আধুনিক ইয়োরোপের ইতিহাস

[1789 খ্রিস্টাব্দ থেকে 1939 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত]

তৃতীয় পত্র

ডঃ গৌতম নিয়োগী, এম. এ., পি-এইচ.ডি.,
রীডার, ইতিহাস বিভাগ, রাজা প্যারীমোহন কলেজ, উত্তরপাড়া,
হুগলি; প্রাক্তন অধ্যাপক, খড়্গপুর কলেজ, মেদিনীপুর
এবং দার্জিলিং সরকারি কলেজ; আজীবন সদস্য,
ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেস এবং
পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ।

অধ্যাপক গৌরদাস হালদার, এম. এ (ডবল), বি.টি.,
প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক, শিক্ষক-শিক্ষণ (বি.এড)
বিভাগ; কো-অর্ডিনেটর, কন্টিনিউয়িং এডুকেশন
সেন্টার, তাম্রলিপ্ত মহাবিদ্যালয়,
মেদিনীপুর।

বি.পি. ব্যানার্জী পাবলিশার্স
৫/১এ কলেজ রো: কলিকাতা-৯ ফোন: ২৪১-০২২৮

প্রকাশক:
শ্রীসূর্যকুমার ব্যানার্জী
ব্যানার্জী পাবলিশার্স
৫/১এ কলেজ রো,
কলিকাতা— ৭০০ ০০৯

লেসার সেটিং:
ইউনিক লেজার সিস্টেম
৪, কুমুদ ঘোষাল রোড
কলিকাতা-৭০০ ০৫৭

অফসেট প্রিন্ট:
লক্ষ্মীনারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৯এ, বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

ভূমিকা

কলকাতা ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নতুন ত্রিবার্ষিক স্নাতক (সাধারণ) পরীক্ষার প্রবর্তন করেছেন। সেই সঙ্গে বোর্ড অফ স্টাডিজ প্রণয়ন করেছেন নতুন পাঠ্যসূচি। এই সূচি আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট কাউন্সিল এবং সিণ্ডিকেট অনুমোদন করেছেন। সেই নির্ধারিত পাঠ্যসূচি অনুসারে বি.এ ক্লাসের তৃতীয় পত্র হিসেবে বর্তমান গ্রন্থখানি রচিত।

কিন্তু ইতিহাসেরও ইতিহাস থাকে। ভূমিকায় তাই প্রথমেই দুটো কথা বলে নেওয়া দরকার, নতুবা সত্যের অপলাপ হবে। বছর দু'য়েক আগে থেকেই আমি এবং আমার সহযোগী লেখক পুরোনো পাঠক্রম অনুসারেই প্রথাগত পাঠ্যপুস্তক থেকে অনেকটা আলাদা ধরণের উচ্চাঙ্গের পাঠ্যপুস্তক মাতৃভাষাতেই পরিবেশনের বাসনায় কাজ শুরু করি এবং তা প্রায় শেষ হওয়ার মুখে নতুন পাঠক্রম আমাদের হাতে আসে। ইতোমধ্যে আমার সহযোগী লেখক অধ্যাপক গৌরদাস হালদার মশাই দুর্ভাগ্যবশত প্রয়াত হন। আজ তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে গভীর শ্রদ্ধা ও তাঁর সাহায্যের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই। তবে নতুন পাঠক্রম অনুসারে পাণ্ডুলিপি আমাকে ঢেলে সাজাতে হয়েছে এবং আমি এককভাবেই তার ভালো-মন্দের জন্য দায়ী।

নতুন পাঠ্যসূচি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্মত এবং ছাত্রজীবনের উপযোগী আমি মনে করি। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত থাকার সুবাদে এই ইতিহাস সূচি অনুমোদনে যেমন আমি অংশীদার ছিলাম, তেমনি একথাও ঠিক, সংশোধিত নব পাঠক্রম দেখে উৎসাহিত হয়ে পাঠ্যপুস্তক রচনায় অধিক উৎসাহিত হয়েছি। নতুন পাঠক্রমে কেবলমাত্র রাজনৈতিক ইতিহাসের উপরে গুরুত্ব না দিয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সামগ্রিক ইতিহাসের বিষয়বস্তুর উপরে।

এবার বইয়ের প্রসঙ্গে আসি। প্রথমতঃ, আমার গভীর বিশ্বাস ছিল যে মাতৃভাষাতেও উচ্চস্তরের পাঠ্যপুস্তক লেখা সম্ভব। দ্বিতীয়তঃ, সাম্প্রতিককালেও ইয়োরোপের ইতিহাসের নানা শাখায় নানা সময়-পরিধি নিয়ে ঐতিহাসিক গবেষকরা কাজ করে চলেছেন। আমার আশা ছিল যে পুরনো তথ্যাবলির সঙ্গে সাম্প্রতিক গবেষণার আলোকে ইয়োরোপীয় ইতিহাসের কাহিনী যদি সহজ ও সাবলীল ভাষায় স্নাতক স্তরের উপযোগী ক'রে পরিবেশন করা যায় তাহলে এক বিরাট অভাব পূরণ হবে। সকলেই জানেন, ইয়োরোপের ইতিহাস বিষয়ে বাংলা বইয়ের ভীষণ অভাব। অথচ ইংরেজিতে ইয়োরোপীয় ইতিহাসের গবেষণামূলক গ্রন্থ তো বটেই, এমনকি পাঠ্যবইয়েরও অভাব নেই। আমরা বাংলায় বই লিখতে গিয়ে যতদূর সম্ভব সাম্প্রতিক ঐ সকল বইপত্রের সাহায্য নিয়েছি এবং গ্রন্থপঞ্জীতে তা' ঋণ হিসাবে স্বীকার করেছি।

নির্ধারিত পাঠ্যসূচি অনুসারে লিখিত হলেও আলোচনা পূর্ণাঙ্গ করার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বা বিষয়ের প্রতি সুবিচার করার জন্য কিছু কিছু অতিরিক্ত বিষয়বস্তু যোগ করতে হয়েছে। এছাড়া পরীক্ষার্থীদের অনুশীলনের সুবিধার্থে গ্রন্থ শেষে পর্বভিত্তিক প্রশ্নাবলীও উল্লেখ করা হয়েছে।

গ্রন্থটি প্রকাশে যাঁরা নিরন্তর উৎসাহ ও প্রেরণা যুগিয়েছেন, প্রয়োজনীয় বইপত্র সংগ্রহ করে দিয়েছেন, পাণ্ডুলিপি পাঠ ক'রে মতামত দিয়েছেন, তাঁদের সকলকেই জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। স্থানাভাবে প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করা থেকে বিরত রইলাম। তবে ছাত্রজীবনে অধ্যাপক বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শিপ্রা সরকার এবং অমিতাভ মুখোপাধ্যায়— এই তিন পরমশ্রদ্ধেয় অধ্যাপকের কাছে ইয়োরোপীয় ইতিহাসের পাঠ নিয়েছিলাম, তা সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। আমাদের বন্ধুদের মধ্যে প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তীর ইয়োরোপের ইতিহাস বিষয়ে ধারণা সবচেয়ে স্বচ্ছ, তাঁর কাছে আমি নানাভাবে ঋণী। তেমনি ঋণী আমার সবচেয়ে বড়ো সমালোচক দেশবন্ধু গার্লস্ কলেজের অধ্যক্ষা ইতিহাসের ছাত্রী ডঃ অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়ের কাছেও।

গ্রন্থটি প্রকাশে ব্যানার্জী পাবলিশার্সের কর্ণধার শ্রীযুক্ত সূর্যকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এই সত্তোরোর্ধ বয়সেও যেভাবে অনলস ও সযত্ন প্রয়াস নিয়েছেন এবং দরাজহাতে সহযোগিতা করেছেন তা সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। যদি ইতিহাসের অধ্যাপক-অধ্যাপিকা বন্ধুগণ গঠনমূলক সমালোচনা করেন এবং কোনও ভুলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তবে পরবর্তী সংস্করণে পরিমার্জনের সময় তা গ্রহণ করার স্বীকৃতি জানিয়ে রাখছি। পূর্বেই বলেছি, গ্রন্থের ত্রুটি বিচ্যুতির দায় একান্তই আমার।

—গৌতম নিয়োগী

UNIVERSITY OF
CALCUTTA & KALYANI

Syllabus for Three-Years (General) Degree Course

History— Paper-III

MODERN EUROPE (1789-1939)

A. Foundation of Modern Europe (1789-1814):

1. Background-Renaissance and Reformation-Geographical Discoveries-Scientific Revolution-Advent of Capitalism.
2. The French Revolution-Socio-Economic Background.
2. Progress of the revolution-Posular Movements-Jacobins and Girondins.
3. Rise of Napoleon-Internal Reconstruction-Napoleon and Europe-Napolean and Revolution.

B. Political developments in Europe from 1815-1870:

1. Triumph of conservatism-The Metternich System.
2. Nationalism, Liberalism and the Revolutions of 1830 and 1848.
3. Stages of Italian unification.
4. Unification and consolidation of Germany.
5. Russia: Attempts at Reforms by Alexander-II.

C. Society and Economy in Nineteenth century Europe:

1. Industrial Advances in England and the continent.
2. Labour Movements.
3. Utopian Socialism and Marxism.
4. Art and Culture, Literatures and Science.

D. Modern Imperialism 1871-1914:

1. Europe in 1871-New Balance of Power.
2. Scramble for colonies in Asia and Africa.
3. The Eastern Question in later Nineteenth Century.
4. Triple Alliance, Triple EntentS & the Emergence of two armed camps.

E. First World War (1914-1919):

1. Origins of the First World War-Issues and Stakes.
2. Russian Revolution of 1917.
3. Peace Settlement of 1919-Its long term consequences-Birth of German Republic.

F. Europe in the Inter-War Period (1919-1939):

1. Consolidation of economic and political power of the Soviet State.
2. Rise of Fascism in Italy.
3. Nazism and Germany-Nazi state-the aggressive foreign policy.
4. Outbreak of the Second World War-Different Interpretations.

সূচিপত্র

প্রথম পর্ব:

আধুনিক ইয়োরোপের বনিয়াদ (1789-1814)

পৃষ্ঠা

অধ্যায় ১ : আধুনিক ইয়োরোপের পটভূমিকা ৩-৩৪

১। সূচনা—পৃঃ ৩ : ২। রেনেশাঁস বা নবজাগরণ—পৃঃ ৮ : ৩। রিফর্মেশন বা ধর্মসংস্কার আন্দোলন—পৃঃ ১৮ : ৪। ভৌগোলিক আবিষ্কার—পৃঃ ২৫ : ৫। বিজ্ঞানের জগতে বিপ্লব—পৃঃ ৩০ : ৬। পুঁজিবাদের উদ্ভব—পৃঃ ৩২।

অধ্যায় ২ : ফরাসি বিপ্লব ৩৫-৮০

১। সূচনা—পৃঃ ৩৫ : ২। সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকা—পৃঃ ৩৬ : ৩। দার্শনিকদের ভূমিকা—পৃঃ ৪৬ : ৪। রাজতন্ত্রের দায়িত্ব—পৃঃ ৫০ : ৫। বিপ্লবের অগ্রগতি ও অভিজাত বিদ্রোহ থেকে গণ আন্দোলন—পৃঃ ৫৪ : ৬। ফরাসি সংবিধান সভা—পৃঃ ৬২ : ৭। বিপ্লবের অগ্রগতি—পৃঃ ৬৭ : ৮। সন্ত্রাসের রাজত্ব—পৃঃ ৭৩ : ৯। ন্যাশানাল কনভেনশন বা জাতীয় প্রতিনিধি সভার পুনরাগমন—পৃঃ ৭৭ : ১০। ডিরেক্টরি বা পঞ্চ পরিচালকের শাসন—পৃঃ ৭৮ : ১১। ফরাসি বিপ্লবের ফলাফল—পৃঃ ৭৯।

অধ্যায় ৩ : নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ৮১-১২৪

১। সূচনা—পৃঃ ৮১ : ২। নেপোলিয়ানের উত্থান—পৃঃ ৮২ : ৩। নেপোলিয়ানের আভ্যন্তরীণ শাসন সংস্কার—পৃঃ ৯০ : ৪। সম্রাট হিসেবে নেপোলিয়ান:—পৃঃ ৯৬ : ৫। নেপোলিয়ান এবং ইয়োরোপ—পৃঃ ১০১ : ৬। নেপোলিয়ান ও বিপ্লব—পৃঃ ১১৮ : ৭। নেপোলিয়ানের পতনের কারণ—পৃঃ ১২০।

দ্বিতীয় পর্ব:

ইয়োরোপের রাজনৈতিক ইতিহাস (1815-1870)

পৃষ্ঠা

অধ্যায় ৪ : ফরাসি বিপ্লবোত্তর ইয়োরোপে রক্ষণশীলপর্ব ১২৭-১৫৪

১। ফরাসি বিপ্লব ও নেপোলিয়ানের পতনের পর রক্ষণশীলতা—পৃঃ ১২৭ : ২। ভিয়েনা সম্মেলন—পৃঃ ১৩০ : ৩। ইয়োরোপীয় শক্তি সমবায়—পৃঃ ১৩৮ : ৪। মেটারনিষ পদ্ধতি—পৃঃ ১৪৮ : ৫। রক্ষণশীলতার ব্যর্থতার কারণ—পৃঃ ১৫২।

অধ্যায় ৫ : জাতীয়তাবাদ, উদারপন্থা ও বিপ্লব ১৫৫-১৯৩

১। বিপ্লবোত্তর ইয়োরোপে জাতীয়তাবাদ, উদারপন্থা ও বিপ্লব—পৃঃ ১৫৫ : ২। 1820 খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবী অভ্যুত্থান—পৃঃ ১৫৯ : ৩। গ্রিসের স্বাধীনতা সংগ্রাম—পৃঃ ১৬৩ : ৪। জুলাই বিপ্লব (1830) কারণ ও ফলাফল—পৃঃ ১৬৬ : ৫। ফেব্রুয়ারি বিপ্লব (1848) কারণ, ফলাফল ও প্রতিক্রিয়া—পৃঃ ১৭৮ : ৬। ফ্রান্সে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র এবং দ্বিতীয় সাম্রাজ্য—পৃঃ ১৯১।

অধ্যায় ৬ : ইতালির ঐক্য আন্দোলনের বিভিন্ন স্তর ১৯৪-২০৯

১। সূচনা—পৃঃ ১৯৪ : ২। ইতালির ঐক্য আন্দোলনের বিভিন্ন স্তর—পৃঃ ১৯৬ : ৩। ইতালির ঐক্য আন্দোলনের প্রথম পর্ব (1815-1848)—পৃঃ ১৯৯ : ৪। গিউসেপ্ ম্যাৎসিনির ভূমিকা—পৃঃ ২০১ : ৫। ইতালির ঐক্য আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব (1848-1860) —পৃঃ ২০৩ : ৬। ইতালির ঐক্য আন্দোলনের শেষ পর্ব (1860-1870)—পৃঃ ২০৮।

অধ্যায় ৭ : জার্মানির ঐক্য ও শক্তিবৃদ্ধি ২১০-২২৬

১। সূচনা—পৃঃ ২১০ : ২। জার্মানির ঐক্য আন্দোলনের প্রথমপর্ব (1815-1848)—পৃঃ ২১১ : ৩। জার্মানির ঐক্য আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব এবং অটোফন বিসমার্ক(1848-1870)—পৃঃ ২১৭ : ৪। জার্মানির ঐক্য ও ইয়োরোপের নতুন শক্তিসাম্য—পৃঃ ২২৫।

পৃষ্ঠা

অধ্যায় ৮ : রাশিয়ার ইতিহাস ২২৭-২৪৪

১। সূচনা—পৃঃ ২২৭ : ২। প্রথম আলেকজাণ্ডার—পৃঃ ২৩১ : ৩। প্রথম নিকোলাস—পৃঃ ২৩৩ : ৪। জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার ও তাঁর সংস্কার—পৃঃ ২৩৬।

তৃতীয় পর্ব :

উনিশ শতকের ইয়োরোপের সমাজ ও অর্থনীতি

অধ্যায় ৯ : ইংল্যাণ্ড ও ইয়োরোপীয় মহাদেশে শিল্পায়ন ২৪৭-২৬৪

১। সূচনা—পৃঃ ২৪৭ : ২। শিল্প বিপ্লব—পটভূমিকা ও বৈশিষ্ট্য—পৃঃ ২৪৮ : ৩। ইংল্যাণ্ডে শিল্পায়ন—পৃঃ ২৫৩ : ৪। ইয়োরোপীয় মহাদেশে শিল্পায়ন—পৃঃ ২৫৮ : ৫। শিল্পায়নের ফলাফল—পৃঃ ২৬৩।

অধ্যায় ১০ : উনিশ শতকে শ্রমজীবী আন্দোলন ২৬৫-২৭৫

১। শ্রমজীবী শ্রেণীর উদ্ভব—পৃঃ ২৬৫ : ২। শ্রমজীবী আন্দোলনের কারণ—পৃঃ ২৬৭ : ৩। ইংল্যাণ্ডে শ্রমজীবী আন্দোলন—পৃঃ ২৬৯ : ৪। ফ্রান্সে শ্রমজীবী আন্দোলন— পৃঃ ২৭২ : ৫। জার্মানিতে শ্রমজীবী আন্দোলন—পৃঃ ২৭৪।

অধ্যায় ১১ : কাল্পনিক সমাজতন্ত্র এবং মার্ক্সবাদ ২৭৬-২৯৪

১। সমাজতন্ত্র কাকে বলে—পৃঃ ২৭৬ : ২। সমাজতন্ত্রের উদ্ভব—পৃঃ ২৭৬ : ৩। কাল্পনিক সমাজতন্ত্র কাকে বলে—পৃঃ ২৭৯ : ৪। রবার্ট আওয়েন—পৃঃ ২৮১ : ৫। সাঁ সিমোঁ—পৃঃ ২৮২ : ৬। শার্ল ফুরিয়ে—পৃঃ ২৮২ : ৭। লুই ব্লাঁ—পৃঃ ২৮৩ : ৮। অন্যান্য সমাজতন্ত্রীগণ—পৃঃ ২৮৪ : ৯। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র এবং মার্ক্সবাদ—পৃঃ ২৮৭ : ১০। মার্ক্স এবং এঙ্গেলস্—পৃঃ ২৮৮ : ১১। মার্ক্সবাদের মূলসূত্র—পৃঃ ২৯০।

অধ্যায় ১২ : শিল্প ও সংস্কৃতি, সাহিত্য ও বিজ্ঞান ২৯৫-৩১০

১। গোড়ার কথা : রোমান্টিকতা ও বাস্তববাদ—পৃঃ ২৯৫ : ২। সাহিত্য—পৃঃ ২৯৮ : ৩। শিল্প ও সংস্কৃতি—পৃঃ ৩০১ : ৪। সংগীত—পৃঃ ৩০৪ : ৫। বিজ্ঞান—পৃঃ ৩০৬।

চতুর্থ পর্ব:

আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ (1871-1914)

পৃষ্ঠা

অধ্যায় ১৩ : 1871 খ্রিঃ ইয়োরোপ ও নতুন শক্তিসাম্য ৩১৩-৩২১

১। সেডানের যুদ্ধ এবং তার ইয়োরোপীয় প্রতিক্রিয়া—পৃঃ ৩১৩ : ২। 1871 খ্রিস্টাব্দে ইয়োরোপে বিভিন্ন দেশের অবস্থা—পৃঃ ৩১৫ : ৩। ইয়োরোপে নতুন শক্তিসাম্য—পৃঃ ৩১৯।

অধ্যায় ১৪ : অ্যাফ্রো-এশিয় দেশগুলিতে উপনিবেশের সম্প্রসারণ ৩২২-৩৩৬

১। সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতা—পৃঃ ৩২২ : ২। এশিয়া মহাদেশে উপনিবেশের সম্প্রসারণ—পৃঃ ৩২৫ : ৩। আফ্রিকার দেশগুলিতে উপনিবেশের সম্প্রসারণ—পৃঃ ৩৩২।

অধ্যায় ১৫ : পূর্বাঞ্চল সমস্যা ৩৩৭-৩৫৬

১। পূর্বাঞ্চল সমস্যা কাকে বলে—পৃঃ ৩৩৭ : ২। পূর্বাঞ্চল সমস্যার কারণ—পৃঃ ৩৩৯ : ৩। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ : কারণ, ফলাফল ও তাৎপর্য—পৃঃ ৩৪২ : ৪। রুমানিয়া সমস্যা—পৃঃ ৩৪৫ : ৫। বার্লিনচুক্তি : পটভূমিকা, শর্ত ও মূল্যায়ন—পৃঃ ৩৪৬ : ৬। বুলগেরিয়ান সমস্যা—পৃঃ ৩৫০ : ৭। বার্লিন বাগদাদ রেলপথ—পৃঃ ৩৫১ : ৮। আর্মেনিয়ান সমস্যা—পৃঃ ৩৫২ : ৯। তরুণ তুর্কি আন্দোলন—পৃঃ ৩৫৩ : ১০। প্রথম ও দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ—পৃঃ ৩৫৪।

অধ্যায় ১৬ : ত্রিপাক্ষিক মৈত্রীব্যবস্থা ও ইয়োরোপের সামরিক মেরুকরণ ৩৫৭-৩৭৪

১। ইয়োরোপীয় মৈত্রী ব্যবস্থা—পৃঃ ৩৫৭ : ২। ট্রিপ্‌ল অ্যালায়েন্স বা ত্রিপাক্ষিক মৈত্রী—পৃঃ ৩৬০ : ৩। ট্রিপল্‌ আতাঁত বা ত্রিশক্তি মৈত্রী গঠন—পৃঃ ৩৬৯ : ৪। মৈত্রী ব্যবস্থার ফলাফল—পৃঃ ৩৭৩।

পঞ্চম পর্ব:

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (1914-1919)

পৃষ্ঠা

অধ্যায় ১৭ : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা, অগ্রগতি, ফলাফল ৩৭৭-৩৯৮

১। বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি ও তৎপালীন ইয়োরোপের পরিস্থিতি—পৃঃ ৩৭৭ : ২। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ—পৃঃ ৩৭৯ : ৩। সেরাজেভো হত্যা ও বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত—পৃঃ ৩৮৮ : ৪। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য জার্মানির দায়িত্ব—পৃঃ ৩৯০ : ৫। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রকৃতি—পৃঃ : ৬। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাবলী—পৃঃ ৩৯৩ : ৭। বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল—পৃঃ ৩৯৬ : ৮। যুদ্ধের পরে শান্তি—পৃঃ ৩৯৭।

অধ্যায় ১৮ : রুশ বিপ্লব (1917 খ্রিঃ) ৩৯৯-৪১৮

১। সূচনা—পৃঃ ৩৯৯ : ২। পটভূমিকা—পৃঃ ৪০০ : ৩। প্রথম রুশ বিপ্লব (1905)—পৃঃ ৪০৪ : ৪। বলশেভিক বিপ্লবের কারণ—পৃঃ ৪০৬ : ৫। মার্চ থেকে নভেম্বর (1917 খ্রিঃ)—পৃঃ ৪১১ : ৬। রুশ বিপ্লবে লেনিনের ভূমিকা—পৃঃ ৪১৩ : ৭। বলশেভিক বিপ্লবের পর রাশিয়া—পৃঃ ৪১৬।

অধ্যায় ১৯ : শান্তি চুক্তি ও তার সুদূরপ্রসারী ফলাফল ৪১৯—৪৪০

১। প্যারিসের শান্তি সম্মেলন—পৃঃ ৪১৯ : ২। ভার্সাই-এর সন্ধি—পৃঃ ৪২৩ : ৩। সেন্ট জার্মেইনের সন্ধি—পৃঃ ৪২৮ : ৪। নিউলির সন্ধি—পৃঃ ৪৩০ : ৫। ট্রিয়াননের সন্ধি—পৃঃ ৪৩০ : ৬। সেভর-এর সন্ধি—পৃঃ ৪৩০ : ৭। শান্তিচুক্তির সুদূর প্রসারী ফলাফল—পৃঃ ৪৩১ : ৮। জাতি সংঘ বা 'লীগ অফনেশনস্'—পৃঃ ৪৩৪ : ৯। জার্মান প্রজাতন্ত্রের উদ্ভব—পৃঃ ৪৩৯।

ষষ্ঠ পর্ব:
দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীযুগে ইয়োরোপ (1919-1939)

পৃষ্ঠা

অধ্যায় ২০ : সোভিয়েটরাষ্ট্রে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তির সুদৃঢ়করণ ৪৪৩—৪৫৩

১। পটভূমিকা—পৃঃ ৪৪৩ : ২। গৃহযুদ্ধ (1918-1921)—পৃঃ ৪৪৪ : ৩। লেনিন ও তাঁর নয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা—পৃঃ ৪৪৭ : ৪। লেনিনের জীবনাবসান ও স্ট্যালিন—পৃঃ ৪৫১।

অধ্যায় ২১ : ইতালিতে ফ্যাসিবাদের উত্থান ৪৫৪—৪৬৯

১। ফ্যাসিবাদের উত্থানের আগে ইতালি—পৃঃ ৪৫৪ : ২। ফ্যাসিবাদের উত্থানের কারণ—পৃঃ ৪৫৬ : ৩। বেনিতো মুসোলিনি এবং ফ্যাসিস্ট দলের উত্থান পৃঃ ৪৫৮ : ৪। মুসোলিনির আভ্যন্তরীণ নীতি—পৃঃ ৪৬২ : ৫। মুসোলিনির পররাষ্ট্রনীতি—পৃঃ ৪৬৬ : ৬। উত্তরকালের কথা—পৃঃ ৪৬৮।

অধ্যায় ২২ : জার্মানি ও নাৎসীবাদ ৪৭০—৪৮৬

১। ন্যাৎসীবাদের উত্থানের আগে জার্মানি—পৃঃ ৪৭০ : ২। অ্যাডল্ফ হিট্‌লার এবং নাৎসী দলের উত্থান—পৃঃ ৪৭৩ : ৩। নাৎসী রাষ্ট্র—পৃঃ ৪৭৬ : ৪। হিট্‌লারের আগ্রাসী পররাষ্ট্রনীতি— পৃঃ ৪৭৯ : ৫। উত্তরকালের কথা—পৃঃ : ৪৮৫।

অধ্যায় ২৩ : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা ৪৮৭—৪৯৬

১। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ—পৃঃ ৪৮৭ : ২। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দায়ঃ নানা ব্যাখ্যা—পৃঃ ৪৯৫।

গ্রন্থপঞ্জি i—vi

নির্দেশনা vii

পর্বভিত্তিক প্রশ্নাবলী viii—x

উল্লেখযোগ্য ঘটনাপঞ্জি xi—xii

প্রথম পর্ব

আধুনিক ইয়োরোপের বনিয়াদ (১৭৮৯-১৮১৪)

[Foundation of Modern Europe (1789-1814)]

অধ্যায় ১

আধুনিক ইয়োরোপের পটভূমিকা

(Syllabus: *Background–Renaissance and Reformation- Geographical Discoveries–Scientific Revolution– Advent of Capitalism*)

১। সূচনা

ইতিহাসের ধারা অবিচ্ছিন্নভাবে বহমান। প্রাগৈতিহাসিক যুগ শেষ হয়ে সমাজ ও সভ্যতার বিবর্তন যখন ইতিহাসের যুগে পদার্পণ করল তখন থেকে অদ্যাবধি সমাজবদ্ধ মানুষদের সমষ্টিগত জীবনযাত্রার রূপ ও কালপরম্পরায় রূপান্তরের নানা পর্বের অতীতাশ্রয়ী ব্যাখ্যার নামই ইতিহাস। এই ইতিহাসের ধারা অবিচ্ছিন্ন হলেও মাঝে মাঝে তার দিক পরিবর্তন হয়েছিল; আবার বিশেষ বিশেষ যুগের কতকগুলি যুগলক্ষণও ছিল। এই কারণে সামগ্রিক ইতিহাস আলোচনার সুবিধার জন্য এবং ইতিহাস পঠন পাঠনের জন্য ইতিহাসবিদগণ প্রাচীন, মধ্য এবং আধুনিক যুগ— এই রূপ-কালপর্ব চিহ্নিত করেছেন।

তবে ভারতবর্ষেই হোক আর ইয়োরোপেই হোক, মানব সভ্যতার ইতিহাসে আধুনিক যুগের সূত্রপাত একদিনে হয়নি। সভ্যতার ইতিহাসের ধারায় আমরা দেখতে পাই যে প্রাচীন যুগ থেকে মধ্যযুগে উত্তরণ ঘটেছে এক দীর্ঘ বিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। একইভাবে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে ইতিহাসের রূপান্তর (Transition) দীর্ঘকালীন এক ক্রম-বিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ঘটেছে। তবে এই প্রসঙ্গে কতকগুলি কথা মনে রাখা দরকার।

প্রথমতঃ, প্রত্যেক যুগের কিছু যুগলক্ষণ থাকে। যেমন ইয়োরোপের প্রাচীন যুগের ইতিহাসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল দাস প্রথা এবং দাস-ভিত্তিক শ্রম (Slavery)। তেমনি মধ্যযুগের ইতিহাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য সামন্ততন্ত্র বা সামন্তপ্রথা (Feudalism)। আবার আধুনিক যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদ এবং শিল্পের প্রসার। আর এই দুই যুগের অন্তর্বর্তীকালীন সময়কে আমরা বলি যুগ সন্ধিক্ষণ। দ্বিতীয়তঃ, এই বিবর্তন-পরিবর্তন পৃথিবীর সব দেশে বা মহাদেশে একই সময়ে হয়নি। যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে ভারতবর্ষে এই পরিবর্তন প্রক্রিয়া ঘটেছিল আঠারো-উনিশ শতকে। তখন মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণ ঘটে। আবার ইয়োরোপ মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে পদার্পণ করেছিল চতুর্দ্দশ থেকে ষোড়শ শতকের মধ্যে। তবে সেখানেও আধুনিক যুগের সূচনার পর উষালগ্ন হলেও অষ্টাদশ শতকের পর দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং শিল্পবিপ্লব নতুন মাত্রা যুক্ত করে ছিল।

তবে কবে থেকে আধুনিক যুগ শুরু হয়েছে এবং কীভাবে শুরু হয়েছে বা বিবর্তন-প্রক্রিয়ার নানা স্তর কেমন, তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে নানা বিতর্ক আছে। আগেই দেখেছি যে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগ, এই যুগ পরিবর্তন প্রতি দেশে বা মহাদেশে পৃথক ঘটনা, যেমন ইয়োরোপে ও ভারতে তা সম্পূর্ণ আলাদা। আবার একথাও মনে রাখা দরকার যে, ইয়োরোপে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণ পর্বের প্রেক্ষাপট ছিল স্বাধীন রাষ্ট্রব্যবস্থা; অথচ আফ্রিকা বা এশিয়ার অনেক দেশেই এই পরিবর্তন ঘটেছিল পরাধীন ও ঔপনিবেশিক (Colonial) রাষ্ট্রব্যবস্থায়।

আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয় হল ইয়োরোপের ইতিহাস। সুতরাং অন্য দেশ বা মহাদেশ বাদ দিয়ে শুধু ইয়োরোপের দিকেই দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে। প্রথমতঃ, ইয়োরোপেও মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে পরিবর্তন একদিনে হয়নি। এটা ঘটেছিল এক ব্যাপক পরিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অর্থাৎ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে পরিবর্তন। এই বিবর্তন ছিল ব্যাপক অর্থাৎ অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সবদিক থেকে। দ্বিতীয়তঃ, নানা ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে এবং ব্যাপক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের ফলে মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা, সমাজ ও মূল্যবোধ ভেঙে যেতে থাকলেও অতীত-ঐতিহ্য সর্বাংশে লুপ্ত হয়ে যায়নি। তাই আজকাল সমাজবিজ্ঞানীগণ পরিবর্তন ও ঐতিহ্যের পরম্পরা (Changes and continuities) কথাগুলি আধুনিকতার (Modernity) ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন। যাই হোক, মধ্যযুগের ইতিহাসের ধারা থেকে আধুনিক সভ্যতার ইতিহাসে পদার্পণের সবচাইতে বড়ো বৈশিষ্ট্য হলো মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, জীবন আদর্শে ও অর্থনীতিতে ভাঙন এবং সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদে উত্তরণ (Transition from Feudalism to Capitalism)।

সামন্ততন্ত্রের অবসানঃ মধ্যযুগের ইয়োরোপের সর্বাপেক্ষা বড়ো বৈশিষ্ট্য ছিল সামন্ততন্ত্র (Feudalism) । যদিও এই প্রথার সংজ্ঞা, তার নানা দিক, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি নিয়ে এবং এই প্রথার উৎপাদন পদ্ধতি ও অর্থনীতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার সুযোগ এবং পরিসর এখানে নেই তবু সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে দু'চার কথা জেনে নেওয়া দরকার। নতুবা কি ভাবে ধীরে ধীরে এই সমাজব্যবস্থা ভেঙে যেতে শুরু করল এবং শেষ পর্যন্ত নতুন যুগের সূচনা হলো তা বোঝা যাবে না।

ত্রিস্তর বিশিষ্ট এই ব্যবস্থার শীর্ষে ছিলেন রাজন্যবর্গ যাদের বেশির ভাগই ছিলেন নিষ্ক্রিয়, ক্ষমতাহীন এবং বিলাসবহুল জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত। মধ্যস্তরে ছিলেন সামন্তপ্রভুর দল যাদের রাজারা রাজ্যের জমি চাষ-আবাদ করতে দিয়েছিলেন। সামন্তপ্রভু বা 'ব্যারন'গণ রাজন্যবর্গকে সৈন্য এবং অর্থ সরবরাহ করত। তৃতীয় স্তরে বা সমাজের সবচেয়ে নিচে ছিলেন কৃষক সম্প্রদায়। এই কৃষকশ্রেণী সামন্তপ্রভুদের জমি চাষ করত এবং এদের একমাত্র সম্বল ছিল কায়িক শ্রম। আবার অনেকক্ষেত্রে সামন্ত প্রভুরা নিজেদের অধস্তন ভূস্বামীবর্গকে জমির চাষ আবাদের ভার দিতেন, যারা নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য

সামন্তপ্রভুদের আনুগত্য মেনে নিতেন। এদের নিচে যে কৃষক সম্প্রদায় ছিল তার মধ্যেও স্তর ছিল; অনেকে ছিলেন স্বাধীন। আবার এই স্বাধীন কৃষকদের নিচে ছিল প্রায় ক্রীতদাসের সমতুল্য ভূমিহীন চাষী বা 'সার্ফ'গণ। বস্তুত এই সার্ফদের শ্রমের উপর সামন্ততান্ত্রিক ভূমিব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল এবং আধুনিকযুগের সূত্রপাতের পরেও ইয়োরোপের অনেক দেশে (যেমন রাশিয়াতে) সার্ফপ্রথার (Serfdom) পরিসমাপ্তি ঘটেনি।

মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার আর একটি বড়ো দিক ছিল শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের বা রাজতন্ত্রের অনুপস্থিতি। চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে নানাবিধ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের ফলে যখন মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ধীরে ধীরে ভেঙে যেতে শুরু করল, তখনই এক বিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে, পৃথিবীর ইতিহাসে নবযুগের পথ উন্মোচিত হয়ে আধুনিক যুগের সূচনা ঘটে। এই সূত্রে মনে রাখা যেতে পারে যে, সামন্ততন্ত্র যে ভেঙে গেল তার অনেক কারণ ছিল। সেগুলি এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো—

(1) সামন্তশ্রেণীর মানুষ বা সামন্তপ্রভুরা ছিলেন স্বার্থপর, অত্যাচারী অথচ সমাজে সংখ্যায় মুষ্টিমেয়।

(2) জনগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন কৃষক যারা দরিদ্র ও শোষিত ছিলেন। স্বাভাবিক ভাবেই এই দুই শ্রেণীর স্বার্থ ছিল পরস্পরবিরোধী এবং দীর্ঘকাল টিকে থাকার অনুকূল নয়।

(3) নানা ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে নতুন নতুন দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য স্থাপিত হয়ে এক নতুন বণিক শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল। এই শ্রেণীর সঙ্গে সামন্তশ্রেণীর বিরোধ বাঁধল কারণ তারা সামন্তশ্রেণীর নেতৃত্ব মানতে রাজী ছিলেন না। মনে রাখতে হবে যে, বণিক শ্রেণী সামন্তপ্রভুদের মত জমি থেকে সম্পদ আহরণ করতেন না, তাদের আয়ের উৎস ছিল বাণিজ্য। সুতরাং বণিক সম্প্রদায় প্রভাবশালী অথচ জমির উপর নির্ভরশীল নয়, তাই তারা সামন্তপ্রভুদের সামাজিক নেতৃত্ব মানতে রাজী ছিলেন না।

(4) ইয়োরোপীয় পণ্যের চাহিদা ইয়োরোপের বাইরে বৃদ্ধি পাওয়াতে উৎপাদন পদ্ধতিতে এক ব্যাপক পরিবর্তন হয়।

(5) সামন্তপ্রথার মূল ভিত্তি ছিল জমি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জমির উপর চাপ পড়ল। সামন্তপ্রভুরা উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন না করে খাজনা বৃদ্ধির চাপ বাড়ানোর ফলে শোষণের মাত্রাই বৃদ্ধি পেল। ফলে কৃষক সম্প্রদায়ের অসন্তোষ এবং ফলতঃ বিক্ষোভ বৃদ্ধি পায়। এই রকম একটি বড়ো বিদ্রোহ ঘটেছিল ইংল্যাণ্ডে, 1381 খ্রিস্টাব্দে। শুধু কৃষক নয়, জটিল অবস্থায় সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষের অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়। চার্চ এবং উচ্চ যাজক সম্প্রদায় ছিলেন সামন্তপ্রভুদের সমর্থক। তাদের সমর্থন সত্ত্বেও সামন্তপ্রভুরা পুরাতন ব্যবস্থা রক্ষা করতে পারলেন না।

(6) বারুদের (Gunpowder) আবিষ্কারের ফলে রাজন্যবর্গ সৈন্যদল সরবরাহের জন্য সামন্তপ্রভুদের উপর আর নির্ভরশীল রইলেন না। সমাজের নানাস্তরের মানুষও শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসনের পক্ষে ছিলেন। ফলে রাজন্যবর্গ নব্য রাজতন্ত্রের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে মনোযোগী হলেন। এর ফলে সামন্ততন্ত্র ভেঙে নতুন শক্তিশালী রাজতন্ত্র (Strong Monarchy) গড়ে উঠল। কোথাও কোথাও তা নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রে পর্যবসিত হলো। পরবর্তীকালে অষ্টাদশ শতকে জ্ঞানালোক (Enlightenment) বা বুদ্ধিবিভাসিত দর্শনের প্রভাবে এই নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র বা স্বৈরাচার পরিবর্তিত হলো প্রজাহিতৈষী স্বৈরাতন্ত্রে (Enlightened Despotism)। যেমন প্রাশিয়া, রাশিয়া, অস্ট্রিয়াতে এই পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। অন্য দিকে অর্থনীতিতে পরিবর্তন দেখা দেওয়ায় কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটল। সব মিলে সমাজের চেহারায় এলো পরিবর্তন ; এই বিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ঘটলো আধুনিক যুগে উত্তরণ।

কৃষি এবং শিল্প উৎপাদনব্যবস্থায় পরিবর্তন ঃ আধুনিক যুগের গোড়া থেকেই কৃষি ও শিল্প উৎপাদন পদ্ধতির সমৃদ্ধি ঘটে। কৃষিক্ষেত্রে অনেক নতুন ফসল চাষের সূচনা ও প্রসার হয়। খাদ্যদ্রব্য অধিকতর সহজপ্রাপ্য হয়ে ওঠে। আবার কৃষি ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের আয়ও বাড়ে। বাণিজ্যের প্রধান পণ্য ছিল কৃষিজাত দ্রব্য। ফলে বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন বাড়ানোর দরকার হয়ে পড়েছিল। আর সেই কাজ করতে গেলে কৃষি উৎপাদন পদ্ধতির উন্নতি ও পরিবর্তন দরকার ছিল। এজন্য অনেক নতুন জমি, বিশেষ করে অনাবাদী জমিকে চাষের যোগ্য করে তোলা হলো। দ্বিতীয়তঃ, খাল খনন করে সেচপদ্ধতির উন্নতি ঘটানো হলো। সেই সঙ্গে করা হলো যোগাযোগ ব্যবস্থায় উন্নতি। তৃতীয়তঃ, লাঙলের ফলাকে করা হলো বড়ো এবং ভারী। সেই সময় লোহার যোগান বৃদ্ধি পেল অথচ দাম ছিল কম। ফলে লোহার তৈরি লাঙল, কোদাল, কাস্তে, নিড়ানি, মই ইত্যাদির ব্যবহার বেড়ে যায়। কৃষির পরিবর্তন দেখা গেল ইয়োরোপের খাদ্যশস্যের বাজারেও। প্রচলিত খাদ্যশস্য ছাড়াও আলু, টমেটো, ওলকপি, শালগম ইত্যাদি নতুন ফসলের চাষাবাদ শুরু হলো। আবার দ্রাক্ষাচাষের জন্য বিশেষ যত্ন নেওয়ার সূচনা হলো। ব্যবহৃত হতে লাগল উন্নত বীজ ও সার। সব মিলে কৃষিক্ষেত্রে যে উন্নতি হলো তা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটালো। এটি আধুনিক যুগের সূচনার অন্যতম চিহ্ন।

অন্যদিকে কৃষিব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের ক্ষেত্রেও উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতি ও নতুন উদ্যোগ দেখা গেল। এর মূল কারণ ছিল বাণিজ্যের প্রসার এবং নতুন দেশ আবিষ্কারের ফলে পণ্যের বাজার বৃদ্ধি। মধ্যযুগে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ও কারিগরী উদ্যোগে শ্রমিক ও কারিগররা উৎপাদিত পণ্যের কম দাম পেত। নতুন নতুন দেশ আবিষ্কার, জলাশয়, স্থলপথে নানা দেশের সঙ্গে সম্পর্ক ইত্যাদির ফলে পণ্যের বাজার বেড়ে গেল,

কাঁচামাল সংগ্রহ সহজতর হলো এবং বাণিজ্যের প্রসার হলো। বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নগরায়ন বৃদ্ধি পেল। কলকারাখানা গড়ে উঠল। এই প্রক্রিয়া বহুগুণ বৃদ্ধিপায় উত্তরকালে শিল্প বিপ্লবের (Industrial Revolution) ফলে। ক্রমে ক্রমে যন্ত্রপাতি ও দৈনন্দিন ব্যবহারের দ্রব্যাদি আবিষ্কৃত হলো। বস্তুত বিজ্ঞানের জগতে বিপ্লব ঘটালো নানাবিধ আবিষ্কার। ফলে শিল্পের ক্ষেত্রে বড়ো পরিবর্তন হলো। সামন্তযুগের অত্যাচারে এবং খাজনা বৃদ্ধির চাপে অনেক কৃষক চাষের কাজ ছেড়ে শহরে গিয়ে শ্রমিকের কাজ শুরু করেন। এ সময় শ্রমিক পাওয়া যেত সস্তায়। কেন্দ্রীয় সরকারের শক্তিবৃদ্ধি ও স্থায়িত্ব এই শিল্পায়নের সহায়তায় হলো, যেমন ইংল্যাণ্ডে।

এই অর্থনৈতিক পরিবর্তনের মধ্যেই ঘটলো ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদের উদ্ভব। বণিকরা অর্জিত পুঁজি (Capital) শিল্পে বিনিয়োগ করতে শুরু করলো। মধ্য যুগের শেষপর্বে ও আধুনিক যুগের গোড়ায় সুতো কাটার চরকা (Spinning Wheel), কাঠের গুড়ি কাটার কারখানা (Saw Mill), জল চালিত কাপড় বোনার মেশিন (Waterloom) ছাড়াও মুদ্রণযন্ত্র, উন্নত হাপর, ঘোড়ায় চড়ার জিন, পাদানি ইত্যাদির প্রচলন ছিল। কিন্তু উত্তরকালে শিল্পবিপ্লবের সময় বাষ্পীয় শক্তির আবিষ্কার নতুন যুগের সূচনা করল। কুটির ও কারিগরী শিল্পের বদলে তখন শুরু হলো বৃহৎ বা ভারী শিল্পের যুগ, উৎপাদন বহু সহস্রগুণ বৃদ্ধি পেল।

আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্য ঃ আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি যে, কোনও একটি বিশেষ বৎসর বা তারিখ থেকে আধুনিক যুগের সূচনা হয়েছে এমন ধারণা ইতিহাসের দিক থেকে সঠিক নয়। কারণ মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণ ঘটেছিল এক বিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। আধুনিক ইয়োরোপের পটভূমিকার দিকে তাকালে দেখা যায় প্রধানতঃ পাঁচটি ঘটনা এই বিবর্তন প্রক্রিয়ার সহায়ক হয়েছিল। এগুলি হলো যথাক্রমে রেনেশাঁস বা নবজাগরণ (Renaissance), ধর্মসংস্কার আন্দোলন (Reformation) ভৌগোলিক আবিষ্কার (Geographical Discoveries), বিজ্ঞানচর্চায় বা বিজ্ঞানের জগতে বিপ্লব (Scientific Revolution) এবং পুঁজিবাদের উদ্ভব (Advent of Capitalism)। এই প্রত্যেকটি ঘটনা সম্পর্কে আমরা স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করব। তার আগে মধ্যযুগোত্তর সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তনের ফলাফল এবং আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্যগুলি একটু আলোচনা করে নেওয়া দরকার।

সামন্ততন্ত্রের অবসান, শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসনের মাধ্যমে নব্য রাজতন্ত্র (New Monarchy) প্রতিষ্ঠা, চোদ্দ থেকে ষোলো শতকের মধ্যে বাণিজ্যের প্রসার, কৃষি ও শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থায় উন্নতির ফলে সমাজব্যবস্থায় এবং সভ্যতার যে যুগ সন্ধিক্ষণের সৃষ্টি করেছিল তার মধ্য দিয়েই মধ্যযুগ আধুনিকযুগে উপনীত হলো। আবার সতেরো

থেকে উনিশ শতকের মধ্যে ঘটলো আরও অনেক তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন। নবযুগের ফলে মানবসমাজের জীবনযাত্রার মান যেমন উন্নত হলো, তেমনি অনেক ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা দেখা গেল সতেরো শতক থেকে। যেমন গ্রামীণ সভ্যতার পরিবর্তে জীবন ক্রমেই নগরকেন্দ্রিক হলো। আর অর্থনীতি কৃষিনির্ভর না থেকে হয়ে উঠতে লাগলো শিল্প নির্ভর। আর একটি বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। মধ্যযুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার এবং ধর্মীয় নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য। আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্য হলো যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানমনস্কতা। এই যুক্তির যুগ (Age of Reason) এবং জ্ঞানালোক (Enlightenment) মানুষের মনের উপর প্রভাব ফেলল, তাদের মনের প্রসার ঘটলো। নানা সংস্কার আন্দোলন সমাজ প্রগতির পথ প্রশস্ত করল। ভূস্বামীদের পরিবর্তে প্রথমে বণিক সম্প্রদায় ও পরে শিল্পপতিগণ সবচেয়ে শক্তিশালী শ্রেণী হয়ে উঠলেন। মানব সভ্যতার ধারার আমূল বদল ঘটিয়েছিল শিল্প-বিপ্লব। এই বিপ্লবের পর ক্রমে পুঁজিবাদ থেকে উপনিবেশবাদ (Colonialism) এবং শেষে সাম্রাজ্যবাদ (Imperialism) ছড়িয়ে পড়ল। আবার রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে ইয়োরোপে রাজতন্ত্রের বদলে সাংবিধানিক বা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র (Constitutional Monarchy), গণতন্ত্র (Democracy), প্রজাতান্ত্রিক ভাবধারা (Republicanism) এবং বিপ্লবীচেতনার বৃদ্ধি ঘটলো। শিল্পবিপ্লব এবং উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন জনিত পরিস্থিতিতে সূচনা হলো সমাজতন্ত্রের। সব মিলে ঘটনাবহুল এবং তাৎপর্যপূর্ণ আধুনিক যুগ, যার সূচনা নবজাগরণে বা রেনেশাঁসের সময় থেকে। রেনেশাঁসের নির্দিষ্ট সূচনাকাল বলা কঠিন, তবে 1453 খ্রিস্টাব্দে অটোমান তুর্কিদের আক্রমণে পূর্বের রোমান বা বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্ট্যান্টিনোপলের পতন এই রেনেশাঁসের পথ সুগম করেছিলো বলে অনেক ঐতিহাসিক ঐ বছরকে ইয়োরোপের আধুনিক যুগের সূচনাকাল বলে মনে করেন। তবে এই মতবাদের সত্যতা থাকলেও পুরোপুরি সঠিক নয়।

২। রেনেশাঁস বা নবজাগরণ

রেনেশাঁস (Renaissance) **কাকে বলে :** নতুন ক'রে জাগরণ বা জেগে ওঠা, যাকে এক কথায় বলা যেতে পারে নবজাগরণ, তাই হলো রেনেশাঁস কথাটির অর্থ। আক্ষরিক অর্থে কথাটির মানে পুনর্জন্মও বটে। তবে ইয়োরোপের ইতিহাসে রেনেশাঁস বলতে এক বিশেষ আন্দোলন বোঝায়। চিন্তা এবং কর্মে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণের ক্ষেত্রে ইয়োরোপের রেনেশাঁস আন্দোলনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।[1]

---

1. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্র. G.R. Elton, *Ideas and Institutions in Western Civilisation; Renaissance and Reformation*, New York, 1963 ; W. Ferguson, *The Renaissance in Historical Thought*, New York, *1948 ;* J. Burckhardt, *The Civilization of the Renaissance in Italy*, New York 1954 ; T Helton (ed.), *The Renaissance ; A Reconsideration of the Theories and Interpretation of the Age*, Madison, 1964..

ইয়োরোপীয় নবজাগরণ বলতে সাধারণভাবে প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সভ্যতার প্রতি নতুন করে আগ্রহও বোঝায়। তবে ব্যাপক অর্থে রেনেশাঁসের সংজ্ঞায় জ্ঞানচর্চা, শিল্প, সাহিত্য, দর্শন ও রাজনীতিতে নতুন প্রতিভার বিকাশ বোঝায়। এই রেনেশাঁসের ফলেই ইয়োরোপে আধুনিক যুগের সূত্রপাত ঘটা সহজ হয়। তবে রেনেশাঁস কথাটির অর্থ আরও ব্যাপক— বিচারবোধ এবং বন্ধন থেকে মুক্তি ; মানুষকেই সভ্যতার মূলবিষয় হিসেবে দেখা; সকলপ্রকার বন্ধন থেকে মানুষের মনের মুক্তির ফলে মানসিক জগতে মুক্ত হাওয়ার সৃষ্টির ফলে জ্ঞানচর্চা বৃদ্ধি রেনেশাঁসের বৈশিষ্ট্য, যা নতুন যুগ সৃষ্টি করে।

রেনেশাঁসের পটভূমিকা ঃ 476 খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমের রোম সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সংস্কৃতির সঙ্গে ইয়োরোপের যোগ কমে যায়, এমনকি পরে লুপ্তও হয়। সেই থেকে রেনেশাঁস পর্যন্ত মধ্যযুগকে একদা বলা হত 'অন্ধকার যুগ' (The Dark Age) । আধুনিক ঐতিহাসিকগণ এই মত আর গ্রহণ করেন না। আমরা আগেই দেখেছি যে ইতিহাসের যুগ পরিবর্তন হঠাৎ ঘটে না, আবার রাতারাতিও হয় না। একটি বিশেষ বৎসরে রাজবংশের পতন হতে পারে, নতুন রাজবংশের সূচনা হতে পারে, যুদ্ধ হতে পারে, কারও জন্ম-মৃত্যু হতে পারে কিন্তু সমাজ সভ্যতা বদলে যায় না। মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগের আবির্ভাব কয়েক শতকধরে ঘটেছিল। রেনেশাঁস আন্দোলনেরও পূর্বাভাস ছিল। মধ্যযুগেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে জ্ঞানচর্চা ছিল, ক্যারোলিনজিয়ান যুগে জ্ঞানচর্চা ছিল; জ্ঞানচর্চার বিকাশ ঘটেছিল দ্বাদশ শতকেও। এই শেষোক্ত বিকাশকে দ্বাদশ শতকের নবজাগরণ (12th Century Renaissance) অনেকে বলেন। এগুলি পঞ্চদশ শতকের নবজাগরণের পটভূমি তবে ব্যপ্তিতে এই নবজাগরণ পূর্বেকার জ্ঞানচর্চাকে বহুমাত্রায় ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

1453 খ্রিস্টাব্দে কনস্ট্যানটিনোপলের পতন এই বিকাশকে অনেক দ্রুততর করেছিল। তুর্কি আক্রমণে ভীত বহু পণ্ডিতব্যক্তি পূর্বের রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পরে বাইজেনটিয়াম রাজ্য ছেড়ে বহু দুর্লভ গ্রন্থের পুঁথি ও পাণ্ডুলিপি সহ ইতালিতে চলে আসেন। তারপর ক্রমে ইতালিতে প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় লিখিত নানা বিদ্যার চর্চা শুরু হয়। রোমান সংস্কৃতির সঙ্গে নতুন করে পরিচয় হতে শুরু করে। প্রাচীন সভ্যতা ও জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে নতুন করে পরিচয় প্রথমে ইতালি ও পরে সমগ্র ইয়োরোপে ছড়িয়ে পড়ে; সর্বত্র তা মানুষদের গভীরভাবে প্রভাবিত করে। শুধু তাই নয়, তা মানুষের মনের বন্ধ জানালা খুলে মুক্তবায়ুর সঞ্চার করে। এর ফলেই ব্যাপক নবজাগরণ আন্দোলনের সূচনা হয়।

নবজাগরণের প্রকৃতি ঃ মধ্যযুগে ছিল খ্রিস্টধর্মের একচ্ছত্র আধিপত্য। রাজা-প্রজা সকলেই খ্রিস্টান ধর্মাধিষ্ঠান বা চার্চকে মেনে চলতেন। বিশ্বাস থেকে সৃষ্টি হয় অন্ধ বিশ্বাসের। খ্রিস্টধর্মের একচ্ছত্র আধিপত্যের বিরুদ্ধে কোনও প্রতিবাদ ছিল না। মানুষ

ভাবত বর্তমান জীবনের যে দুঃখকষ্ট তা সবই আগামী ভবিষ্যতের গভীর বেদনার দিনগুলির আভাস। যে পৃথিবীতে আছে খ্রিস্টধর্ম, চার্চ, বাইবেল সেই পৃথিবী ঘোরে না, সূর্যই পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে। এসব ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয় কুসংস্কার থেকেই। মধ্যযুগে খ্রিস্টান চার্চের দোর্দন্ড প্রতাপ থাকার ফলে ক্যাথলিক ধর্মযাজকগণই কেবল বাইবেল ব্যাখ্যা করতেন। সাধারণ মানুষ বাইবেল পড়তে পারতেন না প্রধানতঃ দুটি কারণে, একটি হলো ভাষাগত অন্যটি পাণ্ডুলিপির দুষ্প্রাপ্যতা। কিন্তু ক্রমে ল্যাটিন, ইংরেজি প্রভৃতি ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ এবং পনেরো শতকে যোহান গুটেনবার্গ কর্তৃক ছাপাখানার আবিষ্কার জ্ঞানচর্চার আন্দোলনকে সাহায্য করে। সুতরাং আক্ষরিক অর্থে পুনর্জন্ম বা নবজাগরণ বোঝালেও রেনেশাঁস শুধু গ্রিক-রোমান সংস্কৃতি, ইতিহাস, সভ্যতা ও দর্শনের চর্চায় সীমাবদ্ধ ছিল না। শিল্পসাহিত্য, ধর্মদর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি, ইতিহাস সম্পর্কিত ধারণার বিশেষ উন্নতিও রেনেশাঁস আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফসল। রেনেশাঁসের মধ্যে ছিল চিন্তার মুক্তি।

রেনেশাঁসের সূচনা হয় ইতালিতে, পরে তা ইয়োরোপের অন্যত্র প্রসারলাভ করে। প্রাচীন গ্রিক ও রোমান সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে নতুন ক'রে পরিচয় ক্রমে শাস্ত্র ও ধ্রুপদী সাহিত্য (Classics) চর্চায় ব্যাপ্ত হয়। তাছাড়া মধ্যযুগের মতন চার্চেরই কেবল বাইবেল ব্যাখ্যা করবার অধিকার রইল না, ছাপার অনায়াসলব্ধ হওয়ার ফলে মানুষ তা পাঠ করে দেখার সুযোগ পেল। তাদের মনে নানা প্রশ্ন জাগলো। তাদের মনে হলো ধর্মীয় বিষয় ছাড়াও অনেক কিছু জানার আছে। এই যাচাই করার মানসিকতা ইহলৌকিক দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি করল। খ্রিস্টান জগতের ধর্মগুরু পোপ (Pope) এবং তার পোপতন্ত্র (Papacy) মধ্যযুগে ছিল বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর সঙ্গে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাটের পর্যন্ত বিরোধ বেধেছিল। কিন্তু পোপতন্ত্র, চার্চ, যাজক সম্প্রদায় ইত্যাদির মধ্যে নানা দুর্নীতি আশ্রয় নিয়েছিল। নবজাগরণের ফলে মানুষের মনের মধ্যে বিচারবোধ জাগ্রত হওয়ায় ইয়োরোপে সৃষ্টি হয় ধর্মসংস্কার আন্দোলন বা রিফর্মেশন। সুতরাং রেনেশাঁসের প্রকৃতির মধ্যে অনুসন্ধিৎসা ও মানবতাবাদ ছিল প্রধান।

মানবতাবাদ ঃ ইয়োরোপে নবজাগরণ আন্দোলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল মানবতাবাদ (Humanism)। এই কথাটির মূল অর্থ হলো পারলৌকিক বা দৈবশক্তি নয় ইহলৌকিক বিষয়ই বড়ো। সভ্যতার মূল বিষয় হিসেবে মানুষকেই দেখা উচিত। মানুষই সৃষ্টি করেছে সভ্যতা, সুতরাং মানুষই আসল। অনেকটা আমাদের দেশে মধ্যযুগে চণ্ডীদাস যেমন বলেছিলেন, 'সবার উপরে মানুষসত্য, তাহার উপরে নাই।' সুতরাং ইয়োরোপীয় রেনেশাঁসের ক্ষেত্রে মানবতাবাদকে বলা যেতে পারে এক আদর্শ যার দ্বারা একজন মানুষের স্বাতন্ত্র্য, তার মর্যাদা ও স্বাধীনতাই সমস্ত চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হলো। পনেরো শতকে ইতালির মানবতাবাদী মিরানদোলা *(Mirandola)* মন্তব্য করেছিলেন, "মানুষের থেকে বিস্ময়ের আর কিছু নেই।"

দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের পিছনে একটা পশ্চাদঘাট ছিল। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, মধ্যযুগে চার্চের ছিল দোর্দন্ড প্রতাপ। চার্চের তথা খ্রিস্টান ধর্মজগতের প্রধান ছিলেন পোপ। তাঁর নিয়ন্ত্রণে ছিল নানা দেশের ধর্মযাজকগণ। মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করত চার্চের মাধ্যমে প্রচারিত হওয়া ঐশ্বরিক বিধান। সুতরাং বিচারবোধ বা যুক্তি নয় মানুষের বুদ্ধিমার্গকে নিয়ন্ত্রণ করত বিশ্বাস। আর এই বিশ্বাস প্রায়শ অন্ধবিশ্বাস (Blind faith) এবং কুসংস্কারে (Superstition) পরিণত হত। মানুষ ইহলোকের চাইতে ঐশ্বরিক বা দৈবশক্তিতে অধিক আস্থা রাখতে ব্যস্ত থাকত। রেনেশাঁসের মানবতাবাদী আদর্শ ছিল এই চিন্তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

মানবতাবাদীদের গবেষণার মূল উদ্দেশ্যই মানুষের পার্থিব মঙ্গল। মুক্তমন ও সরল শরীরের জন্য বিশ্বাস নয়, যুক্তির প্রয়োজন। সভ্যতার ইতিহাস বস্তুত মানুষেরই ইতিহাস। মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির এই বৈশিষ্ট্য ইয়োরোপে যে প্রভাব ফেলল, তা দেখা গেল জীবনের সর্বক্ষেত্রে। ক্রমশঃ মানবসমাজের ভিতটাই বদলে যেতে লাগলো ; মানুষের জ্ঞানস্পৃহা বেড়ে গেল; ফলে শুরু হলো সাহিত্য ও ইতিহাসের চর্চা। এই জানার ইচ্ছার ফলে মানুষ দেশ বিদেশে বেরিয়ে পড়লো। আবার বিজ্ঞানের দিকে ঝুঁকে পড়লো। বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে যেমন মানবিকি চর্চা (Human Studies) বেড়ে গেল, তেমনি এই মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব লক্ষ্য করা গেল শিল্প স্থাপত্য চিত্রকলা ইত্যাদি সৃজনশীলতার মাধ্যমেও। বৃদ্ধিপেল ধ্রুপদী ভাষার বদলে আঞ্চলিক বা দেশীয় ভাষা ; প্রসার ঘটলো ইতালি, ফরাসি, স্পেনীয়, জার্মান, ইংরেজি প্রমুখ সাহিত্যের।

ইতালিতে নবজাগরণের সূচনা ঃ নবজাগরণ বা নতুন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের জন্মস্থান ছিল ইতালি। কেন ইতালি তার একটি কারণ ছিল। বাইজেনটিয়াম বা পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্ট্যানটিনোপল প্রায় একহাজার বছর ধরে প্রাচীন গ্রিক ও রোমান সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি ছিল। অর্থাৎ 476 খ্রিস্টাব্দের পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী রোমের পতনের পর থেকে 1453 খ্রিস্টাব্দে অটোমান তুর্কিদের আক্রমণে পূর্বের রোমান সাম্রাজ্য পর্যুদস্ত হওয়া পর্যন্ত পশ্চিমে ক্লাসিকাল বিদ্যাচর্চা লুপ্ত হয়েছিল আর কনস্ট্যানটিনোপল সেই ঐতিহ্য বহন করে আসছিল। কিন্তু 1453 খ্রিস্টাব্দের পর ইসলামের প্রভাবের ভয়ে ভীত সেই ঐতিহ্যবাহী পণ্ডিতেরা পশ্চিম ইয়োরোপে চলে আসে, তবে সবচেয়ে বেশি আসে ইতালিতে। ফলে রেনেশাঁসের সূচনা ইতালিতে ঘটে।

তবে কনস্ট্যানটিনোপল এর পতনই একমাত্র কারণ নয়, নবজাগরণের সূচনার পিছনে দ্বাদশ শতকের নবজাগরণ থেকে যে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হচ্ছিল তার পরোক্ষ প্রভাবও ছিল। তাছাড়া মধ্যযুগেই নগরায়নের বৃদ্ধি হয়; নানা স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে। যেমন ইতালির বোলোনা (*Bologna*), ফ্রান্সের প্যারিস (Paris), ইংল্যাণ্ডের অক্সফোর্ড

(Oxford) ও কেম্‌ব্রিজ (Cambridge) ইত্যাদি। বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে কেউ কেউ আগামী দিনের আভাস দিয়েছিলেন। যেমন প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের পিটার আবেলার্ড ছাত্রদের শুধু ঈশ্বরের দান বলে সব কিছু মেনে না নিয়ে যুক্তি দিয়ে বিচার করে সত্যের সন্ধান করতে বলেছিলেন।

পঞ্চদশ শতকের ইতালি অবশ্য ঐক্যবদ্ধ এক দেশ নয়, তা ছিল কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত। আর ছিল অনেক শহর-রাজ্য (City-States) যেগুলির সঙ্গে প্রাচ্যের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল প্রাচীন যুগে। এই বাণিজ্যের ফলে তারা সমৃদ্ধও ছিল। এই সবের মধ্যে ফ্লোরেন্স, মিলান, নেপলস্, ভেনিস ইত্যাদি ছিল ; রোম ছিল পোপের নিয়ন্ত্রণে। এই সব শহরগুলিতে শুধু সমৃদ্ধি নয়, বণিকদের প্রাধান্যও ছিল। তারা ছিল কিছু মুক্তপন্থী। এই শহর-রাজ্যগুলিতে চার্চের প্রভাব ছিল কিছুটা কম, শাসকেরা ছিলেন শক্তিমান, তবে সবচেয়ে বড়ো কথা ছিল বণিক শ্রেণীর প্রাধান্য।[1]

যাইহোক, কনস্ট্যানটিনোপল থেকে আগত পণ্ডিতেরা এখানে উর্বরা জমি পেলেন। রেনেশাঁসের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠলো ফ্লোরেন্স, তারপর মিলান। স্বাধীনতার প্রতি সম্মান, শিল্প ও বিদ্যাচর্চার প্রতি উৎসাহ ইত্যাদি ব্যাপারে ধনী বণিক সম্প্রদায় সহায়তা করতেন। ফলে সমাগত বাইরের পণ্ডিত এবং স্থানীয় বণিকদের যৌথ উদ্যোগে ফ্লোরেন্সে নতুন চিন্তা ও সৃজনশীলতার বিকাশের পথ খুলে গেল। মিলানের বণিকরাও রেশম-পশমের বস্ত্র ব্যবসায়ে ধনী ছিলেন। তারাও সৃজনশীলতার সহায়ক হন। এবার আমরা কয়েকজন রেনেশাঁসের কর্মনায়কের সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারি।

দান্তে আলিঘেরি (Dante Alighieri, 1265-1321) তাঁর বিখ্যাত রচনা 'ডিভাইন কমেডি'র জন্য স্মরণীয়। ফ্লোরেন্সের এক প্রাচীন ও অভিজাত বংশের সন্তান দান্তে ল্যাটিন ভাষা শিখলেও তার মাতৃভাষায় (টাসকানের ভাষায়) লিখতে ভালোবাসতেন। এই টাসকান ভাষা থেকেই আধুনিক ইতালিয় ভাষার উৎপত্তি। *ফ্রান্সেস্কো ডি পেত্রার্ক* (Francesco de Petrarch, 1304-1374) ছিলেন মানবতাবাদী আন্দোলনের অন্যতম অগ্রদূত। ফ্লোরেন্স থেকে তাঁর পিতা নির্বাসিত হয়েছিলেন। তিনি তাই আভিঁঅ এবং ফ্রান্স ও জার্মানির বিভিন্নস্থানে শিক্ষালাভ করেছিলেন। তবে দান্তের মতো তিনিও টাসকানিয় ভাষায় কবিতা লিখতেন। সনেট বা চতুর্দ্দশপদী কবিতা রচনায় তিনি অন্যতম পথিকৃৎ। পেত্রার্ক এর রচনার বিষয়বস্তু ছিল মূলত মানুষ। পেত্রার্কের বন্ধু ছিলেন *গিয়োভানি বোকাচিও* (Giovanni Boccacio, 1313-1375)। তার বিশেষ কৃতিত্ব ছিল গদ্য রচনার। তাঁর রচনাতেও ধর্মীয় বিষয়বস্তু নয়, মানুষের ঐহিক সুখ দুঃখেরই কথা ফুটে উঠেছিল। তাঁর বিখ্যাত রচনা 'ডেকামেরন'। ঐ যুগের আরেক স্মরণীয় মানুষ

1. আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্যঃ R. Ehrenberg, *Capital and Finance in the Age of the Renaissance*, London, 1928.

ছিলেন *নিকোলো ম্যাকিয়াভেলি* (Nicolo Machiavelli, 1469-1527), যাকে আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার জনক বলা হয়। তাঁর বিখ্যাত পুস্তকের নাম 'দ্য প্রিন্স'। সাফল্য হলো উদ্দেশ্যের এবং উদ্দেশ্যসাধনের হাতিয়ার সঠিক কিনা তা বোঝার উপায়-এই ছিল তাঁর মত। তাঁর মতে রাজনীতি ধর্মভিত্তিক নয়। রাষ্ট্র স্বাধীন এবং তাই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্র কীভাবে পরিচালনা করা উচিত, তিনি দ্য প্রিন্স বইতে তাই লিখেছেন।

ইয়োরোপের অন্যত্র নবজাগরণের প্রসার ঃ ইতালি থেকে নবজাগরণ আন্দোলন ক্রমশ আলপাস্ পর্বত পেরিয়ে জার্মানি, নেদারল্যাণ্ডস্, স্পেন, পর্তুগাল, ফ্লাণ্ডার্স, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রমুখ বিভিন্ন দেশে প্রসারিত হয়। ইতালির মতন নবজাগরণ আন্দোলনের অন্যতম পীঠস্থান এই সকলদেশ হয়ে ওঠে। চতুর্দশ শতকে ইংরেজ কবি *জিওফ্রি চসার* (Geoffrey Chaucer, 1340-1400) ইংরেজি ভাষার অন্যতম পথিকৃত হিসেবে স্বীকৃত। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের নাম 'দ্য ক্যান্টারবেরি টেলস্'। চসারের আমলে অ্যাংলো-স্যাক্সন ভাষা থেকে ইংরেজিতে রূপান্তর লক্ষ্য করা যায়। চতুর্দশ শতকে ইংল্যাণ্ডের সমাজের এক জীবন ছবি চসারের রচনায় পাওয়া যায়।

তবে ইংল্যাণ্ডের নবজাগরণ বিশেষভাবে প্রসার লাভ করে ষোড়শ শতকে বিশেষত টিওডর বংশীয় রানী প্রথম এলিজাবেথের আমলে। তাই অনেক সময় 'এলিজাবেথান রেনেশাঁস' কথাটি ব্যবহার করা হয়। ইংল্যাণ্ডের নবজাগরণের সময়কালীন অন্যতম প্রধান কবি ছিলেন *এডমাণ্ড স্পেনসার* (Edmund Spencer, 1525-1599), যিনি 'দ্য ফেয়ারি কুইন' রচনা করেছিলেন। তাঁর রচনাতে ষোড়শ শতকের ইংরেজ সমাজের ছবি পাওয়া যায়। *টমাস মোর* (Thomas More, 1478-1535) 'ইউটোপিয়া' নামক গ্রন্থে এক কাল্পনিক সমাজের ছবি এঁকেছিলেন। তিনি ছিলেন ক্যাথলিক ধর্ম সংস্কারের পক্ষে। ইংল্যাণ্ডের অন্যতম বিখ্যাত মানবতাবাদী ছিলেন *ফ্রান্সিস বেকন* (Francis Bacon, 1561-1626), যাঁর প্রবন্ধ এবং আলোচনা আধুনিক বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের আভাস দিয়েছিল। তবে যিনি ছিলেন এলিজাবেথের যুগের তথা সমগ্র ইংরেজি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি, তিনি হলেন স্বনামধন্য *উইলিয়াম শেকস্পীয়ার* (William Shakespeare, 1564-1616)। শেকস্পীয়র ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাবান কবি ও নাট্যকার। ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস, জাতীয় চেতনা, সামাজিক অবস্থা মানবিক আবেগ-অনুভূতি, মনস্তত্ব সবই তাঁর রচনায় প্রতিফলিত। চতুর্দশপদী কবিতাও তিনি রচনা করেন। তাঁর নাটকগুলির মধ্যে 'হ্যামলেট', 'ওথেলো', 'ম্যাকবেথ', 'কিংলিয়ার', 'মার্চেন্ট অফ ভেনিস', 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট' প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

অন্যান্য দেশের মধ্যে স্পেনের *মিগুয়েল দ্য সারভেনটেস* (Miguel de Cervantes, 1547-1616) লিখেছিলেন 'ডন কুইকজোট'। এটি একটি মধ্যযুগীয় যোদ্ধার কাহিনী। এই যোদ্ধা ও তার সঙ্গীর 'শিভালরি' সংক্রান্তধারণা নিয়ে তিনি ব্যঙ্গ করেন। বস্তুত

তাঁর রচনায় মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক ধারণাকেই বিদ্রুপ করা হয়েছে। নেদারল্যাণ্ডস্ এর বিখ্যাত চিন্তাবিদ ও দার্শনিক ছিলেন *ডেসিডেরিয়াস ইরাসমাস* (Desiderius Erasmess, 1469-1536)। তিনি ইয়োরোপের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমন করেছিলেন—ইতালির বোলোনা, ফ্রান্সের প্যারিস, ইংল্যাণ্ডের অক্সফোর্ড ও কেম্‌ব্রিজ ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপনা করেছিলেন। ফলে প্রায় সমগ্র ইয়োরোপেই তাঁর প্রভাব ছিল। সমসাময়িক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন। 'ইন প্রেইজ অফ ফোলি' নামক গ্রন্থে তিনি চার্চের দুর্নীতিকে তীব্রভাবে আক্রমণও করেন। ইরাসমাস তাই ধর্মসংস্কার আন্দোলনেরও প্রেরণাদাতা। ফ্রান্সে *ফ্রাঁসোয়া রাবেলা* (Francois Rabelais, 1490-1553) ছিলেন নবজাগরণের প্রতিনিধি স্বরূপ। তাঁর রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ব্যঙ্গ কৌতুক। তিনি মানবতাবাদের সমর্থক ছিলেন।

বিজ্ঞানে নবজাগরণের প্রভাব ঃ বিশ্বাসের পরিবর্তে যুক্তি ও বিচারবোধ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে রেনেশাঁসের যুগেই বিজ্ঞানচর্চারিও অগ্রগতি ঘটে। বিজ্ঞানচর্চার উপর নবজাগরণের এবং মানবতাবাদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মধ্যযুগে ধারণার ভিত্তি ছিল বিশ্বাস। জীবনযাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করত চার্চ এবং সমস্ত কাজের মূল ছিল কর্তৃত্ব সম্পর্কে ধারণা যা আসত ধর্মশাস্ত্র বা চার্চের অনুমোদিত যাজকশ্রেণীর কাছ থেকে। কিন্তু রেনেশাঁসের যুগে এই কর্তৃত্ব নিয়েই প্রশ্ন ওঠে। কারণ নবজাগরণের অন্যতম প্রেরণা ছিল জানার ইচ্ছা, প্রশ্ন করার ইচ্ছা, প্রমাণ-নির্ভর সত্যতা খোঁজা। তাই শুধু সাহিত্য নয়, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও নবজাগরণের প্রভাব লক্ষ্যণীয়। যেমন যে আবিষ্কার বিদ্যাচর্চা ও সভ্যতাকে অনেক অগ্রবর্তী ক'রে দিয়েছিল তা হলো মুদ্রণযন্ত্রের বা ছাপাখানার আবিষ্কার।

মুদ্রণের আবিষ্কারক ছিলেন এক জার্মানি, যার নাম *যোহান গুটেনবার্গ* (Johan Gutenberg, 1397-1468)। 1447 খ্রিস্টাব্দে 'অ্যাস্ট্রোনামিকাল ক্যালেণ্ডার' তাঁর ছাপাখানার প্রথম প্রকাশন। মুদ্রণ যন্ত্রের কাজ শুরু হওয়ার ফলে অনেক বেশি মানুষ বই ব্যবহার করতে শুরু করেন। স্বাভাবিক ভাবেই এর ফলে জ্ঞানচর্চা বৃদ্ধি পায়। আগে মানুষের হাতে লেখা পুঁথির উপর নির্ভর করতে হত, যা ছিল শ্রমসাধ্য ও ব্যয়সাধ্য। 1456 খ্রিস্টাব্দে 'বাইবেল' ছাপা হওয়ার ঘটনা ছিল বৈপ্লবিক। পঞ্চদশ শতকে ইয়োরোপে পুঁথির সংখ্যা এক লক্ষ, তা ষোড়শ শতকে ছাপা বইতে গিয়ে দাড়ায় সত্তর লক্ষ।

এবারে বিজ্ঞানচর্চার দিকে দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে। ইংল্যাণ্ডের অন্যতম বিজ্ঞানী ছিলেন *রজার বেকন* (Roger Bacon, 1214-1294)। তিনি অবশ্য ছিলেন একাধারে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও গণিতজ্ঞ। তাঁর পদ্ধতি ছিল পরীক্ষামূলক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। এর মূল কথা হলো আমাদের চারপাশে যা ঘটছে তা পর্যবেক্ষণ করা উচিত। পরে

ঘটনার অনুসন্ধান করা প্রয়োজন এবং কারণগুলি প্রমাণসাপেক্ষ কিনা তা দেখা দরকার। মনে রাখা দরকার এই পদ্ধতি অনুসরণ করেই আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম যা মধ্যযুগীয় অন্ধবিশ্বাস বা কুসংস্কারের পরিপন্থি। বরং যুক্তি ও প্রমাণের উপর নির্ভরশীলতা -এই আধুনিকতার পথ সুগম করে। রজার বেকন শুধু চশমা, দূরবীনের কাচ, বারুদ ইত্যাদি আবিষ্কার করেছিলেন এমন নয়, বহু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধও লিখেছেন। *লিওনার্দো দা ভিঞ্চি* (Leonardo da Vinci 1452-1519) শুধু যে বড়ো মাপের একজন শিল্পী ছিলেন তাই নয়, বিজ্ঞান বিষয়েও তার প্রতিভা ছিল। তাঁর নোটবই ও ড্রইং থেকে তিনি যেসব আবিষ্কারের সম্ভাবনা দেখেছিলেন, আমরা সে সব জানতে পারি। তিনি উড়োজাহাজের কথাও কখনো বলেছিলেন।

আলবার্টাস ম্যাগনাস (Albertus Magnus, 1206-1280) প্রাণীদের ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করতেন। *টমাস আকিনা* (Thomas Aquinas, 1225-1274) আশেপাশের পৃথিবীকে পর্যবেক্ষণ ক'রে সত্যে পৌছনো এবং সেই সত্যকে প্রমাণ করার কথা বলেন। রেনেশাঁসের যুগে বৈজ্ঞানিক চর্চার উল্লেখযোগ্য দিক ছিল জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রে। এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাম পোল্যাণ্ডের জ্যোতির্বিজ্ঞানী *নিকোলাস কোপার্নিকাস* (Nicolaus Copernicus, 1473-1543)। তিনি একাধারে ছিলেন চিত্রকর, চিকিৎসক, মুদ্রাসংস্কারক এবং প্রশাসক। মধ্যযুগীয় ধারণা ছিল পৃথিবী মহাবিশ্বের কেন্দ্র। তিনি বলেন পৃথিবী অন্যান্য গ্রহের মতন সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে। নিজের অক্ষের উপর পৃথিবীর ঘূর্ণন এবং সূর্যের কক্ষপথে পৃথিবীর পরিভ্রমণের কথা ছিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে চার্চ-অনুমোদিত তৎকালীন ধারণার বিপরীত। তাই চার্চ মনে করল, এই বৈজ্ঞানিক সত্য বলে দেওয়া ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। 1543 খ্রিস্টাব্দে নিকোলাস কোপার্নিকাসের 'On the Revolution of the Celestial Order' পুস্তক প্রকাশিত হয়।

কোপার্নিকাসের ধারণা আরও জোরদার করেন ইতালিয় বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিও গ্যালিলি (Galileo Galiley 1564-1642)। গ্যালিলিও ধাতব টিউবের দুদিকে কাচের লেন্স লাগিয়ে দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন। বৃহস্পতি গ্রহের উপগ্রহ আবিষ্কার সহ অনেক আবিষ্কার তাকে খ্যাত করে। তবে কোপার্নিকাসের মতন তিনিও বলেছিলেন যে পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে। একদা ব্রুনো এই মত প্রকাশ করার ফলে তা ধর্মদ্রোহ, এই ঘোষণা করে তাকে পুরিয়ে মারা হয়েছিল। গ্যালিলিওকেও তাঁর মতপ্রকাশের জন্য বিচার করা হয় (1633 খ্রিঃ) ইনকুইজেশন বা চার্চের বিচারালয় দ্বারা। জার্মানিতে *যোহান কেপলার* (Johann Kepler 1570-1630) শারীরিক প্রতিবন্ধী হলেও ছিলেন খ্যাতনামা গণিতজ্ঞ। তিনি গ্রহগুলির সূর্য প্রদক্ষিণের ব্যাপারে তত্ত্ব বের করেছিলেন। এর পর ইংরেজ গণিতজ্ঞ ও বিজ্ঞানী স্যার আইজাক নিউটন (Isaac Newton, 1642-1727) মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করায় বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটে।

নবজাগরণের প্রভাব শিল্পে ঃ নবজাগরণ আন্দোলনের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় শিল্পের নানা ক্ষেত্রে—চিত্রকলায়, ভাস্কর্যে, স্থাপত্যে। এই প্রভাব স্বতঃস্ফূর্ত এবং অভূতপূর্ব। মধ্যযুগে ছবির মাধ্যমে প্রকাশ করা হত ধর্মীয় বিষয়বস্তু। কিন্তু নবজাগরণের প্রভাবে শিল্পীরা ধর্মীয় বিষয় নয় মানুষকেই তাদের সৃষ্টির কেন্দ্রে রেখে কাজ শুরু করলেন। এখানেই নতুন শিল্পবোধের পরিচয় পাওয়া গেল। আরেকটি পরিবর্তন দেখা গেল। মধ্যযুগে ধর্মীয় চিত্রের ক্ষেত্রে শিল্পীরা থাকতেন অপরিচিত, উপেক্ষিত ; তাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠাও তেমন ছিল না। কিন্তু রেনেশাঁসের যুগ থেকে শিল্পীদের ব্যক্তিত্ব, চিন্তা, ধ্যান-ধারণা, শৈলী সব প্রধান হয়ে উঠল। তারা স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেন। ধর্মের প্রভাব একদম ছিল না তা নয়, কারণ শিল্পীরা ধর্মীয় বিষয় নিয়েও ছবি আঁকছিলেন বা ধর্মের বিষয়বস্তু নিয়ে কাজ করছিলেন। তবু তাদের কাজ মূলত সেযুগে ধর্ম-নিরপেক্ষ এবং জগতের মানবজীবন-নির্ভর। ফলে ভাস্কর্যে বা চিত্রকলায় দেখি নারী পুরুষের প্রাধান্য। শিল্পের মধ্যে সর্বাধিক অবদান লক্ষ্য করা যায় চিত্রকলায়, রেনেশাঁসের অন্যান্যক্ষেত্রের মতন এ ব্যাপারে ইতালি ছিল পথিকৃৎ। সেখানে শিল্পীরা পুরোনো ঐতিহ্য ভেঙে নতুন শিল্পরীতির প্রবর্তন করলেন ; সৃষ্টি করলেন অসাধারণ অনেক কাজ।

রেনেশাঁসের যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা অবশ্যই *লিওনার্দো দা ভিঞ্চি*, যাঁর সৃজনশীল ক্ষমতা বহু মাত্রিকতায় ভাস্বর হয়ে উঠেছিল। তিনি ছিলেন একাধারে দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, ভাস্কর, ইঞ্জিনিয়ার, স্থপতি এবং চিত্রকর। তবে চিত্রাঙ্কণে তাঁর খ্যাতি সবচেয়ে বেশি। বহুমুখী প্রতিভার জন্য তাঁকে 'The Universal Man' বলা হত। তাঁর জন্ম ফ্লোরেন্স শহরে, যদিও মিলান ছিল তাঁর প্রধান কর্মকেন্দ্র। তবে এই ইতালিয় শিল্পী রোম, ভেনিস এবং ফ্লোরেন্সেও কাজ করেছেন। শেষ জীবনে ফ্রান্সে চলে যান। তাঁর অজস্র আঁকার মধ্যে বিশ্ববিখ্যাত 'মোনালিসা' (বর্তমানে ফ্রান্সের লুভর (পারী) মিউজিয়মে রক্ষিত) এবং 'দ্য লাস্ট সাপার' উল্লেখযোগ্য। লিওনার্দো দা ভিঞ্চি (1452-1519) বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ ছিলেন।

গিয়োতো দি বন্‌দোন (Giotto di Bondone, 1267-1337) ছিলেন প্রাক্‌-রেনেশাঁস যুগের অন্যতম পথিকৃত; কেননা দেওয়াল চিত্রের মধ্যদিয়ে তিনি ধর্মীয় বিষয়বস্তুর বদলে মানুষের ছবি এঁকেছিলেন। পঞ্চদশ শতকের আর এক বিখ্যাত শিল্পী *স্যানড্রো বত্তিচেলি* (1445-1510)। দা ভিঞ্চির মতন তাঁর বাড়ি ফ্লোরেন্স শহরে ; দাভিঞ্চির মতন ফ্লোরেন্সের মেদিচি পরিবার তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা করেন। বত্তিচেলির ছবির নমনীয়তা ও সজীবতা বিশেষ খ্যাতি পায়। তাঁর অন্যতম স্মরণীয় কীর্তি 'দ্য বার্থ অফ ভেনাস' ছবিটি। রোমের সিস্টিন চ্যাপেল এর দেওয়াল চিত্র তাঁর আঁকা।

পনেরো শতকের শেষ দিক থেকে ষোড়শ শতকের মধ্যে যে সব শিল্পী রেনেশাঁসের বিশ্ববিখ্যাত প্রতিনিধি তাদের মধ্যে প্রথমেই মনে পড়ে *বুয়োনারোতি মাইকেলেঞ্জেলো* (Buonarotti Michaelangelo, 1475-1564)। ইনিও ফ্লোরেন্স এর শিল্পী। তবে ইনি শুধু চিত্রকর নন, বিখ্যাত ভাস্করও। ইনিও লোরেঞ্জ দ্য মেদিচির পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। কিন্তু তাঁর এই পৃষ্ঠপোষকের মৃত্যু তাঁর মনে অস্থিরতা এনে দেয়। সমসাময়িক অনেককে, বিশেষ করে লিওনার্দো দা ভিঞ্চির প্রতি তাঁর ঈর্ষা ছিল। রোমে তিনি কিউপিড মূর্তি নির্মাণ করেন (এটি বর্তমানে লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া অ্যাণ্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়ামে রক্ষিত), পরে ফ্লোরেন্সে নির্মান করেন ডেভিড এর মূর্তি যা খুবই খ্যাত। তাঁর অপর বিখ্যাত ভাস্কর্য পিয়েতা। তাঁর চিত্রাঙ্কন কর্মগুলির মধ্যে স্মরণীয় 'দ্য লাস্ট জাজমেন্ট' এবং 'দ্য ফল অফ ম্যান'। ভ্যাটিক্যান (রোম) শহরে পোপের নির্দেশে সিস্টিন চ্যাপেলে সিলিঙ এর দেওয়াল চিত্র এঁকেছিলেন। অসাধারণ সেই দেওয়াল চিত্র আজ বিস্ময়ের উদ্রেক করে যদিও সেকাজ করতে করতে প্রায় সারে চার বছর লেগেছিল এবং তাঁর শরীর বেঁকে গিয়েছিল।

ঐ সময়ের অপর শিল্পী *স্যানজিও রাফায়েলও* (Sangio Raffaello অথবা Raphael, 1483-1520)। ইনি ফ্রেসকো বা দেওয়াল চিত্র আঁকার অপূর্ব দক্ষতা দেখিয়েছেন। নমনীয়তা, রঙের ব্যবহার, অসাধারণ দক্ষতায় ভ্যাটিকানে পোপের প্রাসাদে তাঁর দেওয়াল চিত্র স্মরণীয়। তাঁর আঁকা কুমারী মাতা মেরীর ছবি 'ম্যাডোনা' স্নিগ্ধ, সৌন্দর্য ও জগদ্বিখ্যাত। *টিজইয়ানো ভেচেলি টিশান* (Tigiauno Vecelli Titian, 1480-1516) ছিলেন ভেনিসের চিত্রশিল্পী। তিনি পোর্ট্রেট বা ব্যক্তির প্রবৃত্তি আঁকায় দক্ষ ছিলেন। তাছাড়া ল্যাণ্ডস্কেপ বা প্রাকৃতিক দৃশ্য রচনায়ও তিনি অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন।

মনে রাখা দরকার যে চিত্রশিল্প ভাস্কর্য ছাড়াও রেনেশাঁসের প্রভাব পড়েছিল স্থাপত্য শিল্পেও। ঐ নবজাগরণ পর্বের স্থাপত্যের সবচেয়ে বিখ্যাত নিদর্শন হলো রোমের সেন্ট পিটারের গির্জা। যার কাজ শুরু হয়েছিল 1450 খ্রিস্টাব্দে এবং শেষপর্যন্ত শেষহয়েছিল 1628 খ্রিস্টাব্দে। বহু স্থাপতি এর নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, যেমন মাইকেলেঞ্জেলো, রাফায়েল, ব্রামন্ত। *ব্রামন্ত লাৎসারি* (Bramante Lazzari, 1444-1514) পৃথিবীর বৃহত্তম এই সেন্টপিটার গির্জার মূল আকৃতি দিয়েছিলেন। গম্বুজটির কৃতিত্ব মাইকেলেঞ্জেলোর। শুধু গির্জা নয়, রেনেশাঁসের প্রভাব পড়ে অট্টালিকা নির্মাণেও। রেনেশাঁস শিল্পের অন্যতম প্রভাব হলো মধ্যযুগীয় গথিক স্টাইল থেকে মুক্তি। জার্মানির শিল্পী *আলব্রেখট ডুয়ার* (Albrech Dürer, 1471-1528) রেনেশাঁসের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিলেন। তিনি চিত্রাঙ্কন এবং কাষ্ঠখোদাইএ পারদর্শী ছিলেন। ইতালিয় আরেক খ্যাতনামা শিল্পী ছিলেন জ্যাকোপো রোবুস্তি টিনটোরেটো (Jacopo Robusti Tintoretto, 1518-1594)।

৩। রিফর্মেশন বা ধর্মসংস্কার আন্দোলন

ধর্মসংস্কার আন্দোলন (Reformation) **কাকে বলে** : ইয়োরোপের ইতিহাসে রিফর্মেশন বা ধর্মসংস্কার আন্দোলন বলতে বোঝায় আধুনিক যুগের সূচনা পর্বে মধ্যযুগের অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠান খ্রিস্টান চার্চের অন্যায়, দুর্নীতি, আচরণ এবং আদর্শভ্রষ্টতার বিরুদ্ধে দীর্ঘকালীন বিবাদ, প্রতিবাদ এবং শেষ পর্যন্ত খ্রিস্টান ধর্মজগতে বিভাজন। ফলে খ্রিস্টানগণ রোমান ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্টান্ট নামে দ্বিধাবিভক্ত হয়। প্রোটেস্টান্টদের মধ্যে নানাভাগ ছিল। রিফর্মেশন আন্দোলন পরিণতিলাভ করে ষোড়শ শতকে। এই ধর্মসংস্কার আন্দোলনের প্রধান নায়ক ছিলেন মার্টিন লুথার। তবে উলরিখ জুইংলি, জন ক্যালভিন প্রমুখ ব্যক্তিত্বও এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ইয়োরোপীয় রাজনৈতিক ইতিহাস এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। সুতরাং পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে চার্চের আদর্শভ্রষ্ট অবস্থা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনের নামই ধর্মসংস্কার আন্দোলন বা রিফর্মেশন।[1]

ধর্মসংস্কার আন্দোলনের পটভূমিকা : নবজাগরণের প্রভাব ক্রমশ ইতালি থেকে সারা ইয়োরোপের নানা দেশে ছড়িয়ে পড়লো। রেনেশাঁস মানসিক বন্ধনের মুক্তি ঘটিয়েছিল, মানুষকেই চিন্তাচর্চার কেন্দ্রে এনেছিল। তাদের দৃষ্টি ধর্মীয় ব্যাপার ছাড়াও পড়েছিল ইহলৌকিক দিকে। এই চিন্তার মুক্তি ইয়োরোপে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কেননা প্রচলিত ধারণা ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি মানুষের আনুগত্য কিছুটা কমে গিয়েছিল। আবার অন্যভাবে বলা যায় বিশ্বাসের বদলে বিচারবোধ ও যুক্তি প্রাধান্য পেতে থাকে। দেখা যায় যে শুধু পার্থিব বিষয় নয়, ধর্ম এবং ধর্মপ্রতিষ্ঠানের নানা ধ্যানধারণা এবং আচরণের অযৌক্তিক অবরোধের কারণে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচারবোধের সাহায্যে প্রয়োজন হলো ধর্ম সংস্কারের। এই অনুসন্ধিৎসা থেকেই ধর্মসংস্কারের বা রিফর্মেশনের উদ্ভব।

মধ্যযুগের ইয়োরোপে সাম্রাজ্যের যেমন ছিল প্রাধান্য তেমনি ছিল চার্চের। চার্চের ছিল অপরিসীম প্রাধান্য, দোর্দণ্ডপ্রতাপ। তাদের মধ্যেও যে সম্পর্ক অর্থাৎ অধ্যাপক টাউট যাকে বলেছেন Empire and the Papacy, তা ইয়োরোপের ইতিহাসের ছাত্রছাত্রীদের কাছে পঠনীয় বিষয়। তবে মানুষের জীবনযাত্রার উপর চার্চের নিয়ন্ত্রণ ছিল অত্যন্ত ব্যাপক, পোপ ছিলেন খ্রিস্টান ধর্মজগতের গুরু। পোপের অধীনস্থ চার্চের যাজক সম্প্রদায়ই ছিলেন বাইবেল পড়বার অধিকারী। তাঁরা যেভাবে বাইবেল ব্যাখ্যা করতেন সাধারণ মানুষ তা মেনে চলতে বাধ্য ছিলেন।

---

1. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্র. G. R. Elton, *Reformation of Europe* (1517-1559), Fontana History of Europe, Lond, 1963 ; *New Cambridge Modern History*, Vol II, Cambridge, 1958; Leonard Couri, *The Reformation*, Lond. 1968.

চার্চ কতখানি ক্ষমতাবান ছিল তা বোঝা যায় এই তথ্য থেকে যে চার্চ কর আদায় করত। চার্চের প্রচুর জমি ছিল, সেখানে কৃষকরা চাষ করতেন এবং কৃষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে চার্চের সম্পর্কও ছিল সাধারণ ভূস্বামীদের মতন। এছাড়া চার্চের ছিল প্রভূত সম্পত্তি। আবার চার্চের কর্তৃত্ব অমান্য করলে কিংবা ধর্মবিরোধী মতামত প্রকাশ করলে চার্চের নিজস্ব বিচারালয়ে বিচার হত। এখানে একটা কথা বলা প্রাসঙ্গিক হবে যে ক্যাথলিক চার্চের প্রধান বা পোপকে ধরে নেওয়া হত ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে। যেহেতু তিনি সমস্ত খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের একচ্ছত্র প্রভু তাই প্রত্যেক দেশের চার্চের উপরেই তার নিয়ন্ত্রণ ছিল। ধর্মীয় জীবনে তিনি প্রধান, কিন্তু রাজনৈতিক জীবনে তাঁর ভূমিকা কি? সেখানে রাজা বা সম্রাটের ক্ষমতা অপরিসীম। কিন্তু সম্রাটের ক্ষমতা তো নিজের দেশের বা সাম্রাজ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, পোপের ক্ষমতা সব দেশে। সুতরাং সাম্রাজ্য না পোপতন্ত্র কার ক্ষমতা বেশি এ নিয়ে দ্বন্দ্ব বেঁধেছিল মধ্যযুগে। ক্রমশ দুটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। একদিকে সামন্ততন্ত্রের পতনের ফলে ক্রমেই রাজন্যবর্গের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, শক্তিশালী রাজতন্ত্রের সৃষ্টি হতে থাকে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বা প্রশাসনে সম্রাটগণ নিজেদের ঈশ্বরের প্রতিনিধি মনে করতে থাকেন। তাদের মতে দেশ শাসনে তাদের দেবদত্ত অধিকার (Divine Right) আছে। অপরপক্ষে চার্চের হাতে প্রভূত ক্ষমতা থাকলেও চার্চ সংগঠন (Church Organisation) এবং যাজক শ্রেণীর (Clergy) মধ্যে ঘুণ ধরেছিল। অনৈতিকতা ও দুর্নীতি প্রবেশ করেছিল। এই দুর্নীতির প্রতিবাদেই ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সূচনা।

চার্চের আদালতগুলিও নানাভাবে সাধারণ মানুষদের উপর নির্যাতন করত। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। ইংল্যাণ্ডে একবার রিচার্ড হান নামে এক ব্যবসায়ীর শিশুপুত্রের মৃত্যু হয়। গির্জার যাজক শিশুটির ব্যাপটিজমের পোষাক দাবি করলে রিচার্ড হান এই দাবির বিরুদ্ধে চার্চের বিচারালয়ে অভিযোগ করেন। কিন্তু বিচারালয় অভিযুক্ত যাজককে কিছু না বলে হানকেই ধর্মদ্রোহী হিসেবে সাব্যস্ত করে জেলে পাঠায়। সেখানে তিনি আত্মহত্যা করেন বলা হলেও লোকের সন্দেহ তাঁকে মেরে ফেলা হয়েছিল। এই ঘটনায় সারা ইংল্যাণ্ডে হৈ চৈ হয় কিন্তু যাজক সম্প্রদায়ের কিছুই হয়নি। জিওফ্রি চসারের 'ক্যান্টারবেরিটেলস'এ যাজকশ্রেণীর পার্থিব জীবনযাপনের চিত্র পাওয়া যায়।

যাজকশ্রেণী, যাদের প্রধান দায়িত্বই ছিল মানুষের নৈতিক মানের উন্নতি ঘটানো, ধর্মীয় ব্যাখ্যা ও উপদেশ দেওয়া, সৎ পথে থাকার কথা বলা, তাঁরা নিজেরাই ভোগবাদী জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। ফলে অর্থের প্রতি এবং ঐহিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগের প্রতি লোভ বৃদ্ধি পায়। লোকেও ধর্ম ভালো বুঝতে পারত না, বাইবেল পড়তে পারত না, এমনকি বাইবেলে ইংরেজি অনুবাদ হলেও গোড়ায় তা পাঠ করা নিষিদ্ধ ছিল। ইয়োরোপের নানা দেশেই এই একই অবস্থা বিরাজ করছিল। পোপেরাও সর্বদা অন্যায়ের

উর্ধ্বে ছিলেন না। যাজক শ্রেণীর মধ্যে উর্ধ্ব বর্গীয় যাজকেরা (Upper Clergy) ছিলেন ভোগবাদী অভিজাত শ্রেণীর (Nobility) মতন জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত ; অবশ্য নিম্ন যাজকেরা (Lower Clergy) ছিলেন দরিদ্র। চার্চের মধ্যে যাঁরা নিষ্ঠাবান তাঁরা দুর্নীতির প্রতিবাদ করলেও ফলপ্রসূ হয়নি।

চার্চ কর আদায় তো করতই শেষের দিকে তারা নানা পন্থাও অবলম্বন করত। 'পোপ' পদ নিয়ে বিবাদও হয়েছে চতুর্দ্দশ পঞ্চদশ শতকে। অবস্থা মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল 'ইনডালজেন্স' নামক এক মুক্তিপত্র বিক্রি করা শুরু হওয়াতে। যেহেতু খ্রিস্ট ধর্মে পাপ করলে অনুতাপ ও প্রায়শ্চিত্তের কথা আছে; তাই কোনও ব্যক্তি যে কোন অন্যায় বা পাপ করলেও এই মুক্তিপত্র পয়সা দিয়ে কিনলেই তার মুক্তি হবে, কষ্টকর শাস্তি বা প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োগ নেই। বস্তুত এ ছিল অর্থ আদায়ের ফন্দি। এই অনৈতিকতার বিরুদ্ধে রিফর্মেশন ছিল এক প্রতিবাদী আন্দোলন। মনে রাখতে হবে যে নানা আঞ্চলিক ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ এবং ক্রমে তা ছাপা হওয়াতে মানুষ দেখলেন যে ধর্মের শাস্ত্র-কথিত রূপ এবং চার্চের সমসাময়িক ভোগবাদী জীবনের মধ্যে অমিল, ফলে তারাও ধর্মসংস্কারে প্রভাবিত হলেন।

ধর্মসংস্কারের পূর্বসূরী ঃ ধর্মসংস্কার আন্দোলনের মধ্যে যে প্রতিবাদী রূপ দেখা যায় তার পূর্বসূরী ছিলেন অনেক ধার্মিক ও পণ্ডিত ব্যক্তি। তারা প্রচলিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলেন, চার্চের সংস্কারের কথা বলেন। ধর্মসংস্কারের পূর্বসূরীর মধ্যে প্রথম দুজন ছিলেন ইংল্যাণ্ডের জন ওয়াইক্লিফ এবং বোহেমিয়ার জন হাস। *জন ওয়াইক্লিফ* (John Wycliffe, 1320-1384) ছিলেন দার্শনিক ধর্মতত্ত্ববিদ এবং সংস্কারক। তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতেন। চার্চের অর্থের ও ক্ষমতা লোভের নিন্দা করেন। যাজকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন। তাঁর মতে চার্চের কাজ আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন, ব্যক্তিগত ধনবৃদ্ধি নয়। ঈশ্বরের সঙ্গে সাধারণ মানুষের মধ্যস্থতা করার জন্য যাজক শ্রেণীরও দরকার নেই। তিনি এ্যানেট (Annate) বা ফার্স্ট ফ্রুট (First Fruit) ইত্যাদি নামের কর পোপকে পাঠানোরও বিরোধী ছিলেন। তিনি ল্যাটিন ভাষায় অনেক পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তবে তাঁর সবচাইতে উল্লেখযোগ্য কাজ ছিল ইংরেজি ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ। এতে নিউ টেস্টামেন্টের সব এবং ওল্ড টেস্টামেন্টের কিছুটা অংশ ছিল। তিনি মনে করতেন সাধারণ মানুষ নিজেরাই বাইবেল পাঠ করে বাইবেলের নির্দেশানুসারে ধর্মাচরণ করতে পারবে। একদল 'দরিদ্র যাজক' তাঁর অনুগামী ছিলেন। তাঁর এই দল ইংল্যাণ্ডের নানা স্থানে গিয়ে উচ্চকণ্ঠে বাইবেল পাঠ করে শোনাতেন। স্বাভাবিকভাবেই চার্চ তার উপর বিরক্ত ছিল ; তাকে ধর্মবিরোধী আখ্যা দেওয়া হয়। এমনকি, তাঁর মৃত্যুর পর ক্রুদ্ধ চার্চ তাঁর কবর খুঁড়ে অস্থি বের করে পুড়িয়ে নদীতে ফেলে দেন।

যদিও মারা যাওয়ার পর ওয়াইক্লিফের অস্থি পোড়ানো হলো, কিন্তু তাঁর কর্মের দ্বারা প্রভাবিত *জন হাস* (John Huss, *জার্মান বানানে* (Jan Hus, 1369-1415) নামক অপর সংস্কারপন্থীকে জীবন্ত পুড়িয়া মারা হয়েছিল ধর্মদ্রোহিতার অপবাদে। হাস ছিলেন বোহেমিয়ার লোক (বোহেমিয়া তখন স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল; পরে আধুনিক চেকোশ্লোভাকিয়ার অন্তর্গত)। তিনি ছিলেন প্রাহা (প্রাগ) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ওয়াইক্লিফের সময় গ্রন্থ পুড়িয়ে ফেলার যে নির্দেশ দিয়েছিলেন পোপ, হাস তার নিন্দা করেছিলেন। আর চার্চের দুর্নীতির বিরুদ্ধেও তিনি ছিলেন সরব। বোহেমিয়ার জনগণ তাকে সমর্থন করলেও তাকে বহিষ্কার করা হয় (1410)। 1414 খ্রিস্টাব্দে কনস্টান্সের এক ধর্মসভায় সংস্কার নিয়ে আলোচনা হয়; হাস সেখানে পৌঁছলে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ধর্মবিদ্রোহী (Heretic) আখ্যা দিয়ে তাকে পুড়িয়ে মারা হয়। তাঁর বোহেমিয়ার অনুগামীগণ কুড়ি বছর গৃহযুদ্ধ চালিয়ে গেলেও প্রতিবাদের ও সংস্কারের কণ্ঠরোধ করা হয়।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য কণ্ঠরোধ করা গেল না। প্রতিবাদী আন্দোলনের নেতা মার্টিন লুথারের আবির্ভাব সূচনা করল প্রতিবাদী (Protestant) আন্দোলনের। রিফর্মেশন বা ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের সূচনা হলো— যখন উইটেনবার্গের স্যাক্সন বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক মার্টিন লুথার 1517 খ্রিস্টাব্দের 31 অক্টোবর উইটেনবার্গের ক্যাস্‌ল চার্চের দরজায় তাঁর বিখ্যাত 95টি ধারা সম্বলিত প্রতিবাদ (Ninetyfive Theses) টাঙিয়ে দিলেন।

মার্টিন লুথার এবং ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সূচনা ঃ *মার্টিন লুথার* (Martin Luther, 1483-1546) ছিলেন স্যাক্সনির (জার্মানির এক রাজ্য) এক সম্পন্ন খনির মালিকের পুত্র। শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি কিছুদিন যাজকের কাজ করে উইটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন। চার্চের দুর্নীতি ও অনাচার তাঁর মনে পীড়া দিয়েছিল। বিশেষত পাপ কাজ করে প্রায়শ্চিত্তের বদলে 'ইনডালজেন্স' বিক্রি তাকে ব্যথিত করে এবং এই কাজ অত্যন্ত অন্যায় বলে তিনি মনে করেন। এর জন্য প্রচলিত প্রথা অনুসারে বিতর্কের জন্য তাঁর মতামত 1517 খ্রিস্টাব্দে গির্জার দেওয়ালে টাঙিয়ে দেন। তখন পোপ ছিলেন দশম লিও। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক এলটন লিখেছেন যে তাঁর নতুন ধর্মমত প্রতিষ্ঠা বা পোপের রোমান ক্যাথলিক চার্চ থেকে আলাদা হয়ে স্বতন্ত্র চার্চ গড়ার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। এই ইনডালজেন্স বিক্রির প্রতিবাদ থেকেই ঘটনাক্রমে প্রতিবাদী আন্দোলন অন্যদিকে মোড় নেয়।

ক্রমে লুথার পোপের ক্ষমতাকেই চ্যালেঞ্জ জানান। চার্চের অনাচারের বিরুদ্ধে অনেক পুস্তিকা প্রকাশ করেন। তাঁর মতে বিশ্বাসই হলো মুক্তির মূল কথা, ভালো কাজের ফর্দ নয়। পোপ লুথারকে তাঁর মতামত প্রত্যাহার করতে বললেন, কিন্তু লুথার পোপের নির্দেশটি পুড়িয়ে দেন (1520 খ্রিঃ)। লুথারকে ধর্মদ্রোহী ঘোষণা করা হয়। কিন্তু স্যাক্সনির

রাজা তাঁর পক্ষে ছিলেন। ফলে চার্চ থেকে বিতাড়িত (ex-communicated) হয়েও তাঁর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়নি। বরং লুথার ক্যাথলিক চার্চ থেকে স্বতন্ত্র প্রোটেস্টান্ট চার্চ গড়ে তোলেন, যেখানে ক্যাথলিক চার্চের বহু নীতি পরিত্যক্ত হয়। তাঁর কাছে মাতৃভাষায় ধর্ম-উপাসনা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। যাজকগণ ঈশ্বরের প্রতিনিধি এবং উপাস্য ও উপাসকের মধ্যে মধ্যস্থ— এই ধারণা পরিত্যাগ করেন তিনি। জোর দেওয়া হয় বাইবেল পাঠ এবং ধর্মের চেয়ে বিশ্বাসের উপর। রাষ্ট্রের উপর চার্চের কর্তৃত্ব তিনি মানতেন না, যার জন্য জার্মানির অন্য অনেক শাসক , এমনকি ডেনমার্ক ও সুইডেনের রাজারাও তার আদলে প্রোটেস্টান্ট (আজকাল অনেক সময় বলা হয় লুথেরান) চার্চ গড়ে তোলেন। এভাবে খ্রিস্টান ধর্মজগতে বিভাজন ঘটে। গড়ে তোলা হয় প্রোটেস্টান্ট গির্জার সংগঠন।

অন্যত্র ধর্মসংস্কার আন্দোলন ঃ রিফর্মেশনের ঢেউ আছরে পড়ে ইয়োরোপের অন্য অনেক দেশেও। জার্মানি, সুইডেন, ডেনমার্ক, নরওয়ে প্রমুখ অঞ্চলে মার্টিন লুথারের প্রভাব বেশি ছিল। সুইটজারল্যাণ্ডে প্রোটেস্টান্ট আন্দোলনের নায়ক ছিলেন *উলরিখ জুইংলি* (Ulrich Zuringli,, 1484-1531)। তিনিও রোমান ক্যাথলিকচার্চ পরিত্যাগ করে সংস্কারের পক্ষে প্রচার করেন। তাঁর প্রভাব সুইস দেশে ছড়িয়ে পড়ে ; পরে অবশ্য বিরোধীদের সঙ্গে এক খণ্ডযুদ্ধে তিনি নিহত হন।

ধর্মসংস্কার আন্দোলনের অপর বিখ্যাত নেতা ছিলেন *জন ক্যালভিন* (John Calvin, 1509-64)। যদিও ফ্রান্সে জন্ম গ্রহণ করেন, লেখাপড়া শেখেন তবু তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল সুইটজারল্যাণ্ড। লুথার কিংবা জুইংলি থেকে তার পদ্ধতি ছিল ভিন্ন। যদিও তাঁরও বক্তব্যের মূল কথা ছিল বিশ্বাস। তাঁর মতাদর্শই উত্তরকালে নানাদেশে প্রোটেস্টান্টদের বেশি প্রভাবিত করে।

স্কটল্যাণ্ডে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন *জন নক্স* (John Knox, 1505-1572)। তিনি রোমান ক্যাথলিক যাজক ছিলেন। কিন্তু তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে স্কটিশ চার্চ (প্রেসবিটারিয়ান বা প্রোটেস্টান্ট) গড়ে তোলেন।

ইংল্যাণ্ডে অবশ্য যে প্রোটেস্টান্ট ধর্ম (অ্যাংলিকান) চার্চ অফ ইংল্যাণ্ডের নিয়ন্ত্রণে গড়ে ওঠে তা প্রোটেস্টান্ট। তবে এখানে পোপের প্রাধান্য অবসান ঘটান টিওডর বংশীয় রাজা অষ্টম হেনরি ব্যক্তিগত কারণে। রানী ক্যাথারিনের সঙ্গে তাঁর বিবাহ বিচ্ছেদ পোপ অনুমোদন করেননি; এই বিবাহবিচ্ছেদ না হলে ইংল্যাণ্ডের আইন মোতাবেক রাজা অষ্টম হেনরি অ্যান বলিন নামের অন্য মহিলাকে বিবাহ করতে পারতেন না । রাজা পার্লামেন্টের সাহায্যে আইন করে পোপের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ ঘটান। চার্চ হয় রাষ্ট্রের অধীন। তিনি ইংল্যাণ্ডের ধর্মীয় মঠগুলি (Monasteries) ভেঙে দিয়ে তার প্রভূত সম্পত্তি গ্রহণ করেন। তবু তাঁর আমলে প্রোটেস্টান্ট ধর্ম ইংল্যাণ্ডের ধর্ম হয়ে যায়নি, বরং তা ছিল পোপের প্রাধান্য বিহীন রোমান ক্যাথলিক ধর্ম। অষ্টম হেনরির মৃত্যুর পর তাঁর বালক পুত্র ষষ্ঠ

এডওয়ার্ডের আমলে প্রোটেস্টান্ট ধর্ম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হলেও, অষ্টম হেনরির কন্যা রানী মেরী আবার ক্যাথলিক ধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। শেষপর্যন্ত অষ্টম হেনরির অপর তার এক কন্যা এলিজাবেথের আমলে ইংল্যাণ্ডে প্রোটেস্টান্ট ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে বলা দরকার (i) ইংল্যাণ্ডে প্রোটেস্টান্টদের মধ্যে সবচেয়ে উগ্রদের বলা হত 'পিউরিটান' (Puritan) এবং (ii) ষষ্ঠ এডওয়ার্ড, মেরী এবং এলিজাবেথ তিনজনের একই পিতা হলেও তাঁদের মা ছিলেন ভিন্ন ভিন্ন।

ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ফলাফল: রিফর্মেশন বা ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ফলে ষোড়শ শতক থেকে খ্রিস্টান ধর্মমত ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্টান্ট নামে দু'ভাগে বিভক্ত হয়। রোমান ক্যাথলিকদের প্রধান পোপ (যিনি ভ্যাটিকান সিটিতে বর্তমানে অধিষ্ঠিত)। জেসুইটগণ ক্যাথলিকদেরই এক শাখা। অপর দিকে প্রোটেস্টান্টদের মধ্যে লুথেরান, পিউরিটান, অ্যাংলিকান, প্রেসবিটারিয়ান, হুগেনটস্ ইত্যাদি অনেক শাখা ছিল।

ক্যাথলিক চার্চ দু'ভাগ হবার ফলে অনেক শাসক ও সাধারণ মানুষ এই প্রতিবাদী মত সমর্থন করেছিলেন। রাজন্যবর্গ সমর্থন করেছিলেন পোপের কর্তৃত্ব থেকে মুক্তিপেতে, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের মতন ধর্মীয় ক্ষেত্রেও নিজেদের দেশে প্রধান হতে, চার্চের সম্পত্তির অংশলাভ করতে। সাধারণ মানুষ চেয়েছিলেন চার্চের অনাচার থেকে মুক্তি। প্রোটেস্টান্টদের অনেকেই, যেমন ইংল্যাণ্ডের পিউরিটানগণ, রাজনীতিতে বিশেষ প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন।

প্রোটেস্টান্ট আন্দোলনের ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে জাতীয় চেতনারও প্রসার হয়। মধ্যযুগীয় পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যবাদী ধারণার থেকে আলাদা একদেশ বিষয়ক ধারণা তৈরি হয়। এক ভাষাভাষী, এক ঐতিহ্যের, এক সংস্কৃতির মানুষ, এক রাজনৈতিক সীমানার মধ্যে থাকবে এক চার্চের অধীনে। রোমান ক্যাথলিকদের সার্বজনীন কর্তৃত্বের ধারণা থেকেও এই চেতনা স্বতন্ত্র। প্রোটেস্টান্ট চার্চে তাই কোনও পোপ বা পৃথিবীময় কর্তা নেই। বস্তুত প্রোটেস্টান্ট ধর্মের নীতিও ছিল নানা দেশে ভিন্ন ভিন্ন। যাই হোক, ক্যাথলিক চার্চ ভাগ হবার পর জার্মানিতে এক কৃষক বিদ্রোহ ঘটে। সেখানে কিন্তু লুথার বিদ্রোহ দমনে সাহায্য করেন। আবার প্রোটেস্টান্টদের একটি চরমপন্থী গোষ্ঠী যাদের 'আনাব্যাপটিস্ট' (Anabaptist) নামে অভিহিত করা হয় তারা ছিলেন বিদ্রোহীদের পক্ষে। এই বিদ্রোহ কঠোর ভাবে দমন করা হয়েছিল।

তবে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ ফলাফল হলো এই যে, এর ফলে ক্যাথলিক ধর্মের মধ্যেও সংস্কার প্রচেষ্টা শুরু হয়। এই প্রচেষ্টাকে ইতিহাসে **প্রতি-ধর্মসংস্কার** (Counter Reformation) বলা হয়।

ক্যাথলিক চার্চের সংস্কার ও প্রতি-ধর্মসংস্কার: ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ফলে রোমান ক্যাথলিকচার্চ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেলেও প্রতিবাদী আন্দোলনের প্রভাব ক্যাথলিক

চার্চের উপরেও লক্ষ্য করা যায়। পোপের প্রতি অনুগত থেকেও অনেক যাজক এবং এমনকি অনেক পোপ পর্যন্ত মনে করেছিলেন শুধু প্রোটেস্টান্টদের দমন করলেই হবে না, ক্যাথলিক ধর্মেও সংস্কার দরকার। এই প্রচেষ্টার নামই প্রতিধর্ম সংস্কার বা ক্যাথলিক ধর্মসংস্কার। এর উদ্দেশ্য ছিল যাজকদের মানসিক ও নৈতিক উন্নতি ঘটানো এবং তাদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করা। সেই সঙ্গে চার্চের ত্রুটি ও দুর্নীতি দূর করা। এই কাজে বিশেষ উদ্যোগ নেন পোপ তৃতীয় পল (1468-1549), যিনি 1534 খ্রিস্টাব্দে পোপ হন। এই সংস্কার নীতি অব্যাহত রেখেছিলেন চতুর্থ পলও।

এই সংস্কার প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মদ্রোহীদের বিচারের ব্যবস্থা এবং দমনমূলক ব্যবস্থাও অব্যাহত থাকে। ধর্মদ্রোহীদের শাস্তি দিয়ে বিদ্রোহ বন্ধ করাই ছিল উদ্দেশ্য। স্পেন, ফ্রান্স, ইতালি ইত্যাদি ছিল ক্যাথলিক দেশ। রোমান ক্যাথলিক চার্চ নিজস্ব বিচারালয়ে ধর্মদ্রোহীদের বিচারসভা (Inquisition) করত। যা অত্যাচার বা বিচারের নামে প্রহসন বলা চলে। এখানে বলপূর্বক স্বীকারোক্তি আদায় করে বহু লোককে পুড়িয়ে মারা হয়; বিশেষত স্পেনে এবং ইতালিতে;[1] ফ্রান্সে হুগেনটনদের উপরও কম অত্যাচার হয়নি। ইনকুইজিশন বা ধর্মীয় বিচারালয়ের অত্যাচার ইয়োরোপের এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। ক্যাথলিক চার্চকে শুধু অত্যাচার বা দমন-নিপীড়ন দিয়ে বাঁচানো যাবে না অনুভব করে যারা সংস্কার কার্যে মুখ্যভূমিকা নিয়েছিলেন তাদের অন্যতম ছিলেন *সেন্ট ইগনাসিয়াস লয়লা* (St. Ignatius Loyola ; 1491-1556)। 1540 খ্রিস্টাব্দে তিনি 'সোসাইটি অফ জেসাস' নামে এক সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠান থেকেই পরে জেসুইট মিশনারি (Jesuit Missionary) বা কর্মীরা সৎজীবনযাপনের ব্রত নিয়ে ধর্মপ্রচার এবং জনসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। বিশেষত উত্তরকালে শিক্ষার প্রসারে তাদের ভূমিকা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। পোপ তৃতীয় পলের আমলেই ইতালির ট্রেন্ট নামক শহরে ক্যাথলিক চার্চের প্রধান যাজকদের এক ধর্মসভা (Council of Trent) আহ্বান করা হয় এবং সেখানে দীর্ঘকাল বৈঠক চলে (1545-1563)। যদিও ক্যাথলিক চার্চের আভ্যন্তরীণ সংগঠন ও প্রশাসনিক কাঠামোর সংস্কার করা হয় তবু পোপের প্রাধান্য সমেত পুরোনো ক্যাথলিক ঐতিহ্য ও আচার অনুষ্ঠান অপরিবর্তনীয় ঘোষণা করা হয়। প্রাচীন ল্যাটিন চার্চের বদলে আধুনিক ক্যাথলিক চার্চের উৎপত্তি ঐ সময় থেকে।

আর একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করে ধর্মসংস্কার বিষয়কআলোচনায় ইতি টানা যেতে পারে। ধর্মসংস্কার আন্দোলনের পরে ধর্ম রাজনীতির সঙ্গে অনেক বেশি জড়িয়ে পড়ে। ফলে ধর্মীয় যুদ্ধ যেমন শুরু হয় তেমনি দুই ধর্মাবলম্বীর সংশ্লিষ্ট দেশগুলির মধ্যেও শত্রুতা বাড়ে। ধর্মীয় যুদ্ধ ঘটে ষোড়শ শতকেই (1546-1555) যখন স্পেনরাজ পঞ্চম

1. জি. আর. এলটন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ 107-109, 191-192

চার্লস্ পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট হয়ে জার্মানির প্রোটেস্টান্ট রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। অগস্‌বার্গের সন্ধিতে (1552) ঠিক হয় রাজার ধর্মই হবে রাজ্যের ধর্ম। পঞ্চম চার্লসের পুত্র দ্বিতীয় ফিলিপও ছিলেন গোঁড়া ক্যাথলিক। হল্যাণ্ড (নেদার ল্যাণ্ডস্) এবং বেলজিয়াম তখন স্পেনের অধীনে ছিল। দ্বিতীয় ফিলিপ নেদারল্যাণ্ডে অত্যাচার চালালে সেখানে বিদ্রোহ হয়। উইলিয়াম অফ অরেঞ্জের নেতৃত্বে সেই বিদ্রোহে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানির প্রোটেস্টান্টগণও সাহায্য করেন। শেষ পর্যন্ত নেদারল্যাণ্ডস্ স্বাধীন হয়ে যায়। স্পেনরাজ দ্বিতীয় ফিলিপ অষ্টম হেনরির কন্যা মেরীকে বিবাহ করলে এবং মেরী ইংল্যাণ্ডের রানী হলে ইংল্যাণ্ডে ক্যাথলিক ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়। কিন্তু রানী এলিজাবেথ (1558-1601) আবার প্রোটেস্টান্ট ধর্মের প্রসার ঘটান। তাঁর সঙ্গে দ্বিতীয় ফিলিপের শত্রুতাই ছিল প্রধান কারণ। অপরাজেয় স্প্যানিস আর্মাডা বা নৌবহরের সাহায্য নিয়েও দ্বিতীয় ফিলিপ ইংল্যাণ্ডকে পরাস্ত করতে পারেন নি। এই ধর্মীয় কারণের সঙ্গে উপনিবেশ দখলের লড়াই, ইংল্যাণ্ড-স্পেন শত্রুতা আরও অনেক দিন স্থায়ী ছিল।

৪। ভৌগোলিক আবিষ্কার

ভৌগোলিক আবিষ্কার বলতে কি বোঝায় ঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর আগে পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশ বা দেশ সম্পর্কে ইয়োরোপীয় মানুষজনের বিশেষ ধারণা ছিল না। এমনকি পৃথিবী যে গোল এই ধারণাও স্পষ্ট ছিল না। আমেরিকার (উত্তর এবং দক্ষিণ) দুই মহাদেশ যেমন ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত, তেমনি অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, এশিয়া ও আফ্রিকার বহু দেশ সম্পর্কেও তারা ছিলেন অজ্ঞ। আফ্রিকার কিছু দেশ এবং এশিয়ার কতিপয় দেশের সঙ্গে তাদের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল বা এই দেশগুলি সম্পর্কে তারা জানতেন। এই জ্ঞাত দেশগুলির অন্যতম ভারত। পঞ্চদশ শতকে অটোমান তুর্কিদের বাইজেনটিয়াম বা পূর্বের রোমান সাম্রাজ্য অধিকার এবং ফলে এশিয়া মাইনরের মধ্য দিয়ে বাণিজ্যপথ হাতছাড়া হয়ে যায়। এর আগেই একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে ইসলামি মধ্যপ্রাচ্যের বিরুদ্ধে খ্রিস্টান ইয়োরোপের ধর্মযুদ্ধ বা ক্রুসেড এর অভ্যুত্থানগুলির ফলে ভূমধ্যসাগরও বাণিজ্যের পক্ষে অনুকূল ছিল না। এই পরিপ্রেক্ষিতে যখন ইয়োরোপে রেনেশাঁসের প্রভাবে জ্ঞানস্পৃহা বৃদ্ধি পেল এবং বাণিজ্যের বৃদ্ধি যখন অর্থনীতিতে পরিবর্তন আনল তখন জলপথে নতুন দেশ আবিষ্কারের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এর ফলে পনেরো-ষোলো শতকে বহু দেশ, বহু নতুন পথ আবিষ্কার হয়। এই সব আবিষ্কারের ফলে ইয়োরোপীয়দের ভৌগোলিক জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। এই সব আবিষ্কারকেই বলা হয় ভৌগোলিক আবিষ্কার।

ভৌগোলিক আবিষ্কারের পটভূমিকা : ভৌগোলিক আবিষ্কারের প্রবণতার পেছনে ছিল একদিকে অর্থনৈতিক প্রয়োজন এবং অন্যদিকে নতুন দেশ আবিষ্কারের ইচ্ছা।[1] আমরা আগেই দেখেছি যে আধুনিক যুগের সূচনাতেই কৃষি ও শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতি ঘটেছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপ্তি এবং নতুন প্রভাবশালী বণিক শ্রেণীর উৎপত্তির ফলে ইয়োরোপীয়রা বাণিজ্যের প্রয়োজনে যখন বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হ'ল তখন জলপথ আবিষ্কারের প্রেরণা দেখা যায়। প্রাচীন যুগে গ্রীক ও রোমান বণিকদের সঙ্গে পশ্চিম এশিয়া ও এশিয়ার অন্যান্য দেশের বাণিজ্য ছিল। কিন্তু ইসলামের বিস্তারের ফলে তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের পর আবার বাণিজ্য শুরু হয়। ইতালির শহর-রাজ্যগুলি যেমন— ভেনিস, জেনোয়া, ফ্লোরেন্স, মিলান প্রাচ্যের সঙ্গে বাণিজ্য করে সমৃদ্ধ হয়েছিল। প্রাচ্যের সঙ্গে বণিক ও পর্যটকদের পথ ছিল এশিয়া মাইনর। কিন্তু 1453 খ্রিস্টাব্দে কনস্ট্যানটিনোপল্-এর পতন ঐ বাণিজ্য পথ বন্ধ করে দেয়। ফলে নতুন পথ আবিষ্কারের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।

অন্যদিকে রেনেশাঁসের প্রভাব বা জ্ঞানস্পৃহা শুধু মাত্র সাহিত্য, শিল্প বা বিজ্ঞানচর্চায় সীমাবদ্ধ ছিল না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সম্পর্কে জানার আগ্রহ বেড়েছিল। দুঃসাহসী নাবিকেরা অ্যাডভেঞ্চারের নেশায়, নতুন দেশ বা পথ আবিষ্কারের নেশায় বেরিয়ে পড়ে। স্মরণ করা যেতে পারে যে, ত্রয়োদশ শতকে ভেনেসিয় পর্যটক *মার্কো পোলো* (1254-1324) প্রায় পঁচিশ বছর ধরে চীন, তিব্বত, ব্রহ্মদেশ, ভারত, জাভা, লাওস, জাপান, সাইবেরিয়া ঘুরে ইতালি পৌঁছে তার ভ্রমণ বৃত্তান্ত প্রকাশ করলে পূর্বের সমৃদ্ধি, সোনা-রূপো, মশলা সম্পর্কে জেনে ইয়োরোপ বিস্মিত হয়।

অধ্যাপক প্যারি লিখেছেন যে, শুধু ধর্মীয় প্রেরণা, সাংগঠনিক ক্ষমতা, সাহস ও রোমাঞ্চকর কাজ করার ইচ্ছা, বাণিজ্যিক প্রণোদনা ছাড়াও প্রযুক্তিগত দিকও তাদের সাহায্য করেছিল। পনের শতক থেকে নতুন চার্ট, মানচিত্র এবং বন্দুক যেমন তাদের সাহায্য করে তেমনি নতুন হাতিয়ারগুলিও তাদের সাহায্যে আসে। এই হাতিয়ারগুলির বা যন্ত্রগুলির মধ্যে নাবিকদের কম্পাস (Mariner's Compass) -এর কথা প্রথমেই বলা দরকার। এর সাহায্যে দিক নির্ণয় সহজ হয়। তাছাড়া 'অ্যাস্ট্রোল্যাব' (Astrolabe) নামক যন্ত্রের সাহায্যে ধ্রুবতারার উচ্চতা মেপে অক্ষরেখা নির্দিষ্ট করা যেত। এই দুই আবিষ্কার স্পেন ও পর্তুগালের নাবিকদের উৎসাহিত করে। তাছাড়া ষোড়শ শতক থেকে জাহাজের নির্মাণগত কৌশলে প্রভূত উন্নতি হয়।[2]

1. সবচাইতে ভালো আলোচনা পাওয়া যাবে, J. H. Parry, *Europe and a Wider World*, Lond, 1949 গ্রন্থে। আরও দ্র. S.E. Morrison, *Admiral of the Ocean Sea*, New York, 1940 ; J. C. Beaglehole, *The Exploration of the Pacific*, Lond, 1934 ; Bret Bernerd, *Explorers and Exploring*, Lond, 1973.

2. দ্র. জে. এইচ. প্যারি, পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ 13-28

বিখ্যাত ভৌগোলিক আবিষ্কার সমূহ : ভৌগোলিক আবিষ্কারের বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল পর্তুগাল ও স্পেন।[1] পর্তুগালে রাজা জনের পুত্র *যুবরাজ হেনরি* (Prince Henry, 1394-1460) ভৌগোলিক আবিষ্কারে এবং নাবিকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ ও অভিযানে উৎসাহ দিতেন। এজন্য তাঁর নামই হয় 'নাবিক হেনরি' (Henry the Navigator)। তাঁর প্রেরণায় আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে অনেক অভিযান পাঠানো হয়। শুরু হয় ভৌগোলিক আবিষ্কারের যুগ। নাবিক হেনরি অবশ্য আফ্রিকার উপকূল দিয়ে ভারতে যাওয়ায় পথ সন্ধানে উৎসাহী ছিলেন। তাঁর পাঠানো অভিযানের ফলেই উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার মদিরা আজোরেল এবং পশ্চিম আফ্রিকার গিনি, সেনেগাল ও জাম্বিয়া উন্মুক্ত হয় এবং পর্তুগিজ ঘাঁটিতে পরিণত হয়। তাঁর মৃত্যুর কিছুদিনের মধ্যেই পর্তুগিজ নাবিকগণ বিষুবরেখা অতিক্রম করেছিল। হেনরির মৃত্যুর একশো বছরের মধ্যেই তাঁর পর্তুগিজ সাম্রাজ্য ছড়িয়ে দেওয়ার স্বপ্ন পূরণ হতে থাকে।

পর্তুগালের রাজা দ্বিতীয় জন (1481-1495) অভিযানের ব্যাপারে নাবিক হেনরির মতনই উৎসাহী ছিলেন। জনের উৎসাহে *বারথোলোমিউ ডিয়াজ* (Bartholomew Diaz) আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল দিয়ে যেতে যেতে দক্ষিণ আফ্রিকার দক্ষিণতম সীমায় পৌঁছন 1487 খ্রিস্টাব্দে। তিনি ঐ এলাকার নাম দেন ঝটিকা অন্তরীপ (Cape of Storms), কেননা ঝড়ের ফলে তার জাহাজ ঐখানে যেতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু পর্তুগালের রাজা দ্বিতীয় জন এই নাম বদল করে রাখেন 'উত্তম আশা অন্তরীপ' (Cape of Good Hope)। কারণ তাঁর আশা ছিল ঐ অন্তরীপ ঘুরে ভারত মহাসাগরে যাবার রাস্তা পর্তুগালের দখলে চলে আসবে। নাবিকদের অসন্তোষের ফলে বারথোলোমিউ দিয়াজকে ফিরে যেতে হলেও পেড্রো দ্য কোভিলহো (কার্ভালো) স্থলপথে লোহিত সাগরে পৌঁছে ভারত মহাসাগর পার হয়ে ভারতে পৌঁছবার রাস্তা খুঁজে পান।

যে পর্তুগিজ নাবিক অভিযানকারী ইয়োরোপ থেকে প্রথম ভারতে এসে পা রেখেছিলেন তিনি হলেন *ভাস্কো-ডা-গামা* (Vasco-da-Gama, 1469-1524)। তিনি পর্তুগাল থেকে যাত্রা শুরু করে উত্তম আশা অন্তরীপ ঘুরে ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলের কালিকট বন্দরে এসে পৌঁছান 1498 খ্রিস্টাব্দের মে মাসে। ভাস্কো ডা গামাকে পাঠিয়েছিলেন পর্তুগালের রাজা প্রথম ইমানুয়েল (1495-1521)। 1497 খ্রিস্টাব্দের 3 আগস্ট চারটি জাহাজ নিয়ে রওনা দেন তিনি, সঙ্গে 118 জন নাবিক। স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে বিবাদের কারণে প্রথমবার সেখানে কুঠি নির্মাণ করতে পারেন নি, ফিরে গিয়েছিলেন দুটি জাহাজ আর অর্ধেক নাবিক নিয়ে; কিন্তু তিনি সঙ্গে গোলমরিচ, আদা, লবঙ্গ, এলাচ, দারচিনি ইত্যাদি মশলা (এগুলি অনেক সময় দক্ষিণপূর্ব এশিয়া থেকে ভারতে আসত) এবং দামী পাথর নিয়ে পর্তুগালে ফিরে যান। এই সব দ্রব্যের দাম ছিল অভিযানের খরচের

---

1. সর্বাধুনিক আলোচনা পাওয়া যাবে, J. Berger, *Discoverers of the New World*, Lond, 1969; Gilbert Renault, *The Caravels of Christ*, 1445-1498, London, 1959.

ষাটগুণ। এর পরেও একাধিকবার ভারতে এসেছেন ভাস্কো-ডা-গামা। ভারতের সঙ্গে ইয়োরোপের প্রত্যক্ষ যোগাযোগের প্রথম সূত্র ভাস্কো-ডা-গামা।

এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে *আলফানসো ডি আলবুকার্ক* (Alfonso de Alburquerque, 1453-1515) নামে অপর পর্তুগিজ অভিযানকারী দিয়াজের পথে ভারতে এসে ভাস্কো-ডা-গামার আবিষ্কৃত মালাবার উপকূলে ঘাঁটি গড়েন। কোচিনের রাজার (জামোরিন) অনুমতি নিয়ে তিনি শুধু ভারতে পর্তুগিজ বসতি স্থাপন করেননি, ক্রমে গোয়ায় পর্তুগিজ উপনিবেশের পত্তন করেন। ততদিনে পারস্য উপসাগরে অরমুজ এবং মালাক্কা সিংহল সহ অনেক জায়গায় তাদের বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। জন কাব্রাল নামে এক পর্তুগিজ নাবিক দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিলে পৌঁছেছিলেন।

পর্তুগালের মতন স্পেনও ভৌগোলিক আবিষ্কারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল। এই নাবিকদের মধ্যে প্রথমেই মনে পড়ে *ক্রিস্টোফার কোলম্বাসের* কথা। বস্তুত *কোলম্বাসের* (Christopher Columbus, 1451-1506) ইতালির জেনোয়াতে জন্ম। এক বস্ত্র ব্যবসায়ীর পুত্র। তাঁর ইচ্ছা ছিল আটলান্টিক মহাসাগর পার হয়ে জাপান-চীন হয়ে ভারতে পৌঁছনোর। অর্থসংগ্রহ করতে না পেরে তিনি পর্তুগালে যান কিন্তু পর্তুগিজরা আফ্রিকা ঘুরে ভারতে যাওয়াতে বেশি আগ্রহী ছিল। ইংল্যাণ্ডের রাজাও তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। শেষপর্যন্ত স্পেনের রাজা ফার্দিনান্দ এবং রাণী ইসাবেলা তাকে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। সানতা মারিয়া, পিন্‌তা এবং বিনা নামক তিনটি জাহাজ নিয়ে 81 জন নাবিক সহ যাত্রা শুরু করে অনেক বাধাবিপত্তির মধ্যে দিয়ে 1492 খ্রিস্টাব্দে কোলম্বাস আটলান্টিক পার হয়ে কিউবা এবং হাইতিতে পৌঁছন। অবশ্য তিনি ভেবেছিলেন ভারতে পৌঁছেছেন। তাই এই দ্বীপগুলিকে নাম দেন 'পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ' আর স্থানীয় অধিবাসীদের বলতেন 'ইণ্ডিয়ান'। আরও তিনবার (1494, 1498 এবং 1502) অভিযান করলেও এবং নানা দ্বীপ ও দক্ষিণ আমেরিকায় গেলেও তিনি বুঝতে পারেন নি যে তাঁর প্রাচ্য অভিযান সফল হয়নি। তা'হলেও তাকেই পশ্চিম গোলার্ধ বা আমেরিকার আবিষ্কারক বলে ধরা হয়।

ফ্লোরেন্সের (ইতালি) নাবিক *আমেরিগো ভেসপুচি* (Amerigo Vespucci, 1452-1512) 1497 থেকে 1505 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে চারবার আমেরিকা অভিযান করেন। তিনি স্পেনের সেভিলে থাকতেন। আমাজন নদীও তিনি আবিষ্কার করেন। স্থানীয় গাছপালা পশুপাখি পর্যবেক্ষণ করে তার ধারণা হয় পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও দক্ষিণ আমেরিকার অঞ্চলগুলি ভারত বা প্রাচ্যের অংশ নয়। তিনি সমস্ত অঞ্চলের নাম দেন 'নতুন পৃথিবী' (Mundus Novus), পরে আমেরিগো ভেসপুচির নামেই মূল ভূখণ্ডের নাম হয় আমেরিকা।

আরেকজন স্পেনীয় নাবিক *ভাস্কো নুনেজ বালবোয়া* (Vasco Nunej Balboa, 1475-1517) পশ্চিমে অভিযান করেছিলেন। কোলম্বাস যে দ্বীপের নাম দিয়েছিলেন হিসপ্যানিওলা

(যার আসল নাম হাইতি), সেখানে এবং সান সেবাস্তিয়ান নামক অঞ্চলেও তিনি যান। বালবোয়া প্রথম ইয়োরোপীয় যিনি প্রশান্ত মহাসাগর দেখেছিলেন। *হারনান কোর্টেজ* (Hernan Cortes) নামে স্পেনীয় নাবিক 1519-21 খ্রিস্টাব্দে মেক্সিকো জয় করেন। যেমন স্পেনের *ফ্রান্সিসকো পিজারো* পেরু জয় করেছিলেন (1533)।

স্পেনের রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় পর্তুগিজ নাবিক *ফার্দিনান্দ ম্যাগেলান* (Ferdinand Magellan, 1480-1521) ভূপ্রদক্ষিণের জন্য স্পেনের সেভিল থেকে (1519) নৌ-অভিযান শুরু করেন। তিনি স্পেন থেকে আটলান্টিক পার হয়ে দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ প্রান্তেয় প্রণালী (এখন যার নাম ম্যাগেলান প্রণালী) অতিক্রম করে প্রশান্ত মহাসাগর দিয়ে 95 দিন পরে ফিলিপাইনস্ দ্বীপপুঞ্জে পৌছন। স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হলেও তাঁর সঙ্গীরা ভিক্টোরিয়া নামের জাহাজটি নিয়ে স্পেনে প্রত্যাবর্তন করেন (1522)। নৌ-পথে এই প্রথম ভূপ্রদক্ষিণ।

ভৌগোলিক আবিষ্কার যে শুধুমাত্র পর্তুগিজ ও স্পেনীয় নাবিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়। ক্যানাডার নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ডে সর্বপ্রথমে যান জন ক্যাবট এবং সেবাস্টিয়ান ক্যাবট (1497-98 খ্রিঃ)। ফ্রান্সের জাক কার্টিয়ে (Jacques Cartier) ক্যানাডার সেন্ট লরেন্স নদীর ধার দিয়ে মন্ট্রিয়েল এবং কিউবেক পৌছেছিলেন। ইংরেজ নাবিক অভিযাত্রীদের মধ্যে অত্যন্ত স্মরণীয় নাম *স্যার ফ্রান্সিস ড্রেক* (Francis Drake, 1543-1596)। তিনি ভূপ্রদক্ষিণ করেছিলেন (1577-80 খ্রিঃ)।

ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলাফল ঃ ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলাফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। প্রথমত, ভৌগোলিক আবিষ্কারসমূহ ইয়োরোপীয়দের জ্ঞানবৃদ্ধি করল, মানসিক জগতকে প্রসারিত করে দিল। ইয়োরোপের বাইরেও যে একটা জগৎ আছে বিশেষত আমেরিকা সম্পর্কে নতুন ধারণার সৃষ্টি হলো। যোগাযোগ হলো সুপ্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে, অ্যাফ্রো-এশিয়ার অনেক দেশের সঙ্গে।

দ্বিতীয়তঃ, ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে পৃথিবী যে গোল তা প্রমাণিত হলো। এর ফলে মধ্যযুগের অন্ধ বিশ্বাস, প্রচলিত তত্ত্ব ইত্যাদি ভেঙে গেল। বিজ্ঞানের জয় হলো।

তৃতীয়তঃ, ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে সমুদ্র-বাণিজ্য অনেক বেড়ে গেল। বিদেশের মাল আনা এবং নিজেদের মাল বিক্রি করা বেড়ে গেল। যে সব দেশের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ছিল সেইসব দেশের মালপত্রও আমদানি রপ্তানি হতে লাগল।

চতুর্থতঃ, ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি পাওয়ায় বণিক সম্প্রদায় সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠল। অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল। প্রাচ্য দেশে ব্যবসা করার জন্য অনেক দেশেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি গঠন করা হয়।

পঞ্চমতঃ, অনেকেই কল্পিত সোনার দেশ (El Dorado) এর সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। ইয়োরোপে সোনার খুবই চাহিদা ছিল। আমেরিকায় স্বর্ণসন্ধানী অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় ভাগ্যান্বেষীরা সমবেত হতে লাগল।

ষষ্ঠতঃ, সপ্তদশ শতক থেকে ইয়োরোপীয় পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য বাজারের সন্ধান এবং বিদেশ দখল থেকে প্রথমে মার্কেণ্টাইল মতবাদ এবং পরে উপনিবেশ স্থাপনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হলো। প্রথমে স্পেন ও পর্তুগাল, পরে হল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড এই কাজে ঝাপিয়ে পড়ে। সপ্তমত, বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগের সূত্রধরে খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকগণ সক্রিয় হয়ে ওঠেন।

সর্বশেষে বলা যায়, নানাদেশের সঙ্গে যোগাযোগ, বাণিজ্যের উন্নতি, মূলধনের বিনিয়োগ এক নতুন যুগের সূচনা করে।

৫। বিজ্ঞানের জগতে বিপ্লব

ইয়োরোপে আধুনিক যুগের সূচনায় অন্যতম যুগলক্ষণ ছিল ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের 'বিজ্ঞান-বিপ্লব'। বস্তুতপক্ষে রেনেশাঁস বা নবজাগরণের পরবর্তীযুগে ইয়োরোপে চিন্তার মুক্তির যে লক্ষণ দেখা গিয়েছিল, তা ক্রমশই জ্ঞানকে বিশ্বাসের বদলে যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিল। জানার ইচ্ছা হয়েছিল ধর্মনিরপেক্ষ নীতি, তাই তথ্যের পরিধি হয়েছিল বিস্তৃত। এর ফলে দৃষ্টি পড়ে ইহলৌকিক উন্নতির দিকে। ফলে মানুষের জয় ও অগ্রগতির অন্যতম কারণ বিজ্ঞান মনস্কতা। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যাকে ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের বিজ্ঞানের জগতে বিপ্লব (Scientific Revolution) বলা হয়, তা ঐ অগ্রগতিরই একটা বিরাট দিক্‌চিহ্ন। বিজ্ঞানের এই অগ্রগতি আরও অনেক বেশি প্রসারিত হয় উত্তরকালে অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে।

রেনেশাঁস এর প্রথম পর্বেই আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম হয়েছিল। আলবার্টাস ম্যাগনাস, টমাস অ্যাকিনা, রজার বেকন প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের কথা আমরা উল্লেখ করেছি রেনেশাঁস সম্পর্কে আলোচনার সময়। এই অধ্যায়ে রেনেশাঁস প্রসঙ্গে আমরা লিওনার্দো দা ভিঞ্চির কথাও জেনেছি যিনি শিল্পী শুধু নন, বৈজ্ঞানিকও ছিলেন। সুতরাং বিস্তারিত পুনরালোচনা না করে আমরা মূলকথাগুলি স্মরণ করতে পারি। ম্যাগনাস পর্যবেক্ষণ করতেন গাছপালা ও প্রাণীদের ব্যবহার ; অ্যাকিনা বলতেন পরীক্ষা দ্বারা সত্য প্রমাণ করে গ্রহণের কথা। বেকনও বলেছিলেন আমাদের চারপাশে যা ঘটছে তা পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান এবং পরীক্ষা করে দেখার কথা। ক্রমে ক্রমে রেনেশাঁসের মধ্য দিয়ে যে আধুনিক ইয়োরোপের জন্ম হয় তার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল প্রকৃতি বিজ্ঞান (Natural Science)-এর বিকাশ ও অগ্রগতি।

প্রকৃতি বিজ্ঞান সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা যেমন বিজ্ঞান বিপ্লবের আদি যুগের ব্যাপার, তেমনি আরো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো মধ্যযুগীয় অন্ধবিশ্বাসের পরিবর্তে যুক্তি ও প্রমাণ নির্ভরশীল হওয়া। এই পার্থক্যই আধুনিক যুগের সূচনা করে। রেনেশাঁসের দৃষ্টিভঙ্গির আসল কথাই তো বাইরের পৃথিবীকে পর্যবেক্ষণ করে সত্যে পৌছনো উচিত এবং সেই

সত্য প্রমাণ করা দরকার, বিশ্বাসের উপর সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। মধ্যযুগীয় অন্ধবিশ্বাস এবং ধর্ম নির্ভরতার প্রতি বিরুদ্ধতার কারণে অনেক বৈজ্ঞানিককে নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে।

পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে এই কথা বলার জন্য ব্রুনোকে পুরিয়ে মারা হয়েছিল। অথচ বিজ্ঞানের জগতে বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন পোলিশ বিজ্ঞানী *নিকোলাস কোপারনিকাস* (Nicolaus Copernicus, 1473-1543)। আমরা আগেই রেনেশাঁস আলোচনা প্রসঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে, তিনি সর্বপ্রথম প্রচলিত ধারণাকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ ক'রে দিয়ে ঘোষণা করেন যে, পৃথিবী অন্যান্য গ্রহের মতন সূর্যের চারিদিকে আবর্তন করছে। তাছাড়া বিশ্ব ও আকাশ দুই ধরনের নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হয় না, একই প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা বিশ্বজগৎ নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে চার্চ-অনুমোদিত মধ্যযুগীয় চিন্তার বিপক্ষে এই মতবাদ বিজ্ঞান জগতে বৈপ্লবিক।

কোপারনিকাসের ধারণাকে আরও জোরদার করেন গ্যালিলিও। এই ইতালিয় বৈজ্ঞানিক দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন এবং তা নির্মাণে সক্রিয় ছিলেন। তিনিও স্পষ্টভাবে বলেন যে, পৃথিবী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের (Universe) কেন্দ্রস্থলে নয়, সেখানে রয়েছে সূর্য। তাঁর এই ধারণাও ধর্মীয় বিশ্বাস-বিরোধী। তাকেও চার্চের বিচারালয়ের (Inquisition) রোষের মুখে পড়তে হয়। তবে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা থেমে থাকেনি। বরং বৈজ্ঞানিকগণ নানা নির্যাতন সহ্য করেও ভবিষ্যতের জন্য রেখে যান অভ্রান্ত সত্যের নিশানা।

বিজ্ঞানচেতনা বৃদ্ধির ফলে সতেরো শতক থেকেই নানা দেশে বিজ্ঞান সমিতি বা অ্যাকাদেমি গঠিত হতে থাকে। যেমন 1603 খ্রিঃ রোমে একটি অ্যাকাদেমি গঠিত হয়েছিল। পরে ইতালি ও জার্মানির বিভিন্ন শহরে, 1662-তে ইংল্যাণ্ডে রয়াল সোসাইটি, 1666-তে ফ্রান্সে অ্যাকাদেমি রয়াল দ্য সায়েন্সেস। সতেরো শতকেই আবির্ভূত হন স্যর আইজাক নিউটন। *প্রতিভাবান নিউটন* (Isaac Newton, 1642-1727) জন্মেছিলেন ইংল্যাণ্ডের লিংকনশায়ারে। কেম্ব্রিজেরই ছাত্র, মাত্র 27 বছর বয়সে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক হন। রয়াল সোসাইটির ফেলো নিউটন পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী আবিষ্কার মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব (Law of Gravitation) শুধু নয়, ক্যালকুলাস (Differential & Integral Calculus) এর জটিল অঙ্ক, সৌরজাগতিক গতির বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা ইত্যাদির জন্য আধুনিক বিজ্ঞানের আদিপুরুষ বলা যেতে পারে।

ক্রমে জ্যোতির্বিদ্যায় এডমণ্ড হ্যালি, হিরৎ সেল, গ্যারিবোল্ডি, ফারেনহাইট প্রমুখ উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারে অংশ নেন। ভূতত্ত্বে জেমস হাটন, প্রাণিবিদ্যা, শারীরবৃত্ত এবং চিকিৎসায় মালপিঘি, হারভি, হুক, রে, লিনে, বুঁফ প্রমুখ বিজ্ঞানী জ্ঞানের ধারণা আরও প্রসারিত করেন। রসায়নে রবার্ট বয়েল, যোসেফ ব্ল্যাক, হেনরি ক্যাভেণ্ডিস, আঁতোয়াজ লব্যাঁ ল্যাভোসিয়ে প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ মৌলিক আবিষ্কার ঐ শাস্ত্রকে এগিয়ে দেয়।

এই সব আবিষ্কারের পথ ধরেই অষ্টাদশ শতকের জ্ঞানালোকের যুগে বিজ্ঞানচর্চার যে নতুন ধারা আসে তাতে বাষ্পীয় শক্তি, রেল ইঞ্জিন প্রমুখ আবিষ্কার শুধু বিজ্ঞান জগতে নয়, শিল্পের জগতেও বিপ্লব ঘটায়।

৬। পুঁজিবাদের উদ্ভব

পুঁজিবাদ কাকে বলে : মধ্যযুগ থেকে ক্রমে ক্রমে এক বিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যখন ইয়োরোপীয় সমাজ আধুনিক যুগে উপনীত হলো, সেই নতুন যুগলক্ষণগুলির অন্যতম ছিল পুঁজিবাদ বা ধনতন্ত্র (Capitalism) এর উদ্ভব বলে ঐতিহাসিকগণ অভিমত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সমস্যা হলো ধনতন্ত্র কাকে বলে তার সর্বসম্মত কোনও সংজ্ঞা নেই। এটি এক কথায় এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ঠিকই কিন্তু অর্থনীতিবিদগণ এর নানা সংজ্ঞা দিয়েছেন। পুঁজিবাদের উদ্ভব বিষয়ে তাঁর মূল্যবান গবেষণায় অধ্যাপক মরিস ডব দেখিয়েছেন যে, এ বিষয়ে অর্থনীতিবিদ এবং ঐতিহাসিকদের মধ্যেও দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য আছে।[1]

তবে এক কথায় বলা যায়, পুঁজিবাদ হলো এমন এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যা উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত, যে ব্যবস্থায় দ্রুত উৎপাদন এবং সর্বাধিক মুনাফা অর্জনই হলো একমাত্র লক্ষ্য এবং যে ব্যবস্থায় উৎপাদনের প্রকরণগুলি মূলধন বিনিয়োগকারী ব্যক্তি বা শ্রেণীর হাতে থাকে। যত পণ্য উৎপাদিত হয় ততই মুনাফা বৃদ্ধি পায়। কার্ল মার্ক্স সুস্পষ্টভাবে লিখেছেন যে, (ক) ঐতিহাসিক এবং বস্তুগত পারিপার্শ্বিকতা দ্বারা এই উৎপাদন সম্পর্ক নির্ধারিত হয় এবং (খ) সেই উৎপাদন সম্পর্ক সামাজিক সম্পর্কও নিয়ন্ত্রণ করে।[2] আধুনিক ইয়োরোপের ইতিহাস পুঁজিবাদের উদ্ভব, তার প্রকৃতি ও বিবর্তন ছাড়া বোঝা যায় না বলে অধ্যাপক টনি মন্তব্য করেছেন।[3]

তবে মরিস ডব দেখিয়েছেন যে ধনতন্ত্র এক বিশেষ ঐতিহাসিক পর্যায় হিসেবে যদিও উপেক্ষা করা যায় না, কিন্তু তার মানে এই নয় যে, সকল লেখক এর সংজ্ঞা বা চরিত্র সম্পর্কে সহমত পোষণ করেন। তাই 'ধনতন্ত্র' পরিভাষা হিসেবে জটিল। যদিও অনেক সংজ্ঞার মধ্যেই ত্রুটি আছে, তবে ধনতন্ত্র সম্পর্কে তিনটি মত অনুধাবন করা উচিত। *সমবার্ট* (Werner Sombert), *হেবার* (Max Weber) প্রমুখের মতে এর প্রধান বৈশিষ্ট্য এক বিশেষ চেতনা-উদ্যোগ ও অ্যাডভেঞ্চার, হিসেব নিকেশ, যুক্তি ও বুর্জোয়া মনোভাব মিলে সম্পদ বিনিয়োগ করে মুনাফা বৃদ্ধির চেতনা। দ্বিতীয় মত হলো ধনতন্ত্র মধ্যযুগীয় প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক অর্থনীতির বদলে ধনবাদী বা মুদ্রা অর্থনীতির

---

1. M. Dobb, *Studies in the Development of Capitalism*, London, 1972, p. 1.

2. Marx, *Capital* Vol III. pp 1023-24

3. R.H. Tawney, *Religion and the Rise of Capitalism* গ্রন্থের 1937 খ্রি. সংস্করণে ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

প্রাবল্য সৃষ্টি করে। অর্থাৎ শুধু জীবিকার প্রয়োজনে নয়, মুনাফা বাড়ানোর বিশেষ উদ্দেশ্যই এখানে প্রধান। এজন্যই অধ্যাপক আর্ল হ্যামিলটন লিখেছেন যে ধনতন্ত্র হলো— "a system in which wealth other than land is used for the definite purpose of securing an income।" ঐতিহাসিক *আঁরি পিরেন* (Henri Pirenne) এই প্রবণতা দ্বাদশ শতক থেকে লক্ষ্যণীয় বলে মনে করেন। ব্যক্তিগত প্রয়োজনের চাইতে বাজারমুখী-অর্থনীতি এর উদ্দেশ্য।

তৃতীয় মত মার্ক্সের এবং এঙ্গেলস্ এর রচনায় স্পষ্ট। ধনতন্ত্র হলো সেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে শুধু পূর্বোক্ত চেতনা বা মুনাফার উদ্দেশ্যে ধনের ব্যবহারের সূত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যারা উৎপাদনের উপাদানের মালিক তারা সমাজে সংখ্যালঘু এবং তাদের উৎপাদন ব্যবস্থায় পণ্য উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত অপর সংখ্যাগুরু মানুষ, যারা শ্রমিক, তারা শ্রমশক্তি বিনিয়োগ বা বিক্রি করে শুধু মজুরি পায়। উৎপাদিত পণ্য বা পণ্যের বাজারে সেই পণ্য বিক্রি থেকে আগত মুনাফায়, শ্রমিক শ্রেণীর কোনও অংশ নেই। ধনতন্ত্রের বিকাশ শিল্পবিপ্লবের পরে যেভাবে ইতিহাসে দেখা যায়, তাতে মার্ক্সের মতের সত্যতা প্রমাণিত।

ধনতন্ত্রের উদ্ভব ও নানা স্তর ঃ ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদের উদ্ভব এবং তার বিকাশ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। তেমনি পুঁজির সৃষ্টি, তার সঞ্চয়, ব্যবসায়িক পুঁজি, তা থেকে শিল্প পুঁজিতে রূপান্তর, সমাজে বণিক, বুর্জোয়া এবং শিল্পপতি শ্রেণীর ভূমিকা, শিল্পবিপ্লব, শ্রমজীবী শ্রেণী বা সর্বহারা (Proletariat) শ্রেণী, পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর, সাম্রাজ্যবাদ সবই ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্য বিষয় কিন্তু আমাদের সংক্ষিপ্ত পরিসরে প্রধান সূত্রগুলি শুধু দেখে নিতে হবে।

পনেরো-ষোলো শতকের ভৌগোলিক আবিষ্কার, রেনেশাঁসের চেতনা এবং জ্ঞানের পরিধি বিস্তার এক বাণিজ্য বিপ্লবেরও সূচনা করে। ইয়োরোপের নানা দেশের সঙ্গে এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার নানা দেশের যোগাযোগের ফলে ইয়োরোপের আমদানি-রপ্তানি বাড়তে থাকে। উদ্ভব হয় এক প্রভাবশালী বণিক শ্রেণীর। সামন্ততন্ত্রের অবসানের পর উদ্ভব হয় এক বিত্তবান নাগরিক শ্রেণীর।[1] মধ্যযুগে সামন্ততন্ত্রে ব্যবসার অধঃপতন, মুদ্রা সংকট এবং নগরায়ণের অবক্ষয়ের পরিবর্তে আধুনিক যুগের সূচনা থেকেই ক্রমে আবার সমৃদ্ধ নগর, মুদ্রা-অর্থনীতি, ব্যবসা বাণিজ্য বাড়তে থাকে। সম্পদ জড়ো হতে থাকে কিছু ব্যক্তির হাতে এবং তারা সেই সম্পদ জমির পরিবর্তে প্রথমে বাণিজ্যে এবং পরে শিল্প উৎপাদনে ব্যবহার করতে শুরু করে। সম্পদশালী ধনী মধ্যবিত্ত নাগরিক শ্রেণী ছিল শিক্ষিত, এদের মধ্য থেকেই 'বুর্জোয়া' শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। তাই পুঁজিবাদের উদ্ভবের পিছনে বাণিজ্য বিপ্লব এবং নতুন সামাজিক শ্রেণীর অভ্যুদয় হল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

1. মরিস ডব, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ 33-82

তাছাড়া মধ্যযুগে ক্যাথলিক খ্রিস্টান চার্চের অনুমোদন অনুযায়ী যেনতেন প্রকারেন মুনাফা লোটা ছিল অনৈতিক। সুদ নেওয়া পাপ। মধ্যযুগে একধরনের ধর্মীয় মূল্যবোধ সামন্ততন্ত্রের উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে ছিল; অথচ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ছিল অনেক অনৈতিক কাজ। পোপতন্ত্র এবং ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে রিফর্মেশন বা ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ফলে মূল্যবোধ বদলে যায়। যে নতুন প্রতিবাদী প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চের সৃষ্টি হয়, তাতে অর্থনৈতিক উদ্যোগ প্রেরণা পায়। কারণ যে-কোনও ক্রিয়াকলাপ, তা মুনাফা অর্জন, বাণিজ্য বৃদ্ধি বা ঋণের পরিবর্তে সুদ গ্রহণ সবই ছিল ঐ উদ্যোগের অংশ। অবশ্য তা হীন চোখে দেখা হত না। ফলে প্রোটেস্টান্ট ধর্মের বিকাশের সঙ্গে ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদের সাদৃশ্য দেখেছেন অনেকেই। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যাবে ম্যাক্স হেবার এর লেখায়।[1]

পুঁজিবাদের উদ্ভবের পর প্রথমে বাণিজ্যিক মূলধন (Commercial Capital) এবং উনিশ শতক থেকে শিল্প মূলধন (Industrial Capital) বিনিয়োগ করে এক ক্ষমতাবান সামাজিক শ্রেণীর উত্থান পুঁজিবাদের বিকাশ সূচনা করে। বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরে শ্রেণী-বিভাজন হওয়া শিল্প-মালিক এবং শিল্প-শ্রমিক শ্রেণীতে নতুন সামাজিক সম্পর্ক, পৃথিবীব্যাপী বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা, পণ্যসামগ্রীর উৎপাদন পদ্ধতিতে বিপ্লবের ফলে দ্রুত পণ্য সামগ্রীর ব্যাপক উৎপাদন, ব্যাঙ্ক এবং ঋণের কারবার, বিভিন্ন দেশে ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং সাম্রাজ্যবাদ সবই পুঁজিবাদের বিকাশের সঙ্গে জড়িত।[2]

পুঁজিবাদের বিকাশের নানা স্তর আছে।[3] সামন্ততন্ত্রের উৎপাদন পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে পুঁজিবাদি। উৎপাদন পদ্ধতি প্রসঙ্গে মার্ক্সের মন্তব্য এরকম, পুঁজিবাদ "Like any other definite mode of production, conditioned upon a certain stage of social productivity and upon historically developed form of the productive forces. This historical prerequisite is itself the historical result and product of a preceeding process, from which the new mode of production takes its departure as from its given foundation. The conditions of production corresponding to this specific, historically determined mode of production have a specific, historical passing character.[4]

---

1. Max Weber, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism.*

2. H. Pirenne, "Stages in the Social History of Capitalism", *American Historical Review,* 1914

3. "The development of Capitalism falls into a number of stages, characterized by different levels of maturity and each of them recognizable by fairly distinctive traits"- M Dobb, *Op.Cit,* p 17.

4. মার্ক্স লিখিত তিনখণ্ডের ডাস ক্যাপিটাল গ্রন্থের শেষের খণ্ডটি এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

অধ্যায় ২

ফরাসি বিপ্লব (1789–1814)

(**Syllabus:** *The French Revolution–Socio-Economic Background–Progress of the Revolution– Popular Movements–Jacobins and Girondins*)

১। সূচনা

মানব সভ্যতার ইতিহাসে ফরাসি বিপ্লব এক যুগান্তকারী ঘটনা। সাধারণত 'বিপ্লব' কথাটি রাজনৈতিক অর্থে, প্রচলিত রাষ্ট্রব্যবস্থার বা সামাজিক অবস্থার অতি দ্রুত, আকস্মিক এবং মৌলিক পরিবর্তন বোঝায়। ফ্রান্সে যে বিপ্লব 1789 খ্রিস্টাব্দে শুরু হয় তা এমনই এক আমূল পরিবর্তনের ঝড় বয়ে নিয়ে এসেছিল। নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র নয়, এমনকি জ্ঞানদীপ্ত বা প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচারও নয়, শুনিয়েছিল প্রজাতন্ত্রের বাণী। তুলে ধরেছিল 'সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা'র আদর্শ। বিপ্লবের আগেকার সমাজ যাকে বলা হত পুরোনো ব্যবস্থা (ancient regime), নানা কারণে তাতে যে সংকটের সৃষ্টি হয় ফরাসি রাজতন্ত্র তা সমাধান করতে পারেনি। ফলে দেখা দিল বিক্ষোভ এবং যার পরিণতিতে দেখা দেয় বিপ্লব।এই বিপ্লব নূতন আদর্শ ও পরিবর্তনের বার্তা প্রভাব বিস্তার করে ফ্রান্সের বাইরে সর্বত্র।

পুরোনো সমাজের সংকট ক্রমশই তীব্র হয়ে ওঠে রাজা ষোড়শ লুই এর রাজত্বকালে। ষোড়শ লুই সিংহাসনে বসেছিলেন 1774 খ্রিস্টাব্দে। এর আগে ফ্রান্সে বুরবোঁ বংশীয় রাজা চতুর্দশ লুই ছিলেন দোর্দন্ড প্রতাপশালী; তাঁর আমলে (1643-1755) রাজার বিশেষ ক্ষমতা ও নিরঙ্কুশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এরপর পঞ্চদশ লুই এর রাজত্বকালে (1715-1774) ঐ নিরঙ্কুশ ক্ষমতা বজায় থাকলেও পুনঃপুনঃ সংকট এবং সেগুলি দমনে রাজার ব্যর্থতা রাজতন্ত্রকে দুর্বল করে দেয়। তবে গোটা পুরোনো সমাজব্যবস্থাই ভেঙে পড়ার অবস্থা দেখা দেয় রাজা ষোড়শ লুইয়ের আমলে। শেষ পর্যন্ত বিপ্লবের সূচনা হয়।

অভিজাতরাই রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জন্য ধ্বজা প্রথম উড়িয়েছিলেন 1788 খ্রিস্টাব্দে। মাতিয়ে, লেফেভর প্রমুখ ঐতিহাসিক এই অভিজাত বিদ্রোহ থেকে ফরাসি বিপ্লবের সূচনা ঘটে বলে মনে করেন। তবে 1789 -এর 5 মে যখন রাজা ফরাসি পার্লামেন্ট বা স্টেটস্ জেনারেল ডাকতে বাধ্য হলেন, প্রকৃত বিচারে তাই বিপ্লবের প্রথম পদক্ষেপ। দ্বিতীয় পদক্ষেপ বলা হয় ঐ অধিবেশন আহ্বানের পরের মাসে 'টেনিস কোর্টের শপথ' (20 জুন) এবং স্বৈরাচারের প্রতীক কুখ্যাত বাস্তিল দুর্গের পতনের (14 জুলাই) মধ্যে। রাজার অহঙ্কার এবং গর্ব, সাংসদকে উপেক্ষা করা তথা পুরোনো সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলিই যখন ধূলিসাৎ হতে থাকে তখনই বিখ্যাত ফরাসি বিপ্লবের সূত্রপাত।

এখানে বলা যেতে পারে যে পুরোনো ব্যবস্থা ও সমাজ মধ্যযুগ থেকেই কিছু কিছু বিবর্তিত হচ্ছিল। তবে সমাজের মূল কাঠামো ছিল অপরিবর্তিত। ফ্রান্সেও তাই অভিজাত শ্রেণীর ক্ষমতা কিছু খর্ব হলেও তারাই সমাজের প্রধান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। অষ্টাদশ শতক থেকে অর্থনৈতিক সংকটের ফলে রাজার নিরঙ্কুশ ক্ষমতায় অবক্ষয় দেখা দেয় এবং ঐ শতকের শেষার্ধে সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে সংকট ঘনীভূত হয়। রাজা তা সমাধানে ব্যর্থ হয়ে পার্লামেন্ট ডাকতে বাধ্য হন। রাজা এতদিন স্বৈরাচারীভাবে কর বসিয়ে এলেও পার্লামেন্ট মনে করত কর ধার্য করতে পারে একমাত্র সংসদ। রাজা এই সংকটময় পরিস্থিতিতে তা মানতে বাধ্য হলেন।

বস্তুত অষ্টাদশ শতকের শেষে, "অভিজাত ও যাজকদের সামাজিক প্রতিপত্তি ছিল। কিন্তু গত শতাধিক কাল ধরে আর্থনীতিক পরিবর্তন ক্রমশ নতুন একটি শ্রেণীর আগমনবার্তা ঘোষণা করছিল। ফ্রান্সে এই শ্রেণী বুর্জোয়া (Bourgeoisie) নামে পরিচিত ছিল। শিল্প, বাণিজ্য ও আর্থিক কাজ কর্মে জড়িত নগর কেন্দ্রিক এই শেণীর আর্থিক ক্ষমতার সঙ্গে তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারের অসঙ্গতি ছিল স্পষ্ট। সুতরাং সামাজিক রাজনৈতিক কাঠামোর অসঙ্গতির বিরুদ্ধে অসন্তোষ ১৭৮৯-এর বিপ্লবের মধ্যে প্রকাশিত হয়। বাস্তব অবস্থার সঙ্গে আইনগত কাঠামোর সামঞ্জস্য বিধান বিপ্লবের পরেই হয়।"[1]

এই ফরাসি বিপ্লব সুনিশ্চিতভাবেই নবযুগের উপর অভ্যুদয় ঘটিয়েছিল। সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে পরিবর্তন শুধু ফ্রান্সে নয়, ইয়োরোপের অন্যত্রও প্রভাব ফেলেছিল। অষ্টাদশ শতকের শেষলগ্নে বিশ্ব ইতিহাসের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ফরাসি বিপ্লব।[2] কেন ফ্রান্সের বিপ্লব হলো আর কেনই বা রাজা সংকট সমাধানে ব্যর্থ হলেন অথবা কেনই বা ক্ষোভের স্ফুলিঙ্গ শেষপর্যন্ত বিপ্লবের দাবানলে পরিণত হলো, তা বুঝতে হলে পুরোনো সমাজের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকা বোঝা প্রয়োজন।

২। সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকা

সামাজিক কারণ ঃ ফ্রান্সের পুরাতন সামাজিক অবস্থা মধ্যযুগীয় বৈষম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সমগ্র সমাজব্যবস্থাকে মোট দু'টি ভাগে ভাগ করা হ'ত। একটি ছিল বিশেষ অধিকারভোগী (Privileged) এবং অন্যটি ছিল অধিকারবিহীন (Non-Privileged) শ্রেণী। এই অসাম্যের প্রতিষ্ঠানগতরূপ আমরা তিনটি 'এস্টেট' -এর মধ্যে দেখতে পাই। বিশেষ অধিকার-ভোগীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল ধর্মযাজক সম্প্রদায় এবং অভিজাত সম্প্রদায়।

---

1. সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী, ইয়োরোপের ইতিহাস, (1986), পৃ 90

2. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্র. G. Lefebvre, *The French Revolution*, 2 vols; A. Cobban, *A History of Modern France*, vol 2; *The New Cambridge Modern History*, vol. IX; G. Rude, *Revolutionary Europe*, E. J. Hobsbawn, *The Age of Revolution:* Europe 1789-1848; এবং A. Soboul, *Understanding the French Revolution* (Delhi edn, 1989).

যাজকরা প্রথম শ্রেণী (First Estate) এবং অভিজাতরা ছিলেন দ্বিতীয় শ্রেণীর (Second Estate) অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া ফ্রান্সের অন্য সকলেই যেমন— মধ্যবিত্ত, ব্যবসায়ী, বণিক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, অধ্যাপক, লেখক, বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক, কৃষক ও শ্রমিক ইত্যাদি তৃতীয় শ্রেণীর (Third Estate) অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হত। এই বিশেষ সুবিধাভোগী ও সুবিধাহীন শ্রেণীর মধ্যে সামাজিক অসাম্য বাড়তে বাড়তে রাজা ষোড়শ লুইয়ের সময় চরম আকার ধারণ করে। তবে তিনটি এস্টেটে ঠিক তিনটি সামাজিক শ্রেণী ছিল না। প্রত্যেকটি এস্টেটের মধ্যেও বৈষম্য অর্থাৎ উঁচু-নীচু ভেদ ছিল যা পুরাতন সামাজিকব্যবস্থাকে নতুন যুগের অনুপযোগী করে তুলেছিল। আর তৃতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল বুর্জোয়া (bourgeois = বহুবচন bourgeoisie) শ্রেণী, যারা শিল্প-বাণিজ্য ও আর্থিক কাজকর্মে জড়িত, শিক্ষিত, শহুরে এবং চেতনা-সম্পন্ন, ধনী এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষজন। অধ্যাপক লেফেভর দেখিয়েছেন যে, এই বুর্জোয়া শ্রেণীর উপরেই দার্শনিকদের প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি। সামাজিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার তাগিদ তাদের মধ্যেই ছিল সবচেয়ে বেশি।

ফরাসি সমাজ যে শুধু শ্রেণীবিভক্ত ছিল তাই নয় অর্থনৈতিক কারণেও সামাজিক বৈষম্য আরো প্রকট হয়ে উঠছিল। যাজক এবং অভিজাত সম্প্রদায় নানা রকম সুযোগ সুবিধা ভোগ করত অথচ তাদের কর বিশেষ দিতে হত না। অপরপক্ষে তৃতীয় এস্টেট অধিকার ভোগ না করলেও তারা ছিল কর ভারে জর্জরিত। অভিজাতগণ প্রত্যক্ষ কর এড়িয়ে যেত, 1614 খ্রিস্টাব্দ থেকে স্টেটস্ জেনারেল অধিবেশন না ডাকার ফলে তারা রাজনৈতিক অধিকার হারায়, কিন্তু তা সত্ত্বেও একচেটিয়া সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল। তাছাড়া পঞ্চদশ এবং ষোড়শ লুই এর আমলে অভিজাতগণ তাদের দম্ভ ও উন্নাসিকতার জন্য সাধারণ দরিদ্র মানুষতো বটেই, বুর্জোয়া শ্রেণীর থেকেও আলাদা হয়ে গিয়েছিল। যাজকদের মধ্যে ঊর্ধ্বতন যাজকগণ সমাজের উপরতলায় বসবাস করত। সুতরাং সামাজিক বৈষম্য এবং সেই বৈষম্য-প্রসূত বিদ্বেষ যে ফরাসি বিপ্লবের অন্যতম প্রধান কারণ এ বিষয় সন্দেহ নেই।

"কিসের থেকে বিপ্লব হলো?" এই প্রশ্নের উত্তরে নেপোলিয়ান বলেছিলেন, "অহমিকা— স্বাধীনতা তো অজুহাত মাত্র।" এই দম্ভ ও অহমিকা অর্থনৈতিক শ্রেণী বৈষম্য অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিল। *রাইকার* লিখেছেন, "The Revolution was an outcome of a struggle between classes, of a movement for social equality by the bourgeoisie।"[1] শ্রেণী বৈষম্য শুধু বুর্জোয়া শ্রেণীর আশা-আকাঙ্ক্ষায় প্রতিফলিত হয়েছিল এমন নয়। তাছাড়া আলবেয়ার সবুল বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে বুর্জোয়াদের

---

1. Riker, *A History of Europe*, p. 251

মধ্যে অনেক উপবিভাগ ছিল। তবে পুরোনো সমাজের সামাজিক কাঠামোর মধ্যে যে শ্রেণী বৈষম্য ছিল তা বিপ্লবকালীন সংগ্রামে স্বীকৃত।[1]

তবে শুধু শহুরে মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত ও সচেতন বুর্জোয়াদের দ্বারা সামাজিক প্রতিবাদই একমাত্র ফরাসি বিপ্লবের সামাজিক কারণের মধ্যে গণ্য নয়। এই বিপ্লবে সাধারণ জনতা যেমন বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল, তেমনি কৃষক শ্রেণীও সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে তাদের বহুদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল। ফ্রান্সের জনসংখ্যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছিল কৃষক। কৃষকদের সামাজিক দুরবস্থাও বিপ্লবের অন্যতম প্রধান কারণ।[2]

ফরাসি বিপ্লবের সামাজিক কারণের উপর জোরেস, মাতিয়ে, লেফেভর, সবুল প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ গুরুত্ব দিয়েছেন। এরা সকলেই ফরাসি ইতিহাসবিদ; অপরপক্ষে আমেরিকান ঐতিহাসিক আর. আর. পামার কিংবা ইংরেজ ঐতিহাসিক আলফ্রেড কোবান শ্রেণী বিভেদকে তেমন গুরুত্ব দেন নি। কিন্তু ফরাসি বিপ্লবের সামাজিক ব্যাখ্যার গুরুত্ব কমেনি। ফরাসি বিপ্লবের সামাজিক কারণ বা পটভূমিকা জানতে গেলে নানা শ্রেণী সম্বন্ধে আগে বিস্তারিত জানা দরকার।

প্রথম এস্টেট : প্রথম এস্টেটভুক্ত ছিল যাজক সম্প্রদায় (Clergy)। ফরাসি জাতি সাধারণত ছিল ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী। দেশের বিভিন্ন অংশে ছিল বহু রকমের মঠ ও গির্জা। ধর্মের নামে প্রদত্ত ভূমির উপর কর স্থাপন করা হত না। এই নিষ্কর জমি ও অর্থ ধর্মযাজকদের বিলাস ও আমোদ-প্রমোদে ব্যয় করা হত। তাছাড়া ফ্রান্সের অভিজাতদের মত যাজকরাও রাষ্ট্রসংক্রান্ত ব্যাপারে প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করতেন। ফলে যাজকগণ অপরাধ করলেও বিচারালয়ে বিচার প্রার্থনা করা সম্ভব হত না। তবে যাজকদের মধ্যেও উচ্চতর ও অধস্তন হিসেবে দুটি শ্রেণী ছিল। নিষ্কর ভূমি, অর্থ এবং রাজানুগ্রহ ভোগের অধিকারী ছিলেন উচ্চতর শ্রেণীর যাজকরা। অধস্তন যাজকরা ছিলেন দরিদ্র, অপাংক্তেয় এবং কোনও প্রকার পদোন্নতির আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকে বঞ্চিত। তাই বিপ্লবের সময় এই অধস্তন শ্রেণীর যাজকরা ছিলেন তৃতীয় শ্রেণীর সাথী।

প্রথম এস্টেট বলতে যাজক সম্প্রদায়কেই বোঝায়। তাদের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ কুড়ি হাজারের মতো। চার্চের এবং সম্প্রদায় হিসেবে যাজক শ্রেণীর প্রভূত প্রতিপত্তি ছিল। শুধু ধর্মের ক্ষেত্রে নয়, সামাজিক ও আর্থিক ক্ষেত্রেও এরা ছিলেন প্রভাবশালী। কারণ যাজকেরা বিশেষত উচ্চতর যাজকেরা ছিলেন বিত্তশালী। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী লিখেছেন, "চার্চের নিজস্ব সম্পত্তি ছিল প্রচুর। এই সম্পত্তির আয়

1. A Soboul, পূর্বোক্ত গ্রন্থে "Classes and Class Struggles during the Revolution" শীর্ষক অধ্যায়, পৃ 15–42.

2. The New Cambridge Modern History, vol VII, p. 101.

এবং কর থেকে আদায়ীকৃত অর্থ নিয়ে চার্চের হাতে প্রচুর পরিমানে ছিল। জমির মালিক হিসেবেই চার্চের আয় প্রায় বার্ষিক ১৩ কোটি লিভ্র। এছাড়া টিথ (Tithe) বা কর থেকেও প্রচুর আদায় হত। ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির ফলে চার্চের আয় সমানে বেড়েছে, কারণ করের অংশ খাদ্য শস্যেও নেওয়া হত। কিন্তু চার্চের দেয় প্রায় কিছুই ছিল না। প্রত্যক্ষ কর প্রদান থেকে তাদের অব্যাহতি ছিল। তারা শুধু একটি 'ইচ্ছামত দান' (Don Gratuit) ও দেসিম (Decime) বা ফ্রাঁর এক দশমাংশ সরকারকে দিত। এর মোট পরিমাণ ছিল মাত্র ৩৫ লক্ষ লিভ্র। শিক্ষাব্যবস্থার উপরেও চার্চের বাধাহীন প্রভাব ছিল। বিশাল সম্পত্তির এবং ভোগবাদী জীবনের ফলে মঠগুলিতে, এমনকি সাধারণ যাজকদের মধ্যেও, নৈতিক অবনতি স্পষ্ট।"[1]

কিন্তু সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এই প্রভাবশালী প্রথম এস্টেট বা যাজক সম্প্রদায়কে এক শ্রেণী বলা যায় না। ফরাসি বিপ্লবের সমসাময়িক আবে সিয়েস (Abbe Sieyes) তাই বলেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে যাজকেরা একটি সামাজিক শ্রেণী ছিল না। উচ্চপদে আসীন বা উচ্চতর যাজকেরা বিত্তবান এবং প্রভাবশালী ছিলেন। 39 জন বিশপ ছিলেন, যাঁরা সবাই অভিজাত বংশীয় এবং ধনী। স্ত্রাসবুর্গের বিশপের বার্ষিক আয় ছিল 4 লক্ষ লিভ্র। কিন্তু চার্চের নিম্ন সংগঠনগুলির ভারপ্রাপ্ত অধস্তন যাজকদের আয় ছিল খুব কম। তাছাড়া তাদের ছিল আয় কম, ব্যয় বেশি। দারিদ্র্য ছিল তাদের চিরসঙ্গী। তৃতীয় এস্টেটের সঙ্গেই তাদের মিল বেশি। অধস্তন যাজকদের সঙ্গে উচ্চতর যাজকদের শুধু পার্থক্যই ছিল না, বিদ্বেষ এবং সংঘাতও ছিল। সালভেমিনি-র মতে, এই বিবাদ বিপ্লবের সাফল্যের কারণ ("This dissension between the higher and lower clergy was one of the most potent causes leading to the early victory of the Revolution")।[2] নৈতিক সঙ্কট ও নিম্ন যাজকদের অসন্তোষ প্রথম এস্টেটের সংহতি একেবারে নষ্ট করে দিয়েছিল।

দ্বিতীয় এস্টেট ঃ সুবিধাভোগী হিসেবে দ্বিতীয় এস্টেটভুক্ত ছিলেন অভিজাত সম্প্রদায় (Nobility) যাদের স্বার্থপরতা, দুর্নীতি ছিল সর্বাধিক নগ্ন প্রকৃতির। ফরাসি সমাজে লর্ড পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেই তারা লর্ড হতে পারত। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের রাজা কোনও বিশেষ ব্যক্তিকে লর্ড উপাধি দান করলে তবেই তিনি লর্ড হতে পারতেন। ফ্রান্সের লর্ডরা ছিলেন জন্মসূত্র অভিজাত। তাই তাদের অহমিকা ও ঔদ্ধত্য ছিল অস্বাভাবিক। সামন্ততান্ত্রিক প্রথা অনুসারে তখনকার অভিজাতরাই ছিলেন ভূস্বামী, সেনানায়ক, বিচারক, শাসক এবং রাষ্ট্রীয় উচ্চপদের অধিকারী। তারা কোনও প্রকার কর প্রদানে বাধ্য ছিলেন না, অথচ বলপূর্বক শ্রম ও অবাঞ্ছনীয় কর আদায় করতেন। এক্ষেত্রে তারাই ছিলেন

1. সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ 91-92
2. The French Revolution p. 45.

বিচারক, তাই অপরাধীর অর্থদণ্ড অথবা জরিমানার সবটুকুই তাদের পাওনা হত। তাদের ক্ষেত-খামারে শ্রমজীবী মানুষকে বেগার খাটতে হত অথবা নামমাত্র পারিশ্রমিকে শ্রমদান করতে হত। সুতরাং তাদের উপর সাধারণ মানুষের বিক্ষোভ দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগল। অবশ্য অভিজাত সম্প্রদায়ের সকলের অবস্থা সমান ছিল না।

অভিজাত সম্প্রদায় সম্পর্কে আরও কিছু কথা বলা দরকার। অভিজাতবর্গ বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণী হলেও তারা ছিলেন যাজক শ্রেণীর পরে। সেই কারণে সামাজিক মাপকাঠিতে Second Estate বলা হত। তবে যাজকদের মধ্যে যেমন দুটি অংশ ছিল, অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যেও সব মানুষ সমান ছিল না। তাদের সামাজিক অবস্থাও সমান ছিল না। অভিজাতদের সংখ্যা ছিল প্রায় চার লক্ষের কাছাকাছি। প্রাদেশিক অভিজাতরা ছিল দরবারী অভিজাতদের থেকে একটু ভিন্ন ধরণের।

একধরনের অভিজাত সম্প্রদায় ছিল 'পোষাকী অভিজাত' (nobility of the robe)। তাদের আভিজাত্যের চিহ্ন ছিল পোষাক (Robe)। আবার অসিধারী অভিজাতরা (nobility of the sword) তাদের আভিজাত্যের চিহ্ন হিসেবে অসি বা তরোয়াল ধারণ করতেন। এছাড়া রাজা নতুন অভিজাত সৃষ্টি করতে পারতেন। অনেক ক্ষেত্রে রাজারা বিভিন্ন রাজপদের বিক্রয়মূল্য বৃদ্ধি করতেন এবং তা বিশেষ ক্রেতাকে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আভিজাত্যও দান করতেন। এমনকি এই আভিজাত্য বংশানুক্রমিকভাবেও দেওয়া হত। এই ধরণের অভিজাতরা প্রধানত বিত্তবান বুর্জোয়াদের মধ্য থেকেই আসত। এদের প্রতি জন্মগত অভিজাতদের একটা অবজ্ঞার ভাব থাকলেও আঠারো শতকের শেষে তা কমে আসে।

দুই ধরনের অভিজাতদের মধ্যে সম্পর্ক কেমন ছিল তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে নানা মত আছে। এ বিষয়ে *সুভাষরঞ্জন* চক্রবর্তী লিখেছেন, "*F Ford* বলেছেন যে, পুরোনো অভিজাত ও নতুন আভিজাত্যে উন্নীতদের মধ্যে খুব বেশী বিরোধ আর ছিল না। বস্তুত অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে অভিজাতেরা একদিকে সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে অন্যদিকে রাজার বিরুদ্ধে অনেকটাই ঐক্যবদ্ধ ছিল। কিন্তু *সম্প্রতি স্টোন* (Bailey Stone) দেখিয়েছেন যে ১৭৮০-র দশকেও অভিজাতদের দুটি ধারা সরকারের সঙ্গে বিরোধে, এমনকি পারস্পরিক আক্রমণেও লিপ্ত ছিলেন"।[1]

অভিজাত শ্রেণীর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল জন্মগত। মনে রাখা দরকার যে, বিপ্লবের আগে ফ্রান্সের এক-পঞ্চমাংশ জমির মালিক ছিলেন অভিজাতবর্গ। মোট আয়ের উপর কর বা তেই (Taille) থেকে তাদের অব্যাহতি ছিল। এছাড়া তারা অনেক ধরনের বিশেষ অধিকার ভোগ করতেন। সাধারণ মানুষদের জন্য বিচারালয়ে অভিজাত সম্প্রদায়ের বিচার করা যেত না, তাদের জন্য বিশেষ আদালত ছিল। তবে অভিজাত সম্প্রদায়ের সকলেই যে স্বাচ্ছন্দ্যে ছিল এমন নয়। তবুও অভিজাতদের সামরিক, রাজকীয়

---

1. সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ 93.

ও প্রশাসনিক উচ্চপদে একচেটিয়া অধিকার ছিল। তবে অভিজাত শ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষোভ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। রাজার সঙ্গেও তাদের দ্বন্দ্ব দীর্ঘদিনের। আবার অভিজাতরা নিজস্বার্থে রাজার বিরোধিতা করলেও তৃতীয় এস্টেটের সাধারণ জনগণের সঙ্গে তাদের বিরোধ এবং পার্থক্য ফরাসি সমাজকে দুর্বল করে দিয়েছিল।

তৃতীয় এস্টেট ঃ যাজক ও অভিজাত শ্রেণী ভিন্ন অন্য সমস্ত দেশবাসী ছিল সমাজের তৃতীয় শ্রেণীর (Third Estate) অন্তর্ভুক্ত। 1789 খ্রিঃ আবে সিয়েস প্রশ্ন করেছিলেন, 'তৃতীয় এস্টেট কি?' তিনি নিজেই তার উত্তর দিয়েছেন 'সব'। জনসংখ্যার 93 শতাংশ তৃতীয় এস্টেটের মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর মানুষ ছিলেন। যেমন বুর্জোয়া শ্রেণীর মানুষ। বিদ্যা, বুদ্ধি ও অর্থের বিচারে এঁরা ছিলেন ধর্মযাজক ও অভিজাতদের অপেক্ষা অনেক উর্ধ্বে। কিন্তু অধিকারপ্রাপ্ত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর হাতে ছিল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও সর্বপ্রকার সুবিধাভোগের সুযোগ সুবিধা। আর তৃতীয় এস্টেটের অন্তর্গত ছিলেন সমাজের শোষিত, সর্বহারা, অথচ সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণী। ফ্রান্সের ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা, চিকিৎসা ব্যবস্থা, আইন ব্যবসা, শিক্ষকতা, অধ্যাপনা ইত্যাদি ছিল এই তৃতীয় শ্রেণীর হাতে। বুর্জোয়া শ্রেণীর মানুষ ছিল স্বনির্ভর অথচ রাজনৈতিক ও আর্থিক প্রতিপত্তি থেকে বঞ্চিত। তারা দেশের শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা-সাহিত্য, গবেষণা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা ইত্যাদিকে যেমন বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, তেমনি আবার তাদেরই প্রদত্ত রাজস্বের দ্বারা রাজতন্ত্র, যাজক এবং অভিজাতদের বিলাসিতা অক্ষুণ্ণ ছিল। সুতরাং এই বৈষম্য স্বাভাবিকভাবে তৃতীয় শ্রেণীর মনে জাগিয়ে তুলেছিল বিদ্বেষ। তারা চেয়েছিলেন এই বৈষম্যের অবসান, আর তার জন্যে এদের কাছে বিপ্লব ছাড়া অন্য কোনও পথ খোলা ছিল না। তাই নেপোলিয়ানের বক্তব্য উল্লেখ করে বলা যায়, "অহমিকাবোধই বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করে, স্বাধীনতার দাবি বিপ্লবের অজুহাত মাত্র"। শ্রেণী বৈষম্যের অবসান, মধ্যবিত্তদের সামাজিক সমতা ও মর্যাদার দাবি ছিল ফরাসি বিপ্লবের অন্যতম কারণ। বুর্জোয়া এবং মধ্যবিত্তদের এই দাবির সমর্থনে এগিয়ে এসেছিল সমাজের সর্বনিম্ন পর্যায়ের শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর মানুষ। সমাজের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সুবিধাভোগী মানুষের দ্বারা তারাই ছিল সর্বাধিক শোষিত ও নির্যাতিত। শ্রমিকরা স্বল্প বেতনে অধিক পরিশ্রমে বণিক ও শিল্পপতিদের কারখানায় কাজ করত। আর কৃষকরা বিনা পারিশ্রমিকে ভূস্বামীদের খামারে, সুবিধাভোগীদের গৃহে বেগার খাটতে বাধ্য ছিল। এছাড়া ছিল শহরের খেটে-খাওয়া জনতা সাঁকুলোৎ, ব্রানু ইত্যাদি। মধ্যবিত্তদের দাবি এবং বিপ্লবের ভাবধারায় সচেতন শ্রমিক-কৃষকের স্বতঃস্ফূর্ত অংশ গ্রহণের পেছনে ছিল ফরাসি যাজক ও অভিজাতদের প্রতিক্রিয়াশীল আশা-আকাঙ্ক্ষা ও দুর্নীতিপূর্ণ কার্যকলাপ। গুডউইন তাই মন্তব্য করেছেন, "অভিজাতদের প্রতিক্রিয়াশীল আকাঙ্ক্ষার মধ্যেই ফরাসি বিপ্লবের আসল কারণ খুঁজতে হবে।"

তৃতীয় এস্টেটই ছিল সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ; এই শ্রেণীই আসলে ফরাসি জাতি, কারণ তারাই জনসংখ্যার 93 শতাংশ। অথচ তাদের সামাজিক অধিকার প্রায় নেই বললেই চলে। তবে যাজকদের মধ্যে যেমন দুই ভাগ ছিল, অভিজাতদের মধ্যে যেমন সকলে এক রকম ছিল না, তেমনি তৃতীয় এস্টেটের মধ্যেও বহু ভেদাভেদ ছিল— বিভিন্ন স্তরের বুর্জোয়া, কৃষক, নানা ধরণের শ্রমিক এবং ভবঘুরে পর্যন্ত। এদের মধ্যে আর্থিক তথা সামাজিক প্রভেদ ছিল। উচ্চ বুর্জোয়ারা মূলধনের অধিকারী ছিল এবং তারা ছিল প্রায় অভিজাতদের কাছাকাছি। কিন্তু মানসিকতা অর্থাৎ আভিজাত্যের অহংকার তাদের আঘাত দিয়েছিল। মনে রাখতে হবে যে জন্মগত আভিজাত্যের তুলনায় কর্মার্জিত বিত্তের সামাজিক মর্যাদা ছিল না। ফলে উচ্চ বুর্জোয়া শ্রেণীর উচ্চাশা বাধা প্রাপ্ত হয়। তবে সামাজিক বৈষম্য, হতাশা এবং রাজনৈতিক স্বৈরাচার উচ্চ-মধ্য-নিম্ন সকল বুর্জোয়াকেই এক করেছিল। যদিও অন্তর্নিহিত পার্থক্য ছিল।

তৃতীয় এস্টেটের নেতৃত্ব ছিল বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে। উচ্চ বুর্জোয়ারা বিত্তবান হয়েছিল ব্যবসা, বাণিজ্য ও কারিগর-ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার মাধ্যমে। কেউ কেউ রাজকর্মচারীও হতেন। বৃত্তিজীবী বুর্জোয়ারা ছিলেন মধ্যভাগে, তারাই সবচেয়ে শিক্ষিত এবং সচেতন। নিম্ন বুর্জোয়া ছিল দোকানদার ও কারিগর। সামাজিক দিক থেকে যা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো বুর্জোয়ারা দেখেছিল যে শিক্ষা ও বিত্ত সত্ত্বেও সমাজের উপরতলার দরজা তাদের জন্য বন্ধ। এছাড়া অধ্যাপক জর্জ লেফেভর দেখিয়েছেন যে, নতুন আলোকিত দর্শনের প্রভাব সবচাইতে বেশি পড়েছিল এই শ্রেণীর উপরে।

তৃতীয় এস্টেটের অন্তর্গত সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল কৃষক। তবে তাদের মধ্যেও অনেক ভাগ ছিল। কেউ জমির মালিক, কেউ কৃষক প্রজা, কেউ ভাগচাষী, কেউ ক্ষেতমজুর। পূর্ব ইয়োরোপের তুলনায় ফরাসি কৃষকদের অবস্থা ছিল ভালো। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় করের একটা বিরাট বোঝা কৃষকদের ঘাড়ে পাষাণভারের মতন চেপে বসেছিল। এছাড়া ছিল শ্রমিক, শহরের জনতা, এমনকি ভবঘুরে চালচুলোহীন মানুষ যাদের সাঁ কুলোৎ (Sans culottes) বলা হত। ঐতিহাসিক জর্জ রুদে ফরাসি বিপ্লবে জনতার (Crowd) ভূমিকার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন।

সামাজিক কারণের গুরুত্ব: ফ্রান্সের জমির এক-পঞ্চমাংশ ভোগ করত যাজক সম্প্রদায় এবং এক-তৃতীয়াংশ অভিজাতবর্গ, অথচ তাদের কোনও ভূমিকর দিতে হত না, যা দিতে হত ভূমিহীন গরিব কৃষক ও তৃতীয় সম্প্রদায়কে। বস্তুত সামাজিক ক্ষেত্রে বৈষম্য, অধিকারভোগী শ্রেণীদের কর থেকে রেহাই এবং অধিকারহীন শ্রেণীর উপর করের বোঝা চাপানোই বিপ্লবের মূল কারণ। অকারণ যুদ্ধ ও বিলাসপ্রিয়তা আর্থিক সংকট তীব্র করে তুলেছিল। এই আর্থিক সঙ্কটের ফলেই রাজা ষোড়শ লুই পার্লামেন্টের বা স্টেটস্ জেনারেলের

অধিবেশন ডাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। *জর্জ রুদে* সামাজিক কারণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। *ডেভিড টমসনের* মতে বিপ্লবের প্রাক্কালে ফ্রান্সের ভয়াবহ মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্য মূল্যবৃদ্ধি বিপ্লবের পথ তৈরি করেছিল। অনুরূপ মত মিশলে এবং লেফেভর-এরও। এছাড়া *লিও গারসয়* এর মতে, ফরাসি কৃষকদের বিপর্যয়ের মূলে তিনটি কারণ ছিল— ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, মূল্যবৃদ্ধি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এছাড়া সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য ও শোষণ অবশ্যই বিপ্লবের গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

অর্থনৈতিক কারণঃ ফরাসি বিপ্লবের সূত্রপাত ঘটে রাজা ষোড়শ লুইয়ের রাজত্বকালে (1774-1793) এবং অর্থনৈতিক সঙ্কটই ছিল বিপ্লবের প্রত্যক্ষ এবং তাৎক্ষণিক কারণ। আবার এই অর্থনৈতিক সঙ্কটের সূচনা হয়েছিল তাঁর পূর্বপুরুষ সর্বাধিক শক্তিশালী নরপতি চতুর্দশ লুইয়ের রাজত্বকালে (1643-1715)। পশ্চিম ইয়োরোপে প্রতিপত্তি বিস্তারের আশায় তিনি বার বার যুদ্ধে লিপ্ত হন। তাছাড়া তাঁর আমলে রাজসভার বিলাস ও জাঁকজমকতায় প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হত। এসব কারণে তাঁর রাজত্বের শেষ দিকে অর্থনৈতিক দুর্বলতা প্রকাশ পায়। পরবর্তী নরপতি পঞ্চদশ লুইয়ের রাজত্বকালে (1715-1774) যুদ্ধ ও বিলাসের ব্যয় কমা তো দূরের কথা বরং বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। কারণ তাঁর আমল থেকেই অধিকারপ্রাপ্ত (Privileged) প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর স্বার্থপর কার্যকলাপ সম্প্রসারিত হয়। আর রাজা ছিলেন অকর্মণ্য, বিলাসী এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ। ফলে সুবিধাভোগীদের ভোগে রাজকোষ শূন্য হলো। ফ্রান্সের অর্থনৈতিক সঙ্কট চরম অবস্থায় পৌঁছে গেল। এই সঙ্কটমুহূর্তে শুরু হলো ষোড়শ লুইয়ের রাজত্বকাল (1774-1793)। তিনি সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে পরাজয়ের গ্লানি থেকে মুক্তির আশায় আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রচুর অর্থ ব্যয় করলেন। কিন্তু শত চেষ্টা করেও এবং নতুন কর সংগ্রহের ব্যবস্থা ক'রেও অর্থসঙ্কট দূর করতে পারলেন না। অধ্যাপক গুডউইন তাই লিখেছেন যে, "ফরাসি বিপ্লবের প্রাক্কালে অর্থনৈতিক সমস্যার মূলকথা ছিল এই খরচের বোঝা কমানোর অসম্ভাব্য ব্যাপার।" নতুন কর ধার্য করে তা করা সম্ভব ছিল না। সরকারের আর্থিক অবস্থা সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়ল।

নানা প্রকার করঃ ফ্রান্সের আর্থিক সঙ্কটের অন্যতম একটি কারণ ছিল করভার বন্টনের অসাম্য। ফ্রান্সের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী অর্থাৎ ধর্মযাজক এবং অভিজাতরা কর প্রদানের দায়-দায়িত্ব থেকে প্রায় মুক্ত ছিল। সমগ্র রাজস্বের শতকরা মাত্র 4 ভাগ ধনী যাজক ও অভিজাতদের নিকট থেকে আদায় করা হত, আর অবশিষ্ট শতকরা প্রায় 96 ভাগ রাজস্বের ভার বহন করতে বাধ্য ছিল তৃতীয় শ্রেণীসহ শ্রমিক-কৃষক শ্রেণীর মানুষ। এক্ষেত্রে রাজাকে দিতে হত তেই (Taille) বা মোট আয়ের উপর দেয় কর; কাপিতাসিঁয় (Capitation)বা এক ধরণের উৎপাদন ভিত্তিক আয়কর; ভ্যাঁতিয়েম

(Vingtieme) বা সম্পত্তির উপর আয়কর। পরোক্ষ করের মধ্যে ছিল গাবেল (Gabelle) বা লবণ কর, এইদ (Aides) বা ভোগ্য পণ্যের উপর কর। তাছাড়া চার্চকে দিতে হত টিথ (Tithe) বা ফসলের দশ ভাগের একভাগ। সামন্ত প্রভুকে দিতে হত ত্যারাজ, সঁস, বানালিতে, শঁপার ইত্যাদি কর।

করভি ও অন্যান্য শোষণঃ দেশের রাস্তাঘাট নির্মাণ ও মেরামত করার জন্য কৃষক ও শ্রমিকদের বিনা পারিশ্রমিকে শ্রমদান করতে বাধ্য করা হত। এরূপ শ্রমদানের নাম ছিল 'করভি'। যাজক এবং অভিজাতদের গৃহে ও ক্ষেত খামারেও তাদের বেগার খাটতে হত। ফ্রান্সের প্রান্তিক চাষীদের অধিকারে জমিজমা ছিল না। বেষ্টনী আন্দোলনের (Enclosure Movement) ফলে ছোট ছোট ভূমিখণ্ডগুলিকে ভূস্বামীরা দখল করে। ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের মত বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষির উন্নয়নের উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা গৃহীত হয়। এর ফলে কৃষিকাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত কৃষকের হাতে জমির কোনও অধিকারই ছিল না। এসব কিছুর পরিণতির ফলে ফ্রান্সের কৃষক সমাজ এক প্রকার ধ্বংসের সম্মুখীন হলো।

আর্থিক ব্যবস্থার ত্রুটিঃ ফ্রান্সের বিপ্লবের আগে আর্থিক ব্যবস্থাই ছিল প্রচন্ড বিশৃঙ্খলার মধ্যে। এর জন্য ছিল দীর্ঘদিনের পটভূমি। চতুর্দশ লুইয়ের জাঁকজমক ও আঠারো শতকের বিভিন্ন যুদ্ধের ফলে রাজকোষ শূন্য হয়ে পড়েছিল। 1763 থেকে 1788-র মধ্যে যুদ্ধের জন্য খরচ হয়েছিল প্রায় 20 কোটি স্টার্লিং পাউন্ড। 1774 খ্রিস্টাব্দে রাজা ষোড়শ লুইয়ের আমলে অর্থমন্ত্রী তুর্গো (Turgot) যুদ্ধব্যয় সম্পর্কে রাজাকে বলেছিলেন, "আর একটি কামান দাগা হলেই রাষ্ট্র দেউলিয়া হয়ে যাবে।" এই অবস্থা থেকে উন্নতির জন্য আর্থিক সংস্কারের চেষ্টা তো হয়ই নি, বরং যুদ্ধের খরচাপাতি এবং রাজসভার ও উচ্চশ্রেণীর মানুষদের আড়ম্বর পূর্ণ ব্যয় বাহুল্যের সঙ্গে যুক্ত হলো সুবিধাভোগী শ্রেণীর করভার থেকে অব্যাহতি।[1] ফ্রান্সের বিভিন্ন ধরনের করের কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিপ্লবের আগে ফ্রান্সের আর্থিক সঙ্কটের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল করভারের অসম বন্টন। অর্থাৎ যারা কর দিতে সমর্থ ছিল তাদের অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল আর যারা দিতে অপারগ বা সামর্থ্য কম তাদের উপর প্রায় সমস্ত করের বোঝা চাপানো হয়েছিল। এক কথায় সরকারের আয়-ব্যয়ের মধ্যে কোনও সামঞ্জস্য ছিল না। একমাত্র উপায় ছিল সুবিধাভোগী শ্রেণীর উপর কর চাপিয়ে আর্থিক সংকট থেকে মুক্তি কিন্তু অভিজাতগণ ও উচ্চ যাজকগণ নিজেদের অধিকার ছাড়তে প্রস্তুত নয়। পুরাতন ব্যবস্থার পরিবর্তন না হলে অবস্থার উন্নতি ছিল অসম্ভব। তাই আর্থিক সংকট বিপ্লবকে তরান্বিত করেছিল।

1. সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ 102.

কর সংগ্রহের ত্রুটি ঃ ফ্রান্সের অর্থ সংকটের অন্যান্য কারণের মধ্যে কর সংগ্রহ সংক্রান্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ছিল নানা ধরণের ত্রুটি। প্রথমতঃ, রাজভাণ্ডারে পৌঁছবার মত রাজস্বের পরিমাণ ছিল নিতান্ত কম। দ্বিতীয়তঃ, আদায়ীকৃত রাজস্বের বড় অংশ ব্যয় করা হত রাজসভা ও রাজপরিবারের বিলাস ও জাঁকজমকতার উদ্দেশ্যে। তৃতীয়তঃ, অসৎ সরকারি কর্মচারীরা (Intendent) অধিকাংশ আদায়ীকৃত অর্থ আত্মসাৎ করত। এজন্যই বলা হয় যে, ফরাসি বিপ্লবের মূল কারণ অর্থনৈতিক অব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত। এই ত্রুটিপূর্ণ কর ব্যবস্থার জন্যই অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ ফ্রান্সকে 'ভ্রান্ত অর্থনীতির যাদুঘর' আখ্যা দিয়েছেন।

শুধু এই বললে যথেষ্ট নয় যে ফ্রান্স ছিল ভ্রান্ত অর্থনীতির যাদুঘর এবং এজন্য কর ব্যবস্থা ও তার অসম বন্টনই দায়ী। অষ্টাদশ শতক থেকে ক্রমাগত ঘটে চলেছিল মূল্যবৃদ্ধি, খাদ্য সংকট, রাজস্ব হ্রাস এবং মুদ্রাস্ফীতি। এজন্য বলা হয়েছে, "উৎপাদন ব্যবস্থায় বড় রকমের পরিবর্তন করা বর্তমান সামাজিক আর্থনীতিক কাঠামোর মধ্যে মুস্কিল ছিল। ফ্রান্সে ঐক্যবদ্ধ জাতীয় বাজার ছিল না। বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে অনেক শুল্কের বৈষম্য ছিল। উৎপন্ন ফসলের ওপরে জীবন যাত্রা নির্ভর করত। বাণিজ্য ভিত্তিক শিল্পের রপ্তানীর ক্ষমতা প্রায় নগণ্য। শিল্প মূলত আভ্যন্তরীণ বাজার ও পরিবর্তনশীল কৃষির ওপরে নির্ভর করত। আবার জমিতে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার কোনও পরিবর্তন হচ্ছিল না।[1] অধ্যাপক *ডেভিড টমসন* দেখিয়েছেন যে বিপ্লবের প্রাক্কালে ফ্রান্সে মুদ্রাস্ফীতি ভয়াবহ আকার ধারণ করে এবং পণ্য সামগ্রীর মূল্য 65 শতাংশ বৃদ্ধি পায় অথচ সেই অনুপাতে আয়বৃদ্ধি ঘটেনি। রুটির মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়াতে অবস্থা সঙ্গীন হয়ে ওঠে। তাছাড়া 1788 থেকে ফ্রান্সে ফসলহানি হওয়াতে গণবিক্ষোভ, দাঙ্গা, কৃষি বিদ্রোহের প্রকাশ ঘটে।[2]

ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেকেই বিপ্লবের অর্থনৈতিক পটভূমিকা ও তার তাৎপর্য বিশেষভাবে স্বীকার করেছেন। তাঁদের মতে অর্থনৈতিক সঙ্কটের সঙ্গে বিপ্লবের যোগ প্রত্যক্ষ ও গভীর। লাব্রুস প্রচুর তথ্য ও পরিসংখ্যানের সাহায্যে অর্থনৈতিক সঙ্কটের চেহারা তুলে ধরেছেন। উৎপাদন কৃষিক্ষেত্রে বৃদ্ধি যে একদম বাড়েনি এমন নয়, তুতঁ্যা বা ল্য রোয়া লাদুরি-র মতন ফরাসি ঐতিহাসিকগণ তা দেখিয়েছেন। তবে লেফেভর ও তার অনুগামীরা দেখিয়েছেন যে অর্থনৈতিক সঙ্কটের সত্যতা কোনও ক্রমেই অস্বীকার করা যায় না।

---

1. সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ 102-103
2. David Thomson, *Europe Since Napoleon,* পেঙ্গুইন সং, লন্ডন, 1971, p 28

৩। দার্শনিকদের ভূমিকা

ফরাসি বিপ্লবের আগেই ঘটে যায় ভাবজগতের বিপ্লব। ফরাসি বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করতে দার্শনিক চিন্তাধারা বিশেষ সাহায্য করেছিল। অষ্টাদশ শতকের জ্ঞানদীপ্তির যুগে ফ্রান্সে প্রতিভাবান এবং উদারভাবাপন্ন বহু দার্শনিক এবং লেখক (ফিলজফ) আবির্ভূত হয়েছিলেন যাঁরা সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্মীয় জীবনে নানা অসাম্য ও অনাচারের বিরুদ্ধে তাদের লেখনীর মাধ্যমে তীব্র সমালোচনার দ্বারা এক বৈপ্লবিক ভাবতরঙ্গের সৃষ্টি করেছিলেন। একথা স্বীকার্য যে দার্শনিকগণ অসন্তোষের বিরুদ্ধে চিন্তা-চেতনার স্ফুলিঙ্গ যুগিয়ে বিপ্লবের বহ্নি জ্বালিয়ে দেন, তবে অন্যদিকে একথাও সত্য যে দার্শনিকদের ভূমিকা মূল্যবান হলেও সেগুলি বিপ্লবের প্রত্যক্ষ কারণ নয়। এ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে যথেষ্ট বিতর্ক আছে। মন্তেস্কু, ভলতেয়ার, রুশো প্রমুখ দার্শনিকদের কথা এবং 'ফিজিওক্র্যাট', 'এনসাইক্লোপিডিস্ট' প্রমুখ ফিলজফ গোষ্ঠীর মতামত এই ক্ষেত্রে আলোচনা করা দরকার।

কিংসলি মার্টিন তাঁর গ্রন্থে (French Liberal Thought in the Eighteenth Century) বিপ্লবের আগেকার দার্শনিকদের নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এখানে বলা দরকার যে অষ্টাদশ শতকের নতুন চিন্তার প্রধান কেন্দ্র ছিল ফ্রান্স, তবে ইয়োরোপের অন্যান্য দেশেও নতুন চিন্তার ক্ষেত্রে এক নবীন যুগের সূচনা হয়েছিল। আঠারো শতকে চিন্তার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক সূচনা ও তার বৈশিষ্ট্যকে বলা হয় জ্ঞানালোক বা জ্ঞানদীপ্তি, ইংরেজিতে বলে এনলাইটেনমেন্ট। দর্শনচিন্তায় এর প্রভাব পড়ে। নতুন দর্শন সংস্কারের ও শৃঙ্খলের বন্ধন থেকে মানুষের মুক্তির সূচনা করেছিল। স্বভাবতই এর প্রভাব ছিল ব্যাপক।

মন্তেস্কু (1689–1755) ছিলেন জন্মসূত্রে অভিজাত এবং জীবিকায় বিচারক। তিনি কিছুকাল ইংল্যান্ডে বসবাস করেন। এই সময় ইংল্যান্ডের চিন্তাশীল ও রাজনীতিবিদ জন লক স্বেচ্ছাচারী শাসকের বিরুদ্ধে প্রজার ন্যায়সঙ্গত অধিকার রক্ষার দাবি প্রচার করেন। তখন থেকেই তিনি ইংল্যান্ডের নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের বিধানগুলি লক্ষ্য ক'রে অনুপ্রেরণা লাভ করেন। 1748 খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর '*দ্য স্পিরিট অফ লজ*' গ্রন্থে তিনি আইন, বিচার ও শাসন বিভাগের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য বিধানের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন। তাঁর মতে ইংল্যান্ডের রাষ্ট্রব্যবস্থা ছিল যুক্তিভিত্তিক এবং সর্বোত্তম। এই শাসনতন্ত্রই এনেছে সে-দেশে ব্যক্তি স্বাধীনতা। অন্যদিকে ফরাসি দেশের ঈশ্বরপ্রদত্ত ক্ষমতায় বিশ্বাসী স্বৈরতন্ত্রী শাসনে ব্যক্তি স্বাধীনতার লেশমাত্র ছিল না। তাছাড়া ফরাসি দেশের প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় ধর্ম ছিল সর্বাধিক ত্রুটিপূর্ণ। তাঁর লেখা 'দি পার্সিয়ান লেটার্স' গ্রন্থে তিনি প্রচলিত সমাজব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেছেন। এই দুখানি গ্রন্থই ফরাসি জাতির মনে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। মন্তেস্কু (ফরাসি উচ্চারণ মঁতেস্ক্যু, Montesquieu) বরদোর

এক অভিজাত পরিবারে জন্মেছিলেন; কিছুদিন কাকার কাছ থেকে উত্তরাধিকারীসূত্রে পাওয়া পদে স্থানীয় পার্লামঁতে কাজও করেছিলেন। ইংল্যান্ডে থাকাকালীন তিনি তিনটি বিষয়ের দ্বারা প্রভাবিত হন— জন লকের রচনা। লক ছিলেন রাষ্ট্রের উৎপত্তি বিষয়ে সামাজিক চুক্তির অন্যতম প্রবক্তা। তাঁর লেখা গ্রন্থ Essay on Human Understanding, (1691)। দ্বিতীয়তঃ, মন্তেস্কু নিয়মতান্ত্রিক বা সাংবিধানিক রাজতন্ত্র (Constitutional Monarchy) দেখে উদ্বুদ্ধ হন। এবং তৃতীয়তঃ, গৌরবময় বিপ্লব (Glorious Revolution) দ্বারা ইংল্যান্ডে শাসন পরিবর্তনের প্রভাব তার উপর পরে। ফলে তার লেখা 'লেত্‌র পেরসান'(1721) এবং 'দ্য লিস্প্রি দে লোয়া' (দ্য স্পিরিট অফ লজ,1748) গ্রন্থে অভিজ্ঞতা ও পান্ডিত্যের ছাপ স্পষ্ট। তিনি স্বৈরতন্ত্রের পরিবর্তন চেয়েছিলেন।

ভলতেয়ার (Voltaire) অষ্টাদশ শতকে সমগ্র ইয়োরোপীয় সাহিত্য জগতের মধ্যমণি ছিলেন (1694-1778)। তিনি কাব্য, ইতিহাস, নাটক, সাহিত্য, প্রবন্ধ ইত্যাদি সর্ববিষয়ে পারদর্শিতা দেখাতে সক্ষম হন। তাঁর ক্ষুরধার লেখনী যে-কোনও বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে বিদ্রুপাত্মক আঘাত হানতে পারত। খ্রিস্টধর্মের প্রচলিত প্রথা সম্পর্কে সমালোচনা ক'রে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি প্রবল আঘাত হানতে সমর্থ হন। তাই তাঁর লেখনী সহজে ফরাসি জাতির মনে বিপ্লবী প্রেরণা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। ভলতেয়ার (ফরাসি উচ্চারণ ভলতের) আসলে ছদ্মনাম, তাঁর প্রকৃত নাম ফ্রাঁসোয়া মারি আরুয়ে। তার বিখ্যাত দুখানি গ্রন্থ হলো 'ফিলজফিক্যাল লেটার্স' এবং 'কাঁদিদ'। ভলতেয়ার বা ফ্রাঁসোয়া মারি আরুয়ে জন্মেছিলেন পারী শহরে। পিতা ছিলেন একজন সম্পন্ন বুর্জোয়া। মন্তেস্কুর মতন তিনিও ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন (1746 খ্রিঃ)। তিনি ঈশ্বরবাদী (Theist) অথচ তাঁর যাজক বিরোধিতা সমাজে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। বিবেকের স্বাধীনতা, কর্ম ও চিন্তার মুক্তি ছিল তাঁর কাম্য। ব্যঙ্গের কশাঘাতে সমাজকে উন্মুক্ত করে দেওয়া, চার্চের দুর্নীতিকে তুলে ধরা ইত্যাদির মাধ্যমে ভলতেয়ার সম্ভবত পুরোনো ব্যবস্থার সামজিক অবিচারের উপর সব থেকে বেশি আলোকপাত করেন।

রুদে, উইলার্ট প্রমুখ যেমন বলেছেন দার্শনিকরা জনগণের মনের আশা -আকাঙ্ক্ষাকেই ভাষা দিয়েছেন, সে কথা ঠিক। বস্তুতঃ দার্শনিকদের প্রভাব যে শিক্ষিত শ্রেণীর উপর ছিল তা' অনস্বীকার্য। সমাজের দ্বন্দ্ব ও ক্ষতই দার্শনিকরা দেশবাসীর কাছে তুলে ধরেছিলেন।

জাঁ জ্যাক রুশো (Jean Jacques Rousseau)**ঃ যুক্তিবাদী দর্শনের অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন জাঁ জ্যাক রুশো (1712-1778)। তিনি তাঁর '*সামাজিক চুক্তি*'(Social Contract) নামক গ্রন্থে আধুনিক গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। তাঁর মতে শাসকের অধিকার শাসিতের ইচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি রাজার ঈশ্বরপ্রদত্ত ক্ষমতাকে নস্যাৎ করেন। জনগণের সম্মতি (General Will) রাষ্ট্রশাসনে রাজাকে অধিকার দান করে। রুশোর এই বক্তব্য প্রচলিত রাজ ক্ষমতার বিরুদ্ধে সরাসরি বিপ্লবের প্রেরণা জাগালো।**

আবার প্রচলিত সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে তিনি বললেন, "মানুষ জন্মে স্বাধীন, কিন্তু বাস্তব জীবনে সে সর্বদা শৃঙ্খলিত।" রুশোর এইসব কথা ফরাসি জাতি তথা ইয়োরোপবাসীর মনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করল। *জাঁ জ্যাক রুশো* ছিলেন বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী। ব্যক্তিজীবনে নিঃসঙ্গ এই মানুষটি সম্ভবত অষ্টাদশ শতকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী। প্রজাতন্ত্রের পক্ষে তাঁর পক্ষপাত ছিল। তাঁর কথা 'সামাজিক রাষ্ট্র তখনই সুবিধাজনক, যখন প্রত্যেকেরই কিছু থাকে এবং কারোরই বেশী থাকে না।' সমাজের ভিত্তি হবে স্বাধীনতা ও সাম্য, তাঁর এই বক্তব্যে তৃতীয় এস্টেট নিজেদের মনের কথা খুঁজে পেয়েছিল। তাঁর "সামাজিক চুক্তি" (ফরাসি—কন্ত্রা সোসিয়াল) সম্পর্কিত তত্ত্বটি মূল কথা হলো কোনও এক প্রাচীন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির সম্মিলিত ইচ্ছার ফলে সমাজ বা রাষ্ট্র এক নতুন সম্ভাবনা হিসাবে জন্ম নেয়। সুতরাং এটা এক সামাজিক চুক্তি। এখানে ব্যক্তিগত ইচ্ছা নয়, সামাজিক ইচ্ছাই বড়ো, যা সম্মিলিত ইচ্ছা। এর প্রকাশ ঘটে আইনের মাধ্যমে।

এছাড়া *দিদেরো* (Diderot) এবং *দালেমবেয়ার* (D'Alembert) প্রমুখ লেখকগণ সতেরো খণ্ডে বিভক্ত বিশ্বকোষ প্রকাশ করলেন। প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস, রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং অন্ধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা ছিল বিশ্বকোষে। ঠিক একই সময়ে *ফিজিওক্র্যাটস* (Physiocrats) নামে এক শ্রেণীর অর্থনীতিবিদ্ অবাধ বাণিজ্য নীতির পক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন। ফরাসি দেশের শিল্প-বাণিজ্য ছিল রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে। ফিজিওক্র্যাটগণ বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষির ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বিরোধী ছিলেন। এই গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন *ফ্রাঁসোয়া কোয়েসনে* (Francois Quesnay), *দুঁপ দ্য নমুর* (Dupont de Nemour) প্রমুখ। ফরাসি বিপ্লবের পূর্বেই এইসব সাহিত্য জাতির মনে বিপ্লবী চিন্তাধারার প্রসারের সহায়ক হলো। বস্তুত শুধু মন্তেস্কু, ভলতেয়ার বা রুশো নয়, জ্ঞানালোকের যুগে ফ্রান্সে অনেক দার্শনিক লেখক আবির্ভূত হন। যেমন দেনিস দিদেরো (Diderot, 1713–1784) সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তার দিক থেকে অনেক বেশি চরমপন্থী, ঐহিক সুখ তাঁর কাছে প্রধান। ফলে কিছু পরিমাণে নাস্তিক ও বস্তুবাদী। বিশ্বকোষ রচয়িতাগণ বা *এনসাইক্লোপিডিস্টদের* মধ্যে তিনি এবং *দালেমবেয়ার* (D'Alembert, 1717–1783) এক নতুন জগৎ খুলে দেন। বিজ্ঞান, শিক্ষা এবং সাহিত্যিক অভিধান হিসেবে বিশ্বকোষ 1751 থেকে 1780র মধ্যে পঁয়ত্রিশ খণ্ডে ছাপা হয়। জনমানসে এর প্রচুর প্রভাব ছিল। আবার কোয়েসনে, নমুর প্রমুখ ফিজিও ক্র্যাটগণ মার্কেন্টাইল মতবাদ আক্রমণ করে অবাধ নীতি (Laissez faire) চেয়েছিলেন। শিল্পের উপর গুরুত্ব না দিয়ে তারা কৃষি উৎপাদনকে বাড়াতে চেয়েছিলেন। এই গোষ্ঠীও ফ্রান্সে প্রভাবশালী ছিল। আবার মন্তেস্কু, ভলতেয়ার, রুশো প্রমুখ দার্শনিক, বিশ্বকোষ রচয়িতাগণ, ফিজিওক্র্যাট বা অর্থনৈতিক লেখকগণ ছাড়াও এলভেতিয়ুস, লা মেত্রি, হলবাখ, কাঁদিলাক, মরেলি, মাবালি প্রমুখ অনেক দার্শনিক ফ্রান্সে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহন করেন।

মূল্যায়নঃ যাই হোক, ফরাসি দেশে বিপ্লব ঘটানোর ক্ষেত্রে বিপ্লবী সাহিত্য এবং দর্শনের প্রভাব সম্পর্কে ঐতিহাসিক মতভেদও লক্ষ্য করা যায়। ঐতিহাসিক মর্স স্টিফেনস (Morse Stephens) বলেন, "ফরাসি বিপ্লবের কারণ ছিল প্রধানতঃ অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক, কিন্তু দার্শনিক ও সামাজিক নয়"।[1] *ডেভিড টমসন*-এর মতে ফরাসি বিপ্লবের সঙ্গে দার্শনিকদের চিন্তাধারার যোগ ছিল ক্ষীণ ও অপ্রত্যক্ষ। জোরেস, লেফেভর, লাব্রুস্ এবং মাতিয়ে বিপ্লবকে মূলগতভাবে আদর্শের সংঘাত এবং শ্রেণীবিভক্ত সমাজে অধিকার অর্জনের সংগ্রাম হিসেবে দেখেছেন। কিন্তু রুশতা, তেন, ম্যালে দার্শনিকদের প্রভাবকে স্বীকার করেছেন। প্রকৃত অর্থে সে-যুগে প্রচার মাধ্যমগুলি যেমন জোরালো ও কার্যকরী ছিল না, তেমনি দেশের মধ্যে শিক্ষার সম্প্রসারণও হয়নি। সুতরাং দার্শনিকদের মতামত জনসাধারণের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। তবে যেসব নেতৃত্ব অসংগঠিত জনগণকে বিপ্লবের পক্ষে সংগঠিত করেছিলেন তাঁদের উপর সমকালীন দর্শনের প্রভাব ছিল। তাই দার্শনিক ভাবধারাকে বিপ্লবের প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে গণ্য না করে পরোক্ষ কারণ হিসেবে গণ্য করাই যুক্তিযুক্ত। সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে বিপ্লবের ভিত্তি প্রস্তুত হয়েছিল, তা সৃষ্ট হয়েছিল স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণে অর্থাৎ রাজনৈতিক কারণে আর দার্শনিকগণ সেই-বৈষম্য ও অনাচারের দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেন— যুক্তি দিয়ে তাঁরাই পুরোনো ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি তুলে ধরেন। বিপ্লবের বস্তুগত কারণের সঙ্গে বিপ্লবী মানসিকতা তৈরি করার ক্ষেত্রে দার্শনিকদের ভূমিকা নিতান্ত কম নয়।

ফরাসি বিপ্লবের সঙ্গে দার্শনিকদের ভূমিকার যোগসূত্র নিয়ে আরও দু-চার কথার পর এই প্রসঙ্গে ইতি টানা যেতে পারে। ম্যালে তাঁর ফরাসি বিপ্লব বিষয়ের গ্রন্থে লিখেছেন দার্শনিকগণ ছিলেন নতুন ভাবধারায় উদ্দীপ্ত ও আশাবাদী। মাঁদেলা লিখেছেন যে, পুরোনো সমাজের ভিত্তি ছিল ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা। দার্শনিকগণ ঠিক এর বিরুদ্ধেই সমালোচনা করে বিপ্লবের পথ তৈরি করেন। *তেন* -এর মন্তব্য France drank the poison of philosophy অর্থাৎ দর্শনের ভাবধারায় উদ্বেলিত হয়েই ফ্রান্স বিপ্লবের পথে যায়। অবশ্য একথা যথার্থ নয়। বস্তুত বিপ্লবের পশ্চাতে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কারণ ছিল প্রধান। বাস্তব পরিস্থিতিই আসল। তাছাড়া *ডেভিড টমসন* ঠিকই দেখিয়েছেন যে বিপ্লবের সূত্রপাত দার্শনিকদের দ্বারা হয়নি; দার্শনিকদের চিন্তা প্রাধান্য পায় বিপ্লব চলাকালীন। তবু একথা অনস্বীকার্য যে, বাস্তব পরিস্থিতিই ছিল আসল। একথা মেনে নিয়েও বলতে হবে যে দার্শনিকগণ সেই বাস্তব অবস্থার দিকে, অসাম্য ও শোষণের দিকে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিপ্লবের পথ সুগম করেছিলেন।

---

1. "The causes of the movement was chiefly economical and political, not philosophical and social"—*M. Stephens*

৪। রাজতন্ত্রের দায়িত্ব

ফরাসি বিপ্লবের কারণ প্রসঙ্গে রাজনৈতিক কারণ হিসেবে বুরবোঁ রাজতন্ত্রের দায়িত্ব ছিল সর্বাধিক। পূর্বেই বলা হয়েছে, ফ্রান্সের সর্বাধিক শক্তিশালী চতুর্দশ লুইয়ের আমল (1643-1715) থেকে দেশে অর্থনৈতিক সংকট সূচিত হয়। তাঁর আমলেই যুদ্ধের জন্য এবং রাজসভার বিলাস ও জাঁকজমকতার জন্য অঢেল অর্থ ব্যয় করা হত। তবে শক্তিশালী নরপতি হিসেবে তিনি নিজের আমলে এসবের মোকাবিলা করতে সক্ষম হন; কিন্তু চতুর্দশ লুই ছিলেন চূড়ান্ত স্বৈরাচারী রাজা। তিনি নিজেকে রাজ্যের সর্বোচ্চ শাসক শুধু মনে করতেন এমন নয়, তিনি মনে করতেন, 'আমিই রাষ্ট্র'। বস্তুত ফ্রান্সের পুরোনো ব্যবস্থায় রাজতন্ত্রের দুর্বলতা ছিল প্রকট। অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত ও স্বৈরাচারী এই রাজতন্ত্র পঞ্চদশ লুইয়ের রাজত্বকালে (1715–1774) আরও বেশি সংকটের সম্মুখীন হয়। এরপর ফ্রান্সের অর্থনৈতিক সংঘর্ষ চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল রাজা ষোড়শ লুইয়ের রাজত্বকালে (1774–1793)। ফরাসি বিপ্লবের রাজনৈতিক কারণ বলতে তৎকালীন শাসনতন্ত্র, রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং সংকট দূরীকরণে রাজতন্ত্রের ব্যর্থতাই বোঝায়। বলা বাহুল্য, এর জন্য রাজতন্ত্রই দায়ী ছিল।

ফরাসি রাজতন্ত্রের বহুবিধ দুর্বলতা ঃ প্রথমতঃ, বুরবোঁ (Bourbon) বংশীয় রাজারা ছিলেন নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। কোনও জ্ঞানদীপ্তি তাদের উপর বিন্দুমাত্র প্রভাব ফেলতে পারে নি। দ্বিতীয়তঃ, স্বৈরতন্ত্রে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল রাজার হাতে, এমনকি 1614 থেকে পরবর্তী 175 বছর রাজারা ফরাসি পার্লামেণ্ট বা জাতীয় সভা, যার নাম ছিল স্টেটস্ জেনারেল, তার অধিবেশন পর্যন্ত ডাকেন নি। তবে এই সংসদেও ছিল শ্রেণী-ভিত্তিক ভোট অর্থাৎ যাজক, অভিজাত এবং তৃতীয় সম্প্রদায়ের প্রত্যেকের একটি ক'রে ভোট। প্রতিনিধিদের প্রত্যেকের মাথা পিছু ভোট নয়। তৃতীয়তঃ, রাজশক্তির দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে উচ্চতর যাজক ও অভিজাত শ্রেণী বিশেষ সুবিধা ভোগ করত। চতুর্থতঃ, দরবারি বিলাসিতার প্রাচুর্য, প্রশাসনিক জটিলতা, অকারণ যুদ্ধ, আইনের শাসনের অনুপস্থিতি রাজতন্ত্রকে দূর্বল করে দেয়।

এই সূত্রগুলিকে আরও বিস্তৃত করা যেতে পারে। সতেরো শতকেই সম্রাট চতুর্দশ লুই এবং মন্ত্রী তথা রাজনীতিজ্ঞ কার্ডিরনাল বিশলু, ম্যাজারিণ প্রমুখ ফরাসি রাজতন্ত্রকে শুধু স্বৈরাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেনি, রাজতন্ত্র ঈশ্বর-প্রদত্ত বা দেবদত্ত ক্ষমতার উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। 'আমিই রাষ্ট্র' বলার মধ্যে চতুর্দশ লুইয়ের সেই দম্ভ এই ক্ষেত্রে মনে পড়ে। আবার সম্রাটের অপ্রতিহত ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য 1614 থেকে ফ্রান্সের পার্লামেন্ট বা স্টেটস্ জেনারেল ডাকা বন্ধ হয়ে যায়। নিয়মানুসারে ফরাসি দেশে স্টেটস্ জেনারেলের অধিবেশন ডাকার অধিকার ছিল একমাত্র রাজার। ফ্রান্সের বুরবোঁ বংশীয় রাজারা সেই সুযোগ নিয়েছিলেন। ফলে স্বৈরতন্ত্রের যে বীজ পোঁতা হয়,

তা পঞ্চদশ ও ষোড়শ লুইয়ের সময় আরও বেড়ে যায়। প্রতিনিধি সভা না থাকায় জনকল্যাণের কোনও প্রচেষ্টা হয়নি, জনগণের ইচ্ছা কখনও শাসনকার্যে প্রতিভাত হয়নি। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে, ইয়োরোপে অষ্টাদশ শতকে জ্ঞানদীপ্তির প্রভাবে প্রাশিয়ার দ্বিতীয় ফ্রেডারিক, অস্ট্রিয়ার দ্বিতীয় যোসেফ এবং রাশিয়ার দ্বিতীয় ক্যাথারিন প্রমুখ রাজা-রাণী প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচার (Enlightened Despotism) নীতি গ্রহণ করলেও ফ্রান্সে প্রজাহিতৈষণার কোনও ব্যাপার ছিল না। ইতিহাসবিদ *স্কেভিল* তাই লিখেছেন, "স্টেটস্ জেনারেলের অধিবেশন বন্ধ থাকার ফলে সাধারণ লোকের অসুবিধা ও অভিযোগের কথা সম্রাটের কাছে পৌঁছোনো সম্ভব ছিল না এবং সম্রাটের পক্ষেও সাধারণ প্রজাদের অবস্থার কথা বোঝা সম্ভব ছিল না। ফলতঃ বুরবোঁ রাজবংশের শাসনতন্ত্র ছিল বৃহত্তর জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন।"

ডেভিড টমসন ঠিকই লিখেছেন যে, "ফরাসি রাজতন্ত্র ছিল সামন্ততান্ত্রিক রাজতন্ত্র যা শতাব্দী-প্রাচীন রাজা, অভিজাত, যাজক এবং তৃতীয় এস্টেটের মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল ছিল।"[1] টমসন আরও লিখেছেন, "This theoretically absolute monarchy was in practice powerless to effect the changes that most urgently needed making"। তাছাড়া বুরবোঁ রাজতন্ত্র আইনত সর্বশক্তিমান ছিল ঠিকই কিন্তু বাস্তবে সম্রাট অভিজাত ও যাজক শ্রেণীর উপর নির্ভর করতেন। অভিজাত শ্রেণী সরকারি ক্ষমতা কিছুটা হস্তগত করেছিল। বিশেষ অধিকার বা 'প্রিভিলেজ' রক্ষা করার ব্যাপারে তারা ছিলেন বিশেষ তৎপর। ইতিহাসবিদ নর্মান হ্যামসন তাই লিখেছেন যে, "শাসন ব্যবস্থায় অভিজাত শ্রেণীর অনুপ্রবেশের ফলে অবাঞ্ছিত ফলাফলের সৃষ্টি করে।"[2] বিখ্যাত ইতিহাসবিদ *জর্জ লেফেভর* মন্তব্য করেছেন যে, "ফরাসি রাজতন্ত্র ছিল ইংল্যাণ্ডের সাংবিধানিক রাজতন্ত্র ও ইয়োরোপীয় মহাদেশের স্বৈরতন্ত্রের মাঝামাঝি স্তর।"[3] তদুপরি ফরাসি সম্রাটগণ অনেকেই ছিলেন বিলাসী, পরিশ্রম বিমুখ। পঞ্চদশ লুইয়ের চারিত্রিক দোষও ছিল। ষোড়শ লুই সৎ এবং সদিচ্ছাপরায়ন হলেও ব্যক্তিত্বহীন। তাঁর অযোগ্যতার কারণেই রাণী মারি আঁতোয়ানেত বিশেষ প্রভাবশালিনী হন।

বুরবোঁ বংশীয় নরপতি ষোড়শ লুই ফ্রান্সের এক সঙ্কটময় মুহূর্তে ফ্রান্সের সিংহাসনে বসেন। প্রজার মঙ্গলের জন্য তাঁর সদিচ্ছা ছিল; কিন্তু সেই ইচ্ছাকে কাজে পরিণত করার মত মানসিক দৃঢ়তা ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতা তাঁর ছিল না। অন্যদিকে তিনি ছিলেন রাণী মারিয়া আতোঁয়ানেতের দ্বারা প্রভাবিত। আতোঁয়ানেত ছিলেন অস্ট্রিয়ার রাণী

1. "The French monarchy was a feudal monarchy, based on the centuries-old accumulation of feudal relationships between king, aristocracy, clergy and all the rest of the population known as the 'Third Estate' —ডেভিড টমসন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ 26

2. দ্র. Norman Hampson, *A Social History of the French Revolution*, Lond, 1963

3. G. Lefebvre পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ 88

মারিয়া টেরেসার কন্যা। বিলাসিনী, অভিমানিনী এবং দাম্ভিক প্রকৃতির এই রাণী দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে ছিলেন দক্ষ; কিন্তু ফরাসি দেশ ও জাতি সম্পর্কে ছিলেন অনভিজ্ঞ। সুতরাং বিলাসে মত্ত রাণীর প্রভাব ও পরামর্শ শীঘ্রই সাম্রাজ্যের সঙ্কট ত্বরান্বিত করল।

ফ্রান্সের বিপ্লবের পিছনে ফরাসি রাজতন্ত্রের দায়িত্ব বলতে গিয়ে ঐতিহাসিকরা দেখিয়েছেন রাজা দৈব-অধিকারে বিশ্বাসী, স্বৈরতান্ত্রিক এবং অকর্মণ্য ছিলেন। ফরাসি রাজাদের আরও সীমাবদ্ধতা ছিল। ফ্রান্সের চার্চ ছিল স্বয়ং-শাসিত সংস্থা। তাই সম্রাট চার্চের আভ্যন্তরীণ শাসনে হস্তক্ষেপ করতে পারতেন না। চার্চের বিপুল ভূ-সম্পত্তির উপর করও ধার্য করতে পারতেন না। যাজকেরা গির্জার ভূমির উপর স্বেচ্ছা কর দিতেন। দ্বিতীয়তঃ, ফ্রান্সের প্রদেশগুলিতে যে প্রতিনিধি সভা বা পার্লামেন্ট (ফরাসি উচ্চারণ পার্লমঁ) ছিল সেগুলির নির্দেশ ছাড়া সম্রাটের কোনও নির্দেশ প্রদেশগুলিতে কার্যকর করা যেত না। পার্লামেন্ট ইচ্ছে করলে প্রস্তাবিত আইনকে নাকচ পর্যন্ত করতে পারত। আসলে পুরোনো সমাজে রাষ্ট্রব্যবস্থার সংস্কার সহজ সাধ্য ছিল না। ক্রমশই আঠারো শতকে পার্লামেন্টগুলি অভিজাত শ্রেণীর হাতে রাজার স্বৈরাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। একদিকে সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণীর স্বার্থপরতা ও দূর্নীতি ও অন্যদিকে রাজাদের অক্ষমতা রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি করে। এর ফলে তেমনি রাজারা দূর্নীতি দমনে ব্যর্থ হয়েছিলেন। *ফিশার* তাই মন্তব্য করেছেন, "The Revolution came because the king failed to solve the question of privilege," অভিজাতদের বিশেষ সুবিধা বন্ধের ক্ষমতা রাজার ছিল না। *মাদেলা* (Madelin) তাই লিখেছেন যে, "ফরাসি রাজতন্ত্রই বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল।"

ফরাসি বিপ্লবের রাজনৈতিক কারণ বলতে হলে শুধুমাত্র রাজতন্ত্রের দায়িত্ব বললে চলবে না, ফরাসি রাষ্ট্রের স্বরূপও জানতে হবে। একথা ঠিকই যে, পুরোনো ব্যবস্থার রাজনৈতিক ভিত্তি ছিল রাজতন্ত্র। একদিকে অভিজাত শ্রেণীকে দাবিয়ে নিরঙ্কুশ রাজকীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল অন্য দিকে রাজার ক্ষমতার উপর মধ্যযুগীয় প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা বর্তমান ছিল। যেমন সাংবিধানিক মর্যাদা ছিল গ্যালিকান চার্চ বা ফরাসি ক্যাথলিক চার্চের, তেমনি পার্লামেন্টের বা প্রাদেশিক প্রতিনিধি সভার।

পার্লামেন্ট (পার্লমঁ) রাজার আইন নথিভুক্ত করত। কিন্তু আঠারো শতকে রাজতন্ত্রের ক্রমবর্ধমান দুর্বলতার সুযোগে পার্লামেন্ট প্রতিবাদের (Remonstrances) অধিকার প্রয়োগ করত। পার্লামেন্টগুলির ছিল সর্বোচ্চ রাজকীয় বিচারালয়। এরকম বারোটি পার্লামেন্ট ছিল। তার মধ্যে প্যারিসের পার্লামেন্ট ছিল সব থেকে শক্তিশালী। পঞ্চদশ লুই পার্লামেন্ট ভেঙে দিলেও অভিজাতদের চাপে ষোড়শ লুই সেগুলিকে আবার উজ্জীবিত করেন। পার্লামেন্টের সদস্যপদ রাজার কাছ থেকে যেত, আবার উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যেত। সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী লিখেছেন, "পার্লমঁ নতুন সদস্য নিতে পারত। সদস্য নিয়োগে রাজার

হস্তক্ষেপের অধিকার ছিল না। সুতরাং পার্লমঁর সদস্যেরা অনেকদিনই রাজার নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল এবং রাজার দুর্বলতার সুযোগে পার্লমঁ নিজের অধিকার রক্ষায় বিশেষ সচেষ্ট হয়। বিচারব্যবস্থার উৎস রাজা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা পরিষ্কার। বিচার ব্যবস্থা ছিল জটিল এবং বিশৃঙ্খল। বিশেষ সুবিধা থাকার ফলে বিচার বা আইনের শাসন সম্পর্কে সাধারণ মানুষের আস্থার অভাব ছিল।"[1]

এখানে বলা দরকার, রাজা কোনও নতুন আইন জারি করলে তা পার্লামেন্টগুলিতে নথিভুক্ত করতে হত, নতুবা আইন বৈধ হত না। পার্লামেন্টগুলির বিচারকগণ ছিলেন অভিজাত শ্রেণীর। পার্লামেন্ট ইচ্ছা করলে রাজার প্রস্তাবিত আইনকে নাকচ করতে পারত। অভিজাতরা তাদের বিরুদ্ধে কোনও আইন রাজা করলেই তা নথিবদ্ধ করত না। এর ফলে আইনটি বৈধ হতনা। রাজা অবশ্যই Lit de Justice বা রাজকীয় অধিবেশনের আহ্বান করে এই প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করতে পারতেন। কিন্তু পার্লামেন্টের সভায় নিজে সভাপতিত্ব করে Lit de Justice প্রয়োগ করে অভিজাতদের চটাতে রাজা চাইতেন না। প্যারিসের পার্লামেন্ট -এর অভিজাত শ্রেণীর সদস্যরা ছিলেন খুবই শক্তিশালী। তারা মন্ত্রী তুর্গোর প্রস্তাবিত মৌলিক সংস্কারের ব্যবস্থা কার্যকর হতে দেয় নি। সুতরাং একথা বলা যায় যে, পার্লামেন্ট বা অভিজাত বিচার সভাগুলি শক্তিশালী ছিল।

প্রশাসনিক কাঠামোতেও পুরোনো ব্যবস্থার প্রভাব থাকাতে নতুন প্রয়োজন ভিত্তিক সংস্কার সহজ সাধ্য ছিল না। চতুর্দশ লুইয়ের আমল থেকেই শাসন ব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত হয়, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনব্যবস্থা শিথিল হয়। "কেন্দ্রীয় বা স্থানীয় শাসনব্যবস্থায় কর্তা ছিল রাজা বা রাজপ্রতিনিধি। কেন্দ্রে শাসন চলত রাজপরিষদ বা দশজন মন্ত্রীর মাধ্যমে। দশজন মন্ত্রীর মধ্যে চ্যান্সেলর, রাষ্ট্রীয় সচিব ও আর্থিক নিয়ামক ছিল। মন্ত্রীরা নিজের নিজের বিভাগে থাকতেন। এঁদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার অভাব ছিল। ফলে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব দেখা দিত। বাজেট তৈরী অর্থাৎ আয়-ব্যয়ের অগ্রিম হিসাব রচনার কোন ব্যবস্থা ছিল না। ষোড়শ লুই এর আমলে প্রচলিত ব্যবস্থার অবনতি প্রকট হয়েছিল। রাজার নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা স্পষ্টতই অনুপস্থিত ছিল।"[2]

রাজতন্ত্রে অপদার্থতা ছাড়াও ভার্সাই রাজপ্রাসাদের বিলাসী জীবনযাত্রা ও রাজপরিবারের অমিতব্যয় ফরাসি জনগণকে রাজতন্ত্রের উপর বিরূপ করে তুলেছিল। রাজপ্রাসাদে দাসদাসী ও রাজকর্মচারী ছিল প্রায় দু'হাজার। আঁতোয়ানেতের সহচরীর সংখ্যাও ছিল প্রায় পাঁচশো। এছাড়া ছিল প্রায় দুশো ঘোড়া ও শকট। উৎসব হত প্রায়শই। সব মিলে বিপুল অর্থ ব্যয় হত।

---

1. সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ 100–101
2. সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ 101.

আঠারো শতকে দুর্নীতিপূর্ণ শাসননীতির জন্য বুরবোঁ রাজতন্ত্রের কোনও মহিমা অবশিষ্ট ছিল না। সরকারি কর্মচারীগণ এবং বিচারকগণ ছিলেন দুর্নীতিপরায়ণ। বিচার ব্যবস্থা ছিল খুবই ত্রুটিপূর্ণ। লেতর দ্য গ্রাস (Lettre de grass) এবং লেতর দ্য ক্যাশে (Lettre de cachet) দ্বারা নাগরিকদের অধিকার খর্ব করা হয়। প্রথমটি দ্বারা ক্ষমতা প্রয়োগ করে রাজা আদালত দ্বারা প্রদত্ত শাস্তি মকুব করতে পারতেন। আর দ্বিতীয়টির দ্বারা বিনা বিচারে যে কাউকে কারাগারে আটকে রাখতে পারতেন। লেতর দ্য ক্যাশে প্রয়োগ করে হাজার হাজার লোককে বিনাদোষে বিনা বিচারে বাস্তিল দুর্গে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। সেইজন্য বিপ্লব শুরু হওয়ার মুহূর্তে জনতা ক্ষেপে গিয়ে বাস্তিল দুর্গ আক্রমণ করে।

এছাড়া প্রদেশগুলিতেও দুর্নীতি ছিল। এ বিষয়ে বলা হয়েছে যে, "ফ্রান্সের প্রদেশগুলি দুভাগে বিভক্ত ছিল— পেই দেতা (Pays d'etat) এবং পেই দেলেকসিয়ঁ (Pays d'ele'ction)। প্রথমটিতে রাজার ক্ষমতা অবিসংবাদী ছিল না। এখানে প্রাদেশিক এস্টেট বা তার মনোনীত কর্মচারীর উপরে ইনটেনড্যান্ট (Intendant)দের পুরো কর্তৃত্ব ছিল না। অন্যত্র রাজপ্রতিনিধির ক্ষমতা নিরঙ্কুশ। অষ্টাদশ শতকের শেষে স্থানীয় শাসনের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের উপর দোর্দন্ডপ্রতাপ ছিল ইনটেনড্যান্টদের। বিচারব্যবস্থা থেকে শুরু করে সাধারণ প্রশাসন, পুরসভা, বাণিজ্য, শিল্প, কৃষিব্যবস্থা এবং রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ের ওপরে ইনটেনড্যান্টদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল।"[1] তাদের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় শক্তি বিভিন্ন প্রদেশে ছড়িয়ে ছিল ঠিকই কিন্তু এই কর্মচারীগণ ছিল ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতন অর্থলোলুপ। জনগণের দুর্গতিরও শেষ ছিল না।

সুতরাং রাজতন্ত্রের ব্যর্থতাই বিপ্লবের পথ তৈরি করে। তবে *ডেভিড টমসন* লিখেছেন যে, রাজনৈতিক সঙ্কট বিপ্লবের সূচনা করলেও রাজনৈতিক সঙ্কট একমাত্র সামাজিক ও অর্থনৈতিক সঙ্কটের পরিপ্রেক্ষিতেই ব্যাখ্যা করতে হবে।[2]

৫। বিপ্লবের অগ্রগতি ও অভিজাত বিদ্রোহ থেকে গণ আন্দোলন

ফরাসি বিপ্লবের সূচনা ঠিক কোন ঘটনা থেকে হলো বলা মুশকিল। বিপ্লবের ঘটনাক্রম অনুসরণ করলে দেখা যায় যে এর দুটি স্তর ছিল। প্রথম পর্বে ঘটে অভিজাত বিদ্রোহ এবং পরে ঘটে গণ বিপ্লব। অভিজাত বিদ্রোহের (Aristocratic Revolt) উপর অতিরিক্ত জোর দেওয়া যায় না, যদিও রাজার বিশেষ ক্ষমতা বনাম অভিজাত শ্রেণীর বিশেষ অধিকার ছিল দ্বন্দ্বের মূল কারণ। রাজা যখন শেষ পর্যন্ত স্টেটস্ জেনারেল

1. সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ 101.

2. "The political crisis of 1789, which started the course of events that made the revolution, is explicable in this setting of deep economic and social crisis"– D. Thomson, op.cit, p. 28

ডাকতে বাধ্য হলেন, অভিজাত শ্রেণী ঘোষণা করল যে, কর বসাবার অধিকার একমাত্র স্টেটস্ জেনারেলের, তখনই বিপ্লবের সূচনা বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু অচিরেই দেখা গেল মূল দ্বন্দ্ব প্রথম দুই এস্টেটের সঙ্গে তৃতীয় এস্টেটের। এই দ্বন্দ্ব থেকেই যখন বিক্ষোভ ফেটে পড়ল তখনই শুরু হয় গণ বিপ্লব (Popular Revolts)। এর মধ্যে আবার দুটি দিক দেখা যায়, প্যারিস শহরে গণ বিক্ষোভ এবং গ্রামীণ বিদ্রোহ। প্রকৃত বিচারে ফরাসি বিপ্লব শুরু হয় এই গণ বিক্ষোভের ঘটনাক্রমের মধ্যে দিয়ে।

গুডউইনের মতে, "1789 খ্রিস্টাব্দের ফরাসি বিপ্লবের প্রত্যক্ষ কারণ কৃষকদের অর্থনৈতিক অসন্তোষ বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক অসন্তোষের মধ্যে না খুঁজে, ফরাসি অভিজাতদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার মধ্যে খুঁজতে হবে"।[1] ফরাসি বিপ্লবের অন্যতম নায়ক রোবস্পিয়ের বলেছিলেন যে বিপ্লব ছিল এক 'ক্রমিক বিবর্তন'। প্রথমে বিপ্লব শুরু করে অভিজাতগণ, যাজকগণ অর্থাৎ ধনীরা, জনগণ পরে রঙ্গমঞ্চেঅবতীর্ণ হয়।[2] সুতরাং রাজা, অভিজাত যাজক এবং জনসাধারণ— এই তিন পক্ষের মধ্যে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ ঘটায় অভিজাতরাই, তৃতীয় এস্টেটের অনেকে প্রথমে তাদের সঙ্গে ছিল; পরে বিপ্লবের পাদপ্রদীপে সামনে চলে আসে বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত গরিব, কৃষক ও অন্যান্য জনতা। লেফেভরও তাই লিখেছেন, "The French Revolution was started and led to victory in its first phase by the aristocracy". পরে অবশ্য প্রথম দুই এস্টেট নিজেদের অধিকার আঁকড়ে থাকতে চাইলে এবং সংস্কারে বাধা দিলে তৃতীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাদের সংঘাতই ফরাসি বিপ্লবের প্রধান ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। ম্যালেদ্যু পানের ভাষায়, 1789 এর জানুয়ারি মাস থেকে রাজা, স্বৈরতন্ত্র এবং সংবিধান গৌণ প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়— "Now it is war between the third Estate and the other two orders!" যাই হোক, প্রথমে অভিজাত বিদ্রোহ এবং পরে গণ বিপ্লবের নানা ধারা জানতে হলে বিপ্লবের অগ্রগতি বুঝতে হবে। অভিজাত বিদ্রোহের পিছনে ছিল আর্থিক সঙ্কট। সুতরাং আর্থিক সঙ্কটের চিত্রটি আগে দেখে নেওয়া দরকার।

ষোড়শ লুইয়ের সিংহাসনে আরোহণের সময় ফ্রান্সের রাজকোষ ছিল শূন্য। রাজস্বের আয় এবং সরকারি ব্যয়ের ঘাটতি ছিল প্রবল। এই অবস্থা দূর করার একমাত্র উপায় ছিল কাঠামোগত মৌলিক সংস্কার। করের বোঝা, বিলাসব্যসন, অমিতব্যয়িতা, বাণিজ্যের অবনতি যে সংকট সৃষ্টি করেছিল তা দূর করার জন্য রাজা তুর্গো (Turgot)কে অর্থমন্ত্রী

---

1. A. Goodwin, The *French Revolution*, Lond, 1953, p 1.

2. "It begins with the nobles, the clergy, the wealthy, whom the people supports when its interests coincide with theirs in resistance to the dominant power, that of the monarchy. Thus it was that in France the Judiciary, the nobles, the clergy, the rich gave the original impulse to the revolution. The people appeared only later" রোবস্পিয়েরর উক্তির জন্য দ্র. *A. Cobban, A History of Modern France*, Penguin, 1981, p 137.

করেন। তিনি 1776 খ্রিস্টাব্দে ছ'টি প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এই সব প্রস্তাবে প্যারিস সহ রাজ্যের সর্বত্র অবাধে খাদ্য শস্য বিক্রি করা ও রপ্তানি করা; ব্যয়সঙ্কোচের জন্য অপ্রয়োজনীয় কর্মহীন সরকারি পদগুলি লোপ করা, রাজপরিবারের ব্যয় সংকোচ করা, সরকারি বেতনভুক কর্মচারিবৃন্দের জীবনযাত্রার ব্যয় সঙ্কোচ করা, কর ধার্যের ব্যাপারে প্রাদেশিক সভাগুলির অনুমোদন নেওয়া বন্ধ করা, কর্ভি প্রথা বা বেগার প্রথার অবসান এবং আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগান দেওয়া, ইত্যাদির সুপারিশ করেন। ফলে অভিজাতগণ বিক্ষুব্ধ হয় এবং তাদের ও রাণী মারিয়া আতোঁয়ানেতের বিরোধিতার ফলে ষোড়শ লুই তুর্গোকে পদচ্যুত করেন। অর্থসংকট আরও তীব্র হ'লে সম্রাট নেকার (Necker)কে অর্থমন্ত্রী করেন। তিনিও রাজপরিবারের ব্যয় সংকোচ ও সুবিধাজনক শর্তে নতুন কর ধার্য করার প্রস্তাব দিলে পুনরায় অভিজাত শ্রেণী ও রাণীর চাপে নেকারকে পদচ্যুত করা হয়। পরবর্তী অর্থমন্ত্রী হন ক্যালন (Calonne)। তিনি দেখলেন, দেশ ঋণে ডুবে আছে অথচ যাজক ও অভিজাতরা সমহারে কর প্রদানের বিরুদ্ধে। তবুও তিনি সরকারি ঋণের কিছু অংশকে নাকচ ক'রে ব্যয়ভার লাঘব, নতুন ভূমিকর ধার্য ক'রে সকলের উপর প্রয়োগ, সারা দেশে লবণ ও তামাকের উপর সরকারি একচেটিয়া প্রবর্তন, খাদ্যশস্যের ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি ইত্যাদি প্রস্তাব করেন। যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায় এযাবৎকাল কর থেকে অব্যাহতি পেয়ে আসছিল; তারা অসম্মত হবে জেনে তিনি রাজাকে বিশিষ্টদের পরিষদ (Council of Notables) গঠন ক'রে তার পরামর্শ নিতে বলেন। তাঁর আশা ছিল এরা বাস্তব পরিস্থিতি বিচার ক'রে কর প্রদান ব্যবস্থায় স্বীকৃত হবে। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় এস্টেট থেকে বিশিষ্টদের নিয়ে গড়া ক্যালনের পরিষদ প্রস্তাবগুলি নাকচ করে। উপরন্তু রাজা ষোড়শ লুই ক্যালনকে পদচ্যুত করতে বাধ্য হন (1887 খ্রিঃ)। এরপর অর্থসচিব হলেন ব্রিয়েন (Brienne)। তাঁর পরামর্শে রাজা বিশিষ্টদের পরিষদ ভেঙে দিলেন এবং ব্রিয়েন তাঁর কর প্রস্তাবের কাঠামোগত সংস্কারের পাশাপাশি সুপারিশগুলি প্যারিসের সর্বোচ্চ বিচারালয় বা পার্লামেন্ট অফ প্যারিস-এর কাছে উপস্থিত করলেন। বিচারকগণ রাজকীয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে হলেও তারা অভিজাত শ্রেণীর লোক। পার্লামেন্ট দু-একটি সাধারণ সংস্কার মেনে নিলেও স্ট্যাম্প ও ভূমির উপর প্রত্যক্ষ সর্বজন-প্রযোজ্য কর বাতিল করে দিল। তারা জানিয়ে দেয় যে কর ধার্য করতে পারে একমাত্র 'স্টেটস্ জেনারেল' (3rd May 1788)। রাজাও প্রত্যুত্তরে পার্লামেন্টের হাত থেকে আইন নথিভুক্ত করবার ক্ষমতা ও রাজস্ব-সংক্রান্ত মতামত দেওয়ার অধিকার কেড়ে নিলেন। ফলে অভিজাত, যাজক (এবং কোথাও কোথাও বুর্জোয়ারাও হাত মিলিয়েছিলেন) সম্প্রদায় বিদ্রোহ করলেন (মে, 1788)। মাতিয়ে একে বলেছেন অভিজাত বিদ্রোহ, লেফেভর বলেছেন অভিজাত বিপ্লব।

অভিজাত বিদ্রোহ ঃ অভিজাতদের বিদ্রোহ বস্তুত তাদের শ্রেণীস্বার্থ বজায় রাখার সংগ্রাম। সুবিধা বা 'প্রিভিলেজ' বজায় রাখা এবং রাজতন্ত্রের উপর প্রথম দুই এস্টেটের আধিপত্য প্রতিষ্ঠাই ছিল লক্ষ্য। এরফলে কোথাও সংঘর্ষ হলো। ব্রিয়েন পদত্যাগ করলেন (24 আগস্ট, 1788)। পুনরায় নেকারকে আনা হলো। ঐতিহাসিক লেফেভর মন্তব্য করেছেন যে, "ফরাসি বিপ্লবের প্রাথমিক পর্যায়ে ফরাসি অভিজাতরাই বিপ্লব শুরু করে এবং জয়ী হয়।" কথাটির তাৎপর্য এই যে, 1789 খ্রিস্টাব্দের পয়লা মে নেকার জানান যে জাতীয় সভা বা স্টেটস্ জেনারেল ডাকা হবে এবং তাতে রাজা ষোড়শ লুই সম্মত হন।

যখন তুর্গো, নেকার, ক্যালন, ব্রিয়েন প্রমুখ অর্থমন্ত্রী একের পর এক পদচ্যুত হলেন তখনই অভিজাতদের সুবিধাবাদী নীতি প্রকট হয়ে উঠেছিল। রাজতন্ত্র ছিল দুর্বল, আর্থিক সঙ্কট চরমে এবং এই পরিস্থিতিতে সুবিধাভোগী শ্রেণী অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় এস্টেট অভিজাত বিদ্রোহের সূচনা করেছিল। 1788 এর 3 মে প্যারিসের পার্লামেন্ট একটি ঘোষণা দ্বারা আইনী বিদ্রোহের সূচনা করল। কারণ এর আগে রাজা পার্লামেন্টের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে পার্লামেন্টে রাজকীয় অধিবেশন অর্থাৎ Lit de Justice দ্বারা কর প্রস্তাব পাশ করবার চেষ্টা করেছিলেন। অরলেয়ঁ (Orleans) -এর ডিউক এবং আরও দুই সদস্য ঘোষণা করেন রাজকীয় অধিবেশন অবৈধ। প্রত্যুত্তরে রাজা ঐ তিনজনকে প্যারিস থেকে নির্বাসিত করেন। এর ফলেই পার্লামেন্টের সদস্যগণ ক্ষিপ্ত হয় 3rd মে (1788) ঘোষণা করল— (১) রাজতন্ত্র বংশগত (২) কর ধার্যের অধিকার একমাত্র স্টেটস্ জেনারেলের (৩) কোনও ফরাসি নাগরিককে ইচ্ছে মতন গ্রেপ্তার বা কারারুদ্ধ করা যাবে না (৪) বিচারকদের অপসারণ করা যাবে না এবং (৫) প্রদেশগুলির ঐতিহ্যগত অধিকার অলঙ্ঘনীয়। প্রত্যুত্তরে রাজা বলপূর্বক দুজন সদস্যকে গ্রেপ্তার করেন এবং 4th মে (1788) জোর করে ছটি অনুশাসন নথিভুক্ত করেন এবং পার্লামেন্টের হাত থেকে আইন নথিভুক্ত করার ক্ষমতা কেড়ে নেন। এবার বিরোধ প্রকাশ্য সংঘর্ষে রূপান্তরিত হয়।

এরপরই শুরু হয় অভিজাত বিদ্রোহ। পার্লামেন্টের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে প্যারিস এবং নানা প্রদেশে প্রতিরোধ আন্দোলন সংগঠিত হয়। কোথাও রাজবাহিনীর সঙ্গে অভিজাতদের সংঘর্ষ, কোথাও জনতা ইনটেনডেন্টদের বন্দী করে রাখে। 1788 এর 21 জুলাই অভিজাত ও যাজকগণ তৃতীয় এস্টেটের বুর্জোয়া প্রতিনিধিদের সঙ্গে একত্রে ভিজিই-তে (Vizille) সভা করেন এবং স্টেটস্ জেনারেল আহ্বান ও পার্লামেন্টের পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবি করা হয়। 1788 এর 24 আগস্ট ব্রিয়েন পদত্যাগ করলেন এবং এর আগেই তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে 1789 এর 1st মে স্টেটস্ জেনারেল আহ্বান করা হবে। রাজা ষোড়শ লুই অভিজাত শ্রেণীর দাবির কাছে নতি স্বীকার করলেন।

অভিজাত বিদ্রোহ থেকে সাধারণ মানুষের বিপ্লবঃ *শাতোব্রিয়াঁ* মন্তব্য করেছিলেন যে, প্যাট্রিসিয়নগণ (অভিজাতরা) যে বিপ্লবের সূচনা করেছিল, তা সম্পূর্ণ করেছিলেন সাধারণ মানুষ বা প্লিবিয়ানগণ। কথাটির তাৎপর্য এই যে, 175 বছর পরে বুরবোঁ বংশীয় রাজা ষোড়শ লুই স্টেটস্ জেনারেলের বা জাতীয় প্রতিনিধি সভার অধিবেশন ডাকতে বাধ্য হলেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে কর বসাবার ক্ষমতা ঐ সভার, রাজার নয়। এই দাবি রাজা মানতে বাধ্য হয় অভিজাত বিদ্রোহের ফলে। কিন্তু স্টেটস্ জেনারেলের অভ্যন্তরে সামাজিক শ্রেণী বৈষম্যের চিহ্ন ছিল প্রকট। সেখানে মাথা পিছু ভোট ছিল না— ছিল সম্প্রদায় বা এস্টেট পিছু ভোট, ফলে যাজক-অভিজাত মিলে হত দুই, তৃতীয় সম্প্রদায় এক।

ষোড়শ লুই যখন 1788 খ্রিস্টাব্দের 8th আগস্ট ঘোষণা করেন যে আগামী বৎসর 1789 এর 1st May স্টেটস্ জেনারেল ডাকা হবে তখনই তা ছিল রাজতন্ত্রের পরাজয়।[1] রাজার স্বৈরাচারী কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে অভিজাতরা সোচ্চার হলেও তৃতীয় এস্টেট -এর দ্বারাই সম্মিলিত প্রতিরোধের কার্যকারিতা বিস্তার লাভ করে। তবে প্রথম দিকে অভিজাত বিদ্রোহ জনগণের বিশেষত আইনজীবী ও অন্যান্য বৃত্তিভোগী বুর্জোয়া শ্রেণীর সমর্থন পেয়েছিল। কিন্তু পরে শ্রেণী স্বার্থই তাদের পৃথক করে দেয়।

1788 এর 23 September প্যারিসের পার্লামেন্ট প্রস্তাব নেয় যে (1) স্টেটস্ জেনারেলে আগের মতই তিনটি এস্টেট আলাদা কক্ষে বসবে; আলাদা সিদ্ধান্ত নেবে, (2) 1614 খ্রিস্টাব্দের মতই তিনটি আলাদা শ্রেণীর জন্য ভোট হবে, (3) কোন এক শ্রেণী প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিলে প্রস্তাব কার্যকর হবে না। অর্থাৎ প্রতি এস্টেটের ভোট একটি, সদস্যদের মাথা পিছু নয়। বলা বাহুল্য, এর ফলে অবস্থা আদৌ বদলালো না। রাজার ক্ষমতা কমলেও বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীর সুবিধা থাকবেই। কারণ তৃতীয় এস্টেট চাইলেও প্রথম ও দ্বিতীয় এস্টেট অর্থাৎ যাজক ও অভিজাতরা মিলে বৈষম্যমূলক করব্যবস্থা বজায় রাখার পক্ষপাতী ছিল। স্বাভাবিকভাবে তৃতীয় এস্টেটের সবচেয়ে নিবিড়, বুদ্ধিজীবী ও সচেতন শ্রেণী বুর্জোয়া নেতৃবৃন্দ Privilege বা বিশেষ অধিকারের বিরুদ্ধে সরব হয়। তৃতীয় এস্টেটের বুর্জোয়া নেতাদের মধ্যে ছিলেন লাফায়েৎ (Lafayette), কঁদরসে (Condorcet), ওতাঁন (Autun), তালেরাঁ (Talleyrand), আবে সিয়েস (Abbe Sieyes), মিরাবোঁ (Mirabeau) প্রমুখ। এদের মুখপাত্র আবে সিয়েস, তাঁর বিশেষ অধিকার সংক্রান্ত পুস্তিকায় লেখেন যে তৃতীয় শ্রেণীই হলেন গোটা জাতি।

রাজা ষোড়শ লুই এই সময় স্টেটস্ জেনারেল গঠন সম্পর্কে প্রজাদের মতামত জানতে আবেদনপত্র (Cahiers) পাঠাতে বলেন। এর ফলে তিনটি শ্রেণী থেকে আলাদা

1. A Cobban, op cit, p 133.

আলাদা আবেদনপত্র পাঠানো হয়। যেমন 1788 -এর 12 ডিসেম্বর অভিজাত সম্প্রদায় একটি ক্যাহিয়ারে নিজেদের অধিকার বজায় রাখার কথা জানান। তৃতীয় সম্প্রদায় স্টেটস্ জেনারেল এর আসন সংখ্যা যাজক ও অভিজাতদের সমান করার কথা জানান। তবে রাজার আহ্বানে সাড়া দিয়ে তৃতীয় সম্প্রদায়ের পাঠানো ক্যাহিয়ারগুলি বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন। তাতে কৃষক বা শ্রমিক সম্প্রদায়ের মত প্রতিফলিত হয়নি।

1789 এর জানুয়ারিতে স্টেটস্ জেনারেলের নির্বাচনে 285 জন অভিজাত, 308 জন যাজক এবং 621 জন তৃতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নির্বাচিত হলেও তৃতীয় এস্টেটের দাবি নাকচ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। শিক্ষিত, রাজনৈতিক-চেতনাসম্পন্ন এবং বিত্তবান বুর্জোয়া শ্রেণীর (তৃতীয় সম্প্রদায়ের) ব্যক্তিরা বুর্জোয়া বিপ্লবের মাধ্যমে ফরাসি বিপ্লবের পরবর্তী পর্বে সেই বৈষম্য দূর করেন। তৃতীয় এস্টেটের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন বেইয়ি, তার্জে, মুনিয়ে, বারনাভ, বুজ, রোবস্পিয়ের। তৃতীয় শ্রেণীর সদস্যদের মধ্যে (621) বুর্জোয়ারাই বেশি—আইনজীবী (20%), চাকুরীজীবী (5%), বণিক ও শিল্পপতি (13%), কৃষক (9%)। কিছু প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিও সেই শ্রেণী ত্যাগ করে বুর্জোয়াদের সঙ্গে সামিল হয়। লাফায়েৎ, মিরাবো প্রমুখ ছিল এই দলের। উদারপন্থী অভিজাত, যাজক এবং বুর্জোয়ারা মিলে 'প্যাট্রিয়ট' দল গঠন করেছিলেন। তেমনি কৃষি ও গ্রামীণ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষ নিজেদের দাবি তুলে ধরে।

বুর্জোয়া বিপ্লবঃ যাই হোক, 5th মে, 1789 খ্রিস্টাব্দে স্টেটস্-জেনারেলের প্রতিনিধিরা ভার্সাই শহরে মিলিত হলেন। রাজা নিয়মমাফিক সকলকে অভিনন্দন জানালেন। এরপর তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিরা পরপর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি পেশ করলেন। প্রথমটি ছিল—প্রথম দুই শ্রেণীর বিশেষ অধিকার নাকচ করার দাবি। দ্বিতীয়টি ছিল—অতীতের নীতি অনুসারে প্রত্যেকটি শ্রেণীর প্রতিনিধিদের পৃথক সভাকক্ষে না বসে একই সভায় মিলিত হতে হবে। তৃতীয় দাবিটি ছিল—মাথা প্রতি এক ভোট প্রদানের নীতিকে স্বীকৃতি দিতে হবে। এসব দাবির বিরোধিতা করলেন যাজক ও অভিজাত শ্রেণীর স্বার্থপর প্রতিনিধিরা। ফলে স্টেটস্-জেনারেল কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারল না। রাজাও এই দাবিগুলি মানলেন না। বাধ্য হয়ে জনসাধারণের সমর্থনপুষ্ট তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিরা নিজেদেরকে ফ্রান্সের জাতীয় সভা বা ন্যাশানাল এ্যাসেমব্লি (National Assembly) বলে ঘোষণা করলেন (17 জুন)। এই ঘটনাটি নিঃসন্দেহে বিপ্লবাত্মক।

রাজা ষোড়শ লুই অবিলম্বে উক্ত ন্যাশানাল এ্যাসেমব্লিকে বেআইনী বলে ঘোষণা করলেন, তৃতীয় শ্রেণীর দাবি-দাওয়া নাকচ করলেন এবং অধিবেশন কক্ষের তালা বন্ধ করে দিলেন (20 জুন 1789)। ঐ দিন ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ তৃতীয় এস্টেটের সভ্য প্রতিনিধিরা নিকটবর্তী এক টেনিস কোর্টে মিলিত হয়ে শপথ গ্রহণ করলেন যে, "দেশের নতুন

শাসনতন্ত্র রচনা এবং সুশাসন প্রবর্তন না হওয়া পর্যন্ত আমরা অধিবেশন কক্ষে সভা করব না এবং প্রয়োজনে এইখানে সভা পরিচালনা করব"। এই শপথ ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাসে "*টেনিস কোর্ট শপথ*" নামে খ্যাত। তৃতীয় সম্প্রদায়ের নেতা মিরাবোঁ (Mirabeau) ঘোষণা করলেন, "আমরা সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি, আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বহিষ্কার করতে হলে বলপ্রয়োগ ভিন্ন অন্য উপায় নেই।" ইতোমধ্যে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন যাজক ও অভিজাতদের অনেকেই তৃতীয় শ্রেণীর পক্ষে যোগদান করলেন। পরিস্থিতির চাপে ষোড়শ লুই যাজক ও অভিজাত প্রতিনিধিদের তৃতীয় শ্রেণীর সঙ্গে একত্রে অধিবেশন করার পরামর্শ দিলেন। আর মাথা প্রতি এক ভোট গ্রহণের নীতিকে স্বীকৃতি জানালেন (27th জুন)। বিপ্লবের প্রথম পদক্ষেপ সার্থক হলো। রাজা ও সুবিধাবাদীদের কবল থেকে ক্ষমতা চলে গেল তৃতীয় সম্প্রদায়ের বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে। পুরোনো পদ্ধতি অনুসারে জাতীয় প্রতিনিধি সভায় ফরাসি সমাজের যাজক, অভিজাত ও তৃতীয় সম্প্রদায়ের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত ছিল তিন শ্রেণীর তিনটি ভোট; ফলে দুই-এক ভোটে তৃতীয় সম্প্রদায় হেরে যেত। বিদ্যা, বুদ্ধি, আর্থিক স্বচ্ছলতায় মধ্যবিত্ত শ্রেণী অভিজাতদের তুলনায় অগ্রসর ছিল। অথচ যাজক-অভিজাতদের মতন মর্যাদা, বিশেষ সুবিধা তাদের ছিল না। এটাই ছিল প্রথম দুই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রধান ক্ষোভের কারণ। অভিজাতদের মধ্যে উদারপন্থীরা একথা মানতেন। ফলে 1789 খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে মাথা পিছু ভোটের স্বীকৃতিকেও বুর্জোয়া বিপ্লব বলা চলে। টেনিস কোর্ট শপথ তৃতীয় সম্প্রদায়ের ঐক্য সুদৃঢ় করেছিল। 22 জুন রাজকীয় অধিবেশন শুরু হয় এবং পরদিন রাজা তিন শ্রেণীর মিলিত অধিবেশন মেনে নেন। কিন্তু মাথা পিছু ভোট দান মানেন নি, শেষ পর্যন্ত তাও মেনে নেন (27th জুন)। লেফেভরের মতে, এর পর তৃতীয় সম্প্রদায়ের জয়যাত্রা অব্যাহত। তবে সংগ্রামের এই পর্বে সমস্যার প্রকৃত সমাধান হলো না; সংকট মিটলো না। বুর্জোয়া শ্রেণী শান্তিপূর্ণ পথেই রাজার স্বৈরাতান্ত্রিক ক্ষমতার এবং সুবিধাভোগী শ্রেণীদুটির বিশেষ সুবিধার বিরুদ্ধে প্রথম পদক্ষেপ জিতেছিল মাত্র। 27th জুনের ঘোষণার পর জাতীয় সভা (National Assembly) সংবিধান রচনায় বা সংস্কারে ব্রতী হওয়াতে পরে সংবিধান সভায় (Constituent Assembly) পরিণত হলো। এই বিপ্লবের আরও সক্রিয়তা আমরা পরে দেখব সংবিধান সভার কার্যাবলীর মধ্যে।

প্যারিসে বিক্ষোভ ঃ ঠিক এই সময় ফ্রান্সে নেমে এসেছিল দুর্ভিক্ষের কালো ছায়া। গ্রাম থেকে দলে দলে ক্ষুধার্ত মানুষ শহরে চলে এলো। শহরে ছিল সর্বহারা শোষিত শ্রমিকগণ। শ্রমিক-কৃষক এবার একত্রে শুরু করল লুটপাট, দাঙ্গা-হাঙ্গামা।[1] গ্রাম থেকে আগত দরিদ্র চালচুলোহীন মানুষ, শহরের শ্রমিক ছাড়াও প্রায় সাতলক্ষ ছিল শহরে সর্বহারা জনতা, যাদের সাঁ কুলোৎ (Sans Culottes) বলা হত। জর্জ রুদে তাঁর "দ্য

ক্রাউড ইন দ্য ফ্রেঞ্চ রেভোলিউশন" পুস্তকে বিপ্লবে এই সব শ্রেণীর ভূমিকা আলোচনা করেছেন। খাদ্যাভাব ছিল গরিব জনতার বিক্ষোভের প্রধান কারণ, বুর্জোয়া শ্রেণীর মতন ভোটের অধিকার নয়। লেফেভর, কব প্রমুখ ঐতিহাসিকও বিপ্লবী জনতার ভূমিকা স্বীকার করেছেন। অবস্থার প্রেক্ষাপটে রাজা ষোড়শ লুই শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে প্যারিসের চারপাশে ভাড়াটিয়া জার্মান সৈন্য মোতায়েন করলেন, মন্ত্রী নেকারকে পদচ্যুত ক'রে এক প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রিসভা নিয়োগ করলেন (22 জুন)। রাজরোষে বহু ফরাসি সন্তানকে বাস্তিল দুর্গে নিক্ষেপ করা হলো। এর প্রতিবাদে ক্ষিপ্ত জনতা 1789 খ্রিস্টাব্দের 14 জুলাই বাস্তিল দুর্গ আক্রমণ করে কারার লৌহকপাট ভেঙে ফেলল ও দুর্গের পতন হলো। দলে দলে বন্দীরা বিপ্লবী দলে মিশে গেল। কারাধ্যক্ষ ও রক্ষীদের হত্যা করা হলো। রাজপতাকার পরিবর্তে সেদিন ফ্রান্সে গৃহীত হলো শ্বেত, নীল ও রক্তবর্ণ রঞ্জিত নতুন পতাকা।

গ্রামীণ বিক্ষোভ ঃ বাস্তিল ধ্বংসের প্রতিক্রিয়া দেখা দিল দিকে দিকে। বাস্তিল দুর্গ ছিল স্বৈরতন্ত্রের প্রতীক। জনতার রুদ্র রোষ তার উপর বর্ষিত হলে বিপ্লব প্রকৃত অর্থে সূচনা হয়। এক্ষেত্রে গুডউইনের মন্তব্য "No other single event of the Revolution had so many sided and far-reaching results as the fall of the Bastille."[2] শুধু তাই নয় এই ঘটনা শুধু ফ্রান্সে নয়, বিশ্বের সর্বত্র স্বাধীনতার অভ্যুদয় কাল বলে গুডউইন লিখেছেন। এর পর একে একে প্যারিসে একদিকে পৌর বিপ্লব, অন্যদিকে দাঙ্গা শুরু হয়। যখন স্টেটস্ জেনারেলে বুর্জোয়া ও অভিজাতদের মধ্যে বাদানুবাদ চলছে তার আগেই সৃষ্টি হয় এক ভয়াবহ অবস্থা যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। 1788 খ্রিস্টাব্দে কৃষির অবনতি এবং 1788-89 খ্রিস্টাব্দের অভূতপূর্ব শীতের প্রকোপ ফ্রান্সে দারুণ খাদ্যাভাবের সৃষ্টি করে। অগণিত গরিব চালচুলোহীন মানুষ প্যারিসে এসে বিক্ষোভ শুরু করে। পরে রুটির দোকান ও কারখানা লুঠ এবং সেই সঙ্গে দাঙ্গা শুরু হয়। খাদ্যের দাবিতে এই হাঙ্গামায় সামিল হয় শ্রমিক কারিগর এবং সাঁকুলোৎ শ্রেণী। অন্যদিকে বাস্তিলের পতনের সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবী জনগণ প্যারিসের পৌরশাসনভার নিজেদের হাতে তুলে নেয়। নিজেদের মধ্য থেকে প্রতিনিধি নির্বাচিত করে 'প্যারিস কমিউন' গঠন করা হয়। বিপ্লবীগণ 'ন্যাশানাল গার্ড' নামে এক জাতীয় রক্ষী বাহিনী গঠন করে। বস্তুত সর্বহারাদের হিংস্র আচরণ বুর্জোয়া শ্রেণীকে নিজেদের সংগঠিত করতে বাধ্য করে। তারা আতঙ্কিত হয়। *ওতেল দ্য ভিলে* (Hotel de Ville)-তে যে স্থায়ী পৌর সমিতি বা প্যারিস কমিউন গঠিত হয়, তার মেয়র হন বেইয়ি (Bailly)। জাতীয় রক্ষী বাহিনী (National Guard) এর প্রধান হন লাফায়েৎ। ক্ষমতা স্পষ্টতই রাজা বা

1. দ্র., The New Cambridge Modern History, vol. VII. pp. 672.
2. A Goodwin, Op cit, p 99.

অভিজাতদের বদলে বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে এলো। রাজা ষোড়শ লুই তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিদের অধিকাংশ দাবির স্বীকৃতি দিয়ে প্যারিসের অবস্থা আপাতত শান্ত করলেন। কিন্তু গ্রামে গঞ্জে বিপ্লবী তৎপরতা (Rural unrest) বৃদ্ধি পেল। সেখানে তৈরি হলো নিজেদের পৌরশাসনব্যবস্থা এবং ন্যাশানাল গার্ড নামক রক্ষী বাহিনী। গ্রামের কৃষকগণ সামন্তদের আস্তানা, গোলাঘর ইত্যাদি ধ্বংস করল। সামন্ততন্ত্রের শেষ চিহ্ন মুছে দিল। অভিজাতদের অবসর বিনোদনের জন্য শস্যক্ষেত নষ্ট করে শিকার করা, বেগার খাটানো অবাঞ্ছনীয় কর আদায়ের পালা শেষ হলো। কিন্তু সমকালীন দুর্ভিক্ষ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ গ্রামে-গঞ্জে ভীতির সঞ্চার করল। বহুস্থানে দেখা গেল কৃষি-বিদ্রোহ। ঠিক এই সময় রাজা ষোড়শ লুই সপরিবারে প্যারিস ছেড়ে ভার্সাই নগরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু প্রত্যেকটি শহর-নগরে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম মানুষের ক্রয়-ক্ষমতার বাইরে চলে গেল। অথচ খাদ্যের সন্ধানে গ্রামীণ মানুষ তখন শহরে প্রবেশ করছে। 1789 সালের 5th অক্টোবর বিপ্লবীদের প্রেরণায় হাজার হাজার মহিলা খাদ্যের দাবিতে ভার্সাই-এর দিকে অগ্রসর হলো। তারা রাজা ও তাঁর পরিবারের অন্যান্যদের ভার্সাই থেকে জোর করে প্যারিসে নিয়ে এলো। এই ঘটনাকে ঐতিহাসিক রাইকার **'রাজতন্ত্রের শবযাত্রা'** (Funeral March of the Monarchy) বলে বর্ণনা করেছেন। এই সময় থেকে রাজা ফ্রান্সের তৃতীয় শ্রেণীর হাতে বন্দী হলেন।

৬। ফরাসি সংবিধান সভা

1789 খ্রিস্টাব্দের 17 জুন স্টেটস্ জেনারেলের অধিবেশনে জন সাধারণের সমর্থনপুষ্ট তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিরা নিজেদের ফ্রান্সের জাতীয় সভা বা ন্যাশানাল অ্যাসেম্বলি বলে ঘোষণা করেন। 20 জুন টেনিস কোর্টের (এই কোর্টটি এক ইন্ডোর স্টেডিয়ামের মধ্যে) শপথের মধ্যেই এই জাতীয় সভা ফ্রান্সের সংবিধান সংস্কার পরিবর্তনে মনোযোগী হয়। তাঁদের শপথ ছিল যতদিন না নতুন সংবিধান রচিত হচ্ছে তৃতীয় এস্টেট ঐক্যবদ্ধ থাকবে।

ইতোমধ্যে প্যারিসের বিদ্রোহ সুদূর গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। আর্থিক সংকটের ফলে শুরু হয়ে যায় কৃষক বিদ্রোহ; বিভিন্ন প্রদেশের কৃষকরা বিপ্লবে ঝাপিয়ে পড়লে ফরাসি বিপ্লব শুরু হয়। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার পতন ঘটানো। বিপ্লবের নেতৃত্ব বদলে যেতে লাগল, বিপ্লবী জনগণ ভূস্বামীদের পল্লীভবন বা শাতো (Chateau) ও মঠগুলি আক্রমণ করে, কোথাও অভিজাত প্রাসাদে অগ্নি সংযোগ হয়।[1] এই পরিস্থিতিতে বিপ্লব আর শুধু বুর্জোয়া নেতৃত্বে সংবিধান প্রস্তুত করার মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না। জাতীয় সভার বুর্জোয়া নেতৃবৃন্দ তাই চিন্তিত হলো। বস্তুত বুর্জোয়া ও কৃষক শ্রেণীর স্বার্থ যে ভিন্ন তা লেফেভর দেখিয়েছেন।[2] তখন পরিবর্তিত পরিস্থিতি। সুভাষরঞ্জন

---

1. N. Hampson, Op. cit, p 90
2. G. Lefebvre, Op cit, p 128

চক্রবর্তী লিখেছেন, "পুরোনো ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই প্রায় মৃত; তৃতীয় এস্টেটের প্রাধান্যও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রাজার স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতার অবসানও ঘোষিত হয়েছিল। কিন্তু কৃষকদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল সামন্ততান্ত্রিক সমস্ত অধিকারের অবসান। এই অবস্থায় সংবিধান সভায় বুর্জোয়া নেতাদের হয়েছিল উভয় সংকট। তারা বিদ্রোহ দমন করতে পারত না, আবার বিদ্রোহের ওপরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নিজেদের নেতৃত্ব শিথিল করতেও পারত না।"[1] এই পরিস্থিতিতেই 1789 এর জুন মাস থেকে জাতীয় সভা ফ্রান্সের নতুন সংবিধান রচনার দায়িত্ব নিয়েছিল। সুতরাং 1791 খ্রিস্টাব্দের জুন মাস থেকে জাতীয় সভাকে সংবিধান সভা-ও (Constituent Assembly) বলা হয়। 27th জুন রাজা ষোড়শ লুই তৃতীয় সম্প্রদায়ের দাবি মেনে নেন। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সংবিধান সভা সামন্ত প্রথার অবসান এবং পুরোনো ব্যবস্থার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লোপ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

4th আগস্ট এক ঘোষণার দ্বারা তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন, (ক) ফ্রান্সে সামন্ত প্রথা লোপ করা হলো, (খ) ভূমিদাস বা সার্ফ প্রথা, সামন্তকর, কর্ভি বা বেগার প্রথা লোপ করা হলো, (গ) সামন্তশ্রেণীর বিশেষ অধিকার ও সামাজিক মর্যাদা লোপ করা হলো, (ঘ) টিথ বা ধর্মকর উঠিয়ে দেওয়া হলো। এসবের ফলে সামন্ততন্ত্রের সম্পূর্ণ অবসান না হলেও পুরোনো ব্যবস্থা ভেঙে গেল। সংবিধান সভায় ছিলেন *মিরাবো* (Mirabeau), *লাফায়েৎ* (Lafayette), *আবে সিয়েস* (Abbe Sieyes), *রোবস্পিয়ের* (Robespierre) প্রমুখ নেতৃবর্গ। এখানে আরও দু-একটি কথা বলা দরকার। সংবিধান সভার অধিবেশনে সামন্ততন্ত্র বিলোপের এই পদক্ষেপ প্রথম নেওয়া হয় 4 থেকে 18 আগস্টের মধ্যে। 4 তারিখে প্রস্তাবগুলি আনেন উদারপন্থী অভিজাত ভিকঁৎ দ্য নোয়াই যিনি বুর্জোয়াদেরই পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর প্রস্তাবের মধ্যে ছিল ক্ষতিপূরণ দিয়ে সামন্তপ্রভুদের অধিকারে বিলোপ করা। লক্ষ্যণীয় যে ব্যক্তিগত দাসত্বের ভিত্তিতে যে সব অধিকার ছিল তা বিলুপ্ত করা হলেও সম্পত্তির অধিকার বা চুক্তির ভিত্তিতে যে অধিকার অর্জিত তা বজায় রাখা ছিল। সম্পত্তির অধিকার লুপ্ত হলো না। এর পর 11th আগস্ট প্রস্তাব নিয়ে ভূমিদাস প্রথা, বেগার প্রথা বা কর্ভি, সামন্ত কর, ম্যানর প্রথা, বর্গা প্রথা, টিথ বা ধর্ম কর, রাজপদ ক্রয়-বিক্রয় করার সুবিধা, যাজকদের এক সঙ্গে একাধিক বেনেফিসের কর্তৃত্বে থাকা, অভিজাতদের সরকারি চাকুরিতে অগ্রাধিকার, পোপকে প্রদেয় বার্ষিক কর ইত্যাদির অবসান ঘটানো হয়। অন্য দিকে স্বীকৃত হয় ধর্মের স্বাধীনতা. তিন এস্টেটের ক্ষেত্রেই আইন সমভাবে প্রযোজ্য, যথা— অভিজাতদের কর দেওয়া থেকে অব্যাহতি উঠিয়ে দেওয়া হলো।

1. সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ 123

সুতরাং 4–18 আগস্ট তারিখের মধ্যে এই প্রস্তাবগুলি বিধিবদ্ধ হলেও দুটি কথা মনে রাখতে হবে। প্রথমত রাজা ঐগুলি মেনে নিতে রাজি হন নি। সংবিধান সভা তখন *আবে সিয়েস* -এর মত অনুযায়ী ঠিক করে যে, সার্বভৌম ক্ষমতা যেহেতু জনসাধারণের প্রতিনিধিদের অর্থাৎ সংবিধান সভায়, তাই রাজার অনুমোদন ব্যতিরেকেই প্রস্তাবগুলি বৈধ। তবু রাজনৈতিক সংকট দেখা দিল। দ্বিতীয়ত, *নর্মান হ্যাম্পসন* দেখিয়েছেন যে 4 এবং 11 আগস্ট, 1789 এ ঘোষণার দ্বারা সামন্ততন্ত্রের অনেকাংশ লুপ্ত হলেও সামন্তপ্রথা পুরোপুরি লুপ্ত হয়নি। তিনটি এস্টেটও বিলুপ্ত করে সকল নাগরিককে এক শ্রেণী করা হয়নি। অভিজাতদের বাজেয়াপ্ত জমির উপর ক্ষতিপুরণ দেওয়া থেকে কিছু করও থেকে যায়। হ্যাম্পসনের মতে, "জাতীয় সভা অনেক দূর এগিয়েছিল, কিন্তু যতদূর যাওয়া দরকার ছিল ততটা যায় নি।" তবে এই সব ত্রুটি দূর করার জন্য 1789 এর 7 নভেম্বর এক ঘোষণার দ্বারা সংবিধান সভা ঠিক করে যে তিনটি এস্টেট বিলুপ্ত করা হলো। আবার 1790 -র ফেব্রুয়ারিতে মিশ্রিতদলের উপর অভিজাতদের বিশেষ পদ, গ্রাম্য অভিজাতদের বিশেষ ম্যানরের অধিকার ইত্যাদি বাতিল করা হয়। তাই সামন্ততন্ত্র বিলোপকে ইতিহাসবিদ *রাইকার* পুরাতনতন্ত্রের কবর রচনা বলে উল্লেখ করেছেন।

এরপর 26th আগস্ট সংবিধান সভায় **'ব্যক্তি ও নাগরিকের অধিকার ঘোষণাপত্র'** (Declaration of Men and Citizen) রচিত ও ঘোষিত হয়। এই ঘোষণাপত্রে বলা হলো যে, (1) স্বাধীনতা নিয়েই মানুষ জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং সকল মানুষ সমভাবে স্বাধীনতা ও অধিকার ভোগ করবে। (2) জনসাধারণই রাষ্ট্রীয় সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস। তাই রাষ্ট্রের আইন জনসাধারণের ইচ্ছার অভিব্যক্তি। (3) আইনের দৃষ্টিতে সকল মানুষই সমান মর্যাদাসম্পন্ন এবং বিনা বিচারে কাউকে বন্দী বা দণ্ডদান করা যায় না। (4) সম্পত্তির অধিকার একটি পবিত্র অধিকার এবং (5) স্বাধীন মতামত প্রকাশ এবং ধর্মপালনের মৌলিক অধিকার সকলের আছে। এই ঘোষণাপত্রে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি জানানো হলো। ইতিহাসবিদ *ওলার* (Aulard) তাই ব্যক্তি ও নাগরিকের ঘোষণাকে বলেছেন পুরানো ব্যবস্থার 'মৃত্যু পরোয়ানা'। ঐতিহাসিক *লেফেভরের* মতে, ইয়োরোপের সর্বত্র এই ব্যক্তি ও নাগরিক অধিকারের ঘোষণার মধ্যে নিপীড়িত মানুষ মুক্তি অধিকার খুঁজে পায়। *ওলার* তাই এই ঘোষণাকে পুরাতনতন্ত্র বা Old regime এর death certificate বলেছেন। *টেলর* (G. V. Taylor) ও অনুরূপ মত পোষণ করেছেন। বস্তুত শত শত বছর ধরে ফরাসি জাতি যে সব গণতান্ত্রিক, মৌলিক ও মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল, এই ঘোষণাপত্র তাদের সেই অধিকার এনে দিল। আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণা পত্র এবং অষ্টাদশ শতকের আলোকিত দর্শনের প্রভাব এর মধ্যে স্পষ্ট। *আলফ্রেড কোবান* অবশ্য মনে করেন রুশোর সোস্যাল কন্ট্রাক্ট এর চেয়ে প্রাকৃতিক

আইন ও প্রাকৃতিক অধিকারের ছাপ এখানে স্পষ্ট। বংশ পরিচয় নয়, যোগ্যতাই হবে কর্মের মাপ কাঠি— এই চেতনায় আধুনিকতার কণ্ঠস্বর স্পষ্ট। দৈব ক্ষমতার উপরও এক কুঠারাঘাত করা হয় এই ঘোষণায়।

তবে এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার, 'ব্যক্তি ও নাগরিকের অধিকার' শুধু ফ্রান্সে কেন, সমগ্র বিশ্বে এক উচ্চ আদর্শ তুলে ধরলেও এরও অনেক ত্রুটি ছিল। সম্পত্তির অধিকার যথাযথভাবে নিরূপিত হয়নি; বিবেকের স্বাধীনতার ওপরেও যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়নি। অর্থনৈতিক স্বাধীনতারও উল্লেখ করা হয়নি। বস্তুত এই ঘোষণায় বুর্জোয়া প্রাধান্য স্পষ্ট। সর্বসাধারণের ভোটাধিকার, দরিদ্র জনসাধারণের জীবিকার অধিকার, নাগরিকদের কর্তব্য ইত্যাদির কথা বলা হয়নি। সম্পত্তির অধিকারের ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা ছিল। তবে এসব সত্ত্বেও ঘোষণাপত্রের ঐতিহাসিক তাৎপর্য বিতর্কের উর্ধ্বে। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা জাতির হাতে, রাজা বা বিশেষ শ্রেণীর হাতে নয় এবং নাগরিক ও ব্যক্তির অধিকার রক্ষাই রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য— এই কথাগুলি বিপ্লবের মূল বাণী হিসেবে সংবিধান সভা ঘোষণা করে।

দ্বিতীয় স্তরে সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে দার্শনিক মন্তেস্কুর চিন্তাধারা অনুসারে রাজা ও কার্যনির্বাহক বিভাগ (King and the Executive), আইন বিভাগ (Legislature) এবং বিচার-বিভাগকে (Judiciary) পৃথক করা হলো। ফ্রান্সের রাজক্ষমতা প্রসঙ্গে বলা হলো, রাজা এবং পার্লামেন্ট মিলিতভাবে রাজ্য শাসন করবেন। পার্লামেন্টের নাম হবে আইন সভা (Legislative Assembly)। তবে রাজা তাঁর সুবিধামত মন্ত্রী নিয়োগ করে কার্যনির্বাহ করতে পারেন, কিন্তু এই মন্ত্রীরা আইন বিভাগে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। রাজার হাতে থাকবে সামরিক ও নৌবিভাগের সর্বোচ্চ ক্ষমতা এবং পররাষ্ট্র নীতি পরিচালনার দায়িত্ব। কিন্তু পার্লামেন্টের সম্মতি ভিন্ন তিনি যুদ্ধ ঘোষণা অথবা শান্তি স্থাপন করতে পারবেন না। মোট কথা, রাজ ক্ষমতাকে নতুন সংবিধানে সম্পূর্ণ সঙ্কুচিত করা হলো। রাজার খাসজমি বাজেয়াপ্ত হলো, তিনি আইন রচনার বা আইনসভার উপর অধিকার এবং সকল রাজকর্মচারী নিয়োগের অধিকার হারালেন। দৈব-অধিকার-তত্ত্ব (Divine Right Theory) নাকচ হলো। তবে রাজারা উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতা পাবেন, 2.5 কোটি লিভ্‌র পর্যন্ত ব্যক্তিগত তহবিল (civil list) গড়তে পারবেন এবং কোনও আইন পছন্দ না হলে 'সাসপেন্সিভ ভিটো'* প্রয়োগ করে তা মুলতুবী রাখতে পারবেন।

আইনসভা হবে এক কক্ষ বিশিষ্ট। তারা কর ধার্য করতে পারবেন। সভার সদস্যরা দু'বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন। ফ্রান্সের নাগরিকদের সক্রিয় ও নিষ্ক্রীয় এই দুইভাগে ভাগ করা হলো। যারা অন্তত তিন দিনের শ্রমের সমান বা দেড় থেকে তিন লিভ্‌র কর দিত, তারা সক্রীয় নাগরিক, যদি তাদের বয়স পঁচিশ বছর হয়, তারাই ভোটদানে অধিকারী। নিষ্ক্রীয় নাগরিকদের ভোট নেই। সক্রিয় নাগরিকদের ভোটে প্রাথমিক নির্বাচক

মণ্ডলী এবং তাদের থেকে আবার আইন সভার সদস্য হত। বিচার বিভাগের উপর প্রশাসনের কর্তৃত্ব রইল না। জাতীয় আদালত হলো দুটি। এছাড়া প্রত্যেক জেলায় বিচারালয় স্থাপিত হলো। শাসনকার্যের সুবিধার জন্যে ফ্রান্সকে ৪3টি ডিপার্টমেন্ট বা প্রদেশে এবং সেগুলিকে 547টি জেলায় এবং জেলাগুলি অজস্র কমিউনে (Commune) ভাগ করা হয়। ইনটেনডেন্ট পদ উঠিয়ে দিয়ে প্রতি স্তরেই নির্বাচিত প্রশাসনিক পদের সৃষ্টি করা হল।

এরপর যাজক সম্প্রদায়সহ চার্চকে রাষ্ট্রাধীন করার উদ্দেশ্যে 'ধর্মযাজকগণের সংবিধান' (Civil Constitution of the Clergy) নামে এক বিধান রচিত হলো। এর ফলে প্রথমতঃ, গির্জার উপর পোপের নিয়ন্ত্রণ লোপ পেল এবং গির্জার ভূসম্পত্তি রাষ্ট্রাধীন বা জাতীয় সম্পত্তিরূপে গণ্য হলো। এরপর এই সম্পত্তিগুলিকে আমানত রেখে 'আসিএগ্রা' (Assignat) নামে একপ্রকার নোট বা কাগজী মুদ্রার প্রচলন করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, সাধারণ মানুষের 'টিথ' বা ধর্মকর প্রদান করা বন্ধ হলো এবং প্রত্যেকটি গির্জা এক একটি রাষ্ট্রীয় বিভাগে পরিণত হলো। তৃতীয়তঃ, বিশপ এবং ধর্মযাজকদের নিয়োগের ক্ষেত্রে নির্বাচন ব্যবস্থা গৃহীত হলো। তারা হলেন চার্চের বেতনভোগী কর্মচারী মাত্র।

1789 সালের আগস্ট মাসে সংবিধান সভা ফ্রান্সের নতুন সংবিধান রচনায় মনোনিবেশ করে। এই সময় থেকে দেশ শাসনের দায়িত্বও এই সভার হাতে অর্পিত হয়। সভার প্রতিনিধিরা সংবিধানের ধারা অনুসারেই দেশ শাসন করতেন। সংবিধান রচনার সময় মিরাবো ছিলেন রাজা ষোড়শ লুইয়ের পরামর্শদাতা। তিনি রাজাকে বিপ্লবে নেতৃত্ব দিয়ে নিয়মতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দিতেন। তাছাড়া তিনি রাজাকে বিদেশী শক্তির সাহায্যে নিজের শক্তি উদ্ধারের চেষ্টা ত্যাগ করারও পরামর্শ দিতেন। কিন্তু মিরাবোর মৃত্যুতে (1791) রাজা নিজেকে অসহায় বোধ করলেন এবং সপরিবারে গোপনে পলায়নের চেষ্টা করলেন। ভারেনে নামক স্থানে ধরা পড়ায় বন্দী অবস্থায় তাঁকে প্যারিসে আনা হলো। এই ঘটনার পর 1791 খ্রিস্টাব্দের 21 জুন থেকে রাজার পূর্বক্ষমতা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করা হলো। তবে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র আপাতত বহাল রইল। এদিকে সংবিধান রচনার কাজ শেষ হওয়ায় রাজার স্বাক্ষর গ্রহণ করা হলো। এরপর সংবিধান সভা ভেঙে দেওয়া হলো 30 সেপ্টেম্বর, 1791 খ্রিস্টাব্দে।

এসবের ফলে 1791 সালের সংবিধান যথাযথ কার্যকরী হলো না। তাই ঐতিহাসিক *রাইকার* বলেন, "সংবিধান সভা (পুরাতন বিষয়ের) ধ্বংসের কাজে তৎপরতা দেখালেও গঠনের কাজে ছিল তাদের শৈথিল্য।" তবে ফ্রান্সের ইতিহাসে সংবিধান সভার গুরুত্ব অসামান্য। সামন্ততান্ত্রিক অধিকার এবং বিশেষ সুযোগ-সুবিধার অবসান ঘটিয়ে এই সভা ফরাসি সমাজে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিল। পুরোনো ব্যবস্থার মৃত্যু-পরোয়ানা ঘোষণা ক'রে সংবিধান সভা বিপ্লবকে অনেকটা বাস্তব রূপ দিয়েছিল। তথাপি সংবিধান সভার

কার্যাবলীর অনেক ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। (1) সমস্ত সংস্কারের মধ্যে বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার ছাপ ছিল স্পষ্ট। তৃতীয় সম্প্রদায়ের সকল শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষিত হয়নি, (2) সংস্কারগুলি দ্রুত প্রবর্তনের ফলে জাতীয় ঐক্যের বন্ধন শিথিল হয়, (3) তারা সুষ্ঠু ও স্থায়ী সংবিধান রচনা করতে পারে নি, (4) দেশের নাগরিকদের 'সক্রিয়' ও 'নিষ্ক্রীয়' দু'ভাগে ভাগ করে এক শ্রেণীকে ভোটদানে বঞ্চিত করা ছিল অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, (5) সংবিধানের অনেক ধারা ছিল অ-বাস্তব এবং দেশের ঐতিহ্য বিরোধী, (6) একদিকে আইন সভার হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা এবং অন্যদিকে প্রদেশ, জেলা ও কমিউনগুলিকে শাসনের দায়িত্ব স্থানীয় নির্বাচিত শাসকদের হাতে দেওয়া বিকেন্দ্রীকরণের প্রবণতা সৃষ্টি করে, (7) গির্জার জাতীয়করণ, ধর্মপ্রাণ যাজকদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি করে, (8) সংবিধান মুদ্রাস্ফীতি রোধ করতে পারেনি, (9) মানুষের স্বাভাবিক জন্মগত অধিকার ও সম্পত্তির অধিকার ছিল পরস্পর-বিরোধী এবং (10) সংবিধান দরিদ্র কৃষকদের কোনও উন্নতি ঘটাতে ব্যর্থ হলো। *হ্যাম্পসনের* মতে সামন্ত প্রথা লোপ করা হলেও সামন্তদের সকল অধিকার লোপ করা হয়নি। *লেফেভর* মনে করেন যে, বাস্তব অবস্থাকে কাজের মধ্যে বড় রেশি প্রতিফলিত করার ফলেই সংবিধান সভার কিছু কাজ ক্ষণস্থায়ী (ephemeral) হয়েছিল।

উপরোক্ত ত্রুটিগুলি সত্ত্বেও সংবিধান সভার কার্যাবলী (1789-91) আলোচনা করলে বলা যায় যে, এর গুরুত্ব কম নয়। এই সংবিধান 'পুরোনো ব্যবস্থা' (Ancient Regime) ধ্বংস করে, রাজার স্বৈরশাসনের ক্ষমতার অবসান ঘটায়। ফরাসি চার্চের দুর্নীতিও বন্ধ করে। তবে *জে. এম. টমসন* ঠিকই লিখেছেন যে, ফ্রান্সে বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সকল নাগরিকদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক শাসন তখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি; মুদ্রাস্ফীতি দূর হয়নি; আর্থিক অসংগতিও মেটেনি।

৭। বিপ্লবের অগ্রগতি

আইন সভা, বিপ্লবের অগ্রগতি ও সাফল্যঃ সংবিধান সভাকে ভেঙে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংবিধান অনুসারে 745 জন নির্বাচিত সদস্যকে নিয়ে নতুন আইনসভার (Legislative Assembly) অধিবেশন বসল 1791 খ্রিস্টাব্দের পয়লা অক্টোবর। বিগত দু'বছরে যে সংবিধান সভা ফ্রান্সের শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করেছিল তার সদস্যদের কেউই এই নতুন আইন সভায় নির্বাচিত হয়ে আসেননি। ফলে নতুন সদস্যরা সকলেই ছিলেন ফ্রান্সের বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। তাই তাঁরা নিজ নিজ দল বা ক্লাবের আদর্শ অনুসারে পরিচালিত হতে বাধ্য ছিলেন। আইন সভায় মূলত চারটি দল ছিল। দক্ষিণপন্থী শাসনতান্ত্রিক দল নিয়মতান্ত্রিক রাজক্ষমতাসহ সাংবিধানিক নির্দেশ মেনে চলার পক্ষপাতী ছিলেন। বামপন্থীরা (Leftists) দুটি অংশে বিভক্ত ছিলেন; যথা—

(ক) জিরণ্ডিস্ট (Girondist) ও (খ) জ্যাকোবিন (Jacobin) [ফরাসি উচ্চারণে জ্যাকবাঁ]। বিপ্লবে বিশ্বাসী হলেও জিরণ্ডিস্টরা উগ্রপন্থী ছিলেন না। অন্যদিকে জ্যাকোবিনরা ছিলেন যথার্থই উগ্রপন্থী বিপ্লবী। এছাড়া আইন সভায় বেশ কিছু সংখ্যক নিরপেক্ষ মধ্যপন্থী সদস্য ছিলেন। এই চারটি গোষ্ঠী অর্থাৎ (i) নিয়মতান্ত্রিক গোষ্ঠী আইনসভার স্পিকারের বা পরিচালকের ডানদিকে বসত বলে তাদের দক্ষিণপন্থী বলা হয়। তাঁরা 1791 এর সংবিধান অনুসারে রাজ্য পরিচালনার এবং বিপ্লবকে আর এগোতে না দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। এদের ফইয়াঁ (Feuillant)-ও বলা হত। নিয়মতান্ত্রিক গোষ্ঠীর নেতা ছিলেন লাফায়েৎ। তবে এদের অপর এক গোষ্ঠী বারনাভ, দুপঁর এবং লামেতের নেতৃত্বে চলত। এই দক্ষিণ পন্থীরা মোট ছিলেন 264 জন। (ii) গণতান্ত্রিক মতাদর্শে বিশ্বাসী অনেক সদস্য ফ্রান্সের জিরন্দ (Gironde) প্রদেশ থেকে নির্বাচিত বলে তাদের জিরন্দিন বা জিরণ্ডিস্ট বলা হত। এরা স্পিকারের বামপাশে বসত এবং বামপন্থী হিসেবে চিহ্নিত। (iii) এছাড়াও প্রজাতান্ত্রিক প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারকামী বামপন্থী দল ছিল জ্যাকবাঁ বা জ্যাকবিন। এরা জ্যাকবিন ক্লাবের সদস্য। ব্রিস (Brissot), কঁদরসে (Condorcet) ছিলেন এদের নেতা। এদের মধ্যে উগ্র নেতা ছিলেন কুঁতঁ (Couthon) এবং কারনো (Carnot)। (iv) মধ্যপন্থী সদস্যরা ডান বা বাম কোন দিকে ছিলেন না। এদের সংখ্যাই সব চেয়ে বেশি (346)। এরা সকলেই নতুন আইন সভার অধিবেশনে অংশগ্রহণ করলেন।

আইনসভার অধিবেশন শুরু হওয়ার পরে তাদের সঙ্গে রাজার বিরোধ শুরু হয়। অর্থনৈতিক সংকট এবং বিপ্লব ব্যর্থ করার চক্রান্তের আশঙ্কা সংঘাতকে অনিবার্য করে তোলে। এই চক্রান্তের মধ্যে ছিল ফ্রান্সের অভ্যন্তরে প্রতিবিপ্লবী প্রচেষ্টা, দেশত্যাগীদের বিপ্লব-বিরোধী মনোভাব এবং সর্বোপরি বিদেশী হস্তক্ষেপ (এই বিষয়টি আমরা যথাস্থানে আলোচনা করব)। বিদেশী হস্তক্ষেপের আশংকা থেকে যেমন শুরু হয় বিপ্লবী যুদ্ধ (1792 খ্রিঃ), তেমনি ফরাসি জনমত রাজা ও রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে তীব্র আকার ধারণ করল। এর আগে আইন সভা কয়েকটি আইনের প্রস্তাব করে, যেমন ষোড়শ লুইয়ের দেশত্যাগী ভ্রাতা দু'মাসের মধ্যে দেশে ফিরে না এলে উত্তরাধিকারের দাবি হারাবেন (31 অক্টোবর 1791), দেশত্যাগীরা না ফিরে এলে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হবে (9 নভেম্বর), বা প্রত্যেক যাজককে ধর্ম আইন মানতে হবে (27 নভেম্বর)। যাজক ও দেশত্যাগীদের উপর রাজা ভিটো প্রয়োগ করে আইন মুলতুবী রেখেছিলেন। বস্তুত আইনসভার অন্যতম কাজই ছিল দুটি স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়া। এক, যে সকল যাজক Civil Constitution of the Clergy আইনের প্রতি আনুগত্য জানাতে অসম্মতি জানাবে তাদের ভাতা, বেতন ও অন্যান্য সুবিধা নাকচ করা হবে। দুই, *ডেভিড টমসন* লিখেছেন যে এমিগ্রি বা দেশত্যাগী রাজতন্ত্রীরা ফ্রান্সের রাইন সীমান্তে সৈন্য সংগঠন করে বিপ্লবী সরকারকে আক্রমণের চেষ্টা করে। তাই সিদ্ধান্ত করা হয় যে, 1792 -এর পয়লা জানুয়ারির মধ্যে ফ্রান্সে ফিরে

না এলে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হবে এবং তাদের মৃত্যুদণ্ড বহাল হবে। রাজা ষোড়শ লুই তার Suspensive Veto প্রয়োগ করে আইন দুটি সাময়িকভাবে বন্ধ রাখেন অর্থাৎ অনুমোদন করেন নি। ফলে জিরন্দিন ও জ্যাকবিন উভয় বামপন্থীদলই অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়। এরপর বিপ্লবীদের যুদ্ধ ও বিদেশী হস্তক্ষেপে বিপ্লব বানচাল হওয়ার আশংকায় জনতা 1792 খ্রিস্টাব্দের 10 আগস্ট তুইলরি রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করে। রাজা সপরিবারে আইনসভায় আশ্রয় নেন। আইনসভা রাজাকে পদচ্যুত ক'রে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে কনভেশন আহ্বানের ব্যবস্থা করে। ফলে পূর্ববর্তী সংবিধান বাতিল হয়ে যায়। *লেফেভর* এই ঘটনাকেই বলেছেন *দ্বিতীয় ফরাসি বিপ্লব।*

দ্বিতীয় ফরাসি বিপ্লব বলতে আসলে রাজতন্ত্রের পতন, গণভোট প্রথার প্রবর্তন এবং প্রজাতন্ত্র ঘোষণাকেই বোঝায়। এখানে জনগণের ভূমিকা বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়। বিপ্লবের শুরু থেকেই জাতীয় সভার বাইরে বিভিন্ন ক্লাব ও সাঁল (Salon) ঘিরে রাজনৈতিক আলোচনা ও উত্তেজনা হত। ফইয়াঁ ক্লাবে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের সমর্থকদের ভীড় হত। জ্যাকবিন ক্লাবে গণতন্ত্রের সমর্থক, নিম্নবিত্ত বুর্জোয়া দোকানদার, কারিগর প্রমুখ সমবেত হত। আরও নিচের তলার সাধারণ মানুষ যেত করদলিয়ে ক্লাবে। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দাতোঁ (Danton)। এছাড়া ফ্রান্সের 48টি সেকশনে সক্রিয় নাগরিকরা রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করত। ক্রমশ জনতা সক্রীয়-নিষ্ক্রীয় ভেদাভেদ ঘুচিয়ে রাজতন্ত্র উচ্ছেদের দিকে অগ্রসর হয়। রাজা সপরিবারে অস্ট্রিয়াতে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন এবং ভারেনে (Varennes) নামক সীমান্ত এলাকায় ধরা পড়লেন। জনতার ধিক্কার ধ্বনির সঙ্গে তাঁকে প্যারিসে নিয়ে আসা হলো।

এই দ্বিতীয় বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে ফ্রান্সের অভ্যন্তরে ব্যাপক পরিবর্তনমূলক ঘটনা ঘটে গেল। প্রথমতঃ, রাজাকে রাজপদ থেকে অপসারিত ক'রে টেম্পল কারাগারে বন্দী করা হলো। দ্বিতীয়তঃ, জনতার চাপে আইন সভাকে ভেঙে দিয়ে জাতীয় প্রতিনিধি সভার (National Convention) আহ্বান জানানো হলো। ঠিক হলো, প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে বা গণভোটের দ্বারা জাতীয় কনভেনসন গঠিত হবে এবং তারাই নতুন সংবিধান তৈরি করবে। তৃতীয়তঃ, প্যারিসের স্বায়ত্বশাসন প্রতিবিধানকে ভেঙে দিয়ে বিপ্লবী কমিউন বা নাগরিক পরিষদের ক্ষমতা অর্পণ করা হলো। ক্ষমতা হাতে পেয়েই প্যারি কমিউন রাজতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক সন্দেহে এক হাজারেরও বেশী নারী পুরুষকে হত্যা করল। এই ঘটনা 'সেপ্টেম্বর হত্যাকাণ্ড' নামে পরিচিত। প্যারিসের জনতাই তখন বিপ্লবের নায়ক। 1792 খ্রিস্টাব্দের 4 সেপ্টেম্বর রাজতন্ত্রের অবসানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। প্রাপ্তবয়স্কের নির্বাচনের দ্বারা এরপর জাতীয় প্রতিনিধি সভা (National Convention) গঠিত হলো।

বস্তুতপক্ষে 1791 এর মাঝামাঝি থেকেই রাজতন্ত্রের অবস্থা খারাপ হতে থাকে। রাজা ষোড়শ লুই বিদেশী শক্তির সহায়তায় বিদেশ থেকে দেশে ফিরে স্বৈরতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা

করবেন ভেবে ছিলেন; কিন্তু পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে অপমানিত হলেন। উপরন্তু জনতা নতুন করে জেগে উঠল। জাতীয় রক্ষি বাহিনীতে এক লক্ষ স্বেচ্ছাসেবক যোগ দিল। তারপর সংবিধান সভার কার্যকাল শেষ হয়ে (30 সেপ্টেম্বর) আইন সভা শুরু হয়। তবে সংবিধান সভার তৈরি নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র বেশি দিন টেঁকে নি। আভ্যন্তরীন সংকট এজন্য দায়ী। তারপর 1791 এর শেষ দিকে একদিকে আসিঞ্রার মূল্য হ্রাস ও অন্যদিকে বিভিন্ন ভোগ্যপণ্যের (যেমন কৃষিপণ্য, চিনি, মদ) মূল্য বৃদ্ধির ফলে জনগণ ক্রমেই বিক্ষুব্ধ হতে থাকে। দোকানে, মজুতদারদের বাড়িতে, দেশত্যাগীদের বাড়ি বা দোকান আক্রান্ত হয়। ইতোমধ্যে বিদেশীদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। আইন সভা প্রথমে জিরন্দিন, তারপর ফইয়াঁ, শেষে আবার জিরন্দিন মন্ত্রিসভা রাজাকে বশে আনতে ব্যর্থ হয়। অবশেষে 1792 এর আগস্ট মাসে প্যারিসের 48টি সেকশন নতুন বিপ্লবী কমিউন গঠন করেন। আইনসভা রাজাকে পদচ্যুত করে। প্রাপ্তবয়স্কের ভোটে কনভেনশন আহ্বান করা হয়। এদিকে সাঁকুলোত শ্রেণী রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করে, রাজাকে পরে টেম্পল কারাগারে বন্দী করে রাখা হয়। আইন সভায় জিরন্দিনদের আধিক্য ছিল কিন্তু প্যারিসের কমিউনগুলি ছিল জনতার শক্তির অধীন। আইনসভায় মাউন্টেনগোষ্ঠী বিপ্লবী কমিউনের প্রতিনিধি ছিল।

10 আগস্ট 1792 র বিপ্লবী জনতার অভ্যুত্থানকেই দ্বিতীয় ফরাসি বিপ্লব আখ্যা দিয়েছেন ইতিহাসবিদ লেফেভর। ঐ তারিখের পর ফ্রান্সের শাসন ব্যবস্থা-আইনসভা, কার্যনির্বাহক পরিষদ ও কমিউন— এই তিন শক্তিতে বিভক্ত হয়ে যায়। এরপর 4 সেপ্টেম্বর রাজতন্ত্রকেই অবলুপ্ত করা হয়। প্রতি বিপ্লবী অপরাধে 2–7 সেপ্টেম্বরের মধ্যে অনেক যাজক ও রাজতন্ত্রী অভিজাতদের হত্যা করা হয়। এই পরিস্থিতিতেই কনভেনশনের নির্বাচন ও অধিবেশন শুরু হয়। অবশ্য কনভেনশনের অধিবেশন আলোচনা করার আগে বিদেশী হস্তক্ষেপ ও বিপ্লবী কর্ম পন্থা বিষয়ে জানা দরকার।

বৈদেশিক হস্তক্ষেপ ও তার স্বরূপ ঃ 1789 খ্রিস্টাব্দের মে মাসে যখন ফরাসি বিপ্লবের সূচনা হয় তখন ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গ বিপ্লবের তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারেনি। তারা স্টেটস্ জেনারেল আহ্বান ও জাতীয় সভার কার্যকলাপকে এবং সংবিধান সভার ক্রিয়াকলাপকে ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার মনে করত। ক্রমে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার বাণী, নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের বদলে রাজতন্ত্রের আদর্শ, বিপ্লবী অভ্যুত্থান ইত্যাদি ইয়োরোপে যেমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল, তেমনি বিদেশী রাষ্ট্রগুলিও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে দাঁড়াল। *সোরেল* এর মতে, 'মূলত এই দ্বন্দ্ব ছিল বিপ্লব বনাম প্রতিক্রিয়াশীলতার ঘাত-প্রতিঘাত।' বৈদেশিক হস্তক্ষেপের আশংকা করেছিলেন ফ্রান্সের বিপ্লবী দলগুলিও।

এর দুটি কারণ ছিল। প্রথমতঃ, বিপ্লব শুরু হওয়ার পরেই বহু অভিজাত ও রাজতন্ত্রী ফ্রান্স ত্যাগ করে বিদেশে চলে যান, তারা প্রতি-বিপ্লব ঘটাতে সচেষ্ট ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, অস্ট্রিয়ার রাজা লিওপোল্ড ছিলেন ফ্রান্সের রাণী মারি আতোঁয়ানেতের ভাই। তিনিও ছিলেন বিপ্লব-বিরোধী। তাছাড়া তিনি নিজের বোন ভগ্নিপতি প্রমুখকে রক্ষায় তৎপর ছিলেন।

রাজা ষোড়শ লুইয়ের সমর্থনে অস্ট্রিয়ার লিওপোল্ড পাদুয়া নামক স্থান থেকে এক প্রচারপত্র প্রকাশ করেন (জুলাই, 1791)। এবং ফরাসি রাজতন্ত্রের অনুকূলে হস্তক্ষেপ করার আহ্বান জানান। ঐ বৎসর 27 আগস্ট প্রাশিয়ার রাজা ফ্রেডারিক দ্বিতীয় উইলিয়াম ও অস্ট্রিয়া-রাজ যুগ্মভাবে পিলনিজ নামক স্থানে মিলিত হ'য়ে এক ঘোষণাপত্র দ্বারা ইয়োরোপের সমস্ত রাজাদের ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে আহ্বান জানান। 1792 খ্রিস্টাব্দে (পয়লা মার্চ) অস্ট্রিয়ার রাজা লিওপোল্ডের মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসলেন বিপ্লব-বিরোধী কঠোর মনোভাবাপন্ন দ্বিতীয় ফ্রান্সিস। তিনি অস্ট্রিয়া এবং প্রাশিয়া ফ্রান্স অভিমুখে রওনা হন। ফ্রান্সের অনুরোধে অস্ট্রিয়া বা প্রাশিয়া প্রতিবিপ্লবী শরণার্থীদের বহিষ্কার করতে বা ফ্রান্সের সীমানা থেকে সৈন্য সরাতে অরাজী হলে ফরাসি আইন সভার চাপে ফরাসি সম্রাট অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন (20 এপ্রিল, 1792)। বিপ্লবের নিরাপত্তা, যুদ্ধাতঙ্ক এবং সীমানা সুরক্ষাই এই যুদ্ধের কারণ। ঐ পরিস্থিতিতে অস্ট্রিয়া-প্রাশিয়ার সম্মিলিত সেনাবাহিনীর প্রধান ব্রানস্‌উইক ঘোষণা করেন যে, মিত্রপক্ষের উদ্দেশ্য রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। এই সংবাদে উত্তেজিত ফরাসি জনতা প্যারিসে দ্বিতীয় বিপ্লব ঘটায় যার কথা আগেই বলা হয়েছে। অর্থাৎ রাজতন্ত্রেরই পত্তন ঘটল।

ডেভিড টমসনের মতে বিপ্লবী যুদ্ধ কে আগে শুরু করে তা বলা কঠিন। এই যুদ্ধ বিপ্লবী আদর্শের সঙ্গে রাজতন্ত্রের লড়াই বলে *ফিলিপ গডেলা* মনে করেন। যাই হোক, ব্রানস্‌উইকের ঘোষণা ফরাসিদের ঐক্যবদ্ধ করল। প্রথম দিকে যুদ্ধে পরাস্ত হলেও ফ্রান্সের জাতীয় সৈন্যবাহিনী অস্ট্রো-প্রাশিয়ান বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করল। ফলে ভামির (Valmy) যুদ্ধে পরাজিত হলো অস্ট্রো-প্রাশিয়ান বাহিনী (20 সেপ্টেম্বর, 1792)। অচিরে বৈদেশিক হস্তক্ষেপ আপাতত তা স্তব্ধ হলো।

জাতীয় প্রতিনিধিসভার শাসন এবং জিরন্দিন-জ্যাকবিন দলের দ্বন্দ্বঃ আইন সভা ভেঙে দেওয়ার পর জাতীয় প্রতিনিধি সভার (National Convention) অধিবেশন শুরু হলো (21 সেপ্টেম্বর, 1792)। শুরুতে জিরণ্ডিস্ট এবং জ্যাকোবিন দলের আদর্শগত প্রতিপত্তির লড়াই আরম্ভ হলো। প্রথম থেকে উভয় দলই ছিল বামপন্থী প্রজাতন্ত্রে বিশ্বাসী। উভয় দল রাজতন্ত্রের উচ্ছেদকামী হলেও জিরন্ডিস্টরা জ্যাকোবিনদের মত উগ্রপন্থী ছিল না। তাই জিরন্ডিস্টরা উগ্রপন্থী প্যারিস কমিউনের প্রাধান্যও পছন্দ করত না। অন্যদিকে

জ্যাকোবিন দল প্যারিস কমিউনের সঙ্গে সৌহার্দ্র রেখে সন্ত্রাস বিস্তারে আগ্রহী ছিল। তাই জাতীয় প্রতিনিধি সভায় এবার দক্ষিণপন্থীরূপে আসন গ্রহণ করল জিরন্ডিস্ট দল। বামপন্থীরূপে জ্যাকোবিন দল কক্ষের বাম ধারে উচ্চাসনে বসল। তাই এই দলের অন্য নাম "মাউন্টেন" (Mountain)। এই দু'দলের মাঝখানে সভাকক্ষে 'প্লেন'(Plain) নামে অভিহিত নিরপেক্ষ সদস্যরা বসত। শেষ পর্যন্ত মধ্যবিত্তদের প্রতিনিধিস্বরূপ জিরন্ডিস্টদের প্রতিপত্তি কিছুটা ম্লান হলো ও জনগণের প্রতিনিধি স্বরূপ জ্যাকোবিন দল জনতার সাহায্য নিয়ে বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিশেষ প্রভাবশালী হলো।

যাহোক্, প্রথম অধিবেশনে উভয় দলের মতভেদ প্রকট হবার পূর্বেই সর্বসম্মতিক্রমে রাজতন্ত্রের অবসান ঘোষণা করা হলো (22 সেপ্টেম্বর)। শেষ পর্যন্ত জ্যাকোবিন দল সভাকক্ষের অধিকাংশের মতামত নিয়ে বিচারের কাজ করল এবং রাজাকে বিশ্বাসঘাতকতার অপবাদে প্রাণদন্ডে দন্ডিত করল (21 জানুয়ারি, 1793)। অবিলম্বে 'গিলোটিন' যন্ত্রে তাঁর শিরচ্ছেদ করা হলো। গিলোটিন নামক এক ফরাসি চিকিৎসক এই যন্ত্রটি আবিষ্কার করেছিলেন। এই যন্ত্রে দুটি কাষ্ঠদন্ডের মাঝখানে ঝুলন্ত এক ভারী ওজনের লোহার কাটারি থাকত, যা সহজেই শায়িত মানুষের মুণ্ডচ্ছেদ করতে পারত। এই ঘটনায় ইয়োরোপের সমস্ত রাজতান্ত্রিক দেশ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে দাঁড়াল। 1793 খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, স্পেন, পর্তুগাল, সার্ডিনিয়া, নেপলস্ ইত্যাদি দেশ একত্রে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে এক বিরাট শক্তিসংঘ গঠন করল। ফলে যুদ্ধে ফ্রান্স ইয়োরোপীয় প্রথম শক্তিজোটের (First Coalition) নিকট পরাজিত হলো। পরিণতিতে ফ্রান্সের অনেগুলি অঞ্চল তাদের হাতছাড়া হলো। আর জিরন্ডিস্ট দলের সেনাপতি দুম্যরিয়ে (Dumouriez) পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে তখন দেশে ফিরলেন। এভাবেই জিরন্ডিস্ট দলের প্রভাব নষ্ট হলো।

বৈদেশিক যুদ্ধের ন্যায় রাজহত্যার ফলশ্রুতি স্বরূপ ফ্রান্স আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও বিপদের সম্মুখীন হলো। দেশের অভ্যন্তরে রাজভক্তগণ বিপ্লবী প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। ভদেঁ, লিয়ঁ, বোর্দো ইত্যাদি অঞ্চলে কৃষকগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করল। এই সঙ্কটকালীন অবস্থার মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে জাতীয় প্রতিনিধি সভা অবিলম্বে নয় জন (পরে বারো জন) সদস্য দ্বারা গঠিত এক সমিতির উপর দেশের শাসনভার অর্পণ করেন। এই সমিতি বা গণ-নিরাপত্তা সমিতি (Committee of Public Safety) নামে পরিচিত। এর আগেই দাঁতোর প্রস্তাব মত প্রতিষ্ঠিত হলো বিপ্লবী ট্রাইবুন্যাল (Revolutionary Tribunal) নামে একটি বিচারালয়। এই বিচারালয়ে বিপ্লব-বিরোধী ব্যক্তিদের চরম শাস্তিদানের ব্যবস্থা গৃহীত হলো। এর পর শুরু হলো চরম সন্ত্রাসের বা বিভীষিকার রাজত্ব (Reign of Terror)।

৮। সন্ত্রাসের রাজত্ব (সেপ্টেম্বর 1793 – জুলাই 1794)

সন্ত্রাসের রাজত্বের পটভূমিকা : সন্ত্রাসের শাসন কেন শুরু হলো তা বুঝতে হলে তার পটভূমিকা একটু ভালো করে বোঝা দরকার। *আলফ্রেড কোবান* লিখেছেন যে, "The revolution of the tenth August succeeded in destroying the monarchical constitution, but it solved none of the problems which had brought about this collapse" অর্থাৎ 1792 এর আগস্ট মাসে রাজতন্ত্রের পতন ঘনিয়ে, সংবিধান সভার কার্যাবলী অনুসারে গঠিত পূর্বের আইন সভার পরমায়ু শেষ হয়ে এলেও, ফ্রান্সের সমস্যাগুলির কিন্তু সমাধান আদৌ হয়নি। এই পরিস্থিতিতে 1792 এর সেপ্টেম্বরে রাজতন্ত্রের অবসান হয়ে প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হলো। নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের বদলে প্রজাতন্ত্র এই প্রথম প্রবর্তিত হলো ফ্রান্সে (22 সেপ্টেম্বর 1792)। এর আগে আইন সভার (Legislative Assembly) বদলে গণ ভোটের দ্বারা জাতীয় প্রতিনিধিসভার (National Convention) নির্বাচন হয়, যদিও সামান্য সংখ্যক মানুষই ভোট দিতে পেরেছিল। তবু 1792 এর সেপ্টেম্বর থেকে জাতীয় কনভেনশনের অধিবেশন বসে।

কিন্তু কনভেনশনে বিভিন্ন দল-উপদলের বিবাদ চলতে থাকে। কনভেনশনে প্রথমে ছিল জিরন্ডিস্টদের প্রাধান্য। কিন্তু বিদেশী হস্তক্ষেপের, যুদ্ধের পরাজয় এবং আভ্যন্তরীণ প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থানের চেষ্টা জিরন্ডিস্টদের পতন ডেকে আনে এবং জ্যাকবাঁ বা জ্যাকবিনদের উত্থানের পথ সুগম করে। সুভাষ রঞ্জন চক্রবর্তী লিখেছেন, "দশই আগস্টের অভ্যুত্থান ও রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ, যুদ্ধ ও বিদেশী আক্রমণ, আভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র, প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থানের আশঙ্কা স্থায়ী বিপ্লবকে একটা নতুন দিকে নিতে বাধ্য করেছিল। প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা বিপ্লবী আন্দোলনে গুণগত পরিবর্তনের সূত্রপাত করেছিল। কিন্তু বিপ্লবীদের মধ্যে বিরোধ ছিল। একদল চেয়েছিল ১৭৮৯ এর সমস্ত লাভ অটুট রেখে বিপ্লবকে সমাপ্ত করতে। অন্য দলটির সামনে ছিল আরো গণতান্ত্রিক সমাজের স্বপ্ন। দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর নেতৃত্ব দিয়েছিল জাকবাঁরা। আগস্টের পরে জনতার যৌথ মানসিকতা যুদ্ধ ও বিদেশী আক্রমণ এবং আভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্রের ভয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।"[1]

তবু জাতীয় কনভেনশন কিছু কাজ করতে পেরেছিল। যেমন— (১) রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে প্রজাতন্ত্রের ঘোষণা, (২) প্রচলিত রোমান পুরাতন বর্ষপঞ্জির বদলে নতুন বিপ্লবী বর্ষপঞ্জি পালন করা, (৩) প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিন (22 সেপ্টেম্বর থেকে) বর্ষ আরম্ভ ঘোষণা, (৪) ওজন ও পরিমাণ পদ্ধতির সংস্কার সাধন করে মেট্রিক পদ্ধতির (Metric System) প্রচলন (৫) সকল নাগরিককে 'সিটিজেন' বলে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা

---

1. সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী, "জনতা, জাকবাঁ ও গণতন্ত্র : ফরাসী বিপ্লবের একটি অধ্যায়", দ্র. গৌতম চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.) ফরাসী বিপ্লব : দুশো বছরের আলোকে , পঃ বঃ ইতিহাস সংসদ। কলকাতা, 1990. পৃ 15

(৬) শস্য ও অন্যান্য পণ্যের সর্বোচ্চ দর বেধে দেওয়া, (৭) রাষ্ট্রীয় সংহতির জন্য ফরাসি ভাষাকেই একমাত্র রাষ্ট্রীয় ভাষা ঘোষণা, (৮) দেশত্যাগী অভিজাত মানুষদের বা এমিগ্রিদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা ইত্যাদি।

জিরন্ডিস্ট এবং জ্যাকবাঁদের বিরোধ অবশ্য চলতেই থাকে। রাজার প্রাণদন্ডের প্রশ্নে মতভেদ ঘটে। শেষপর্যন্ত মাত্র একভোটে প্রাণদন্ডাজ্ঞা গৃহীত হয়। জিরন্ডিস্টদের মতে সেপ্টেম্বর হত্যাকান্ডের জন্য জ্যাকবাঁগণ বিশেষত *জাঁ পল মারা* (Marat) দায়ী। অপরপক্ষে মাউন্টেনগণ মনে করত জিরন্ডিস্টগণ নরমপন্থী ও রাজতন্ত্রের সমর্থক। 1793 খ্রিস্টাব্দে যুদ্ধে বিদেশী শক্তির কাছে বিপর্যয় এবং দেশের অভ্যন্তরে প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থানের ফলে শেষপর্যন্ত জিরন্ডিস্টদের পতন হয় 1793-র 31 মে এবং 2 জুন। জাতীয় প্রতিনিধি-সভার আভ্যন্তরীণ সঙ্কট থেকেই জ্যাকবাঁ প্রজাতন্ত্রের যেমন জন্ম তেমনি তথাকথিত সন্ত্রাসের শাসনেরও উদ্ভব। যার সময় কাল বলা যেতে পারে 1793 এর জুলাই থেকে 1794 এর জুলাই পর্যন্ত। 1794 এর 27 জুলাই ত্যরমিদর প্রতিক্রিয়ার ফলে সন্ত্রাসের শাসনের অবসান।[1]

জাতীয় প্রতিনিধি সভার শাসনকালে ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ এবং বহির্বিভাগীয় সঙ্কট থেকে মুক্তির জন্য গণনিরাপত্তা কমিটি এবং বিপ্লবী ট্রাইবুন্যাল গঠিত হয়। এই সংগঠনের মূলে ছিল জিরন্ডিস্ট ও জ্যাকোবিন দলের বিবাদ। জিরন্ডিস্ট দল চেয়েছিল সেপ্টেম্বর হত্যাকান্ডের নায়কদের শাস্তি দান এবং প্যারিস কমিউনের প্রতিপত্তি হ্রাস করতে। অন্যদিকে প্যারিস কমিউনের সাহায্য নিয়ে জ্যাকোবিন দল চেয়েছিল জাতীয় প্রতিনিধি সভার তর্ক -বিতর্ক পরিহার করে যে-কোনও মূল্যে ফ্রান্সকে আভ্যন্তরীণ ও বহির্বিভাগীয় সঙ্কট থেকে মুক্ত করতে। সুতরাং জ্যাকোবিন দল প্যারিসের জনতার সাহায্য নিয়ে জিরন্ডিস্টদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংগঠন করল এবং প্রতিনিধি সভার একত্রিশ জন জিরন্ডিস্ট নেতাকে বন্দী করল। সংগঠনের অভাবে জিরন্ডিস্টরা সহজেই পরাজিত হলো। এই ভাবে জ্যাকোবিন দল ফ্রান্সে সর্বশক্তিমান হয়ে উঠল।

জাতীয় কনভেনশনের 4th ডিসেম্বর 1793-এর আইনে বিপ্লবী সরকারের রূপরেখা অনেকটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নতুন সরকার হবে একটি সংহত ও শক্তিশালী প্রশাসক গোষ্ঠী, নিষ্ক্রীয় সংসদ এবং কেন্দ্রীভূত প্রশাসন। ঐ দিনের আইনে প্রশাসনিক ক্ষমতা কনভেনশনের দুটি কমিটির উপর ন্যস্ত হয়— একটি হলো গণ নিরাপত্তা কমিটি (Committee of Public Safety) এবং অপরটি হলো সাধারণ নিরাপত্তা কমিটি (Committee of General Security)। এরপর দেশের ভিতরে বিচারের জন্য বিপ্লবী বিচারালয় (Revolutionary Tribunal) 1794 এর 9th মার্চ গঠিত হয়। গণ নিরাপত্তা

1. বিস্তারিত ও সর্বাধুনিক আলোচনার জন্য মার্ক বুলোয়াজা, *দ্য জ্যাকবিন রিপাবলিক* 1792-1794, কেমব্রিজ, 1987

কমিটি প্রথম গঠন করা হয় 5-6 এপ্রিল। মারার নেতৃত্বে জ্যাকবিনদল 5th এপ্রিল জিরণ্ডিস্টদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। আঁরিয়ো (Hanriot)এর নেতৃত্বে জাতীয় রক্ষীবাহিনীর সাহায্যে কনভেনশনে জিরণ্ডিস্টদের পতন হলে গণনিরাপত্তা কমিটির সামনে সমস্যা দেখা দেয়। এই সমস্যা দূর করার জন্য সন্ত্রাসের শাসন শুরু হয়। অবিলম্বে গণ নিরাপত্তা কমিটি এবং বিপ্লবী ট্রাইবুন্যাল সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ শুরু করল।

গণ নিরাপত্তা কমিটির সামনে ছিল দুটি দায়িত্বপূর্ণ কর্মসূচি। প্রথমটি হলো, আভ্যন্তরীণ সঙ্কট থেকে ফ্রান্সকে মুক্ত করা এবং দ্বিতীয়টি হলো, বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে ফ্রান্সকে রক্ষা করা। আভ্যন্তরীণ বিপদের মোকাবিলার জন্য গণনিরাপত্তা কমিটি সন্ত্রাসমূলক কর্মসূচি প্রণয়ন করল। এই কর্মসূচির প্রথমাংশ হলো সন্দেহভাজনদের বিরুদ্ধে আইন (Law of suspects) প্রয়োগ। রাজতন্ত্রের প্রতি অনুগত অথবা বিপ্লব-বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত ব্যক্তি হিসাবে সন্দেহ হলেই তাকে গ্রেপ্তার করা হত। গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাদের কারাগারে নিক্ষেপ করা হত। কর্মসূচির দ্বিতীয় অংশ ছিল বিচার করার ব্যবস্থা। দ্রুত বিচার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তৈরি হয়েছিল বিপ্লবী ট্রাইবুন্যাল (Revolutionary Tribunal)। কর্মসূচির তৃতীয় অংশ ছিল গিলোটিন (Guillotine) যন্ত্রের সাহায্যে দেশদ্রোহীদের শিরচ্ছেদ করা। গণনিরাপত্তা কমিটির নির্দেশে (1793-1794) প্রায় 20,000 মানুষকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। পরোক্ষ অথবা প্রত্যক্ষভাবে যারা রাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন, যাদের বিপ্লববিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত বলে সন্দেহ করা হত তাদের সকলকেই গিলোটিনে প্রাণ দিতে হলো। উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেন রাণী মারী আতোঁয়ানেত, জিরণ্ডিস্ট দলের নেতৃ মাদাম রঁলা, ডিউক অফ অর্লিয়াঁ, দার্শনিক কুঁড়ে, সম্রাট লুইয়ের ভ্রাতা ফিলিপ, বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বেইলী এবং আরও অনেক বিখ্যাত ফরাসি সন্তান। এইভাবে জ্যাকোবিন দল যখন হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত তখন নেতা মারাকে (Marat) ছুরিকাঘাতে নিহত করল শার্লট কর্দে (Charlottee Corday) নামক এক নর্ম্যান্ডি দেশীয় তরুণী। গিলোটিন যন্ত্রের সাহায্যে যেমন সন্দেহভাজনদের পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো তেমনি আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে গণনিরাপত্তা কমিটি ভঁদে, লিয়ঁ, বোর্দো ইত্যাদি অঞ্চলে নির্দয়ভাবে নির্যাতন শুরু করল। এমন শাস্তি তাদের দেওয়া হলো যেন পুনরায় বিপ্লবের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারে।

আভ্যন্তরীণ বিপদের শঙ্কা থেকে সাময়িক মুক্তি পেয়ে গণ নিরাপত্তা কমিটি বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। বিপ্লবী সেনাপতি কারনো (Carnot) -এর সামরিক দক্ষতায় ইংল্যাণ্ড ডানকার্ক থেকে অবরোধ উঠিয়ে নিল, অস্ট্রিয়া যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ফ্রান্সের হাতে বেলজিয়ামকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো, প্রাশিয়া ও স্পেন বিপ্লবী ফ্রান্সের সঙ্গে অনুকূল শর্তে সন্ধি করতে বাধ্য হলো। সর্বত্র ফ্রান্সের সাফল্যের ফলশ্রুতি স্বরূপ ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রজোট ভেঙে গেল। সেনাপতি কারনো 'বিজয়ের স্রষ্টা বা সংগঠক" (Organiser of Victory) রূপে আখ্যায়িত হলেন।

আভ্যন্তরীণ ও বহির্বিভাগীয় (বিদেশী আক্রমণ) বিপদের শঙ্কা থেকে মুক্ত হবার পর গণনিরাপত্তা কমিটি কিছু কিছু সংস্কারমূলক কার্যে হাত দিল। তারা পুরাতন বর্ষপঞ্জীর পরিবর্তে নতুন বর্ষপঞ্জী প্রচলন করল। বলা হলো যে, এখন থেকে ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিন থেকে বর্ষারিম্ভ হবে। এছাড়া সমাজ পরিবর্তনের দোহাই দিয়ে ক্যাথলিক ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচার করা হলো যে, গির্জা, যাজক, রবিবার, স্বর্গ ইত্যাদি কিছুই থাকবে না; থাকবে শুধু বিবেকের পূজা অর্থাৎ যুক্তির মর্যাদা। ফলে খ্রিস্টধর্মের বিলোপ সাধনের প্রচেষ্টা থেকে উগ্র ও চরমপন্থী প্যারিস কমিউনের সঙ্গে জাতীয় প্রতিনিধি সভার বিবাদ উপস্থিত হলো। পরিণতিতে রোবস্‌পিয়েরের নেতৃত্বে গণ-নিরাপত্তা কমিটির হাতে নাস্তিকদের গিলোটিনে প্রাণ দিতে হলো।

ইতোমধ্যে অন্যতম নায়ক *দাঁতো* (Danton) অবিরাম রক্তপাতের বিরুদ্ধে মতামত পোষণ করতে থাকেন। সুতরাং দাঁতোকেও তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে গিলোটিনে প্রাণ দিতে হলো। তাঁর অবর্তমানে রোবস্‌পিয়ের পেলেন বিপ্লবী শাসনের একচেটিয়া অধিকার। জ্যাকোবিন দলের এই নেতার নিয়ন্ত্রণে ছিল জাতীয় প্রতিনিধি সভা, প্যারিস কমিউন, গণনিরাপত্তা কমিটি, বিপ্লবী ট্রাইবুন্যাল ইত্যাদি। গণনিরাপত্তা কমিটি জুলাই-আগস্ট, 1793 থেকে আভ্যন্তরীণ অন্তর্ঘাত ও বিদেশী আক্রমণের হাত থেকে দেশ রক্ষার জন্যই সন্ত্রাস শুরু করেন। তবে এই কমিটিতে সদস্য নানা গোষ্ঠীর ছিল যদিও সকলেই জ্যাকবিন দলের। বামপন্থী ছিলেন ম্যাকসিলিলিয়েন রোবস্‌পিয়ের, সাঁ জুস্ত, কুঁত। সাঁকুলোতদের চরমপন্থী ছিলেন বিলো-ভারেন এবং কোলো দেরবোয়া। মধ্যপন্থী রোবেয়ার লিঁদে, কারনো, প্রিয়র দ্যলা কোৎদর। আর গোষ্ঠী হিসেবে *এবের* (Hebert) পন্থী, আরাজে (Enrage) এবং দাঁতোপন্থী ছাড়া রোবস্‌পিয়েরের পন্থীগণ। সব গোষ্ঠীকে গিলোটিনে পাঠিয়ে শেষ পর্যন্ত রোবস্‌পিয়েরের ক্ষমতা অপ্রতিহত হয় 1779 এর 13 এপ্রিল থেকে 27 জুলাই পর্যন্ত। অন্য দিকে বিপ্লবী ট্রাইবুন্যালকে পুনর্গঠিত ক'রে 45 দিনের মধ্যে 1306 জনকে গিলোটিনে শিরচ্ছেদ করলেন। এর ফলে বন্ধু ও শত্রু সকলেই শঙ্কিত হলো। শেষে আতঙ্কিত সদস্যরা একদিন সন্ধ্যায় রোবস্‌পিয়ের আর তাঁর অনুগামীদের বন্দী করলেন। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে রোবস্‌পিয়ের সহ তাঁর 24 জন সহকর্মীকে গিলোটিনে প্রাণ দিতে হলো। তাঁর অবর্তমানে বিভীষিকার রাজত্বের (Reign of Terror) পরিসমাপ্তি ঘটল (27 জুলাই, 1794)। রোবস্‌পিয়ের ও তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া বিপ্লবী ক্যালেণ্ডার অনুসারে ত্যরমিদর মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল বলে একে, *ত্যরমিদরের প্রতিক্রিয়া* (Thermidorian Reaction) বলা হয়। যাই হোক, সন্ত্রাসের শাসনের প্রকৃতি নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। *তেন* (Taine) লিখেছেন যে, সন্ত্রাসের ফলে যোগ্য নেতৃত্বের অভাব ঘটে। এই মত মানেননি *ওলার*। তাঁর মতে যুদ্ধ এবং প্রতিবিপ্লবী শক্তির মোকাবিলার জন্য প্রয়োজন ছিল নির্মম সরকারের। *জোরেস, মাতিয়ে, লেফেভর* প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ সন্ত্রাসের রাজত্ব অর্থনৈতিক সংস্কার বলে উল্লেখ করেছেন।

সন্ত্রাসের প্রকৃতি ও তাৎপর্য : বৈপ্লবিক সরকার বা সন্ত্রাসের রাজত্বের প্রয়োজন আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক জরুরী অবস্থা থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। তবে সন্ত্রাসের প্রকৃতি ও তাৎপর্য নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। তেন একদা লিখেছিলেন যে বিপ্লবের অগ্রগতির ফলে সদবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের আধিপত্য কমে আসে। এই মত আদৌ গ্রহণীয় নয়। বিপ্লবী নেতাদের আদর্শবাদ কম ছিল না। রাজতন্ত্রীরা খুব যোগ্য ছিলেন এমন কথা বলা যায় না। ওলার দেখিয়েছেন যে, সন্ত্রাসের পিছনেও ব্যক্তিগত কারণের চেয়ে ঘটনা পরম্পরাই বেশি দায়ী ছিল। জোরেস, মাতিয়ে, লেফেভর প্রমুখের লেখা থেকে বোঝা যায় যে, আর্থনীতিক নিয়ন্ত্রণ বিপ্লবের চরিত্রকে বদলে তার সামাজিক ভিত্তিকে আরও বিস্তৃত করার চেষ্টা করেছিল।

সন্ত্রাসের আমলে অবশ্যই বাড়াবাড়ি হয়েছিল। গিলোটিনে পাঠানো হয়েছিল এমন অনেককেই যারা প্রতিবিপ্লবী ছিলেন না। অনেক ক্ষেত্রে বিচারের নামে প্রহসন করা হয়েছে। গণ নিরাপত্তা সমিতি শেষ পর্যন্ত সাধারণ মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার করে এবং জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মতপার্থক্য ও ক্ষমতা দখলের ইচ্ছা কি সন্ত্রাসের পিছনে কাজ করেনি? যদি জরুরি অবস্থার প্রয়োজনেই সন্ত্রাস হয়ে থাকে তাহলে তা মিটে যাওয়ার পরেও অব্যাহত ছিল কেন? এই সব যুক্তির মধ্যে সত্যতা আছে। তবে একথা মানতেই হবে সন্ত্রাসের শাসন বিপ্লবকে রক্ষা করেছিল। মনে রাখা দরকার যে, সন্ত্রাসের সময় নানা আমূল সংস্কারপন্থী কার্যসূচিও গ্রহণ করা হয়েছিল। ত্যরমিদর প্রতিক্রিয়ার পিছনে সন্ত্রাসের ব্যর্থতা নয়, বিপ্লবী জনতার হতাশা এবং সমস্যার সমাধান না হওয়াই দায়ী। সন্ত্রাসের রাজত্বের পিছনে গণতান্ত্রিক ও সাম্যের আদর্শও কাজ করেছে। সুতরাং বিপ্লবের ইতিহাসে ফ্রান্সে সন্ত্রাসের শাসন এক তাৎপর্যপূর্ণ যুগ, যদিও তার অনেক ত্রুটি ছিল।

৯। ন্যাশানাল কনভেনশন বা জাতীয় প্রতিনিধিসভার পুনরাগমন

রোবস্পিয়েরের হত্যাকারীরা এবার জাতীয় প্রতিনিধি সভায় বা ন্যাশানাল কনভেনশনে শক্তিসম্পন্ন হলো। বিভীষিকার অবসান ঘটানোর উদ্দেশ্যে তারা অবিলম্বে উগ্রপন্থী প্যারিস কমিউন ভেঙে দিল, বিপ্লবী ট্রাইবুন্যালকে সাময়িকভাবে স্থগিত রাখল, গণনিরাপত্তা কমিটিকে নিয়ন্ত্রণ করল এবং জ্যাকোবিন দলটির কর্মসূচি স্তব্ধ করে দিল। পুনরায় যাতে ফ্রান্সে রক্তপাত না ঘটে তার জন্যে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করল।

জাতীয় প্রতিনিধি সভার কৃতিত্ব পর্যায়ে যে-সব কাজ হয়েছে সেগুলি ফ্রান্সের রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনে কম প্রভাব বিস্তার করেনি। জাতীয় প্রতিনিধি সভা এই যুগেই আনুষ্ঠানিকভাবে ফ্রান্সকে প্রজাতান্ত্রিক দেশ হিসেবে ঘোষণা করে। তৎকালীন ইয়োরোপে প্রচলিত রোমান বর্ষপঞ্জী প্রচলন করা হয়। নিখুঁত পরিমাপ ও ওজনের

ক্ষেত্রে দশমিক রীতি বা মেট্রিক পদ্ধতি (Metric System) প্রচলিত হয়। দেশত্যাগী ভূস্বামীদের ভূ-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ক'রে সেগুলিকে ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি-বণ্টন এবং সকলকে সমহারে কর দানে বাধ্য করা হয়। এই সময় সমগ্র দেশ থেকে যেমন ভূমিদাস প্রথার বিলোপ ঘটানো হয় তেমনি ঋণ পরিশোধে অসমর্থ ব্যক্তিকে শাস্তিদানের প্রথা নাকচ করা হয়। জনগণের স্বচ্ছলতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে খাদ্যদ্রব্যের ঊর্ধ্বতন মূল্য বেঁধে দেওয়া হয়। অতীতে অভিজাত সাধারণ ব্যক্তির পার্থক্যকে বুঝবার জন্য যেভাবে কথাবার্তা, আচার-আচরণ, পোষাক-পরিচ্ছদে পার্থক্য নির্দেশ করা হত সেগুলির উচ্ছেদ ঘটিয়ে সকল স্তরের নাগরিকদের মধ্যে সাম্যের পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়। রুশোর মতবাদের ভিত্তিতে এই সময় ফ্রান্সের জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হয়। শিশু কেন্দ্রিক তত্ত্বের উপর গুরুত্ব দিয়ে প্রাথমিক স্কুল, সেন্ট্রাল স্কুল, শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্র, পলিটেকনিক স্কুল ইত্যাদিকে পুনর্গঠন করা হয়। এছাড়া এই যুগেই মিউজিয়াম ও লাইব্রেরী সহ অন্যান্য বহু শিক্ষামূলক সংস্থাও প্রতিষ্ঠিত হয়।

লক্ষ্য করা যায়, বিপ্লব একদিকে যেমন ফ্রান্সে বিভীষিকার সৃষ্টি করেছে অন্য দিকে তেমনি প্রগতিশীল সংস্কারমূলক কর্মসূচির বাস্তবায়নের মাধ্যমে ফ্রান্সকে আধুনিকতার দ্বারদেশে পৌঁছে দিয়েছে। এটাই হল ফরাসি বিপ্লবের গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য।

রোবস্‌পিয়ের ও তাঁর সঙ্গীদের গিলোটিনে পাঠানো হলো 1794 এর 27 জুলাই। তারপর সন্ত্রাসের অবসান হলেও ন্যাশানাল কনভেনশন বা জাতীয় প্রতিনিধি সভা 1795 এর 26 অক্টোবর পর্যন্ত চলেছিল। কনভেনশন আবার পুরোনো কর্তৃত্ব ফিরে পেলেও তারা 'শ্বেত সন্ত্রাস' শুরু করায় এবং বিপ্লবী সরকারের সমস্ত নীতি পরিবর্তন করার চেষ্টা করায় আবার সংকট দেখা দিল। শেষ পর্যন্ত কনভেনশন নতুন করে বুর্জোয়া আধিপত্যের সংবিধান রচনা করে। এই সংবিধানই পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট প্রশাসন বা ডিরেক্টরি।

১০। ডিরেক্টরি বা পঞ্চ পরিচালকের শাসন (1795–1799)

জাতীয় প্রতিনিধি সভার (National Convention) কার্যকাল উত্তীর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সে পঞ্চ পরিচালকের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। বস্তুত জাতীয় প্রতিনিধি সভা বা জাতীয় কনভেনশন কার্যকাল (21 সেপ্টেম্বর 1792 থেকে 26 অক্টোবর 1795) শেষ হবার আগেই আভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত বিপদ থেকে বিপ্লবী ফ্রান্সকে রক্ষা করার জন্য এক নতুন সংবিধান রচনা করে, তার নাম ডিরেক্টরি। এই সংবিধান অনুসারে পাঁচজন ডিরেক্টারকে নিয়ে এক কার্যনির্বাহী সংস্থা গঠন করা হয়। এছাড়া পুরানো পরিষদ (Council of Ancients) ও 'পাঁচশো সদস্যের পরিষদ' (Council of Five Hundred) নামে দুটি কক্ষ সমন্বিত এক আইনসভাও গঠন করা হয়। ডিরেক্টারদেরও পাঁচ বছরের

জন্য আইনসভার দ্বারা নির্বাচিত করার ব্যবস্থা করা হয়। পঞ্চ পরিচালকের সামনে ছিল দুটি গুরু-দায়িত্ব: একটি হলো আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা বিধান এবং অন্যটি বিদেশী শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ।

ডিরেক্টরির শাসনাধীনে ফ্রান্সে বিপ্লবী প্রভাব ক্রমশ লোপ পেতে শুরু করে। এর ফলস্বরূপ আর্থিক দুরবস্থা, রাষ্ট্রীয় জীবনে দুর্নীতি, ধর্মীয় অত্যাচার এবং ধনী শ্রেণীর ক্ষমতাবান হয়ে ওঠার মধ্যে দেখতে পাই। ফ্রান্সে মুদ্রাস্ফীতি, সোন-রুপার দাম কমে যাওয়ার ফলে আর্থিক সংকটে পড়েন শাসকগণ।

ত্যরমিদরে প্রতিক্রিয়ার পর অতিবাম ও অতি দক্ষিণপন্থীর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করার যে নীতি (যাকে 'বাসকুল নীতি' বলা হত) ডিরেক্টরি নিয়েছিলেন তা সফল হয়নি। বিপ্লববাদীগণ ইয়োরোপের- বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার এবং যাজক ও এমিগ্রি বা দেশত্যাগীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। আর সংস্কারপন্থীগণ যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে শাসনতান্ত্রিক সরকার গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন। এই সংস্কারপন্থীদের নিয়ে 'ক্লিচিয়েনস্' দল গঠিত হয়। তাই এই টানা-পোড়েনে ডিরেক্টরি কাজ করতে পারেননি। তদুপরি অযোগ্য শাসন, নিজেদের দুর্নীতি, সৈন্যবাহিনীর উপর নির্ভরতা ও জনসাধারণের দুর্দশা তাদের পতন ডেকে আনে। সরকার ভয় পেয়ে জ্যাকোবিনদের 'পাতেয়ঁ' (প্যান্থেয়ন) ক্লাব বন্ধ করে দেন।

ডিরেক্টরির সময়ে সব থেকে বড় আক্রমণের সম্ভাবনা এসেছিল 1796 খ্রিস্টাব্দে বব্যুফ (Babeuf) -এর নেতৃত্বে পরিচালিত 'সাম্যের ষড়যন্ত্র' থেকে। বব্যুফ সম্পত্তির বিলোপ গঠন করে এক সাম্যবাদী সমাজ চেয়েছিলেন। এই বামপন্থী নেতা ভবিষ্যতের সাম্যবাদের পূর্বসূরী বলে অনেকে মনে করেন। যাই হোক, তাঁর ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে এবং পরিণতিতে তাঁর প্রাণদণ্ড হয়। আভ্যন্তরীণ এই সব সমস্যা ডিরেক্টরির রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ শিথিল করে। বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে তখন ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রথম রাষ্ট্রজোটের (First Coalition) যুদ্ধ চলছিল। অস্ট্রিয়া, সার্ডিনিয়া, ইংল্যান্ড ছিল ফ্রান্সের বিপক্ষে। প্রথম দিকে ফ্রান্সের বিফলতার পর এক তরুণ সেনাপতি এই যুদ্ধের মধ্য দিয়েই সাময়িক সাফল্য লাভ ক'রে ক্রমে ফরাসি জাতির ত্রাণকর্তা হিসেবে অবতীর্ণ হন। তাঁর নাম নেপোলিয়ান বোনাপার্ট।

১১। ফরাসি বিপ্লবের ফলাফল

1789 থেকে 1799 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ফ্রান্সের যে বৈপ্লবিক পরিস্থিতি ছিল তার ফলে ফ্রান্সের সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি সবই আলোড়িত ও প্রভাবিত হয়েছিল। একথা ঠিক যে, বিপ্লব একটি নির্দিষ্ট সরল রেখা ধরে চলেনি তবে বিপ্লবের যে প্রভাব ইতিহাসে চিরস্থায়ী হয়ে আছে, তা হলো 'পুরোনো সমাজ' এর পতন। বিপ্লব ছিল অসম্পূর্ণ

কিন্তু সম্পূর্ণ ব্যর্থ বলা যায় না। একেবারে গোড়ায় অভিজাত বিদ্রোহ, পরে বুর্জোয়া বিপ্লব এবং বিশেষ সময় গণ-অংশগ্রহণ তাই লক্ষ্য করা যায়। ফরাসি বিপ্লবই প্রথম রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল যদিও সেই প্রজাতন্ত্র দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ফরাসি বিপ্লবের ফল ছিল সুদূর প্রসারী এবং তা শুধু ফ্রান্সের ভৌগোলিক সীমানায় আবদ্ধ ছিল না।

প্রথমতঃ, বিপ্লবের (এবং নেপোলিয়ানের পতনের) পর আবার বুরবোঁ বংশীয় শাসন ও রাজতন্ত্র ফিরিয়ে আনা হলেও পুরোনোব্যবস্থা আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, ফরাসি বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শ ফ্রান্স এবং সমগ্র বিশ্বের জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তৃতীয়তঃ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ সুবিধা বা "প্রিভিলেজ' বিলুপ্ত হওয়াতে সামন্ততন্ত্রও বিলুপ্ত হয়। ভবিষ্যতে এক নতুন স্বাধীন কৃষক সমাজ ও ফ্রান্সে শিল্পায়নের পর শ্রমজীবী সমাজের উদ্ভব ঘটল। চতুর্থতঃ, পুরোনো সমাজ ভেঙে যাওয়ায় চার্চ আর হৃত ক্ষমতা ফিরে পায় নি। চার্চ শুধু একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হলো। পঞ্চমতঃ, বিপ্লব বুর্জোয়া শ্রেণীর উত্থানের পথ সুগম করেছিল। সর্বশেষে বলা যায়, বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে রাষ্ট্রের চরিত্র বদল ঘটে, জাতীয় ঐক্যও প্রতিষ্ঠিত হয়। চিন্তার ক্ষেত্রে এক নতুন যুগ আসে যার প্রতিফলন সাহিত্যে ও শিল্পে লক্ষ্য করা যায়। আবার প্রতিবিপ্লবী আদর্শও ছড়িয়ে পড়ে। ফরাসি বিপ্লব গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের বার্তাবহন করে নতুন ঊষার অভ্যুদয় ঘটিয়েছিল।

অধ্যায় ৩

নেপোলিয়ান বোনাপার্ট (1799-1815 খ্রিঃ)

(Syllabus: *Rise of Napoleon-Internal Reconstruction-Napoleon and Europe-Napoleon and Revolution)*

১। সূচনা

সাম্প্রতিক গবেষণায় নেপোলিয়ান (ফরাসি উচ্চারণে ন্যাপোলেয়ঁ) বোনাপার্টকে বলা হয়েছে ফরাসি বিপ্লবের 'ত্রাণকর্তা'।[1] কথাটির মর্মার্থ এই যে, পুরোনো ব্যবস্থা (ancient regime) ভেঙে ফ্রান্সে যে নবযুগের সূচনা হয় তার সূত্রপাত অভিজাতদের বিদ্রোহের মধ্যে। তারপর যে রাজনৈতিক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল, তৃতীয় এস্টেটের অন্তর্গত বুর্জোয়া শ্রেণী যুগপৎ রাজতন্ত্রের স্বৈরাচার ও অভিজাত- উচ্চ যাজকদের বিশেষ সুবিধার (Privilege) বিরুদ্ধাচরণ করে তাকে বৈপ্লবিক পরিবর্তনে রূপান্তরিত করে। বিপ্লবের ব্যাপকতর সামাজিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে 1789 থেকে 1799 খ্রিস্টাব্দে দিরেক তোয়ারের (ডিরেক্টরি) সময়ে নেপোলিয়ানের উত্থানের পথ তৈরি হওয়া পর্যন্ত ফরাসি বিপ্লবের ঘটনা সমূহ এক সহজ সরল রেখা ধরে অগ্রসর হয়নি। বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক গোষ্ঠীর উত্থান ও আধিপত্য বিপ্লবের সামাজিক এবং রাজনৈতিক চরিত্রে প্রতিফলন ঘটায়। সংবিধান সভা ও তারপর আইনসভার মধ্যে যেমন বুর্জোয়া প্রাধান্য পরিষ্কার তেমনি জনতার হস্তক্ষেপ বিপ্লবে এক বিশেষ মাত্রা যোগ করেছিল।[2] জনতার ভূমিকা জ্যাকবাঁ (জ্যাকবিন) দলের ক্ষমতাকালীন পর্বে চূড়ান্তরূপে দেখা যায়। কিন্তু ত্যরমিদর প্রতিক্রিয়া এবং পঞ্চপরিচালকের শাসনাধীনে ডিরেক্টরির সময়ে বুর্জোয়া প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই পর্বের শেষে 1799 খ্রিস্টাব্দের 18 ব্রুমেয়ার (9. Nov.) সেনানায়ক নেপোলিয়ান বোনাপার্টের অভ্যুত্থান যেমন ফ্রান্সের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ এনে দেয়, তেমনি তিনিই দেখা দেন ফরাসি বিপ্লবের ত্রাণকর্তা হিসেবে।[3]

প্রথম কনসাল হিসেবে নতুন শাসনব্যবস্থার প্রধান হিসেবে তিনি যখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন তখন তাঁর বয়স মাত্র তিরিশ বছর। তবে তাঁর জীবন সম্পর্কে

1. J. Tulard, *Napoleon : The Myth of the Saviour* (1985)

2. সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী, "জনতা, জাকবাঁ ও গণতন্ত্র : ফরাসী বিপ্লবের একটি অধ্যায়", দ্রঃ গৌতম চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.) ফরাসী বিপ্লবঃ দুশো বছরের আলোকে, কলকাতা, 1990

3. ফরাসি বিপ্লবের সময় যে নতুন বিপ্লবী ক্যালেণ্ডার প্রবর্তিত হয় সেগুলির মাস হলো ভঁদেমিয়ের, ব্রুমেয়ার, ফ্রিমেয়ার, নিভোজ, প্লুভিয়েজ, ভঁতোজ, জ্যরমিনাল, ফ্লোরেয়াল, প্রেইরিয়াল, মেসিদ্‌র, ত্যরমিদর ও ফ্রুকতিদর। 1795 এর ত্যরমিদর মাসের 18 তারিখে (29 জুলাই) 'ত্যরমিদর প্রতিক্রিয়া'র মাধ্যমে যেমন রোবস্‌পিয়েরের পতন, তেমনি 1799 এর ব্রুমেয়ার মাসের 10 তারিখে (9 Nov.) নেপোলিয়ানের দ্বারা ডিরেক্টরি ক্ষমতাচ্যুত হয়।

কিংবদন্তী এত বেশি এবং ঐতিহাসিকদের মধ্যে নানা মত এত ব্যাপক যে, রোমান্টিক ব্যক্তিত্বের আড়ালে ইতিহাসপুরুষ হারিয়ে যেতে বসেছে। উনিশ শতকে তাঁর সম্পর্কিত কিংবদন্তী এবং তাঁর আদর্শ ফ্রান্সে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলেছিল।[1] তবে প্রতিভাবান সামাজিক নায়ক, রাজনৈতিক বাস্তব ধারণার অধিকারী নেপোলিয়ানের ত্রুটিও কম ছিল না। নিজে স্বৈরাচার বিরোধী ছিলেন অথচ সাফল্যের পিছনে ছুটতে গিয়ে নিজেই স্বৈরাচারী হয়ে পড়েন। ঐতিহাসিক পিয়েতর হাইল সেজন্য তাঁর ভালো-মন্দ উভয় দিকের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।[2]

তাঁর অনেক জীবনী লেখা হয়েছে।[3] তবে ফ্রান্সের ইতিহাসে 1799 খ্রিস্টাব্দ থেকে 1815 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কাল নেপোলিয়ান বোনাপার্টের নামের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত।[4] যাদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে নেপোলিয়ান ক্ষমতা লাভ করেছিলেন তাঁদের আশা ছিল যে তাঁরাও নেপোলিয়ানের সামরিক খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা ব্যবহার করে ক্ষমতা উপভোগ করবেন। বাস্তবে তা হয়নি। বস্তুত তারা নেপোলিয়ানের রোম্যান্টিক মন আর উচ্চাকাঙ্খা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করতে পারেন নি। আবার প্রজাতান্ত্রিক ফ্রান্সে ক্ষমতালাভ করে বিপ্লবের পদাতিক নেপোলিয়ান নিজের বিপুল জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে গণস্বীকৃতি নিয়েই ধীরে ধীরে নিজের একাধিপত্য বিস্তার করে ফ্রান্সের সম্রাট হয়ে বসেন। তারপর ক্ষমতা ছড়িয়ে দেন সমগ্র ইয়োরোপে, প্রসারিত হয় বৈপ্লবিক আদর্শ। ফলে গোটা ইয়োরোপে তাঁর প্রভাব পড়ে। শুরু হয় সংঘর্ষ। শেষপর্যন্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্নিহিত দুর্বলতাই তাঁর পতন ডেকে আনে। ডেভিড টমসন তাই মন্তব্য করেছেন, "The Napoleonic Empire was doomed because of its inherent and self-defeating, contradictions।"[5] তবু নেপোলিয়ানের উত্থান ইয়োরোপের ইতিহাসের চমকপ্রদ অধ্যায়।

২। নেপোলিয়ানের উত্থান

1769 খ্রিস্টাব্দের 15 আগস্ট ইতালির অন্তর্গত ভূমধ্যসাগরের কর্সিকা (Corsica) দ্বীপে এক বনেদী পরিবারে নেপোলিয়ান জন্মগ্রহণ করেন। দ্বীপটি ছিল ফ্রান্সের অধীনে। তাই জাতীয়তায় তিনি ছিলেন ফরাসি। আসলে প্রকৃত বিচারে নেপোলিয়ান ফরাসি

---

1. এ নিয়ে আলোচনা করেছেন H.A.L. Fisher তাঁর *Bonapartism* শীর্ষক গ্রন্থে

2. P. Geyl, *Napoleon : For and Against* (trans, 1949)

3. এগুলির মধ্যে সহজপাঠ্য এবং তথ্যবহুল : Vincent Cronin, *Napoleon*, Penguin Books, 1973 এবং Emil Ludwig, *Napoleon*, Pocket Books. New York, 1953.

4. নেপোলিয়ান ও ফ্রান্সের ইতিহাস জানার পক্ষে J. M. Thompson, *Napoleon Bonaparte : His Rise and Fall* (1952) ; G. Lefebvre , *Nepoleon* (1935), F.M.H. Markham, *Napoleon and the Awakening of Europe*, (1954) ; *The New Cambridge Modern History*, Vol IX ইত্যাদি উপযোগী।

5. D. Thomson ; *Europe Since Napoleon*, (1971) p. 62

নন; ইতালিয়ানও নন। বলা উচিত কর্সিকান। কর্সিকা দ্বীপটি রুক্ষ পাহাড় পর্বতে ভর্তি, মানুষজন কম। জনগণও নির্ভীক ও রুক্ষ প্রকৃতির। নেপোলিয়ানের জন্মের মাত্র পনের মাস আগে ইতালির জেনোয়া থেকে দ্বীপটি ফ্রান্সের অধিকারে আসে। সুতরাং ঘটনাচক্রে তিনি ফরাসি হিসেবেই জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা কার্লো বোনাপার্ট ছিলেন আইনজীবী, আর মাতা লিটিসিয়া রোমোলিনি ছিলেন অপূর্ব সুন্দরী। প্রাথমিক পাঠ শেষ করার পর তিনি প্যারিসের এক সামরিক বিদ্যালয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে শিক্ষালাভ করেন ও সতেরো বছর বয়সে গোলন্দাজ বাহিনীতে যোগদান করেন।

1768 খ্রিস্টাব্দের 15 May ফরাসি রাজ চতুর্দশ লুই কর্সিকা দ্বীপটি কিনে নিয়েছিলেন। এই দ্বীপে পাওলি (Paoli) নামক নেতার অধীনে এক দেশপ্রেমিকের দল জেনোয়া থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা কামনা করত। তাঁরা ফ্রান্সের অধীনতাও মানতে চায়নি। কার্লো বোনাপার্ট প্রথমে সেই দলে থাকলেও পরে ফরাসিদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক স্থাপন করে রাজকীয় পদলাভ করেছিলেন। কার্লো (Carlo) এবং লিটিসিয়া (Letizia) ছিলেন ধনী। তারা কর্সিকার এ্যাজাক্কিও (Ajaccio) অঞ্চলের বাসিন্দা। বোনাপার্টদের পূর্বপুরুষরা টাসকানির লোক। ষোড়শ শতকে এসে তারা কর্সিকায় বসতি স্থাপন করেন। যাই হোক, নেপোলিয়ান পিতার স্বাচ্ছল্যে ও ফরাসিরাজের সঙ্গে সুসম্পর্কের দরুণ ওতঁ (Autun), ব্রিয়েন (Brienne) ও প্যারিসের সামরিক কলেজে শিক্ষা লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি অত্যন্ত সাহসী ছিলেন। সামরিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে 1786-এর জানুয়ারি মাসে আর্টিলারি বা ওলন্দাজ বাহিনীতে সেকেণ্ড লেফটেন্যান্ট হিসেবে যোগ দেন।

ফ্রান্সের বিপ্লবী আদর্শে উদ্বুদ্ধ নেপোলিয়ান ছিলেন জ্যাকোবিন দলের সমর্থক। 1793 খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ বাহিনী ভূমধ্যসাগরের উপকূলে ফ্রান্সের অধীনস্থ তুলোঁ বন্দর অবরোধ করলে তিনি অতর্কিত আক্রমণে উক্ত বন্দরটি উদ্ধার করেন।

এখানে বলা দরকার যে, নেপোলিয়ান সৈন্য হিসেবে জীবন শুরু করার তিন বছরের মধ্যেই ফ্রান্সে বিপ্লবের দামামা বেজে ওঠে। ওলন্দাজ বাহিনীর অধিকাংশ অফিসারের মতন তিনিও বিপ্লবকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। তাঁর লেখা একটি রচনায় (1791 সময়ের) রুশোর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। 1792-তে প্যারিসে রাজার চরম অপমান তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ন্যাশানাল কনভেশনে জিরন্দিন-জ্যাকবিন দ্বন্দ্বে তিনি শেষোক্ত দলের সমর্থক ছিলেন। ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে তুলোঁ (Toulon) বন্দরে বিদ্রোহ ঘটে এবং তা ব্রিটিশের হাতে দেওয়া হয়। নেপোলিয়ানের প্রথম সামরিক অভিযান সার্দিনিয়াতে (1793) সফল না হলেও, 1793-র ডিসেম্বর মাসে তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্রিটিশ নৌবাহিনীকে বিতাড়ন করে তুলোঁ পুনরুদ্ধার তাঁর প্রথম বড়ো সাফল্য। এই সাফল্যের ফলেই তিনি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পদে উন্নীত হন। 1795 খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে ভঁদেমিয়ের উন্মত্ত

উচ্ছৃঙ্খল জনতা প্যারিসের জাতীয় প্রতিনিধি সভা আক্রমণ করলে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে সেই আক্রমণ প্রতিহত করেন। এই দুটি ঘটনা নেপোলিয়ানের প্রথম সামরিক সাফল্য। এতেই তাঁর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। পূর্বোক্ত তুলোঁ বন্দর রক্ষা করে ফ্রান্সের নিরাপত্তা বজায় রাখা রোবস্‌পিয়ের-এর ভাই অগুস্ত্যাঁ বিশেষভাবে পালন করেছিলেন। রোবস্‌পিয়ের-এর সঙ্গেও নেপোলিয়ানের বন্ধুত্ব ছিল। এই বন্ধুত্বের কারণেই ত্যরমিদরীয় প্রতিক্রিয়ার ফলে (27 জুলাই 1794) নেপোলিয়ানকেও জ্যাকবাঁ সন্ত্রাসবাদী সন্দেহে কারাগারে পাঠানো হয়। এর পরিণতিতে তাঁর ক্ষমতায় আরোহণের পথ তো রুদ্ধ হলোই, অতি অল্পের জন্য গিলোটিনে যেতে যেতে বেঁচে যান। তাঁর বিরুদ্ধে কোনও সন্ত্রাসবাদী কাজের প্রমাণ না পাওয়ায় তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ভঁদেমিয়েরের অভ্যুত্থান (5 Oct, 1795) নেপোলিয়ানের সামনে নতুন সুযোগ এনে দেয়। আগে মুক্ত হয়ে, তিনি নিজপদেই বহাল হয়েছিলেন। জ্যাকবিন দলের পতনের বা ত্যরমিদরের প্রতিক্রিয়ার পর ন্যাশানাল কনভেনশনের অবলুপ্তি ঘটে এবং নতুন সংবিধান গৃহীত হয়। এর পরও প্যারিসে কয়েকটি অভ্যুত্থান ঘটে। 1795 -এর 5 অক্টোবর বিত্তবান ও রক্ষণশীল রাজতন্ত্রী, অভিজাত শ্রেণী এবং জাতীয় রক্ষী বাহিনীর অনেক সৈন্য, সব মিলে প্রায় পঁচিশ হাজার এক অভ্যুত্থান ঘটায়। কনভেনশনের অধিবেশন চলে 26 অক্টোবর পর্যন্ত ; তার আগেই ডিরেক্টরি নামক সংবিধান গৃহীত হয়েছে। ডিরেক্টরির অন্যতম নেতা বারাসকে (Barras) ভঁদেমিয়েরের অভ্যুত্থান দমনের দায়িত্ব দেওয়া হলে তিনি নেপোলিয়ানকে সেই দায়িত্ব দেন। প্রজাতন্ত্র-বিরোধী এই রাজতন্ত্রী বিদ্রোহ প্যারিসের রাস্তায় কামান দেগে কার্যত ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন নেপোলিয়ান বোনাপার্ট। পুরস্কার স্বরূপ তিনি মেজর জেনারেল পদে উন্নীত হন এবং আভ্যন্তরীণ সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব লাভ করেন।

1796 খ্রিঃ তিনি যোসেফিন নামে এক বিপ্লবী সেনানায়কের বিধবাকে বিবাহ করে ফরাসি সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। ডিরেক্টরির শাসনাধীন ফ্রান্সে নেপোলিয়ান বোনাপার্ট কর্তৃক প্রথম কোয়ালিশনের বিরুদ্ধে চমকপ্রদ সাফল্যই তাঁর দ্রুত উত্থানের পথ প্রশস্ত করে। 1796 খ্রিস্টাব্দে নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ইতালির বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়ার দায়িত্ব পান। এর আগে জার্মানিতে অস্ট্রিয়বাহিনী ফরাসি সেনাপতি জুরদাঁকে পরাস্ত করেছিল। নেপোলিয়ান তাঁর নতুন রণকৌশল ও রণনীতিকে সার্থকভাবে প্রয়োগ করে ইতালি অভিযানে প্রায় অবিশ্বাস্য ও অলৌকিক সাফল্য পান। ফলে ইতালিতে ফরাসি প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি এক মাসেরও কম সময়ে পাঁচটি খণ্ডযুদ্ধে সার্দিনিয়াকে পরাস্ত করেন, স্যাভয় ও নিস্‌ ফ্রান্সের অধিকারে আসে, অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়ে তাদের মিলানের যুদ্ধে পরাজিত করেন, পোপের রাজ্যগুলির উপর ফরাসি প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শেষপর্যন্ত অস্ট্রিয়ার আর্চডিউক চার্লস ভীত হয়ে কাম্পো ফরমিয়ো-র সন্ধি (অক্টোবর 1798) করতে বাধ্য হন। ইতালি ও অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে

চমকপ্রদ সাফল্য নেপোলিয়ানের ফ্রান্সে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করে, ফ্রান্সের সম্মান ইয়োরোপে বৃদ্ধি পায়, প্রথম কোয়ালিশন তখন প্রায় ভেঙ্গে পড়ে।

ফরাসি বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা, রাজতন্ত্রের পতন, রাজা ও তাঁর সমর্থকদের শিরচ্ছেদ, বিপ্লবী আদর্শের প্রচার ইত্যাদির জন্য এবং ইয়োরোপে রাজনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য বিপ্লবোত্তর পরিস্থিতিতে বিপ্লবী যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধে ব্রিটেন, অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, সার্দিনিয়া, স্পেন, রাশিয়া প্রমুখ মিলে ক্রমে জোট বা কোয়ালিশন গঠন করে। প্রথম কোয়ালিশন গঠিত হবার পরে যুদ্ধ চলতে থাকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে 1796-তে ইতালির বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়ার ভার পেয়ে নেপোলিয়ান তাঁর নতুন রণনীতি ও রণকৌশলকে সার্থকভাবে প্রয়োগ ক'রে। অবিশ্বাস্যভাবে ইতালিতে পর্যাপ্ত ফরাসি প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ক'রে এবং অস্ট্রিয়াকে যুদ্ধ বন্ধ ক'রে শান্তি সম্পাদনে বাধ্য ক'রে বিপুল খ্যাতিলাভ করেন। ইতালি ও অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে বোনাপার্টের অভাবনীয় সাফল্যের ফলে ফ্রান্স ইয়োরোপে নতুন রাজনৈতিক মহিমালাভ করে।

ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গের মধ্যে অবশিষ্ট রইল ইংল্যাণ্ড। সোজাসুজি ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করে ইংল্যাণ্ড আক্রমণের পরিবর্তে তিনি ঔপনিবেশিক শক্তিতে শক্তিমান ইংল্যাণ্ডকে ভারতে যাতায়াতের পথ রুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। ভারত ছিল ইংল্যাণ্ডের রত্নভাণ্ডার। তাই নেপোলিয়ান মিশর জয়ের পরিকল্পনা রূপায়নের ব্যবস্থা করলেন। মিশরের পিরামিডের যুদ্ধে জয়লাভ করেও শেষ দিকে নীলনদের যুদ্ধে ব্রিটিশ নৌ-সেনাপতি হোরেশিও নেলসনের হাতে পরাজিত হন (1798)। এটাই তার জীবনের প্রথম পরাজয়। যাই হোক, ব্রিটিশ নৌবাহিনীর অজ্ঞাতে তিনি ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন করতে সমর্থ হন। ফ্রান্স সেনাপতি অশ (Hoche) -এর অধীনে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যে অভিযান পাঠিয়েছিল তা ব্যর্থ হয়েছিল। নেপোলিয়ান তখনই বুঝেছিলেন যে চ্যানেল অতিক্রম করে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে জেতা মুশকিল। 1798-এ ফরাসি প্রভাব বহুদিকে বিস্তৃত হয়েছিল। নেপোলিয়ান মিশর অভিযানে প্রথমে সফল হলেও তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়নি। কেননা ইংরেজ বাণিজ্য ও নৌশক্তির ক্ষতি করা যায়নি। উপরন্তু ঐ সময়ে ইয়োরোপে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় কোয়ালিশন গঠিত হয়।

ফ্রান্সে ফিরেই তিনি লক্ষ্য করলেন যে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলি পুনরায় জোটবদ্ধ হয়েছে। যাকে বলা হয় দ্বিতীয় কোয়ালিশন। পঞ্চ পরিচালকের শাসনে দুর্নীতি প্রবেশ করেছে। রাজতন্ত্রীরা পরিচালকদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। প্রশাসন অযোগ্য, তারা ডিরেক্টরি সেনাবাহিনীর উপর নির্ভরশীল। আর্থনীতিক সংকট তারা সমাধান করতে পারেনি। এই অবস্থায় নেপোলিয়ান বোনাপার্ট এক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বিপ্লবী ক্যালেণ্ডার অনুসারে 18 ব্রুমেয়ার (9 নভেম্বর) তারিখে বলপূর্বক সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে ডিরেক্টরি ভেঙে দিয়ে ফ্রান্সের ক্ষমতা দখল করেন।

আসলে ডিরেক্টরি এবং নতুন সংবিধান গৃহীত হলেও 1795 এরপর পরিচালকগণ সাবধানে এগোতে চেয়েছিল। প্রথম পাঁচজন ডিরেক্টর ছিলেন বারাস (Barras), লা র‍্যাভেলিয়ের (La Ravelliere), ল্যতুর্নিয়ে (Letournier), র‍্যউবেল (Reubel) ও কারনো (Carnot)। ডিরেক্টরির রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ক্রমশ শিথিল হয়ে আসে। ঘনিয়ে আসে ফরাসি বিপ্লব ও প্রজাতন্ত্রের অন্তিম দিন। এর জন্য অযোগ্য শাসন যেমন দায়ী, সেনাবাহিনীর ওপর নির্ভরতা, দুর্নীতি, অর্থনৈতিক সমস্যা দূর করার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা ইত্যাদির ফলে জনসাধারণের দুর্দশা বেড়ে যায়। ইতালি অভিযানে নেপোলিয়ানের চমকপ্রদ সাফল্যের ফলে তাঁর জনপ্রিয়তা তখন তুঙ্গে। নেপোলিয়ানও ক্ষমতার স্বপ্ন দেখেছিলেন। সতীর্থদের কাছে তিনি নাকি মন্তব্য করেছিলেন, "আপনারা কি মনে করেন আমি ইতালিতে জয়লাভ করেছি শুধু ডিরেক্টরির আইনজীবীদের সুবিধে হওয়ার জন্য?"

নেপোলিয়ানের বাহিনী মিশর থেকে ফিরে আসে 17 ভঁদেমিয়ের (9 অক্টোবর)। যুদ্ধমন্ত্রী বারনাদোৎ তাঁর সামরিক বিচারের প্রস্তাব দেন, কারণ তিনি সেনাবাহিনী পরিত্যাগ করে ফ্রান্সে ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু ফ্রান্সের গণমানসে পরিত্রাতা হিসেবে তখন তিনি দেখা দিয়েছেন। যুদ্ধে বিজয়, শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করতে হলে তাকে দরকার— জনগণ তাই চান। তাই নেপোলিয়ান ফ্রান্সে ফেরার পরই শুরু হয়ে যায় নতুন করে ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টা (Coup d'etat)। এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেন আবে সিয়েস। তালেরাঁর মধ্যস্থতায় বোনাপার্টের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা হয়ে যায়। ডিরেক্টরির আমলে পূর্বেকার গৃহীত সংবিধান অনুযায়ী আইনসভার দুটি পরিষদ ছিল— প্রবীণ বা বর্ষীয়ানদের সভা (Les Ancients) যার সদস্য 250 জন এবং পাঁচশতের পরিষদ। আবে সিয়েসের চাপে 1st ব্রুমেয়ার নেপোলিয়ানের ভাই লুসিয়া বোনাপার্টকে পাঁচশতের পরিষদের সভাপতি করা হলো। বারাস নিরপেক্ষ থাকলেন। এরপর এলো 18 ব্রুমেয়ারের সেই দিন। নেপোলিয়ান গিয়ে সসৈন্যে পরিষদে পৌঁছলেন এবং ডিরেক্টরির অবসান ঘটালেন। তবে মনে রাখা দরকার যে সিয়েস, দুকো, বারাস, তালেরাঁ বা অন্যান্য কেউই ভাবতে পারেন নি যে নেপোলিয়ান নিজেই ক্ষমতা দখল করবেন। তাঁরা নেপোলিয়ানের সামরিক প্রতিভা ও বিপুল জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগাবেন ভেবেছিলেন। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল 1799 এর 9 নভেম্বরের পর ফ্রান্সের নিয়ন্ত্রণ চলে গেল নেপোলিয়ান বোনাপার্টের হাতে।

শুরু হলো 'নেপোলিয়ানের যুগ' (Age of Napoleon)। এই যুগে চারটি শক্তির প্রভাব তাঁর উপর পড়েছিল। (ক) ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা (খ) শাসনতান্ত্রিক সংস্কার (গ) ইয়োরোপে রাজ্যবিস্তার এবং (ঘ) ইয়োরোপীয় শক্তিজোটের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ। নেপোলিয়ান ডিরেক্টরি শাসনের পতন ঘটিয়ে কনসুলেট (Consulate) নামে নতুন শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করলেন।

নেপোলিয়ানের ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছিল 'কনসুলেট' নামক নতুন শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে। এই শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন আবে সিয়েস। তাঁর তখন একান্ন বছর বয়েস। তাঁর নীতি ছিল 'ওপর থেকে কর্তৃত্ব নিচের থেকে আস্থা' ('Authority must come from above and confidence from below')।[1] আলফ্রেড কোবান মন্তব্য করেছেন যে, "সিয়েস, যিনি বিপ্লবের বার্থ সার্টিফিকেট লিখেছিলেন, তিনি বিপ্লবের মৃত্যু পরোয়ানাতেও স্বাক্ষর করেছিলেন।"[2] কারণ 1789 যদি দৈব অধিকারের সমাপ্তি বলে ধরা যায় তাহলে 1799 হলো একনায়কতন্ত্রের সূচনাকাল। আবে সিয়েসের মতে ফ্রান্সে একটি মজবুত ও কার্যকর শাসনব্যবস্থা করার জন্য শাসনবিভাগকে শক্তিশালী করা দরকার ছিল। কিন্তু প্রথম কনসাল হিসেবে নেপোলিয়ান হলেন কনসুলেট শাসনের সর্বেসর্বা; অপর দুই কনসাল সিয়েস এবং দুকো ছিলেন ঠুঁটো জগন্নাথ। যাই হোক, এই নতুন সংবিধানকে বলা হয় 'অষ্টম বছরের সংবিধান' (Constitution of the Year VIII)। নেপোলিয়ান সহ আরও দুজন কনসালের উপর শাসনভার অর্পিত হলো। নেপোলিয়ান হলেন সর্বশক্তিমান প্রথম কনসাল। ক্ষমতায় অধিষ্ঠান থেকে পতন পর্যন্ত নেপোলিয়ানের যুগকে চার পর্বে ভাগ করা যায়। যথাক্রমে—

(ক) কনসাল হিসেবে নেপোলিয়ান (1799-1804)।

(খ) ইয়োরোপে রাজ্যবিস্তার (1804-1807) ও সম্রাট হিসেবে সাফল্য।

(গ) টিলসিটের সন্ধির পর থেকে তাঁর ব্যবস্থার ভাঙন (1807-1812)।

(ঘ) চূড়ান্ত পর্ব ও নেপোলিয়ানের পতন (1812-1815 খ্রিঃ)।

প্রথমপর্বে নেপোলিয়ান ছিলেন প্রথম কনসাল; প্রথমে অস্থায়ী, পরে এক বিশেষ ব্যবস্থা দ্বারা সারা জীবনের জন্য। তারপর প্রজাতন্ত্র উঠিয়ে দিয়ে তৈরি করলেন সাম্রাজ্য, নিজেই হলেন সম্রাট। এই প্রথমপর্ব তাঁর জীবনের সবচেয়ে সৃষ্টিশীল পর্ব বলা যেতে পারে, কারণ শুধু যে ধাপে ধাপে নিজের উচ্চাকাঙ্খা পূরণ করেছেন তাই নয় যুদ্ধের সফল পরিণতি এবং কিছু দীর্ঘস্থায়ী আভ্যন্তরীণ সংস্কার ঐ পর্বে তাঁর জীবনকে চিহ্নিত করেছিল। দ্বিতীয় পর্ব চিহ্নিত আছে সারা ইয়োরোপে নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্য বিস্তার আকাঙ্খা এবং ফরাসি প্রভাব বিস্তার করার প্রচেষ্টা দ্বারা। টিলসিটের সন্ধিতে এই দ্বিতীয় পর্ব শেষ বলা যেতে পারে। দ্বিতীয় পর্ব পর্যন্তও তিনি মোটামুটি সফল। তৃতীয় পর্বে দেখা গেল নেপোলিয়ানের ব্যবস্থায় ভাঙন—মহাদেশীয় পদ্ধতির ক্ষেত্রে যা লক্ষ্যণীয় স্পেন বা জার্মানিতে জাতীয় চেতনার উন্মেষের মধ্যে। শেষপর্ব আরও ব্যর্থতায় ঢাকা—রাশিয়ায় নিষ্ফল অভিযান থেকে ওয়াটার্লুর পরাজয়; সব যার অন্তর্গত।

1. ডেভিড টমসন; পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ 48.

2. আলফ্রেড কোবান, *আ হিস্টারি অফ মডার্ন ফ্রান্স*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ 13.

কনসাল হিসেবে নেপোলিয়ান ঃ পঞ্চ পরিচালক সভার পতনের (9 নভেম্বর, 1799) সঙ্গে সঙ্গে নেপোলিয়ান কনসুলেট নামে একখানি শাসনতন্ত্র রচনা করলেন। এই শাসনতন্ত্রে বলা হলো যে, পরবর্তী দশ বছরের জন্য সেনেট কর্তৃক নির্বাচিত তিনজন কনসালের উপর শাসনভার অর্পণ করা হবে। এই তিন জনের মধ্যে একজন হবেন প্রথম্ ও প্রধান এবং অন্য দুজন হবেন তার উপদেষ্টা। এই ব্যবস্থায় নেপোলিয়ান হলেন প্রথম কনসাল; কার্যত রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।

প্রথম কনসালের হাতে রইল যুদ্ধ ঘোষণা, শান্তিস্থাপন, মন্ত্রী ও রাষ্ট্রদূত নিয়োগের ক্ষমতা। আইনসভা ভেঙে চারটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা হলো। এই চারটি অংশ হলো রাজ্যপরিষদ, বিচারালয়, বিধান সভা ও সেনেট। 1800 খ্রিস্টাব্দে এক গণভোটে এই সংবিধান অনুমোদিত হয়েছিল।

কনসুলেট শাসন ব্যবস্থা বিষয়ে আরও একটু বিস্তারিত বলা দরকার। কোবানের মন্তব্যঃ "But Bonaparte was determined that he himself, as First Consul, should have effective and undivided executive authority. Even the other two Consuls were to be little more than rubber stamps". এই মন্তব্যের সত্যতা এই যে, কনসুলেট শাসনব্যবস্থায় দেখা যায় আইনসভার চেয়ে শাসনপরিষদের ক্ষমতা অনেক বেশি এবং শাসনপরিষদ বলতে নামে তিন কনসাল হলেও মূলতঃ প্রথম কনসালই অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী। আর আইনসভার কার্যত কোনও ক্ষমতাই ছিল না। আইনসভার চারটি ভাগ ছিল— কাউন্সিল অফ স্টেট, সিনেট, ট্রিবুনেট এবং লেজিসলেচার। ট্রিবুনেট ও লেজিসলেটিভ বডির সদস্যগণ সরাসরি প্রত্যক্ষ নির্বাচনে নির্বাচিত হত না। প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যেক কমিউন তাদের মোট সংখ্যার এক দশমাংশ নির্বাচিত করত। সেই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের আবার একদশমাংশ নিজেদের মধ্যে নির্বাচন করে জাতীয় তালিকা তৈরি হত। এবার তার থেকে ট্রিবুনেট এবং লেজিসলেচার-এর জন্য মনোনয়ন করত সেনেট। আর সেনেট এবং কাউন্সিল অফ স্টেট এর সদস্যদের মনোনয়ন করবেন প্রথম কনসাল। এতে জনসাধারণের সঙ্গে আইন বিভাগের দূরত্ব বেড়ে যায়। তাছাড়া আইনরচনার প্রক্রিয়াও ছিল জটিল। কাউন্সিল অফ স্টেট (25 জন) আইনের প্রস্তাব আনত। তারপর ট্রিবুনেট (100 জন) সেই প্রস্তাব আলোচনা করত কিন্তু ভোটাভুটিতে অংশ নিতে পারত না; তারপর লেজিসলেচার (300 জন) আলোচনা না করে কেবল প্রস্তাব ভোটে পাস করত এবং চতুর্থ ধাপে সেনেট (৪5জন) সেই আইনের শাসনতান্ত্রিক যৌক্তিকতা বিচার করে চূড়ান্ত অনুমোদন বা তা নাকচ করত।

ক্রমে ক্রমে দেখা গেল ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ; সমস্ত ক্ষমতাই নেপোলিয়ানের হাতে। ফলে আইনসভায় এবং ট্রিবুনেটে অনেকেই তাঁর সমালোচনা করছিলেন। প্যারিস এবং প্রদেশগুলিতে রাজকীয় ষড়যন্ত্রও ছড়িয়ে পড়ছিল। এমনকি তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্রও

হয়। কিন্তু তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তা তাকে সাহায্য করে। 1800 খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে এক গণভোটে এই শাসন অনুমোদিত হয়—পক্ষে পড়ে তিরিশ লক্ষ এগারো হাজার সাত ভোট, বিপক্ষে মাত্র একহাজার পাঁচশো বাষট্টি ভোট। এরপর 1800-খ্রিস্টাব্দের মে মাসে 'সিনেটাস কনসুল্টাস' দ্বারা সংবিধান সংশোধন করে নেপোলিয়ান হয়ে গেলেন সর্বেসর্বা। ফরাসি জাতি নেপোলিয়ানকে সমর্থন করেছিল তার অন্যতম কারণ, মজবুত সরকার ও বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে জবরদস্ত্ নেতা চাওয়ার ইচ্ছা।

নতুন শাসনতন্ত্র অনুসারে প্রথম কনসাল রূপে নেপোলিয়ান ইয়োরোপীয় দ্বিতীয় রাষ্ট্রজোটের বিরুদ্ধে তৎপর হলেন। নেপোলিয়ান যখন মিশর অভিযানে ব্যস্ত সেই সময় এই রাষ্ট্রজোটটি তৈরি হয়েছিল। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ফ্রান্সের বিরুদ্ধে গঠিত কোয়ালিশন ভেঙে দেওয়া, তাঁর অনুপস্থিতিতে ইয়োরোপে যে সব পরিবর্তন হয়েছিল তার প্রতিবিধান করা। অবিলম্বে নেপোলিয়ানের বাহিনী অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করল (1800) এবং তিনি নিজে ইতালি পুনরুদ্ধার করলেন। অস্ট্রিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রান্সিস এর সঙ্গে লুনেভিল-এর শান্তি চুক্তিতে (Peace of Luneville) ইতালি হলো ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত এবং রাইন নদী ফ্রান্সের পূর্বসীমা হিসেবে স্বীকৃত হলো। এরপর ফ্রান্সের বাহিনী ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল। যুদ্ধের ফলস্বরূপ 1802 খ্রিস্টাব্দে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে আমিয়াঁর শান্তিচুক্তি (Peace of Amiens) স্থাপিত হয়। এই চুক্তিতে ইংল্যাণ্ড কর্তৃক অধিকৃত ফ্রান্সের উপনিবেশগুলি ফ্রান্স পুনরুদ্ধার করল। সেই সময় থেকে ইয়োরোপীয় দ্বিতীয় রাষ্ট্রজোটের বিলুপ্তি ঘটল।

অধ্যাপক সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী লিখেছেন, "একদিকে সীমান্ত অতিক্রম করে ইয়োরোপে ফ্রান্সের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হবার পর নেপোলিয়ানের মিশর অভিযান আশঙ্কার সৃষ্টি করেছিল; অন্যদিকে তাঁর অনুপস্থিতিইয়োরোপীয় দেশগুলিকে নতুন করে জোটবদ্ধ হতে সাহায্য করেছিল।" এরই ফলে গঠিত হয় দ্বিতীয় কোয়ালিশন। ফলে এই কোয়ালিশনের সঙ্গে আবার শুরু হয় ফ্রান্সের যুদ্ধ। মিত্রশক্তিতে ছিল ব্রিটেন, অস্ট্রিয়া, রাশিয়া, পর্তুগাল, নেপলস্ প্রমুখ। কনসুলেট শাসন শুরু হওয়ার আগেই দ্বিতীয় রাষ্ট্রজোট গঠিত হয়। 1799 -এর গোড়ার দিকে অস্ট্রিয় বাহিনীর তুলনায় ফরাসিবাহিনী ছিল ক্ষুদ্র; নেপোলিয়ান তাঁর বাহিনী নিয়ে গিয়েছিলেন মিশরে এবং ফরাসি বাহিনীর সংগঠনও ছিল দুর্বল। এর ফলে ইঙ্গ-রুশ বাহিনী হল্যাণ্ড আক্রমণ করে। হল্যাণ্ডে তখন ফ্রান্সের তাঁবেদার ব্যাটাভিয়ান রিপাবলিক ক্ষমতাশীল। অপর দিকে অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার যুগ্মবাহিনী ইতালি আক্রমণ করে। ফ্রান্সের তাঁবেদার ইতালির সিজালপাইন প্রজাতন্ত্র, সুইটজারল্যাণ্ডের হেলভেশিয়ান প্রজাতন্ত্র ইত্যাদি বিপন্ন হয়। রাশিয়া আইওনীয় দ্বীপপুঞ্জ দখল করে নেয়। অর্থাৎ নানা প্রান্তে ফরাসি বাহিনীর পরাজয় ঘটে। কিন্তু নেপোলিয়ান মিশর থেকে ফিরে এসে কনসাল হিসেবে ক্ষমতালাভ করার পর অবস্থা বদলে যায়। বস্তুত নেপোলিয়ান ফেরার আগেই ফরাসি বাহিনী অবস্থা অনেকটা সামলে

নেয়। মাসেনা-র নেতৃত্বে এক বাহিনী সুইটজারল্যাণ্ড থেকে রুশ বাহিনীকে হটিয়ে দেয়, ব্রুন-এর নেতৃত্বে এক বাহিনী হল্যাণ্ডে ইঙ্গ-রুশদের প্রতিরোধ করে।

এরপর নেপোলিয়ান দ্বিতীয় রাষ্ট্রজোটের বিরুদ্ধে চমকপ্রদ সাফল্য পান। রাশিয়ার জার পলকে মাল্টা প্রত্যাপর্ণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করান। 1800 খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে আলপস্ অতিক্রম করে ফরাসি বাহিনী ইতালিতে প্রবেশ করে মারেংগার যুদ্ধে অস্ট্রিয় বাহিনীকে পরাজিত করে। ডিসেম্বরে মারার নেতৃত্বে আর এক বাহিনী হোনেবলিনভিন এর যুদ্ধে অস্ট্রিয়াকে আবার হারায়। অস্ট্রিয়া বাধ্যহয়ে 1801-এর 9 ফেব্রুয়ারি 'লুনেভিল এর সন্ধি' স্বাক্ষর করে। এই সন্ধির ফলে অস্ট্রিয়া ক্যাম্পোফর্মিডর সন্ধির আগেকার শর্ত পুনরায় স্বীকার করে নেয়, স্বীকার করে বাটাভিয়ান, সিজালপাইন, হেলভেশিয়ান প্রজাতন্ত্র; রাইন নদীর বামপার্শস্থ অঞ্চল এবং বেলজিয়ামের উপর ফ্রান্সের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। 1801 খ্রিস্টাব্দে স্পেন ও ফ্রান্সের মধ্যেও চুক্তি হয়, যার দ্বারা ফ্রান্স আমেরিকার লুইসিয়ানা লাভ করে। শেষপর্যন্ত ইংল্যাণ্ডও ফ্রান্সের সঙ্গে আমিয়াঁর সন্ধি (Treaty of Amiens) দ্বারা ফ্রান্সের সঙ্গে সাময়িক শান্তি (Truce) বজায় রাখতে বাধ্য হয়।

৩। নেপোলিয়ানের আভ্যন্তরীণ শাসনসংস্কার

বিদেশী রাষ্ট্রজোটের অবসানে ফ্রান্স স্বস্তি বোধ করল। এবার কনসাল হিসেবে নেপোলিয়ান ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ সংস্কার কার্যে মনোযোগ দিলেন। উদ্দেশ্য ছিল বিপ্লব-বিধ্বস্ত ফ্রান্সের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা। বস্তুতপক্ষে কেবলমাত্র প্রতিভাবান যুদ্ধবিশারদ ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে নয়, সংস্কারক এবং শাসক হিসেবেও নেপোলিয়ান কীর্তির স্বাক্ষর রেখে গেছেন। ফিশার তাই মন্তব্য করেছেন, "যদিও নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্য ছিল ক্ষণস্থায়ী কিন্তু তার বেসামরিক সংস্কারগুলি ছিল শক্ত পাথরের উপর তৈরি"। ফরাসি বিপ্লবের আদর্শগুলির মধ্যে তিনি সাম্য পছন্দ করতেন এবং মনে করতেন জনগণও তাই চায়। কিন্তু তিনি স্বাধীনতা পছন্দ করতেন না। তাই প্রজাতন্ত্র তাঁর কাম্য ছিল না। পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করার পাশাপাশি তিনি আভ্যন্তরীণ সংস্কারেও মনোযোগী হন।

শাসনসংস্কারের উদ্দেশ্য ঃ নেপোলিয়ান ছিলেন উচ্চাকাঙ্খী; প্রথম কনসাল হিসেবে তিনি একনায়ক হয়ে ওঠেন। এই কনশালপর্বে তাঁর শাসনব্যবস্থার অধিকাংশ সংস্কার গৃহীত হয়। তবে এই প্রসঙ্গে তাঁর আভ্যন্তরীণ সংস্কার ও শাসন, সম্রাট হিসেবে তাঁর রাজত্ব অব্যাহত ছিল। তাঁর শাসন সংস্কারের উদ্দেশ্য ছিল সহজ কথায় তিনটি। প্রথমতঃ, জনহিতকর কাজ করে জাতির কৃতজ্ঞতা লাভ করা; দ্বিতীয়তঃ, প্রয়োজনীয় সংস্কার করে নিজের শক্তিবৃদ্ধি করা; তৃতীয়তঃ, শাসনব্যবস্থার দুর্বলতাগুলিকে দূর

করে এক শক্তিশালী শাসন প্রবর্তন করা। তিনি বলেছিলেন, 'আমার নীতি হলো মানুষদের শাসন করা, কারণ তাদের অধিকাংশই শাসিত হতে চায় এবং আমি বিশ্বাস করি এভাবেই জনগণের সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হতে পারে।" নেপোলিয়ানের সঙ্গে ফরাসি বিপ্লবের সম্পর্ক আমরা পরে যথাস্থানে আলোচনা করব কিন্তু এখানে বলা দরকার, তিনি বলেছিলেন, 'ফরাসি জাতি যা চায় তা হলো সাম্য, স্বাধীনতা নয়।' সেই জন্যই তাঁর শাসন-সংস্কারের মধ্যে আমরা দেখি স্বৈরাচারী মনোভাব, সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করার প্রবৃত্তি, আবার প্রাচীন ব্যবস্থা বা বিশেষ অধিকারভোগ যাতে কখনো ফিরে আসতে না পারে সে ব্যাপারেও তিনি উদ্যোগ নেন। ডেভিড টমসন তাকে আঠারো শতকের শেষ এবং সর্বপ্রধান প্রজাহিতৈষী ও জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী বলে উল্লেখ করেছেন।[1]

শাসন বিভাগীয় সংস্কার : শাসনবিভাগের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তাই দেশের প্রচলিত স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষমতা খর্ব করা হলো। আগেকার মতন সমগ্র ফ্রান্সকে 83টি ডিপার্টমেন্ট বা প্রদেশে বিভক্ত করা হয় এবং প্রতিটি প্রদেশকে আবার ছোট অংশে ভাগ করা হয়। অর্থাৎ 83টি ডিপার্টমেন্ট 547টি জেলা বা ক্যান্টনে, সেগুলি বহু কমিউনে বিভক্ত করা হয়। এগুলির শাসনভার দেওয়া হলো প্রিফেক্ট, সাব-প্রিফেক্ট, মেয়র প্রমুখ কর্মচারীদের উপর। তবে প্রথম কনসাল স্বয়ং এই সব কর্মচারীদের নিযুক্ত করতেন। এতে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে এলেও স্বায়ত্তশাসন খর্ব হলো। বিচার বিভাগেও বিচারকগণ নেপোলিয়ান কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। সকলের সহানুভূতি লাভ করার জন্য তিনি দেশত্যাগী বা এমিগ্রিদের প্রতি নরম মনোভাব দেখালেন। রাজতন্ত্রী এবং জিরণ্ডিস্টদের জন্য সরকারি চাকরির দ্বার উন্মুক্ত হলো।

এখানে কতকগুলি বিষয় লক্ষ্য করা দরকার। নেপোলিয়ান কেন্দ্রীভূত শাসন গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। এজন্য কনসুলেট সংবিধান সংশোধন ক'রে তিনি যাবজ্জীবন কনসাল হন এবং 1804 খ্রিস্টাব্দে রাজতন্ত্রী ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ার পরে তিনিও প্রজাতন্ত্রের শাসন সম্পূর্ণ ত্যাগ করে সম্রাট পদ গ্রহণ করেন। বিশেষ উল্লেখ্য যে নেপোলিয়ান নির্বাচনের বদলে মনোনয়ন পক্ষপাতী ছিলেন। ফলে ডিপার্টমেন্ট, ক্যান্টন এবং কমিউনের প্রিফেক্ট, সব প্রিফেক্ট বা মেয়রদের নিজেই মনোনীত করতেন। পুরো শাসন তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রিফেক্টগণ ছিলেন প্রায় সর্বময় কর্তা। ইতিহাসবিদ *তকভিল* তাই তাদের পুরোনো ইনটেনডেন্টদের সঙ্গে তুলনা করেছেন। স্থানীয় প্রাদেশিক সভাগুলি ছিল বটে তবে

1. "His over-all pur pose was a systematic reconstruction of the main legal, financial and administrative institutions of France, which gives Bonaparte a strong claim to be the last and greatest of the eighteenth century benevolent despots"—ডেভিড টমসন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ 57

তাদের বিশেষ ক্ষমতা ছিল না। তবে নেপোলিয়ান মনোনয়ন দেবার সময় যোগ্যতাকেই মাপকাঠি হিসেবে ধরতেন। নেপোলিয়ানের শাসন বিভাগীয় সংস্কারের মূল বৈশিষ্ট্য কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ।

অর্থনৈতিক সংস্কার : অর্থনৈতিক সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য ছিল পুরোনো ব্যবস্থার আর্থিক বিধিব্যবস্থা এবং কর প্রথা দূর করা। এছাড়া ব্যয় সংকোচ, কঠোরভাবে কর সংগ্রহ এবং বিজিত দেশগুলি থেকে বাধ্যতামূলক অর্থআদায়ের মাধ্যমে তিনি ফ্রান্সের ঘাটতি বাজেটে ভারসাম্য আনলেন। কাগজী মুদ্রার প্রচলন ও ডিরেক্টরির আমলে দুর্নীতি ফ্রান্সে যে অরাজক অবস্থা সৃষ্টি করেছিল তা দূর করার জন্য নেপোলিয়ান 1800 খ্রিস্টাব্দে 'ব্যাঙ্ক অফ ফ্রান্স' প্রতিষ্ঠা করেন। কেন্দ্রীয় ঋণ দান এবং বাজারে নোট ছাড়ার একচেটিয়া অধিকার তাদের দেওয়া হয়। কর আদায়ের জন্য কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া ও কর আদায়কারীদের কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের অধীনে আনা হয়। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ থেকে আর্থিক ভাণ্ডার গড়ে তোলা হলো। বণিকসংঘকে পুনর্গঠিত করা হয় (1802), ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিকাশলাভ ঘটে।

নেপোলিয়ানের আর্থিক সংস্কার প্রসঙ্গে আরও মনে রাখা দরকার যে, অবাধ বাণিজ্যের নীতি থেকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণই তাঁর বেশি কাম্য ছিল। তবে তাঁর নিয়ন্ত্রণের ধারণা রোবস্‌পিয়েরের নেতৃত্বে পরিচালিত গণ-নিরাপত্তা কমিটির নিয়ন্ত্রণের মতন ছিল না। তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রের উৎসাহে কৃষির অগ্রগতি, ফ্রান্সের পক্ষে সুবিধাজনক বাণিজ্য এবং যথেষ্ট পরিমাণে ধাতুর যোগান। ডিরেক্টরির আমলে আসিএ্যা নামক কাগজী মুদ্রার বিলোপ সাধন করা হয়। তাই নেপোলিয়ান মুদ্রা ব্যবস্থাকে স্থিতিশীল রাখার জন্য ধাতুনির্মিত মুদ্রার পুনঃপ্রচলন করেন। ব্যাঙ্ক অফ ফ্রান্স (1800) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুদ্রাব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালন শুধু নয় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদেরও সাহায্যে হাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়। মনে রাখা দরকার, নেপোলিয়ান নতুন কর ধার্য করলেন না কিন্তু পুরাতন কর দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হলো। বস্তুত ফ্রান্সে বহুদিন পর অর্থনীতির ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও অমিতব্যয় বন্ধ হলো। সরকারি ব্যয় কমানো, অর্থদপ্তরকে রাজস্ব এবং হিসাবকক্ষ এই দুই ভাগে বিভক্ত করা ইত্যাদি কাজ একাজে সহায়ক হয়। কৃষি ও শিল্পের অগ্রগতি নেপোলিয়ানের আমলে শুরু হয় নতুন ভাবে। রুটি ও মাংসের ব্যবসায় তিনি গিল্ড ব্যবস্থারও পুনঃপ্রবর্তন করেন। তবে শ্রমিকদের সংগঠন করতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। রুটি বা ময়দার সর্বোচ্চ দর ঠিক করে দেওয়া বা শস্য রপ্তানির ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণের ফলে খাদ্যাভাব কমে আসে।

আইন সংস্কার : ফরাসি বিপ্লবের সময় যে আইন সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছিল নেপোলিয়ান আইন বিশেষজ্ঞদের দিয়ে সেই কাজ সম্পূর্ণ করেন। ফ্রান্সের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন আইনগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে তিনি 1804 খ্রিস্টাব্দে সংকলন

করালেন 'কোড নেপোলিয়ান' বা সিভিল কোড। অনুরূপভাবে তৈরি হলো দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন বিধি। এই আইন সংস্কার খুবই উল্লেখযোগ্য। আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান, ধর্মীয় সহনশীলতা, ভূমিদাস প্রথার বিলোপ, কৃষকদের মালিকানা স্বত্ব, সামন্ততন্ত্রের বিলোপ, উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে সাম্য ইত্যাদি ছিল এই আইন সংস্কারের বৈশিষ্ট্য। কোড নেপোলিয়ান বেশ উল্লেখযোগ্য কীর্তি। ইয়োরোপের অনেক দেশই এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। 1804 খ্রিস্টাব্দের 'সিভিল কোড'ই পরে (1807) 'কোড নেপোলিয়ান' নামে পরিচিত। তবে প্রচলিত আইন সংকলনের কাজ শুরু হয়েছিল 1792 থেকেই। ঐ উদ্দেশ্যে কনভেনশন যে সমিতি তৈরি করে তারাই 779টি আইনের ধারা সংকলন করেছিলেন। পরে ডিরেক্টরির সময়ে ঐ সংখ্যা বাড়িয়ে 1004 করা হয়। নেপোলিয়ান নিজে আইনের ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। কাউন্সিল অফ স্টেট এর মোট 84টি অধিবেশনে আইন নিয়ে আলোচনা হয়েছিল, এর মধ্যে 36 টি স্বয়ং নেপোলিয়ান সভাপতিত্ব করেছিলেন। নতুন কোড-এর বৈশিষ্ট্য সাম্য এবং কর্তৃত্ব উভয় দিকের সামঞ্জস্য। আইনে সামন্ততান্ত্রিক অধিকারেরও অবসান ঘটানো হয়েছিল। কোড সংকলনে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন Tronchet এবং Portales। মোট 2287টি কোড সংকলিত হয়।

শিক্ষা সংস্কারঃ নেপোলিয়ান শিক্ষা সংস্কারেও বিশেষ মনোযোগী হন। প্রাথমিক শিক্ষা ছিল পৌরসভার হাতে। মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে এক শিক্ষা অধিকর্তার অধীনে আনা, সরকারি অনুদানে কতকগুলি নির্বাচিত বিদ্যালয় বা 'লিসে' প্রতিষ্ঠা করা, পেশাগত শিক্ষার দিকে নজর দেওয়া, কারিগরী বিদ্যালয় ও সামরিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদির পাশাপাশি সমগ্র দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ইউনিভার্সিটি অফ ফ্রান্স দ্বারা নিয়ন্ত্রণ তাঁর উল্লেখযোগ্য সংস্কার। নেপোলিয়ানের শিক্ষা সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকদের আনুগত্য বৃদ্ধি করানো।

নেপোলিয়ান শিক্ষাব্যবস্থায় যে পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন তার মধ্যে নারীশিক্ষা বা মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে প্রচেষ্টার অনুপস্থিতি চোখে পড়ে। বিদ্যালয় সরকারি-বেসরকারি দুইই ছিল। প্রাথমিক বিদ্যালয় (e'cole communale) ছিল পৌরসভাগুলির হাতে। মাধ্যমিক বিদ্যালয় (e'cole centrales) ছিল সরকারি বেসরকারি হাতে। ডেভিড *ক্রনিন* লিখেছেন যে, 1866 খ্রিস্টাব্দে মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ছিল 377 (বেসরকারি) এবং 370 (সরকারি)। প্যারিস শহরেই বারোটি আইন-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শিক্ষার ব্যাপারেও বিশেষ নজর দেওয়া হয়। সুনাগরিক করাই ছিল শিক্ষা সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য।

কাজের স্বীকৃতি ঃ নেপোলিয়ান কাজের দক্ষতার স্বীকৃতি ও পুরস্কার স্বরূপ নাগরিকদের মধ্যে বিশিষ্টদের **'লিজিয়ন অফ অনার'** নামে বিশেষ সম্মানের ব্যবস্থা

করেন (1802)। এতে ফরাসি বিপ্লবের সাম্যের আদর্শ আঘাত পেল, ফলে বৈষম্য বাড়ল কিন্তু এর দ্বারা সামরিক-বেসামরিক উভয়ক্ষেত্রেই কর্মের উদ্যোগ বৃদ্ধি পেল।

জনহিতকর কার্যাবলী : নেপোলিয়ান নানা জনহিতকর কাজের উদ্যোগ নেন। প্রাচীন সৌধগুলির সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের পাশাপাশি প্যারিসে নতুন সৌধ নির্মাণ করা হয়। বড় বড় রাস্তা নির্মাণ, সেতু তৈরি, সেচ-ব্যবস্থার উন্নয়ন, বন্দরের উন্নতি ইত্যাদির দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। ফলে শুধু সৌন্দর্যবৃদ্ধি নয়, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং আভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যের প্রসার ঘটে।

ধর্মীয় সংস্কার : ধর্মের ক্ষেত্রে দেশের জটিল সমস্যা সমাধান করার জন্য নেপোলিয়ান রোমান ক্যাথলিকদের সঙ্গে সমঝোতায় আসতে চেয়েছিলেন। এজন্য তিনি পোপ সপ্তম পায়াস্-এর সঙ্গে এক চুক্তিতে বা কঁকরদায় (Concordat) আবদ্ধ হলেন 1801 খ্রিস্টাব্দে। এর ফলে সংবিধান সভার আমলে 'সিভিল কনস্টিটুশন অফ দ্য ক্লার্জি' যে বহু মানুষকে অসন্তুষ্ট করেছিল, তা কমে এলো। ফলে এই চুক্তির দ্বারা ক্যাথলিক চার্চকে ফ্রান্সে সরকারি স্বীকৃতি দেওয়া হলো, আবার পোপও গির্জার সম্পত্তি বিপ্লবের সময় যেভাবে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল তা মেনে নিলেন। ফ্রান্সকে পঞ্চাশটি যাজক গোষ্ঠীতে ভাগ করা হয়। রাষ্ট্র কর্তৃক যাজকদের বেতনের ব্যবস্থা হলো, প্রোটেস্টান্ট ও ইহুদীদের সঙ্গেও নেপোলিয়ান বন্দোবস্ত করেছিলেন।

নেপোলিয়ানের ধর্মীয় সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশে ধর্মীয় বিভেদ দূর করা। তাঁর মত ছিল "জনগণের ধর্মের প্রয়োজন আছে কিন্তু এই ধর্ম সরকারের হাতে থাকা উচিত।" একথা ঠিক যে বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সের ধর্মজীবন বিপর্যস্ত হয়েছিল। যাজকদের মধ্যে সাংবিধানিক এবং বিক্ষুব্ধ, দুই ভাগ হয়ে গিয়েছিল। নেপোলিয়ান ও পোপের মধ্যে চুক্তির ফলে ফ্রান্সে ধর্মীয় ঐক্য আসে। ক্যাথলিক ধর্ম ফ্রান্সে প্রধান। তবে তাকে সরকারের নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। অর্থাৎ চার্চের যাজকগণকে নিয়োগ করবে রাষ্ট্র তবে তা অনুমোদন করবেন পোপ, আর যাজকগণের বেতন দেবে সরকার। রোমান ক্যাথলিকদের সঙ্গে নেপোলিয়ানের সুসম্পর্ক তাঁর সামাজিক ভিত্তি বাড়িয়ে দেয়। তবে প্রোটেস্টান্ট বা অন্যদেরও ধর্মীয় স্বাধীনতা দেওয়া হয়।

সরকারি নিয়ন্ত্রণ : নেপোলিয়ান কঠোর সরকারি নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করলেন। জনসাধারণের কার্যকলাপের উপর দৃষ্টি রাখার জন্য পুলিশ ও গুপ্তচর ব্যবস্থাকে সংগঠিত করা, জ্যাকবিন ও রাজতন্ত্রীদের দমন করা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ করা ইত্যাদি সেই কাজের প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

আভ্যন্তরীণ সংস্কারের মূল্যায়ন : নেপোলিয়ানের সংস্কারগুলি বা আভ্যন্তরীণ শাসনের স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে তার মধ্যে একাধারে বিপ্লবের আদর্শের প্রতি আনুগত্য

এবং বিপ্লবের বিরোধিতা উভয়ই চোখে পড়ে। ডেভিড টমসন তাই বলেছেন, বোনাপার্ট ফ্রান্সকে শাসন ক'রে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছিলেন।[1] জর্জ রুদের মতে, নেপোলিয়ান বুর্জোয়া স্বার্থকেই রক্ষা করেছিলেন। নেপোলিয়ানের আভ্যন্তরীণ সংস্কার বহু ক্ষেত্রে ফ্রান্সের উন্নতি ঘটিয়েছিল বা বিপ্লবী অস্থিরতার পর স্থায়ী সমাধান এনেছিল। তবে সরকারি নিয়ন্ত্রণ, সমাজে বৈষম্য দূর করতে না পারার ব্যর্থতা, ধর্মঘট বেআইনী ঘোষণা, নারীজাতিকে পুরুষের উপর নির্ভরশীল বানানো, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ, সম্পত্তির মীমাংসা না হওয়া ইত্যাদি ত্রুটিগুলি লক্ষ্য করা যায়। ফলে নেপোলিয়ানের সংস্কার পরিপূর্ণ ভাবে প্রগতিশীল ছিল না।

নেপোলিয়ানের আভ্যন্তরীণ সংস্কারের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে অধিকাংশ ঐতিহাসিক তাঁর প্রশংসা করেছেন। *H. A. L.* Fisher -এর মন্তব্য এই প্রসঙ্গে সুপরিচিত: "If the conquests of Napoleon were ephemeral, his civilian work was built upon granite"– অর্থাৎ তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য ছিল ক্ষণস্থায়ী কিন্তু অসামরিক সংস্কারগুলি শক্ত পাথরের ভিতের ওপর স্থায়ীভাবে নির্মিত। *বেডাওয়ে* লিখেছেন, যেখানেই নেপোলিয়ান বা সৈন্যদল গেছেন সেখানেই পুরোনো ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। অর্থাৎ নেপোলিয়ানের চিন্তায় ও শাসনকার্যে সুস্থিতি ফিরিয়ে আনার অঙ্গীকার ছিল। তবে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি সাম্য চাইলেও, স্বাধীনতা পুরোপুরি চাইতেন না। সে কথা মনে রেখেই ডেভিড টমসন বোধহয় মন্তব্য করেছেন, 'ফ্রান্সকে শৃঙ্খলায় আবদ্ধ করে বোনাপার্ট ফ্রান্সে আইনের শাসন ফিরিয়ে এনেছিলেন'। তবে নেপোলিয়ানের আভ্যন্তরীণ সংস্কারের প্রধান মূল্য এই যে, তা বিপ্লবের ধ্বংসাত্মকরূপকে প্রশমিত করে সৃষ্টিশীল দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিল। শাসনে ত্রুটিও ছিল কিন্তু বুরবোঁ শাসনের চেয়ে তা বহুগুণ উন্নত। সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার উপর জোর দিয়েছিল *মারখাম*। এজন্য জনগণ তাঁর পিছনে ছিল। তবে *ওলার* -এর মতে প্রজাতন্ত্রের আত্মসমর্পণ ছিল প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থা। সব মিলে বলা চলে শাসক হিসেবে সর্বতো ভাবে সফল নন ঠিকই তবে নেপোলিয়ান বোনাপার্ট তাঁর কৃতিত্বের ছাপ রেখে গেছেন।

সাফল্যের কারণ ঃ বহুকালের স্বৈরতান্ত্রিক রাজশক্তিসহ সুবিধাবাদী যাজক ও অভিজাততন্ত্রকে উচ্ছেদ ক'রে ফরাসি বিপ্লব ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠা করেছিল প্রজাতান্ত্রিক শাসন। বিপ্লবের সূচনা থেকে পরবর্তী দশ বছরের মধ্যে প্রজাতান্ত্রিক শাসনের ধ্বংসস্তূপের উপর প্রতিষ্ঠিত হলো সামরিক শক্তি সমর্থিত, একনায়কতন্ত্র। এই পরিবর্তনের মূলে ছিল **প্রথমতঃ**, নেপোলিয়ানের অসামান্য প্রতিভা, কর্মশক্তি, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আত্মবিশ্বাস আর সামরিক ও কূটনৈতিক নিপুণতা। তিনি সৈন্যদলের বিশ্বাস ও প্রীতি যেমন অর্জন করেন তেমনি ফ্রান্সের অনিশ্চয়তা নিমগ্ন জনগণের বিশ্বাস ও আনুগত্যও তিনি লাভ

1. ডেভিড টমসন, পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ 56-59

করেন। **দ্বিতীয়তঃ**, বিপ্লব বিধ্বস্ত ফ্রান্সের রক্তক্ষয়ী দিনগুলি থেকে তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন সেই অভিজ্ঞতাই তাঁকে উচ্চাকাঙ্ক্ষা মেটাবার সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণে সাহায্য করেছিল। যেমন, কনসাল হিসেবে ক্ষমতা হাতে পাওয়ার পূর্বেই ইতালি ও মিশর অভিযানের মাধ্যমে তিনি ফরাসি জাতির মনে বিশ্বাস উৎপাদনে সক্ষম হন। **তৃতীয়তঃ**, সামরিক ও বেসামরিক ক্ষেত্রে সুদক্ষ নেপোলিয়ান নিজেকে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার আশাও পোষণ করতেন। তাই প্রথম কনসাল হিসেবে তিনি ইয়োরোপীয় শক্তিজোটের অবসান ঘটালেন। এর ফলে নেপোলিয়ানের শুধু জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেল তাই নয়, তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত হলো এক ধরনের সম্মোহিনী শক্তি। সেই সুযোগ নেপোলিয়ান গণভোটের মাধ্যমে দশ বছরের পরিবর্তে 'যাবজ্জীবন কনসাল' (Consul for life) উপাধি গ্রহণ করলেন। **চতুর্থতঃ**, বিপ্লবের আদর্শকে সামনে রেখে তিনি নানাবিধ সংস্কারমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে বিপক্ষ দলগুলির সমর্থন অর্জন করলেন। 'লিজিয়ন অফ অনার' নামক মর্যাদাপূর্ণ প্রতীক সৃষ্টি করে তিনি তাঁর প্রতি অনুগত এক শ্রেণীর নতুন অভিজাত সম্প্রদায় সৃষ্টি করলেন। এসবের ফলে ফরাসি জাতির মনে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় বিশ্বাস ফিরে এলো। এটাই তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী সম্রাটপদ লাভের পূর্বাভাস। **পঞ্চমতঃ**, যাবজ্জীবন কনসাল হিসেবে নেপোলিয়ান যখন ফ্রান্সের ভাগ্যনিয়ন্তা হলেন তখন রাজতন্ত্রীরা তাঁর বিরুদ্ধে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো। এই গোপন সংবাদ জানতে পেরেই তিনি কনসালের পদ উঠিয়ে দিয়ে সম্রাট পদ সৃষ্টির প্রস্তাব দিলেন। প্রায় চার লক্ষ মানুষের গণভোটে নেপোলিয়ান সম্রাটপদ লাভ করলেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী নেপোলিয়ানের সব আশা পূর্ণ হলো।

৪। সম্রাট হিসেবে নেপোলিয়ান

প্রজাতন্ত্র থেকে সাম্রাজ্য ঃ সম্রাটরূপে নেপোলিয়ান হলেন অসামান্য ক্ষমতার অধিকারী। ফ্রান্স এবং তার অধীনস্থ রাজ্যগুলির প্রজাপুঞ্জের নিকট থেকে তিনি পেয়েছিলেন অবিচলিত আনুগত্য। ফ্রান্সের যা 'স্বাভাবিক সীমানা' (Natural Frontier) তাই রক্ষা করার জন্য নেপোলিয়ান যুদ্ধে রত, একথা ফরাসিবাসীরা মনে করত। তাই তাদের ছিল প্রথম কনসালের প্রতি বিপুল আনুগত্য। অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে লুনেভিল ও ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে আমিয়াঁর সন্ধি ফ্রান্সের অনুকূল হলেও তা যে দীর্ঘস্থায়ী হবে না তা বোঝা গিয়েছিল। 1803-এ আবার শুরু হলো ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধ এবং অচিরেই তা ইয়োরোপীয় যুদ্ধে রূপান্তরিত হলো। এরই ফাঁকে নেপোলিয়ান সংবিধান পরিবর্তন ক'রে গণভোটে অবিশ্বাস্য সংখ্যাধিক্য (কোবানের হিসেব অনুযায়ী পক্ষে 3,572, 329, বিপক্ষে 2579) সম্রাট পদ গ্রহণ করলেন। অবশ্য সুযোগও এসেছিল। জর্জ কাদুদাল (Cadoudal) নামে এক রাজতন্ত্রী ইংল্যাণ্ডের সহায়তায় নেপোলিয়ানকে সরাবার ষড়যন্ত্র

করেছিলেন। ষড়যন্ত্রী সকলেই ধরা পড়ে, শাস্তি হয় এবং অপর দিকে সিনেট 1804-এর মে মাসে প্রজাতান্ত্রিক সরকারকে বংশানুক্রমিক সম্রাটের হাতে তুলে দেন। পরে গণভোটে নেপোলিয়ানের সম্রাট হওয়ার অনুমোদনের পিছনে ছিল জনগণের আনুগত্য এবং বিদেশীদের বিরুদ্ধে জয়লাভের আকাঙ্খা।

কনসালরূপে নেপোলিয়ান যে শান্তির নীতি অনুসরণ করছিলেন সম্রাটরূপে সেই একই নেপোলিয়ান সূচনা করলেন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধনীতি। সম্রাট হিসেবে নেপোলিয়ান বোনাপার্ট কার্যভার গ্রহণ করেন 1802 খ্রিস্টাব্দের 2 ডিসেম্বর। তাঁর অভিষেকে নোৎরদামে উপস্থিত ছিলেন পোপ সপ্তম পায়াস। সম্রাট নেপোলিয়ান পরে মন্তব্য করেছিলেন 'আমি ফ্রান্সের রাজমুকুটকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখি, আমি তরবারির দ্বারা তা মাথায় তুলে নিই' (I found the crown of France lying on the ground, I picked it up with my sword)। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাস্তব পরিস্থিতিই তাকে এক্ষেত্রে সাহায্য করেছিল। ডেভিড টমসন লিখেছেন, "The Empire of Napoleon in Europe was established as a result of the great series of brilliant victories by which, within two years, he smashed the Third Coalition of 1805." কথাটির সত্যতা অতি গভীর। নেপোলিয়ান 1804 থেকে 1807 পর্যন্ত ফ্রান্স তো বটেই, ইয়োরোপের বিশাল এলাকাজুড়ে তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তার করেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে তৃতীয় ইয়োরোপীয় শক্তিজোটকে পরাস্ত করেন। বৈদেশিক নীতির এই সাফল্য সাম্রাজ্যবিস্তার নীতির চূড়ান্ত পরিণতি বলা যেতে পারে। 1807 খ্রিস্টাব্দে (জুলাই মাসে) রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে টিলসিটের সন্ধি তার এই নীতির পূর্ণতা লাভ করে। তাই পরবর্তী দশটি বছর অতিবাহিত হলো রণহুঙ্কারে, অশান্তির ডামাডোলে।

সম্রাট নেপোলিয়ান এবং ইয়োরোপে সাম্রাজ্য বিস্তার ঃ সম্রাট হিসেবে নেপোলিয়ান বিশ্ববিজয়ের স্বপ্ন দেখতেন। তিনি ইতালি, হল্যাণ্ড, সুইটজারল্যাণ্ড ইত্যাদি প্রজাতান্ত্রিক রাজ্যগুলিকে নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করলেন। নেপোলিয়ানের এই আগ্রাসী নীতি ইংল্যাণ্ডকে ভাবিত করল।

সম্রাট হয়েই নেপোলিয়ান এক নতুন সাম্রাজ্যবিস্তার নীতির প্রবর্তন করেন। ফলে প্রায় গোটা ইয়োরোপ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এখানে দুটি কথা মনে রাখা দরকার। প্রথম কথা হলো, প্রথম ও দ্বিতীয় কোয়ালিশনের বিপক্ষে নেপোলিয়ানের সাফল্য তাকে সাম্রাজ্যবিস্তারে উৎসাহিত করেছিল এবং পরবর্তীকালে সম্রাট হয়ে তিনি বিস্তারনীতি ত্যাগ করতে পারেন নি। বস্তুত ফরাসি ঐতিহাসিক ভাঁদালের (Vandal) মতে শান্তি বজায় রাখা বা যুদ্ধ এড়ানো তাঁর ব্যক্তিত্ব-বিরোধী (it was certainly beyond the capacity of his characte1)। অবশ্য সোরেল-এর মতে নেপোলিয়ানের

একা দোষ দেওয়া যায় না। বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সের যে স্বাভাবিক সীমান্ত সৃষ্টি হয়েছিল তা ইংল্যাণ্ডের পক্ষে মেনে নেওয়া কঠিন ছিল। দ্বিতীয় কথা হলো, ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সের বৈদেশিক নীতি, বিশেষত ঔপনিবেশিক প্রেরণার মধ্যেই পারস্পরিক বিরোধিতার বীজ লুকানো ছিল।

এই জন্য 1802 এর 25 মার্চ ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে যে আমিয়াঁর সন্ধি (Treaty of Amiens) স্বাক্ষরিত হয় (হল্যাণ্ড ও স্পেনও এই সন্ধিতে স্বাক্ষর করেছিল) তা আদৌ স্থায়ী হয়নি। কীভাবে নেপোলিয়ান দ্বিতীয় কোয়ালিশনের বিপক্ষে সাফল্য পেয়েছিলেন তা আমরা যথাস্থানে আলোচনা করেছি। আমিয়াঁর সন্ধির শর্তানুসারে ফ্রান্স পর্তুগাল, মিশর ও দক্ষিণ ইতালি থেকে সৈন্য সরিয়ে নেবে কথাছিল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই নেপোলিয়ান পিয়েডমন্ট, পারমা এবং এলবা দখল করে নেন এবং ইতালিতে নব প্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। হল্যাণ্ডে ফরাসি বাহিনী থেকে যায়। জার্মানিতেও বিভিন্ন রাজ্যে তিনি হস্তক্ষেপ করেন। বেলজিয়াম ফ্রান্স আগেই অধিকার করে রেখেছিল। সুইটজারল্যাণ্ডেও একটা নতুন সংবিধানের ব্যবস্থা করেন। ফ্রান্সের স্পেনের কাছ থেকে লুইসিয়ানা কেনা এবং সান ডোমিঙ্গোতে অভিযান পাঠানো তার উপনিবেশ বিষয়ে আগ্রহ প্রমাণ করে। এ সব দেখে ইংল্যাণ্ড আশঙ্কিত হয়। এজন্য তারা মাল্টা ফ্রান্সকে ছেড়ে দিতে দেরি করে। মিশর অধিকারের উপায় উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে সামরিক বাহিনী প্রেরিত হলো। এইসব কর্মসূচি ইংল্যাণ্ডকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। এতদিন সামুদ্রিক বাণিজ্যে ও নৌযুদ্ধে ইংল্যাণ্ড ছিল অদ্বিতীয়। অন্যদিকে নেপোলিয়ান স্থলযুদ্ধে অদ্বিতীয় হয়েও নৌবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধিতে যথেষ্ট অগ্রগামী হয়েছেন। এই তৎপরতা লক্ষ্য করেই ইংল্যাণ্ড 1803 খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং শেষপর্যন্ত 1803 খ্রিস্টাব্দের মে মাসে আবার ইঙ্গ-ফরাসি যুদ্ধ শুরু হয়।

এই যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরই নেপোলিয়ান সম্রাট হন এবং পুনরায় ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী হন উইলিয়াম পিট (কনিষ্ঠ)। ইংল্যাণ্ডের সংবাদপত্রগুলিতে নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার চলতে লাগল। নেপোলিয়ান ইংল্যাণ্ডকে মনে করতেন 'দোকানদারের জাত' (a nation of shopkeepers)। ইংল্যাণ্ডের নৌ-বহর ফরাসি বাণিজ্যপোত আক্রমণ করলে নেপোলিয়ান ফ্রান্সে ভ্রমণরত এরূপ একহাজার ইংরেজদের বন্দী করেন। ইঙ্গ -ফরাসি যুদ্ধ প্রথম দিকে নৌযুদ্ধে সীমাবদ্ধ ছিল। ইংল্যাণ্ডের যুদ্ধ জাহাজ ছিল বেশি (55), ফ্রান্সের 42টির মধ্যে 13টি মাত্র যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল। ফরাসি নৌসেনাপতি লাতুশ ত্রেভিই মারা যাওয়ার (1804) পর ফ্রান্সের তেমন নৌশক্তি রইল না। অবশ্য 1804 -এর শেষ দিকে স্পেন তাদের পক্ষে যোগদেওয়াতে নেপোলিয়ান ইংলিশ চ্যানেল

অতিক্রমরত ফরাসি স্থলবাহিনীকে (যে প্রায় অপরাজেয় ছিল) ইংল্যাণ্ডে নামিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। এমত অবস্থায় ইংল্যাণ্ড ইয়োরোপে ফ্রান্সকে ব্যস্ত রাখার জন্য রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, সুইডেন প্রমুখের সঙ্গে তৃতীয় জোট (Third Coalition) গঠন করে (এপ্রিল-আগস্ট 1805)। এর পরই বিখ্যাত ট্রাফালগারের নৌযুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি হোরেশিও নেলসন ফরাসি-স্পেনীয় বাহিনীকে পরাজিত করেন (21 অক্টোবর 1805)। এই পরাজয়ের ফলে নেপোলিয়ানের ইংল্যাণ্ড আক্রমণের চেষ্টা চিরতরে বন্ধ হয়ে যায় এবং তিনি মহাদেশীয় অবরোধ পদ্ধতি বা 'কন্টিনেন্টাল সিস্টেম'-এর উদ্ভাবন করেন।

নেপোলিয়ান ইংল্যাণ্ড আক্রমণ করতে পারেন নি ঠিকই কিন্তু ইয়োরোপীয় মহাদেশে তার জয়ের ধারা অব্যাহত ছিল। ট্রাফালগারের নৌ যুদ্ধে ফ্রান্স হেরে গেলেও স্থল যুদ্ধে জয়লাভ করেছিল অনেক স্থানেই। একথা ঠিক যে, তৃতীয় কোয়ালিশন গঠনের জন্য নেপোলিয়ানের সম্প্রসারণশীল নীতিই প্রধানত দায়ী ছিল। আবার ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে নেপোলিয়ানের হ্যানোভার দখল করেন, নেপলস্ এ ফরাসি বাহিনী পাঠান, এমনকি মিশর অভিযানের ভয় দেখান। ফলে ইংল্যাণ্ড, অস্ট্রিয়া, রাশিয়া প্রমুখ একজোট হয়। দক্ষিণ জার্মানি নিয়ে ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে বিরোধ শুরু হয়েছিল এবং জার্মান রাজ্য ব্যাভেরিয়া ফ্রান্সের কাছে সাহায্যপ্রার্থী হয়। নেপোলিয়ান ব্যাভেরিয়া, উরটেমবার্গ এবং বাডেন এর সঙ্গে মৈত্রী চুক্তি করেন। ফলে অস্ট্রিয়াও রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি করতে বাধ্য হয়। 1805 এর মার্চ মাসে নেপোলিয়ান ইতালিতে একটি রাজ্য স্থাপন করে নিজেই তার রাজা হন। জেনোয়া ফ্রান্সের সঙ্গে যুক্ত হবার আবেদন করেছিল এবং তাতেও নেপোলিয়ান সম্মত হয়েছিলেন।

তৃতীয় রাষ্ট্রজোটের অবসান—ইতালি ও জার্মানি দখল ঃ এই পরিস্থিতিতে 1805 এর এপ্রিল থেকে আগস্টের মধ্যে তৃতীয় কোয়ালিশন গঠিত হলো। অস্ট্রিয়া, ইংল্যাণ্ড ও রাশিয়ার মধ্যে বন্ধুত্ব লাভ করে ব্যাভেরিয়া আক্রমণ করে; কিন্তু নেপোলিয়ানের বিখ্যাত 'গ্র্যাণ্ড আর্মি' অসামান্য সাফল্য পায় উলম্ এর যুদ্ধে (Battle of Ulm), (অক্টোবর, 1805)। অস্ট্রিয় সেনাপতি ম্যাক পরাজিত হন ফরাসি বাহিনীর হাতে। তারপর 1805 এর 2 ডিসেম্বর মোরাভিয়ার অস্টারলিৎস্ এর যুদ্ধে (Battle of Austerlitz) অস্ট্রিয়-রুশ যুগ্মবাহিনী ফরাসি বাহিনীর হাতে পর্যুদস্ত হয়। ফলে অস্ট্রিয়া প্রেসবার্গ -এর সন্ধি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়; তৃতীয় ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রজোট ভেঙে যায়। এই চুক্তির সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হলো, জার্মান রাজ্যগুলিতে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য হ্রাস পায়। অস্টারলিৎস -এর পরাজয়ের ফলে রাশিয়া পূর্ব ইয়োরোপের দিক থেকে পশ্চাদ্ পসরণ করতে বাধ্য হয়। অস্ট্রিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রান্সিস তৃতীয়বার নেপোলিয়ানের কাছে হেরে ব্যাভেরিয়া, উরটেমবুর্গ ও বাডেনের স্বাধীনতা স্বীকার

করে নেন। এছাড়া ইতালির ভেনেশিয়া ফ্রান্সকে ছেড়ে দেয় এবং নেপোলিয়ানকে ইতালির রাজা বলে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হন।

এর পরিণতিতে জার্মান রাজ্যগুলিতে অস্ট্রিয়ার ক্ষমতা কমে গেল তো বটেই 'পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য' বিপন্ন হয়ে পড়ল। নেপোলিয়ান এই কাজ করে মন্তব্য করেছিলেন 'এটি পবিত্র নয়, রোমানও নয়, সাম্রাজ্যও নয় (It was neither Holy, nor Roman, nor an Empire)।' প্রেসবার্গের সন্ধির ফলে জার্মানিতে অস্ট্রিয়ার প্রভাব কমে যায় ঠিকই কিন্তু ফ্রান্সের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। ফলে প্রাশিয়া আতঙ্কিত হয়। অস্ট্রিয়ার পরিবর্তে জার্মানিতে প্রাশিয়ান প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আশা কমে যায়। প্রাশিয়ান রাজা তৃতীয় ফ্রেডারিক-এর ধারণা ছিল তিনি ফরাসি বাহিনীকে পরাজি. ক'.ত বাধ্য হবেন। কিন্তু নেপোলিয়ানের বাহিনীর দুর্দম গতি ও রণকৌশলের কাছে প্রাশিয়াই জেনা (Battle of Jena) এবং আউয়ের স্টাট (Auerstadt) -এর যুদ্ধে হেরে যায় (1806)। নেপোলিয়ান বার্লিনে প্রবেশ করেন এবং 13টি ছোট ছোট জার্মান রাজ্যগুলিকে নিয়ে 'কনফেডারেশন অফ দ্য রাইন' (Confederation of the Rhine) গঠন করেন এবং নিজে হন তার রক্ষাকর্তা (Protector)। শধু তাই নয়, প্রাশিয়ার বন্দরগুলি ইংরেজ বাণিজ্যপোতের জন্য বন্ধ করে দিয়ে নেপোলিয়ান তার সুপরিচিত মহাদেশীয় অবরোধ পদ্ধতির (Continental System) সূচনা করেন। এ বিষয়ে পরে যথাস্থানে আলোচনা করা হবে। যাইহোক ফ্রান্সের হাতে পরাজিত হয়ে প্রাশিয়া শনব্রাণের সন্ধি মেনে নিতে বাধ্য হয়।

টিলসিটের সন্ধি (1807) : ইয়োরোপের মধ ভূখণ্ডে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর নেপোলিয়ান রাশিয়ার বিরুদ্ধে কয়েকটি খণ্ড-বিখণ্ড যুদ্ধে এবং ফ্রিডল্যাণ্ড (Friedland)-এর যুদ্ধে রাশিয়াকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করলেন (1807)। বাধ্য হয়ে রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজাণ্ডার নেপোলিয়ানের সঙ্গে টিলসিটের সন্ধিতে (Treaty of Tilzit) স্বাক্ষর করলেন (1807)।

আসলে অস্ট্রিয়া এবং প্রাশিয়া পরাজিত হবার পর নেপোলিয়ান রাশিয়ার দিকে দৃষ্টি দেন। পোল্যাণ্ডের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি তিনি পেয়েছিলেন। 1807 -এর ফেব্রুয়ারিতে আইলাউ -এর যুদ্ধে ফরাসি বাহিনী কোনওক্রমে হারতে হারতে জিতলেও, 1807-এর জুন মাসে ফ্রিডল্যাণ্ডের যুদ্ধে রাশিয়া সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়। এর ফলেই রাশিয়া নেপোলিয়ানের সঙ্গে টিলসিটের সন্ধি করতে বাধ্য হলো (জুলাই, 1807)। ফল স্বরূপ নেপোলিয়ান প্রভূত ক্ষতিপূরণ পেলেন এবং জার মহাদেশীয় অবরোধ মেনে নেন।

টিলসিটের সন্ধিতে শুধু রাশিয়া ও ফ্রান্স নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে ছিল প্রাশিয়া ও ফ্রান্সের চুক্তি শর্ত। এই সন্ধিতে রাশিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে অনাক্রমণ এবং প্রতিরক্ষা

মূলক মৈত্রী (Offensive and Defensive Pact) স্থাপিত হয়। কিন্তু এই সন্ধিতে প্রাশিয়া প্রায় তার অর্ধেক ভূখণ্ড হারাল। প্রাশিয়ার ভূখণ্ড নিয়ে তৈরি হলো ওয়েস্টফেলিয়া রাজ্য (Kingdom of Westphalia) এবং 'গ্র্যাণ্ড ডাচি অফ ওয়ার্‌শ' (Grand Duchy of Warsaw) নামক দুটি রাজ্য। টিলসিটের সন্ধিতে নেপোলিয়ান সমগ্র পশ্চিম ইয়োরোপের ভাগ্য নিয়ন্তারূপে প্রতিষ্ঠিত হলেন। এই সন্ধিই ছিল নেপোলিয়ানের ক্ষমতার চরম প্রকাশ।

একথা সত্য যে, টিলসিটের সন্ধির ফলে নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে গঠিত তৃতীয় রাষ্ট্রজোট ভেঙে যায়। নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ইয়োরোপের ভাগ্য নিয়ন্তারূপে দেখা দেন। কিন্তু টিলসিটের সন্ধির পর থেকে নেপোলিয়ান ইয়োরোপে একের পর এক ভুল পদক্ষেপ নেওয়ার ফলে তার পতনের সূচনা হয়। তবু জার্মানি এবং ইতালিতে নেপোলিয়ানের আক্রমণ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে এক শাসনে আবদ্ধ করার মধ্য দিয়ে ঐ দুই দেশে জাতীয়তাবোধের চেতনার উন্মেষ ঘটে। নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্যবিস্তার নীতি অবশ্য টিলসিটের পরেই ভেঙে পড়েনি, আরও কয়েক বছর টিকে ছিল। বস্তুত ডাইরেক্টরির সেনাপতিরূপে, প্রথম কনসালরূপে এবং ফ্রান্সের সম্রাটরূপে নেপোলিয়ান বোনাপার্ট সাম্রাজ্য বহুদূর বিস্তার করেছিলেন এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ফরাসি আধিপত্য বৃদ্ধি করেছিলেন।

৫। নেপোলিয়ান এবং ইয়োরোপ

ইয়োরোপের সঙ্গে নেপোলিয়ানের সম্পর্ক সংক্ষেপে উল্লেখ ক'রে আলোচনার সূত্রপাত করা যেতে পারে। টিলসিটের সন্ধির (1807) পর ইয়োরোপে ইংল্যাণ্ড ভিন্ন আর কোনও শক্তি ছিল না যে ফ্রান্সের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে। কিন্তু এতদিনের চেষ্টাতেও নেপোলিয়ান ফ্রান্সকে নৌ-শক্তিতে ইংল্যাণ্ডের সমকক্ষ করে তুলতে পারেন নি। তাই তিনি পরোক্ষ আঘাত হানার উদ্দেশ্যে 'কন্টিনেন্টাল সিসটেম' (Continental System) বা মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা নামে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ নীতি গ্রহণ করলেন। তিনি 'বার্লিন ডিক্রি' (Berlin Decree) নামক হুকুমনামায় ঘোষণা করলেন যে, ইংল্যাণ্ডে উৎপাদিত কোনও সামগ্রী যেন ইয়োরোপীয় বন্দরগুলিতে প্রবেশ না করতে পারে (1806)। তিনি মনে করলেন এই অবস্থার দ্বারা ইংল্যাণ্ডকে যেমন অর্থনৈতিক দিক থেকে পঙ্গু করা সম্ভব হবে তেমনি ইংল্যাণ্ডের হাত থেকে সমস্ত ইয়োরোপীয় বাণিজ্য ফ্রান্সের হাতে চলে আসবে। কিন্তু এই ব্যবস্থার প্রত্যুত্তরে ইংল্যাণ্ড 'অর্ডার ইন কাউন্সিল' (Order in Council) নামক ঘোষণায় প্রচার করল যে, ইংল্যাণ্ডের নৌবাহিনী ফ্রান্স এবং তার মিত্র দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধ করবে। ইংল্যাণ্ডের এই আদেশের প্রত্যুত্তরে নেপোলিয়ান 'মিলান ডিক্রি' (Milan Decree) নামক হুকুমনামায় ঘোষণা করলেন (1807) যে, যদি কোনও নিরপেক্ষ দেশের জাহাজ

ইংল্যাণ্ডের বন্দরে প্রবেশ করলে সেই জাহাজটিকে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এই অর্থনৈতিক অবরোধ অর্থাৎ বার্লিন ও মিলান ডিক্রি একত্রে ইতিহাসে *কন্টিনেন্টাল সিসটেম* (Continental system) বা মহাদেশীয় অর্থনৈতিক অবরোধ প্রথা নামে পরিচিত।

নেপোলিয়ানের এই অবরোধ নীতি ব্যর্থতায় পরিণত হলো। ব্রিটিশ নৌবহরের প্রতিপত্তি থাকায় কোনও উপনিবেশ থেকে ইয়োরোপে সামগ্রী আমদানি বা রপ্তানি করা ফ্রান্সের পক্ষে সম্ভব হলো না। অন্যদিকে ব্রিটিশের সামান্য অসুবিধা হলেও তাদের উপনিবেশ থেকে রপ্তানি মোটেই স্তব্ধ হয়নি। ফলে ইয়োরোপে হাহাকার পড়ে গেল। অর্থনৈতিক অবরোধ প্রথাকে কার্যকরী করতে নেপোলিয়ানকে একে একে যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হলো।

সম্রাট নেপোলিয়ানের আদেশ পালনে অক্ষম হওয়ায় রোম এবং হল্যাণ্ডকে ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত হতে হলো। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তিনি স্পেনের সহযোগিতায় পর্তুগাল অধিকার করেই বিশ্বাসঘাতকতা করে স্পেন দখলের চেষ্টা করলেন। এই সময় স্পেনের আহ্বানে ইংরেজ সেনাপতি স্যার আর্থার ওয়েলেসলি এক বিশাল বাহিনী নিয়ে পর্তুগালের ভিতর দিয়ে স্পেনে প্রবেশ করলেন। ফলে পর্তুগাল ব্রিটিশের ঘাঁটিতে পরিণত হয়। পশ্চিম প্রান্তে ফরাসি বাহিনী যখন 'উপদ্বীপের যুদ্ধে' (Peninsular war) রত তখন নেপোলিয়ান নিজে মস্কো অভিযান করলেন। রুশ বাহিনী সরাসরি ফরাসি বাহিনীকে বাধা না দিয়ে পশ্চাদপশরণ ও পোড়ামাটি নীতি (Scorched earth policy) অবলম্বন করল। পিছিয়ে যাওয়ার সময় রুশ বাহিনী নিজেদের ঘর-বাড়ি, খাদ্যশস্য, গ্রাম-নগর ধ্বংস করেছিল। নভেম্বরের শীত, অবিশ্রান্ত তুষারপাত এবং গেরিলাদের গোলাবর্ষণে ফরাসি বাহিনীর অধিকাংশই প্রাণ হারাল। অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে নেপোলিয়ান কোনক্রমে স্বদেশে ফিরে এলেন (ডিসেম্বর, 1812)।

নেপোলিয়ানের মস্কো অভিযানের ব্যর্থতার সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইয়োরোপ-বাসীর মনে আশার সঞ্চার হলো। সর্বত্র শুরু হলো মুক্তিযুদ্ধ (War of Liberation) । ইতোমধ্যে ইংল্যাণ্ড, প্রাশিয়া, রাশিয়া, সুইডেন প্রভৃতি দেশ নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে চতুর্থ রাষ্ট্রজোট (Fourth Coalition) গঠন করল (1813)। লিপজিগের যুদ্ধে নেপোলিয়ান সম্মিলিত ইয়োরোপীয় মিত্র বাহিনীর নিকট পরাজিত হলেন (1813)। মিত্রজোট এবার সন্ধির প্রস্তাব দিল। নেপোলিয়ান সেই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলেন। এবার মিত্রশক্তি প্যারিস আক্রমণ করল। 1814 খ্রিস্টাব্দের 31 মার্চ প্যারিসের পতন ঘটল। বাধ্য হয়ে নেপোলিয়ান ফঁতেনব্লুর সন্ধিতে (Treaty of Fointainebleau) স্বাক্ষর করে ফরাসি সিংহাসন ত্যাগ করলেন। তাঁকে এলবা দ্বীপের রাজা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হলো।

পরবর্তী ক্ষেত্রে ইয়োরোপীয় মিত্র রাষ্ট্রগুলির মতভেদ প্রকট হয়ে উঠলো। সংবাদ পেয়ে নেপোলিয়ান অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে প্যারিসে প্রত্যাবর্তন করলেন ও পুনরায়

যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। মিত্ররাষ্ট্রগুলিও সেই সংবাদে আবার একতাবদ্ধ হলো। শুরু হলো ওয়াটার্লুর যুদ্ধ (1814-15 খ্রিঃ)। এই যুদ্ধে পরাজিত নেপোলিয়ানকে সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত করা হলো। 1821 খ্রিঃ তিনি সেখানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

এবার কয়েকটি বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করা যেতে পারে। *জে.এম.টমসন* যদিও লিখেছেন যে আমিয়াঁর সন্ধি (1812) ভঙ্গ করার ফলে নেপোলিয়ানের পতনের সূচনা, তবে প্রায় সব ঐতিহাসিকই স্বীকার করেছেন যে টিলসিটের সন্ধিপর্যন্ত নেপোলিয়ানের গৌরবময় সময়। ফরাসি সম্রাটের সামরিক প্রতিভা তখন তুঙ্গে ; ফ্রান্সের সীমা তখন বহুদূর প্রসারিত। *আলফ্রেড কোবানের* মন্তব্য অনুযায়ী এখানেই থেমে থাকার পাত্র নেপোলিয়ান ছিলেন না, ফলে এরপরও তাকে ক্রমাগত যুদ্ধ করে যেতে হয়।[1] (The Capacity for accepting a limit to his ambition was against his nature...The perpetration of war was in the nature of his regime)। *রাইকার লিখেছেন* 'Tilzit was in a sense the turning point of his fortunes' অর্থাৎ একদিক থেকে দেখতে গেলে টিলসিটের পর তাঁর সৌভাগ্যের দিক পরিবর্তন হয়।

নেপোলিয়ান সম্রাট হওয়ার পরের বছর 21 অক্টোবর ট্রাফালগারের নৌ যুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের কাছে পরাজিত হওয়ার পর তাঁর চিরশত্রু ইংল্যাণ্ডকে ধ্বংসকরার জন্য মহাদেশীয় অবরোধ বা 'কন্টিনেন্টাল সিস্টেম' প্রবর্তন করেছিলেন। এই পদ্ধতি শেষপর্যন্ত ইংল্যাণ্ডের কোনও ক্ষতি করতে পারেনি, বরং ফ্রান্সেরই ক্ষতি করেছিল। সুতরাং আমিয়াঁর সন্ধির শর্তভঙ্গ করার পর নেপোলিয়ানের সঙ্গে ইয়োরোপের সম্পর্ক জানতে হলে প্রথমেই মহাদেশীয় অবরোধ পদ্ধতি জানা দরকার। দ্বিতীয়তঃ, মহাদেশীয় অবরোধ পদ্ধতিকে কার্যকর করা এবং স্পেনের সঙ্গে মৈত্রী মারফৎ পর্তুগালকে বাগে আনতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত স্পেনের সঙ্গে নেপোলিয়ানের যুদ্ধের সূচনা হয়। এই যুদ্ধ পেনিনসুলার যুদ্ধ বা উপসাগরীয় যুদ্ধ নামে পরিচিত। এই 'স্পেনীয় ক্ষত'ই নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্যে পচন ধরায়। তৃতীয়তঃ, রাশিয়ার সঙ্গে টিলসিটের মিত্রভঙ্গ করা এবং শেষপর্যন্ত রাশিয়া আক্রমণ নেপোলিয়ানের পতনকে তরান্বিত করে। চতুর্থতঃ, এরপরই ইয়োরোপের প্রধান চারটি দেশ ইংল্যাণ্ড, রাশিয়া, প্রাশিয়া এবং অস্ট্রিয়ার সম্মিলিত মিত্রপক্ষ ক্রমে ক্রমে মুক্তিযুদ্ধে নেপোলিয়ানকে ক্ষমতাচ্যুত করে। আমরা একে একে চারটি সূত্র সম্প্রসারিত করবঃ।

মহাদেশীয় অবরোধ পদ্ধতি ও তার ফল : ফ্রান্স অপেক্ষা নৌ-শক্তি এবং নৌ-বাণিজ্যে বলীয়ান ইংল্যাণ্ডকে অর্থনৈতিক তথা বাণিজ্যিক ভাবে পঙ্গু করার জন্য এবং ইংল্যাণ্ডের ব্যবসা-বাণিজ্যের পরোক্ষ আঘাত হানার উদ্দেশ্যে ইয়োরোপীয় মহাদেশের

1. A Cobban, *Opcit*, Vol II, p 47

দ্বার বন্ধ করে দেওয়ার জন্য উনিশ শতকের প্রথম দশকে নেপোলিয়ান যে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন তাকেই মহাদেশীয় অবরোধ পদ্ধতি বা কন্টিনেন্টাল সিস্টেম বলে। মহাদেশীয় অবরোধ বলতে এককথায় বোঝায় ইংল্যাণ্ডকে ইয়োরোপীয় মহাদেশ থেকে অবরুদ্ধ করে রাখা।

সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী লিখেছেন, "মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থার মধ্যে আমরা আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক, এমনকি সামরিক উদ্দেশ্যেরও একটা সাযুজ্য দেখতে পাই।... নেপোলিয়ান একদিক থেকে ফরাসী বাণিজ্যকে রক্ষা করতে ও বাড়াতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু এই ব্যবস্থা অবলম্বনের পশ্চাতে তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইংল্যাণ্ডের রপ্তানী, বাণিজ্য হ্রাস করে ইংল্যাণ্ডের অর্থনীতিতে বিরাট আঘাত হানা।"[1] কোবান স্পষ্ট করেই লিখেছেন যে, শুধুই ইংল্যাণ্ডকে পথে বসানো নয়, ফ্রান্সের সম্পদ ও মহিমা বৃদ্ধি করাও কন্টিনেন্টাল সিস্টেমের উদ্দেশ্য ছিল।[2]

তবে মহাদেশীয় অবরোধ সম্পূর্ণ নেপোলিয়ানের উদ্ভাবন— এসব ভাবলে ভুল হবে। ফ্রান্স কোলবেয়ারের সময় থেকেই ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পের জন্য সংরক্ষণবাদ অনুসরণ করে আসছিল। ফরাসি বিপ্লবের পর বিপ্লবী যুদ্ধের সময়ও রক্ষণশীল নীতির চূড়ান্ত প্রয়োগ দেখা যায়। ফ্রান্সের বিপ্লবী সরকার 1793 খ্রিস্টাব্দেই ফরাসি প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র ব্রিটেনজাত সামগ্রীর প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছিলেন। ব্রিটেনের সঙ্গে 1786 এর বাণিজ্য চুক্তিটি বাতিল করা হয়েছিল। 1796 থেকে ফ্রান্স ব্রিটিশ পণ্যের সঙ্গে আমদানি-রপ্তানি সম্পূর্ণ বন্ধ ক'রে দেয়। নেপোলিয়ান এই মহাদেশীয় অবরোধ পদ্ধতিকে চূড়ান্তরূপ দিয়েছিলেন। শুধু ফ্রান্স নয়, নেপোলিয়ান সমগ্র ইয়োরোপের উপকূল ইংল্যাণ্ডের কাছে বন্ধ ক'রে দিয়ে এই নীতিকেই সম্পূর্ণ বিস্তৃত করে পূর্ণতর রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। 1803 খ্রিস্টাব্দের পর নেপোলিয়ান এই ব্যবস্থাকে হ্যানোভার উপকূলে পর্যন্ত চালু করেন। তবে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থার দ্বারা ইংল্যাণ্ডের মতন এক বাণিজ্য-সমৃদ্ধ, নৌ-শক্তিতে বলীয়ান ও ঔপনিবেশিক ক্ষেত্রে অগ্রসর দেশকে পর্যুদস্ত করা সম্ভব ছিল না। বাল্‌টিক ও অ্যাড্রিয়াটিক সমুদ্রে ইংল্যাণ্ডের অবাধ যাতায়াত ছিল। অ্যাটলান্টিক মহাসাগরে তো ছিলই। তবু নেপোলিয়ান হাল ছাড়ার পাত্র নন। 1806 খ্রিস্টাব্দের পর স্থলযুদ্ধে সাফল্যের পর প্রায় সমগ্র ইয়োরোপ যখন নেপোলিয়ানের অধীনে এলো তখন ইংল্যাণ্ডকে জব্দ করার নতুন সুযোগ এলো। নেপোলিয়ান ভাবলেন স্পেন, পর্তুগাল, অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার সাহায্য পেলে এবার ব্রিটেনের জাহাজ ও পণ্যের কাছে সমগ্র ইয়োরোপের দরজা বন্ধ করে দেওয়া যাবে। এই উদ্দেশ্য নিয়েই 1806

1. সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ 244

2. কোবান (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ 47) লিখেছেন, "The Continental System was a device for bringing Great Britain to her knees, but it was also,quite a part from this, a method of increasing and consolidating the wealth and therefore the greatness of France."

খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে তাঁর *'বার্লিন ডিক্রি'* জারি করার সঙ্গে সঙ্গে কন্টিনেন্টাল সিস্টেম চালু হয়ে যায়।

বার্লিন ডিক্রির দ্বারা ঘোষণা করা হলো যে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের বিরুদ্ধে অবরোধ ব্যবস্থা চালু করা হলো এবং তাদের সঙ্গে সব ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করা হলো। যদি এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করা হয়, ব্রিটেন বা তার উপনিবেশ থেকে আসা সব পণ্য বাজেয়াপ্ত করা হবে। টিলসিট-এর সন্ধির পরে অস্ট্রিয়া ও রাশিয়া, পরবর্তী বছরে স্পেন ও পর্তুগাল এই ব্যবস্থায় যোগ দিতে রাজী হয়। অন্যভাবে বলা যায়, বার্লিন ডিক্রি দ্বারা বলা হলো যে, ইংল্যাণ্ডের উপর নৌ-অধিকার জারি করা হলো ; ফ্রান্স বা তার মিত্র বা নিরপেক্ষ দেশের বন্দরগুলিতে ইংল্যাণ্ডের কোনও জাহাজ ঢুকতে দেওয়া হবে না, ইংল্যাণ্ডের কোন মালও এই সব দেশের বন্দরে নামতে দেওয়া হবে না, যদি নামে তার মাল বাজেয়াপ্ত করা হবে।

এর প্রত্যুত্তরে 1807 খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ইংল্যাণ্ড **Orders in Council** নামে এক নির্দেশনামা জারি করে। এর দ্বারা ইয়োরোপের নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির বিভিন্ন বন্দরে পাল্টা অবরোধের কথা ঘোষণা করে এবং ইয়োরোপের কোনও রাষ্ট্র ফ্রান্স অথবা ফ্রান্স-অধিকৃত বন্দরে পণ্যসামগ্রী প্রেরণ করলে তা বাজেয়াপ্ত করার কথাও ঘোষণা করা হয়। 1807 খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে নেপোলিয়ান এবং জার প্রথম আলেকজাণ্ডারের মধ্যে সম্পাদিত টিলসিটের সন্ধি ইংল্যাণ্ডের পক্ষে আশঙ্কার কারণ হয় এবং ফলে ইংল্যাণ্ড পুনরায় Orders in Council এর কথা ঘোষণা করে যে-সব বন্দরে ব্রিটিশ পণ্য সামগ্রীর প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, সেই বন্দরগুলির অবরোধের কথা পুনরায় ঘোষণা করা হয়। নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলিকে ব্রিটেনের সঙ্গে সুবিধাজনক শর্তে ব্যবসা-বাণিজ্য করবার সুযোগ দেওয়া হয় এবং যে-সব শত্রু বন্দরে ব্রিটিশ অবরোধ জারি করা হয়নি সেই বন্দরে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলিকে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ দেওয়া হয়। তাছাড়া ইংল্যাণ্ডের নৌবহর তখন ডেনমার্কের নৌ-বহর আক্রমণ করে ধ্বংস করে দেয়; পাছে ফ্রান্স ডেনমার্ক অধিকার করে ঐ নৌ বহরের কর্তৃত্ব দখল না করে।

এই অর্ডার ইন কাউন্সিলের প্রত্যুত্তরে 1807-এর অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে নেপোলিয়ান *'মিলান ডিক্রি'* ঘোষণা করেন। এতে বলা হলো যে, কোনও নিরপেক্ষ রাষ্ট্র অবরুদ্ধ বন্দরে বাণিজ্য-জাহাজ প্রেরণ করলে তা বাজেয়াপ্ত করা হবে। কোনও জাহাজ, তা মিত্র বা নিরপেক্ষ যে-কোনও দেশেরই হোক-না-কেন, যদি তারা অর্ডার ইন কাউন্সিল অনুযায়ী ইংল্যাণ্ডের কাছ থেকে লাইসেন্স নেয়, তাহলে তাদের সমুদ্রের বুকে অথবা যে-কোনও বন্দরে, ব্রিটিশ সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করা হবে এবং ফ্রান্স তা বাজেয়াপ্ত করবে। ব্রিটেনের কোনও বন্দরে যদি কোনও নিরপেক্ষ দেশের জাহাজ ঢোকে তবে তাকে শত্রু-জাহাজ বলে মনে করা হবে। শুধু এতেই সন্তুষ্ট না হয়ে নেপোলিয়ান ফঁতেনব্লু

(Fontainebleu) ডিক্রি জারি করে বলেন যে, পূর্বোক্ত আদেশ ভঙ্গ করার অপরাধে যে-সব ইংরেজ মাল বাজেয়াপ্ত করা হবে তা প্রকাশ্যে আগুনে পোড়ানো হবে এবং নেপোলিয়ানের নির্দেশ অমান্যকারী ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের বিচার করার জন্য বিশেষ আদালত গঠন করা হবে। এই ভাবে 1806 খ্রিস্টাব্দ থেকে 1810 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নেপোলিয়ান বোনাপার্ট তার তথাকথিত 'মহাদেশীয় অবরোধ পদ্ধতি' গড়ে তুললেন।

শুধু গড়ে তোলাই নয়, তাকে কার্যকর এবং সাফল্য মণ্ডিত করবার জন্যেও তিনি সচেষ্ট হলেন। মহাদেশীয় অবরোধ নেপোলিয়ানের ইংল্যাণ্ড বিরোধী সংগ্রামের একটি বিশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসেবেই দেখা উচিত বলে অধিকাংশ ঐতিহাসিক মনে করেন। তিনি 1806 খ্রিঃ প্রাশিয়ার তৃতীয় ফ্রেডারিক উইলিয়ামকে, 1807 খ্রিঃ রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজাণ্ডারকে, 1809 খ্রিঃ অস্ট্রিয়ার সম্রাট প্রথম ফ্রান্সিসকে মহাদেশীয় অবরোধ মেনে নিতে বাধ্য করেন। ডাচ (হল্যাণ্ডের) বণিকগণ এই ব্যবস্থা গ্রহণে অসম্মত হলে 1810 খ্রিঃ তিনি হল্যাণ্ড দখলের উদ্দেশ্যে একদল ফরাসি সৈন্য পাঠান। ঐ বছরেই হেলিগোল্যাণ্ডে ব্রিটেনের চোরাকারবার বন্ধ করবার জন্য নেপোলিয়ান জার্মানির সমগ্র উত্তর-পশ্চিম উপকূল অঞ্চল সরাসরি দখল করেন। আবার টিলসিটের সন্ধির পর জার কন্টিনেন্টাল সিস্টেম মেনে নিতে বাধ্য হলে পোপ জানালেন তিনি নিরপেক্ষ থাকবেন। নেপোলিয়ান সৈন্য পাঠিয়ে পোপকে কার্যত বন্দী করলেন। আবার মহাদেশীয় অবরোধ সফল করতে গিয়েই নেপোলিয়ান পর্তুগাল ও স্পেন দখল করেন। পর্তুগাল যদিও বরাবরই ইংল্যাণ্ডের অনুগত ছিল কিন্তু নেপোলিয়ানের চাপে পর্তুগাল এই পদ্ধতি মানতে বাধ্য হলেও ইংল্যাণ্ডের বাণিজ্য দ্রব্যাদি দখল করতে রাজি হলো না। ফলে নেপোলিয়ান পর্তুগাল দখল করলেন। স্পেন কিন্তু ফ্রান্সের তাঁবেদার রাজ্যই ছিল। স্পেনের মধ্য দিয়েই ফরাসি সৈন্য. পর্তুগাল গিয়েছিল। তথাপি নেপোলিয়ান স্পেনের সিংহাসন দখল করলেন। যার ফলে স্পেনের সঙ্গে শুরু হলো পেনিনসুলার ওয়ার বা উপসাগরীয় যুদ্ধ। সুইডেনও নেপোলিয়ানের মহাদেশীয় অবরোধ সহজে মানতে চায়নি, ফলে নেপোলিয়ানের তখনকার বন্ধু জার প্রথম আলেকজাণ্ডার সুইডেন আক্রমণ করে ঐ ব্যবস্থা মেনে নিতে বাধ্য করিয়েছিলেন।

মহাদেশীয় অবরোধ পদ্ধতির ফলাফলের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে, ইংল্যাণ্ড এবং ইয়োরোপীয় দেশগুলির সাময়িক ক্ষতি হলেও ফ্রান্সের ক্ষতি হয়েছিল সবচেয়ে বেশি। সেই কারণে নেপোলিয়ানের মহাদেশীয় অবরোধ পদ্ধতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল বলা যায়। ইতিহাসবিদ *লজ* (Lodge) -এর মতে, "The Continental System was the most stupendous proof of Napoleon's incapacity as a Statesman" অর্থাৎ মহাদেশীয় অবরোধ হচ্ছে রাজনীতিজ্ঞ হিসেবে নেপোলিয়ানের অযোগ্যতার সাংঘাতিক এক উদাহরণ। শেষপর্যন্ত 1813 খ্রিস্টাব্দে

নেপোলিয়ান এই পদ্ধতি প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হন। একথা ঠিক যে, প্রথমদিকে, 1806 থেকে 1808 এর মধ্যে, ইংল্যাণ্ড খুব বেশি ক্ষতিগ্রস্ত না হলেও 1808 খ্রিস্টাব্দের পর থেকে তাকে কিছুটা অর্থনৈতিক এবং খাদ্য সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হয়। ইংল্যাণ্ডের রপ্তানি বাণিজ্যের এক-তৃতীয়াংশই যেত ইয়োরোপ থেকে। ফরাসি বেসরকারি যুদ্ধ জাহাজগুলি ব্রিটেনের বাণিজ্যের বেশ ভালরকম ক্ষতি করে। ব্রিটেনের উৎপাদিত মাল রপ্তানি বাজারের অভাবে গুদামজাত হয়ে পড়ে থাকে। ইংল্যাণ্ডে ঐ সময়েই কর্মহীন শ্রমজীবীরা লুটডাই বিদ্রোহ ঘটিয়েছিল। ইংল্যাণ্ডও অর্ডার ইন কাউন্সিল শিথিল করে নিরপেক্ষ জাহাজগুলিকে প্রায় অবাধে অনুমতি দেয়। 1807 থেকে 1812র মধ্যে প্রায় 44,346 টি এরকম অনুমতিপত্র দেওয়া হয়। তবু ইংল্যাণ্ডের ক্ষতি হয়নি, এমন নয়। আমেরিকা থেকে ইয়োরোপে মাল রপ্তানির বিরুদ্ধে অর্ডারস্ ইন কাউন্সিল জারি করার ফলে আমেরিকাও ব্রিটিশ পণ্যের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। 1810 থেকে 1812র মধ্যে ইংল্যাণ্ডে চরম খাদ্য সংকটও দেখা দেয়। সেই সময় নেপোলিয়ান আবার এক ভুল করেন। তিনি ইংল্যাণ্ডে গম রপ্তানি করে ইংল্যাণ্ডকে বিরাট খাদ্য সংকটের হাত থেকে বাঁচান। তিনি ভেবেছিলেন ইংল্যাণ্ডের থেকে আমদানি বন্ধ, এই সুযোগে খাদ্য শস্য রপ্তানি করে ইংল্যাণ্ডের সম্পদ আরও শুষে নিতে। এতে বরং ব্রিটেনকে নিয়ন্ত্রণে আনার সুযোগই তিনি হারালেন। তাছাড়া এ সময় ব্রিটেন আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, তুরস্ক প্রমুখের সঙ্গে নতুন বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে তোলে।

ফ্রান্সের নিজের সংকটও কম ছিল না। সেখানেও ছিল কর্মহীনতা ও বেকারির সমস্যা। *আলফ্রেড কোবান* এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ইংল্যাণ্ড নৌশক্তিতে বলীয়ান তাই শেষ পর্যন্ত ক্ষতি তারা সামলে নেয়। *মর্স স্টিফেনস্* তাই মন্তব্য করেছেন, "মোটের উপর এই ব্যবস্থা ইংল্যাণ্ডের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির ক্ষতিসাধন না করে বাড়িয়ে দিয়েছিল।" অপরপক্ষে ফ্রান্স অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভবান তো হয় নি, বরং ইয়োরোপীয় অন্যান্য দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ফ্রান্সকেই দায়ী করেছিল। আবার মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা কার্যকর করতে গিয়ে ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ফ্রান্সের রাজনৈতিক বিরোধ বাধে। সুতরাং শুধু অর্থনৈতিক নয়, রাজনৈতিক দিক থেকেও এই পদ্ধতি ছিল হঠকারী এবং মূলতঃ ব্যর্থ। *মার্কহ্যামের* মতে ফ্রান্সের অভ্যন্তরেও ফরাসি মধ্যবিত্ত শ্রেণী এই সময় থেকে নেপোলিয়ানের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ে।

মহাদেশীয় অবরোধ পদ্ধতি কেন ব্যর্থ হলো এবং এই পদ্ধতির ব্যর্থতা নেপোলিয়ানের পতনের জন্য কতখানি দায়ী— সে-বিষয়েও একটু নজর দেওয়া দরকার। প্রথমতঃ, কন্টিনেন্টাল সিস্টেমকে কার্যকর করতে হলে যে বিশাল নৌ-শক্তির প্রয়োজন ছিল তা নেপোলিয়ানের ছিল না। ইয়োরোপের সুদীর্ঘ-উপকূলের উপর নজর রাখতে গিয়ে তাকে নির্ভর করতে হয়েছিল অন্যদেশের উপরে। অপরপক্ষে নৌশক্তিতে বলীয়ান

ইংল্যাণ্ডের পক্ষে ফ্রান্স ও তার নিয়ন্ত্রণাধীন দেশগুলির ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতি করা সহজসাধ্য ছিল। দ্বিতীয়তঃ, শিল্পে উন্নত দেশ ইংল্যাণ্ড-এর পণ্যের ইয়োরোপের বাজারে যথেষ্ট চাহিদা থাকায় ফ্রান্সের মতন শিল্পে অনুন্নত দেশের পক্ষে তা পূরণ করা সম্ভব ছিল না। তৃতীয়তঃ, মহাদেশীয় অবরোধ পদ্ধতিতে ইয়োরোপের নানা দেশের বণিকদের যথেষ্ট ক্ষতি হয় এবং ফলে নানা দেশ ফ্রান্সের প্রতি বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। চতুর্থতঃ, মহাদেশীয় অবরোধ কার্যকর করতে গিয়ে পোপের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার ফলে সমগ্র ক্যাথলিক জগৎ নেপোলিয়ানের বিপক্ষে চলে যায়। পঞ্চমতঃ, ইয়োরোপের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের চোরা পথে ব্যবসা-বাণিজ্য কখনোই বন্ধ করা যায় নি। এমনকি, ফ্রান্স নিজে পর্যন্ত অনেক সময় গোপনে ইংরেজি পণ্য আমদানি করত। ষষ্ঠতঃ, ইয়োরোপের বাইরে ইংল্যাণ্ড অনেক নতুন বাজার ও বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে তোলে। সপ্তমতঃ, ফ্রান্সের ভিতরেই এক শ্রেণীর বণিক ও শিল্পপতি এই পদ্ধতির বিরোধী ছিলেন। সর্বশেষে বলা যায়, এই মহাদেশীয় অবরোধকে কেন্দ্র করে স্পেনের সঙ্গে উপদ্বীপের যুদ্ধের সূত্রপাত আর এই স্পেনীয় ক্ষতই তাঁর পতনের অন্যতম কারণ। তেমনি এই পদ্ধতি শেষ পর্যন্ত না মেনে জার প্রথম আলেকজাণ্ডার-ইংল্যাণ্ডের কাছে রাশিয়ার বন্দর উন্মুক্ত করে দেওয়াই নেপোলিয়ানের রাশিয়া আক্রমণের অন্যতম কারণ। এই মস্কো অভিযান (1812) নিষ্ফল তো হলোই বরং এর পর থেকে নেপোলিয়ানের পতনের পথ আরও সুগম হলো। নেপোলিয়ানের অহমিকাই গোটা ইয়োরোপকে তাঁর বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ করে এবং প্রকৃতবাস্তব অবস্থা বুঝতে না পারাই তাঁর পতনের মূলকথা।

পেনিনসুলার যুদ্ধ, 'স্পেনীয় ক্ষত' এবং তার ফলাফল ঃ নেপোলিয়ানের মহাদেশীয় অবরোধ পদ্ধতির প্রবর্তনের পর স্পেনের সঙ্গে বিবাদকে কেন্দ্র করেই শুরু হয় পেনিনসুলার যুদ্ধ বা উপদ্বীপের যুদ্ধ। এই যুদ্ধ নেপোলিয়ানকে একটি সম্মিলিত জাতির আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে দাড় করিয়ে দেয় এবং এই ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে ইয়োরোপে নেপোলিয়ান বিরোধী জনগণের উত্থান ঘটে। স্পেনের যুদ্ধে ফরাসি সম্রাটের গ্র্যাণ্ড আর্মির জীবনী শক্তি ক্ষয় করেছিল; নেপোলিয়ানের শত্রুদের আবার একতাবদ্ধ করেছিল। এজন্য নেপোলিয়ান নিজেই লিখেছিলেন, 'The Spanish ulcer ruined me' অর্থাৎ স্পেনীয় ক্ষতই আমাকে ধ্বংস করেছে।

অথচ এই যুদ্ধ শুরু হওয়ার জন্য সম্পূর্ণ নেপোলিয়ানই দায়ী। ফরাসি বিপ্লবের সময় থেকেই স্পেনে বুরবোঁ বংশীয় শাসন বলবৎ ছিল। তবে সেখানকার রাজা চতুর্থ চার্লস (1788-1807) ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল। আসল ক্ষমতা ছিল রাণী মারিয়া লুইসা এবং রাণীর প্রিয়পাত্র তথা প্রণয়ী মন্ত্রী গোদয় (Godoy) -এর হাতে। গোদয় পর্তুগালকে স্পেনের অধীনে নিয়ে আসার ইচ্ছা পোষণ করতেন। নেপোলিয়ান ক্ষমতায় আসার

পর স্পেন তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে যায়নি। বস্তুত বিপ্লব পর্বে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রথম রাষ্ট্রজোটে স্পেন ছিল বটে তবে 1795 খ্রিঃ স্পেন ফ্রান্সের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করে। নেপোলিয়ান ক্ষমতায় আসার পর 1800-র অক্টোবরে স্পেনের সঙ্গে সান্ ইলদে ফানসোর চুক্তি সম্পাদন করেন। ফ্রান্স লুইসিয়ানা লাভ করে যদিও পরে তা আমেরিকাকে বিক্রি করে দেয়। নেপোলিয়ানের পর্তুগাল দখলের বাসনা ছিল। স্পেনের সেই ব্যাপারে সম্মতি ছিল। স্পেনের নিজের সামরিক শক্তি বেশি না থাকাতে তারা ফ্রান্সের সাহায্যে পর্তুগালের কিছু অংশ পেতে চেয়েছিল। 1804 খ্রিস্টাব্দে নেপোলিয়ান সম্রাট হন এবং স্পেন ফ্রান্সের পক্ষে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেয়। তবে 1805 -এর অক্টোবরে ট্রাফালগারের নৌযুদ্ধে ফরাসি স্পেনীয় যুগ্ম নৌবাহিনী ইংল্যাণ্ডের কাছে পরাজিত হয়।

এরপর নেপোলিয়ান তাঁর মহাদেশীয় অবরোধ পদ্ধতি প্রবর্তন করলে স্পেন ও আইবেরীয় উপদ্বীপের উপকূল অঞ্চলে ফরাসি প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করার দরকার হয়ে পড়ে। পর্তুগালকে সম্পূর্ণ নিজের অধীনে আনতে ফ্রান্স সচেষ্ট ছিলই, কেননা পর্তুগালের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল এবং পর্তুগাল কন্টিনেন্টাল সিস্টেম কার্যকর করার ব্যাপারে ফ্রান্সের সঙ্গে বিশেষ সহযোগিতা করেনি। টিলসিটের সন্ধির পর তাই নেপোলিয়ান পর্তুগাল দখল করতে মনস্থ করেন; 1807 -এর অক্টোবরে জুনোর (Junot) নেতৃত্বে সৈন্যবাহিনী পাঠানো হয়। ফ্রান্স থেকে স্থলবাহিনীর পর্তুগাল যেতে হলে স্পেনের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়; পর্তুগালের দক্ষিণ অংশ স্পেনকে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নেপোলিয়ান গোদয়কে স্বপক্ষে নিয়ে আসেন।

কিন্তু ফরাসি সৈন্য পর্তুগাল আক্রমণের জন্য স্পেনে প্রবেশ করার পর ক্রমশ পরিস্থিতির বদল ঘটে। একদিকে ফরাসি বাহিনী; স্পেনের সঙ্গে যে ফঁতেনব্লু-র চুক্তি হয়েছিল (1807), এবং যে কারণে স্পেনের মধ্য দিয়ে পর্তুগাল অভিমুখে ফরাসি বাহিনীকে যেতে দিতে স্পেন সম্মত হয়েছিল; সেই চুক্তির বিরুদ্ধাচরণ করে স্পেনের কিছু অঞ্চল দখল করে নেয়। অপরপক্ষে জুনোর বাহিনী স্পেনে ঢোকার পরই স্পেনের মানুষ গোদয় সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। রাজা চতুর্থ চার্লস -এর উত্তরাধিকারী ফার্দিনান্দও গোদয় এর আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন। তিনি নেপোলিয়ানের কাছে সাহায্যের জন্য বার্তা পাঠান। নেপোলিয়ান এই সুযোগে স্পেনের সিংহাসনে নিজের বা তার নিজস্ব প্রতিনিধির শাসন প্রবর্তন করতে আগ্রহী হন । তিনি মুরার (Murat) অধীনে এক নতুন ফরাসি-বাহিনী মাদ্রিদ অভিমুখে পাঠান। বিক্ষুব্ধ স্পেনীরা গোদয়কে বন্দী করে; রাজা চতুর্থ চার্লস পুত্র ফার্দিনান্দ-এর অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করেন। কিন্তু নেপোলিয়ান বেয়ন (Bayonne) নামক স্থানে চার্লস এবং ফার্দিনান্দ উভয়কে ডেকে পাঠিয়ে উভয়কে নিজের অনুকূলে সিংহাসন ছাড়তে বাধ্য করেন এবং 1808 খ্রিস্টাব্দের 15 জুন সেই শূন্য সিংহাসনে নিজের ভাই যোসেফ বোনাপার্টকে বসান।

নেপোলিয়ান স্পেনের জনগণের আশা আকাঙ্খাকে ধর্তব্যের মধ্যে আনেন নি।

রাজপরিবারের সবাইকে নির্বাসনে পাঠিয়ে, সিংহাসনে ভাইকে বসিয়ে, এক উদারনৈতিক সংবিধানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নেপোলিয়ান যা করলেন, তার নিট ফল হলো স্পেনবাসীদের মর্যাদায় ও দেশপ্রেমে আঘাত। এর ফলে সমবেত জাতির এক গণবিক্ষোভের সম্মুখীন হতে হলো। এই বিক্ষোভ থেকেই উপদ্বীপের যুদ্ধের (Peninsular War) সূচনা হলো। *ডেভিড টমসন* তাই লিখেছেন, "Hitherto Napoleon had defeated professional salaried soldiers, now he faced a nation" (এতদিন পর্যন্ত নেপোলিয়ান বেতনভুক পেশাদার সৈন্যদেরই হারিয়েছিলেন। এবার তিনি ঐক্যবদ্ধ জাতীয় প্রতিরোধের সম্মুখীন হলেন)।

যোসেফ বোনাপার্ট 1808 -এর জুলাইতে মাদ্রিদ পৌছনোর আগেই স্পেনে বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং গণবিক্ষোভ স্পেনের নানা অংশে ছড়িয়ে পড়ে। এই বিদ্রোহের সামরিক রূপ ছিল কৃষকদের গেরিলা যুদ্ধ। সাধারণ মানুষ দলে দলে সৈন্য বাহিনীতে নাম লেখান এবং যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েন। রাজনৈতিকভাবে বিভিন্ন প্রদেশে জুন্টা (Junta) বা সামরিক নেতৃত্ব গঠিত হয়। যার কেন্দ্রীয় সংগঠন ছিল কাদিজ শহরে। এরা স্থানীয় প্রশাসন নিজেদের হাতে নিয়ে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করতে শুরু করে। 1808 খ্রিস্টাব্দের জুলাইতে কাদিজ দখল করতে যাওয়া ফরাসি বাহিনীর সেনাপতি দুপঁ (Dupont) বেলেন নামক স্থানে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হন। যোসেফ বোনাপার্টও মাদ্রিদ ছেড়ে পলায়নে বাধ্য হন। স্পেনীয়গণকে দেখে উৎসাহিত হয়ে পর্তুগালও বিদ্রোহ করে এবং ইংল্যাণ্ডের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। ইংল্যাণ্ডও সৈন্য পাঠিয়ে পর্তুগালকে সাহায্য করতে অগ্রসর হয়। স্পেন ও পর্তুগালের এই গণঅভ্যুত্থান এবং ফ্রান্স-বিরোধী যুদ্ধই উপদ্বীপের যুদ্ধ, যাতে ইংল্যাণ্ড ফ্রান্সের বিরুদ্ধে স্পেন-পর্তুগালের পক্ষে যোগ দেয়। এই যুদ্ধ 1808 থেকে 1813 খ্রিঃ পর্যন্ত চলেছিল এবং শেষ পর্যন্ত নেপোলিয়ানের চূড়ান্ত বিপর্যয়ের মধ্যে এর পরিসমাপ্তি ঘটে।

এবার যুদ্ধের গতিপ্রকৃতির দিকে সংক্ষেপে দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে: বেলেনের যুদ্ধে দুপঁর পরাজয়ের পর নেপোলিয়ান নিজে 1808 -এর নভেম্বর মাসে ফরাসি বাহিনীর দায়িত্ব নেন এবং জার্মানি থেকে 'গ্র্যাণ্ড আর্মি'র একটি বড়ো অংশকে স্পেনে নিয়ে আসেন। স্পেনীয় বিদ্রোহীগণ তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে ফরাসি বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত 1808 -এর ডিসেম্বরে নেপোলিয়ান মাদ্রিদে প্রবেশ করেন। ইতোমধ্যে স্পেনীয়গণকে সাহায্য করার জন্য স্যার জন মুর-এর অধীনে একদল ইংরেজ সৈন্য লিসবন থেকে অগ্রসর হয়ে করুণার যুদ্ধে ফরাসি বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়। তবে অল্পদিনের মধ্যেই নেপোলিয়ানকে অন্য কাজে স্পেন পরিত্যাগ করতে হয় এবং আর ভবিষ্যতে তিনি স্পেনে ফিরতে পারেন নি। অবশ্য মুর পরাজিত হলেও স্পেনের দক্ষিণাঞ্চল এবং পর্তুগালকে ফরাসি আক্রমণের হাত থেকে সাময়িকভাবে রক্ষা করতে তিনি সমর্থ হয়েছিলেন।

অপরদিকে পর্তুগালে পর্তুগিজদের সাহায্যের জন্য তেরো হাজার ইংরেজ সৈন্য নিয়ে উপস্থিত হন আর্থার ওয়েলেসলি, যিনি ডিউক অফ ওয়েলিংটন নামেই বিখ্যাত। ওয়েলেসলি ফরাসি অধিনায়ক জুনোকে ভিমিরিয়োর যুদ্ধে পরাজিত করেন (1808) এবং জুনো সিন্ট্রার কনভেনশন স্বাক্ষর করলে ফরাসি বাহিনী পর্তুগাল থেকে সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়। ইংরেজরা পর্তুগালের রাজধানী লিসবনে ঘাঁটি তৈরি করে। নেপোলিয়ান অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত থাকাতে স্পেনে পুরো মন দিতে পারেন নি। ফলে পেনিনসুলার যুদ্ধের অগ্রগতি যতই বাড়তে থাকে ততই ফরাসি বাহিনীর সঙ্কট বৃদ্ধি পায়। শেষে নেপোলিয়ান তাঁর বিখ্যাত সেনাপতি মাসেনাকে স্পেনে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য এক লক্ষ চল্লিশ হাজার সৈন্য সমেত পাঠান। স্পেনের দক্ষিণ দিক থেকে সুল্ট (Soult) অবশ্য মাসেনাকে (Massena) সাহায্য পাঠান নি। ইংরেজ সৈন্য ওয়েলিংটনের নেতৃত্বে সম্মুখ যুদ্ধ পরিত্যাগ করে পর্তুগালে টরেস ভেড্রাস (Torres Vedras) নামে এক আত্মরক্ষা ব্যূহ তৈরি করেন, ফরাসি বাহিনী শত চেষ্টা করেও যা ভেদ করতে পারেনি। ফলে ফরাসি বাহিনী পর্তুগালে প্রবেশ করতে অসমর্থ হয়।

এরপর নেপোলিয়ান বোনাপার্ট বিশাল সৈন্য বাহিনী নিয়ে রুশ অভিযানে গেলে (1812 খ্রিঃ) স্পেন ও পর্তুগালের উপদ্বীপের যুদ্ধের বহু ফরাসি সৈন্য সরে আসতে বাধ্য হয়। ডিউক অফ ওয়েলিংটন এবার আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করেন। 1812 খ্রিঃ সালামানকর যুদ্ধে তিনি ফরাসিদের শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করেন। মাদ্রিদ ইংরেজ সেনাদের হস্তগত হলো। এরপর ডিউক অফ ওয়েলিংটন 1813 খ্রিস্টাব্দের জুনমাসে ভিক্টোরিয়াতে ফরাসি সেনাপতি জুর্দানকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেন। ফ্রান্স পেনিনসুলার যুদ্ধে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হয়ে স্পেন-পর্তুগালের আশা পরিত্যাগ করে। অতঃপর ওয়েলিংটন ফ্রান্স আক্রমণের পরিকল্পনা করে ফরাসি-অধিকৃত স্পেনের পাম্পেলুনা এবং সেন্ট সেবাস্টিয়ান দুর্গ দুটি দখল করেন (আগস্ট-অক্টোবর 1813 খ্রিঃ)। এরপর পিরেনিজের যুদ্ধে জয়লাভ করে ওয়েলিংটন ক্রমশ নীভ অতিক্রম করে বেয়ন নগর দখল করেন, ফরাসি সেনাপতি সুল্টকে পরাজিত করে বর্দো (Bordeaux) এবং পরে তুলো (Toulouse) দখল করেন (1814 খ্রিঃ)। নেপোলিয়ানের পতন তখন সমাগত।

পেনিনসুলার যুদ্ধের বিফলতা শুধু নেপোলিয়ানের সাময়িক মর্যাদাই ক্ষুণ্ণ করেনি। তার পতনকেও তরান্বিত করেছিল। *H.A.L. Fisher* যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে, "ফরাসি সাম্রাজ্যের সংগঠনে নেপোলিয়ানের স্পেনীয় অভিযানের পরই প্রথম ফাটল দেখা দেয়।" প্রথমত ঃ, স্পেনবাসীদের জাতীয় প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়ে নেপোলিয়ানের অজেয় রণকৌশল ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয়তঃ, স্পেনের দৃষ্টান্তে অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া সমেত অন্যান্য দেশও জেগে ওঠে। তৃতীয়তঃ, স্পেনের সিংহাসন দখলের চেষ্টার মধ্যে ঘৃণ্য আত্মসাৎ প্রবণতা ইয়োরোপে নেপোলিয়ানের সম্মানহানি করে। চতুর্থতঃ, স্পেনের সঙ্গে পর্তুগালও নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ায় এবং তাদের দৃষ্টান্তে ইয়োরোপের

অন্য দেশেও জাতীয়তাবাদের জাগরণ হয়। পঞ্চমতঃ, নেপোলিয়ানের মহাদেশীয় অবরোধ পদ্ধতি উপদ্বীপে ব্যর্থ হলে ক্রমশ রাশিয়া এই পদ্ধতি অগ্রাহ্য করে। ষষ্ঠতঃ, স্পেনের যুদ্ধে জয়লাভ না করেই রুশ অভিযান চালিয়ে নেপোলিয়ান হঠকারিতার পরিচয় দেন। সপ্তমতঃ, উপদ্বীপের যুদ্ধে ইংল্যাণ্ড সিংহবিক্রমে ফ্রান্সের উপর ঝাপিয়ে পড়ে। বিশেষত ডিউক অফ ওয়েলিংটনের নেতৃত্ব নেপোলিয়ানের পক্ষে ক্ষতিকর হয়। অষ্টমতঃ, দীর্ঘদিনের উপদ্বীপের যুদ্ধে ফ্রান্সের লোকবল এবং অর্থবলের প্রভূত ক্ষতি হয়। স্পেনের প্রতিরোধ থেকেই ইয়োরোপীয় প্রতিরোধের জন্ম নেয়। সেই কারণেই উত্তরকালে তার পতনের জন্য স্পেনীয় ক্ষত'কে চিহ্নিত করেছিলেন।

নেপোলিয়ানের রুশ অভিযান এবং তার ফলাফল : ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ান রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে টিলসিটের সন্ধি করেছিলেন 1807 খ্রিস্টাব্দে। তার পরের বছর এরফুর্ট (Erfurt) -এর চুক্তি দ্বারা তা সমর্থিত হয়েছিল। কিন্তু নানাকারণে ফ্রান্সের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্কের অবনতি ঘটে। শেষপর্যন্ত রাশিয়াকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার জন্য নেপোলিয়ান রাশিয়ার রাজধানী মস্কো অভিযানের পরিকল্পনা করেন। তিনি নিজেই বর্ণনা করেছিলেন যে এই অভিযান ছিল তাঁর সব থেকে কঠিন এবং বৃহৎ পরিকল্পনা; যা সফল হলে ইয়োরোপে তার শক্তি অপ্রতিহত হতে পারত অথচ যা ব্যর্থ হয়েছিল বলে তার পতন তরান্বিত হলো।

নেপোলিয়ানের সঙ্গে জারের সম্পর্ক কেন ক্রমে খারাপ হলো সেই কারণগুলি বোঝা দরকার। প্রথমতঃ, জার প্রথম আলেকজাণ্ডারের কিছুদিনের মধ্যে আশাভঙ্গ হয়। অধ্যাপক সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী লিখেছেন, "আলেকজাণ্ডার নিজে নেপোলিয়ানের সাহায্যে তুরস্ককে ভাগ করা ও কনস্তান্তিনোপল দখল করার পুরোনো উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রূপান্তরিত করার জন্যই নেপোলিয়ানের সঙ্গে চুক্তি করতে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে নেপোলিয়ান কোন মতেই তুরস্ক ভাগ করতে রাজী হবেন না।" তাছাড়া সুইডেনের বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুত সাহায্যও জার পান নি। বস্তুত রুশ-ফ্রান্স বন্ধুত্বে প্রধান ত্রুটি ছিল, ফ্রান্সের প্রাধান্য স্বীকার করে জারকে এই সন্ধি করতে হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ, জার এবং রাশিয়ার অভিজাতদের ভয় ছিল যে নেপোলিয়ান আবার স্বাধীন পোল্যাণ্ড তৈরি করতে পারেন। নেপোলিয়ান কর্তৃক গ্র্যাণ্ড ডাচি অফ ওয়ার্‌স গঠন করার পর থেকেই রাশিয়ার ভয় ছিল যে পোল্যাণ্ড ভাগ করে তারা পোল্যাণ্ডের যে-সব অংশ পেয়েছেন নেপোলিয়ান সেগুলি ফেরৎ চাইবেন। তারপর আবার যখন 1809-তে অস্ট্রিয়ার পরাজয়ের পরে গ্যালিসিয়া 'গ্র্যাণ্ড ডাচি অফ ওয়ার্‌স'র সঙ্গে যুক্ত করা হলো তখন রাশিয়া ক্ষুব্ধ হয় এবং স্বাধীন পোল্যাণ্ড পুনর্গঠন করা হবে না এ রকম প্রতিশ্রুতি চাইলে নেপোলিয়ান তা দিতে অস্বীকার করেন। তৃতীয়তঃ, নেপোলিয়ানের উৎসাহ এবং সহায়তায় সুইডেনে বারনাদোৎ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসেবে নির্বাচিত হলে জার আলেকজাণ্ডারের

ভয় এবং বিরক্তি বৃদ্ধি পায়। চতুর্থতঃ, নেপোলিয়ান ওলডেনবার্গের ডাচি দখল করে নেন। এখানকার ডিউক ছিলেন জারের ভগ্নীপতি। ফলে জার রুষ্ট হন। পঞ্চমতঃ, মহাদেশীয় অবরোধ পদ্ধতি দু'জনের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটায়। জার 1810 এর ডিসেম্বরে নির্দেশ জারি করে রাশিয়ার বন্দর নিরপেক্ষ জাহাজগুলির জন্যে খুলে দিলে মহাদেশীয় ব্যবস্থায় ফাটল ধরে। ষষ্ঠতঃ, উপদ্বীপের যুদ্ধ শুরু হলে, স্পেনীয়বাসীদের জাতীয় প্রতিরোধ শুরু হলে এবং পর্তুগালের মতন ক্ষুদ্র দেশও নেপোলিয়ানের আগ্রাসন প্রতিহত করায়, রাশিয়া উদ্বুদ্ধ হয়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে রাশিয়া প্রথমেই মহাদেশীয় অবরোধ মানতে অস্বীকার করে, এবং 1812 থেকে অবস্থার বদল ঘটে। মহাদেশীয় ব্যবস্থার ফলে সুইডেনের বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সুইডেনের যুবরাজ বারনাদোৎ এজন্য ক্ষুব্ধ ছিলেন। 1812-তে নেপোলিয়ান সুইডিশ পোমেরেনিয়া দখল করলে সেই বছর সুইডেন রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রীস্থাপন করে। আবার সন্ধি অনুযায়ী সুইডেন রাশিয়াকে ফিনল্যাণ্ড অর্পণ করে এবং সামরিক সাহায্য দিতে রাজী হয়। রাশিয়া তদুপরি তুরস্কের সঙ্গে তার বিবাদ মিটিয়ে নিয়ে বুখারেস্ট-এর সন্ধি করে (1812)। এর দ্বারা রাশিয়া বেসারাবিয়া লাভ করলো এবং সার্বিয়ার স্বাধীনতা স্বীকৃত হলো। আলেকজাণ্ডার ইংল্যাণ্ডের সঙ্গেও বন্ধুত্ব লাভে আগ্রহী হলেন। 1812 খ্রিস্টাব্দে উপদ্বীপের যুদ্ধে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্যাস্‌লরি (Castlereagh) ডিউক অফ ওয়েলিংটনকে বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। ক্যাসল্‌রির চেষ্টাতেই 1812-তে সুইডেন, রাশিয়া ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে ওরব্রোতে একচুক্তি সম্পাদিত হয়।

কেন নেপোলিয়ান রাশিয়া অভিযানের পরিকল্পনা নিলেন তা নিয়ে নানা মত আছে। *মর্স স্টিফেনস্* -এর মতে কন্টিনেন্টাল সিস্টেম কার্যকর করতে রাশিয়ার অস্বীকৃতি, *আলফ্রেড কোবানের* মতে রাশিয়াকে অধীনস্থ করতে নেপোলিয়ানের আকাঙ্খা, আবার নেপোলিয়ানের জীবনীকার *ভিনসেন্ট ক্রোনিনের* মতে পোল্যাণ্ড নিয়ে মতভেদই এজন্য দায়ী। যে কারণেই হোক 1812 খ্রিস্টাব্দে তিনি তাঁর সুবিখ্যাত গ্র্যাণ্ড আর্মির প্রায় ছয় লক্ষ সৈন্য নিয়ে প্রস্তুতি নেন। রাশিয়া আক্রমণ করেন প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ সৈন্য নিয়ে। তবু চমকপ্রদ যুদ্ধ জয়ের ঝুঁকি থেকেই গিয়েছিল। কৌশলগত দিক থেকেও নেপোলিয়ান ভুল করেন। অর্থাৎ তার ধারণা ছিল বিপুল সৈন্য নিয়ে সংক্ষিপ্ত যুদ্ধের মাধ্যমে তিনি রাশিয়াকে পরাজিত করতে পারবেন। কিন্তু রাশিয়ার সেনানায়কগণ সম্মুখ যুদ্ধ এড়িয়ে যায়, ইচ্ছে করে পশ্চাদপসরণ করে, বিপক্ষের সৈন্যদের ভিতরে টেনে নিয়ে যেতে বাধ্য করে, শেষে বিপক্ষ জয়লাভ করে বটে কিন্তু তারা ফাঁকা অঞ্চল ছাড়া কিছুই লাভ করতে পারেনি। বরং ফরাসি বাহিনী চরম খাদ্যাভাবে পড়ে। একেই 'পোড়া মাটির নীতি' (Scorched Earth Policy) বলা হয়। ফ্রান্সের পেশাদার সুদক্ষ সৈন্যদের সঙ্গে সামনাসামনি যুদ্ধের বদলে পোড়ামাটির নীতি সম্পর্কে নেপোলিয়ানের কোনও ধারণা ছিল না। সর্বোপরি সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ল বলেই ফ্রান্সের গ্র্যাণ্ড

আর্মি কাজে লাগে নি। একই রকম গুরুত্বপূর্ণ ছিল আবহাওয়ার ভূমিকা। যাওয়ার সময় বর্ষায়, প্রত্যাবর্তনের সময় প্রচণ্ড শীত এবং তুষারপাতে নেপোলিয়ানের বিপুল ক্ষতি হয়। নেপোলিয়ানের রুশ অভিযান তাই সামরিক মর্যাদা হ্রাস, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ, বিপুল লোকবল, অর্থবল-এর ক্ষতি ছাড়া কিছুই করতে পারে নি।

নেপোলিয়ানের বাহিনী 1812-র জুন মাসে টিলসিটের কাছে নিমেন নদী অতিক্রম করে পোল্যাণ্ডের রাজধানী ভিলনা (Wilna) প্রবেশ করে। রুশ বাহিনী ঐ অঞ্চল পরিত্যাগ করে এবং যাওয়ার সময় নেপোলিয়ানের সৈন্যদল ব্যবহার করতে পারে এমন সবকিছু নষ্ট করে দেয়। এই হলো পোড়া মাটি নীতির প্রথম পদক্ষেপ। রুশ বাহিনীর দায়িত্বে ছিলেন বার্কলে এবং বাগ্রাসিও। নেপোলিয়ান ভেবেছিলেন ভিটেবসক্ এ যুদ্ধ হবে, তা হয়নি। রুশবাহিনী স্মলেনস্ক -এ পালিয়ে যায়। নেপোলিয়ান ফরাসি সৈন্য নিয়ে সেখানে ধাওয়া করেন। রুশবাহিনী পিছিয়ে যায়। এই সময় জার আলেকজাণ্ডার বার্কলের জায়গায় কুতুস্ভকে সেনাপ্রধান নিযুক্ত করেন। নেপোলিয়ান স্মলেনস্ক থেকে মস্কো অভিমুখে যাত্রা করেন। প্রতি পদে পদে নেপোলিয়ান প্রতিকূল আবহাওয়ার সম্মুখীন হন। জুলাই এ প্রবল বর্ষা, আগস্টে অসহ্য চাপা গরম এবং পরে দারুণ শীত। ভিলনায় অন্যাবশ্যক সময় কাটানো ও শীতে স্মলেনস্ক (Smolensk) -এ কাটিয়ে মস্কো অভিমুখে যাত্রাও তাঁর ভুল পদক্ষেপ। শীতে ও খাদ্যাভাবে বহু সৈন্য মারা যায়। তবু নেপোলিয়ান 1812-র সেপ্টেম্বরে বোরোজিনোতে রুশ বাহিনীকে পরাজিত করে মস্কোয় প্রবেশ করলেন। আসলে রুশ বাহিনী পোড়া মাটির নীতির দ্বিতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে ইচ্ছাকৃতভাবে পিছিয়ে পিছিয়ে মস্কো পর্যন্ত নিয়ে যায়। তৃতীয় পদক্ষেপে মস্কো শহর থেকে সমস্ত লোকজন সরিয়ে নিয়ে শহরে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং প্রায় চার পাঁচ দিন সেই আগুনে মস্কো শশ্মানে পরিণত হয়। নেপোলিয়ানের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে চরমখাদ্যাভাব দেখা দেয়। এর উপর নেপোলিয়ান প্রচণ্ড শীত উপেক্ষা করে একমাস মস্কোয় ছিলেন এই আশায় যে, জার সন্ধি করতে বাধ্য হবেন কিন্তু প্রথম আলেকজাণ্ডার সেন্ট পিটার্সবার্গ এ অবস্থান করেছিলেন, আদৌ নেপোলিয়ানের কাছে আত্মসমর্পণ করেন নি। 14 সেপ্টেম্বর থেকে 19 অক্টোবর পর্যন্ত থেকে নেপোলিয়ান মস্কো ছেড়ে শেষ পর্যন্ত প্যারিসে ফিরে আসেন।

নেপোলিয়ানের ব্যর্থতা পূর্ণ হয়ে যায় আরও তিনটি কারণে। স্মলেনস্ক, ভিলনা হয়ে ফেরার সময় প্রচণ্ড শীত আর তুষারপাতে বহু সৈন্য মারা যাওয়া, প্রচণ্ড খাদ্যাভাবে বহু লোকের মৃত্যু। দ্বিতীয়তঃ, প্রতাবর্তনের পথে ফরাসি বাহিনীর উপর রুশদের অতর্কিত আক্রমণ এবং তৃতীয়তঃ, নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে নানা বিক্ষোভ ও ষড়যন্ত্র ফ্রান্সের মধ্যে শুরু হওয়া।

নেপোলিয়ানের রুশ অভিযান ব্যর্থতার কারণ ছিল বহুবিধ। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস, সম্মুখ যুদ্ধের দ্বারা যুদ্ধ জয়ের আশা, মাত্র এক বছরের মধ্যে রাশিয়ার বিশাল দেশ

জয় করার পরিকল্পনা, পোড়ামাটি নীতি সম্বর্কে ধারণা না থাকা, প্রতিকূল আবহাওয়া ইত্যাদির কথা সহজেই মনে পড়ে। নেপোলিয়ানের রুশ অভিযানের ফলাফলের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামরিক তিন দিকেই নেপোলিয়ানের ব্যর্থতা ছিল প্রকট। রাশিয়াকে জয় করতে না পেরে তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নি। তাঁর বিশাল সামরিক বাহিনী হলো বিধ্বস্ত। সামরিক প্রতিভা, ব্যক্তিগত মর্যাদা, ফরাসি সম্মান সবই হলো কলুষিত। বিপুল অর্থব্যয় আর্থিক ব্যবস্থাকে করে তুললো বিপন্ন। অর্থ সঙ্কটমুক্ত করতে গিয়ে নতুন কর ধার্য করাতে সাধারণ মানুষদের অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়। সর্বাপেক্ষা চূড়ান্ত ফলাফল হলো: (ক) মস্কো অভিযানের ব্যর্থতার পরই নেপোলিয়ানের পতনের চূড়ান্ত পর্বের সূত্রপাত হয় এবং (খ) নেপোলিয়ানের ব্যর্থতার পরই ইয়োরোপে চতুর্থ রাষ্ট্রজোট (Fourth Coalition) গঠিত হয়, যাদের মুক্তি সংগ্রাম (War of Liberation) শেষ পর্যন্ত নেপোলিয়ানের ক্ষমতাচ্যুত করে।

নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে মুক্তিসংগ্রাম এবং নেপোলিয়ানের পতন ঃ নেপোলিয়ানের রাশিয়া অভিযানের ব্যর্থতার পর থেকে ইয়োরোপের নানা দেশের মিলিত মুক্তি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁর চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে। রুশ অভিযানের পর থেকে লাইপজিগের যুদ্ধ এই পতন প্রক্রিয়ার প্রথম পর্ব ; ফ্রান্সের যুদ্ধ অর্থাৎ মিত্র শক্তির ফ্রান্স আক্রমণ এবং নেপোলিয়ানের এলবাতে নির্বাসন পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্ব ; নেপোলিয়ানের শত দিবসের জন্য প্রত্যাবর্তন, ওয়াটারলুর যুদ্ধে পরাজয় এবং সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসন হল অন্তিম পর্ব।

নেপোলিয়ানের রুশ অভিযানের ব্যর্থতাই ইয়োরোপে এক নতুন উন্মাদনার সৃষ্টি করে। নেপোলিয়ান অজেয় নন এই ধারণা জোরদার হতেই তাঁর বিরুদ্ধে গঠিত হয় চতুর্থ রাষ্ট্রজোট (Fourth Coalition)। এতে যোগদান করে ইংল্যাণ্ড, প্রাশিয়া, রাশিয়া, পরে যোগ দেয় সুইডেন এবং অস্ট্রিয়া। এই জোট নেপোলিয়ানের পতন না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

1813 খ্রিঃ থেকেই শুরু হয়ে যায় জার্মানিতে গণ অভ্যুত্থান। এর আগে 1812 খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসেই প্রাশিয়ার সঙ্গে রাশিয়ার চুক্তি হয়। 1813-র জানুয়ারিতে জার আলেকজাণ্ডার ইয়োরোপীয় জনগণের মুক্তির কথা ঘোষণা করেছিলেন। প্রাশিয়ার রাজা ফ্রেডারিক তৃতীয় উইলিয়াম এব্যাপারে হাত মেলান। ফরাসি অধীনতা থেকে প্রাশিয়ার মুক্ত হওয়ার আন্দোলন অন্যান্য জার্মান রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে। 1813-র মার্চ মাসে ফ্রেডারিক ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং তার আগের মাসেই ফ্রান্সের বিপক্ষে রাশিয়া, প্রাশিয়া ক্যালিশের চুক্তি করে। প্রাশিয়া, রাশিয়া এবং সুইডেনের মিলিত সৈন্যের কাছে ফরাসি বাহিনী পর্যুদস্ত হয়ে বার্লিন, হামবুর্গ প্রমুখ ত্যাগ ক'রে পশ্চাদপসরণ করে। কনফেডারেশন অফ দ্য রাইন বা জার্মান রাষ্ট্র সংঘ, যা নেপোলিয়ান গঠন করেছিলেন তা ভেঙে যায়। বস্তুত প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানির সর্বস্তরের মানুষ মুক্তি সংগ্রামে যোগ দেয়।

আবার সেই সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের উদ্যোগে গঠিত হয় চতুর্থ রাষ্ট্রজোট বা ফোর্থ কোয়ালিশন যার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ছিল ইংল্যাণ্ড, প্রাশিয়া, রাশিয়া এবং সুইডেন। নেপোলিয়ান যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন; তখনও পর্যন্ত অস্ট্রিয়া ছিল নিরপেক্ষ। নেপোলিয়ান পোপের সঙ্গে বিবাদ মিটিয়ে ফেলেন। স্বদেশবাসীদের উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেন। মিত্রপক্ষ [ফোর্থ কোয়ালিশন] ফ্রান্স আক্রমণের পরিকল্পনা করে। তাদের সেনা নায়ক ছিলেন উইটগেনস্টাইন, ইয়র্ক, বুলো, ব্লশ্যার প্রমুখ। 1813-র এপ্রিল মাসে নেপোলিয়ান ফরাসি বাহিনীর অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন। ড্রেসডেনের যুদ্ধে মিত্রপক্ষের পরাজয় হলেও 1813 খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে ফরাসি সৈন্যদের চাপে নেপোলিয়ান প্লাসজিৎস-এ যুদ্ধবিরতি করতে বাধ্যহন। এরপরই মিত্রপক্ষ পুনরায় যুদ্ধ প্রস্তুতি নিয়ে ফেলে। নেপোলিয়ানের অন্যতমা স্ত্রী মারিয়া লুইস ছিলেন অস্ট্রিয়ার সম্রাট প্রথম ফ্রান্সিসের কন্যা। তাই অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলার ও যুবরাজ মেটারনিষ প্রথমে ফ্রান্সের বিপক্ষে যাননি। তাছাড়া তাদের চিরশত্রু রাশিয়া শক্তিশালী হোক অস্ট্রিয়া চাইত না। আবার প্রাশিয়া শক্তিশালী হয়ে জার্মানির নেতৃত্ব গ্রহণ করুক এও তাদের মনঃপুত ছিলনা। কিন্তু শেষপর্যন্ত অস্ট্রিয়াও মিত্রপক্ষে যোগ দিতে বাধ্য হয়। 1813 খ্রিঃ রাইবেনবাখ্-এর সন্ধিতে রাশিয়া, প্রাশিয়া, অস্ট্রিয়া হাত মেলায় এবং ফলে মিত্রশক্তির শক্তি বেড়ে যায়। 1813-র অক্টোবরে লাইপজিগের যুদ্ধে নেপোলিয়ানকে শত্রু পক্ষ ঘিরে ধরে। এমনকি স্যাকসনি ও ব্যাভেরিয়া তাকে পরিত্যাগ করে। পোল্যাণ্ডও মিত্রপক্ষে যোগ দেয়। তুমুল সংগ্রামের পর ফ্রান্সের শোচনীয় পরাজয় ঘটে।

লাইপজিগের যুদ্ধে ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশ নেপোলিয়ানের বিপক্ষে অবতীর্ণ হয়েছিল বলে এই যুদ্ধকে 'জাতিসমূহের যুদ্ধ' (Battle of the Nations)-ও বলে। পেনিনসুলার যুদ্ধে স্পেন-পর্তু গালের কাছে বিপর্যয়, রাশিয়া আক্রমণের ব্যর্থতা এবং পরিশেষে লাইপজিগের যুদ্ধে পরাজয় নেপোলিয়ানের রণকৌশলী প্রতিভা এবং সামরিক শক্তির অবক্ষয় প্রকট করে। ফ্রান্সের বাইরে তার সাম্রাজ্য ভাঙতে আরম্ভ করে। ওয়েস্টফেলিয়া থেকে জেরোম বোনাপার্টকে তাড়ানো হয়। কনফেডারেশন অফ দ্য রাইন ভেঙে যায়। হল্যাণ্ড মুক্ত হয় এবং উইলিয়ম অফ অরেঞ্জ তার রাজা হন, ডেনমার্ক মিত্রপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করে, অস্ট্রিয়া অনেক হৃতরাজ্য ফিরে পায়। এরপর মিত্রপক্ষ নেপোলিয়ানের কাছে ফ্রাঙ্কফোর্টের সন্ধির প্রস্তাব পাঠালে নেপোলিয়ান তা অগ্রাহ্য করেন। এবার মিত্রপক্ষ ফ্রান্স আক্রমণের পরিকল্পনা করে। মিত্রপক্ষের সেনাপতি ব্লুশ্যারকে নেপোলিয়ান হারিয়ে দেন এবং মিত্রপক্ষের মধ্যে অন্তর্বিবাদ দেখা যায়। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের উদ্যোগে শোঁম-এর সন্ধিতে ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রিয়া-রাশিয়া-প্রাশিয়ার সদ্ভাব পুনঃস্থাপিত হয়। এবার ইংল্যাণ্ডের সৈন্যও মিত্র পক্ষে যোগ দেয়। মিত্রপক্ষ ফ্রান্স অভিযান করে এবং শেষপর্যন্ত প্যারিস দখল করে (মার্চ, 1814)। এরপর নেপোলিয়ানের রাজনৈতিক জীবনের উপর যবনিকা নেমে আসে।

1814-র 6 এপ্রিল তিনি মিত্রপক্ষের সঙ্গে ফঁতেনব্লু-র সন্ধি করতে বাধ্য হন এবং সিংহাসন ত্যাগ করতেও স্বীকৃত হন। ইতালি ও অস্ট্রিয়ার উপর সব দাবি ছেড়ে দেন। মিত্রপক্ষ তাকে বাৎসরিক পেনশন দিয়ে ফ্রান্স ও ইতালির মাঝখানে ভূমধ্যসাগরের উত্তরে এলবা দ্বীপে নির্বাসনে পাঠান। ফ্রান্সে অষ্টাদশ লুইয়ের নেতৃত্বে বুরবোঁ শাসন ফিরে আসে। দুর্বলচিত্ত অষ্টাদশ লুই ফ্রান্সে ফিরে আসেন 1814 খ্রিস্টাব্দের মে মাসে। ঐ মাসেই মিত্রপক্ষের সঙ্গে ফ্রান্সের প্যারিসের প্রথম সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। এরপর মিত্রপক্ষ ইয়োরোপের পুনর্গঠনের জন্য অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা শহরে এক সম্মেলনে মিলিত হন।

এরপরের ঘটনা আরও নাটকীয়। এলবা দ্বীপে নির্বাসিত নেপোলিয়ান ফ্রান্সের পরিস্থিতির উপর তীক্ষ্ণ নজর রেখেছিলেন। অচিরেই ফ্রান্সে গোলযোগ উপস্থিত হয়। অষ্টাদশ লুই রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তন করলেও প্রজাবর্গকে শাসনতান্ত্রিক সুযোগ সুবিধা দিয়ে এক নতুন সংবিধানের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু রাজতন্ত্রীগণ বিশেষত বিদেশে প্রত্যাগত অভিজাতবর্গ দেশে প্রত্যাবর্তন ক'রে তাদের বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য তুমুল বিতণ্ডা সৃষ্টি ক'রে। এছাড়া আর্থিক সংকটের জন্য জনগণের বিক্ষোভ বাড়ে। এই ডামাডোলে এলবাদ্বীপ থেকে কিছু অনুচর সহ নেপোলিয়ান ব্রিটিশ নৌবহরের দৃষ্টি এড়িয়ে দক্ষিণ ফ্রান্সের কান (Cannes) শহরে এসে নামেন। 1815 খ্রিস্টাব্দের 20 মার্চ তিনি প্যারিসে পৌঁছে নিজেকে সম্রাট ঘোষণা করেন। রাজা অষ্টাদশ লুই ইংল্যাণ্ডে পালিয়ে যান। নেপোলিয়ানের সাফল্যের কারণ ছিল— সেনাবাহিনীর অফিসার এবং জনগণ। বিশেষত কৃষকদের সমর্থন। তাঁর এই রাজত্ব ছিল 'একশত দিবসের' (Reign of Hundred Days)।

ফ্রান্সে নেপোলিয়ানের ফিরে আসা এবং পুনরায় ক্ষমতা গ্রহণের সংবাদে মিত্রপক্ষ দ্রুত ফ্রান্স আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়। ব্রিটেন, রাশিয়া, প্রাশিয়া এবং অস্ট্রিয়া নেপোলিয়ানের বিপক্ষে অবতীর্ণ হয়। নেপোলিয়ানও এক বিরাট সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন। ফ্রান্সে সেনানায়কগণ যুদ্ধের জন্য আগ্রহী থাকলেও ফরাসি জনগণ যুদ্ধের ঘোর বিরোধী ছিল। মিত্রপক্ষ তিন দিক থেকে আক্রমণ করে। ডিউক অফ ওয়েলিংটনের নেতৃত্বে ইংরেজ বাহিনী উত্তরদিকে বেলজিয়ামের মধ্যে দিয়ে। ব্লুশ্যার এর নেতৃত্বে প্রাশিয়ান বাহিনীও আসে উত্তর থেকে। পূর্ব থেকে এলো রুশ বাহিনী। শোয়ারৎজেনবার্গ-এর নেতৃত্বে অস্ট্রিয় বাহিনী এল পশ্চিমদিক থেকে। নেপোলিয়ান দু-একটি যুদ্ধে জিতলেও 1815 খ্রিস্টাব্দের 18 জুন *ওয়াটারলুর যুদ্ধে* ফরাসি বাহিনীর চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে। ওয়াটারলুর যুদ্ধই নেপোলিয়ান বোনাপার্টের শেষ যুদ্ধ। পালাতেও তিনি পারেন নি।এরপর তাঁকে অ্যাটলাণ্টিক মহাসাগরের সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত করা হয় এবং সেখানেই 1821 -এর 5 মে নেপোলিয়ানের মৃত্যু ঘটে।

৬। নেপোলিয়ান ও বিপ্লব

ফরাসি বিপ্লব ফ্রান্সে পুরাতন ব্যবস্থা এবং পুরাতন যুগের অবসান ঘটায়। ক্রমে অবসান হয় রাজতন্ত্রের এবং প্রতিষ্ঠিত হয় প্রথম প্রজাতন্ত্র। এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পথ ধরেই পরবর্তীকালে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন নেপোলিয়ান বোনাপার্ট। তিনি নিজেকে 'বিপ্লবের সন্তান' (Child of the Revolution) বলতেন। প্রথম কনসাল হিসেবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে ক্রমে তিনি আজীবনের জন্য কনসাল এবং পরিশেষে সম্রাট হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করেন। জনগণও তা মেনে নেয়। ফলে নেপোলিয়ানের হাতেই আবার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহলে কি তিনি বিপ্লব-বিরোধী? এই প্রশ্নের উত্তর আলোচনা করা দরকার।

একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, বিপ্লবই নেপোলিয়ানের উত্থানের পটভূমি রচনা করেছিল। তিনি যখন ক্ষমতায় আসেন তখনও প্রজাতান্ত্রিক সরকারই ছিল। এমনকি সম্রাট হওয়ার পরেও পুরোনো অবস্থা আর ফিরে আসেনি। সামন্ততন্ত্রের বিলুপ্তির শেষ কাজ নেপোলিয়ানই করেছিলেন। অভিজাত শ্রেণীর বিশেষ সুবিধাভোগেরও তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। সুতরাং বিপ্লবের সন্তান বলে নেপোলিয়ান অন্যায় করেন নি। আর সম্রাট হলেও ফরাসি অভিজাত পরিবারে কিংবা রাজবংশে তাঁর জন্ম নয়। বিপ্লবী পরিস্থিতি না থাকলে কর্সিকা-জাত এক উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারে সন্তান থেকে সেনানায়ক হওয়া নেপোলিয়ানের পক্ষে সম্রাট কেন, প্রধান শাসক হওয়া আদৌ সম্ভব হত না। তবে এই কাজে তাঁর সামরিক সাফল্য, বীরত্ব, যুদ্ধ বিজয়ের মহিমা এবং দেশের বেসামরিক প্রশাসকদের ব্যর্থতা সহায়ক হয়েছিল। যদি বিপ্লবের ঢেউতে পুরাতনতন্ত্র ভেঙে না যেত তাহলে এই উত্থান ছিল অসম্ভব। নেপোলিয়ানের মন্তব্য এই প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক, 'আমি ফ্রান্সের রাজমুকুট মাটিতে পড়ে থাকতে দেখি এবং নিজের তরবারি দ্বারা তা তুলে মাথায় পড়ে নিই।' সুতরাং নেপোলিয়ানের স্বৈরাচারী পদ গ্রহণ ও ইয়োরোপে ফরাসি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা আপাত দৃষ্টিতে বিপ্লবের মূল গণতান্ত্রিক আদর্শের পরিপন্থী মনে হলেও তা পুরোপুরি সত্য নয়।

বস্তুত বিপ্লব সম্পর্কে নেপোলিয়ানের দৃষ্টিভঙ্গি কি রকম ছিল তা বিশ্লেষণ করা দরকার।

নেপোলিয়ানের পতনের পর তাকে সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত করা হয়েছিল। আত্মজীবনী মূলক রচনায় নেপোলিয়ান দুটি উক্তি করেছিলেন, যা পরস্পর বিরোধী মনে হতে পারে। এক জায়গায় তিনি লেখেন 'I am the Revolution' অর্থাৎ আমিই বিপ্লব ; আবার অন্যত্র তিনি লিখেছেন, "I destroyed the Revolution" অর্থাৎ আমিই বিপ্লবকে ধ্বংস করেছি। বস্তুত দুটি কথার মধ্যেই সত্যতা আছে। ফরাসি বিপ্লবের মূল বাণী বা আদর্শ ছিল 'সাম্য'-'মৈত্রী'-'স্বাধীনতা'। এই তিনটির মধ্যে নেপোলিয়ান

সাম্যকে মানতেন। স্বাধীনতাকে জানতেন না। সে-বিষয়ে বিস্তারিত বলার আগে ফরাসি বিপ্লবের মূল আদর্শগুলি একটু স্মরণ করা প্রয়োজন।

প্রথমতঃ, বিপ্লব স্বৈরতন্ত্রকে ধ্বংস করেছিল। দ্বিতীয়তঃ, নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের মধ্যে যে স্বৈরতন্ত্র ছিল, তার প্রতি তীব্র আঘাত হানা বিপ্লবের মূল আদর্শ ছিল। এখানে স্বভাবতই স্বাধীনতা বা Liberty-র প্রশ্ন উদ্ভাসিত হয়। অর্থাৎ জনসাধারণ শৃঙ্খলামুক্ত হয়ে নিজেদের স্বাধীন মতপ্রকাশের ভিত্তিতে প্রজাতান্ত্রিক সরকার গঠন করে। তৃতীয়তঃ, স্বৈরতন্ত্রকে যোগ করার ফলে ক্ষমতার যে বিকেন্দ্রীকরণ হয় তার ফলে প্রাদেশিক সভা, পৌরসভা ও কমিউনগুলির ক্ষমতা বাড়ে। চতুর্থতঃ, সর্বনিম্ন মজুরির দাম বেঁধে দেওয়া এবং সর্বোচ্চ মূল্য বেঁধে দেওয়া জনসাধারণের সুবিধা হয়। পঞ্চমতঃ, সুবিধাভোগী এবং সুবিধাহীন এই পার্থক্য দূর ক'রে তিন এস্টেটের পার্থক্য ঘুচিয়ে, অভিজাত সম্প্রদায়ের বিশেষ সুবিধার (Privilege) বিলোপ সাধন ক'রে বিপ্লব ফ্রান্সে সামন্ততন্ত্রের কবর রচনা করে। ষষ্ঠতঃ, গির্জা বা চার্চের বিশেষ অধিকারও বিলুপ্ত হয়। চার্চের সম্পত্তির জাতীয়করণ হয়। সপ্তমতঃ, সামন্ততান্ত্রিক পুরাতনব্যবস্থার অবসানের মধ্যেই উদীত হয় সাম্য বা Equality-র প্রশ্ন।

এখন বিচার করা যেতে পারে যে, এই প্রশ্নগুলির ব্যাপারে নেপোলিয়ান কী মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন। জনগণকে স্বাধীনতা বা গণতান্ত্রিক অধিকার দেওয়ার ব্যাপারে নেপোলিয়ানের সমর্থন ছিল না। তিনি দৈবসত্ত্বে বিশ্বাসী না হলেও স্বৈরতন্ত্রের প্রতি তাঁর ঝোঁক লক্ষ্যণীয়, কেননা সমস্ত ক্ষমতা তিনি নিজের হাতে কুক্ষিগত করতে চেয়েছিলেন।[1] কনসুলেট নামে যে সংবিধান গৃহীত হয়েছিল তাতে সর্বসাধারণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত আইনসভার কোনও স্থান ছিল না। বস্তুত নির্বাচনের চেয়ে মনোনয়নেই তার পক্ষপাত ছিল। সুতরাং কনসুলেটের আমলে যদিও প্রজাতন্ত্রই ছিল, তবে তা নামমাত্র। বস্তুত ফরাসি বিপ্লবের স্বাধীনতার আদর্শ তখনই ধ্বংস করা হলো। প্রাদেশিক সভাগুলির ক্ষমতা লোপ করা কিংবা প্রথম কনসাল থেকে যাবজ্জীবন রূপান্তরিত করার মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতার আদর্শচ্যুতি আরও বাড়ে এবং তা পরিণতি লাভ করে সম্রাট পদ গ্রহণের মধ্যে। মনোনয়নের দ্বারা অবশ্য এক দক্ষ আমলাতন্ত্র তিনি গড়ে তুলেছিলেন। ওলার (Aulurd) -এর মতে নেপোলিয়ানের এই ক্ষমতার আত্মসাৎ ফরাসি বিপ্লবের সমাধি রচনা করে। এইচ. জি. ওয়েলস্-ও এজন্য নেপোলিয়ানের সমালোচনা করেছেন।

নেপোলিয়ান মনে করতেন জনগণের অতিরিক্ত স্বাধীনতাই সকল প্রকার গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলার মূল। তিনি সংবাদপত্রের স্বাধীনতার খর্ব করেন। প্রিফেক্ট এবং সাব

1. "Politically his bent was towards despotism untrammelled by divine right. His experiences of the Revolution had left him with a deep contempt, not unmixed with fear, for the people– A Cobban, *পূর্বোক্ত গ্রন্থ, দ্বিতীয় খণ্ড,* পৃ 18

প্রিফেক্ট নিয়োগ অনেকটা বিপ্লবের আগেকার ইনটেনডেন্ট নামক রাজকর্মচারী নিয়োগের মতোই ব্যাপার। বস্তুত তিনি বুর্জোয়া শ্রেণীরই উপর বেশি নির্ভরশীল ছিলেন। কিন্তু আবার বহু ব্যাপারে তিনি বিপ্লবের ভাবাদর্শকেই এগিয়ে নিয়ে গেছেন। ফিলিপ গেডেলার মতে 'The Empire was not an interruption, but an extension of the Revolution"। অর্থাৎ প্রজাতন্ত্র থেকে রাজতন্ত্রে রূপান্তর ঘটলেও তা আসলে বিপ্লবেরই বিস্তৃতি, ছেদ নয়।

নেপোলিয়ান ফরাসি বিপ্লবের সাম্যের আদর্শ মেনে নিয়েছিলেন। তিনি বলতেন, 'ফরাসি জাতি স্বাধীনতা বা গণতন্ত্র চায় না, তারা চায় সাম্য।' তাঁর আমলের বিভিন্ন আইন দ্বারা তিনি সাম্য নীতিকে স্থায়িত্ব দেন। বস্তুত স্বৈরতন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতা কুক্ষিগত করলেও নেপোলিয়ান পুরোনো ব্যবস্থা, বিশেষ সুবিধা বা সামন্ততন্ত্রকে ফিরিয়ে আনতে স্বীকৃতি চাননি। বিপ্লবের মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দেওয়া, আইনের চোখে সকল নাগরিককে সমান মর্যাদা দেওয়া, চাকরির সুযোগ যোগ্যতা ও মেধার ভিত্তিতে দেওয়া, ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ মেনে চলা ইত্যাদির মাধ্যমে তাঁর কীর্তি বিপ্লবের সন্তান হিসেবেই করেছিলেন। তাছাড়া তাঁর হাত ধরেই ফরাসি বিপ্লবের আদর্শ ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। মধ্যযুগীয় সামাজিকব্যবস্থা, রাজনৈতিক অনৈক্য, অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার ব্যাপারে ফ্রান্সের বাইরে বহু দেশে নেপোলিয়ান অনুঘটকের কাজ করেছেন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যেতে পারে, নেপোলিয়ানের সঙ্গে বিপ্লবের সম্পর্ক জটিল। বস্তুত তাঁর মধ্যে এক স্ববিরোধিতা ছিল। একদিক থেকে দেখলে তিনি বিপ্লব-বিরোধী আবার অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে তিনি বিপ্লবের আদর্শের ধ্বজাধারী। কনসুলেট শাসনে যে আস্থার সঙ্গে শৃঙ্খলার সমন্বয় করা হয়েছিল (Confidence from below and authority from above) তাই যেন নেপোলিয়ানের মানসলোকের প্রতীক। বিপ্লবের আশাবাদ শেষপর্যন্ত হতাশায় পরিণত হয়ে নেপোলিয়ানের পদতলে পড়েছিল। জনগণ নেপোলিয়ানের পিছনে ছিল। দুবার গণভোটে বিপুল জয়লাভ বিপ্লব-বিরোধী হলে সম্ভব হত না। বিপ্লবের মূল পরিবর্তনগুলি রক্ষা করে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে গিয়ে নেপোলিয়ান প্রজাতন্ত্রকে বিসর্জন দেন। এই অন্তর্নিহিত দুর্বলতাই তার সাম্রাজ্যের ভিতর লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য। জনগণকে পাশে নিয়ে বিপ্লবের সন্তান নেপোলিয়ান প্রয়োজনে স্বৈরতন্ত্র গ্রহণ করেছেন।[1]

৭। নেপোলিয়ানের পতনের কারণ

ইতিহাসে উত্থান ও পতন হলো জন্ম আর মৃত্যুর মত একটা অপরিহার্য ঘটনা। উত্থানের মধ্যেই নিহিত থাকে পতনের বীজ। সমরনায়ক ও কূটনীতিজ্ঞ নেপোলিয়ানের

1. ডেভিড টমসনের মতে, "A Child of the Revolution, he combined the substance of old absolutism with the new sanction of popular approval". পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ 60

উত্থানের মূলে ছিল তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা, সামরিক প্রতিভা, আত্মবিশ্বাস এবং সার্বিক কর্মদক্ষতা। কিন্তু এসবেরও একটা সীমা পরিসীমা আছে। ক্ষণস্থায়ী মানুষের পরিমিত ক্ষমতার মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আত্মবিশ্বাস ইত্যাদির সীমা বাঞ্ছনীয় প্রকোষ্ঠে সীমিত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু নেপোলিয়ানের ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত হলো অহমিকা, বিচার-বুদ্ধির অভাব ও বাস্তব-বোধ হীনতা ইত্যাদি। তাই লাইপজিগের যুদ্ধে পরাজিত নেপোলিয়ান মিত্রশক্তির দেওয়া সন্ধির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তবে জীবনের শেষ প্রান্তে তিনি স্বীকার করেছিলেন যে, 'পশু শক্তি কখনই কোনও জিনিষের স্থায়িত্ব আনতে পারে না'।

অথচ এই নেপোলিয়ান বলতেন যে, 'অসম্ভব কথাটি শুধু মাত্র নির্বোধদের অভিধানেই থাকে।' এটি-তাঁর অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস। *ডেভিড টমসন* লিখেছেন নেপোলিয়ানের একনায়কতন্ত্রের অনেক গুণ ছিল, কিন্তু ফ্রান্স একটি পুলিশী রাষ্ট্রে পরিণত হয়।[1] অন্তর্নিহিত দুর্বলতা তাঁর সাম্রাজ্যের মধ্যেই ছিল এবং এজন্যই তার সাম্রাজ্য ধ্বংস হয় বলেও ডেভিড টমসন অভিমত প্রকাশ করেছেন।

জ্যাকোবিন দলের পৃষ্ঠপোষক নেপোলিয়ান বিপ্লবের পথ ধরেই ফ্রান্সের রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন। তিনি নিজেই বলতেন 'আমি বিপ্লবের প্রতীক' (I am the Revolution)। *ফিশারের* মতে, নেপোলিয়ান ছিলেন 'বিপ্লবের সন্তান' কিন্তু *ওলার* এর মতে আদৌ তা নয়। শেষ পর্যন্ত তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আত্মবিশ্বাস এবং ক্ষমতার লিপ্সা তাঁকে স্বৈরাচারী শাসকে রূপান্তরিত করল। ঐতিহাসিক *রাইকারের* মতে "স্বৈরতন্ত্রের রথের চাকায় নেপোলিয়ান বিপ্লবের ঘোড়া জুড়ে দিলেন।" একে একে বহু জাতীয় রাষ্ট্রকে নেপোলিয়ান ফ্রান্সের নিয়ন্ত্রণাধীন করলেন। সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হলো কিন্তু সেসব রাষ্ট্রের প্রজা-পুঞ্জের স্বাভাবিক আনুগত্য তিনি লাভ করতে পারেননি।

মনে রাখা দরকার, ফ্রান্সের বাইরে বিপ্লবী নীতি ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রথম কৃতিত্ব ছিল বিপ্লবী বাহিনীর এবং সেই প্রক্রিয়াকে আরও সম্পূর্ণ করেন নেপোলিয়ান। আবার খণ্ড বিক্ষিপ্ত রাজ্যগুলিকে বিশেষত একই ভাষাভাষী রাজ্যগুলিকে এক শাসনাধীনে এনে তিনি জাতীয়তাবোধ বিকাশে এক অনুঘটকের কাজ করেছিলেন। যেমন ইতালি ও জার্মানিতে। কিন্তু *মারখাম* দেখিয়েছেন যে 1810-এর পরে তার কার্যকলাপ ছিল জাতীয়তাবিরোধী। ফরাসি সম্রাট হিসেবে নিজ স্বার্থ দেখাই এই পরিবর্তনের জন্য দায়ী। পিয়েতর হাইল (Pieter Geyl) লিখেছেন যে, নেপোলিয়ান বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্ক্ষা বুঝতে পারেন নি।

---

1. ডেভিড টমসন লিখেছেন, "The dictatorship of Napoleon in France was a utilitarian, efficient, industrious, hard-headed government" কিন্তু তিনিই অন্যত্র লিখেছেন, "France relapsed more and more into a police state under an autocracy often heavy-handed." পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ 61

নেপোলিয়ানের পতনের কারণগুলি সহজেই লক্ষ্য করা যায়।

প্রথমতঃ, নেপোলিয়ানের অপরিমিত উচ্চাশার মধ্যেই তাঁর পতনের বীজ ছিল। অতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁর বাস্তবতাবোধ এবং কূটনৈতিক বুদ্ধি বিনাশ করেছিল। তাঁর অপরিমিত উচ্চাশার জন্যই সমগ্র ইয়োরোপকে পদানত করতে চেয়েছিলেন। অন্য দেশ দখল করে সেখানে নিজের লোকেদের শাসক হিসেবে বসিয়েছিলেন। স্পেনে এই ধরনের কাজ করতে গিয়েই বিপদ ডেকে এনেছিলেন। নেপোলিয়ানের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, অন্য দেশের সঙ্গে আলোচনা করে যুদ্ধের অবসান ঘটানো তার চরিত্রের বিপরীত ছিল। তিনি ভাবতেন এতে তার সাম্রাজ্য ভেঙে পড়বে। লাইপজিগের যুদ্ধের পর মিত্রপক্ষের শান্তি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা তার অপরিমিত আত্মবিশ্বাসের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এর আগে রুশ অভিযানের মধ্যেও এই ধরনের অপরিমিত উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন লক্ষ্যণীয়। মোট কথা, গভীর আত্মপ্রত্যয় ও অহমিকাই তাকে ভ্রান্তপথে চালিত করেছিল।

দ্বিতীয়তঃ, তার সাম্রাজ্যের ভিত্তি ছিল দুর্বল। অর্থাৎ সামরিক শক্তির জোরে তিনি ক্ষমতাধীন হন; তিনি পরে গণভোটের মাধ্যমে জনগণের রায় পেয়েছিলেন বটে কিন্তু তাঁর প্রতি আপামর ফরাসি জনগণের আনুগত্যের অভাব ছিল। ক্রমে ক্রমে তাঁর শাসন স্বৈরতন্ত্রে পরিণত হয়। যতই তিনি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন ততই ব্যক্তি স্বাধীনতা লোপ পেতে থাকে। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্যের ভিত্তি ছিল সামরিক শক্তি। তার সামরিক শক্তির জোরে ইয়োরোপীয় জাতিগুলি তার অধীনে এসেছিল সত্য। তবে সব জায়গায় জনগণের স্বাভাবিক আনুগত্য তিনি লাভ করতে পারেন নি। রাশিয়ার অভিজাতগণ নেপোলিয়ানকে ভুঁইফোড় বলে মনে করতেন। মনে রাখা দরকার, নেপোলিয়ান রাজার পুত্র ছিলেন না। যে সামরিক শক্তি ছিল তার ক্ষমতার উৎস তাতে দুর্বলতা দেখা দিতেই আনুগত্যহীন সাম্রাজ্য ভেঙে যেতে থাকে।

তৃতীয়তঃ, নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্য বিশাল আকার ধারণ করেছিল যা রক্ষা করা সহজ ছিল না। ফ্রান্স এবং ফ্রান্সের বইরে এই সাম্রাজ্যকে স্থায়ী করবার মতন সংগঠন তাঁর ছিল না। তাঁর প্রতিভা ও একনায়কতন্ত্রের সীমাবদ্ধতা টিলসিটের সন্ধির পর থেকেই ধরা পড়তে শুরু করে। নেপোলিয়ানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সন্ধি করে, আবার তা ভঙ্গ করতে আমরা দেখি। ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে আমিয়াঁর সন্ধি, অস্ট্রিয়ার সঙ্গে লুনেভিল-এর সন্ধি, রাশিয়ার সঙ্গে টিলসিটের সন্ধি সবই তিনি ভেঙেছিলেন। নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্যের সংগঠনের মধ্যেই ছিল অন্তর্নিহিত দুর্বলতা। বেলজিয়াম, স্যাভয়, নিস, ডালমেশিয়া প্রভৃতি সরাসরি ফ্রান্সের অধীনে আসা, হল্যাণ্ডে নিজের ভাই লুইকে বসানো, জার্মানির একাংশকে কনফেডারেশন অফ দ্য রাইনের মধ্যে আনা, অপর অংশে ওয়েস্টফেলিয়া রাজ্য গঠন করে ভাই জেরোমকে বসানো, গ্র্যাণ্ড ডাচি অফ ওয়ার্স

গঠন করে ফ্রান্সের বশংবদ স্যাক্সনির রাজবংশকে স্থাপন করা; নিজে ইতালির রাজমুকুট গ্রহণ, স্পেনের সিংহাসনে ভাই যোসেফকে বসানো ইত্যাদি কাজের মধ্যে যে বিশাল সাম্রাজ্যের রূপ দেখি তা স্থায়ী ছিল না, হওয়া সম্ভবও ছিল না। তাঁর নিজস্ব সামরিক প্রতিভা এবং অপরাজেয় সৈন্যদলেরও ক্ষয় ছিল অনিবার্য।

চতুর্থতঃ, নেপোলিয়ানের অপরাজেয় সৈন্যবাহিনী একদা গড়ে উঠেছিল দেশপ্রেমিক ফরাসিদের নিয়ে যারা পিতৃভূমি ও বিপ্লবের জন্য যে-কোনও রকম ত্যাগ স্বীকারে সদা প্রস্তুত ছিল। কিন্তু পরে সাম্রাজ্য বিস্তৃত হলে পোল, ডেন, জার্মান, ইতালিয়, ডাচ প্রমুখ অনেক জাতির লোক স্বার্থের কারণে এবং অর্থের প্রয়োজনে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেয়। তাদের প্রেরণা, আদর্শ ও আনুগত্যের অভাব ছিল। নেপোলিয়ানের বিশেষ খ্যাতি ছিল রণকৌশলের ক্ষেত্রে। প্রথম কনসাল হিসেবে তার স্বাক্ষর আছে। অথচ শেষের দিকে তারই ঘাটতি দেখা গিয়েছিল। রাশিয়ার ক্ষেত্রে 'পোড়ামাটি নীতি' বা তার আগেই নৌযুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের কৌশলের কাছে তিনি পরাস্ত হন।

পঞ্চমতঃ, নেপোলিয়ান জাতীয়তাবাদের কথা প্রচার করলেও তাঁর সাম্রাজ্য ও শাসন জাতীয়তাবাদ বিরোধী ছিল। বস্তুত এ ছিল একধরনের স্ব-বিরোধিতা। তিনি ইয়োরোপের স্বৈরাচারী রাজাদের পরাজিত করেন, তখন জাতীয়তাবাদের স্ফূরণ ঘটে। তিনি যখন জার্মানি ও ইতালিতে ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করেন তখন জাতীয় চেতনার প্রসার ঘটে। এই জাতীয়তাবাদী শক্তি তার দ্বারাই সাহায্য পেয়েছিল আবার বিভিন্ন দেশে জাতিগুলির আশা আকাঙ্ক্ষাকে পদ দলিত ক'রে তাঁর অনুগতদের সিংহাসনে বসানোর ফলে জাতীয়তাবাদীরা তার শত্রু হয়।

ষষ্ঠতঃ, রণকৌশলে একদা নেপোলিয়ান অনেক নতুনত্ব ও উদ্ভাবনী কৌশল দেখান। কিন্তু ক্রমে আর্থার ওয়েলেসলি (ডিউক অফ ওয়েলিংটন), ব্লুস্যার, নেলসন প্রমুখ সুযোগ্য নেতা তার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। বিশেষত ইংল্যাণ্ডের অপরাজেয় নৌশক্তি ছিল নেপোলিয়ানের পরাজয়ের অন্যতম কারণ। কোনও নৌযুদ্ধেই ইংল্যাণ্ডকে হারানো তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। নীলনদের যুদ্ধে পরাজয় তার মিশর জয়ের স্বপ্ন যেমন ধুলিসাৎ করে, তেমনি ট্রাফালগারের যুদ্ধে পরাজয় ইংল্যাণ্ড-জয়ের স্বপ্ন ভেঙে দেয়।

সপ্তমতঃ, নেপোলিয়ানের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ 'মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা' বা কন্টিনেন্টাল সিস্টেমের ব্যর্থতা। ইংল্যাণ্ডকে তিনি 'দোকানদারের জাত' (Nation of Shop Keepers) বলতেন; অথচ সেই ইংল্যাণ্ডকে অর্থনৈতিকভাবে জব্দ করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। কারণ ইংল্যাণ্ডের উপনিবেশ ও নৌশক্তি ছিল শক্তির উৎস। বরং এই ভ্রান্ত নীতির ফলে ইয়োরোপীয় মহাদেশের অনেক রাষ্ট্রই তাঁর বিরোধী হয়ে ওঠে।

অষ্টমতঃ, স্পেনের জনগণ এই মহাদেশীয় অবরোধ মানতে অস্বীকৃত হয় এবং তাদের জনগণের উপর নেপোলিয়ান বলপূর্বক ফরাসি শাসন চাপিয়ে দেওয়ার ফলেই

যে বিক্ষোভের সূত্রপাত, তার থেকেই শুরু হয় 'পেনিনসুলার ওয়ার' বা উপদেশীয় যুদ্ধ। ছয় বছর ব্যাপী। ঐ যুদ্ধ (1808-14 খ্রিঃ) নেপোলিয়ানের যে সার্বিক ক্ষতি হয় তার কথা স্মরণ রেখেই তিনি বলেছিলেন যে, 'স্পেনীয় ক্ষত' তাঁর ধ্বংস ডেকে এনেছিল।

নবমতঃ, পোপ সপ্তম পায়াস নেপোলিয়ানের মহাদেশীয় অবরোধ মেনে নেননি, তাঁর চার্চের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের নীতিরও তিনি বিরোধিতা করেছিলেন। ফলে নেপোলিয়ান তাঁকে বন্দী করেন এবং তাঁর রাজ্য দখল করেন (1809)। ফ্রান্স সহ সমগ্র ক্যাথলিক জগতে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

দশমতঃ, 1812 খ্রিস্টাব্দে নেপোলিয়ানের রাশিয়া আক্রমণ ও এর ব্যর্থতা তার পতনকে তরান্বিত করেছিল। অমন দুর্ধর্ষ গ্র্যাণ্ড আর্মি তীব্র শীতের মধ্যে প্রকোপে, আল্পস্ পার হয়ে অসময়ে মস্কো অভিযানে গিয়ে কিছুই লাভ করে নি, বরং প্রভূত ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

নেপোলিয়ানের পতনের শেষ অথচ অন্যতম প্রধান কারণ রাশিয়া, প্রাশিয়া, ইংল্যাণ্ড এবং অস্ট্রিয়ার মিলিতভাবে রাষ্ট্রজোট গঠন করা। চতুর্থ রাষ্ট্রজোট প্রতিজ্ঞা করে যে, নেপোলিয়ানের পতন না হওয়া পর্যন্ত তারা মুক্তি সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। অপরপক্ষে বলা যায় ফ্রান্সের জনগণও শান্তির জন্য উদ্‌গ্রিব ছিল। এমনকি এলবা থেকে ফিরে এলে শতদিবসের রাজত্বেও দেখা যায় সৈন্য ও সাধারণ কৃষকপ্রজারা তাকে স্বাগত জানিয়েছেন ঠিকই কিন্তু দীর্ঘকাল যুদ্ধ করাতে ফরাসি জনগণ শান্তি চেয়েছিল। অষ্টাদশ লুইয়ের দুর্বলতা এবং রাজতন্ত্রীদের অত্যাচারই পুনরায় নেপোলিয়ানকে স্বাগত জানাবার কারণ। তবে বিশাল রাজ্যের সংকট এবং অন্তর্নিহিত দুর্বলতা থেকেই গেল এবং অচিরেই নেপোলিয়ানের পতন হলো ওয়াটারলুর যুদ্ধে (জুন, 1815)। ডেভিড টমসনের ভাষায়, 'নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্যের আত্ম-বিনাশী, স্ব-বিরোধিতা এবং অন্তর্নিহিত দুর্বলতার জন্যই এই সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।"

দ্বিতীয় পর্ব

ইয়োরোপের রাজনৈতিক ইতিহাস (১৮১৫-১৮৭০ খ্রিঃ)

(Political Developments In Europe From 1815-1870)

অধ্যায় ৪

ফরাসি বিপ্লবোত্তর ইয়োরোপে রক্ষণশীল পর্ব

(Syllabus: ***Triumph of Conservatism–The Metternich System)***

১। ফরাসি বিপ্লব ও নেপোলিয়ানের পতনের পর রক্ষণশীলতা

1815 খ্রিস্টাব্দের ইয়োরোপের দিকে তাকালে আমরা কি চিত্র দেখতে পাই— ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ান বোনাপার্ট পরাজিত এবং ক্ষমতাচ্যুত হয়ে নির্বাসিত; নেপোলিয়ানের বিপক্ষে যে-সব দেশ প্রধান প্রতিপক্ষ হিসেবে তাঁর পতনের পশ্চাতে সক্রিয় ছিল সেই দেশগুলি ইয়োরোপে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা এবং রাষ্ট্রনৈতিক মানচিত্রের পুনর্গঠনের জন্য অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা শহরে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে রত। অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলার মেটারনিষ একদা ইতালি সম্পর্কে বলেছিলেন যে ইতালি তো কোনও দেশ নয়, 'ভৌগোলিক নাম বিশেষ'। ঐতিহাসিক *ডেভিড টমসন* তেমনি মন্তব্য করেছেন যে ঐ সময় ইয়োরোপ নামে মহাদেশটি পরিচিত হলেও বিভিন্ন দেশের ভিন্নতা ছিল প্রবল। তবে দেশগুলির মধ্যেকার ভিন্নতা অথবা সাদৃশ্য কোনটাকেই বড়ো করে দেখা চলে না।

যাইহোক, উপরে যে মন্তব্য করা হলো, 1815 খ্রিস্টাব্দে ইয়োরোপীয় নেতৃবর্গ রাষ্ট্রনৈতিক মানচিত্রের পুনর্গঠন করতে চেয়েছিলেন, তার প্রয়োজন হয়েছিল কেন? এক কথায় এর উত্তর হলো এই যে, ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ান ইয়োরোপের চিত্রটিই আমূল বদলে দিয়েছিলেন, তা ইতালি-সুইটজারল্যান্ড-অস্ট্রিয়া-জার্মানি-পোল্যান্ড-হল্যাণ্ড-বেলজিয়াম যেদিকেই তাকাই না কেন তা সহজেই বোঝা যায়। এমনকি, স্পেন, পর্তুগাল, রাশিয়া ইত্যাদি দেশের উপরেও ফরাসি সম্রাটের উত্থানের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। বহু দেশের পুরোনো রাজবংশকে উচ্ছেদ, কোনও দেশ দখল করা, কোনও দেশের সীমানা ভেঙে নতুনভাবে গঠন, কোথাও নিজের লোক বসিয়ে দেওয়া ইত্যাদির ফলে ইয়োরোপের মানচিত্র বদলে যায়। তাই নেপোলিয়ান বিরোধী রাষ্ট্রনৈতিক নেতারা নেপোলিয়ান কর্তৃক বিজিত অঞ্চলের পুনর্বন্টন, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিভিন্ন রাষ্ট্রে শাসন ও সীমানার পুনর্গঠন করতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু বাহ্যত এই উদ্দেশ্য থাকলেও আসলে কিন্তু ছিল প্রত্যেকটি বৃহৎ শক্তির নিজ স্বার্থ। তেমনি মুখে বলা হয়েছিল যে ভবিষ্যতে কোনও একটি দেশ যেন বিশেষ ক্ষমতাবান হয়ে না পড়ে তা লক্ষ্য করা হবে। এইজন্য জোর দেওয়া হয়েছিল শক্তিসাম্য (Balance of Power) নীতির উপর। ডেভিড টমসন লিখেছেন, "The Empire of Napoleon had given Europe, for a time, one form of order and unity; that imposed

from above by conquest. In common resistance to this French domination the Governments of Britain and Europe had evolved another form of unity : that of concerted alliance for the single purpose of defeating France. At the treaty of Chaumont, made between the United Kingdom, Austria, Prussia, and Russia in March, 1814, these allies undertook to remain in alliance for twenty years. The immediate purpose of overthrowing Napoleon was in this way widened into the long-term purpose of preventing any similar domination of the Continent by a single power."[1] (অর্থাৎ নেপোলিয়ান ইয়োরোপের রাজ্যগুলি জয় করে এক ধরণের ঐক্য গড়েছিলেন, এর বিপরীতে নানা রাষ্ট্র জোটবদ্ধ হয়েছিল ফ্রান্সকে পরাজিত করার একক উদ্দেশ্য নিয়ে। নেপোলিয়ানের বিপক্ষে চূড়ান্ত অভিযানের আগেই মিত্রশক্তিরা 1814-র মার্চ মাসে শোমঁ-র চুক্তি করেন। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, নেপোলিয়ানকে পরাজিত করবার পরেও নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা বজায় রাখতে তাঁরা অন্তত কুড়ি বছর ঐক্যবদ্ধ থাকবেন। এরপর এই আশু লক্ষ্য পরিবর্তিত হয়ে ব্যাপকভাবে বলা হলো শুধু ফ্রান্স কেন, কোনও রাষ্ট্রই যেন এককভাবে মহাদেশকে পদানত করতে না পারে তা দেখা হবে)।

এই ভাবে, শক্তিসাম্যের কথা মাথায় রেখে প্রথমে নেপোলিয়ানকে হারানো এবং পরে সাধারণভাবে কোনও দেশই যাতে অধিক শক্তিশালী না হয়ে পড়ে তার ব্যবস্থা করা হলো। শোমঁর চুক্তির পরে প্যারিসের প্রথম চুক্তি (মে, 1814), ভিয়েনার চুক্তি (জুন, 1815) এবং প্যারিসের দ্বিতীয় চুক্তি (নভেম্বর,1815) সবই মিত্রশক্তিবর্গের মৈত্রীর সাক্ষ্য বহন করে। কিন্তু উত্তরকালে দেখা গেল শক্তিসাম্য অপেক্ষা আপন-আপন স্বার্থরক্ষায় দেশগুলি তৎপর, তাই বড়ো বড়ো আদর্শ দীর্ঘস্থায়ী হলো না। পরে যথাস্থানে তা আলোচিত হবে। তার আগে একটি বিশেষ জরুরি সূত্র আলোচনা করা দরকার।

নেপোলিয়ানের উত্থানের চাইতেও ইয়োরোপীয় দেশগুলির কাছে ভয়াবহ ব্যাপার ছিল ফরাসি বিপ্লব। কারণ ঐ বিপ্লব শুধু ইয়োরোপ কেন সারা পৃথিবীর মানব সমাজের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে এক দিকচিহ্ন হয়ে দেখা দিয়েছিল। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা (Equality, Fraternity, Liberty)—এই বাণীর মধ্যে ছিল রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে জেহাদ, এই আদর্শ ছিল স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দীপ্ত ঘোষণা উচ্চারণ। পরে নেপোলিয়ান বিপ্লবী আদর্শ থেকে অনেকাংশে বিচ্যুত হলেও, তাঁর হাত ধরেই এই আদর্শ ছড়িয়ে পড়েছিল ইয়োরোপের নানা প্রান্তে। ফরাসি বিপ্লব ছিল জীর্ণ পুরাতনতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রবল আঘাত। উদারনীতি, গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবোধের প্রতীক

1. ডেভিড টমসন, *ইয়োরোপ সিন্স নেপোলিয়ন,* পৃ ৭।

ছিল এই বিপ্লব। ভুললে চলবে না যে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র (Absolute Monarchy) কেন, জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচার (Enlightened Despotism) পর্যন্ত এর দ্বারা কেঁপে ওঠে। ফ্রান্সেই প্রথম রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ হয়ে প্রজাতন্ত্র (Republic) প্রতিষ্ঠিত হয়। দৈবস্বত্বের তত্ত্ব (Divine Right Theory) বা অভিজাতশ্রেণীর বিশেষ অধিকার (Privilege) ভেঙে ফেলে সামন্ততন্ত্রকে বিলুপ্ত করা হয়। এই সব পরিবর্তনে ইয়োরোপের নানা দেশে অভিজাতগণ, রাজতন্ত্রীগণ, রক্ষণশীলগণ শঙ্কিত হন। তাই রাষ্ট্রনায়কগণ রক্ষণশীলতার প্রতি বিশ্বস্ত থেকে পরিবর্তনকে আটকাতে চেয়েছিলেন।

সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী লিখেছেন, "ফরাসী বিপ্লবী যুদ্ধ ও নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্য স্থাপনের ফলে ইয়োরোপের পুরোনো রাষ্ট্রব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। নতুন একটি ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন ছিল।"[1] মেটারনিষের নেতৃত্বে রক্ষণশীলরা তাই করার চেষ্টা করেছিলেন 1815 খ্রিস্টাব্দ থেকে 1848 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে।

তাই বলে 1815 থেকে 1848 পর্যন্ত শুধু রক্ষণশীলতার যুগ ভাবলে ভীষণ ভুল হবে। অধ্যাপক ডেভিড টমসন যথার্থই লিখেছেন যে, "There existed within Europe a further tension between forces of continuity and forces of change." অর্থাৎ একদিকে ছিল পরিবর্তন-বিরোধী ধারাবাহিকতা বা কায়েমী স্বার্থবজায় রাখার শক্তি; একেই রক্ষণশীলতা বা গোঁড়ামির সমার্থক বলা যেতে পারে, এর মধ্যেই ছিল রাজতন্ত্র, চার্চ, ভূস্বামী, অভিজাতবর্গ এবং প্রায় সিকি শতাব্দীর বিপ্লবী অস্থিরতার অবসান ঘটিয়ে তথাকথিত শান্তি আনার প্রচেষ্টা; অপরদিকে ছিল পরিবর্তনকামী শক্তি। এর অন্তর্গত ছিল বিপ্লবী আদর্শ, গণতন্ত্র বা প্রজাতান্ত্রিক চেতনা, সামন্ততন্ত্র বিরোধী নবোত্থিত বুর্জোয়া শ্রেণীর আশা-আকাঙ্খা, প্রজাবর্গের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি, স্বৈরাচারের বদলে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র গঠনের কামনা। শিল্পায়ন, জনসংখ্যাবৃদ্ধি, নাগরিক জীবনযাত্রা এবং জাতীয়তাবাদী ভাবধারাও এই পরিবর্তনপন্থার অন্তর্ভুক্ত। কেটেলবি লিখেছেন, "In the realm of politics, the period from 1815 to 1850 was one of aspirations rather than of achievements।" কথাটি আংশিক সত্য। ঐ যুগ আশা-আকাঙ্খার যুগ ঠিকই কিন্তু আকাঙ্খা দুটি ভিন্ন ধরণের — রক্ষণশীলদের আশা-আকাঙ্খা হলো রাজতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্র টিকিয়ে রাখা, প্রগতিশীলদের আশা হলো উদারনৈতিক শাসন, সুবিধাভোগী শ্রেণীর বদলে সাম্য ও স্বাধীনতা। আর কর্মসাফল্য একেবারে নেই তাও বলা চলে না। একদিকে রক্ষণশীলরা ভিয়েনা সম্মেলন, ইয়োরোপীয় শক্তি সমবায়, মেটারনিষ পদ্ধতি ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে কর্ম চালিয়ে গেছেন। অন্যদিকে পরিবর্তনকামী চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে 1820, 1830, 1848-র নানা বিপ্লবী অভ্যুত্থানে। ধারাবাহিকতা ও পরিবর্তনের প্রবণতার

1. সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী, *ইয়োরোপের ইতিহাস*, পৃ 278

কটুর দিকই ছিল যথাক্রমে প্রতিক্রিয়াশীলতা ও বিপ্লবীয়ানা। এই ঘাত-প্রতিঘাতই উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ইয়োরোপের ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা রক্ষণশীল উপাদানসমূহ, তার কার্যকলাপ এবং সাফল্য-ব্যর্থতার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখব।

২। ভিয়েনা সম্মেলন

পটভূমিকা ঃ ভিয়েনা সম্মেলনকে প্রকৃত বিচারে প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন বলা যেতে পারে।[1] এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য, আদর্শ, কার্যাবলী এবং কাজের সমালোচনা আমাদের জরুরি জ্ঞাতব্য। তবে তার আগে সম্মেলনের পটভূমিকা একটু জেনে নেওয়া দরকার।

নেপোলিয়ানের বিপক্ষে চূড়ান্ত আঘাত-হানার আগেই 1814 খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে শোমঁর চুক্তি (Treaty of Chaumont) স্বাক্ষর করেছিল ইংল্যান্ড, প্রাশিয়া, রাশিয়া, এবং অস্ট্রিয়া। ঠিক হলো যে নেপোলিয়ানকে পরাজিত করার পরেও অন্তত কুড়ি বছর তারা একসঙ্গে ঐক্যবদ্ধ থাকবে। ইয়োরোপের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলাপ আলোচনা তখন থেকেই শুরু। তাছাড়া নিরন্তর যুদ্ধের পর তখন শান্তিস্থাপন করাও দরকার। মার্চের শেষে নেপোলিয়ান মিত্রশক্তিবর্গের কাছে পরাজিত হলেন এবং পরের মাসে তিনি সিংহাসন ত্যাগ করলেন। ফ্রান্সের সিংহাসন দেওয়া হলো বুরবোঁ বংশীয় অষ্টাদশ লুইকে। নেপোলিয়ানকে এলবা দ্বীপে নির্বাসনে পাঠানো হলো। অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার বাহিনী প্যারিসে উপস্থিত। এই পরিপ্রেক্ষিতে 1814-র মে মাসে প্যারিসের প্রথম সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধিতে কিন্তু ফ্রান্সের উপর তেমন দায়িত্ব চাপানো হয়নি।

এই সন্ধিতে নেপোলিয়ানকে ক্ষমতাচ্যুত করে, তার উত্তরাধিকারীদের সিংহাসন দেবার সম্ভাবনা বাতিল করে দিয়ে পুরোনো বুরবোঁ বংশীয় অষ্টাদশ লুইকে সিংহাসন দেওয়া হলো। মেনে নেওয়া হলো ফ্রান্সের 1792 খ্রিস্টাব্দের সীমানা। ইতালি, জার্মানি বা বেলজিয়ামকে ফ্রান্স তার বিজিত রাজ্যসমূহ ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হলেও কিছু বিজিত অঞ্চল ফ্রান্স নিজেদের দখলে রাখতে সমর্থ হয়েছিল। অন্যদিকে টোবাগো, সান্তা লুসিয়া, অইল দ্য ফ্রঁস গ্রেট ব্রিটেনকে এবং সান দোমিংগোর একটি অংশ স্পেনকে ছেড়ে দিতে হলেও ফ্রান্সকে কোনও আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হয়নি। এর পরই মিত্রশক্তিবর্গ, বিভিন্ন ছোটখাট দেশ ও ফ্রান্স ভিয়েনাতে সমবেত হলো। আরও মনে রাখা দরকার যে, প্যারিসের প্রথম সন্ধিতে ফ্রান্সকে নিরস্ত্রীকরণ করাও হয়নি। ডেভিড টমসন ঠিকই লিখেছেন যে, প্যারিসের প্রথম সন্ধির পর এলবা দ্বীপ থেকে নেপোলিয়ানের পলায়ন, ফ্রান্সে পদার্পণ, শত দিবসের রাজত্ব, মিত্রশক্তির কাছে ওয়াটার্লুর যুদ্ধে পরাজয় এবং নেপোলিয়ানের

1. বিস্তারিত আলোচনার জন্য ডেভিড টমসনের পূর্বোক্ত গ্রন্থ ছাড়াও Harold Nicholson, *Congress of Vienna : A study in Allied Unity;* C.K.Webster, *The Congress of Vienna;* J.Droz, *Europe Between Revolutions* (1815 - 1848); *The New Cambridge Modern History,* Vol IX.

পুনরায় সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসন, পরিস্থিতি বদলে দেয়। ফলে ফ্রান্সের উপর কঠিন শর্ত আরোপিত হয়।

প্যারিসের প্রথম সন্ধি হয়েছিল 1814-র মে মাসে। নেপোলিয়ানের চূড়ান্ত পরাজয় 1815-র জুন মাসে। ঐ মাসেই ভিয়েনা চুক্তি সম্পাদিত হয়। এরপর 1815-র নভেম্বর মাসে প্যারিসের দ্বিতীয় সন্ধি সাক্ষরিত হয়। তাতে ফ্রান্সের সীমানা নির্ধারণ হয়, তার অধীনে 1790 তে যা ছিল তাই থাকে। অর্থাৎ ফ্রান্সকে আরও কিছু জায়গা হারাতে হলো। শুধু তাই নয়, তাকে প্রচুর আর্থিক ক্ষতিপূরণও দিতে হলো। প্যারিসের প্রথম ও দ্বিতীয় সন্ধির মাঝখানে ভিয়েনা সম্মলন। বস্তুত 1814-র নভেম্বর থেকে আলোচনার পর 1815-এ জুন মাসে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

প্রতিনিধি ও নেতৃবর্গ : ভিয়েনা সম্মেলন উপলক্ষে ইয়োরোপের বহু রাজা এবং কূটনীতিবিদ হাজির হয়েছিলেন। অস্ট্রিয়ার সম্রাট প্রথম ফ্রান্সিস তো ছিলেনই, হাজির ছিলেন অস্ট্রিয়ার যুবরাজ এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী মেটারনিষ। অনেক ঐতিহাসিকের মতে তিনিই ছিলেন সম্মেলনের নিয়ন্ত্রক। অধ্যাপক সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী লিখেছেন, "রক্ষণশীল ও প্রখর রাজনৈতিক বুদ্ধির অধিকারী মেটারনিষ ১৮০৯ সালে মাত্র ৩৬ বছর বয়সে অস্ট্রিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী হন। তিনি ৩৯ বছর এই পদে আসীন ছিলেন। এটাই তাঁর যথেষ্ট কৃতিত্ব হিসেবে পরিগণিত হতে পারে কারণ হ্যাপস্‌বার্গ সাম্রাজ্যের সমস্যা খুব সরল ছিল না। মেটারনিষ ইয়োরোপে নতুনভাবে পুরোনো রাজতন্ত্রের সংহতি ও পুরোনো ব্যবস্থাকে ফিরিয়ে আনতে আগ্রহী ছিলেন। একই সঙ্গে বিভিন্ন শক্তির স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে ইয়োরোপীয় শক্তিজোটকে টিকিয়ে রাখতে তিনি সচেষ্ট ছিলেন। জার্মানীতে প্রাশিয়ার বা পূর্ব ইয়োরোপে রাশিয়ার শক্তি যাতে বেশী বৃদ্ধি পেতে না পারে সে ব্যাপারে তিনি খুব সজাগ ছিলেন।" সাধারণভাবে রক্ষণশীল মেটারনিষ যে ভিয়েনা সম্মেলনের অন্যতম প্রধান নেতা ছিলেন সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। শুধু তাই নয়, নিজ ব্যক্তিত্বে, কূটনীতিতে এবং চিন্তাধারায় তিনি সম্মেলনকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিতও করেছিলেন। তাঁর প্রায় সর্বক্ষণের সাহায্যকারী ছিলেন গেনৎস্(Gentz)। অস্ট্রিয়ার সম্রাট ফ্রান্সিসের কথা তো আগেই বলা হয়েছে।

রাশিয়ার প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে ছিলেন স্বয়ং জার প্রথম আলেকজান্ডার। নেপোলিয়ানের পতনের ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন। মেটারনিষের মতন কূটনীতিজ্ঞান তাঁর ছিল না। তাছাড়া রাশিয়ার মতন স্বৈরাচারী দেশের সম্রাট হলেও তিনি বাস্তববাদী ছিলেন না। তার সঙ্গে ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী নেসেল রোড, কাউন্ট রাজুমোভস্কি এবং কাউন্ট স্টাকেলবার্গ। তাছাড়া জার্মান স্টাইন, পোল্যান্ডের প্রিন্স জারটোরিস্কি এবং সুইস লা হার্প তাকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য হাজির ছিলেন। তাঁর আরও পরামর্শদাতা ছিল যেমন

পোৎসো ডি বোরগো, কাপো দিস্ত্রিয়া প্রমুখ। তবে জার আলেকজান্ডারের মধ্যে নানা স্ববিরোধ ছিল এবং তার অস্থির চিত্ততার জন্যেই মেটারনিষ তাঁকে নিজপক্ষে টানতে পেরেছিলেন। বস্তুত স্বৈরাচারী ও উদারনৈতিক মতবাদের টানাপোড়েন এবং ধর্মীয় মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি তার চিন্তাকে জটিল করেছিল। তবু তাঁর হস্তক্ষেপের ফলেই বিজিত ফ্রান্সের প্রতি সম্মেলন বিদ্বেষপরায়ণ হতে পারেনি।

প্রাশিয়ার সম্রাট তৃতীয় ফ্রেডারিক উইলিয়ামও উপস্থিত ছিলেন। তবে তিনি ছিলেন জার প্রথম আলেকজান্ডারের অনুগত। এছাড়া প্রাশিয়ার প্রতিনিধি দলে ছিলেন প্রিন্স হারডেনবুর্গ আর তাকে সাহায্য করেছিলেন ফন হুমবোলট। ইংল্যান্ডের প্রতিনিধিবর্গের নেতৃত্ব দেন ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড ক্যাসলরি। ইংরেজদের একজন বিশিষ্ট প্রতিনিধি ছিলেন ডিউক অফ ওয়েলিংটন। ইংল্যান্ডের ভূমিকাও ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরাও শক্তিসাম্য বজায় রাখতে আগ্রহী ছিলেন। বিশেষভাবে ফ্রান্স ও রাশিয়া যাতে শক্তিশালী না হয় সেদিকে তাদের লক্ষ্য ছিল। ক্যাসলরি ভিয়েনা সম্মেলনে স্বাধীনভাবে স্পষ্ট মত প্রকাশ করেন। মোটামুটি ভিয়েনা সম্মেলনের মধ্যে নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রধান চারটি দেশের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। এগুলি হলো অস্ট্রিয়া, রাশিয়া, ইংল্যান্ড এবং প্রাশিয়া।

তবে উপরি উক্ত চারটি দেশ শুধু নয়, পোপ এবং তুরস্ক ছাড়া ইয়োরোপের প্রায় প্রতিটি দেশের প্রতিনিধি ভিয়েনা সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করার মতন হলো ফ্রান্সের ভূমিকা। মেটারনিষকে বাদ দিলে ফ্রান্সের প্রতিনিধি তালেঁরা (Talleyrand) ছিলেন ভিয়েনা সম্মেলনের সব থেকে সফল কূটনীতিক। অত্যন্ত চতুর ও সুযোগ সন্ধানী এই প্রাক্তন বিশপ পরাজিত দেশের প্রতিনিধি হয়েও সম্মেলনে নিজের এবং ফ্রান্সের জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্থান আদায় করেছেন, আলোচ্য বিষয়গুলিতে মত প্রকাশ করেছেন, সম্মেলনের উপর প্রভাব বিস্তার পর্যন্ত করেছেন। ফলে ফ্রান্সের মর্যাদা যথাসম্ভব অক্ষুন্ন রাখার চেষ্টার মধ্যেই তাঁর সাফল্য। তেমনি প্রাশিয়া-রাশিয়াকে ইংল্যান্ড-অস্ট্রিয়ার কাছ থেকে খানিকটা সরিয়ে এনে কাজে লাগিয়েছেন। ইতিহাসবিদ হ্যারল্ড নিকলসন তাঁর 'কংগ্রেস অফ ভিয়েনা' গ্রন্থে এজন্য তালেঁরাকে 'প্রতিভাবান'(Genius) বলেছেন। বস্তুত ভিয়েনা সম্মেলনের শেষ দিকে চতুঃশক্তি নয়, প্রাধান্য ছিল পঞ্চ শক্তির।

ভিয়েনা সম্মেলনের উদ্দেশ্য : ভিয়েনা সম্মেলনের নেতৃবর্গের সামনে মূল উদ্দেশ্য ছিল এককথায় নেপোলিয়ানের উত্থানের ফলে ইয়োরোপের মানচিত্রের যে পরিবর্তন হয়েছিল তার পুনর্গঠন করা। তবে যদিও 'ইয়োরোপের পুনর্গঠন'ই (Reconstruction of Europe) মূল উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয়েছে তবে এর পিছনে আসল উদ্দেশ্য ছিল দুটি। একদিকে ইয়োরোপে সমাজ ব্যবস্থার পুনর্গঠন। অর্থাৎ নেপোলিয়ান নয়, ফরাসি

বিপ্লব ইয়োরোপে পুরোনো ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলে যে বিপ্লবী আদর্শ স্থাপন করে নতুন চেতনার জন্ম দিয়েছিল, তাকে বিনষ্ট করা। এজন্য দরকার ছিল পুরোনো রাজবংশগুলিকে ফিরিয়ে আনার। অপরদিকে, ইয়োরোপের দেশগুলি যাতে কেউ কারো থেকে বেশি শক্তিশালী না হয়ে ওঠে, ক্ষতিপূরণ যেন কেউ কারো থেকে বেশি না পায়। সুতরাং ফরাসি-বিপ্লবের আদর্শ এবং নেপোলিয়ানের অধীনে ফ্রান্সের রাজ্যগ্রাস ইয়োরোপের রাজনীতি ক্ষেত্রে যে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল, তার সমাধান করাই ছিল ভিয়েনা সম্মেলনের উদ্দেশ্য।

ভিয়েনা সম্মেলনের সামনে সমস্যা ঃ উদ্দেশ্য হিসেবে ইয়োরোপের পুনর্গঠনের কথা বলা হলেও ভিয়েনা সম্মেলনের মূল সমস্যা ছিল ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গের মধ্যে রেষারেষি। মনো রাখা দরকার যে মিত্রপক্ষের মধ্যে মূল ঐক্যসূত্র ছিল নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। যতদিন এই সংগ্রাম অব্যাহত ছিল ততদিন ঐ বন্ধন অটুট ছিল। কিন্তু ওয়াটার্লুর যুদ্ধের পর থেকেই মিত্র শক্তির দেশগুলির মধ্যে নানা মতভেদ দেখা যেতে থাকে। তবে ভিয়েনা সম্মেলনের সামনে যেসব সমস্যা উপস্থিত হয়েছিল সেগুলিকে মোটামুটিভাবে ঐতিহাসিকগণ শনাক্ত করেছেন। সেগুলি হলো ঃ (ক) ফ্রান্সের শক্তি ও সীমানা নির্ধারণ, (খ) ইয়োরোপের পুনর্গঠন, (গ) পোল্যান্ডের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ, (ঘ) জার্মানির রাজ্য ও শাসন সংগঠন, (ঙ) ইতালির রাজ্য ও শাসন সংগঠন, (চ) ইয়োরোপের শক্তিসাম্য ও শান্তি বজায় রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং (ছ) মিত্রপক্ষের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিগুলির শর্তাদির বাস্তব প্রয়োগ এবং ক্ষতি পূরণ লাভের ক্ষেত্রে সমতা।

এই সমস্যা এবং লক্ষ্যগুলিকে সামনে রেখেই ভিয়েনা সম্মেলনের নেতৃবর্গ সমবেত হয়েছিলেন। তবে লক্ষ্যণীয় যে সম্মেলনে যোগদানকারী রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে আদর্শগত পার্থক্য ছিল। কিন্তু প্রায় সকলেই ছিলেন রক্ষণশীল। এ বিষয়ে শিরোমণি হলেন মেটারনিষ। অস্ট্রিয়ার সম্রাট ও প্রাশিয়ার সম্রাটদ্বয়ও তাই। ব্রিটেনে তখন ছিল রক্ষণশীল টোরী দলের সরকার। একমাত্র রুশ জার প্রথম আলেকজান্ডার কিছু পরিমাণে রক্ষণশীলতা থেকে মুক্ত ছিলেন, তবে তাকেও পুরোপুরি উদারনৈতিক বলা যায় না। তবু তাঁর উদারনৈতিকতা সম্পর্কে অন্যান্য রাষ্ট্রনায়কদের সন্দেহ ছিল। মূল সমস্যা ছিল মিত্রপক্ষের মধ্যে পারস্পরিক দাবি এবং স্বার্থ। জার্মানি, ইতালি, পোল্যান্ড সম্পর্কে ব্যবস্থা নিতে হবে ঠিকই কিন্তু এ ব্যাপারে ইংল্যান্ড, রাশিয়া, প্রাশিয়া এবং অস্ট্রিয়া -এই চার বৃহৎ শক্তি চার ধরণের উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত হয়েছিল। যেমন উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় রাশিয়ার শক্তি বৃদ্ধি কিংবা জার্মানিতে প্রাশিয়ার প্রাধান্য অস্ট্রিয়া আদৌ চাইত না। রাশিয়া

চাইত পোল্যান্ডের রাজ্য। ইংল্যান্ডও রাশিয়ার শক্তিবৃদ্ধির ঘোরতর বিরোধী ছিল। পিয়েডমন্ট-সার্ডিনিয়া ইতালির ঐক্যবিধানের পক্ষপাতী ছিল কিন্তু অস্ট্রিয়া উত্তর ইতালিতে তাদের শক্তি ছাড়তে রাজী ছিল না। প্রাশিয়া সমগ্র স্যাক্সনি দাবি করত। এই নানা, ভিন্ন স্বার্থ ও পারস্পরিক দাবি পাল্টাদাবির মধ্যে ভিয়েনা সম্মেলন মোটামুটি যুক্তিসঙ্গত ভাবে কাজ করতে সমর্থ হয়েছিল।

ভিয়েনা সম্মেলনের আদর্শ ঃ সাধারণভাবে মনে করা হয় যে ভিয়েনা সম্মেলনে নেতৃবর্গ তিনটি মূল নীতি দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন। যেমন কেটেলবি লিখেছেন, 'Three Principles moulded the Vienna Settlement'। ভিয়েনার নেতৃবর্গ মুখে উচ্চ আদর্শ, ন্যায়, সততা ইত্যাদির কথা বলেছিলেন তবে কাজ করতে গিয়ে তারা আশ্রয় নিয়েছিলেন কূটনৈতিক চাল ও দর-কষাকষির। *ডেভিড টমসন* লিখেছেন,"Like any general settlement of the kind, the settlement of Vienna was a network of bargains and negotiated compromises"। তথাপি এ কথা বলা যায় তিনটি আদর্শ সামনে রেখেই সন্ধির শর্তগুলি স্থির করা হয়েছিল। এই আদর্শ তিনটি হলো—

(i) ন্যায্য অধিকার বা বৈধ রাজবংশের শাসনাধিকার (Principle of Legitimacy)।

(ii) শক্তি সাম্য (Principle of Balance of Power)।

(iii) ক্ষতিপূরণ (Principle of Compensation)। তবে নীতিগুলি প্রয়োগের সময় পারস্পরিক স্বার্থরক্ষা নিয়ে দর কষাকষি চলে। তখন নীতিগুলির স্থান হয় গৌণ, স্বার্থই হয় মুখ্য। এজন্য ইতিহাসবিদ *গর্ডন ক্রেগ* নীতিগুলির আক্ষরিক প্রয়োগের পরিবর্তে সুবিধা অনুযায়ী প্রয়োগের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

ভিয়েনা সম্মেলনের কার্যাবলী ঃ ন্যায্য অধিকার নীতির মূল কথা ছিল এই যে ফরাসি বিপ্লবের এবং নেপোলিয়ানের আগে ইয়োরোপে যে সব দেশে যে সব রাজবংশের শাসন বলবৎ ছিল তাদের সেই দেশ শাসন করার ন্যায্য অধিকার আছে। শুধু তাই নয়, যে স্থান যে দেশের অধিকারে ছিল তাদেরও সেই অঞ্চল পাওয়ার ন্যায্য অধিকার আছে। মনে রাখা দরকার যে প্রাক্-বিপ্লব যুগের রাজনৈতিক কাঠামোকে ফিরিয়ে আনতে চাওয়া হলো এবং এর ফলে বিপ্লব-প্রসূত গণতন্ত্র ও জাতীয়তার আবেদনকে উপেক্ষা করা হলো।

এই ন্যায্য অধিকার নীতি উত্থাপন করেছিলেন ফরাসি প্রতিনিধি তালেরাঁ। তা সমর্থন করেছিলেন মেটারনিষ। তালেরাঁর উদ্দেশ্য ছিল ফ্রান্সকে বড়ো বিপদের হাত থেকে রক্ষা করা এবং বুরবোঁ রাজবংশের শাসন ফিরিয়ে আনা। মেটারনিষ সেই সঙ্গে ঘোষণা করেন যে নেপোলিয়ানের যুগে ইয়োরোপে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে যে-সব পরিবর্তন হয়েছিল তা অবৈধ।

এই ন্যায্য অধিকার নীতি প্রয়োগ করে ফ্রান্সে বুরবোঁ শাসন ফিরিয়ে আনা হলো এবং ষোড়শ লুইয়ের ভাই অষ্টাদশ লুইকে রাজা বলে স্বীকৃতি জানানো হলো। এই ন্যায্য অধিকার নীতি প্রয়োগ করেই উত্তর ইতালিতে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য পুনঃস্থাপিত হলো; তারা লমবারদি ও ভেনেসিয়ার দখল পেল। মধ্য ইতালিতে পোপ তাঁর রাজ্য ফিরে পেলেন। এমনকি, সিসিলি ও ন্যাপলস্ অযোগ্য ও কুখ্যাত ফার্দিনান্ডকে ফিরিয়ে দেওয়া হলো। একইভাবে পিয়েডমন্ট-সার্ডিনিয়াতে স্যাভয় পরিবার এবং হল্যান্ডে অরেঞ্জ পরিবারকে শাসনক্ষেত্রে ফিরিয়ে আনা হলো। স্পেনেও স্থাপিত হলো বুরবোঁ বংশ। সর্বক্ষেত্রে অবশ্য বৈধ বা ন্যায্য অধিকার নীতি প্রয়োগ করা হয়নি।

শক্তিসাম্য নীতির মূলকথা ছিলো কোনও দেশ যাতে অপর কোনও দেশের চাইতে বেশি শক্তিশালী না হয়ে যায়, তা লক্ষ্য রাখা। বস্তুতপক্ষে ভিয়েনা সম্মেলনে নেতৃবৃন্দের সন্দেহ, বিদ্বেষ ও পরস্পর-বিরোধী স্বার্থবোধ এবং ভবিষ্যতে ফ্রান্সের আক্রমণ থেকে ইয়োরোপ রক্ষা করার কথাই মাথায় ছিল। তাই প্রথমেই ফ্রান্সকে কমজোরী করে দেওয়া হলো। ফ্রান্সকে 1790 খ্রিঃ অর্থাৎ বিপ্লবপূর্ববর্তী সীমানায় বেঁধে দেওয়া হলো। তাদের সেনাবাহিনীও ভেঙে দেওয়া হলো। ঠিক হলো যে, পাঁচ বছরের জন্য মিত্রশক্তির সৈন্য ফ্রান্সে থাকবে এবং তার ব্যয়ভার ফ্রান্সকেই বহন করতে হবে। ফ্রান্সের প্রতিবেশী দেশগুলিকে শক্তিশালী করা হয় এবং ফ্রান্সের চারিদিকে এক বেষ্টনী তৈরি করা হয়। যেমন ফ্রান্সের উত্তর-পূর্ব দিকে লুক্সেমবার্গ ও বেলজিয়ামকে হল্যান্ডের সঙ্গে যুক্ত করা হলো; পূর্ব সীমান্তে জার্মানির রাইন প্রদেশগুলিকে প্রাশিয়ার সঙ্গে যুক্ত করা হলো, জার্মানির পুনর্গঠন নিয়ে অবশ্য জটিলতা দেখা দিয়েছিল। এক্ষেত্রে ফরাসি বিপ্লবের আগেকার অবস্থায় ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে জার প্রথম আলেকজান্ডারের আপত্তি ছিল। নেপোলিয়ান যখন জার্মানি দখল করেন তখন সেখানে প্রায় তিনশো রাজ্য ছিল। এখানে ন্যায্য অধিকার মানা হলো না; জার্মানিকে 39টি রাজ্যে বিভক্ত করে এক শিথিল রাষ্ট্রজোট (Bund) গঠন করা হলো। এই জোটের সভাপতি রইলো অস্ট্রিয়া। ফ্রান্সের দক্ষিণপূর্বে সুইটজারল্যান্ডকে ফ্রান্সের তিনটি ক্যান্টন বা জেলা দেওয়া হলো। সুইটজারল্যান্ড একটি স্বাধীন নিরপেক্ষ দেশে পরিণত হলো। ফ্রান্সের দক্ষিণ সীমান্তে ইতালিতে জেনোয়াকে যুক্ত করা হলো সার্ডিনিয়ার সঙ্গে। আরও মনে রাখা দরকার যে নেপোলিয়ানের তৈরি করা দুটি রাষ্ট্র ওয়েস্টফেলিয়া এবং গ্র্যান্ড ডাচি অফ ওয়ারশ ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, রাশিয়া ও ইংল্যান্ডকে এমন এমন অঞ্চলের অধিকার দেওয়া হয় যাতে তারা পারস্পরিক শক্তি সাম্য বজায় রেখে চলতে পারে। ইতালির ক্ষেত্রেও ঐক্য বিনষ্ট ক'রে, তাকে এক ভৌগোলিক সংজ্ঞায় পরিণত ক'রে দিয়ে পাঁচটি অংশে বিভক্ত করা হলো।

ক্ষতিপূরণ নীতির মূলকথা ছিলো ফ্রান্সের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করা এবং ফ্রান্সের বিপক্ষে যে সব দেশ যুদ্ধ করেছে এবং সেজন্য যা ক্ষতি হয়েছে, তা পুষিয়ে দেবার জন্য অঞ্চল দখল করা। অর্থাৎ ক্ষতিপূরণের সঙ্গে পুনর্বন্টনের প্রশ্নটিও জড়িত ছিল। অন্যভাবে বলা যায়, বিজয়ী শক্তিবর্গ ইয়োরোপ ও বাইরের উপনিবেশের কিছু কিছু ভূখন্ড নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিল। ফ্রান্স বিজয়ী মিত্রশক্তিকে যুদ্ধের দরুণ 70 কোটি ফ্রাঁ (franc) ক্ষতিপূরণ দিয়েছিল।

প্রাশিয়া স্যাক্সনির প্রায় অর্ধাংশ, ওয়েস্টফেলিয়ার কিছু অংশ, বার্গের ডাচি, পোল্যান্ডের কিছু অংশ, পোজেন প্রদেশ, ডানজিগ এবং থর্ণ লাভ করল। তবে লুক্সেমবুর্গের দুর্গগুলি তারা পায় নি। এছাড়া প্রাশিয়া সুইডেনের ছেড়ে দেওয়া পশ্চিম পোমেরেনিয়া ও রাইন নদীর বাম তীরের প্রদেশগুলি লাভ করল। প্রাশিয়ার সম্প্রসারণ ঘটলো, ভবিষ্যতে প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানির ঐক্যের পথ সুগম হলো। রাশিয়া ফিনল্যান্ড ও পোল্যান্ডের কিছু অংশ এবং তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বেসারাবিয়া লাভ করার ফলে রাশিয়ার সীমানা পশ্চিম ইয়োরোপে প্রসারিত হলো। পরিণতিতে ইয়োরোপে রাশিয়ার সম্মান এবং রাজনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পেল।

হল্যান্ডকে অস্ট্রিয়ার কাছ থেকে বেলজিয়াম দেওয়া হয়েছিল। তার ক্ষতিপূরণের জন্য অস্ট্রিয়া ইতালি থেকে লমবারদি এবং ভেনেশিয়া লাভ করল। এর ফলে অস্ট্রিয়ার নৌশক্তি বৃদ্ধি পেল ঠিকই কিন্তু ইতালির ঐক্যের পথে তারাই হলো বড়ো বাধা। এছাড়া অস্ট্রিয়া পূর্ব সাইলেশিয়া এবং ব্যাভেরিয়ার অন্তর্ভুক্ত টাইরল লাভ করল। ব্যাভেরিয়া ক্ষতিপূরণস্বরূপ পেল আনস্‌বাখ এবং বেইরুঠ। জার্মান রাষ্ট্রজোটের প্রতিনিধি সভার (Diet) সভাপতি রইলো অস্ট্রিয়া। তৎসত্ত্বেও সবমিলে অস্ট্রিয়ার বিশেষ লাভ হয়নি। সুইডেন থেকে ফিনল্যান্ড রাশিয়াকে এবং পশ্চিম পোমেরেনিয়া প্রাশিয়াকে দেওয়ার ফলে তাদের যে ক্ষতি হয় তা পূরণ করার জন্য ডেনমার্কের কাছ থেকে নরওয়ে কেড়ে নিয়ে সুইডেনকে দেওয়া হলো। নেপোলিয়ানের সঙ্গে যুদ্ধে ডেনমার্ক ফরাসি পক্ষে এবং সুইডেন মিত্রপক্ষে ছিল।

ইংল্যান্ড উত্তর সাগরে হোলিগোল্যান্ড, ভূমধ্যসাগরে মাল্টা ও আইওনীয় দ্বীপপুঞ্জ দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ কলোনি এবং ভারত মহাসাগরে সিংহল (শেষের দুটি হল্যান্ডের কাছ থেকে), স্পেনের কাছ থেকে ত্রিনিদাদ এবং ফ্রান্সের কাছ থেকে টোবাগো (দুটিই ওয়েস্ট ইন্ডিজে) ইত্যাদি লাভ করল। এই সব রাজ্যলাভের ফলে ইংল্যান্ডের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য, বাণিজ্য ও নৌশক্তি প্রবল হয়ে উঠলো। এছাড়া হল্যাণ্ডের রাজার অধীনে বেলজিয়াম-হল্যান্ড সংযুক্তি এবং সেখানে অরেঞ্জ পরিবার ক্ষমতাশীল হওয়াতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্বস্তি লাভ করল।

ফ্রান্স অবশ্য আলসাস এবং লোরেন প্রদেশ দুটি লাভ করেছিল। তাছাড়া ফ্রান্স যথাক্রমে পর্তুগাল, সুইডেন এবং ইংল্যাণ্ডের কাছ থেকে ফরাসি গায়ানা, গুয়েদেলুপ এবং বুরবোঁ দ্বীপ লাভ করল। হ্যানোভার পেল স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা; ব্যাভেরিয়া রাইন উপকূলে কিছু রাজ্যাংশ পেয়েছিল।

এইসব আঞ্চলিক লাভ-ক্ষতি ছাড়াও ভিয়েনা সম্মেলনে কয়েকটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। মূলত ক্যাস্‌লরির চাপে দাস ব্যবসা নিষিদ্ধ করে প্রস্তাব গৃহীত হয়। মনে রাখা দরকার, ব্রিটেনে উদারপন্থী সংস্কারক উইলবারফোর্সের প্রচেষ্টায় এর আগেই 1807 খ্রিস্টাব্দে দাস ব্যবসা (Slave trade) বিলুপ্ত হয়। এই দৃষ্টান্তে হল্যান্ড ও সুইডেনও দাস ব্যবসার অবসান ঘটায়। এছাড়া যে সমস্ত নদী একাধিক দেশের মধ্যে প্রসারিত হয়েছে সেই নদী পথে বাণিজ্যের সার্বজনীন অধিকার মেনে নেওয়া হয়।

ভিয়েনা সম্মেলনের কার্যাবলীর সমালোচনা : নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যদি আমরা ভিয়েনা সম্মেলনের কার্যাবলীর মূল্যায়ন করি তাহলে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এই ধরনের কাজের ভালো ও মন্দ দুই-ই থাকা সম্ভব এবং তা ছিলও। একথা স্বীকার্য যে, ভালো ও মন্দের বিচার আপেক্ষিক এবং ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তা ভিন্ন। রাজনীতিকদের কাজের সমালোচনা সমসাময়িক মানদণ্ড দিয়েই করা প্রয়োজন। ভিয়েনা সম্মেলন নিয়েও আমরা নিন্দা-প্রশংসা দুই-ই লক্ষ্য করি। *হ্যারল্ড নিকলসন* ভিয়েনা সম্মেলন ইয়োরোপকে যুদ্ধের হাত থেকে দীর্ঘকাল রক্ষা করেছিল বলে তার কার্যাবলীর প্রশংসা করেছিলেন। আবার বিপরীতপক্ষে ভিয়েনা সম্মেলন জাতীয়তাবাদ ও উদারপন্থী আদর্শকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছিল বলে অনেকে তার কার্যাবলীকে কঠোর সমালোচনাও করেছেন। মোটের উপর দোষত্রুটি সত্ত্বেও ভিয়েনা সম্মেলন ছিল যুক্তি সংগত এবং রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচায়ক—এই অভিমত প্রকাশ করেছেন অধ্যাপক *ডেভিড টমসন*।

ভিয়েনা সম্মেলনের বিপক্ষে যে-সব সূত্র তুলে ধরা হয় সেগুলি মোটামুটি হলঃ (১) এই সম্মেলন জাতীয়তাবাদ ও উদারনীতিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছে। (২) এই উপেক্ষার পশ্চাতে ছিল বিপ্লবী আদর্শ বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব। বস্তুত ভিয়েনার নেতৃবর্গ ছিলেন রক্ষণশীল, তাই তারা যুগের দাবিকে আমল দেন নি। (৩) ভিয়েনা সম্মেলন ছিল নামেই সম্মেলন। প্রকৃত প্রস্তাবে অস্ট্রিয়া, ইংল্যাণ্ড, প্রাশিয়া, রাশিয়া এবং ফ্রান্স— এই পাঁচজনের হাতে ছিল কর্তৃত্ব। *রাইকার* যেমন লিখেছেন, 'The foreign ministers of the five great powers were the Congress'। (৪) ন্যায্য অধিকার নীতি আংশিক প্রয়োগ করা হয়েছিল। কোথাও হয়েছে, কোথাও হয়নি। (৫) অনেক ক্ষেত্রে পূর্বতন অবস্থাকে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। (৬) অপরের রাজ্য অধিকার

করতে গিয়ে স্বার্থপরতার চূড়ান্ত পরিচয় দিয়েছিল। (৭) ফ্রান্সের ক্ষেত্রে আরোপিত পরিবেষ্টন নীতি দ্বারা শক্তিসাম্য নষ্ট হয়েছিল। (৮) নেতৃবর্গ অনেক ভ্রান্ত পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। *ম্যারিয়ট* লিখেছেন যে, সম্মেলন রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় দেয়নি। এককথায়, ভিয়েনা সম্মেলন যে রাষ্ট্রব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিল তা যুগের পক্ষে অচল। *কেটেলবি* এবং *হ্যাজেন* উভয়েই এই যুগধর্মকে উপেক্ষা, বিশেষত ফরাসি বিপ্লবের আদর্শ, জাতীয়তাবাদ ও গণতান্ত্রিক উপেক্ষার কথা লিখেছেন।

অন্যদিকে *গ্রান্ট* ও *টেম্পারলি*-র মতে ভিয়েনা সম্মেলনের নেতাদের প্রতিক্রিয়াশীল এবং উদারনৈতিকতা-বিরোধী বলা রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। তবে ত্রুটি যে ছিল তা উভয় লেখক অস্বীকার করেন নি। যেমন তারা উল্লেখ করেছেন যে, বৃহৎ শক্তিগুলির স্বার্থে ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির স্বার্থ জলাঞ্জলি দেওয়া হয়েছিল। আবার *হারন্‌শ* লিখেছেন যে, যাঁরা ভিয়েনার নেতা ছিলেন, তারা তো রাজনীতিবিদ-ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা মহাপুরুষ নন। সুতরাং ভুল ভ্রান্তি স্বাভাবিক। তাই *ডেভিড টমসন* জাতীয়তাবাদ ও উদারনীতিকে উপেক্ষার কথা স্বীকার করেও সম্মেলনকে অযৌক্তিক বলেন নি। একথা ঠিক, সম্মেলনের সাফল্যের দুটি বড়ো প্রমাণ হলো, পরবর্তী প্রায় চল্লিশ বছর ইয়োরোপকে যুদ্ধ মুক্ত রাখা এবং অন্যদিকে শক্তিবর্গের মধ্যে এক যুক্তিগ্রাহ্য সাম্য বজায় রাখা। মনে রাখতে হবে, ইয়োরোপে 1815 খ্রিস্টাব্দে সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত ছিল শান্তি। জাতীয়তাবাদ, বিপ্লব, প্রজাতন্ত্র এবং সাধারণ মানুষের অধিকারবোধ উনিশ শতকের গোড়ায় সম্পূর্ণ বোঝা সহজ ছিল না, তার জন্য ভিয়েনার নেতাদের অতিরিক্ত দোষ দেওয়া অর্থহীন। তবে প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থা অন্তর্নিহিত স্ববিরোধিতার জন্য শেষপর্যন্ত ভেঙে পড়েছিল।

৩। ইয়োরোপীয় শক্তি সমবায়

শক্তি সমবায় কাকে বলে ঃ বাদ্যযন্ত্রের ক্ষেত্রে যেমন একক সুরের বদলে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের সমবেত মূর্ছনা এবং এক মিলিত সুরকে বলা হয় কনসার্ট, তেমনি নেপোলিয়ান বোনাপার্টের পতনের আগে থেকেই নেপোলিয়ানের বিপক্ষে মিলিত মিত্রশক্তিবর্গ ঐক্যবদ্ধ থাকার যে প্রচেষ্টা শুরু করেছিলেন এবং নেপোলিয়ানের পতন তথা ভিয়েনা সম্মেলনের পরে যে প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন তাকেই ঐতিহাসিকগণ নাম দিয়েছেন 'কনসার্ট অফ ইয়োরোপ'। একে বাংলা ভাষান্তরে ইয়োরোপীয় শক্তি সমবায় বলা যেতে পারে।[1]

একথা ঠিক যে, বিভিন্ন ইয়োরোপীয় শক্তির সম্মিলিত প্রয়াসেই শেষ পর্যন্ত ফ্রান্স পরাজিত হওয়ার পর ভিয়েনা সম্মেলনে ইয়োরোপে এক নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থার

1. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্র. W. Alison Philips, *The Confederation of Europe: A Study of European Alliance*, 1813-1823; H G Schenk, *The Aftermath of the Napoleonic Wars: The Concert of Europe; The New Cambridge Modern History*, Vol IX.

প্রবর্তন করা হয়। এই ব্যবস্থার অন্যতম রূপকার ছিলেন অস্ট্রিয়ার মেটারনিখ। তবে অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, রাশিয়া এবং ইংল্যাণ্ড এই চতুঃশক্তিই এর পিছনে ছিল। *এইচ. এ. এল. ফিশার* লিখেছেন যে, "ফরাসি বিপ্লবের ফলে ইয়োরোপীয় শক্তিগুলি বহু কষ্ট ভোগ করে। এজন্য 1815 খ্রিস্টাব্দে তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, আর কোনওভাবে ফরাসি বিপ্লব বা নেপোলিয়ানের অভ্যুত্থান ঘটতে দেওয়া হবে না।"[1] মিত্রশক্তিবর্গ বুঝেছিলেন, শান্তি বজায় রাখতে হলে এবং ভিয়েনা সম্মেলনের কার্যবলী বজায় রাখতে হলে তাঁদের ঐক্যবদ্ধ থাকা দরকার। এই প্রয়োজনের প্রতিফলনই দেখা যায় ইয়োরোপীয় শক্তি সমবায়ের মধ্যে।

শক্তিসমবায়ের প্রথম ভিত্তি ঃ পবিত্র চুক্তি ঃ ইয়োরোপীয় শক্তি সমবায়ের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দু'টি। প্রথমতঃ, ইয়োরোপে শান্তি বজায় রাখা এবং দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য বজায় রাখা। শান্তি বজায় রাখার অন্তর্গত ছিল ভিয়েনা ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখা এবং ভবিষ্যতে যাতে কোনও প্রকার বিপ্লবী পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয় তা দেখা। দ্বিতীয়তঃ, ফ্রান্সকে সংযত রাখা এবং ভবিষ্যতে যাতে নেপোলিয়ানের উত্থান না হয় তা লক্ষ্য রাখা।

এই উদ্দেশ্যগুলি মাথায় রেখেই ইয়োরোপীয় শক্তি সমবায় গঠিত হয়। এই শক্তি সমবায়ের ভিত্তি ছিল চতুঃশক্তি চুক্তি (Quadruple Alliance)। তবে তা ছিল দ্বিতীয় অথচ মুখ্য ভিত্তি। প্রথম অথচ গৌণ ভিত্তি ছিল তথাকথিত পবিত্র চুক্তি (Holy Alliance)। সুতরাং বলা যেতে পারে, পবিত্র চুক্তি এবং চতুঃশক্তি চুক্তি এই দুই স্তম্ভের উপর ইয়োরোপীয় শক্তি সমবায় দাঁড়িয়ে ছিল। অবশ্য পবিত্র চুক্তির ব্যর্থতার ফলেই চতুঃশক্তি চুক্তির প্রয়োজন হয়েছিল।

পবিত্র চুক্তির উদ্ভাবক ছিলেন রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজাণ্ডার। তিনি ধর্মের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিলেন। ভাবপ্রবণ, আদর্শবাদী অথচ ধর্মভীরু জার মনে করতেন যে ফরাসি বিপ্লবের ন্যায় প্রজা-অভ্যুত্থান ছিল খ্রিস্টান ধর্মশাস্ত্র বিরোধী। এই ঘটনা ঘটেছে একদিকে প্রজারা ধর্ম মানেন নি বলে, অন্যদিকে ইয়োরোপীয় রাজাদের ধর্মনীতি অনুসারে শাসন না করার ফলে। এই ভাবনার পিছনে ফন ক্রুডেনার নামক এক জার্মান সন্ন্যাসিনীর প্রভাব ছিল বলে অনেকে মনে করেন। অন্যান্য ভাবনা চিন্তাও তাকে প্রভাবিত করে থাকতে পারে। কারণ ঐ সময়ে ইয়োরোপে গত শতকের যুক্তিবাদী ও অবিশ্বাসী বিভিন্ন চিন্তার বিরুদ্ধে এক ধরণের ধর্মীয় পুনর্জাগরণ লক্ষ্য করা গিয়েছিল।

---

1. H.A.L. Fisher, *History of Europe.*, p 873.

যাইহোক, বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টে খ্রিস্টিয় রাজধর্ম সম্পর্কে যে সব আদর্শের উল্লেখ আছে তা পালন করবার জন্য ইয়োরোপীয় দেশগুলির কাছে আহ্বান জানিয়ে জার প্রথম আলেকজান্ডার 1815 খ্রিস্টাব্দের 26 সেপ্টেম্বর পবিত্র চুক্তির কথা ঘোষণা করেন। জারের মতে তাদের রাজনৈতিক কাজকর্মের পিছনে চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করবে খ্রিস্টধর্মের প্রেম, দয়া ও শান্তির বাণী। চুক্তির শর্তগুলি ছিল অনেকটা এরকম; (ক) ইয়োরোপীয় সম্রাটগণ পরস্পরকে খ্রিস্টিয় সমাজের অধীন ভ্রাতা হিসেবে বিবেচনা করবেন, (খ) নিজস্ব প্রজাদের সন্তানের মতো দেখবেন, (গ) প্রত্যেকে ন্যায়, প্রেম ও শান্তি মেনে দেশ শাসন করবেন, (ঘ) দেশ শাসনের সঙ্গে তাঁরা ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্যগুলি পালন করবেন এবং (ঙ) চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশগুলি পরস্পরকে ভ্রাতাজ্ঞান করে আদর্শগুলি নিজ নিজ রাজ্যে বাস্তবে প্রয়োগ করবেন।

জারকে খুশি করার জন্য অস্ট্রিয়া এবং প্রাশিয়া এই আহ্বানে সাড়া দেয় এবং পবিত্র চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। ইংল্যান্ড যদিও নেপোলিয়ানের পতনের ব্যাপারে ছিল মিত্র শক্তির অন্যতম প্রধান দেশ, তবু তারা পবিত্র চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি। অবশ্য পরে পোপ ছাড়া ইয়োরোপের অনেকে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করে।

তবে পবিত্র চুক্তিতে কাজের কাজ কিছুই হয়নি। মহান খ্রিস্টান আদর্শের কথা বলা হলেও পবিত্র চুক্তির মাধ্যমে ইয়োরোপে পুরাতনতন্ত্রকে স্থায়ী করা এবং বিপ্লবী আদর্শকে নির্মূল করার উদ্দেশ্য ছিল। তাছাড়া চুক্তি আকারে না এনে বিমূর্ত আদর্শ-ভিত্তিক (Abstract principles) ঘোষণাপত্র হিসেবে একে রাখা হয়। ফলে তা অস্পষ্ট নীতিবাক্যে সীমাবদ্ধ থেকে যায়। ইংল্যাণ্ড এই পবিত্র চুক্তিতে স্বাক্ষর তো করেইনি, একে আমলও দেয়নি। রাশিয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি তার মনঃপূতও ছিল না। ইংল্যাণ্ড অভিযোগ করে যে তারা যদি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে তাহলে কি ধরণের দায়িত্ব পালন করতে হবে তা বলা নেই। ব্রিটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্যাস্‌লরি একে এক 'অতীন্দ্রিয় বোকামি' (A piece of sublime mysticism and nonsense) মনে করতেন। তালেরাঁর কাছে এটি ছিল হাস্যকর যুক্তি। এমনকি মেটারনিষ পর্যন্ত একে 'অর্থহীন উচ্চ ঘোষণামাত্র' মনে করতেন ('high sounding nothing')। বস্তুত জারকে খুশি করতেই অস্ট্রিয়া-প্রাশিয়া এটি মেনে নেয়। সুতরাং পবিত্র চুক্তি তেমন কার্যকর হয়নি।

তবে কোনও কোনও ঐতিহাসিক মনে করেন পবিত্র চুক্তি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়নি। ট্রপোর প্রোটোকলের মধ্য দিয়ে এই চুক্তিকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। তখন প্রয়োজন বোধে বিপ্লবী পরিবর্তন রোধ করার জন্য অন্য দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের কথা মেনে নেওয়া হয়। অধ্যাপক সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী লিখেছেন, "এর ফলে, পবিত্র চুক্তি বেশ খানিকটা পাল্টে গিয়ে একটি বাস্তব ও অর্থবহ চুক্তিতে পরিণত

হয়।"[1] ট্রপোর প্রোটোকলই পবিত্র চুক্তির আসল দলিল হিসেবে গণ্য করা উচিত। যাই হোক, পবিত্র চুক্তি 1853 পর্যন্ত টিঁকে ছিল এবং তা চতুঃশক্তি শক্তির সঙ্গে মিলে শক্তি সমবায়কে জোরদার করেছিল।

শক্তি সমবায়ের আসল ভিত্তি-চতুঃশক্তি চুক্তি ঃ জার আলেকজাণ্ডার যেমন ছিলেন পবিত্র চুক্তির রূপকার, তেমনি চতুঃশক্তি চুক্তির রূপকার ছিলেন প্রিন্স মেটারনিখ। 1815 খ্রিস্টাব্দের 20 নভেম্বর তার উদ্যোগে চতুঃশক্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এতে স্বাক্ষর করেছিলেন অস্ট্রিয়া রাশিয়া, প্রাশিয়া এবং ইংল্যাণ্ড। নিজেদের মধ্যে বা ইয়োরোপে কারও সমস্যা দেখা দিলে তারা মাঝে মাঝে সম্মেলনে বসে মিটিয়ে নেবে এমন কথাও অন্যতম শর্তে বলা হলো।[2]

চতুঃশক্তি চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল ঃ (i) ভিয়েনা চুক্তিকে রক্ষা করা (ii) ইয়োরোপে যুদ্ধ বিগ্রহ রদ করে শান্তি বজায় রাখা (iii) বিভিন্ন শক্তির মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে তা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে ফেলা (iv) বিপ্লবী ভাবধারা ইয়োরোপে শান্তি বিঘ্নিত করলে তা দমন করা এবং (v) ইয়োরোপীয় পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য মাঝে মাঝে সম্মেলনে মিলিত হওয়া। *গ্রান্ট ও টেমপারলি* মনে করেন "কংগ্রেস কূটনীতি" চতুঃশক্তি চুক্তির ফলেই উদ্ভূত হয়েছে। মনে রাখা দরকার যে, ভিয়েনা সম্মেলন, মেটারনিখ পদ্ধতি এবং ইয়োরোপীয় শক্তি সমবায় ছিল পরস্পরের পরিপূরক। একথাও সত্য যে, মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে মতপার্থক্য ছিল। যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা অর্থাৎ নতুন সীমান্ত রেখাগুলি বজায় রাখা এবং ফ্রান্সে নেপোলিয়ানের মতো কোনও শক্তির পুনরুত্থান বন্ধ করাই ইংল্যান্ডের উদ্দেশ্য ছিল। অপরপক্ষে অস্ট্রিয়ার মেটারনিখের উদ্দেশ্য ছিল এই চুক্তিকে বিপ্লব-বিরোধী রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা। তবে মোটের উপর শক্তি সমবায় ছিল রক্ষণশীল। অধ্যাপক *ডেভিড টমসন* তাই লিখেছেন যে, এই কংগ্রেসব্যবস্থা রক্ষণশীল শক্তিরই সহায়তা করেছিল।[3]

চতুঃশক্তি চুক্তিতে বিভিন্ন সময়ে সম্মেলনে মিলিত হবার যে প্রস্তাব করা হয় তার থেকেই 'কংগ্রেসব্যবস্থা'র উৎপত্তি বলে ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করেন। তবে নিজেদের স্বার্থ-সংক্রান্ত আলোচনা ও ইয়োরোপীয় রাজনীতিতে উদ্ভূত বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতির

---

1. সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ 291
2. Grant and Temperley, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ 197
3. "The Congress System of 1815 was more realistic in this respect, that it did not presuppose a greater degree of unity and uniformity in Europe than actually existed ... Its misfortune was that it came to be manipulated by Metternich for the almost exclusively conservative purpose of preventing change, in an age when the forces of change were rapidly gaining in strength as against the forces of order and continuity," ডেভিড টমসন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ 98

উপর আলোচনা এবং সেই সঙ্গে ইয়োরোপের রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রচেষ্টাই শক্তি সমবায়ের কার্যকলাপ। কোনও কোনও ঐতিহাসিক অবশ্য কংগ্রেসব্যবস্থা বলে কিছু ছিল তা মনে করেন না। তবে কংগ্রেস বা কনফারেন্স যাই বলা হোক-না-কেন, কংগ্রেস-ব্যবস্থা বলে একটা কিছু অবশ্যই ছিল, যদিও শেষ পর্যন্ত তা ভেঙে যায়। এজন্য শক্তিবর্গের নিজেদের স্বার্থ সংক্রান্ত বিরোধ প্রধানত দায়ী, তবে একথাও সত্য যে, শক্তি সমবায় রক্ষণশীল পথে হাঁটতে চেয়েছিল। টমসনের ভাষায়, "The 'Congress System' reveals both the aims and methods of the forces of conservatism, and the increasing tensions that opened the doors to liberal and nationalist revolts"।[1]

আয়-লা-শ্যাপেল-এর কংগ্রেস ঃ ইয়োরোপীয় শক্তি সমবায়ের কার্যকলাপের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় যে 1818 খ্রিস্টাব্দ থেকে 1822 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে চারটি সম্মেলনে ইয়োরোপীয় দেশসমূহ মিলিত হয়েছিল। এই সম্মেলনগুলি অনুষ্ঠিত হয়েছিল যথাক্রমে আয়-লা-শ্যাপেল (Aix-la-Chapelle), ট্রপো (Troppan), লাইবাখ (Laibach) এবং ভেরোনা (Verona) শহরে। এই সম্মেলনগুলিতে চতুঃশক্তি স্বাক্ষরকারী চারটি দেশই উপস্থিত ছিল। এরপর 1824 খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গ শহরে (St. Petersburg) পঞ্চম সম্মেলন বসেছিল বটে কিন্তু তাতে ইংল্যান্ড যোগ দেয়নি। ততদিনে কংগ্রেস-ব্যবস্থা ভেঙে গেছে। আমরা পরপর প্রত্যেকটি অধিবেশন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে নিতে পারি ঃ

আয়-লা-শ্যাপেলের বৈঠক হয় 1818 খ্রিস্টাব্দে। আয়-লা-শ্যাপেল ফরাসি নাম, ফরাসি উচ্চারণ। শহরটি জার্মানিতে, হল্যান্ড এবং বেলজিয়াম সীমান্তে। শহরটির প্রাচীন জার্মান নাম আখেন (Aachen)। কিন্তু আয়-লা-শ্যাপেল— এই ফরাসি নামেই পরিচিত। এই কংগ্রেসের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ফ্রান্সকে আবার পূর্ণ ইয়োরোপীয় শক্তি হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া। মনে রাখা দরকার, ফ্রান্স ইতোমধ্যে তার প্রদেয় বিপুল ক্ষতিপূরণ মিটিয়ে দিয়েছিল এবং মিত্রশক্তির দখলদার বাহিনীও ফ্রান্স ত্যাগ করেছিল। চতুঃশক্তি উপলব্ধি করে যে ফ্রান্সের মতন বৃহৎ দেশকে শক্তি সমবায়ের বাইরে রেখে শক্তি সমবায় চলতে পারে না। এই ভাবনা বাস্তবোচিত। তাই ঐ সম্মেলনে ফ্রান্সকে চতুঃশক্তির সঙ্গে যুক্ত করে নেওয়াতে তারা পঞ্চশক্তিতে পরিণত হয়।

এছাড়া আয়-লা-শ্যাপেলের কংগ্রেসে আরও কতকগুলি কাজ হয়েছিল। যেমন, (ক) মোনাকো নামক ক্ষুদ্র দেশের রাজার বিরুদ্ধে সেখানকার প্রজারা অভিযোগ জানালে রাজাকে ভর্ৎসনা করা হয়। (খ) জার্মানির ব্যাডেন নামক স্থানের উত্তরাধিকারের সম-া এবং অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার ইহুদী প্রজাদের সমস্যার কথা কংগ্রেসে উত্থাপিত হয় এবং

1. ডেভিড টমসন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ. 135

কংগ্রেস সর্বসম্মতভাবে তা সমাধান করে। (গ) সুইডেনের রাজার বিরুদ্ধে নরওয়ে কুশাসনের অভিযোগ আনলে শক্তিসমবায় রাজা বারনাদোৎকে ভর্ৎসনা করে।

এই কংগ্রেসে রুশ জার প্রথম আলেকজান্ডার তাঁর প্রিয় ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত প্রস্তাব সামনে রাখলেও ইংল্যান্ড ও অস্ট্রিয়া তার বিরোধিতা করে। এছাড়া কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান তাৎপর্য ছিল বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধকে খানিকটা সামনে নিয়ে আসা। তবে আয়-লা-শ্যাপেলের কংগ্রেসে মতপার্থক্য যে দেখা যায়নি এমন নয়। যেমন দাস ব্যবসা (Slave trade) বন্ধ করবার জন্য ইংল্যান্ডের জাহাজ তল্লাসি চালাবার প্রস্তাব কেউ মানে নি। আবার ভূমধ্যসাগর থেকে জলদস্যু দূর করার জন্য নৌবহর দিয়ে সাহায্য করার রুশ প্রস্তাব ইংল্যাণ্ড মানে নি। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ এবং আন্তর্জাতিক সেনাবাহিনী গঠনের প্রস্তাব জার আলেকজাণ্ডারের খুব পছন্দ ছিল। তিনি তা উত্থাপন করেনও। ক্যাস্‌লরি এবং মেটারনিষের বিরোধিতার জন্য প্রস্তাব বাতিল হয়। বস্তুত পারস্পরিক সন্দেহের তখন থেকেই সূত্রপাত।

ট্রপোর কংগ্রেস : ইয়োরোপীয় শক্তি সমবায়ের আন্তর্জাতিক উদ্দেশ্যের পিছনে যে ফরাসি বিপ্লব প্রসূত পরিবর্তনের বিষয়ে ভীতি কাজ করেছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। মনে রাখা দরকার, মেটারনিষ যতই তাঁর পদ্ধতি প্রয়োগ করুন, ভিয়েনা সম্মেলন যাই চাক বা শক্তি সমবায় যাই পদক্ষেপ নিক; রক্ষণশীলতা এবং রাজনৈতিক স্থিতি সত্ত্বেও পরিবর্তনকামী বিপ্লবী আদর্শ তখনও কাজ করে যাচ্ছিল। শক্তিবর্গ যে ভীত ছিল তার প্রমাণ 1819 খ্রিস্টাব্দের ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্টে কতকগুলি আইন প্রণয়ন বা অস্ট্রিয়ার মেটারনিষের কার্লস্‌বাদ ডিক্রি (দমনমূলক আইন, যা জার্মান রাজ্যগুলিতে প্রযোজ্য হয়) জারি। তা সত্ত্বেও ইয়োরোপে বিপ্লব বা বিদ্রোহ স্তব্ধ হয়নি। স্পেনের রাজা ফার্দিনান্ড শক্তি সমবায়ের কাছে আবেদন জানায় যে, ন্যায্য অধিকার নীতি অনুসারে দক্ষিণ আমেরিকায় স্পেনীয় উপনিবেশগুলি তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হোক। রাশিয়া এই দাবি সমর্থন করলেও ইংল্যান্ডের আপত্তিতে তার নিষ্পত্তি হয়নি। তবে 1820 -তে নতুন বিপ্লবী অভ্যুত্থান পরিস্থিতির বদল ঘটায়।

যে পরিস্থিতিতে 1820-র অক্টোবর-নভেম্বরে ট্রপোর সম্মেলন বসে তা হলো (i) স্পেনবাসীরা বুরবোঁ বংশীয় রাজা সপ্তম ফার্দিনাণ্ডের বিরুদ্ধে সফল গণ অভ্যুত্থান ঘটিয়ে তাকে 1812 খ্রিস্টাব্দের উদারনৈতিক সংবিধানটি নতুন করে চালু করতে বাধ্য করান। এজন্য ফার্দিনান্ড ইয়োরোপীয় কনসার্টের সাহায্য প্রার্থনা করেন। (ii) 1820-র জুলাইতে ইতালির নেপলস্‌-একটি বিদ্রোহের ফলে রাজা প্রথম ফার্দিনান্ড উদারনৈতিক সংবিধান জারি করতে বাধ্য হন। তিনিও কনসার্টের কাছে সাহায্যের আবেদন জানান। এবং (iii) পর্তুগালের রাজা ষষ্ঠ জনের বিরুদ্ধে অনুরূপ বিদ্রোহ দেখা দেওয়ায় তিনিও

কনসার্টের কাছে সাহায্য প্রার্থী হয়েছিলেন। স্পেনে প্রজাবিদ্রোহের সংবাদে জার প্রথম আলেকজান্ডার সেখানে রুশ সৈন্য পাঠাবার প্রস্তাব বা যৌথ ব্যবস্থা নেবার কথা বললে ইংল্যাণ্ডের ক্যাস্‌লরি তাঁর বিখ্যাত স্মারকলিপি বা স্টেট পেপার ঘোষণা করে জানান যে, স্পেনের বিদ্রোহ সেই দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার এবং সেখানে হস্তক্ষেপ করার কোনও অধিকার শক্তি সমবায়ের নেই। মেটারনিখও প্রথমদিকে সম্মেলন আহ্বানে ইচ্ছুক ছিলেন না, কিন্তু নেপলস্‌ এবং পিয়েডমণ্টে গণবিক্ষোভ দেখা দিলে তিনি বিচলিত হন। ইতালিতে অস্ট্রিয়ার স্বার্থ জড়িত ছিল। তাই স্পেনের ব্যাপারে তিনি আভ্যন্তরীণ হস্তক্ষেপ না চাইলেও ইতালির ক্ষেত্রে সৈন্য পাঠানো জরুরি মনে করলেন। ইতোমধ্যে জার্মানিতে রক্ষণশীল নাট্যকার *কোৎবু* (Kotzebue) কার্ল স্যান্ড নামে এক বিপ্লবী ছাত্রের দ্বারা নিহত হলে জার আলেকজাণ্ডারও উদারনীতি ছেড়ে দেন। বিপ্লবী পরিস্থিতি দমনের জন্য সকলেই একমত হলে ট্রপোর সম্মেলন বসে।

1820-এর অক্টোবর-নভেম্বরে ট্রপোর সম্মেলনে যে ঘোষণাপত্র জারি হয় তাকেই ট্রপোর প্রোটোকল বলে। এতে বলা হলো যে, (i) রাজা সেচ্ছায় ও বিনা প্ররোচনায় যে সংবিধান প্রচলন করবেন একমাত্র সেই সংবিধানই বৈধ বলে বিবেচিত হবে। (2) যদি ইয়োরোপের কোনও দেশে বিপ্লবাত্মক আন্দোলন দেখা দেবার ফলে রাজা তাঁর ন্যায্য অধিকারে বঞ্চিত হন তাহলে সেই দেশকে কনসার্ট থেকে বহিষ্কার করা হবে। (3) যদি এই বিপ্লবী অভ্যুত্থানের ফলে প্রতিবেশী রাজ্যের শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে সেই দেশে বলপূর্বক সৈন্য পাঠিয়ে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার অধিকার শক্তি সমবায়ের আছে। এককথায় বলা যেতে পারে ট্রপোর ঘোষণাপত্র দ্বারা ইয়োরোপীয় শক্তি সমবায় বস্তুতপক্ষে ইয়োরোপের সকল প্রকার আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে তুলে নেয় এবং স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের সমর্থক হয়ে গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহ দমনের হাতিয়ারে পরিণত হয়। এ ব্যাপারে অস্ট্রিয়া, রাশিয়া এবং প্রাশিয়া ছিল একমত কিন্তু ফ্রান্স ছিল নিস্পৃহ এবং ইংল্যাণ্ড এই সিদ্ধান্তগুলির বিরোধিতা করেছিল।

ইংল্যাণ্ড এই ঘোষণাপত্রের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট আপত্তি জানায়। বস্তুতপক্ষে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং সাংবিধানিক রাজতন্ত্রে সংসদীয় ব্যবস্থা থাকায় ইংল্যাণ্ড রক্ষণশীলতা সমর্থন করতে পারেনি। ক্যাস্‌লরির মতে (ক) এই ঘোষণাপত্র চতুঃশক্তি চুক্তির আদর্শের বিরোধী তাই ইংল্যাণ্ড এতে যোগ দেবেনা; (খ) স্পেনের বিপ্লব যেহেতু সেদেশের নিজস্ব ব্যাপার তাই সেখানে হস্তক্ষেপ করলে তার সার্বভৌমত্ব নষ্ট হবে এবং ত্রুটিপূর্ণ নজির সৃষ্টি হবে। (গ) যদি শক্তি সমবায় আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে সৈন্য প্রেরণ করে তাহলে তা চতুঃশক্তি চুক্তির বিরোধী কাজ হবে। এবং (ঘ) অত্যাচারী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অধিকার প্রজাদের আছে।

ইংল্যাণ্ডের বিরোধিতা সত্ত্বেও ট্রপোর সম্মেলনে প্রস্তাবগুলি পাস করানো হলো ঠিকই তবে কনসার্টের ভিতরের ফাটল বাড়তে থাকে। তাই কেটেলবি লিখেছেন, শক্তি সমবায়ের বাঁশির গায়ে ফুটো দেখা দেয়।

লাইবাখের সম্মেলন ঃ ট্রপোর কংগ্রেসের সামনে উপস্থিত সমস্যাগুলির সম্পূর্ণ সমাধান না করেই তার অধিবেশন স্থগিত রাখা হয়েছিল। সেগুলি আবার তুলে আনা হলো লাইবাখের সম্মেলনে (1821 খ্রিঃ)। ইতোমধ্যে ব্রিটেনের আপত্তি সত্ত্বেও মেটারনিষ ইতালিতে সশস্ত্র বাহিনী প্রেরণ করেন কারণ ট্রপোর ঘোষণাপত্রে অস্ট্রিয়াকে সেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। অস্ট্রিয়ার সৈন্যদল বুরবোঁ বংশীয় রাজা প্রথম ফার্দিনান্দকে নেপলস্-এর সিংহাসনে পূর্বক্ষমতা সহ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। এর মধ্যে সার্ডিনিয়াতেও বিক্ষোভ দেখা দেয়। প্রথম ভিক্টর ইমানুয়েল তাঁর ভ্রাতা আলবার্ট ফেলিক্সকে সিংহাসন ছেড়ে দেন। চার্লস আলবার্টকে রিজেন্ট হিসাবে ঘোষণা করা হয়। উদারপন্থী চার্লস আলবার্ট রাজ্যের জন্য এক নতুন সংবিধান জারি করেন। কিন্তু অস্ট্রিয় বাহিনী এই উদারনৈতিক সংবিধান সহ আলবার্টের শাসন রদ করে এবং পুনরায় ফেলিক্সকে ফিরিয়ে আনেন। অস্ট্রিয়া নিজেও লমবারদি ও ভেনেশিয়াতে নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখে। এই লাইবাখ সম্মেলনেই মেটারনিষতন্ত্র জয়যুক্ত হয় যদিও তা ছিল ক্ষণস্থায়ী।

তাছাড়া গোলমাল পর্তুগালেও ছড়িয়ে পড়ে। রাজা ষষ্ঠ জন দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিলে ছিলেন। ফলে বিপ্লবী আন্দোলন বিস্তার লাভ করে। একটি অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতীয় সভা স্পেনের ধাঁচে একটি নতুন সংবিধান ঘোষণা করে, এক কক্ষ বিশিষ্ট জাতীয় সভা তৈরি হল, জনগণের সাম্য ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা স্বীকার করা হল এবং সামন্ততন্ত্রের বিলোপ সাধন করা হল। চার্চের বেশ কিছু সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করা হয়। 1822 -এর অক্টোবরে রাজা ষষ্ঠ জন দেশে ফিরে এই সংবিধান মেনে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েও পরে তা ভঙ্গ করেন, তখন ব্রিটেন হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয়।

ভেরোনার সম্মেলন ঃ ইয়োরোপীয় শক্তি সমবায়ের শেষ সম্মেলন বসে ইতালির ভেরোনা শহরে 1822 খ্রিস্টাব্দে। এর আগে ইংল্যাণ্ডে বিদেশ মন্ত্রী পদে বসেন ক্যানিং। তিনি মনে করতেন যে শক্তি সমবায়ে যোগ দিয়ে ইংল্যাণ্ডের ক্ষতি হয়েছে, তারা স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করতে পারেনি। টেমপারলির মতে ক্যানিং শক্তি সমবায়ের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছেদের কথা চিন্তা করেন যদিও ভেরোনার বৈঠকে ইংল্যাণ্ড ডিউক অফ ওয়েলিংটনকে প্রতিনিধি হিসেবে পাঠায়।

ইতোমধ্যে জাতীয়তাবাদী ও উদারপন্থী বিদ্রোহ আরও বহুস্থানে ছড়িয়ে পড়ে। আবার বিদ্রোহের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মিত্র শক্তির মধ্যে স্বার্থের সংঘাতও দেখা দেয়। বিদ্রোহ প্রসারিত হয়ে পড়ল স্পেন থেকে ইয়োরোপের দক্ষিণ প্রান্তে গ্রিস পর্যন্ত। ভেরোনা

সম্মেলনের সামনে দুটি প্রশ্ন ছিল বড়ো—গ্রিস এবং স্পেন। গ্রিসে তুরস্কের অটোমান সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দেয়। রাশিয়া গ্রীক খ্রিস্টানদের পক্ষ অবলম্বন করে গ্রিসে প্রবেশ করে তুরস্কের বিরুদ্ধে যেতে পারত। কিন্তু রাশিয়ার অগ্রগতি যদি পূর্ব ইয়োরোপে হয় তবে তা অস্ট্রিয়ার স্বার্থের বিরোধী হবে। ইংল্যাণ্ডও গ্রিসের স্বাধীনতা চাইত কিন্তু রাশিয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি একেবারেই চাইত না। সুতরাং ভেরোনার সম্মেলনে অস্ট্রিয়া এবং ইংল্যাণ্ড লক্ষ্য রাখে যাতে কোনও মতেই রাশিয়া উদ্যোগ নিতে না পারে। শেষ পর্যন্ত ব্রিটেনের মধ্যস্থতায় গ্রিসে রুশ হস্তক্ষেপ বন্ধ হয়, এবং তুরস্কের সুলতানের কাছ থেকে সংস্কারের প্রতিশ্রুতি আদায় করা হয়। গ্রিক বিদ্রোহ অবশ্য কোনও হস্তক্ষেপ ছাড়াই চলতে থাকে।

স্পেনের গোলযোগ ছিল অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অস্ট্রিয়া স্পেনের বিদ্রোহ দমন করার জন্য উৎসুক ছিল। ফ্রান্সের স্বার্থ স্পেনের রাজ পরিবারের সঙ্গে জড়িত ছিল। ফ্রান্সে ঐ সময় নরমপন্থী সরকার বদল হওয়ার ফলে স্পেনের আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলায় ফ্রান্স হস্তক্ষেপ করতেও আগ্রহী হয়। ইতোমধ্যে ক্যাস্‌লরি আত্মহত্যা করলে ব্রিটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হন ক্যানিং। ইংল্যাণ্ডের আপত্তি সত্ত্বেও স্পেনের বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রস্তাব ভেরোনায় পাস হয়। মেটারিনষ রক্ষণশীল শক্তিগুলির সমর্থন পেয়ে ইংল্যাণ্ডকে কোণঠাসা করেন। ফরাসি সেনা স্পেনে প্রবেশ করে এবং স্পেন ও পর্তুগালের উদারনৈতিক বিদ্রোহ দমন করে। স্বৈরতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তিত হয়। ভেরোনায় ফরাসি প্রতিনিধি মর্মরেন্সি এবং শাতোব্রিয়াঁ ছিলেন হস্তক্ষেপের পক্ষে। স্বৈরাচারী বুরবোঁ রাজা সপ্তম ফার্দিনাণ্ড স্পেনে বসেন। এরপর স্পেনের দক্ষিণ আমেরিকায় উপনিবেশগুলিতে সাহায্যের প্রশ্ন উঠলে ইংল্যাণ্ড ভেরোনার বৈঠক বর্জন করে চলে যায়। ইয়োরোপীয় শক্তি সমবায়ের পতন আসন্ন হয়ে পড়ে।

ইয়োরোপীয় শক্তি সমবায়ের পতন ঃ ইয়োরোপীয় শক্তি সমবায় ভেরোনার সম্মেলন (1822)এর পরেই ভেঙে পড়ে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্যানিং ইয়োরোপীয় শক্তি সমবায়ের বিরুদ্ধে যে আপত্তি জানান এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি *জেমস মনরো* (James Monroe) আমেরিকার স্পেনীয় উপনিবেশগুলির বিদ্রোহে ইয়োরোপীয় শক্তি সমবায়ের সম্ভাব্য হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে যে বিখ্যাত নীতি ঘোষণা করেন, তার ফলে শক্তি সমবায় ভেঙে যায়। মনরো-নীতির (Monroe Doctrine) মূলকথা ছিল, আমেরিকা আমেরিকাবাসীদের জন্য। এই নীতি ঘোষিত হয় 1823 খ্রিস্টাব্দে।

বস্তুত, ভেরোনা সম্মেলনের পরেই ক্যানিং আশঙ্কা করেছিলেন যে শক্তি সমবায় দক্ষিণ আমেরিকায় সৈন্য পাঠাতে পারে, তাই তারা স্পেনের বিদ্রোহী উপনিবেশগুলিকে স্বীকৃতি দেন। ইংল্যাণ্ডের নৌবহরগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয় অ্যাটলান্টিক মহাসাগরে

শক্তি সমবায়ের জাহাজগুলিকে আটকাবার জন্য। তারপরই মার্কিন প্রেসিডেন্ট মনরোর বিখ্যাত ঘোষণা করেন, আমেরিকায় ইয়োরোপের হস্তক্ষেপ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বরদাস্ত করবে না। স্পষ্টভাষায় মনরো বলেন, 'We should consider any attempt on the part of these absolute monarchies of Europe to extend their systems to any portion of this hemisphere as dangerous to our peace and safety'[1] এর পর মেটারনিষ গুটিয়ে গেলেন। এর পরও গ্রিসের বিদ্রোহের সমস্যা সমাধানের জন্য জার প্রথম আলেকজাণ্ডার রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গে শক্তি সমবায়ের পঞ্চম সম্মেলন আহ্বান করেন। সেন্ট পিটার্সবার্গের বৈঠক (1824) প্রকৃত প্রস্তাবে ইয়োরোপীয় শক্তি সমবায়ের সম্মেলন বলা যায় না, কারণ ইংল্যাণ্ড ঐ সম্মেলন বর্জন করেছিল। এই সম্মেলনে রাশিয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে গ্রিসের পক্ষ অবলম্বন করতে চাইলে অস্ট্রিয়ার বিরোধিতায় কোনও প্রকার মীমাংসায় উপনীত হওয়া গেল না। বরং সিদ্ধান্ত হলো যে, তুরস্ক হলো এশিয়ার দেশ, গ্রিস হলো তুরস্কের রাজ্য এবং তাই তুরস্কের সমস্যার সঙ্গে শক্তি সমবায়ের কোনও সম্বন্ধ নেই। কার্যত এরপর আর ইয়োরোপীয় শক্তি সমবায় বলে কিছু অবশিষ্ট ছিল না।

ইয়োরোপীয় শক্তি সমবায়ের প্রকৃতি : ইয়োরোপীয় শক্তি সমবায় জনগণের প্রতিনিধির অথবা গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী সদস্যদের সংস্থা নয়, বরং ছিল রক্ষণশীল রাষ্ট্রনীতিবিদদের সংগঠন। পাঁচটি দেশের মধ্যে একমাত্র ইংল্যাণ্ডই ছিল গণতান্ত্রিক দেশ। রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজান্ডার একদা কিছুটা উদারনৈতিক ছিলেন বটে তবে রাজত্বের শেষ দিকে তিনিও প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে ওঠেন। আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার জন্য স্থাপিত হয়েও মেটারনিষের নেতৃত্বে শক্তি সমবায়ের চরিত্র হয়ে উঠেছিল পরিবর্তন বা গণঅভ্যুত্থান বিরোধিতার হাতিয়ার। শক্তি সমবায়ের চরিত্র বদলের ফলে শক্তি সমবায় হলো যুগের পক্ষে অপাংক্তেয়। ডেভিড টমসন দেখিয়েছেন যে, বিভিন্ন রাজ্যে যে সব অভ্যুত্থান হয়েছে তা সর্বদা গণতান্ত্রিক নয়, শুধু বিদেশী নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে কিংবা উদারনৈতিক সংবিধান প্রবর্তনের পক্ষেই জনগণ বিক্ষোভ দেখায় তবু শক্তিসমবায় নিজেদের চরিত্রের জন্য সেগুলির বিরুদ্ধতা করে।

শক্তি সমবায়ের ব্যর্থতার কারণ : ইয়োরোপীয় শক্তি সমবায়ের সংগঠন প্রকৃতি ও কার্যকলাপ খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলেই তাঁর বিফলতার কারণগুলি খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। প্রথমতঃ, নেপোলিয়ানের আক্রমণের সম্ভাবনা দূর হলে ইয়োরোপীয় শক্তি সমবায়ের প্রয়োজনীয়তা কমে যায়। দ্বিতীয়তঃ, ইংল্যাণ্ড ছিল নৌশক্তিতে বলীয়ান। শক্তি সমবায়ের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের স্বার্থের ভিন্নতা ছিল। বস্তুতঃ সাংবিধানিক রাষ্ট্র ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে অস্ট্রিয়া,

---

1. C.D. Hazen, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ 51

প্রাশিয়া, রাশিয়ারই আদর্শগত বিরোধ ছিল। তৃতীয়তঃ, শক্তি সমবায়ের সদস্যদের মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব নগ্নভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল।[1] চতুর্থতঃ, 1822 এর পর শক্তি সমবায়ের প্রতি ক্যানিং -এর আস্থা হ্রাস পায়।[2] পঞ্চমতঃ, মেটারনিষের নেতৃত্বে শক্তি সমবায় হয়ে উঠেছিল এক স্বৈরাচারী রাষ্ট্রসংঘে। ষষ্ঠতঃ, শক্তি সমবায় ছিল ফরাসি বিপ্লবের আদর্শ তথা গণতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি আদর্শের বিরোধী। সপ্তমতঃ, ইংল্যাণ্ডের অসহযোগিতা ছিল এই শক্তি সমবায়ের পতনের বড়ো কারণ। অবশ্য এজন্য ইংল্যাণ্ডকে একা দায়ী না ক'রে সকলকেই দায়ী করা উচিত। অষ্টমতঃ, শক্তি সমবায়ের হস্তক্ষেপের নীতি, স্বৈরাচারী সরকারগুলিকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা, জাতীয় ভাবধারাকে দমন করে রাখা ইত্যাদি দীর্ঘস্থায়ী হওয়া সম্ভব ছিল না। কারণ উনিশ শতকে পরিবর্তনমুখী চিন্তা ও কর্ম বন্ধ করা যায়নি। নবমতঃ, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের হুঙ্কার শক্তি সমবায়কে সংকুচিত করে দেয় এবং শেষ পর্যন্ত জুলাই বিপ্লব (1880) এর পর থেকে সমস্ত মেটারনিষতন্ত্রই ভেঙে যেতে থাকে। শক্তি সমবায়ের তথাকথিত শান্তি প্রচেষ্টা এবং সমস্যা হলে সম্মেলনে আলোচনা করে মিটিয়ে ফেলার উচ্চ আদর্শ আদৌ বাস্তবে প্রতিফলিত হয়নি। তবে শক্তি সমবায়ের গুরুত্ব একেবারেই ছিল না বলা চলে না। কংগ্রেস কূটনীতি আংশিক সফল বলা যেতে পারে। ইয়োরোপীয় শক্তি সমবায় যুদ্ধ না করে শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের পথ দেখিয়েছিল কিন্তু বৃহৎ শক্তিবর্গের স্বার্থের জন্যই তা সফল হয়নি, ডেভিড টমসনের মতে, "In so far as the Congress system meant that the great powers of Europe could usefully meet from time to time to resolve disputes among them and to preserve a certain balance of power in the Continent, it met with partial success and helped to keep the peace।"

৪। মেটারনিষ পদ্ধতি

মেটারনিষ ব্যবস্থা কাকে বলে ঃ ইয়োরোপের ইতিহাসে 1815 খ্রিস্টাব্দে নেপোলিয়ানের পতন এবং ভিয়েনা সম্মেলন থেকে 1848 খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের সময়কাল পর্যন্ত যুগকে সাধারণভাবে 'মেটারনিষের যুগ' বলা হয়ে থাকে। মেটারনিষ যেভাবে বিপ্লব-প্রসূত আদর্শের এবং বাস্তব অবস্থার মোকাবিলা করে প্রাক্‌বিপ্লব ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিলেন বা অস্ট্রিয়ার তথা হ্যাপস্‌বার্গ সাম্রাজ্যের সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার মোকাবিলা করেন এবং তার রক্ষণশীল ব্যবস্থা দ্বারা ইয়োরোপকে চালিত করার চেষ্টা করেন, তাকেই 'মেটারনিষ পদ্ধতি' (Metternich System) বলা হয়ে থাকে।

---

1. Ketelby, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ 185
2. J. Droz, *Europe Between Revolutions*, p 221

মেটারনিষ আদৌ কি কোনও 'ব্যবস্থা' বা 'পদ্ধতির' প্রবর্তন করেছিলেন? এ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক আছে। কতকগুলি নীতির ভিত্তিতে নির্ধারিত কার্যবিধি সমন্বিত পদ্ধতি অবশ্যই প্রবর্তন করেন নি। তবে মেটারনিষের চিন্তাধারার মধ্যে সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি অবশ্যই ছিল। এই চিন্তাধারার উৎস ছিল রক্ষণশীলতা (Conservatism) এবং বিপ্লব-প্রসূত চিন্তার বিরোধীতা। এই চিন্তার বাস্তব রূপদানের জন্য তিনি সচেতন ও সক্রিয় ছিলেন। এই কারণে 'মেটারনিষ পদ্ধতি' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে।

মেটারনিষ মনে করতেন "বিপ্লব এক ব্যধি যার প্রতিকার করা প্রয়োজন"। তিনি নিজে কোনও ব্যবস্থার কথা লেখেন নি। মেটারনিষ প্রগতি বিরোধী— এই মতের অন্যতম আদি প্রবক্তা ট্রিটস্‌কে। নিজের আত্মজীবনীতে অবশ্য মেটারনিষ নিজেকে ইয়োরোপের রক্ষাকর্তা হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন। রিটার ফন সরবিকের মতে মেটারনিষ নিছক সুবিধাবাদী এবং পুরোপুরি প্রগতি-বিরোধী অথবা ইয়োরোপের রক্ষাকর্তা কোনওটাই ছিলেন না। সাম্প্রতিক গবেষণায় ইয়োরোপের গবেষকগণ দেখিয়েছেন যে, মেটারনিষের কোনও 'সিস্টেম' থাক বা না থাক তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী রক্ষণশীল ব্যবস্থা বজায় রাখার চেষ্টা করেছিলেন।[1] এর অর্থ, প্রাক্ ফরাসি-বিপ্লব সমাজব্যবস্থা বজায় রাখা। ভিয়েনা-সম্মেলন-সৃষ্ট সীমানা বজায় রাখা এবং ইয়োরোপীয় যুদ্ধ এড়িয়ে চলা।

মেটারনিষ ব্যবস্থার প্রয়োগ ঃ একজন রক্ষণশীল রাজনীতিবিদ হিসেবে মেটারনিষ ফরাসি বিপ্লব তথা নেপোলিয়ান যে-পরিবর্তন ইয়োরোপে নিয়ে এসেছিলেন, তাকে উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। ভিয়েনা সম্মেলনের মধ্যে আমরা সেই ব্যবস্থারই বাস্তব রূপ দেখতে পাই। আর এ কাজ করতে গেলে যে উদারপন্থা ও জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র সবকিছুরই বিরোধিতা করতে হবে, তাও স্বাভাবিক। তবে ভিয়েনা সম্মেলনে গৃহীত কর্মসূচি যাতে স্থায়ী হয় সেজন্য কতকগুলি কাজ করা জরুরি ছিল। সুতরাং রাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে মৈত্রী স্থাপন থেকে শুরু করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নজরদারির মাধ্যমে সামান্যতম অভ্যুত্থান, বিপ্লব বা প্রগতিবাদী কর্মসূচিও যাতে মাথা চাড়া দিতে না পারে এবং অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়, তথাকথিত 'মেটারনিষ ব্যবস্থা' প্রয়োগের মাধ্যমে তিনি তাই করতে চেয়েছিলেন। *কিটেল* (Kittel) -এর মতে তিনি এক এক দেশে তার ব্যবস্থা এক এক ভাবে নিয়েছিলেন।

মনে রাখা দরকার, ক্লেমেন্স ফন মেটারনিষ পোষাক পরিচ্ছদ ও বাচনভঙ্গীতে অত্যন্ত মার্জিত হলেও চতুর, আত্মম্ভরী এবং দাম্ভিক ছিলেন। চমৎকার ভাষণ দিতে পারলেও

---

1. দ্র. Alan Sked, *"Metternich and the Federalist Myth"*, in A. Sked & C. Cook (eds.) *Crisis and Controversy: Essays in Honour of Prof A. J. P. Taylor;* Robert A. Kann, *"Metternich: A Reappraisal of his impact in International Relations"*, Journal of Modern History, vol 32; P. Viereck, *Conservatism Revisited.*

প্রয়োজনে কঠোর কাজ করতে কুণ্ঠিত হতেন না। আবার ন্যায্য অধিকার, শাসন ও সিংহাসনে রাজার দৈব অধিকারতত্ত্ব, অভিজাততন্ত্র, সামন্ততন্ত্র, যাজকতন্ত্র কোন কিছুকেই তিনি খারাপ বলে মনে করতেন না। বিপ্লবের নবোদিত ভাবধারা অভিজাততন্ত্র তথা পুরোনো ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে সভ্যতার ক্ষতি করেছে বলে তিনি মনে করতেন।[1] এজন্য ভিয়েনা সম্মেলনের পর ইয়োরোপের কোথাও যাতে বিপ্লবী কার্যকলাপ আবার শুরু না হয় সেজন্য তিনি গোপনীয় খবর সংগ্রহ করতেন। এই কাজ করার জন্য অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা শহরে 'কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশন' গঠন করেছিলেন।[2] এছাড়া ইয়োরোপীয় শক্তি সমবায়কে মেটারনিষ নিজ উদ্দেশ্যে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছিলেন যদিও ইংল্যাণ্ডের অসহযোগিতায় কয়েক বছরের মধ্যেই তা ভেঙে পড়ে। তবে ট্রপোর ঘোষণাপত্রটি প্রকৃতপক্ষে রক্ষণশীল মেটারনিষেরই জয় সূচিত করেছিল। ইংল্যাণ্ডের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে তিনি ইতালিতে সৈন্যদল পাঠিয়েছিলেন।

বস্তুত দুটি স্তরে আমরা মেটারনিষতন্ত্রের প্রয়োগ করার চেষ্টা লক্ষ্য করি। ইয়োরোপীয় শক্তি সমবায়ের মাধ্যমে ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে সাংবিধানিক আন্দোলন তথা বিপ্লবী আন্দোলন দমনের চেষ্টা। এজন্যই স্পেন, পিয়েডমণ্ড বা নেপলস্-এ ফরাসি ও অষ্ট্রিয় বাহিনী ঢুকে বিপ্লবী আন্দোলন দমন করেছিল। তবে ইংল্যাণ্ডের আপত্তিতে দক্ষিণ আমেরিকার স্পেনের উপনিবেশে বিদ্রোহ দমনে কনসার্টকে মেটারনিষ ব্যবহার করতে পারেন নি। পরে ইংল্যাণ্ডের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াতে এবং আমেরিকার মনরোর নীতি ঘোষণার ফলে ইয়োরোপীয় শক্তি সমবায়ই শক্তিহীন হয়ে পড়ে। এরপর মেটারনিষ অষ্ট্রিয়ার আভ্যন্তরীণ নীতিতে তাঁর ব্যবস্থা প্রয়োগ করে হ্যাপস্‌বার্গ সাম্রাজ্যকে বিপ্লব থেকে রক্ষা করতে পেরেছিলেন। এই ব্যবস্থাকে অনেকটা পুলিশ রাষ্ট্রের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। এব্যাপারে তাঁর সহযোগী ছিলেন সেড নিৎস্‌কি। ইচ্ছামত গ্রেপ্তার, গোপন বিচার, দণ্ডদান, সেন্সর প্রথা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা লোপ, বিদেশী পুস্তক পরীক্ষা করে অনুমতি, শিক্ষাব্যবস্থার উপর নজরদারি এবং জাতি গোষ্ঠীর বিবাদকে কাজে লাগানো ইত্যাদি হল পুলিশী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য।

তবে মেটারনিষ পদ্ধতির প্রয়োগ অষ্ট্রিয় সাম্রাজ্যের বাইরে জার্মানি এবং ইতালিতেও প্রয়োগ করা হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল অষ্ট্রিয়-হাঙ্গেরীর হ্যাপস্‌বার্গ সাম্রাজ্যের চারপাশে একটি দুর্ভেদ্য বিপ্লবী-আদর্শ বিরোধী পরিমণ্ডল গড়ে তোলা। জার্মানি ছিল অষ্ট্রিয়ার প্রতিবেশী এবং অঙ্গ রাজ্য। মেটারনিষ তাঁর রক্ষণশীল চিন্তাধারা অনুযায়ী তার ব্যবস্থা জার্মানিতে প্রয়োগের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এই কারণেই ভিয়েনা কংগ্রেসে

1. Jack Droz, *Europe Between Revolutions* (1815-1848)

2. John Lowe, *The Concert of Europe: International Relations (1814-1870)*, Hodder & Stoughton, London, 1991, p.73

জার্মান জাতীয়তাবাদী নেতা স্টাইন জার্মান ঐক্যের যে পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন তা বাতিল করে মেটারনিষ জার্মান রাজ্যগুলিকে নিয়ে 39টি রাজ্যের এক ফেডারেশন বা যুক্তরাষ্ট্র (Bund) গঠন করেন এবং এই যুক্তরাষ্ট্রর সভাপতি হন অস্ট্রিয়া। অস্ট্রিয়ার কাজই ছিল জার্মানিতে যাতে বিপ্লবী ভাবধারা, তথা উদারনীতিবাদ, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ইত্যাদি আদর্শ ছড়িয়ে পড়তে না পারে তা লক্ষ্য রাখা। মেটারনিষ বিশেষভাবে চেষ্টা করেছিলেন ছোট জার্মান রাজ্যগুলি উপর নিজের ব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়ার। প্রাশিয়ার রাজা তৃতীয় ফ্রেডারিক উইলিয়াম যাতে কোনও রকম উদারনৈতিক সংবিধান চালু না করেন সেজন্যও তিনি সম্রাটের উপর ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেন। বস্তুতপক্ষে মেটারনিষ জার্মানির সর্বত্রই যাতে সাংবিধানিক রাজতন্ত্র (Constitutional Monarchy) প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, সে-দিকে লক্ষ্য রেখেছিলেন। এজন্য এক শক্তিশালী রাজতান্ত্রিক জোট তৈরি করার দরকার ছিল। তবে এতদ্‌সত্ত্বেও জার্মানির অনেক রাজ্যে—উত্তর বা পূর্ব দিকের রাজ্যগুলিতে না হলেও দক্ষিণ জার্মানির রাজ্যগুলিতে ফরাসি বিপ্লবের প্রভাব ছিল গভীর। ভিয়েনা সম্মেলনের ফলে জার্মান জাতীয়তাবাদীরা সর্বত্রই হতাশ হয়েছিলেন। জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও উদারনৈতিক ভাবধারা ছড়িয়ে পড়ে। তারই প্রভাবে কার্ল স্যাণ্ড নামক ছাত্র কোৎসবু নামক রক্ষণশীল ব্যক্তিকে হত্যা করলে অবস্থা চরমে ওঠে এবং ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভের জবাবে 1819 -এর সেপ্টেম্বরে মেটারনিষ তাঁর কুখ্যাত কার্লস্‌বাদ ডিক্রি বা দমনমূলক আইন জারি করনে। শুরু হলো কঠোর সেন্সর প্রথা, উদারপন্থী ছাত্র-অধ্যাপকদের নিগ্রহ করা। বারশেনশাখট নামক উদারপন্থী সংগঠন নিষিদ্ধ করা হয়। এমনকি নিষিদ্ধ করা হয় অনেক রাজনৈতিক সংগঠন। রাজনৈতিক বিক্ষোভ ইত্যাদি লক্ষ্য রাখার জন্য মেইনৎস্‌ শহরে এক কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়।

ইতালিতেও মেটারনিষ অনুরূপ রক্ষণশীল ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। জার্মানিতে তবু এক শিথিল যুক্তরাষ্ট্র গড়ে তোলা হয়েছিল; ইতালিতে তাও হয়নি। সেখানে উত্তর ইতালির লম্‌বারদি ও ভেনেশিয়া-কে অস্ট্রিয়ার প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে রাখা হলো। ইতালিকে একটি ভৌগোলিক সংজ্ঞায় (Geographical expression) পরিণত করা হলো। জাতীয়তাবাদকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা হয়। মধ্য ইতালির হ্যাপসবার্গ শাসকরা ছিল তাঁর ক্রীড়নক মাত্র। সুতরাং ইতালির বহু অঞ্চলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে মেটারনিষের গুপ্ত পুলিশ বাহিনী দমনপীড়ন চালাতেন। অনেক জায়গায় জার্মান ও স্লাভ কর্মচারি নিয়োগ করা হত। অর্থাৎ নেপোলিয়ানের আমলে যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগের যে মাপকাঠি ছিল মেটারনিষ তা বাতিল করে দেন। নেপোলিয়ানের আমলের জনহিতকর কার্যাবলীও বন্ধ হয়ে যায়। এই দমনপীড়নের বিরুদ্ধে ইতালিতে বিক্ষোভ শুরু হয়।

গড়ে ওঠে অনেক গুপ্ত সমিতি (Secret Society) যেগুলির মধ্যে কারবোনারি (Carbonari) ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 1820-21 খ্রিস্টাব্দে ইতালির বিভিন্ন অঞ্চলে বিপ্লবী অভ্যুত্থান ঘটলে মেটারনিষ বহিরাগত অস্ট্রিয় সৈন্যপাঠিয়ে সেই আন্দোলন বলপূর্বক দমন করেন।

ইতালিতে সৈন্য পাঠানো ইংল্যাণ্ডের মনঃপূত ছিল না। তারা কিছু দিন পরেই শক্তি সমবায় ছেড়ে বেরিয়ে আসে। 1822 খ্রিস্টাব্দের ভেরোনা সম্মেলনের পরে 'কনসার্ট' কার্য ভেঙে যায়। মেটারনিষের তথাকথিত 'স্থিতাবস্থা' (Statusquo) বজায় রাখার ব্যবস্থাও দুর্বল হতে থাকে। 1830 খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে ফ্রান্সে বিপ্লব দেখা দেয়, ন্যায্য অধিকারের ধ্বজাধারী বুরবোঁ বংশের বিদায় হয় এবং ফ্রান্সে আবার প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মেটারনিষ ব্যবস্থা এক বিরাট ধাক্কা খায়। একই বৎসরে বেলজিয়ামের স্বাধীনতা ঘোষণাও মেটারনিষতন্ত্রের উপর প্রবল আঘাত হানে। তারপর 1848 খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে যখন ফ্রান্সে বিপ্লব শুরু হয় এবং ক্রমে ইয়োরোপের নানা স্থানে বিপ্লবের ঢেউ আছড়ে পড়ে, তার পরিণতিতে তথাকথিত মেটারনিষতন্ত্র তো সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েই, স্বযং মেটারনিষকেই তাঁর প্রিয় শহর ভিয়েনা ছেড়ে প্রাণ নিয়ে লণ্ডনে পালিয়ে যেতে হয়। প্রতিক্রিয়ার দুর্গ এই তাসের ঘরের মত ছত্রাকার হয়ে পড়ে।

৫। রক্ষণশীলতার ব্যর্থতার কারণ

1815 খ্রিস্টাব্দ থেকে 1848 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যে যুগ তাকে সাধারণত 'মেটারনিষের যুগ' বলা হত। একদিক থেকে দেখলে কথাটি সত্যি। কারণ 1815 খ্রিস্টাব্দে ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ানের পতনের পর তিনি নিজেকে 'নেপোলিয়ান বিজেতা' বলে গর্ব অনুভব করতেন। যদিও কথাটি পুরোপুরি সঠিক নয়। ফ্রান্সকে হারাবার পশ্চাতে ইংল্যাণ্ডের কৃতিত্ব অস্ট্রিয়ার চেয়ে বেশি। আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে ইংল্যাণ্ড, অস্ট্রিয়া, রাশিয়া এবং প্রাশিয়া— এই চতুঃশক্তিরই কৃতিত্বে নেপোলিয়ানের পতন। তবু নিজের কূটকৌশল, ব্যক্তিত্ব এবং বাক্‌পটুতা দ্বারা 1815-র পরে অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলার (যে পদে ছিলেন 1809 থেকে 1848 পর্যন্ত) থেকে ক্রমে ইয়োরোপের ভাগ্য নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠেছিলেন তিনি। এজন্যই *H.A.L. Fisher* লিখেছিলেন, "In the counsels of autocrats, his (Metternich's) was the directing mind so that the period between 1815 and 1848 has not unjustly been called the Age of Metternich".

কিন্তু আবার অন্যদিক থেকে বলতে গেলে 1815-48 খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী যুগকে মেটারনিষের যুগ বলা অতিকথন এবং অসঙ্গত। মেটারনিষ মানেই রক্ষণশীলতা। কিন্তু 1815-48 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ইয়োরোপে কি শুধুই রক্ষণশীল প্রবণতা ছিলো? বরং ডেভিড

টমসন ঠিকই লিখেছেন যে ঐ যুগে দুটি পরস্পর বিরোধী শক্তি কাজ করেছে। নানা টানাপোড়েনের মধ্যে এটিও উল্লেখযোগ্য—টমসনের ভাষায় "There existed within Europe a further tension between forces of continuity and forces of change"। টমসন আরও লিখেছেন, "The conflicts between these opposing forces were to dominate the generation after Waterloo"।

তাহলে বরং বলা যেতে পারে 1815 থেকে 1848 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত একদিকে যেমন রক্ষণশীলতা, স্থিতাবস্থা বজায় রাখা, পুরাতনতন্ত্রকে আঁকড়ে ধরা, বিপ্লবী ভাবাদর্শ দমন ইত্যাদি স্থিতাবস্থার উপাদান সমূহ ছিল, তেমনি গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, প্রজাতন্ত্র তথা সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার আদর্শ মরে যায় নি। উদারনৈতিকতার মধ্যে পরিবর্তন শীলতার উপাদানসমূহও ছিল।

তবে একথা ঠিক প্রথম দিকে জয়যুক্ত হয়েছিল রক্ষণশীলতাই, যার প্রতিভূ ছিলেন মেটারনিষ। অবশ্য পিয়েতর ভিয়েক তাঁর 'মেটারনিষ রিকনসিডার্ড' গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে এজন্য শুধু তাকেই দোষ দেওয়া অর্থহীন। অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার সম্রাটদ্বয় এজন্য প্রধানত দায়ী। আধুনিক কোনও কোনও ঐতিহাসিকও তেমন মত প্রকাশ করেছেন। তবে মেটারনিষ যে ভিয়েনা সম্মেলন, ইয়োরোপীয় শক্তি সমবায় এবং তাঁর ব্যবস্থার মাধ্যমে রক্ষণশীলতা বজায় রাখতে এবং বিপ্লবী জাতীয়তাবাদকে স্তব্ধ করতে চেয়েছিলেন, তা অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু 1848 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে রক্ষণশীলবাদী শক্তিগুলি নতুন যুগের আগমনকে ঠেকাতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। পরস্পর বিরোধী স্বার্থ সংঘাতের ফলে শেষ পর্যন্ত মেটারনিষতন্ত্র এবং স্থিতাবস্থার উপাদান (forces of continuity) বিফল হয়। এক্ষেত্রে বিফলতার কারণগুলি অনুসন্ধান করা যেতে পারে।

ইয়োরোপীয় শক্তি সমবায় কেন ব্যর্থ হলো তার কারণ খোঁজা অপেক্ষাকৃত সহজ। এগুলি হলো (১) শক্তি সমবায় গঠনের ত্রুটি (২) ইংল্যাণ্ডের অসহযোগিতা (৩) নৌ-শক্তিমান ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে অস্ট্রিয়া-ও রাশিয়ার বিরোধ (৪) কনসার্টের সদস্যদের মধ্যে আদর্শগত বৈষম্য (৫) কনসার্টের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সংঘাত ও স্বার্থপরতা (৬) শক্তিসমবায়ের মাধ্যমে সংস্কার প্রচেষ্টা না করে রক্ষণশীলতার যন্ত্রে পরিণত করে বিভিন্ন দেশের উদারনৈতিক বিক্ষোভ ও জাতীয়তাবাদ দমন এবং (৭) আমেরিকার বিরোধী মনোভাব।

মেটারনিষতন্ত্র বা মেটারনিষ পদ্ধতি কেন ব্যর্থ হলো তা বলার আগে দুটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, (ক) *কেটেলবি* ঠিকই লিখেছেন; রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 1815 থেকে 1850 পর্যন্ত সময় যতটা আশা-আকাঙ্ক্ষার যুগ, ততটা কর্ম সাফল্যের যুগ নয় (..... 'The period frorm 1815 to 1850 was one of aspirations rather than of

achievements)'। পরস্পর বিরোধী স্বার্থসংঘাতই ঐ যুগে বড়ো এবং (খ) রক্ষণশীলতার ব্যর্থতা মানেই প্রগতিশীলতার জয় জয়কার নয়। যাই হোক, রক্ষণশীলতার ব্যর্থতার প্রথম কারণ সমকালীন যুগের ভাবধারাকে অস্বীকার। দ্বিতীয়তঃ, মেটারনিষ পদ্ধতিতে সংস্কার-বিমুখতা। আর ছিল নেতিবাচক মনোভাব। তৃতীয়তঃ, মেটারনিষ তাঁর পদ্ধতির প্রয়োগের ক্ষেত্রে ইয়োরোপের সব দেশের সাহায্য পাননি। চতুর্থতঃ, যুদ্ধ দূর করে ইয়োরোপকে তিনি শান্তি এনে দিয়েছিলেন সত্য কিন্তু অস্ট্রিয়ার স্বার্থ তিনি সর্বদা প্রথমে ভাবতেন। পঞ্চমতঃ, পুরাতনতন্ত্রের ক্ষয়ে যাওয়া বোতলে পরিবর্তনের তাজা সুরা ধরে রাখা সম্ভব ছিল না। জুলাই বিপ্লব, ফেব্রুয়ারি বিপ্লবে তার সূচনা দেখা গিয়েছিল। মেটারনিষের পতনের পর জার্মানি ও ইতালির ঐক্যে তার পরিণতি দেখা গেল। বাস্তব অবস্থা উপলব্ধি করতে না পারাই প্রতিক্রিয়াশীল নীতির বিফলতার প্রধান কারণ।

অধ্যায় ৫

জাতীয়তাবাদ, উদারপন্থা এবং বিপ্লব

(Syllabus: *Nationalism, Liberalism and the Revolutions of 1830 and 1848*)

১। বিপ্লবোত্তর ইয়োরোপে জাতীয়তাবাদ, উদারপন্থা ও বিপ্লব

ফরাসি বিপ্লবোত্তর ইয়োরোপের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল জাতীয়তাবাদের নতুন ধারণা এবং নতুন সংজ্ঞা। এই নব-চেতনা ইয়োরোপে ছড়িয়ে পড়ে এবং জয়যুক্ত হতে থাকে ফরাসি বিপ্লব আর নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্যের হাত ধরে। *ডেভিড টমসন* লিখেছেন, 'It was first launched upon its course of triumphant development throughout Europe by the French Revolution and the Napoleonic Empire।'[1] কিভাবে? তা বুঝতে হলে জাতীয়তাবাদ বলতে কি বোঝায় এবং তার পূর্বতন সংজ্ঞার সঙ্গে তার কি পার্থক্য তা বোঝা দরকার।

'জাতি' বলতে আধুনিক যুগের গোড়ার দিক থেকে বর্ণনা করা যেতে পারে, জনগণের সেই সম্প্রদায় যারা একত্রে বসবাস করে এবং এই 'সমষ্টিগত চেতনা' তারা লাভ করেছে: (ক) সমষ্টির সকলের একই বাসভূমি এই বিশ্বাস থেকে এবং (খ) একই ঐতিহ্য এবং ঐতিহাসিক কাল পরম্পরার মধ্যে দিয়ে যাওয়ার অতীত অভিজ্ঞতা থেকে।[2] বলা বাহুল্য, এই সংজ্ঞা ব্যাপক এবং এই ব্যাপকঅর্থে 1815 খ্রিস্টাব্দের অনেক শতাব্দী আগে থেকেই জাতির অস্তিত্ব ছিল। অন্তত এই ধরনের জাতীয়তার উজ্জ্বল উদাহরণ ইংল্যাণ্ডে এবং ফ্রান্সে আমরা দেখতে পাই। এই জাতীয়তার মধ্যে নিজস্ব ঐতিহ্য ও ইতিহাস শুধু নয়, নিজেদের ভাষা, সাহিত্য, শিক্ষা ও সংহতিবোধ থাকে প্রবল। কিন্তু আধুনিক অর্থে ইয়োরোপীয় জাতীয়তাবাদ বলতে যা বোঝায় তার উদ্ভব উনিশ শতক থেকে। এই 'জাতীয়তাবাদ' হলো এমন এক চেতনা যার দ্বারা প্রভাবিত হলে পূর্বোক্ত জন সম্প্রদায় যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত থাকে তাহলে তাদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বাসনা হয়। কারণ যেহেতু তারা একই জাতির অংশ, সুতরাং তাদের স্বতন্ত্রভাবে না থেকে একসঙ্গে থাকা উচিত। এই ঐক্যবোধ হলো আধুনিক জাতীয়তাবাদের প্রথম বৈশিষ্ট্য। আর জাতীয়তাবাদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো স্বাধীনতাবোধ। অন্যান্য জাতির মতন, নিজেরাও

---

1. ডেভিড টমসন, *ইয়োরোপ সিন্স নেপোলিয়ন*, পৃ 119

2. টমসম লিখেছেন, "A nation may be described as a community of people whose sense of belonging together derives from their belief that they have a common homeland and from experience of common traditions and historical development". তদেব।

স্বাধীন থাকব এবং আপন ভূখণ্ড নিজেরাই শাসন করব— এই ধারণা জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত। বলা বাহুল্য, এই স্বাধীনতাস্পৃহার পিছনে কাজ করে দেশাত্মবোধ এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার (Patriotism and the right of Self-determination)। এই জাতীয়তাবোধ ছিল প্রগতির সহায়ক কেননা এর প্রভাবেই বিদেশী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জনগণ হয়েছিল সোচ্চার। আবার উনিশ শতকের শেষ দিক থেকেই এই জাতীয়তাবাদই যখন উগ্র আকার ধারণ করতে থাকে তখন তার চরিত্রের বদল ঘটে; কিন্তু সেই প্রসঙ্গ বর্তমানে প্রাসঙ্গিক নয়।

বর্তমানে প্রশ্ন হলো, কেন ফরাসি বিপ্লব এবং নেপোলিয়ানের যুগকেই এই নবচেতনার জন্মলগ্ন বলা হয়? এই নবচেতনায় কি শুধুই জাতীয়তাবাদ উদ্ভূত, না অন্য আদর্শও উঠে এসেছিল? বিপ্লবের সঙ্গে জাতীয়তাবাদের সম্পর্ক কি? উদারপন্থা বলতেই বা কি বোঝায়? তার সঙ্গেই বা বিপ্লবী অভ্যুত্থানের কি সম্পর্ক?

ফরাসি বিপ্লবই প্রথম তুলে ধরে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার আদর্শ। এর থেকে জ্যাকবাঁ তত্ত্বের উদ্ভব যার মর্মবাণী 'জনগণের সার্বভৌমত্ব' ('Sovereignty of the people')। এই বাণীর দুই বৈশিষ্ট্য। একদিকে, এই বাণী তুলে ধরেছিল রাজতন্ত্রের বদলে সামগ্রিক জাতির দাবি এবং সরকার কি ধরণের হবে তা নির্ধারণের অধিকার জনগণের এবং সেই শাসনব্যবস্থার কার্যপ্রণালীকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও জনগণের। জনগণের এই ইচ্ছা শক্তির মধ্যেই 'জনগণের সার্বভৌমত্ব' কথাটির প্রথম ব্যঞ্জনা মূর্ত হয়ে উঠেছে ('the claims of the nation as a whole against its monarch, and the right of the people to determine its own form of government and to control the conduct of that government')। আবার অন্যদিকে, জনগণের সার্বভৌমত্ব বলতে বোঝায় সেই গণতান্ত্রিক ধারণা ও তত্ত্ব যেখানে সরকার বা শাসকবৃন্দ হবেন জনগণের ইচ্ছার প্রতিধ্বনি বা গণ কণ্ঠস্বর (voice of 'the people'), কোনও একক ব্যক্তির কণ্ঠস্বর বা ইচ্ছা নয়। সুতরাং অন্যভাবে বলা যায় যে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার বিপ্লবী আদর্শের সঙ্গে সঙ্গে 'জনগণের সার্বভৌমত্ব' প্রত্যেক নাগরিকের অধিকারের কথাই তুলে ধরেছিল। এই নাগরিকদের মধ্যে সম্মান অথবা মর্যাদার বৈষম্য যাই থাক, রাজনীতির সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের সমঃস্বর ধ্বনিত হয়। এই সমদৃষ্টিভঙ্গি থেকেই জাতীয়তাবোধের জন্ম। গণতন্ত্রের চেয়ে জাতীয়তাবাদী স্পৃহাই অধিক পরিমাণে জন্ম নেয় ফরাসি বিপ্লব থেকে। একথা ঠিক সন্ত্রাসের রাজত্বের বাড়াবাড়ি এই চেতনাকে কিছুটা ম্লান করেছিল। কিন্তু নেপোলিয়ান যখন আবার 'আইনের চোখে সবাই সমান' ঘোষণা করলেন তাঁর 'কোড নেপোলিয়ানের' মাধ্যমে এবং ইয়োরোপের নানা অঞ্চল বিজয় করলেন, তখন তার হাত ধরেই সাম্য-বার্তা তথা একজাতির মধ্যেকার ঐক্যবোধ অর্থাৎ জাতীয়তাবাদের প্রসার ঘটলো। একারণেই *ডেভিড টমসনের* মন্তব্যঃ 'So, by 1815 nationalism was a much livelier force in Europe than was democracy'।

ফরাসি বিপ্লবের পথে প্রতিবন্ধকতাগুলি দূর হওয়ার মধ্যে দিয়েই সমষ্টিগত চেতনা বৃদ্ধি পায়। একাত্মবোধ থেকে জাতীয় চিন্তা তাদের মাথায় আসে। শিক্ষিত তৃতীয় এস্টেটের লোকেরা প্রতিনিধি সভার নাম দেন 'জাতীয় সভা' বা ন্যাশানাল অ্যাসেম্বলি। বিপ্লবী যুদ্ধের সময় জাতীয় প্রেরণাতেই বহু ফরাসি সেনাবাহিনীতে নাম লেখায়। নেপোলিয়ানের সাম্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপ এবং ফরাসি জনগণের উদ্দীপনা জাতীয়তাবোধেরই বহিঃপ্রকাশ।

স্পেনে, পোল্যাণ্ডে, রাশিয়াতে, বেলজিয়ামে বা পর্তুগালে এতখানি জাতীয়তাবাদ প্রসার ঘটেনি, যদিও সে-সব দেশে নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্যবাদ পৌঁছেছিল। নেপোলিয়ানের প্রভাবে জাতীয় চেতনা ছড়িয়ে পড়েছিল লক্ষ্যণীয়ভাবে জার্মানি ও ইতালিতে। জার্মানি ও ইতালি তখন ঐক্যবদ্ধ এক দেশ ছিল না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। জার্মান সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে তখন এক জাতীয় ভাবধারা ছিল এবং তাই নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েও তারা ফরাসি প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছিল। তবে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য ভেঙ্গে দিয়ে 'কনফেডারেশন অফ দ্য রাইন' গঠন করে নেপোলিয়ানই ভবিষ্যৎ জার্মান ঐক্য আন্দোলনের পথ দেখান। তেমনি বিক্ষিপ্ত ইতালির রাজ্যগুলিও এক শাসন থেকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জাতীয় চেতনার স্বাদ পায়। আবার স্পেনে নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে যে অনুপ্রেরণা উপদ্বীপের যুদ্ধে দেখা যায় তাও গভীর জাতীয়তাবাদ প্রসূত। এই কারণেই ফরাসি বিপ্লব ও নেপোলিয়ানের যুগকেই জাতীয়তাবাদের উদ্ভবের যুগ বলা হয়।

না, একথা ঠিক নয় যে ফরাসি বিপ্লব ও তার অব্যবহিত পরবর্তী যুগে শুধুই জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়েছে; উঠে এসেছিল অন্য আদর্শও। যেমন গণতন্ত্র, আর প্রজাতন্ত্র। তবে প্রজাতন্ত্র তখনও তেমন দানা বাঁধেনি। দীর্ঘকাল পরে 1848 খ্রিস্টাব্দে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পরে ফ্রান্সে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়েছিল। তবে দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। তবু মানতেই হবে রাজতন্ত্রের যুগে তাকে উচ্ছেদ করে ইয়োরোপে প্রথম প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ফ্রান্সে। গণতান্ত্রিক আদর্শ অবশ্য ফ্রান্সের আগে ইংল্যাণ্ডে দেখা দেয়। স্টুয়ার্ট এবং হ্যানোভার বংশের শাসনেই সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে সিংহাসনের চেয়ে সংসদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয় বেশি; ফলে সেখানে সাংবিধানিক বা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র হিসেবে গণতন্ত্রের প্রথম পদক্ষেপ দেখা যায়। আর দেখা যায় রাজনৈতিক দল। গণতন্ত্র আরও সমৃদ্ধ হয় আমেরিকায়। ঔপনিবেশিক যুদ্ধে সফল হয়ে স্বাধীন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হয়; এই ঘটনা ফরাসি বিপ্লবেরও ছ' বছর আগের। তবু গণতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্রের চেয়ে জাতীয়তাবাদই ছিল বিপ্লব প্রসূত আদর্শগুলির মধ্যে অগ্রগণ্য। আবার এই জাতীয় চেতনার প্রভাবেই ভবিষ্যতে বিপ্লবী অভ্যুত্থান হয়েছে। সুতরাং বিপ্লবী চেতনার সঙ্গে জাতীয় চেতনার সম্বন্ধ ছিল।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে রক্ষণশীল নেতৃবর্গ যত চেষ্টাই করুন না কেন, জাতীয়তাবাদ আদর্শ হিসেবে পুষ্ট হয়েছে এবং জনমানসে গভীর প্রভাব ফেলেছে। স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে

ঘটেছে বিপ্লবী অভ্যুত্থান। তার জন্য জাতীয় চেতনার চেয়ে অধিক ক্রিয়াশীল ছিল উদারপন্থা। *ডেভিড টমসন* মনে করেন জাতীয়তাবাদ এবং উদারপন্থার মধ্যে মৈত্রী ও মিল ছিল।[1]

উদারপন্থা কাকে বলে? উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ইয়োরোপে উদারপন্থা বলতে যা বোঝাত তার অর্থ অনুযায়ী উদারপন্থা (Liberalism) শাসক ও শাসিতের মধ্যে সমন্বয় সাধনের তত্ত্ব; অর্থাৎ শাসক স্বৈরাচারী হবেন না, উপর থেকে শাসন করবেন না, শাসিতের সম্মতি তার মধ্যে থাকবে। টমসনের ভাষায় "It rested on the belief that there should be a more organic and complete relationship between government and the community, between state and society"[2] উদারপন্থীরা সমস্ত শাসিত জনগণের কথা ভাবতেন এমন নয়, তবে সম্মতি বলতে সচেতন শ্রেণীর সম্মতি অবশ্য নিতে হবে এই ছিল তাদের মত। অর্থাৎ অন্য ভাষায় বলা যায়, শুধু রাজন্যবর্গ, অভিজাততন্ত্র এবং যাজকতন্ত্রের সহায়তায় দেশ চালাতে পারবেন না। স্বাভাবিকভাবেই উদারপন্থা সামন্ততন্ত্রকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছিল। তবে অ-সুবিধাভোগী, মধ্যবিত্ত এবং বৃত্তিভোগী শ্রেণীর পিছনে অভ্যুত্থানের সময় কৃষিজীবী এবং শহুরে জনতা যোগ দেয়।

আলোচনা গুটিয়ে এনে এখন বলা যেতে পারে যে, ইয়োরোপীয় মহাদেশে তত্ত্ব হিসেবে উদারপন্থা এবং জাতীয়তাবাদ উভয়েরই ফরাসি বিপ্লবের পরে প্রসার ঘটলেও তার মূল উৎস ছিল আঠারো শতকের জ্ঞানালোক (Enlightenment) এবং যুক্তিবাদ (Rationalism)। মনে রাখা দরকার, যুক্তিবাদই নিরঙ্কুশ ক্ষমতা, দৈব সত্ত্বাধিকার এবং অসাম্যকে তীব্রভাষায় আক্রমণ করেছিল। স্বৈরতন্ত্রের বদলে সংসদীয় গণতন্ত্র ছিল তার আদর্শ এবং সেই সঙ্গে কাঙ্খিত ছিল আইনের শাসন। অধিক ভোটাধিকার তখনও দাবি করা হয়নি। বস্তুতঃ জনগণের সার্বভৌমত্বের অর্থ অবশ্যই সীমাবদ্ধ অর্থে ধরতে হবে। তবে সর্বজনের কিছু ক্ষেত্রে অধিকার স্বীকার করতেই হবে। যেমন— আইনের চোখে সাম্য। সাম্য এবং স্বাধীনতার মিশ্রণ জাতীয়তাবাদ ও উদারপন্থার মধ্যে লক্ষ্যণীয়। উদারপন্থার মধ্যেও অন্তর্নিহিত দুর্বলতা ও স্ববিরোধিতা ছিল। ফলে জনগণ অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি নিয়ে বিপ্লবী অভ্যুত্থান করলে উদারপন্থীরা আনন্দিত হত কিন্তু নিজেদের হাত থেকে ক্ষমতা চলে যাওয়ার ভয়ে উদারপন্থীরা শঙ্কিত থাকত। এজন্য রক্ষণশীলদের সঙ্গে হাত মেলাতেও তারা রাজী ছিল। এই কারণেই বহু গণঅভ্যুত্থান বলপূর্বক দমন করা সম্ভব হয়েছিল।

যাই হোক, 1815 খ্রিস্টাব্দে থেকে 1848 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইয়োরোপের ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে প্রতিক্রিয়ার ও রক্ষণশীলতার উপাদানসমূহের সঙ্গে জাতীয়তাবাদ

1. ডেভিড টমসন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. 123
2. তদেব

ও উদারপন্থার নিয়ত বিরোধ। মেটারনিখ ও অন্যান্য রক্ষণশীল নেতারা ভিয়েনা ব্যবস্থার মাধ্যমে পুরাতনতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। প্রথম দিকে তারা সফলও হয়েছিলেন কিন্তু ক্রমেই রক্ষণশীলতার পায়ের তলার মাটি সরে যেতে থাকে।

এর কারণ কি? উত্তর দিয়েছেন ডেভিড টমসন। প্রথমতঃ, "The kind of social and economic order for which the institutions of dynastic monarchy and privileged aristocracy were peculiarly fitted was a more static order, based on landed property and agriculture, on religious faith and political inactivity" অর্থাৎ যে আর্থ-সামাজিক অবস্থায় বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র এবং সুবিধাভোগী অভিজাততন্ত্রের টিকে থাকার আদর্শ ছিল, তা ছিল এক স্থিরাবস্থা, যার ভিত্তি ভূ-সম্পত্তি এবং কৃষি, ধর্ম বিশ্বাস এবং রাজনৈতিক স্থবিরতা। কিন্তু উনিশ শতকে যে নবযুগ আগত হলো, তার যা আর্থ-সামাজিক রূপ, তাতে বাণিজ্য এবং শিল্প হয়ে উঠলো প্রধান, সম্পদের ভিত্তির বদল ঘটলো, বিশ্বাসের বদলে যুক্তি এবং বিজ্ঞান ও জনসংখ্যার বিস্ফোরণ- সব মিলে যে নতুন সুরা তৈরি হলো তা পুরাতন বোতলে ধরা সম্ভব ছিল না। ফলে 'forces of conservatism'কে লড়তে হলো শেষ লড়াই। এর জন্য র‍্যাডিকাল বিপ্লবী চেতনার জয় হলো এমন নয়, পুঁজিবাদী শিল্প অর্থনীতির চাপেই ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়লো।

দ্বিতীয়তঃ, 1815 খ্রিস্টাব্দ থেকে মাঝে মাঝেই বিপ্লবী অভ্যুত্থান ঘটেছে কিন্তু সেখানে নানা শ্রেণীর কাছে সেই অভ্যুত্থান বা বিপ্লব ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বহন করে এনেছিল। তবে যাই-হোক-না-কেন, শেষ পর্যন্ত পুরোনো ব্যবস্থার শক্ত ভিত্তিতে ফাটল ধরেছে। বিপ্লবী চেতনা বা স্বাধীনতা স্পৃহা শুধুমাত্র ইয়োরোপীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই অভ্যুত্থানের রূপ নিয়েছিল এমন নয়, যেমন গ্রিসের স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিল অটোমান তুরস্কের বিরুদ্ধে। ভিয়েনা সম্মেলনের পর থেকে প্রধান কয়েকটি অভ্যুত্থানের মধ্যে— (ক) 1820-21 খ্রিস্টাব্দের অভ্যুত্থান (খ) ফ্রান্সে জুলাই বিপ্লব, তার প্রতিক্রিয়ায় অভ্যুত্থান, (গ) বেলজিয়ামের স্বাধীনতা (ঘ) গ্রিসের স্বাধীনতা এবং (ঙ) ফ্রান্সের ফেব্রুয়ারি বিপ্লব এবং ইয়োরোপে বিপ্লবের প্রসার বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

২। 1820 খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবী অভ্যুত্থান

ভিয়েনা সম্মেলনের পর থেকেই ইয়োরোপের পুনর্গঠন করার নামে নেতৃবৃন্দ প্রাক্-বিপ্লব অবস্থায় ইয়োরোপকে নিয়ে গিয়েছিলেন। দেশে দেশে গণতান্ত্রিক বিপ্লবী চেতনার প্রসারকে প্রতিরোধ করা এবং প্রজাতান্ত্রিক মতাদর্শকে বিনাশ করে রাজতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনাই ছিল রক্ষণশীল চূড়ামণি মেটারনিখের উদ্দেশ্য। এজন্যই ভিয়েনা সম্মেলনের কার্যাবলীর পাশাপাশি ইয়োরোপীয় শক্তি সমবায় দেশে দেশে উদারনৈতিক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দমন করতে চেয়েছিল।

1815 থেকে 1848 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মেটারনিষ প্রবর্তিত এই পরিবর্তন বিরোধী এবং রাজতন্ত্রী আবহাওয়া থাকা সত্ত্বেও বিপ্লবী আদর্শের মৃত্যু হয়নি এবং সেই সঙ্গে উদারনৈতিক ও জাতীয়তাবাদী চেতনাও জনগণকে প্রভাবিত করেছে। নিরঙ্কুশ বা স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের প্রবর্তন, অভিজাততন্ত্র তথা পুরোনো ব্যবস্থাকে ফিরিয়ে আনা, সামন্ততান্ত্রিক অথবা বিশেষ অধিকার ফিরিয়ে আনা —এ সমস্তই ছিল একদিকে যুগের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন এবং অন্যদিকে জনগণের আশা-আকাঙ্খার বিরোধী। ফলে এই সব পুনঃপ্রবর্তনের জন্য জনগণ বিক্ষোভ দেখিয়েছে এবং অনেক সময় তা বিপ্লবী অভ্যুত্থানে রূপান্তরিত হয়েছে। অনেক সময় তারা শাসকবৃন্দকে উদারনৈতিক সংবিধান প্রবর্তন করতে বাধ্য করেছে। প্রজাতান্ত্রিক আন্দোলনেও উদারনৈতিক সংবিধানের দাবিতে ইয়োরোপের অনেক দেশই উত্তাল হয়েছে। সাময়িকভাবে রক্ষণশীলদের জয় হলেও প্রগতির গতিপথ তারা রুদ্ধ করতে পারে নি। অন্তত তিনবার বিপ্লবী অভ্যুত্থান দেখা গিয়েছিল ইয়োরোপে। 1820 খ্রিস্টাব্দের শেষে ইতালি, পর্তুগাল প্রভৃতি দেশে বিপ্লবী প্রচেষ্টা দেখা যায়। স্পেনের বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া দেখা যায় তার দক্ষিণ বা ল্যাটিন আমেরিকার উপনিবেশগুলিতে। এরপর 1830 এবং 1848 খ্রিস্টাব্দে বিপ্লবের পীঠস্থান ফ্রান্সে দু'বার বিপ্লব ঘটে, যার ফলে শাসন পরিবর্তন হয় এবং সেই বিপ্লবের প্রভাব পড়ে সমগ্র ইয়োরোপে। প্রথমে আমরা 1820 খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ইয়োরোপে যে বিপ্লবী অভ্যুথান ঘটে সেই দিকে নজর দেব।

ফরাসি বিপ্লবের সময় স্পেনের রাজা সপ্তম ফার্দিনাণ্ড ছিলেন স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। নেপোলিয়ান স্পেন অধিকার করে (1808) নিজের ভাইকে সিংহাসনে বসালে স্পেনের জনগণ জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পেনিনসুলার যুদ্ধ শুরু করেন এবং শেষপর্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে ফরাসি শাসন মুক্ত করেন। স্পেনের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ 1812 খ্রিস্টাব্দে মানবাধিকার ও প্রজাবর্গের সার্বভৌম ক্ষমতা সমন্বিত এক নতুন উদারনৈতিক সংবিধান প্রণয়ন করেন। ফলে স্পেনে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। নেপোলিয়ানের পতনের পর সপ্তম ফার্দিনাণ্ড দেশে ফিরে ন্যায্য অধিকার নীতির বলে ক্ষমতা ফিরে পান এবং অচিরেই 1812 খ্রিঃ সংবিধান বাতিল করে পুনরায় স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠেন। এর বিরুদ্ধে 1820 খ্রিস্টাব্দে স্পেনের জনগণ জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। পূর্বের সংবিধানে (1812) সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত আইন পরিষদের প্রতি দায়িত্ব দেওয়ার ফলে যাজক ও সামন্ত শ্রেণীর অধিকার খর্ব হয়েছিল। 1815-এর সপ্তম ফার্দিনাণ্ড এই আইন পরিষদের পরিবর্তে মুষ্টিমেয় কট্টর রাজতন্ত্রীদের নিয়ে 'রাজকীয় পরিষদ' (Royal Council) -এর হাতে ক্ষমতা ন্যস্ত করেছিলেন। ক্রমে সামন্ত শ্রেণী ও যাজকদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটল। গণ অসন্তোষের প্রথম প্রকাশ দেখা দেয় 1819 খ্রিস্টাব্দে কাদিজ বন্দরে নৌবাহিনীর মধ্যে নুনেজের নেতৃত্বে। পরের বছর 1820তে কর্ণেল রিগোর নেতৃত্বে সৈনিক বিদ্রোহ হয়। ক্রমে দেশের বুদ্ধিজীবীরা ও উদারপন্থীদের

লোকজন বিদ্রোহে যোগ দিলে স্পেনের সর্বত্র তা ছড়িয়ে পড়ে। ফলে সপ্তম ফার্দিনাণ্ডকে বাধ্য হয়ে বিদ্রোহীদের দাবি মেনে 1812 খ্রিস্টাব্দের সংবিধানের আইনসভা আহ্বানের প্রস্তাব মেনে নিতে হয়। স্পেনের বিদ্রোহের ফলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, রাজনৈতিক দলের অধিকার, শুল্ক ব্যবস্থা, সামন্ততান্ত্রিক অধিকার বাতিল ইত্যাদি স্বীকৃত হলো। স্পেনের এই বিদ্রোহ চলাকালীন 1820 খ্রিঃ ট্রপোতে ইয়োরোপীয় শক্তি সমবায়ের অধিবেশন চলছিল। বিপ্লবের ফলে আতঙ্কিত রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজাণ্ডার স্পেনে সৈন্য পাঠাবার প্রস্তাব দিলেও বিট্রিশ প্রধানমন্ত্রী ক্যাস্‌লরির বিরোধিতায় তা বাতিল হয়। কিন্তু ইয়োরোপীয় শক্তি সমবায়ের পরবর্তী ভেরোনা সম্মেলনে (1822) স্পেন থেকে বিপ্লব ইয়োরোপে ছড়িয়ে পড়ার আতঙ্কে রাষ্ট্রপ্রধানগণ স্পেনের বিদ্রোহ দমনে সৈন্য প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ফ্রান্স, রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া স্পেনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে, ফরাসি সৈন্য স্প্যানিশ উদারপন্থীদের দমন করে সপ্তম ফার্দিনাণ্ডের অধীনে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করে (1823 খ্রিঃ)।

1820 খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহ শুধু স্পেনে সীমাবদ্ধ ছিল না। তা ছড়িয়ে পড়ে ইতালি এবং পর্তুগালেও। দক্ষিণ ইতালির নেপলস্‌ -এর বুরবোঁ বংশীয় রাজা প্রথম ফার্দিনাণ্ডের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে জেনারেল পপ-এর নেতৃত্বে এক বিদ্রোহ হয়। সেই বিদ্রোহ পিয়েডমন্ট অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ইতালিতে কার্বোনারি নামক গুপ্ত সমিতির সদস্যরা এই বিদ্রোহকে এক উদারনৈতিক গণ বিদ্রোহে পরিণত করলেন এবং এই বিদ্রোহের ফলেই রাজা প্রথম ফার্দিনাণ্ড নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। অন্যদিকে ঐ সময় ট্রপোতে ইয়োরোপীয় শক্তি সমবায়ের সম্মেলনে জার প্রথম আলেকজাণ্ডারের প্রস্তাব অনুযায়ী বিপ্লবী যুদ্ধ দমনে অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া সম্মত হন। তদনুযায়ী মেটারনিষ পিয়েডমন্ট ও নেপলস্‌ এ বিদ্রোহ দমনের জন্য বারো হাজার অস্ট্রিয়ার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী পাঠান। ঐ সৈন্যদল বিদ্রোহ দমন ক'রে নেপলস্‌-এ বুরবোঁ এবং পিয়েডমন্টে স্যাভয় রাজবংশের স্বৈরতান্ত্রিক শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে।

স্পেন থেকে বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গ প্রতিবেশী পর্তুগালকেও স্পর্শ করে। নেপোলিয়ানের আক্রমণের সময় পর্তুগালের ষষ্ঠ জন ব্রাজিলে পালিয়ে গিয়েছিলেন এবং দীর্ঘকাল অনুপস্থিত ছিলেন (1809-20)। পর্তুগালের শাসনভার মার্শাল বেরেসফোর্ড নামক জনৈক ইংরেজ সেনাপতির হাতে ছিল। এর বিরুদ্ধে পর্তুগিজ অভিজাত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে যে বিক্ষোভ ছিল তাই 1820-তে জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহে রূপান্তরিত হয়। প্রথমে ওপার্তো নামক শহরে শুরু হয়ে, পরে তা নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। পর্তুগিজ বিপ্লবীরা কার্যকরী সরকারের কাছে থেকে স্পেনের ধরণের একটি উদারনৈতিক সংবিধান এবং রাজাকে দেশে ফিরিয়ে আনার অঙ্গীকার আদায় করে। একটি এক কক্ষ

বিশিষ্ট সংসদ গড়া হয়, যারা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সমগ্র নাগরিকের সমতা এবং সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ ঘোষণা করেন। চার্চের ক্ষমতা খর্ব করে তাদের জমিও বাজেয়াপ্ত হয়। রাজা ষষ্ঠ জন দেশে ফিরে এগুলি মেনে নেন (1822)। কিন্তু ইয়োরোপীয় শক্তি সমবায় পর্তুগালের বিদ্রোহ দমনের জন্য ফ্রান্সের উপর দায়িত্ব দিলে ফরাসি সৈন্যবাহিনী পর্তুগালে প্রবেশ করে বিদ্রোহ দমন করে এবং স্বৈরতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

দক্ষিণ আমেরিকার স্পেনীয় উপনিবেশের স্বাধীনতা লাভ ঃ এই বিপ্লব (1820) শুধুমাত্র ইয়োরোপের দেশগুলির মধ্যে সীমিত ছিল না। এই বিদ্রোহের প্রভাব আমেরিকায় অবস্থিত স্পেনীয় উপনিবেশগুলিতে বিস্তার লাভ করে। আমেরিকার এই উপনিবেশ নিয়ে স্পেনের কোনও মাথাব্যথা ছিল না। আমেরিকা থেকে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের উপনিবেশগুলি বিলুপ্ত হলেও স্পেনের উপনিবেশ অটুট ছিল। 1808 খ্রিস্টাব্দে নেপোলিয়ানের ভ্রাতা যোসেফ বোনাপার্ট যখন স্পেনের সিংহাসনে বসলেন তখন উপনিবেশবাসীরা তাঁকে অস্বীকার করে। তখন সেই বিদ্রোহ দমনের যথাযথ ব্যবস্থা না থাকায় উপনিবেশবাসীরা কিছুটা স্বাধীনতা লাভ করে। পরে ফার্দিনাণ্ড ফিরে আসার পর (1814-15) তারা তাঁর প্রতিও আনুগত্য স্বীকার করল না। তিনিও সেই বিদ্রোহ দমনের জন্য সামরিক বাহিনী প্রেরণ করতে পারেন নি। প্রকৃতপক্ষে তখন দেশে সামরিক অভ্যুত্থান বিদ্যমান ছিল। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা অর্জন, ফরাসি বিপ্লবের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার ভাবধারা ল্যাটিন আমেরিকার স্পেনীয় উপনিবেশকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। বস্তুতপক্ষে 1810 থেকে 1830-এর মধ্যে জাতীয়তাবাদী, উদারনৈতিক, বিপ্লবী আন্দোলনের ঢেউ ল্যাটিন বা দক্ষিণ আমেরিকায় এক নব তরঙ্গের সৃষ্টি করেছিল। ব্রাজিল ছিল পর্তুগালের উপনিবেশ, বাকি সর্বত্রই ছিল স্পেনীয় অধিকারে। এই বিপ্লবী উত্থানের পিছনে কয়েকটি কারণ ছিল। (i) স্পেনীয় উপনিবেশগুলির অভিজাতবর্গ ইয়োরোপে পড়াশোনা করে জ্ঞানদীপ্তির দ্বারা প্রভাবিত হন, (ii) আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের সাফল্য ও ফরাসি বিপ্লব তাদের উদ্দীপ্ত করে, (iii) কিছু বিপ্লবী ও মানবতাবাদী ধর্মযাজক উপনিবেশের কৃষক ও সাধারণ মানুষের পক্ষে ছিলেন, (iv) নেপোলিয়ানের আমলে অনেক স্পেনীয় উপনিবেশের শাসকবর্গই স্পেনের কর্তৃত্ব অস্বীকার করে, (v) স্পেনীয় উপনিবেশবাসীরা ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্যে অভ্যস্ত ছিল এবং ব্রিটেনের সাহায্য তারা পেত, (vi) পর্তুগালের রাজা ষষ্ঠ জন স্বদেশে ফিরে গেলে তার পুত্র ওম পেড্রো ব্রাজিলের স্বাধীনতা ঘোষণা করে, পর্তুগাল তা মেনে নেয় এবং ব্রাজিলের স্বাধীনতা অন্য দেশগুলিকে অনুপ্রাণিত করে, (vii) ব্রিটিশ বিদেশমন্ত্রী ক্যানিং ইয়োরোপীয় শক্তি সমবায়ের হস্তক্ষেপের নীতির বিরোধিতা করেন এবং ব্রিটিশ বাণিজ্যিক স্বার্থের সংরক্ষণে ল্যাটিন আমেরিকার উপনিবেশবাসীদের সংগ্রাম সমর্থন করেন। এবং (viii) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি জেমস্ মনরো 1823 খ্রিস্টাব্দে তাঁর বিখ্যাত 'মনরোনীতি' (Monroe

Doctrine) ঘোষণা করেন। যার মূল কথা ছিল– 'আমেরিকা আমেরিকাবাসীদের জন্য'। এরফলে ইয়োরোপের পক্ষে স্পেনের উপনিবেশ রক্ষা করা সহজ ছিল না। এই পরিস্থিতিতে ফ্রানসিসকো মিয়ান্দার, সাইমন বলিভার, সান মার্তিন প্রমুখের নেতৃত্বে একে একে আর্জেন্টিনা, ভেনেজুয়েলা, চিলি, নিউ গ্রানাডা, মেক্সিকো, প্যারাগুয়ে, কোলম্বিয়া, ইকুয়েডর, বলিভিয়া প্রমুখ রাষ্ট্র গঠিত হয় যেগুলি ছিল স্বাধীন। তারা স্পেনের উপনিবেশিকতা থেকে মুক্ত হয় এবং প্রজাতন্ত্রী সরকার গঠন করে।

৩। গ্রিসের স্বাধীনতা সংগ্রাম

বর্তমান অধ্যায়ে আমাদের মূল আলোচ্য জাতীয়তাবাদ, উদারপন্থা এবং বিপ্লব। এই আলোচনার সূত্রে আমরা দেখেছি যে 1815 খ্রিস্টাব্দে ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ানের পরাজয় এবং ইয়োরোপের পুনর্গঠনের প্রয়োজনে আহুত ভিঁয়েনা সম্মেলনের সময় থেকে 1848 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দুই পরস্পর বিরোধী প্রবণতা কাজ করেছিল– একদিকে রক্ষণশীলতা ও প্রতিক্রিয়াশীল উপাদান, যা স্থিতবস্থা বজায় রেখেছিল এবং অন্যদিকে পরিবর্তনমুখী উপাদান। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা যথাস্থানে রক্ষণশীল প্রবণতা এবং তার নানাবিধ প্রয়োগ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। বর্তমান অধ্যায়ে জাতীয়তাবাদ ও উদারপন্থার তত্ত্ব এবং তার নানাবিধ প্রয়োগ বিষয়ে ঘটনা পরম্পরায় 1820 খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবী অভ্যুত্থানগুলি আলোচনা করছি। এরপর যদিও 1820 এবং 1830 খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবই আলোচ্য হওয়া উচিত কিন্তু কাল পরম্পরার প্রতি সুবিচার করতে গিয়ে এবং ইয়োরোপের ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে গ্রিসের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং তার সাফল্যের কাহিনী আলোচনা করাই যুক্তি সঙ্গত মনে করি।

আলোচনার শুরুতে দুটি কথা বলা দরকার। প্রথম কথা হলো গ্রিস ইয়োরোপের দেশ হলেও তা কিন্তু স্বাধীন হওয়ার আগে ছিল তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে এশিয়বাসী তুর্কিরা গ্রিস সহ পূর্ব ইয়োরোপের অর্ধেক এলাকা দখল করে নিয়েছিল। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে গ্রিসের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম তীব্র আকার ধারণ করে এবং শেষপর্যন্ত সফল হয়। এই সংগ্রামই আমাদের মূল আলোচ্য— যাকে স্থিতাবস্থা ও ধারাবাহিকতা বনাম পরিবর্তনের পরস্পর বিরোধী প্রবণতার কোনও দিকেই ফেলা যায় না। ইয়োরোপীয় ব্যবস্থা এখানে কার্যকরই ছিল না। দ্বিতীয় কথা হলো, ইয়োরোপীয় মিত্রতার রাজনীতি বা আদর্শগত সংগ্রামের চৌহদ্দির বাইরে হলেও গ্রিসের সংগ্রামে অবশ্যই জাতীয়তাবাদের সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্যণীয় এবং ইয়োরোপও শেষ পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয়েছিল। আর গ্রিসের স্বাধীনতা লাভের ফলে ইয়োরোপে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল।

প্রাচীন সভ্যতার একটি গৌরবোজ্জ্বল দেশ হিসাবে গ্রিস বিশ্বের ইতিহাসে সর্বদা স্মরণীয়। 1453 খ্রিস্টাব্দে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত তুর্কিরা কনস্ট্যাণ্টিনোপল সহ গ্রিস ও

বলকান অঞ্চল অধিকার করে। তারপর থেকে প্রায় তিনশ বছর গ্রিস ছিল তুর্কিদের পদানত। ইয়োরোপে আধুনিক যুগের সূত্রপাত এবং ইয়োরোপের নবজাগরণের সময় থেকে তারা নিজেদের অতীত সম্পর্কে পুনরায় সজাগ হতে থাকে।

গ্রিস দেশ তুরস্ক সাম্রাজ্যের অধীনে থাকলেও বলকান ও অন্যান্য অঞ্চলের মত গ্রিসের উপর তুর্কি শাসনকে দৃঢ়ভাবে চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। গ্রিসের আভ্যন্তরীণ শাসনের ক্ষেত্রে তুর্কিরা বিশেষ হস্তক্ষেপ করত না। ফলে তারা নিজেদের অভাব অভিযোগ সহ প্রাচীন জাতীয় গৌরবের বিষয় বিশেষভাবে ভাববার সুযোগ পেত। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে ফরাসি বিপ্লবের ভাবাদর্শ দ্বারা গ্রিকরা অনেক বেশি অনুপ্রাণিত হলো। 1804 খ্রিস্টাব্দে তুরস্কের অধীনতা পাশ থেকে সার্বিয়া যখন মুক্ত হলো তখন গ্রিকদের মনেও এই ঘটনা গভীর রেখাপাত করে। 1814 খ্রিস্টাব্দে 'ফিলিকে হেটাইরিয়া,' (Philike Hetairia) নামে একটি গুপ্ত সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতি তুরস্ক কর্তৃপক্ষের চোখের আড়ালে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রস্তুতি চালাতে থাকে। গ্রিকরা অবশ্য রাশিয়ার নিকট থেকে সাহায্য প্রাপ্তির আশা করত। কারণ জারের প্রধানমন্ত্রী ক্যাপো এবং ইসতিরিয়া সহ অনেক উচ্চপদস্থ কর্মচারী এই গুপ্ত সমিতির সদস্য ছিলেন।

এই সময় (1821) তুরস্কের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার সুযোগে জ্যানাইনা (Janina) প্রদেশের শাসনকর্তা আলিপাশা সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় উৎসাহিত হয়ে গ্রিসের মোলডাভিয়া প্রদেশের প্রিন্স হিপসিল্যান্টির নেতৃত্বে তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষিত হয়। গ্রিস আশা করেছিল রাশিয়া সাহায্য করবে। রাশিয়া প্রকৃতই সাহায্যের জন্য প্রস্তুত ছিল; কিন্তু রাশিয়ার শক্তি বৃদ্ধি পাবে এই আশঙ্কায় অস্ট্রিয়া একদিকে যেমন রাশিয়াকে অগ্রসর হতে দিল না তেমনি অন্যদিকে অস্ট্রিয়া এই স্বাধীনতা আন্দোলনকে বিদ্রোহ বলে অপবাদ দিল। ফলে হিপসিল্যান্টি তুরস্কের হাতে পরাজিত হয়ে নির্বাসন দণ্ড ভোগ করলেন। এভাবে গ্রিসের প্রথম বিপ্লবী অভ্যুত্থান ব্যর্থ হলো।

ইতোমধ্যে গ্রিসের মোরিয়া এবং ঈজিয়ান সাগরের দ্বীপগুলিতে বিদ্রোহ ব্যাপকভাবে আত্মপ্রকাশ করে। বিদ্রোহী গ্রিকগণ মোরিয়ায় অবস্থিত মুসলমান অধিবাসীদের নির্বিচারে হত্যা করল। অন্যদিকে থেসালি ও ম্যাসিডোনিয়ার মুসলিমরা খ্রিস্টান পুরুষদের হত্যা করল এবং নারীদের ক্রীতদাসী হিসেবে বিক্রি করল। এমনি করে গ্রিস ও তুরস্কের দ্বন্দ্ব সাম্প্রদায়িকতার রূপ ধারণ করল। তুর্কিরা চরম প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে গ্রিক প্যাট্রিয়ার্ক ও কয়েকজন আর্চ বিশপকে ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলিয়ে হত্যা করল। 1824 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তুরস্ক ও গ্রিস উভয়ই এককভাবে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করল। সাম্প্রদায়িকতার অজুহাতে মিশরের শাসনকর্তা মহম্মদ আলি তুরস্কের সাহায্যার্থে তার পুত্র ইব্রাহিম পাশাকে সসৈন্যে প্রেরণ করলেন (1824)। ইব্রাহিম পাশা নিষ্ঠুরভাবে হত্যালীলা শুরু করলেন। গ্রিকরা তুরস্কের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে হতাশ হয়ে পড়ল।

গ্রিসের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাত বছর ইয়োরোপের খ্রিস্টান রাষ্ট্রগুলি নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকা অবলম্বন করে। তবে খ্রিস্টান ধর্মযাজকদের হত্যার পর সমগ্র ইয়োরোপে তুরস্কের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখা দিল। ইয়োরোপের একটি ঐতিহ্যবাহী রাষ্ট্র ধ্বংস হবে এটা অনেকেই সহ্য করতে পারল না। বেসরকারি পর্যায়ে ইয়োরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে অর্থ ও স্বেচ্ছাসৈনিক প্রেরিত হলো। ইংল্যাণ্ডের কবি বায়রন মসি পরিত্যাগ করে গ্রিসের পক্ষে অসি ধারণ করলেন। তিনি গ্রিসের ভূমিতেই দেহরক্ষা করেন। গ্রিসের পতন যখন অনিবার্য হয়ে উঠল তখন রাশিয়ার জার নিকোলাস গ্রিসের পক্ষে যুদ্ধের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। অন্যদিকে ইংল্যাণ্ড যেমন রাশিয়ার শক্তি বৃদ্ধি পছন্দ করত না, তেমনি আবার হেলেনিক সভ্যতার অপমৃত্যু ঘটুক এটাও ছিল তার কাছে অবাঞ্ছনীয়। ইংল্যাণ্ড তখন যৌথ নীতি অবলম্বন করে রাশিয়া ও ফ্রান্সের সঙ্গে জোটবদ্ধ হলো। গ্রিস ও তুরস্কের মধ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য তুরস্কের নিকট এই ত্রিশক্তি একটি নোট পাঠাল। কিন্তু তুরস্ক তাতে কর্ণপাত করল না। সুতরাং ইয়োরোপীয় জোটের সঙ্গে তুরস্কের যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠল। ত্রিশক্তির নৌবহরের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় তুরস্কের এক নৌবহর নাভারিনোর যুদ্ধে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হলো। কিন্তু তুরস্কের পতন হলে রাশিয়ার শক্তি বৃদ্ধি হবে— এই কথা ভেবে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স যুদ্ধ থেকে বিরত রইল। তখন রাশিয়া এককভাবে তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে এবং তুরস্ককে 'অড্রিয়ানোপল-এর সন্ধিতে' স্বাক্ষর করতে বাধ্য করে (1829)। সন্ধির শর্ত অনুসারে (১) তুরস্ক গ্রিসের স্বাধীনতা স্বীকার করে। (২) মোলডেভিয়া ও ওয়ালেচিয়া প্রদেশ দুটির স্বায়ত্বশাসনের অধিকার স্বীকৃত হয়। (৩) দার্দানেলিস প্রণালীতে রুশ জাহাজ চলাচলের দাবিও স্বীকৃত হয়।

অড্রিয়ানোপল-এর সন্ধি স্থায়ী হলে পূর্ব ইয়োরোপে রাশিয়ার যথেষ্ট শক্তি বৃদ্ধি পেত। ভূমধ্যসাগরেও তার প্রতিপত্তি অবিলম্বে প্রসারিত হত। কিন্তু এই অবস্থা ইংল্যাণ্ডের স্বার্থের বিশেষ পরিপন্থী ছিল। তাই ইংল্যাণ্ড, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স ইত্যাদি রাষ্ট্র অড্রিয়ানোপলের সন্ধি ত্যাগ করার জন্য রাশিয়ার উপর চাপ সৃষ্টি করে। যুদ্ধের ভয়ে রাশিয়া এই প্রস্তাবে রাজি হলো। তখন লণ্ডন বৈঠকে (1832) গ্রিসের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেওয়া হলো। কিন্তু তার স্বাধীনতা নির্ভর করবে ইয়োরোপের রাষ্ট্রজোটের সম্মিলিত রক্ষাশর্তের উপর। 1833 খ্রিস্টাব্দে ব্যাভেরিয়ার রাজা প্রথম লুইয়ের 17 বছর বয়স্ক দ্বিতীয় পুত্র অটো (Otto) হলো স্বাধীন গ্রিসের প্রথম নরপতি। এভাবেই দক্ষিণ-পূর্ব ইয়োরোপে গড়ে উঠল একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গ্রিস।

গ্রিসের স্বাধীনতা যুদ্ধের গুরুত্ব ও ফলাফল শুধুমাত্র বলকান অঞ্চলে সীমিত রইলো না; ইয়োরোপের সর্বত্র এর প্রভাব বিস্তৃত হলো। এই স্বাধীনতা যুদ্ধের ফলে ভিয়েনার যথাপূর্বং ও বৈধস্বত্বের নীতি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। ফরাসি বিপ্লবের উদার জাতীয়তাবাদী ভাবধারার জয় সূচিত হলো। দ্বিতীয়তঃ, তুরস্কের অধীনতাপাশ থেকে মুক্তির

জন্যে বলকান ও অন্যান্য অঞ্চলে অবস্থিত খ্রিস্টান রাষ্ট্রগুলি নতুন করে উৎসাহিত হলো। ইয়োরোপীয় ভূখণ্ডে তুরস্কের প্রভাব হ্রাস পেল। তৃতীয়তঃ, গ্রিসের স্বাধীনতা সংগ্রামে রাশিয়ার ভূমিকা ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই সংগ্রামের পর ভূমধ্যসাগরে যেমন রাশিয়ার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়, তেমনি ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে তার মর্যাদাও বহু পরিমাণে সম্প্রসারিত হয়।

৪। জুলাই বিপ্লব (1830) ঃ কারণ ও ফলাফল

নেপোলিয়ানের পতনের পর ফ্রান্সের অবস্থা ঃ মিত্রশক্তির কাছে পরাজিত হলে নেপোলিয়ান 1814 খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হন। তাকে এলবা দ্বীপে নির্বাসিত করা হয়। ফ্রান্সের সিংহাসন ফিরিয়ে দেওয়া হয় বুরবোঁ বংশীয় অষ্টাদশ লুইকে। কিন্তু নেপোলিয়ান আবার ফিরে এসেছিলেন 1815 খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে। তাঁর দ্বিতীয় প্রত্যাবর্তনের রাজত্ব মাত্র একশো দিন স্থায়ী হয়েছিল- তারপর 1815 খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে ওয়াটারলুর যুদ্ধে পরাজয় এবং সেন্ট হেলেনা দ্বীপে চিরতরে নির্বাসন হল।

প্রথমবার সিংহাসন ত্যাগের পর বুরবোঁ বংশীয় শাসন ফিরে এলেও রাজতন্ত্রের রূপ কিহবে তা নিয়ে যথেষ্ট মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। রাজতন্ত্রের উগ্র সমর্থক, প্রজাতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক রাজতন্ত্রে সমর্থক সবাই ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে রাজতন্ত্রকে গ্রহণ করেছিল। 1814 খ্রিস্টাব্দের 12 মার্চ বর্দোতে (Bordeaux) রাজতন্ত্রীরা অষ্টাদশ লুইকে রাজা হিসেবে ঘোষণা করলো। মিত্রবাহিনী প্যারিস আক্রমণের পরে সেনেটও নেপোলিয়ানকে পদচ্যুত করে অষ্টাদশ লুইকে ফিরিয়ে আনার পক্ষে ভোট দেয় 6 এপ্রিল। অষ্টাদশ লুই স্বয়ং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেও তার রাজত্ব সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহ দেখা যায় নি। অস্থিরচিত্ত অষ্টাদশ লুই নেপোলিয়ানের প্রত্যাবর্তনের সংবাদে দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে ছিলেন। আবার ফিরে আসেন 1815-র 4 জুলাই। অষ্টাদশ লুই রাজা হয়ে একটি সনদ ঘোষণা করেছিলেন। তাতে তিনি 'promised France, representative government in a Senate and Chamber of Deputies, taxation only with consent, public and individual liberty, freedom of the press, freedom of religion, responsible government, judicial independence, a career open to talents' ইত্যাদি ঘোষণা করেন। *আলফ্রেড কোবানের* মতে, 'এটি ছিল দৈব অধিকার এবং বিপ্লবের মধ্যে এক আপোষ, যদিও বিপ্লবের দিকেই পাল্লা ভারী।'[1]

লক্ষ্য করার বিষয় হলো, যে সনদ অষ্টাদশ লুই ফ্রান্সের জনগণকে দিয়েছিলেন সেই সনদ (Charter) কোনোমতেই প্রাক্ 1789 রাজতন্ত্রের প্রত্যাবর্তন বোঝায় না। শুধু রাজতন্ত্রের প্রত্যাবর্তন বা পুনঃপ্রবর্তন (Restoration) বললেই সব বোঝায় না, রাজতন্ত্র

1. এ. কোবান, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ 65

তার পুরনো চরিত্র নিয়ে হাজির হতে পারে নি। অধ্যাপক সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী লিখেছেন, "বেশ কিছু মৌলিক অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় ঃ আইনের চক্ষে সমানাধিকার ও সমস্ত কাজের জন্যে সমান সুযোগ; অবাধে গ্রেপ্তার বন্ধ; বিবেক ধর্ম ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা; বিপ্লবের সময় বাজেয়াপ্ত করা জমি সমেত সমস্ত সম্পত্তির অধিকার। এছাড়া প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে, বুরবোঁদের প্রত্যাবর্তনের পূর্বের রাজনৈতিক কাজকর্ম ও মতামতের জন্যে কারোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। সিভিল কোড্ ও অন্যান্য নানান পরিবর্তন বজায় রাখার ফলে রাজতন্ত্র আর পুরোপুরি স্বৈরাচারী নয়। পুরোনো সমাজব্যবস্থা নয়, শুধুমাত্র পুরোনো রাজবংশই ফিরে এল। অর্থাৎ বাহ্যত ফ্রান্স একটি সাংবিধানিক রাজতন্ত্রে পরিণত হলো।"

কিন্তু শেষপর্যন্ত 1815 খ্রিস্টাব্দ থেকে অবস্থার বদল হতে থাকে এবং 1830 খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সে আবার বিপ্লব হয়। ফ্রান্সে 1830 খ্রিস্টাব্দে যে বিপ্লব হয়েছিল তা 1789 খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবের মতন ব্যাপক চরিত্রের এবং মানব সভ্যতার উপর সুদূর প্রসারী ফলাফল সৃষ্টিকারী নয়। ঐ বিপ্লব জুলাই মাসে হয়েছিল বলে একে 'জুলাই বিপ্লব' বলে। এই বিপ্লবের স্থিতিকাল বস্তুত ছিল মাত্র তিনদিন (27-29 জুলাই, 1830)। নেপোলিয়ানের পতনের পর ফ্রান্সে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন অষ্টাদশ লুই, তা আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি (1814-24) এবং তারপর বসেন দশম চার্লস (1824-30)। দশম চার্লসের প্রতিক্রিয়াশীল এবং উগ্ররাজতন্ত্রী নীতির ফলেই জুলাই বিপ্লবের সূত্রপাত এবং ঐ বিপ্লবের ফলেই বুরবোঁ (Bourbon) বংশীয় শাসনের অবসান হয় এবং 1830 খ্রিঃ 30th জুলাই অরলেয়ঁ (Orleans) বংশীয় লুই ফিলিপ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ফ্রান্সের বিপ্লব-প্রসূত ভাবধারাই ছিল পরবর্তী জুলাই বিপ্লবের মূল কারণ। ফরাসি বিপ্লব এবং নেপোলিয়ান কৃত সংস্কারমূলক কার্যাবলীর ভিতর দিয়ে ফ্রান্সের সমাজব্যবস্থা, রাষ্ট্রনৈতিক ভাবধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ফলে বিপ্লব-পূর্ব রাজতন্ত্র ও স্বেচ্ছাচারিতা সম্পর্কে একটা বীতশ্রদ্ধভাব জনগণের মনে দানা বেঁধেছিল। অধ্যাপক *চার্লস্ হ্যাজেন* তাই ঠিকই লিখেছেন যে, 1789-1848 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ইয়োরোপের "অপর কোনও দেশে ফ্রান্সের মত এত ব্যাপক ও আমূল পরিবর্তন দেখা যায়নি।" আবার *ডেভিড টমসন* যাকে বলেছেন অবিচ্ছন্নতার শক্তি (Forces of Continuity) এবং পরিবর্তনের শক্তি (Forces of Change), সেই দুই পরস্পর বিরোধী শক্তির মধ্যে সংঘর্ষ চলছিল এবং এই সংঘর্ষই জুলাই বিপ্লবকে অনিবার্য করে তোলে।

লক্ষ্যণীয় যে, অষ্টাদশ লুই যে উদারনৈতিক সনদ বা সংবিধানের কথা বলেছিলেন তার মুখবন্ধে বলা হয়েছিল যে রাজা সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায় জনগণকে এই সংবিধান প্রদান করছেন। তিনি রাজতন্ত্রের উচ্ছেদকে স্বীকার করতেন না। তিনি মনে করতেন 1814 খ্রিস্টাব্দ রাজত্বের উনিশতম বৎসর। যাই হোক, সনদটি উগ্র রাজতন্ত্রীরা দাবি

করতে পারতেন যে রাজা যা স্বেচ্ছায় দিয়েছেন তা তিনি ফিরিয়ে নিতে পারেন। আবার উদারপন্থীরা দাবি করতে পারতেন যে রাজা তার শপথ অনুযায়ী এই সংবিধানের শর্ত মানতে বাধ্য। অর্থাৎ বুরবোঁ শাসনের প্রত্যাবর্তন আপসমূলক হলেও সংঘাতের সম্ভাবনা থেকেই গেল। অষ্টাদশ লুই সংঘর্ষ এড়াতে পেরেছিলেন, দশম চার্লস পারেন নি। তবে অষ্টাদশ লুইয়ের কাজও সহজ ছিল না।

অষ্টাদশ লুই যে সনদ অনুমোদন করেছিলেন সেই অনুসারে চেম্বার বা প্রতিনিধিসভা স্থাপিত হয়, তবে ভোটদানের অধিকার ছিল সীমিত। প্রতিনিধি হতে গেলে অন্তত চল্লিশ বছর বয়স্ক এবং এক হাজার ফ্রাঁ প্রত্যক্ষ কর দিতে হবে। আর ভোট দিতে গেলে বয়স অন্তত 30 হওয়া দরকার এবং করের পরিমান 300 ফ্রাঁ। এইভাবে 90,000 লোকের ভোটাধিকার ছিল। প্রতিনিধিসভার বা মন্ত্রিসভার ক্ষমতা বা দায়িত্ব সম্বন্ধে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয় নি। একটি উচ্চকক্ষও প্রবর্তিত হয়। তখন ফ্রান্সে কোনও রাজনৈতিক দল না থাকলেও তিন ধরনের রাজনৈতিক গোষ্ঠী বা গোষ্ঠী প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

তিন ধরনের রাজনৈতিক গোষ্ঠী : একটি দক্ষিণপন্থী বা উগ্ররাজতন্ত্রী গোষ্ঠী ছিল। যারা আলট্রা (Ultra) নামে পরিচিত ছিল এবং তাদের মধ্যে প্রধানত দেশত্যাগী অভিজাত এবং উচ্চ যাজকরাই ছিলেন বেশি। এরা ছিলেন অবিমিশ্র রাজতন্ত্রের সমর্থক। এদের নেতা ছিলেন লুই-এর ভাই কঁত দার্তোয়া (Comte d' Artois)। তাছাড়া বাঁর দ্য ভিত্রোল (Baron de Vitrolles), জুল দ্য পলিনিয়াক (Jules de Polignac), কঁত দ্য ব্রুজ (Comte de Bruges)– এদের সঙ্গে মিলে দার্তোয়া একটি গোপন সরকার করেছিলেন। এই গোষ্ঠী পুরাতন ব্যবস্থা এবং রাজার স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতা যাতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, তাই চেয়েছিলেন। এই দলের সঙ্গেই ছিলেন শাতোব্রিয়াঁ, কিন্তু তিনি ছিলেন অপেক্ষাকৃত নরমপন্থী। এছাড়া রাজতন্ত্রের সমর্থক কিছু গোপন সমিতি ফ্রান্সে 1815-র পর সক্রিয় হয়ে ওঠে।

অন্যদিকে আর একটি গোষ্ঠী ছিল যাদের সাংবিধানিক গোষ্ঠী বলা যেতে পারে। এরা অষ্টাদশ লুইয়ের দেওয়া চার্টারকে শাসনের কেন্দ্রবিন্দু বলে ভাবতেন এবং সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নতিও কামনা করতেন। এই গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন রিসল্যু (Richelieu), গিজো (Guizot), বারঁত (Baronte), দ্যকাজ (Decazes), পাসকিয়ে (Pasquier), দ্যুক দ্য ব্রগলি (Duc de Broglie) প্রমুখ।

অপর একটি গোষ্ঠী ছিল যাদের মধ্যে প্রজাতন্ত্রী, বোনাপার্টিয় এবং অন্যান্য বুরবোঁ বিরোধী লোকজন ছিল। এই উদারপন্থী গোষ্ঠী ফ্রান্সে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী ছিলেন। শহুরে বুর্জোয়া শ্রেণী এদেরই সমর্থক ছিল।

অষ্টাদশ লুইয়ের অধীনে ফ্রান্স : অধ্যাপক সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী লিখেছেন, "অষ্টাদশ লুইয়ের অধীনস্থ ফ্রান্সের রাজনৈতিক ইতিহাস তিনটি পর্যায়ে দেখা সম্ভব— 1816-র

নভেম্বর পর্যন্ত ছিল রাজতন্ত্রীদের প্রাধান্য; 1815 থেকে 1820 মোটামুটি সংবিধান সম্মত শাসনব্যবস্থার সময় বলা যায় এবং 1820 থেকে 1824 এর মধ্যে রাজতন্ত্রী প্রাধান্যের প্রত্যাবর্তন সূচিত হয়।"[1]

অষ্টাদশ লুইয়ের রাজত্বকালের গোড়ার দিকে উগ্র রাজতন্ত্রীদের কাজকর্মের ফলে ফ্রান্সে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ও অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছিল। তালেরাঁ মন্ত্রিসভা আপসের নীতি নিয়েছিলেন, তা তেমন কার্যকর হয়নি। লুই বিরোধীদের ক্ষমতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তবু নানাস্থানে প্রতিহিংসার রাজনীতি অবাধে চলছিল বিশেষত গ্রামাঞ্চলে, ঐতিহাসিকরা একেই বলেছেন 'শ্বেত সন্ত্রাস', যা বিপ্লবকালীন সন্ত্রাসের রাজত্ব থেকেও ছিল ভয়াবহ। তালেরাঁ মন্ত্রিসভাকে সরিয়ে লুই রিশল্যুর অধীনে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। তারা নানা জরুরি ব্যবস্থা নিলেন; কিন্তু ক্যাথলিক চার্চকে পুরাতন মহিমায় ক্ষমতাসীন করা, সামরিক আদালত চালু করা, ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ ইত্যাদি কার্যকলাপ ছিল পশ্চাদ্‌পন্থী। উগ্র রাজতন্ত্রীরা পার্লামেন্টের বা প্রতিনিধিসভার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে, কারণ এটি সম্ভব হলে মন্ত্রিসভার উপর চাপ সৃষ্টি করা যাবে। বিরক্ত হয়ে লুই প্রতিনিধি সভা ভেঙে দিয়ে নতুন নির্বাচনের আদেশ দেন। কিন্তু 1816-র অক্টোবরের নতুন নির্বাচনে মন্ত্রিসভার সমর্থকদেরই জয় হয়।

রিশল্যু মন্ত্রিসভা নির্বাচনী আইনের সংশোধন করে। লুই এবং রিশল্যুর মন্ত্রিসভা আবার ফ্রান্সের পুনর্গঠনে মনোযোগী হয়। উগ্র রাজতন্ত্রী বা প্রতিক্রিয়াশীলদের শ্বেতসন্ত্রাস বা ক্ষমতার অপব্যবহার কমে আসে। ফলে বিপুল ক্ষতিপূরণ মিটিয়েও আর্থনীতিক উন্নয়ন দ্রুততর হয়; বিদেশী সৈন্য ফ্রান্স ছেড়ে চলে যায়। 1818-তে ফ্রান্স হৃত মর্যাদা ফিরে পেয়ে ইয়োরোপীয় জোটে যোগ দেয়। নতুন নির্বাচনী আইনে দ্যপার্তির্মঁ বা ডিপার্টমেন্টের মুখ্য শহরগুলিতে ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করার ফলে উদারপন্থী বুর্জোয়াদের সুবিধে হয়। ফলে 1816 থেকে 1819 এর মধ্যে প্রতিনিধি সভায় প্রজাতন্ত্রীদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। 1818-এর ডিসেম্বরে রিশল্যুর জায়গায় মন্ত্রী হলেন দ্যকাজ এবং দ্যকাজ মন্ত্রিসভা সাংবিধানিক সংস্কারকে আরও বেশি করে উদারপন্থার দিকে নিয়ে যায়। ফলে উগ্র রাজতন্ত্রী বা আলট্রা রয়ালিস্টদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। দ্যকাজ মন্ত্রিসভার আমলে সেন্সর ব্যবস্থা তুলে দেওয়া, উগ্র রাজতন্ত্রী প্রিফেক্টদের বরখাস্ত করা ইত্যাদির পর যখন সিংহাসনের উত্তরাধিকারী *দ্যুক দ্য বেরীকে* (Duc de Berry) হত্যা করা হয় তখন উগ্ররাজতন্ত্রীদের সহ্যের শেষ সীমা অতিক্রম করে গেছে। তারা এই হত্যাকান্ডের জন্য প্রজাতন্ত্রীদের দায়ী করে; রাজা অষ্টাদশ লুইও শঙ্কিত হন। দ্যকাজকে বরখাস্ত করে পুনরায় রিশল্যুর মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়। তিনি এবার দক্ষিণপন্থীদের সাহায্যে সরকার পরিচালনা শুরু করেন। নির্বাচনী আইন আবার সংশোধন করে ভোট দানের অধিকার শহরে এবং গ্রামাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়।

---

1. সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. 32

এই 'দ্বৈত ভোট' চালু হবার ফলে ক্রমশ প্রতিনিধি সভায় রাজতন্ত্রীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বাড়তে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত উগ্র রাজতন্ত্রীদের চাপে রিশল্যুকে বরখাস্ত করে ভিলেল (Villele)-এর অধীনে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়। ভিলেল আর্থনীতিক সংস্কারের ধারা অক্ষুন্ন রেখে রাজতন্ত্রকে দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেন। ক্রমশ রাজনীতির ক্ষেত্রে উগ্র রাজতন্ত্রীদের প্রাধান্য দেখা যেতে থাকে। সংবাদপত্রের নিয়ন্ত্রণ, বিচারে জুরি ব্যবস্থা রহিত হওয়া, শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ যাজকদের হাতে চলে যাওয়া ইত্যাদির ফলে প্রজাতন্ত্রীরা শঙ্কিত হয়। ইতালির কারবোনারীর ধাঁচে বিভিন্ন গুপ্ত সমিতি গড়ে ওঠে। এমনকি 1820-22 ইয়োরোপের নানাস্থানের বিপ্লবী অভ্যুত্থানের ঢেউ ফ্রান্সে এসে পড়ে।

কিছু কিছু স্থানে ছোটখাটো বিক্ষোভ হলেও তা দমন করা হয়। রাজতন্ত্রীরা ভিলেলকে আক্রমণাত্মক বিদেশ নীতি গ্রহণের চাপ দিয়েছিলেন। 1823 খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্স স্পেনে সৈন্যবাহিনী পাঠায় মেটারনিষের পরামর্শে, নতুন করে স্পেনের রাজা ফার্দিনান্ডের ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়া হয়। বৈদেশিক শক্তির সাফল্য দেশের অভ্যন্তরে উগ্ররাজতন্ত্রীদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এরপর 1824-এর সেপ্টেম্বর মাসে অষ্টাদশ লুইয়ের মৃত্যু এবং দশম চার্লসের সিংহাসনে আরোহণ বুরবোঁ রাজতন্ত্রের শেষ অধ্যায়ের সূচনা করে। একদিকে বিবাদমান শক্তির লড়াই বাড়ে এবং অন্যদিকে জুলাই বিপ্লবের পথ প্রশস্ত হয়। অষ্টাদশ লুই ব্যর্থ হলেও বিপ্লবের সঙ্গে রাজতন্ত্রের একটা সমঝোতার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পরে ক্রমশ উগ্র রাজতান্ত্রিক মনোভাব বৃদ্ধি পাওয়ার ফলেই জুলাই বিপ্লবের সূত্রপাত।

দশম চার্লসের রাজত্বকাল (1824-30) এবং জুলাই বিপ্লবের কারণ : অষ্টাদশ লুইয়ের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই কঁত দার্তোয়া (Comte d' Artois) দশম চার্লস নাম নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি আগে থেকেই ছিলেন উগ্র রাজতন্ত্রী গোষ্ঠীর প্রধানতম নেতা। সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী লিখেছেন, "দশম চার্লসের ব্যক্তিত্ব ও পূর্বজীবন ফ্রান্সের সমসাময়িক ইতিহাসে রাজনীতির পক্ষে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। তাঁর ব্যক্তিত্বের যে দিকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তাহল সর্বময় রাজশক্তিতে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। তিনি বিপ্লবের এবং বিপ্লবী আদর্শের ঘোর শত্রু ছিলেন এবং বুরবঁদের প্রত্যাবর্তনের পূর্বে ও পরে উগ্র রাজপন্থীদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।"[1] আসলে প্রজাতন্ত্র বা উদারপন্থা তো দূরের কথা, নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র সম্পর্কে তার ঘোর আপত্তি ছিল। তাঁর এই উগ্র মনোভাব একটি উক্তিতে স্পষ্ট : তিনি বলেছিলেন, "বনে গিয়ে কাঠুরের মতন কাঠ কেটে থাকব তাও ভালো কিন্তু ইংল্যাণ্ডের রাজার মতন রাজা হতে পারব না।"

বেরীর হত্যাকাণ্ডের পর ভিলেল মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার সময় যখন অষ্টাদশ লুই রাজা হলেন তখনই উগ্র রাজতন্ত্র তীব্র আকার ধারণ করে। রাজা তখন মাদাম দ্যু লায়লা

1. সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. 324

(Layla) নামক এক সুন্দরী বিধবার প্রেমে মত্ত, সেই সুযোগে ভিলেল দার্তোয়া গোষ্ঠী ক্ষমতা বাড়িয়ে নেয়।[1] তারা মনে করতেন আর্থিক স্বচ্ছলতা পেলে ফরাসিবাসীরা প্রতিক্রিয়াশীলতা মেনে নিতে আপত্তি করবে না।[2]

দশম চার্লস অভিজাত ও উচ্চ যাজকদের দিয়ে রাজত্ব করতে মনস্থ করেন। ভিলেলের চাইতেও তিনি অনেক উগ্র ও কট্টর ছিলেন।[3] তিনি 1789 খ্রিস্টাব্দের আগেকার অবস্থা ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন অথচ তা বাস্তবে সম্ভব ছিল না। এ যাবৎ ইতিহাসের শিক্ষা না নেওয়া এবং পুরাতনতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টাই জুলাই বিপ্লবের প্রথম এবং প্রধান কারণ। ভিলেলের সহায়তায় তিনি দেশত্যাগী এবং পরে ফিরে আসা অভিজাতদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। বস্তুত, "চার্লসের সংক্ষিপ্ত রাজত্ব তাঁর তিন মন্ত্রীর কার্যকাল দিয়ে সংক্ষেপে বর্ণনা করা সম্ভব। ১৮২৪ থেকে ১৮২৮ পর্যন্ত ভিলেলের নেতৃত্বে রাজতন্ত্রকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা করা হয়। ১৮২৮ থেকে ১৮২৯ ক্ষমতা থাকে মারতিনিয়াকের (Martignac) হাতে— এ সময়কে উগ্ররাজতন্ত্রীদের পশ্চাদপসরণের সময় বলা যায়। ১৮২৯-৩০ এ ক্ষমতায় আসেন কঠোর রাজতন্ত্রী পলিনিয়াক (Polignac)। তাঁর অধীনে ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ও তার চূড়ান্ত পরাজয় লক্ষ্যণীয়।"[4]

তিনজন মন্ত্রীর অধীনে ক্রমে ক্রমে চূড়ান্তভাবে রাজতন্ত্র এবং পুরোনো ব্যবস্থা কায়েম করতে গিয়ে নানা পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এগুলি ছিল জুলাই বিপ্লবের দ্বিতীয় কারণ। ভিলেলের আমলে যাজকদের ও দেশত্যাগী অভিজাতদের ক্ষমতা বৃদ্ধি, অভিজাতদের হারানো জমি ফিরিয়ে দেওয়া, জাতীয় ঋণপত্রের উপর সুদের হার কমিয়ে দেওয়া, শিক্ষা ব্যবস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর যাজকদের নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির ফলে মধ্যবিত্ত এবং বুর্জোয়া শ্রেণী ক্ষুব্ধ হন। যখন স্যাক্রিলেজ (Sacrilege) আইন পাস করে অপবিত্র আচরণের জন্য শাস্তি হিসেবে প্রাণদণ্ড পর্যন্ত দেবার ব্যবস্থা হলো তখন তীব্র প্রতিবাদ হলো। সরকার বিরোধী প্রচার বৃদ্ধি পেল। শাতোব্রিয়াঁ বিদেশ দপ্তরের মন্ত্রিত্ব না পাওয়াতে রাজতন্ত্রী দল ছেড়ে বিরোধীদের দিকে চলে যান। বিরোধীদের ক্ষমতা বেড়ে যাওয়াতে আতঙ্কিত দশম চার্লস প্রতিনিধি সভা ভেঙে দেন এবং নতুন নির্বাচনের নির্দেশ দেন। সংবাদপত্রের উপর নিয়ন্ত্রণ কঠোর করা হয়। নতুন নির্বাচনেও কিন্তু বিরোধী পক্ষই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং ফলে 1828-এর জানুয়ারিতে ভিলেল পদত্যাগ করেন।

চার্লস মারতিনিয়াক্-এর অধীনে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। মারতিনিয়াক্ ছিলেন নরমপন্থী রাজতন্ত্রীদের নেতা। তিনি কিছুটা নরমনীতি প্রয়োগ করেন। যেমন সংবাদপত্রের

1. আলফ্রেড কোবান, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. 81
2. Jacques Droz, *Europe Between Revolutions*, pp. 105-106
3. Gordon Craig, *Europe Since 1815*, pp. 51-52
4. সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. 325

উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, শিক্ষা ব্যবস্থার উপর যাজকীয় নিয়ন্ত্রণ শিথিল ইত্যাদি। অবশ্য অবস্থার কোনও উন্নতি হয়নি। দক্ষিণপন্থী এবং বামপন্থী উভয়েই তাকে সমালোচনা করে। দশম চার্লস্‌ও বিন্দুমাত্র উদারপন্থার সঙ্গে আপোষ করতে রাজী ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত 1827-এর আগস্ট মাসে মারতিনিয়াক্ পদত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং পলিনিয়াক্ নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করেন।

পলিনিয়াকের নেতৃত্বে উগ্র রাজতন্ত্রী ও অভিজাততন্ত্রী বিশ্বাস এবং তদনুসারে কার্যকলাপ বিশেষত 1830-এর জুলাই মাসের অধ্যাদেশ (Ordinance) হলো বিপ্লবের তৃতীয় এবং অব্যবহিত কারণ। *গর্ডন ক্রেগ* ঠিকই লিখেছেন যে, পলিনিয়াক্ তার চরম প্রতিক্রিয়াশীল মতামত চেপে রাখার কৌশল জানতেন না। তিনি ঘোষণা করেন যে, তাঁর উদ্দেশ্য হলো, "সমাজকে পুনর্গঠিত করা, রাষ্ট্রব্যবস্থায় যাজকদের পুরোনো ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়া ও একটি শক্তিশালী অভিজাত গোষ্ঠী তৈরী করে তাকে বিশেষ সুযোগ সুবিধা প্রদান করা।" বস্তুত তাঁর আমলে যাজকতন্ত্র (Clericalism) রীতিমতো মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ওয়েলিংটন পলিনিয়াকের সরকারকে পুরোমাত্রায় যাজকদের সরকার বলেছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে প্রজাতন্ত্রী এবং উদারপন্থীরা সকলেই সংগঠিত হয়। এই রাজনৈতিক সংকটের সঙ্গে অর্থনৈতিক সংকট যুক্ত হওয়ার ফলে অবস্থা আরও খারাপ হয়। এমনকি আলজেরিয়ায় সফল অভিযানও সরকারের বিরুদ্ধে জনবিক্ষোভ কমাতে পারে নি।

1830 খ্রিস্টাব্দের মে মাসে আইনসভা ভেঙে দেওয়া হয়। নির্বাচনে বিরোধী পক্ষের 274 জন নির্বাচিত হন এবং বিরোধী পক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। পলিনিয়াক প্রমাদ গণলেও রাজা তাঁর মত থেকে তখনও বিন্দুমাত্র সরতে রাজী ছিলেন না। তিনি এবং পলিনিয়াকের পরামর্শক্রমে সনদের 14 নং ধারা অনুযায়ী 25th জুলাই চারটি অর্ডিন্যান্স জারি করেন। সেই সঙ্গে বিপ্লবের পথও উন্মুক্ত হয়ে যায়। ঐ কুখ্যাত জুলাই অর্ডিন্যান্স বা অধ্যাদেশ অনুসারে (১) সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করা হয়। (২) আইনসভা ভেঙে দেওয়া হয় (৩) নির্বাচন আইন পরিবর্তন করে বুর্জোয়া শ্রেণীকে ভোটাধিকারে বঞ্চিত করা হয়; কেবলমাত্র সম্পত্তিবান অভিজাতদের ভোটাধিকার রইল এবং (৪) অষ্টাদশ লুইয়ের 1814-এর সনদ রদ করা হয়। এই জুলাই অর্ডিন্যান্স চালু করার সঙ্গে সঙ্গে 1830 খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে গণবিক্ষোভ থেকে বিপ্লবের সূত্রপাত ঘটে।

জুলাই বিপ্লব ঃ যা ছিল আদিতে প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রী পলিনিয়াকের বিরুদ্ধে উদারপন্থী ও প্রজাতন্ত্রীদের প্রতিবাদ, শেষপর্যন্ত দশম চার্লসের নির্বুদ্ধিতার ফলে তাই বিপ্লবে পরিণত হয়। *আলফ্রেড কোবান* লিখেছেন, "In 1830 a political movement which had began as an attempt to force Charles X to dismiss an unpopular minister

turned into a revolution।" প্রথমে বিদ্রোহ শুরু হয় সংবাদপত্র অফিসে। তিয়ের (Thiers), মিনে (Mignet) ও কারেল (Carrel) পরিচালিত 'লা ন্যাশিনিয়েল' পত্রিকা আগেই বুরবোঁ বংশীয় শাসন সরিয়ে অরলেয়ঁ (Orleans) বংশকে রাজক্ষমতায় প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব দিয়েছিল। প্রজাতন্ত্রী সংবাদপত্র 'ট্রিবিউন' (Tribune) এরও ছিল তাই মত। 1830-এর জুলাই মাসে দশম চার্লসের কুখ্যাত অর্ডিন্যান্স চালু হওয়ার পরেই সংবাদপত্রে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সোচ্চার হয়। ক্রমে কলকারখানা, দোকান, অফিস বন্ধ হয়ে যায়। 25th জুলাই এর অধ্যাদেশের ফলে 26-27 জুলাই, এই বিক্ষোভে সব উদারপন্থী ও প্রজাতন্ত্রী সামিল হয়। বিশেষত স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসে প্যারিসের জনতা (Mob)। গণবিক্ষোভের ফলে 27th জুলাই থেকে বিপ্লব শুরু হয় যখন প্যারিসের রাস্তায় অবরোধ তৈরি করা হয়। 29th জুলাই রাজকীয় বাহিনী কোণঠাসা হয়ে পড়ে। প্রতিনিধি সভার সদস্যরা হস্তক্ষেপ করার ফলে লাফায়েতের নেতৃত্বে পৌরবাহিনী গঠিত হয়। 28th জুলাই থেকেই শুরু হয় দাঙ্গা। 29th জুলাই তা ভয়ঙ্করভাবে বেড়ে যায়। 30th জুলাই অবস্থা বেগতিক দেখে দশম চার্লস সিংহাসন ত্যাগ করতে সম্মত হন। তিনি তাঁর পৌত্র ডিউক অফ বর্দোর অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করে ইংল্যান্ডে পালিয়ে যান। কিন্তু উদারপন্থীরা বুরবোঁ বংশীয় শাসন উচ্ছেদ করে অরলেয়ঁ-র ডিউক (Duke of Orleans) লুই ফিলিপকে (Louis Philippe) সিংহাসনে বসাবার চেষ্টা করেন এবং শেষ পর্যন্ত তাই হয়। ফলে তিনটি গৌরবজনক দিন (Les trois glorieuses) অর্থাৎ 27-28-29 জুলাইয়ে যে বিপ্লব হলো তাতে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের বদলে বুর্জোয়া রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হলো। কিন্তু প্যারিসের জনতা বা প্রজাতন্ত্রীদের ইচ্ছানুযায়ী প্রজাতন্ত্র (Republic) হলো না।

এই বিপ্লব কি অনিবার্য ছিল? *ডেভিড টমসন* তা আদৌ মনে করেন না। *বেরি* (Bury) বা *ড্রজ* (Droz) মনে করেন, 1814-এর সনদে অনেক ত্রুটি ছিল এবং দশম চার্লসের রাজতান্ত্রিক ধারণার ফলে বিপ্লব অনিবার্য হয়ে পড়ে। বিপ্লবে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের পথ চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়।

জুলাই বিপ্লবের ফলাফল — ফ্রান্সে ঃ জুলাই বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে সাংবিধানিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলো। রাজার অপ্রতিহত ক্ষমতা বা নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র বা দৈব অধিকার ফ্রান্স থেকে বিলুপ্ত হলো। বরং 'জনসাধারণের দৈব ক্ষমতাই' প্রতিষ্ঠিত হলো বলা যায়, কেননা লুই ফিলিপ রাজা হলেন জনসাধারণের ইচ্ছানুসারে, তাঁর বংশগত পরিচয়ের জন্য নয়।

দ্বিতীয়তঃ, 1830 খ্রিস্টাব্দের 30th জুলাই দশম চার্লস সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি অবশ্য তাঁর পৌত্র বর্দোর ডিউকের অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করে ইংল্যাণ্ডে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। কিন্তু ফ্রান্সের সিংহাসনে বুরবোঁ বংশের বংশানুক্রমিক শাসনের অধিকার চিরতরে লুপ্ত হলো। ফ্রান্সের আইনসভা বুরবোঁ শাসনের অবসান ঘটিয়ে

অরলেয়ঁর ডিউক লুই ফিলিপকে সাংবিধানিক রাজা হিসেবে গ্রহণ করে। অরলেয়ঁ (ইংরেজি উচ্চারণে অর্লিয়েন্স, ফরাসি উচ্চারণে অরলেয়ঁ /Orleans) বংশীয় লুই ফিলিপ অবশ্য রাজা ষোড়শ লুইয়ের এক ভাইয়ের উত্তর পুরুষ। ডেভিড টমসন লিখেছেন, "Descended from a younger brother of Louis XVI, the Orleans family had been the traditional rivals to the Bourbons King।"[1] অরলেয়ঁ পরিবার বুরবোঁ পরিবারের শত্রু ছিল এ কথা সত্যি, তবে অরলেয়ঁগণ বুরবোঁদের সরিয়ে দেবার জন্য আদৌ কোনও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল না। ঘটনাচক্রে লুই ফিলিপ ক্ষমতা পেয়ে যান, তখন তাঁর বয়স সাতান্ন।[2]

তৃতীয়তঃ, জুলাই বিপ্লবের ফলে পুনরায় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলো। যদিও তা সাংবিধানিক রাজতন্ত্র (Constitutional Monarchy)। স্বৈরাচারী নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র নয়; দৈব অধিকার ভিত্তিক বংশানুক্রমিক শাসন নয়। তবে এর ফলে ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা আর রইলো না। এ ব্যাপারে লুইকে সাহায্য করেছিলেন ফরাসি বিপ্লবের (1789) আমলের বর্ষীয়াণ নেতা লাফায়েৎ। বিপ্লবের (জুলাই, 1830) অব্যবহিত পরে 31st জুলাই প্যারিসের টাউন হল বা ওতেল দ্য ভিল (Hotel de Ville)-এর বারান্দায় লাফায়েৎকে সঙ্গে নিয়ে লুই ফিলিপ যখন দাড়ালেন, তখন প্যারিসের জনতা তুমুল হর্ষধ্বনি করে। বুর্জোয়া শ্রেণী জনতার জনপ্রিয়তা কাজে লাগিয়ে প্রজাতন্ত্রী সরকারের হাত থেকে ফ্রান্সকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হয় এবং বুর্জোয়া রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে।

চতুর্থতঃ, জুলাই বিপ্লবে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল প্যারিস শহর। সমগ্র ফ্রান্স বা গ্রামীণ জনতা এতে তেমন অংশ নেয় নি। বস্তুত 1789-এর বিপ্লবের তুলনায় এই বিপ্লবের মেয়াদ নিতান্তই অল্প– তা 'তিন গৌরবজনক দিন'-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল (জুলাই 27-28-29)। তাছাড়া 1789-এর বিপ্লবের তুলনায় এই বিপ্লব ছিল শান্তিপূর্ণ। কোনও মৌলিক কর্মসূচির দ্বারাও বিপ্লব প্রভাবিত হয়নি। তবু ফল হিসাবে বলা যায় এই বিপ্লবে সমগ্র ফ্রান্সের সমর্থন ছিল। H. A. L. Fisher তাই মন্তব্য করেছেন, 'প্যারিস গোটা ফ্রান্সের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেয়।'

পঞ্চমতঃ, যদিও আপাতদৃষ্টিতে 1830 খ্রিস্টাব্দের জুলাই বিপ্লব তেমন বিপ্লবী পরিবর্তন ঘটায় নি তবু ফ্রান্সে এই বিপ্লবের ফল ছিল গুরুত্বপূর্ণ। অনেকে মনে করেন এই বিপ্লব ফ্রান্সের বিপ্লবী ঐতিহ্য জাগিয়ে তুললেও জাতির আশা-আকাঙ্খা পূরণে সফল হয়নি, কারণ বিপ্লবের চরিত্র ছিল রক্ষণশীল। কোবান, রবিনসন ও বিয়ার্ড প্রমুখ এই

---

1. ডেভিড টমসন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. 166

2. কোবান লিখেছেন, "There is no evidence, however, of the existence of any real conspiracy. The change in the dynasty was not a consciously calculated result of the 1830 revolution: it was a pragmatic response to largely fortuitous circumstances."
—দ্র. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. 94

মতের সমর্থক। কিন্তু *E. Lipson* -এ ব্যাপারে সঠিক মন্তব্য করেছেন, "The Revolution of 1830 was an event of great significance in the history of France।"[1] কারণ বিপ্লব যদিও প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেনি, রাজতন্ত্রের উচ্ছেদও করেনি তবু পুরাতনতন্ত্র, দৈব অধিকার, অভিজাত শ্রেণীর বিশেষ সুবিধা, যাজকতন্ত্র এগুলির অবসান ঘটায়।

ষষ্ঠতঃ, জুলাই বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে রাজতন্ত্র ফিরে এলো বটে তবে সাংবিধানিক অনেক পরিবর্তন ঘটলো। (i) অষ্টাদশ লুইয়ের প্রদত্ত 1814 খ্রিস্টাব্দের সনদকে সংশোধন করে ভোটাধিকারের পরিবর্তন করা হয়। 300 ফ্রাঁ-র জায়গায় 200 ফ্রাঁ কর প্রদানকারীদের ভোটের অধিকার দেওয়া হয়। (ii) ভিয়েনা সম্মেলনের ন্যায্য অধিকার বাতিল হয়ে যায়। ফলে বুরবোঁ রাজাদের বংশানুক্রমিক শাসনও বতিল হয়। নতুন রাজা লুই ফিলিপ সংবিধান মেনে দেশ শাসন করবেন, এই প্রতিশ্রুতি দিলে সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের সূত্রপাত হয়। (iii) সার্বভৌম ক্ষমতা যায় পার্লামেন্টের হাতে। (iv) অষ্টাদশ লুইয়ের সনদে 14নং ধারায় রাজার বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যবস্থা ছিল। এই সুযোগ নিয়েই দশম চার্লস জুলাই অর্ডিন্যান্স জারি করেছিলেন। এবার এই ধারা রদ করার ফলে রাজার ক্ষমতা কমে যায়। (v) জুলাই বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে আলট্রা রয়ালিস্ট বা উগ্র রাজতন্ত্রীদের প্রাধান্য চিরতরে লুপ্ত হয়। (vi) একইভাবে উচ্চ যাজক শ্রেণীর প্রাধ্যন্যও বিনষ্ট হয়। বিশেষত শিক্ষাব্যবস্থায় যাজক প্রাধান্য লুপ্ত হয়। এইভাবে রাজা, যাজক এবং অভিজাতদের ক্ষমতা খর্ব হওয়ার ফলে ফ্রান্সে সামন্ততন্ত্র (Feudalism), অভিজাততন্ত্র (Aristocracy), যাজকতন্ত্র (Clericalism), স্বৈরাচার (Absolutism) এবং পুরাতনতন্ত্র (Old order) ফিরে আসার পথ বন্ধ হয়ে যায়। *গর্ডন ক্রেগ* তাই মন্তব্য করেছেন, 'দশম চার্লসের আমলে যে ধরণের স্বৈরাচার স্থাপনের চেষ্টা হয়েছিল জুলাই বিপ্লব তা ধ্বংস করে।'

সপ্তমতঃ, *তক্‌ভিল* লিখেছেন যে জুলাই বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সের রাজনৈতিক জীবনে বুর্জোয়া শ্রেণীর নিরঙ্কুশ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলো। বস্তুত ভোটাধিকার সম্পদশালী ব্যক্তিদের হাতে থাকায় তারাই সরকার গঠন করে। গর্ডন ক্রেগও একই মতের সমর্থক। উচ্চ বুর্জোয়া শ্রেণী ফ্রান্সের প্রভাবশালী হওয়ায় ফ্রান্সে শিল্পায়নের পথ সুগম হয়। এছাড়া ক্রমশ শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রাধান্যও প্ররিলক্ষিত হয়। এমনকি 1830-এর পর সাধারণ লোক ও শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যেও রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়।

সর্বশেষে বলা যায় যে, 1830-এর জুলাই বিপ্লবে 1815-র বন্দোবস্তের ধ্বংসের সূচনা, যার পরিণতি লক্ষ্য করা যায় 1848-এর ফেব্রুয়ারি বিপ্লবে। বস্তুত জুলাই বিপ্লব শুধুমাত্র ফ্রান্সের ভৌগোলিক সীমানায় আবদ্ধ ছিলো না। এই প্রসঙ্গে *ফিশারের* মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—"প্যারিসের বিপ্লবী চুল্লি থেকে উড়ন্ত অগ্নিস্ফূলিঙ্গ ভিয়েনা কংগ্রেস বা ইয়োরোপীয় শক্তি সমবায় শাসিত ইয়োরোপের নিরস কাষ্ঠখণ্ডগুলির উপরে পড়ে এক দাবানলের সৃষ্টি করে।" জুলাই বিপ্লবের প্রভাব ইয়োরোপের অন্যান্য দেশেও পড়েছিল।

1. E. Lipson, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ 16.

জুলাই বিপ্লবের প্রভাব — ফ্রান্সের বাইরে : 1830 খ্রিস্টাব্দের জুলাই বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় ফ্রান্সের বাইরে নানা দেশেও। বস্তুতপক্ষে 1789 খ্রিস্টাব্দের ফরাসি বিপ্লব থেকেই ফ্রান্স ইয়োরোপের রাজনৈতিক ঝটিকাকেন্দ্র। এইজন্য এমন মন্তব্যও করা হয়েছে যে, 'যদি ফ্রান্সের সর্দি হয়, তাহলে ইয়োরোপের হাঁচি শুরু হয়।" জুলাই বিপ্লব যেহেতু ভিয়েনা বন্দোবস্ত তথা ন্যায্য অধিকারবাদকেই আঘাত করেছিল, তাই এই বিপ্লব ফ্রান্সের বাইরে জাতীয়তাবাদ, উদারপন্থা এবং গণতান্ত্রিক ভাবধারাকেও প্রভাবিত করে। ইতিহাসবিদ্ ফিশার সেই কারণেই স্ফুলিঙ্গ থেকে দাবানল সৃষ্টির কথা বলেছেন। জুলাই বিপ্লব যে বুরবোঁ বংশের ক্ষমতা উচ্ছেদ করে পার্লামেন্টের হাতে অধিক ক্ষমতা অর্পণ করে তাতে নিশ্চিতভাবে কর্মশীলতা ধাক্কা খায়। জুলাই বিপ্লবের প্রভাবে বেলজিয়ামে স্বাধীনতার বিদ্রোহ শুরু হয় এবং শেষ পর্যন্ত বেলজিয়াম হল্যাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন হয়। এছাড়া সুইটজারল্যাণ্ড, স্পেন, হল্যাণ্ড, ইতালি, ইংল্যাণ্ড, সুইডেন, পর্তুগাল, জার্মান সাম্রাজ্য সর্বত্রই জুলাই বিপ্লবের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

বেলজিয়ামের স্বাধীনতা : 1815তে ভিয়েনা সম্মেলন বেলজিয়ামকে হল্যাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছিল যা বেলজিয়ান বা বেলজিয়ামবাসীদের মনঃপূত ছিল না। কারণ এই সংযুক্তরাজ্যে ওলন্দাজ বা ডাচদের সংখ্যাধিক্য ছিল, প্রশাসনেও তাদের প্রাধান্য ছিল। যদিও স্টেটস্ জেনারেল সদস্য সংখ্যা প্রায় সমান সমান। এই পরিপ্রেক্ষিতে জুলাই বিপ্লব পরিবর্তন পন্থীদের সামনে সুযোগ এনে দেয়। সেই সময় বেলজিয়ামে দুটি ভিন্ন জাতি গোষ্ঠী ছিল — ওয়ালুন এবং ফ্লেমিশ।এরা উভয়েই ক্যাথলিক কিন্তু ভাষা ভিন্ন। ডাচরা ছিল ক্যালভিনপন্থী অর্থাৎ প্রোটেস্টান্ট। বেলজিয়াম ছিল শিল্পের পক্ষপাতী, ডাচদের মূল অর্থনৈতিক স্বার্থ ছিল বাণিজ্য। ডাচদের অবাধ বাণিজ্য নীতির ফলে বেলজিয়ামের মিলগুলি ধ্বংস হওয়ার সম্মুখীন হয়। সরকারি চাকরিতে বেলজিয়ানদের চাইতে ডাচরা অনেক বেশি নিযুক্ত হলে বেলজিয়ানদের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। আর ভাষাগত উৎপত্তির দিক থেকে বেলজিয়ানরা বেল্টিক এবং ডাচরা টিউটনিক। সুতরাং পাশাপাশি রাজ্য হলেও তাদের ভিন্নতা স্পষ্ট এবং সেই কারণেই বেলজিয়াম হল্যাণ্ডের সঙ্গে সংযুক্তি মানত না।

1830 খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে ফ্রান্সে বিপ্লবের ফলে স্বৈরাচারী দশম চার্লস্ তথা বুরবোঁ রাজতন্ত্রের পতন হলে বেলজিয়ামবাসীরা উদ্বুদ্ধ হয় এবং 25th আগস্ট ব্রাসেলস্ শহরে এক অভ্যুত্থান ঘটে। বেলজিয়ামের অন্যান্য শহরেও তা ছড়িয়ে পড়ে। বিদ্রোহীরা ব্রাসেলসে অবস্থিত ডাচ বাহিনীকে বিতাড়ণ করে এবং এক বিকল্প অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠা করে। এই সরকার 1830 এর 4th সেপ্টেম্বর বেলজিয়ামের স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ইতোমধ্যে হল্যাণ্ডের রাজা উইলিয়াম বিদ্রোহীদের দাবি মেনে নেওয়ার কোনও লক্ষণ না দেখলেও বিদ্রোহ দমন করতে বলপ্রয়োগের আশ্রয় নেননি। তিনি তাঁর দুই পুত্রকে

ব্রাসেলসে পাঠান। প্রিন্স অরেঞ্জ যথেষ্ট সাহসের সঙ্গে ব্রাসেলস্ শহরে প্রবেশ করে বেলজিয়ামবাসীদের স্বাধিকারের প্রতিই সমর্থন জানায়। তাঁর মতে দুই অংশ আলাদা। কেবল রাজার মাধ্যমেই দুই অংশ যুক্ত থাকবে। রাজা স্টেটস্ জেনারেল আহ্বান কারলে ঐ সভা 29th সেপ্টেম্বর বিযুক্তির পক্ষেই ভোট দেয়। আসলে বেলজিয়ামে রক্ষণশীল অভিজাতবর্গ এবং অপেক্ষাকৃত নবীন উদারপন্থী মধ্যবিত্ত একজোট হয়ে স্বাধীনতা চাইছিলেন। নভেম্বরে একটি নির্বাচিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন শুরু হয় এবং ঐ সভা পুনরায় 18th নভেম্বর বেলজিয়ামের স্বাধীনতা ঘোষণা করে। 1831-এর ফেব্রুয়ারিতে এক নতুন সংবিধান গৃহীত হয়, যা অনেক দিক থেকে গ্রহণীয় কেননা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র শুধু নয়, ঠিক হয় যে নির্বাচিত সংসদই রাজাকে মনোনীত করবে। সেই হিসেবে স্যাক্সবুর্গের লিওপোল্ডকে সিংহাসন দেবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে জুলাই মাসে প্রথম লিওপোল্ড সংবিধান রক্ষার শপথ নিয়ে রাজা হন।

এদিকে বেলজিয়ামের ঘটনা আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ঐ দেশের নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদকে ইয়োরোপের রক্ষণশীল শক্তিবর্গ দমন করতে চেয়েছিল। রুশ জার সৈন্য পাঠাবার প্রস্তাব দেয়। প্রাশিয়াও সৈন্য প্রস্তুত করে। অস্ট্রিয়ারও এ ব্যাপারে আপত্তি ছিল না। নিরুপায় বেলজিয়াম ফ্রান্সের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। ফ্রান্সের নতুন রাজা লুই ফিলিপও সহানুভূতিশীল ছিলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটেন বেলজিয়ামে রুশ-জার্মান অথবা ফরাসি কোনও হস্তক্ষেপেরই বিপক্ষে ছিলেন। তারাও বেলজিয়ামের স্বাধীনতা সমর্থন করত। ব্রিটেন 1830-এর নভেম্বরে লণ্ডনে এক সম্মেলন আহ্বান করে। ইতোমধ্যে পোল্যাণ্ড, জার্মানি, ইতালি ইত্যাদি অঞ্চলে বিক্ষোভ শুরু হলে বেলজিয়াম হস্তক্ষেপের প্রশ্ন ধামাচাপা পড়ে এবং 1830-এর ডিসেম্বরে লণ্ডন সম্মেলন বেলজিয়ামের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয়— এই সম্মেলনে ব্রিটেন, ফ্রান্স সহ পাঁচ শক্তি উপস্থিত ছিল। 1831-এর জানুয়ারিতে বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা স্বীকার করা হয়। ওলন্দাজ বাহিনী বেলজিয়াম আক্রমণ করলে ফ্রান্স সৈন্য পাঠায়। লণ্ডন সম্মেলনে বেলজিয়ামের সঙ্গে হল্যাণ্ডের সম্পর্ক নির্ধারিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত হল্যাণ্ড তা মেনে নেয়।

পোল্যাণ্ড : ভিয়েনা চুক্তির ফলে পোল্যাণ্ডের এক বৃহদাংশ রাশিয়ার অধীনে এবং বাকি অংশ প্রাশিয়ার অধীনে রাখা হয়েছিল। জার প্রথম আলেকজাণ্ডার রুশ অধিকৃত পোল্যাণ্ডকে স্বায়ত্তশাসন দিলেও তার মৃত্যুর পর নিকোলাস সেই অধিকার হরণ করেছিলেন। জুলাই বিপ্লবের প্রভাবে 1830-এর নভেম্বরে ওয়ারশ শহরে বিদ্রোহ শুরু হয়। গুপ্ত সমিতির সদস্যরা ও ছাত্রসমাজ ছিল নেতৃত্বে। রুশ সেনাবাহিনীর প্রধান প্রাক্তন জারের ভাই কনস্টান্টাইন ভয় পেয়ে পালিয়ে যান। বিদ্রোহীরা একটি অস্থায়ী সরকারও গঠন করে। জার নিকোলাস কোনও আলোচনা না করে সৈন্য পাঠিয়ে এই বিদ্রোহ দমন

করে। ইংল্যাণ্ড বা ফ্রান্স কেউ পোলদের সমর্থনে এগিয়ে আসেনি। এই ব্যর্থতার পরিণতিতে পোলদের অবস্থা আরও খারাপ হয়।

ইতালিতে : জুলাই বিপ্লবের ফলে ইতালিতে প্রবল উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় এবং ইতালির বিভিন্ন রাজ্যে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। মডেনাতে নতুন সংবিধান তৈরি করা হয়েছিল। পারমা থেকে মারি লুইস বিতাড়িত হয়েছিলেন। বোলোনাতে পোপের শাসনের নিরসন ঘটিয়ে সংযুক্ত মধ্য ইতালি প্রদেশ গঠন করা হয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও অস্ট্রিয়া সৈন্য পাঠিয়ে বলপূর্বক বিদ্রোহগুলি দমন করে। তাছাড়া বিদ্রোহীদের মধ্যেও অনৈক্য ছিল। কারবোনারি বা ঐ ধরণের গুপ্ত সমিতির দ্বারা বিক্ষোভ যে স্থায়ী সমর্থন আনতে পারবে না তা স্পষ্ট হয়। তবে এই ব্যর্থতার ফলে ম্যাটসিনির আবির্ভাব ঘটে এবং ইতালিবাসী বুঝতে পারে যে অস্ট্রিয়া তাদের প্রধান শত্রু।

জার্মানিতে : ফ্রান্সের পাশেই জার্মান রাষ্ট্রগুলিতে স্বাভাবিকভবে জুলাই বিপ্লবের প্রভাব পড়ে। ফলস্বরূপ ব্রানশ্‌উইকে-র শাসকবিতাড়িত হয়েছিলেন এবং হ্যানোভার, হেস-কাসেল, স্যাক্সনিতে সংবিধান জারি করা হয়। গটিনজেন, লাইপজিগ, ড্রেসডেন প্রভৃতি শহরেও বিক্ষোভ দেখা দেয়। কিন্তু মেটারনিখের নেতৃত্বে প্রতিক্রিয়া সক্রিয় হয়ে ওঠে। অস্ট্রিয়া-রাশিয়া-প্রাশিয়া বিপ্লবী আন্দোলন দমন করবার জন্য পরস্পরকে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দেয়। মেটারনিখ আইনের সংশোধন করে বিভিন্ন জার্মান রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও হস্তক্ষেপের বন্দোবস্ত করেন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উদারপন্থী ও জাতীয়তাবাদী অধ্যাপকদের বরখাস্ত করা হয়। জার্মান জাতীয়তাবাদকে আঘাত করা হলো।

অন্যান্য দেশে : মধ্য ইয়োরোপের বিভিন্ন স্থানে উদারপন্থী আন্দোলন দেখা যায়। সুইটজারল্যাণ্ডের ক্যান্টনগুলি, স্পেন, পর্তুগালে উদারপন্থী সংবিধান গৃহীত হয়। এমনকি ইংল্যাণ্ডেও জুলাই বিপ্লবের ফলে কিছু শাসনতান্ত্রিক সংস্কার হয়। সুইডেনের রাজা নরওয়ের স্বায়ত্তশাসনের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হন। ব্যাপক প্রভাব বা স্থায়ী পরিবর্তন আনতে না পারলেও 1830-এর জুলাই বিপ্লব সমগ্র ইয়োরোপে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল।

৫। ফেব্রুয়ারি বিপ্লব (1848): কারণ, ফলাফল ও প্রতিক্রিয়া

লুই ফিলিপ এবং জুলাই রাজতন্ত্র : 1830 খ্রিস্টাব্দে জুলাই বিপ্লবের ফলে ভিয়েনা কংগ্রেসের পর যে বুরবোঁ বংশীয় শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার অবসান হয় এবং জুলাই বিপ্লবের নেতৃবর্গ অরলেয়ঁ বংশীয় লুই ফিলিপকে আহ্বান জানালে তিনি সংশোধিত সংবিধান মেনে শাসন চালাবার শপথ নিয়ে রাজা হন। যেহেতু জুলাই বিপ্লবের ফলেই লুই ফিলিপ সিংহাসন লাভ করেছিলেন তাই এই রাজতন্ত্রকে 'জুলাই রাজতন্ত্র' বলে। লুই ফিলিপ 1830-এর জুলাই-এর পর থেকে 1848-এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রায়

আঠারো বছর রাজত্ব করেছিলেন এবং 1848-এর ফেব্রুয়ারি মাসে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের ফলে তিনি শাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হন। তখন ফ্রান্সে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কিছুকাল পরে তৃতীয় নেপোলিয়ানের অধীনে দ্বিতীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কি কি কারণে ফ্রান্সে ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ঘটেছিল তার ব্যাখা ঐতিহাসিকেরা দিয়েছেন এবং একথাও দেখিয়েছেন যে, ঐ ফেব্রুয়ারি বিপ্লব শুধু মাত্র ফ্রান্সে তাৎপর্যপূর্ণ ফল ফলিয়েছিল এমন নয়। সমগ্র ইয়োরোপে এই বিপ্লবের প্রভাব লক্ষ্য করা গিয়েছিল। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের কারণ ও ফলাফল আলোচনা করার আগে লুই ফিলিপের রাজত্বকাল সম্পর্কে একটু আলোচনা করা দরকার।

1830 থেকে 1848-এর মধ্যেকার ফ্রান্সের ঘটনাবলী তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। প্রথম পর্ব 1830 থেকে 1836 খ্রিঃ; যখন নিরবিচ্ছিন্নভাবে গোলমাল ও বিশৃঙ্খলা লেগে ছিল। দ্বিতীয় পর্ব 1836 খ্রিঃ থেকে 1846 খ্রিঃ যখন জুলাই রাজতন্ত্র ছিল স্থিতিশীল এবং তৃতীয় পর্ব 1846 খ্রিঃ থেকে 1848 খ্রিঃ যখন বিভিন্ন কারণ একজোট হয়ে ফ্রান্সকে আবার বিপ্লবের দিকে ঠেলে দিয়েছিল।

লুই ফিলিপ ছিলেন অরলেয়ঁ (Orleans) -এর ডিউক; যখন রাজা হলেন তখন বয়স সাতান্ন, অর্থবান, সম্ভ্রান্ত অথচ অনাড়ম্বর। তাঁর পিতা ছিলেন ফিলিপ এগালিতেঁ। পিতা পুত্র দু'জনই বরাবর ষোড়শ লুই তথা বুরবোঁদের বিরোধী ছিলেন। তবে প্রজাতন্ত্রে তাদের সমর্থন ছিল না যদিও লুই ফিলিপ উদারপন্থার সমর্থক ছিলেন। এই কারণে তিনি উচ্চ বুর্জোয়া শ্রেণীর সমর্থন পেয়েছিলেন। 1830-এর পর জুলাই রাজতন্ত্রে লুই ফ্রান্সের নয়, ফরাসিদের রাজা হলেন।

বস্তুত নতুন রাজতন্ত্রের অনেক বৈশিষ্ট্য ছিল আগেকার রাজতন্ত্র থেকে ভিন্ন। অষ্টাদশ লুই যেমন নিজের অনুগ্রহে সনদ বা চার্টার অনুমোদন করেছিলেন, তেমন নয়। বরং নতুন সংবিধান সনদ হলো রাজার সঙ্গে জনগণের যুক্তির ফল। 1814-র সনদ পরিবর্তন আইনসভার হাতে দেওয়া হলো। সেখানে যে 14 নং ধারা ছিল অর্থাৎ রাজার বিশেষ ক্ষমতাবলে আদেশ জারির ক্ষমতা, তা বাতিল করা হলো। রাজার ব্যক্তিগত খরচের পরিমানও কমিয়ে দেওয়া হলো। বিলুপ্ত হলো সেন্সর প্রথা। ক্যাথলিক ধর্ম হলো ফ্রান্সের সংখ্যাধিক্যের ধর্ম। আইনসভা বা চেম্বারের সভাপতি নির্বাচন করবেন সদস্যরাই। আইনসভার ক্ষমতাও বাড়ানো হলো। ভোটাধিকারের ভিত্তি হলো প্রসারিত। ভোটদাতা হতে গেলে অন্ততঃ 25 বছর বয়স হতে হবে, ডেপুটি হিসেবে নির্বাচনে দাড়াতে হলে বয়স অন্তত 30 হওয়া চাই। বার্ষিক 200 ফ্রাঁ কর দিলেই ভোটদাতা হওয়া যেত। প্যারিসের বিভিন্ন কমিউনকে নিজেদের পরিষদ নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হলো। কমিউন নিজেরাই একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করতে পারত। জুলাই বিপ্লবের তেরঙ্গা পতাকা হলো ফ্রান্সের জাতীয় পতাকা। এতদসত্ত্বেও জুলাই রাজতন্ত্র গণতান্ত্রিক নয়, এখানে যেন উচ্চবিত্ত

বা বুর্জোয়া শ্রেণীরই প্রাধান্য। বস্তুত জুলাই বিপ্লব ছিল অসম্পূর্ণ বিপ্লব, জনগণের আশা-আকাঙ্খা পূর্ণ হয়নি। ফ্রান্সের রাজনীতিতে নানা গোষ্ঠী তখনও বিরাজমান— যেমন রাজবিরোধী লেজিটিমিস্ট গোষ্ঠী ছিলেন বুরবোঁ রাজতন্ত্রের সমর্থক। রাজ-বিরোধী আন্দোলনের দল এদের থেকে আলাদা কারণ তারা প্রজাতন্ত্রী, রাজ সমর্থক প্রতিরোধের দল নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী। ব্রগলি (Broglie), তিয়ের (Theirs), গিজো (Guizot) প্রমুখ এই দলে ছিলেন।

জুলাই থেকে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের মধ্যে ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্রের প্রতি সমর্থন বাড়তে থাকে। শেষ পর্যন্ত 1848-র বিপ্লবের পরে প্রতিষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র। (আমরা পরে যথাস্থানে তা আলোচনা করব)। এখানে যা বলা দরকার তা হলো, প্রজাতন্ত্রের প্রতি সমর্থনের এমনকি অগ্রগতিই ফেব্রুয়ারী বিপ্লবকে তরান্বিত করেছিল। তাই হয়তো অঁরি গিলম্যাঁ (Henri Guillemin) ঐ বিপ্লবকে বলেছেন, 'প্রজাতন্ত্রের প্রথম পুনরুজ্জীবন'। আগে অনেকেই প্রজাতন্ত্র বলতে সন্ত্রাস, গিলোটিন বা জ্যাকবাঁ-বাদ (Jacobinism) বুঝতেন, 1830-এর পর সেই ধারণা বদলে যায়। স্বৈরাচারের বদলে অনেকে যেমন নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র চাইতেন, তেমনি প্রজাতন্ত্র হলো অনেকের আদর্শ।

সম্প্রতি *মরিস আগুলঅঁ* (Maurice Agulhon) তাঁর *Republican Experiment (1848-52)* গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে 1830 থেকে 1848 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে জুলাই বিপ্লবের পরে প্রজাতন্ত্রীরা খোলাখুলিভাবে রাজনৈতিক জীবনে অংশ নেন এবং সাধারণ মানুষদের রাজনৈতিক মানসিকতারও পরিবর্তন ঘটেছিল। এই প্রজাতন্ত্রী শক্তির বা আদর্শের বিরোধিতা লুই ফিলিপকে দুর্বল করেছিল।

তেমনি ফ্রান্সে শিল্পায়নের প্রসার, নতুন শ্রমিক শ্রেণীর উত্থান, শ্রমজীবীদের উপর আদি সমাজতান্ত্রিকদের প্রভাব ফ্রান্সের অবস্থা বদলে দেয়। শহরাঞ্চলে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ফ্রান্সের আর্থ সামাজিক ব্যবস্থার ত্রুটি অনেক লেখকের রচনায় ফুটে ওঠে— যেমন প্রুঁধ (Proudhon), ফুরিয়ে (Fourier), সাঁ সিমঁ (Saint Simon), লুই ব্লাঁ (Louis Blanc) প্রমুখ। *তক্‌ভিলের* মতে এ সময় শ্রমিক শ্রেণীর জাগরণ ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। লুই ফিলিপের বুর্জোয়া রাজতন্ত্রে এদের আশা পূরণ না হওয়াও ফেব্রুয়ারি বিপ্লবকে তরান্বিত করেছিল।

সরকার-বিরোধী আর একটি গোষ্ঠী ছিল বোনাপার্টিস্ট যারা নেপোলিয়ান বোনাপার্টের কিংবদন্তীকে ঘিরে বেড়ে উঠেছিল। এদের নেতা লুই নেপোলিয়ান দু'বার (1836, 1841) ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন। পরে অবশ্য ইনি ক্ষমতায় আসেন। (সেই সম্পর্কে যথাস্থানে আলোচনা হবে)।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে 1830 খ্রিস্টাব্দ থেকে 1848 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ফ্রান্সের ঘটনাবলীকে তিনভাগে বিভক্ত করে নিলে আলোচনার সুবিধা হয়। এর মধ্যে

1830 খ্রিঃ থেকে 1836 খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বিপ্লবের ফলে উদ্ভূত উদ্দীপনা যেমন ছিল, তেমনি ছিল বিশৃঙ্খলা। অজস্র রাজনৈতিক ক্লাব ও সোসাইটি, সংবাদপত্র, প্রজাতন্ত্রের সমর্থক গোষ্ঠী, বুরবোঁ সমর্থক গোষ্ঠী প্রভৃতির গোলমাল, প্যারিস ও লিয়ঁতে বিক্ষোভ ইত্যাদির বিরুদ্ধে ছিল সরকারের নিয়ন্ত্রণ নীতি। এই দমননীতি অনেকটা সফলও হয়েছিল।

1836 খ্রিঃ থেকে 1846 খ্রিঃ পর্যন্ত লুই ফিলিপের রাজত্বকালে ফ্রান্সের রাজনীতি ছিল অনেকটা স্থিতিশীল। ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অগ্রগতিও সম্ভব হয়েছিল। অধ্যাপক সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী লিখেছেন, "বলা যায় যে,১৮৩৫-এর শেষ নাগদ লুই ফিলিপের রাজত্ব যে রূপ গ্রহণ করে, মোটের উপর সেটাই ১৮৪৮ অবধি বজায় ছিল। সংসদীয় রাজতন্ত্রের মোটামুটি দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ফ্রান্সের এ সময়েই হয়েছিল। সংসদীয় রাজনীতিতে দক্ষ মানুষেরও অভাব ছিল না। কিন্তু এ সত্ত্বেও কোন মন্ত্রীসভা বেশীদিন টিকতে পারেনি। ১৮ বছরে ১৭টি মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছিল। এর জন্য দায়ী ছিল রাজার সমর্থক গোষ্ঠীর নিজেদের মধ্যে বিভেদ ও একই সঙ্গে রাজার ব্যক্তিগত শাসন প্রতিষ্ঠা করার গোপন বাসনা। এছাড়া ছিল ডেপুটিদের আপন আপন স্বার্থ চরিতার্থ করার নীতি বা ভোটদাতার সংখ্যা সীমিত থাকার ফলে বৃহত্তর জাতীয় জীবনের সঙ্গে তাদের যোগাযোগের অভাব।"

লুই ফিলিপ শাসক হিসেবে বিচক্ষণ ছিলেন। তিনি প্রথমে 'নাগরিক রাজা' হিসেবে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র বজায় রেখে চলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু 1840-এর পর থেকে মুখে সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের কথা বললেও মনে মনে নিজের স্বৈরতন্ত্রী ক্ষমতা বজায় রাখতে তৎপর হন। মন্ত্রিসভায় কাজকর্মের উপর নিজের প্রভাব বাড়াবার চেষ্টা করেছেন। তাছাড়া তাঁর সমর্থক গোষ্ঠীর মধ্যেও নানা ধরণের মানুষ ছিলেন এবং তাদের মতামতও একধরনের ছিল না। একের পর এক মন্ত্রিসভার পরিবর্তন ফ্রান্সে সমস্যা সমাধানে সহায়ক ছিল না। তাছাড়া ছিল রাজ-বিরোধী ষড়যন্ত্র। আভ্যন্তরীণ নীতিতে সংস্কারের অভাব যেমন ছিল, তেমনি বিদেশনীতিতেও চমকের অভাব ছিল। ফলে ফ্রান্স ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। সেই সময় ফরাসি বিপ্লবের (1789) ইতিহাসের চর্চা নতুন ক'রে শুরু হয় এবং বিপ্লবের বিভিন্ন পর্বের মূল্যায়ণ এবং বিপ্লবের ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে ফরাসিদের নতুন ক'রে সচেতন করে তোলে। কবি-সাহিত্যিকদের রচনাও জনমানসে প্রভাব ফেলে।

এই পরিস্থিতিতে 1846 খ্রিস্টাব্দের পর থেকে নানাবিধ কারণ একত্রিত হয়ে ফ্রান্সকে আবার বিপ্লবের দিকে ঠেলে দেয়। অর্থনৈতিক সঙ্কট, অপরিণামদর্শী বিদেশ নীতির সঙ্গে নির্বাচন সংস্কারের দাবি এবং সংস্কারের ক্ষেত্রে নানা মন্ত্রিসভা তথা রাজা লুই ফিলিপের ব্যর্থতা জুলাই রাজতন্ত্রের পতন ডেকে আনে।

ফেব্রুয়ারি বিদ্রোহের কারণ : জুলাই বিপ্লব থেকে ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ঘটে যাওয়ার মধ্যে অর্থাৎ 1830 খ্রিস্টাব্দ থেকে 1848 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ফ্রান্সের জুলাই রাজতন্ত্র জনগণের আশা-আকাঙ্খা পূরণে সফল হয়নি। অধ্যাপক *চার্লস্ হ্যাজেন* লিখেছেন যে,

'জুলাই রাজতন্ত্র ছিল বুর্জোয়া শ্রেণীর, ধনীর এবং পুঁজিবাদদের সরকার।' লুই ফিলিপ এর এই 'বুর্জোয়া রাজতন্ত্র', সংসদীয় ব্যবস্থা বজায় রাখলেও মন্ত্রিসভার সঙ্গে রাজার বিবাদ এবং মন্ত্রিসভার দ্রুত পরিবর্তন ফ্রান্সের যে জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল, ফ্রান্সের সব শ্রেণীর মানুষের বিশেষত পাতি-বুর্জোয়া বা নিম্ন বুর্জোয়াদের আশাপূরণে তা সহায়ক ছিল না। ফলে বিপ্লব বা পরিবর্তন ঘটেছিল। ফ্রান্সের অবস্থা প্রসঙ্গে এমন মন্তব্যও করা হয়েছিল যে ফ্রান্সে রাজনৈতিক বিপ্লবের দিন শেষ, ভবিষ্যতে বিপ্লব হলে তা হবে সামাজিক বিপ্লব। মন্তব্যটি স্টাইন নামক জনৈক জার্মানের। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের ঠিক আগে ফরাসি কবি লামার্তা বলেন যে, বিপ্লব হবেই এবং তা হবে 'জনগণের বিবেকের বিপ্লব'(revolution of the public conscience)। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের কারণগুলি ঐতিহাসিকগণ আলোচনা করেছেন।

প্রথমতঃ, 1846 এবং 1847খ্রিঃ পরপর দু'বছর শস্য ও কৃষি উৎপাদন আশানুরূপ না হওয়াতে সঙ্কট দেখা দেয়। রুটির দাম বেড়ে যায় এবং 1844 এর দামের দ্বিগুণ হয়। যন্ত্রশিল্পেও মন্দা দেখা দেয়। সাধারণ মানুষ প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে অপারগ হয়। শ্রমিকদের মজুরি কমে, বেকারী বাড়ে, বহু ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়। বেহিসেবী ফাটকাবাজি চলতে থাকে। এই অর্থনৈতিক সঙ্কট সামাজিক সঙ্কটও সৃষ্টি করে। নানা শ্রেণীর মানুষ সরকার বিরোধী হয়ে ওঠেন।

দ্বিতীয়তঃ, *জ্যাক দ্রজের* মতে সঙ্কট 1848-এ অনেকটা কেটে যায়। আর্থ-সামাজিক সঙ্কটের জন্য বিপ্লব হলে তা 1847-এই হত। তাঁর মতে লুই ফিলিপ বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থ দেখার ফলে এক শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে অপর শ্রেণীর মানুষের দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এই শ্রেণী বৈষম্য বিপ্লবের জন্য প্রধানত দায়ী। তবে *কার্ল মার্ক্স* লিখেছেন যে ফেব্রুয়ারিতে বিপ্লবের অর্থ ছিল রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্তন। পরে জুন মাসে বিপ্লবের রূপ বদলে গিয়ে বিপ্লবের অর্থ দাড়ায় বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার অবসান। অনেকটা একই মত তক্ভিল পোষণ করতেন।

তৃতীয়তঃ, অপরিণামদর্শী বিদেশ নীতি। বিশেষ করে স্পেনীয় বিবাহ সংক্রান্ত নীতিকে কেন্দ্র করে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে শত্রুতা ফরাসি জনগণের কাছে লুইয়ের জনপ্রিয়তা কমিয়ে দেয়। বস্তুত লুই আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয় নীতির ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করার ফলে মানুষদের আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হন।

চতুর্থতঃ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে বিরোধিতা জুলাই রাজতন্ত্রের ভিত্তিকে দুর্বল করে দিয়েছিল। রাজতন্ত্রী, প্রজাতন্ত্রী, বোনাপার্টিস্ট, সমাজতন্ত্রী প্রভৃতি নানা দলের পার্থক্য প্রায় সকলেই ফিলিপের মধ্যপন্থী শাসনব্যবস্থার প্রতি বিরূপ ছিলেন।

পঞ্চমতঃ, জুলাই রাজতন্ত্র শ্রমিক শ্রেণীর উন্নতি সাধনে ব্যর্থ হয়েছিল। 1831-এ ফ্রান্সের লিয়ঁতে (Lyons) শ্রমিকদের প্রথম সশস্ত্র বিক্ষোভ দেখা যায়। অধ্যাপক বেরি

(J. P. Bury– উচ্চারণ বিউরি নয়) লিখেছেন যে, এই বিক্ষোভকে সমাজতন্ত্রের আবির্ভাবও বলা যেতে পারে।[1] লুই ব্লাঁ ছিলেন প্রথম শ্রমজীবী আন্দোলনের নেতা। শার্ল ফুরিয়ে বা সাঁ সিঁম ছিলেন আদি (যাদের মার্ক্স বলেছেন কাল্পনিক বা ইউটোপিয়ান) সমাজতান্ত্রিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। লুই ব্লাঁ উচ্চবুর্জোয়াদের সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন।[2] *ম্যারিয়ট* দেখিয়েছেন যে, শ্রমিক অসন্তোষ ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের অন্যতম কারণ।

ষষ্ঠতঃ, বিপ্লবের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল সাধারণ মধ্যবিত্ত বা পাতি বুর্জোয়া শ্রেণী কর্তৃক ভোটাধিকার বাড়াবার দাবি। বিশেষত নির্বাচন সংক্রান্ত সংস্কারের দাবিতে বহু মানুষ সামিল হন। শেষ পর্যন্ত সার্বজনীন ভোটাধিকারের দাবি উঠে যায়। তখনও পর্যন্ত লুইকে অপসারণের কথা বেশি লোক চিন্তা করেন নি। কিন্তু গিজোর রক্ষণশীল মনোভাব এবং লুই ফিলিপের সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার ব্যাপারে ব্যর্থতা বিপ্লব ডেকে আনে। শেষ মুহূর্তে রাজা গিজো-কে বরখাস্ত করে মোলে-কে মন্ত্রিসভা গঠনের আহ্বান জানিয়েও শেষ রক্ষা করতে পারেন নি।

ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ঃ ফ্রান্সে বিপ্লব ঘটে 1848 খ্রিস্টাব্দের 22-23-24 ফেব্রুয়ারি। বস্তুত এর কিছুদিন আগেই আলেক্সিস দ্য তক্‌ভিল (Alexis de Tocqueville) মন্তব্য করেছিলেন, "আমরা একটি আগ্নেয়গিরির ওপরে ঘুমিয়ে আছি ..... বিপ্লবের হাওয়া বইছে, দিগন্তে ঝড়ের আভাষ"।[3]

1830 খ্রিস্টাব্দের মতন 1848 খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবেও প্রধান অংশ নেয় প্যারিস। গোটা ফ্রান্স বিপ্লবে এগিয়ে আসে নি। ফেব্রুয়ারি বিপ্লব শহুরে বিপ্লব। শহরেই, বিশেষত প্যারিসে নানা মানবাধিকার রক্ষাসমিতি স্থাপিত হয়েছিল যারা ভোটাধিকার বাড়াবার জন্য প্রচার চালাত। এছাড়া গঠিত হলো অনেক সংস্কারকামী ভোজসভা (Reform Banquets), প্রজাতন্ত্রী, বোনাপার্টের সমর্থক, এমনকি মধ্যপন্থী তিয়ের প্রমুখও সংস্কারের দাবী তোলেন। ল্যদ্রু-রলাঁ সার্বজনীন ভোটাধিকার দাবি করেন। মূল প্রশ্ন হয়ে দাড়ায় ভোটাধিকারের ব্যাপ্তি।

এই পরিস্থিতিতে 1848 -এর 22nd ফেব্রুয়ারি প্যারিসের বুলেভার্ডেতে ভোটাধিকার সম্প্রসারণ ও রাজনৈতিক সংস্কারের দাবিতে এক কেন্দ্রীয় জমায়েত আহুত হয়েছিল। মন্ত্রী গিজো এই সভা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। দাঙ্গা ও বিক্ষোভ শুরু হয়ে যায়। জনগণ গিজোর পদত্যাগ দাবি করে। শহরের রাস্তায় দেখা যায় উত্তাল শোভাযাত্রা; শ্রমিক প্রধান এলাকায় ব্যরিকেড করে পথ অবরোধ করা হয়; জনতার মুখে শ্লোগান 'সংস্কার দীর্ঘ জীবী হোক'। 23rd ফেব্রুয়ারি ক্ষিপ্ত জনতা গিজোর বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। সেই সময় হঠাৎ কারো পিস্তল থেকে ভুলক্রমে একটি গুলি বেরিয়ে পড়লে,

1. J. P. T. Bury, *France*, 1815-1840. p52.
2. C. D. Hazen, *Europe Since* 1815, p 118
3. উদ্ধৃতির জন্য, সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. 408

সেনাবাহিনী পালটা ব্যাপক গোলাগুলিবর্ষণ করে। তাতে কুড়ি জন বিক্ষোভকারী মারা যায়। জনতা এবার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। সন্ত্রস্ত রাজা লুই ফিলিপ গিজোকে পদচ্যুত করে মোলেকে মন্ত্রিসভা গঠনের আহ্বান জানান। মোলে অসম্মত হন। উদারতন্ত্রী, প্রজাতন্ত্রী, সমাজতন্ত্রী সব দলই বিপ্লবে অংশ নেয়। শেষ পর্যন্ত 24th ফেব্রুয়ারি লুই ফিলিপ পৌত্র কঁত দ্য পারীর অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করতে রাজী হন। জুলাই রাজতন্ত্রের পতন হলো কেননা, গিজোর পদত্যাগ এবং লুই ফিলিপের সিংহাসন ত্যাগে উদারপন্থীরা খুশি হলেও প্রজাতন্ত্রী জনতা 24th ফেব্রুয়ারি পার্লামেন্টে প্রবেশ করে এক অস্থায়ী প্রজাতান্ত্রিক সরকার গঠন করে।

এইভাবে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হয়। সর্বসাধারণের ভোটাধিকারও স্বীকৃত হয়। এই সরকারের নেতৃত্বে রইলেন দ্যুপঁ দ্য লিউর, আরোগো, লামার্তা, ল্যদ্রু-রলাঁ প্রমুখ। একই দিনে (24th ফেব্রুয়ারি) সমাজতন্ত্রী দলও লাল পতাকা নিয়ে কল-কারখানায় এবং প্যারিসের রাস্তায় শোভাযাত্রা করে এবং পার্লামেন্ট ভবন প্রজাতন্ত্রীদের হাতে থাকায় 'ওতেল দ্য ভিলে'-তে আর একটি সমাজবাদী সরকার গঠন করে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য দুই সরকারের মধ্যে সংঘর্ষ এড়াতে প্রজাতন্ত্রী সরকারে সমাজতন্ত্রীদের কয়েকজনকে নেওয়া হয়। এদের মধ্যে ছিলেন লুই ব্লাঁ, মারাস্ত, ফ্লঁক ও শ্রমিক আলবেয়র (Albert)। প্যারিসের পাতি বুর্জোয়া জনগণ অবশ্য সমাজতন্ত্রীদের সরকারের চাইতে প্রজাতন্ত্রকেই নিরাপদ মনে করে। যাই হোক, ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের ফলে জুলাই রাজতন্ত্রের অবসান ঘোষিত হলো।

ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের গুরুত্ব ও ফলাফল—ফ্রান্সে ঃ 1848 খ্রিস্টাব্দের বিপ্লব ফ্রান্সে ফেব্রুয়ারি মাসে হয়েছিল বলে এই বিপ্লবকে ফেব্রুয়ারি বিপ্লব বলে। এই বিপ্লব ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ফেব্রুয়ারি মাসের 24th তারিখে বৃদ্ধ রাজা লুই ফিলিপ (প্রায় পচাত্তর বছর বয়স) সিংহাসন ত্যাগ করলেন তাঁর শিশু পৌত্রের অনুকূলে (পুত্র আগেই মারা গিয়েছিল)। বিপ্লবী জনতা ও নেতৃবর্গ, যাদের মধ্যে নানা গোষ্ঠীরই লোকজন ছিলেন, তারা এতে সন্তুষ্ট না হয়ে রাজতন্ত্রকেই উচ্ছেদ ক'রে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে। এর আগে 1789-এর ফরাসি বিপ্লবের পর, রাজা ষোড়শ লুই এবং বুরবোঁ রাজতন্ত্র-এর উচ্ছেদ করে ফ্রান্সের ইতিহাসে প্রথম প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হয়েছিল। তারপর আবার রাজতন্ত্রের প্রত্যাবর্তন হয় নেপোলিয়ানের হাতে। সুতরাং 1848-এর প্রজাতন্ত্রকে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র (The Second Republic) বলা হয়। জুলাই রাজতন্ত্রের অবসান এবং দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ফ্রান্সে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের প্রথম ও প্রধান ফল।

দ্বিতীয়তঃ, ফ্রান্সে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হবার পর সর্বসাধারণের ভোটাধিকার স্বীকৃত হলো। এপ্রিল মাসে নতুন পার্লামেন্টের নির্বাচনের ব্যবস্থার কথাও ঘোষণা করা হলো।

বিদেশী আক্রমণের মোকাবিলা করবার জন্য সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করার ব্যবস্থা হলো এবং সেই সঙ্গে বেতন ও রেশনের ব্যাপারে সংস্কার প্রবর্তন করা হলো। ঠিক হলো প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকে জাতীয় রক্ষিবাহিনী বা ন্যাশানাল গার্ডের কাজ করতে হবে। আগে কেবলমাত্র বুর্জোয়া শ্রেণীর লোকেদের দ্বারাই এই বাহিনী গঠিত ছিল। এছাড়া পনেরো হাজার লোক নিয়ে প্যারিসে এক ভ্রাম্যমান রক্ষিবাহিনীও গঠন করা হলো। এগুলি ছাড়া ক্রীতদাস প্রথা লোপের আইন করা হয় এবং ফ্রান্সের উপনিবেশে যে-সব ক্রীতদাস ছিল তাদের মুক্তি দেওয়া হয়।

তৃতীয়তঃ, সামাজিক শৃঙ্খলা ও রাজনৈতিক স্থিতি প্রতিষ্ঠার পথে সব থেকে বড়ো অন্তরায় ছিল অর্থনৈতিক সমস্যাজনিত সঙ্কট। প্যারিসে বেকার সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করেছিল। প্রজাতান্ত্রিক সরকারের মন্ত্রিসভা 25th ফেব্রুয়ারি সকল নাগরিকের কাজ পাওয়ার অধিকার (right to work) মেনে নিলেও সমস্যা দেখা দিল— কিভাবে এটি কার্যকর করা হবে তা নিয়ে। মন্ত্রিসভার সদস্য লুই ব্লাঁ এব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনি অবাধ বাণিজ্যের বদলে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে শিল্পের পক্ষপাতী ছিলেন। সমাজতান্ত্রিক চিন্তার বাস্তব প্রয়োগ করার কথাও তিনি ভেবেছিলেন। ফরাসি সরকার লুই ব্লাঁর চিন্তায় প্রভাবিত হয়ে 'জাতীয় কারখানা' (National Workshops) প্রতিষ্ঠা করল। এই কারখানা জনপ্রিয় হয় কেননা এখানে বেকাররা নাম নথিবদ্ধ করতে পারত এবং কাজ না পেলেও বেকার ভাতা পেত।

চতুর্থতঃ, প্রজাতান্ত্রিক সরকারের কার্যকলাপ শীঘ্রই দেশে মতানৈক্যের সৃষ্টি করে। নতুন ব্যবস্থা গ্রামাঞ্চলের জমির মালিক, কৃষক শ্রেণী ও রক্ষণশীল মানুষদের খুশি করতে পারেনি। কৃষকরা তাদের সম্পত্তির অধিকার পেয়ে তা রক্ষা করতেই অধিক আগ্রহী ছিল। বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়। আবার সরকারের নরমপন্থী প্রজাতান্ত্রিক দল ও নেতারা ভয় পেয়ে যায়। তাদের ভয়ের উৎস ছিল রাজনৈতিক বিপ্লবকে সামাজিক বিপ্লবে রূপান্তরিত করার চেষ্টা। অন্যদিকে সমাজতন্ত্রীরা নির্বাচন পিছিয়ে দেবার দাবিতে, মানুষ মানুষকে শোষণ বন্ধ করার দাবিতে এবং একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র করার দাবিতে বিক্ষোভ দেখায় শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে। এই বিরোধের প্রতিফলন দেখা যায় 1848-এর এপ্রিলের নির্বাচনে। এমনিতে একুশ বছর বয়স্ক সার্বিক ভোটের ফলে ভোটদাতা দু'লক্ষ থেকে নব্বই লক্ষ হয়ে দাড়ায়; তদুপরি সমাজতন্ত্রী ও চরমপন্থীরা হেরে যায়, জয় হয় নরমপন্থী প্রজাতান্ত্রিকদের। প্রজাতান্ত্রিকদের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিকদের বিচ্ছেদ চরম আকার নেয়, প্রথমে মে মাসের শ্রমিক বিক্ষোভে এবং পরে জুন মাসের সংঘর্ষে। জেনারেল কাভেইনাকের অধীনে জাতীয় রক্ষিবাহিনী বিদ্রোহী শ্রমিকদের হতাহত করে। জর্জ রুদে লিখেছেন যে, বিদ্রোহীদের সংখ্যা ছিল প্রায় এক লক্ষ। *তক্ভিল* এবং *কার্ল মার্ক্স*, উভয়েই এই জুন সংঘর্ষকে শ্রেণী সংগ্রাম আখ্যা দিয়েছেন।

পঞ্চমতঃ, শেষ পর্যন্ত 1848-এর বিপ্লবের ফলে, ফেব্রুয়ারি থেকে জুন মাসের ক্রমিক ঘটনাবলী স্পষ্ট দেখিয়ে দেয় যে বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর মধ্যে নতুন সামাজিক সম্পর্ক রচিত হচ্ছিল এবং ফ্রান্স তথা ইয়োরোপের ইতিহাসে এই ঘটনা বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত। 1848-এর ফেব্রুয়ারি মাসে বিপ্লবের ফলে উচ্চ বুর্জোয়া শ্রেণীর হাত থেকে ক্ষমতা চলে গিয়েছিল পাতি বুর্জোয়া শ্রেণীর (Petty Bourgeoisie) হাতে। তারপর প্রজাতন্ত্র কি রূপ নেবে তাই নিয়ে সামাজিক বিরোধ – অর্থাৎ প্রজাতন্ত্র শুধু রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে, না ধনবণ্টন ও কর্মের অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজবিপ্লব ঘটাবে— সেই বিরোধের নিষ্পত্তি হলো শ্রমিকশ্রেণী ও সমাজতান্ত্রিকদের পরাজয়ে। এই পরাজয় যে প্রজাতান্ত্রিক নরমপন্থীদের পক্ষেও শুভ হয়নি, তা বোঝা গেল অচিরেই। 1848-এর নভেম্বরে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের নতুন সংবিধান গৃহীত হলো এবং সেই সংবিধান অনুসারে নির্বাচনে (ডিসেম্বর, 1848) নেপোলিয়ান বোনাপার্টের ভ্রাতুষ্পুত্র লুই নেপোলিয়ান বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করেন এবং প্রজাতন্ত্রকেই উঠিয়ে দ্বিতীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের ফল — ফ্রান্সের বাইরে : একটি স্ফুলিঙ্গ দাবানল সৃষ্টি করে। যদিও ফ্রান্সের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবকে কেউ বলেছেন 'অন্ধ বিপ্লব'। কেউ বা আখ্যা দিয়েছেন 'বুদ্ধিজীবীদের বিপ্লব'। তবু ফ্রান্সের স্ফুলিঙ্গ থেকে প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয়ে ইয়োরোপের নানা দেশে দেখা দেয় বিক্ষোভ, বিদ্রোহ। বস্তুতপক্ষে 1848 খ্রিস্টাব্দকে বলা হয় 'বিপ্লবের বৎসর'।[1] প্রখ্যাত মার্ক্সবাদী ইতিহাসবিদ *এরিখ হবস্‌ব্যম* মন্তব্য করেছেন, "এটি প্রথম সম্ভাব্য বিশ্ব বিপ্লব", কারণ 1848-এর ঢেউ দক্ষিণ আমেরিকা পর্যন্ত পৌঁছেছিল। আবার এমন মন্তব্যও করা হয়েছে যে "1848 ছিল ইয়োরোপের ইতিহাসে এক দিক পরিবর্তন— আ টার্নিংপয়েন্ট— যখন ইয়োরোপ মোড় ঘুরতে পারেনি" ("1848 was a turning point in European History when Europe failed to turn")। বস্তুতপক্ষে 1848 খ্রিস্টাব্দের বিপ্লব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ হয়েছিল। তবু দুটি কথা স্মরণযোগ্য। প্রথমতঃ, এই বিপ্লবের তাৎপর্য অনস্বীকার্য এবং দ্বিতীয়তঃ, ফ্রান্স ছিল এই বিপ্লবের প্রেরণাদাত্রী দেশ, সেকথাও অনস্বীকার্য।

ইতালিতে : 1815 খ্রিস্টাব্দে ভিয়েনা সম্মেলনের পরে পুনরায় ইতালি একটি ভৌগোলিক সংজ্ঞায় পরিণত হলেও পরের তিন দশক ধরে ইতালিতে উদারপন্থী ও জাতীয়তাবাদী আদর্শের হাওয়া বয়ে গেছে। 1820-21 খ্রিস্টাব্দের অভ্যুত্থান, কারবোনারি

---

1. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্র G. Duveau, *1848: The Making of a Revolution*, R. Postgate, *Story of a year. 1848;* M.Kranzberg (ed.) *1848. A Turnnig point*, A. Whitridge, *Men in Crisis: The Revolutions of 1848* এবং F. Fetjo, *The Opening of An Era. 1848.*

এবং অন্যান্য গুপ্ত সমিতির প্রচেষ্টা ইত্যাদি ব্যর্থ হলেও ম্যাটসিনির 'ইয়ং ইতালি' তরুণ সমাজকে প্রভাবিত করেছিল। জাতীয় ঐক্য ও বিভিন্ন সাংবিধানিক সংস্কার প্রচেষ্টার জন্য নানা পন্থার কথা ভাবা হয়েছিল।

1848-এ সিসিলির পালেরমোতে নেপলস্ এর রাজা দ্বিতীয় ফার্দিনাণ্ড-এর অপশাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু হয় এবং বিক্ষোভ অন্যান্য শহরে ছড়িয়ে পড়ে। সিসিলির জন্য সংবিধান জারি, সিসিলির স্বাধীনতা ইত্যাদি ফার্দিনাণ্ড মেনে নেন; পরে তিনি নেপলস্-সিসিলির যৌথ সংবিধান জারির প্রস্তাব দেন, যার স্বরূপ অনেকটা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের ধাঁচের। পিয়েডমণ্ট, টাসকানি, রোমেও অনুরূপ সংবিধান বিক্ষোভের ভয়ে জারি করা হয়। তবে উদারপন্থী সংস্কার শীঘ্রই জাতীয় আন্দোলনের রূপ নেয়। ফ্রান্সের বিপ্লবের প্রভাবে এই ব্যাপারটি ঘটে। লমবারদি ও ভেনেশিয়া থেকে অস্ট্রিয়াকে বিতাড়নের জন্য বিক্ষোভ শুরু হয়। পিয়েডমন্ট -এর রাজা চার্লস অ্যালবার্ট এবং তার মন্ত্রী কাউন্ট কাভুর অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের সাহায্য করেন। তাঁর সঙ্গে যোগ দেয় টাসকানি। কিন্তু পোপ ও নেপলস্-এর রাজা ফার্দিনাণ্ড অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে সর্বতোভাবে এগিয়ে আসেনি। অস্ট্রিয় বাহিনী শেষ পর্যন্ত বিক্ষোভ-বিদ্রোহ দমন করে। তবে এই বিক্ষোভের ফলে ভেনিসে, রোমে কিছুদিনের জন্য প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তবু 1848-এ উদারতন্ত্রীদের মূল লক্ষ্য ছিল সাংবিধানিক রাজতন্ত্র – স্বাধীনতা, জাতীয় ঐক্য বা প্রজাতন্ত্র নয়, ফলে শেষ পর্যন্ত বিপ্লবও সফল হলো না। তবে পিয়েডমণ্টে অ্যালবার্টের পুত্র ভিক্তর ইমানুয়েল এবং মন্ত্রী কাভুর ইতালিয় ঐক্য প্রচেষ্টার পক্ষে বাধাগুলি খুঁজে তা দূর করার ক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছিলেন। এখানেই 1848-এর বিক্ষোভের তাৎপর্য।

সুইটজারল্যাণ্ডে : এখানে 1845 থেকে সাতটি ক্যাথলিক ক্যান্টন 1815 খ্রিস্টাব্দের যুক্তরাষ্ট্রীয় চুক্তি ভঙ্গ করে একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক ও সামরিক সংঘ তৈরি করেছিল। এই সংঘের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রীয় সংসদ বা ফেডারেল ডায়েটের সংঘর্ষ তীব্র আকার ধারণ করে এবং 1847-এর শেষে তা গৃহযুদ্ধের রূপ নেয়। 1848-এ নানা দেশে বিপ্লব চলাকালীন সুইটজারল্যাণ্ডে একটি প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সংবিধান গৃহীত হলো এবং প্রতিটি ক্যান্টনে প্রজাতন্ত্রী সরকার গঠিত হলো। সুতরাং উদারপন্থীদের জয় হয়। আইনের চোখে সাম্য, বাক্‌স্বাধীনতা স্বীকৃত হলো। আইন প্রণয়নের দায়িত্ব ছিল ফেডারেল আইনসভার হাতে। এই ব্যবস্থা 1874 পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল।

অস্ট্রিয়া ও হ্যাপস্‌বার্গ সাম্রাজ্য : ফেব্রুয়ারি বিপ্লব শুধু ভিয়েনাব্যবস্থা ভেঙে ফেলে বা তার প্রধান উদ্গাতা মেটারনিখকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করে তাই নয়, বিপ্লব হ্যাপস্‌বার্গ সাম্রাজ্যে বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল। অস্ট্রিয়ার অধীনস্থ উত্তর ইতালির বিক্ষোভের কথা অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে। হ্যাপস্‌বার্গ সাম্রাজ্যের মধ্যে 1848-এ তিনটি ছিল

বিক্ষোভের প্রধান কেন্দ্র ঃ সাম্রাজ্যের রাজধানী ভিয়েনা, দ্বিতীয়টি হলো চেক অঞ্চলের প্রাগ (Prague, চেক উচ্চারণে প্রাহা) এবং তৃতীয়টি হল হাঙ্গেরীর বুদাপেস্ট (Budapest)। ফ্রান্সে জুলাই রাজতন্ত্র পতনের সংবাদ ভিয়েনাতে উত্তেজনা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করল। ভিয়েনাতেও শুরু হয় বিক্ষোভ। খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি ও পশ্চাদমুখী অর্থনীতিতে শহরের মানুষ যেমন অসন্তুষ্ট ছিল তেমনি সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় কৃষকসমাজ ছিল অতিষ্ঠ। বৃত্তিজীবী ও বুদ্ধি জীবীরা পুলিশী অত্যাচারে বিব্রত। সংস্কারের দাবি উঠেছিল আগেই। মূল লক্ষ্য ছিল প্রশাসনিক পরিবর্তন, আর্থনীতিক সংস্কার, সেন্সর প্রথার অবসান ইত্যাদি। ভিয়েনা সরকার সেই বিষয়ে কর্ণপাত করেন নি। 13th মার্চ থেকে শুরু হয় বিপ্লবী বিক্ষোভ— প্রধানত ছাত্ররা নেতৃত্বে থাকলেও পরে শ্রমিক শ্রেণীরাও এগিয়ে আসে। কয়েকটি ব্যাঙ্ক ফেল পড়ে। সরকারি সম্পত্তি লুঠ হয়। মেটারনিষ পালিয়ে যেতে বাধ্য হন যখন অভিজাত সম্প্রদায়ও তাকে পরিত্যাগ করে। সম্রাট ফার্দিনাণ্ড একটি সংবিধান সভা আহ্বান করে সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দেন। 1848-এর এক ঘোষণায় সম্রাট কৃষকদের বাধ্যতামূলক শ্রমদান থেকে মুক্তির আশ্বাস দিলে এবং তা 1849-এর পয়লা জানুয়ারি থেকে কার্যকর হবে জানালে কৃষক সম্প্রদায় বিপ্লব সম্পর্কে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ে।

হাঙ্গেরী ঃ উদারপন্থী এবং জাতীয়তাবাদী আদর্শের প্রেরণায় হাঙ্গেরীতেও বিক্ষোভ দেখা গিয়েছিল। জুলাই বিপ্লবের পরে হাঙ্গেরীর সংসদ সার্ফদের স্বাধীনতা ক্রয় করবার অধিকার দেবার প্রস্তাব গ্রহণ করলেও ভিয়েনা সরকারের বিরোধিতায় তা কার্যকর হয়নি। হাঙ্গেরীর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অগ্রদূত ছিলেন লাজোস কোসুথ (Lajos Kossuth)। পেশায় সাংবাদিক কোসুথ সেন্সার বিধি লঙ্ঘন করে নিজস্ব পত্রিকায় মতামত প্রকাশ করতেন। জনমানসে লেখার গভীর প্রভাব পড়ে। সরকার তাকে কারারুদ্ধ করেও পরে মুক্তি দিতে বাধ্য হন। হাঙ্গেরীর স্বাধিকার, শিল্পের বিকাশে হাঙ্গেরীর জন্য আলাদা কর ব্যবস্থা ছিল তাঁর লেখার বিষয়বস্তু। কোসুথ ছাড়া আরও অপেক্ষাকৃত নরমপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতাও ছিলেন। জাতীয়তাবাদী নেতাদের চাপেই 1844-এ সংসদের অধিবেশনে হাঙ্গেরীর ভাষাকে (মগেয়ার) সরকারি ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। কোসুথ সংসদেও নির্বাচিত হয়েছিলেন। অন্যান্য যে সব বুদ্ধিজীবী জনসাধারণকে প্রভাবিত করেছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কচি পেটোফি (Petofi) এবং আরনি (Arony) ও ঔপন্যাসিক জোকাই (Jokai)।

ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর 1848-এর 3rd মার্চ কোসুথ হাঙ্গেরীতে সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠার দাবি জানালেন এবং এই ব্যাপারে ভিয়েনার মন্ত্রিসভা যে প্রধান বাধা তা স্পষ্ট ভাষায় বললেন। মেটারনিষের পতনের পর জনগণ আরো উদ্দীপ্ত হয় এবং বিক্ষোভ বিস্ফোরণে রূপান্তরিত হয়। হাঙ্গেরীর সংসদ হাঙ্গেরীর জন্য একটি নতুন সংবিধান

জারি করে। এই সংবিধানে যদিও ভোটাধিকার সম্পত্তির উপর নির্ভরশীল ছিল তবু নাগরিক ও ধর্মীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সামন্তপ্রভুদের বিশেষ সুবিধার বিলোপ ইত্যাদির মাধ্যমে হাঙ্গেরী কার্যত স্বাধীন হলো। 1848-এর 31st মার্চ ভিয়েনা সরকার নতুন সংবিধান মেনে নিলেন। হাঙ্গেরীর সঙ্গে অস্ট্রিয়ার যোগসূত্র ছিল শুধু একই সম্রাটের অধীনে থাকা। হাঙ্গেরীতে বাথিয়ানির (Batthyany) নেতৃত্বে এক নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হলো।

কিন্তু অচিরেই আভ্যন্তরীণ মতভেদ হাঙ্গেরীর সরকারকে দুর্বল করে দেয়। ইতালির বিদ্রোহ দমনে ভিয়েনা সরকারকে সৈন্য পাঠিয়ে সাহায্য, মন্ত্রিসভার বামপন্থীরা পছন্দ করেনি। হাঙ্গেরীতে ক্রোট (Croat) সার্ব (Serb) রুমানিয় (Rumanian) প্রভৃতি সংখ্যালঘু জাতিদের সঙ্গে মগেয়ার (Magyar) দের বিভেদ ছিল। সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীরা মগেয়ার ভাষাকে সরকারি ভাষা করায় ক্ষুব্ধ হয়। ক্রোয়েশিয়াতে মগেয়ার বিরোধী অসন্তোষ ছিল তীব্র। এই বিভেদের মধ্যে সম্রাট হাঙ্গেরীর সংসদ ভেঙে দিলেও খোদ ভিয়েনাতেই বিক্ষোভ শুরু হয়েছিল, যার কথা আগেই যথাস্থানে উল্লিখিত হয়েছে। ভিয়েনাতে সম্রাট ফার্দিনাণ্ড সিংহাসন ত্যাগ করলে নতুন সম্রাট হন ফ্রান্সিস যোসেফ। সরকারের প্রধান হন ফেলিক্স সোয়ারৎজেনবার্গ (Schwarzenberg)। তারা হাঙ্গেরীর সমস্ত অধিকার প্রত্যাহার করেন। অস্ট্রিয়-হাঙ্গেরী বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ বাধে। একদিকে 1849-এ জোসেফ এক ঘোষণায় হাঙ্গেরীকে হ্যাপস্‌বার্গ সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত করার চেষ্টা করেন। অন্যদিকে কোসুথ হাঙ্গেরীর সংসদে ঘোষণা করেন যে হাঙ্গেরীর সিংহাসনে হ্যাপস্‌বার্গদের কোনও নৈতিক অধিকার নেই। 1849-এর 14th এপ্রিল হাঙ্গেরীর সংসদ নিজেদের একটি স্বাধীন প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করেন এবং তার প্রথম সভাপতি হলেন কোসুথ। অস্ট্রিয় সম্রাট ফ্রান্সিস জোসেফ রুশ জারের সাহায্য নিয়ে রাশিয়ার সৈন্য দ্বারা হাঙ্গেরীয় বাহিনীকে পরাজিত করেন। কোসুথ তুরস্কে পালিয়ে যান, অন্য অনেকে নির্যাতন সহ্য করেন। দক্ষিণ হাঙ্গেরীতে ক্রোট এবং সার্বরা ছিল সংখ্যায় বেশি; সেখানে ইয়েলাচিচ (Jellachich)- এর নেতৃত্বে ক্রোয়েশিয় জাতীয়তাবাদীরাও হাঙ্গেরীর থেকে স্বাতন্ত্র্য চেয়েছিল।

চেক ঃ হ্যাপস্‌বার্গ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বোহেমিয়া, মোরাভিয়া এবং সাইলেশিয়া অঞ্চলে 1848-এর বিপ্লবের প্রভাবে চেক (Czech) সরকার প্রতিষ্ঠার দাবি ওঠে। বোহেমিয়া শাসকরা ছিল জার্মান অথচ তারা সংখ্যালঘু। নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বমূলক ডায়েট্ মৌলিক নাগরিক ও ধর্মীয় অধিকার ইত্যাদি বোহেমিয়ান আন্দোলনের ফলে মেনে নেওয়া হয়। স্কুল-কলেজে ও সরকারি কাজে জার্মানদের সঙ্গে চেক ভাষাও গৃহীত হয়। উদারপন্থী -জাতীয়তাবাদীদের জয় দীর্ঘস্থায়ী ছিল না। হ্যাপস্‌বার্গ সম্রাটের সাময়িক দাবি মেনে নেওয়ার পরেই আবার তারা উদারপন্থা দমনে ঝাপিয়ে পড়েছিল। চেকদের মধ্যে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী ছিল। চেক-জার্মান বিরোধিতার সুযোগে অস্ট্রিয় জার্মানদের সাহায্য ক'রে চেকদের দমন করে।

জার্মানিঃ ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের বিশেষ প্রভাব পড়েছিল জার্মানিতে যদিও তখন একতাবদ্ধ জার্মানি বলে কোনও রাষ্ট্র ছিল না। প্রাশিয়া, ব্যাভেরিয়া, ব্যাডেন, স্যাক্সনি, হ্যানোভার, হেগ, উর্টেমবার্গ প্রভৃতি জার্মান রাজ্যে বিক্ষোভ দেখা দেয়। মনে রাখতে হবে যে, 1815 থেকে 1848 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ঐ সব জার্মান রাজ্যে উদারপন্থী ও জাতীয়তাবাদী ভাবধারা বিস্তৃত হয়েছিল। জুলাই রাজতন্ত্রের পতনের পর প্রথম বিক্ষোভ শুরু হয় রাইনল্যান্ডের মানহাইমে (Mannheim), পরে তা অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে। জার্মান জাতীয়তাবাদও নতুন প্রেরণা লাভ করে। প্রাশিয়ার রাজা ফ্রেডারিক চতুর্থ উইলিয়াম সাংবিধানিক শাসনের প্রতিশ্রুতি দেন, ব্যাডেন সংসদীয় শাসন মেনে নেয়। স্যাক্সনি, হ্যানোভার, ব্যাভেরিয়া ও প্রাশিয়া ছাড়া প্রায় সব রাজ্যই সাংবিধানিক সংস্কার মেনে নেয়। ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে এক পার্লামেন্ট বা অস্থায়ী সাধারণ সভা আহ্বান হয়। এটি ছিল জার্মান জাতীয়তাবাদীদের নিজেদের ডাকা সভা। জাতীয় ঐক্যের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে এরা জার্মানির জাতীয় ভবিষ্যৎ সংবিধানের ভিত্তি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন কিন্তু বাস্তববোধের অভাবে সেই প্রচেষ্টা বিশেষ ফলপ্রসূ হয়নি। ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্টের ব্যর্থতার পরই প্রাশিয়ার লৌহমানব অটো ফন বিসমার্কের আবির্ভাব। বিসমার্ক উত্তরকালে তার কূটনৈতিক বুদ্ধির সাহায্যে জার্মানির ঐক্য সম্পন্ন করেছিলেন। *নেপিয়ার* লিখেছেন, "The year 1848 proved in Germany that Union could not be achieved through discussion and by agreement; that it could be achieved only by force।" *এ. জি. পি. টেলরও* লিখেছেন যে 1848-এর পর উদারপন্থীরা জার্মানির নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, তারপর তা শক্তিনির্ভর হয়ে পড়ে বিসমার্কের হাতে।

1848-এর বিপ্লবের তাৎপর্য ঃ ফ্রান্সে ফেব্রুয়ারি বিপ্লব কিংবা 1848-49-50 অন্যান্য দেশের বিপ্লবী অভ্যুত্থান উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ হলেও তা তাৎপর্যহীন ছিল এমন বলা যায় না। *ডেভিড টমসন* লিখেছেন যে, বিপ্লবগুলির উদ্ভব, লক্ষ্য, গতি ও পরিণতির মধ্যে মিল ছিল। একথা ঠিক যে, স্বতঃস্ফূর্ত বিপ্লবী আন্দোলন ঐ বছর ইয়োরোপের অনেকাংশে বিস্তার লাভ করেছিল, আবার এই পর্বে জাতীয়তা ও উদারপন্থা দীর্ঘস্থায়ী ফল লাভে সক্ষম হয়নি। তবে 1815-48 পর্বে যে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন সূচিত হচ্ছিল 1848-এ এসে তার দিক পরিবর্তন ঘটে। এর চিহ্ন একদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি, দেশে দেশে শিল্পায়ন এবং অন্যদিক সামন্ততান্ত্রিক ভূমিব্যবস্থার অবসানের মধ্যে বিধৃত। 1848 খ্রিস্টাব্দে সেই নতুন শ্রেণীর ভূমিকা লক্ষ্যণীয়। উদারপন্থার সমর্থক মধ্যবিত্ত শহুরে পাতি (পেটি) বুর্জোয়া শ্রেণী আর শিল্পায়নের ফলে উদ্ভূত শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ এক ছিল না। আবার একথাও মনে রাখতে হবে যে, 1848-এর অভিজ্ঞতাই জাতীয়তাবাদকে পূর্ণ লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যায়। বিশেষত জার্মানিতে এবং ইতালিতে। এর তাৎপর্য গভীর। 1848 এর বিপ্লবের ফলেই মেটারনিখের প্রতিক্রিয়াতন্ত্রের মৃত্যুঘণ্টা

বেজে যায়। 1848 খ্রিস্টাব্দেই *কার্ল মার্ক্স* এবং *ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্* লেখেন তাদের বিখ্যাত 'দ্য ম্যানিফেস্টো অফ দ্য কমিউনিস্ট পার্টি' যাতে নতুনভাবে সমাজ বিবর্তনের ইতিহাস ব্যাখ্যা করা হয়েছিল।

৬। ফ্রান্সে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র এবং দ্বিতীয় সাম্রাজ্য

দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাঃ 1848 খ্রিস্টাব্দে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে জুলাই রাজতন্ত্রের পতন ঘটে। অরলেয়ঁ বংশীয় রাজা লুই ফিলিপ ঐ বৎসর 24th ফেব্রুয়ারি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। তাঁর পৌত্র কঁত দ্য পারীকে রাজা বলে ঘোষণা করা হলো কিন্তু প্যারিসের বিপ্লবী জনতা ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। কিভাবে? রাজা সিংহাসন ত্যাগে রাজী হলে উদারপন্থীরা খুশি হন। কেননা তারা চাইছিলেন গিজোর পদচ্যুতি, রাজার অপসারণ এবং সবচেয়ে বড়ো কথা ভোটাধিকার সম্প্রসারণ। এগুলির মধ্যে প্রথম দুটি ঘটেছে, তৃতীয়টি ঘটতে চলেছে। কিন্তু প্রজাতন্ত্রীরা এতে খুশি হয়নি। প্রজাতন্ত্রীদের মদতে একদল সশস্ত্র জনতা প্যারিসে সংসদ ভবনে প্রবেশ করে এবং প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করে।

অধ্যাপক সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী লিখেছেন, "ল্যদ্রু-রল্যাঁ একটি অস্থায়ী সরকার গঠনের প্রস্তাব করলেন। তাকে সমর্থন করে লামার্তিন একটি নামের তালিকা পাঠ করলেন। সমবেত জনতা হর্ষধ্বনি করে এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানান। সরকারের নেতৃত্বে রইলেন দ্যুঁপ দ্য লিউর (Dupont de L' Eure), আরোগো (Arago), লামার্তিন, ল্যদ্রু-রল্যাঁ প্রমুখ। ইতোমধ্যে 'ওতেল দ্য ভিলে'-তে সমাজবাদীরা আর একটি সরকার গঠন করেছিলেন। দুই সরকারের মধ্যে সংঘর্ষ এড়াতে অস্থায়ী সরকারে সমাজবাদীদের কয়েকজনকে নেওয়া হল। এঁদের মধ্যে ছিলেন লুই ব্লাঁ, মারাস্ত, ফ্লঁক ও শ্রমিক আলবেয়র (Albert)। জুলাই রাজতন্ত্রের অবসান ঘোষিত হল।"[1]

এইভাবে 1848 খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ফ্রান্সে দ্বিতীয় বারের জন্য প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হলো। *আলফ্রেড কোবান* লিখেছেন, "1848 in France was a revolution by accident।"[2] একথা সর্বাংশ সত্য নয়; জনগণ দীর্ঘকাল ধরেই রাজনৈতিক সংস্কার, ব্যাপক ভোটাধিকার চাইছিলেন। গিজোর বাড়ির সামনে বিক্ষোভ এবং পুলিশের গুলি চালানোর ফলে জনগণের বিক্ষোভ বিস্ফোরণে পরিণত হওয়া দুর্ঘটনাজনিত হতে পারে কিন্তু রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ করে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা দুর্ঘটনা নয়, পরিস্থিতির যুক্তিগ্রাহ্য পরিণতি।

দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের কার্যকাল ঃ 1848 খ্রিস্টাব্দের 24 ফেব্রুয়ারি থেকে 1852 খ্রিস্টাব্দের পয়লা ডিসেম্বর পর্যন্ত দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের কার্যকাল। শেষোক্ত দিবসে লুই

1. সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. 350
2. আলফ্রেড কোবান, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, দ্বিতীয়খণ্ড পৃ. 133

নেপোলিয়ান ফ্রান্সে দ্বিতীয় বারের জন্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার পর প্রজাতন্ত্রের অবসান ঘোষণা করেন এবং ফ্রান্স সাম্রাজ্য হিসেবে ঘোষিত হয়। এই কাজ তিনি করেন নতুন সংবিধান অনুসারে বিশেষ ক্ষমতা বলে। তিনি নিজে হন সম্রাট। সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ান।

এই চার বছরের ঘটনাবলী সংক্ষেপে এরকম— 1848-এর 24 ফেব্রুয়ারি রাজা লুই ফিলিপের ক্ষমতা ত্যাগের পর নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ হয়ে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। অস্থায়ী প্রজাতান্ত্রিক সরকার গঠনের কথা এবং সার্বজনীন ভোটাধিকারের কথা ঘোষণা করা হলো। ফ্রান্সে এবং তার সব উপনিবেশে ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করা হলো। ফ্রান্সে অবশ্য নানা মতাবলম্বী দলের সমর্থকদের মধ্যে বিচ্ছেদ বাড়তে থাকে। নতুন পার্লামেন্টের নির্বাচনের কথা ঘোষণা করা হয় 23 এপ্রিল নির্বাচনে সমাজবাদী ও চরমপন্থীরা হেরে যায়। মে মাসে নানা বিক্ষোভ চলতে থাকে এবং 1848-এর জুন মাসে বিক্ষোভ থেকে শুরু হয় সংঘর্ষ, মার্ক্স যাকে বলেছিলেন প্রথম 'শ্রেণী সংগ্রাম'। জুনের ভয়াবহ দিনগুলির (22-26 জুন) ক্ষমতা কার্যত চলে যায় সেনাবাহিনীর হাতে। 1848-এর 4 নভেম্বর দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের সংবিধান গৃহীত হয় এবং সেই সংবিধান অনুসারে নির্বাচন হয় রাষ্ট্রপতি পদের জন্য (10 ডিসেম্বর)। ঐ নির্বাচনে নেপোলিয়ান বোনাপার্টের ভ্রাতুষ্পুত্র লুই নেপোলিয়ান পঞ্চান্ন লক্ষ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন — কাভেইনাক, ল্যদ্রু-রঁলা, লামার্তা প্রমুখ পরাজিত হন।

লুই নেপোলিয়ান বোনাপার্টিস্ট দলের নেতা। প্রজাতন্ত্রকে তিনি আদৌ পছন্দ করতেন না। তবু 1848 খ্রিস্টাব্দে গৃহীত সংবিধান অনুসারে তিনি চার বছরের জন্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান মেনে চলার শপথও নেন। 1849 খ্রিস্টাব্দ থেকে 1851 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে। সংবিধান সভার মেয়াদ শেষ হবার পর 1849-এর মে মাসে নতুন আইন সভার নির্বাচন হয়। ক্রমশ নানা রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিভেদ, বামপন্থীদের বিক্ষোভ, রক্ষণশীলদের শক্তি সমাবেশ, ভোটাধিকারে সঙ্কোচন ইত্যাদি চলতে চলতে অবস্থা চরমে ওঠে যখন লুই নেপোলিয়ান রাষ্ট্রপতি পদে পুনঃনির্বাচন চাইলেন। সংবিধান পুনঃনির্বাচন অনুমোদন করত না। সংবিধান সংস্কার করার চেষ্টা হলো, আইনসভা তা মানতে রাজী হলো না। এই পরিপ্রেক্ষিতে 1851 খ্রিস্টাব্দের 2 ডিসেম্বর লুই নেপোলিয়ান 'সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ' (*কুদেতা*— Coup d'etat) ঘটিয়ে আইন সভাই ভেঙে দিলেন। কার্ল মার্ক্সের The Eighteenth Brunaire of Louis Bonaparte পুস্তকে এই ঘটনার অসামান্য বিশ্লেষণ আছে। এই ক্ষমতা দখল গণতন্ত্র কিংবা প্রজাতন্ত্রের পক্ষে শুভ হয়নি।

দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের অবসান ঃ সৌভাগ্যবশত ফ্রান্সের বিপুল সংখ্যক জনগণ সেই মুহূর্তে লুই নেপোলিয়ানের ক্রিয়াকলাপ সমর্থন করেছিল। ফলে আইনসভা ভেঙে দিয়ে

পুনঃনির্বাচনের অধিকার ঠিক ছিল কিনা এ বিষয়ে গণভোট নিলে (14 ডিসেম্বর 1851) বিপুল ভোটে তা অনুমোদিত হয়। 1852 খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে নতুন সংবিধান গৃহীত হয়। জনগণ প্রজাতন্ত্র অপেক্ষা নেপোলিয়ানের অধীনে স্থিতিশীল সরকার অধিক বাঞ্ছনীয় মনে করত, কৃষকরা আশা করত নেপোলিয়ান তাদের সম্পত্তি রক্ষা করবেন, শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ভাবত ইনি ফ্রান্সের গৌরব ফিরিয়ে আনবেন। সর্বোপরি ছিল বোনাপার্টের কিংবদন্তীর প্রভাব। ফলে প্রথমবার গণভোটে চার বছরের বদলে দশ বছরের জন্য রাষ্ট্রপতি করতেও জনগণ পশ্চাৎপদ হয়নি। 1852 খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর তিনি প্রজাতন্ত্রকেই উচ্ছেদ করে সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং নিজেকে সম্রাট ঘোষণা করার বাসনায় পুনরায় গণভোট নিলে (20-21 নভেম্বর 1852) জনগণ তাও অনুমোদন করে। এরপর 1852 খ্রিস্টাব্দের 1st ডিসেম্বর লুই নেপোলিয়ান প্রজাতন্ত্রের বদলে দ্বিতীয় ফরাসি সাম্রাজ্য এবং নিজেকে সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করে।

দ্বিতীয় সাম্রাজ্য : 1852 খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর থেকে 1870 খ্রিস্টাব্দে প্রাশিয়ার সঙ্গে সেডানের যুদ্ধে লজ্জাজনকভাবে পরাজিত হওয়া পর্যন্ত তৃতীয় নেপোলিয়ান ছিলেন দ্বিতীয় ফরাসি সাম্রাজ্যের অধীশ্বর। এই সময় তিনি 'শৃঙ্খলার সঙ্গে স্বাধীনতার সমন্বয়' ঘটাতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হন। বস্তুত তাঁর এক ধরনের একনায়কতন্ত্র ছিল যদিও তা খুব কট্টর বা সন্ত্রাসমূলক ছিল না। ভ্রান্ত বৈদেশিক নীতি এবং আভ্যন্তরীণ নীতির ক্ষেত্রে বিফলতা শেষ পর্যন্ত তৃতীয় নেপোলিয়ানকে ইতিহাসের *ট্র্যাজিক* (Tragic) নায়কে পরিণত করে।

অধ্যায় ৬

ইতালির ঐক্য আন্দোলনের বিভিন্ন স্তর

(Syllabus: *Stages of Italian Unification*)

১। সূচনা

ঐক্যবদ্ধ ও স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ইতালির উদ্ভব 1870 খ্রিস্টাব্দে। এর আগে উনিশ শতকের গোড়ার দিক থেকে ইতালির ঐক্য আন্দোলন সূচনা।এর পরে নানাস্তর পরিক্রমা করে তার সাফল্য শেষ পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে। আবার 1870 খ্রিস্টাব্দের পর ইতালি ইয়োরোপের অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে উদিত হয়। উনিশ শতকের আগে ইতালি নামে কোনও একক দেশ ছিল না। অস্ট্রিয়ার প্রিন্স মেটারনিষের ভাষায় তা ছিল 'ভৌগোলিক নাম' (Geographical expression) বিশেষ।

খ্রিস্টিয় পঞ্চম শতকে তথাকথিত বর্বর (Barbarians) জাতিগুলির হাতে রোমান সাম্রাজ্য পতনের (476 A.D.) পর ইতালির কোনও ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রীয় জীবন ছিলনা। তারা ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রনীতিতে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন অংশও পায় নি। বর্বর জাতিগুলি রোমান সাম্রাজ্য পতনের পর স্পেন, ব্রিটেন এবং গল(ফ্রান্স) রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হলেও ইতালিতে কোনও একক শক্তি দীর্ঘকাল থাকে নি। অস্ট্রোগথ বা লম্বার্ডগণ সাময়িক সাফল্য দেখিয়েছিল। তারপর তথাকথিত পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে পোপ বনাম সম্রাটের দ্বন্দ্বের প্রভাব ইতালির অঞ্চলগুলিতে দেখা দেয়। মধ্যযুগের পর এই 'অন্ধযুগ' শেষ হয়ে যায় যখন অষ্টম চার্লস আলপ্স অতিক্রম করে ইতালি আক্রমণ করেন। বস্তুত ইতালি ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত এবং তাদের মধ্যে বাদ-বিবাদ লেগেই থাকত। এই সব রাজ্যের রাজারা সমগ্র ইতালির কথা কখনও ভাবতেন না, নিজ নিজ রাজ্য কিংবা নিজেদের স্বার্থই ভাবতেন। ফলে ইতালি রেনেশাঁস বা নবজাগরণে উল্লেখযোগ্য অংশ নিলেও বা ম্যাকিয়াভেলির মতন রাষ্ট্রচিন্তাবিদ্ জন্ম নিলেও বাস্তবে তার অবস্থা ছিল পঙ্কিল।[1] ফরাসি বিপ্লব পর্যন্ত চলে এই অবস্থা।

ফরাসি বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী এবং প্রজাতান্ত্রিক আদর্শের প্রতিক্রিয়াতে ইয়োরোপে বহুদেশে উদারনীতিবাদ ও জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ও প্রসার ঘটে। ভিয়েনা চুক্তি ও মেটারনিষতন্ত্রের প্রতিক্রিয়াশীল এবং দমনমূলক নীতি সত্ত্বেও জাতীয়তাবাদের

---

1. "Deprived of her natural leaders, Italy sank into the degraded condition from which all the efforts of patriots like Machiavelli proved powerless to raise her" – Lipson, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, p.160

প্রসার হয় এবং অখণ্ড জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের আদর্শ প্রবল হয়ে ওঠে। ফলে স্বৈরতন্ত্রের সঙ্গে বিরোধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। এই জাতীয়তাবাদী প্রেরণার সাক্ষ্য আমরা দেখতে পাই ইতালি, জার্মানি এবং পোল্যাণ্ডে।

শুরুতেই বলা হয়েছে যে, উনিশ শতকের আগে ইতালি নামে কোনও দেশ ছিল না। ইতালি ছিল একটি ভৌগোলিক নাম বিশেষ। ইতালিয় ভাষাভাষী মানুষদের এলাকা ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত। ইতালিবাসীদের ছিল নিজেদের অঞ্চল সম্পর্কে স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং স্বার্থবোধ। এই আঞ্চলিকতাবাদের ফলে ইতালির নানা অঞ্চল ছিল পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন। উপরন্তু ইতালির অর্থনীতি ছিল পশ্চাদপদ। উত্তর ইতালিয় এলাকাগুলিতে কিছু কিছু শিল্পের প্রসার ঘটলেও দক্ষিণ ইতালির বিস্তৃর্ণ অঞ্চল ছিল মূলত কৃষিপ্রধান। আবার রাজনৈতিক নেতৃত্বের যোগ্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীরও অভাব ছিল। নেপোলিয়ান ইতালির মূল ভূখণ্ডকে নিজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করলে (1796) ইতালিবাসীদের রাজনৈতিক ঐক্যবোধ, জাতীয় সংহতি, একই ধরণের আইন ইত্যাদি বৃদ্ধি পায়। ইতালিতে তখনই প্রথম জাতীয়তাবাদের সূত্রপাত। কিন্তু 1815 খ্রিস্টাব্দে নেপোলিয়ানের পতনের পর ভিয়েনা চুক্তির ফলে ইতালির জাতীয় ঐক্যের দাবি অস্বীকৃত হলো, আবার আটটি ক্ষুদ্র রাজ্যে ইতালি বিভক্ত হয় এবং বিদেশী শক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলো। ভিয়েনা কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইতালিতে যে সব শাসক নানা রাজ্যে ক্ষমতায় ফিরে এসেছিলেন তাঁরা সকলেই স্বৈরাচারী শাসন প্রবর্তন করেছিলেন। এই স্বৈরাচারী শাসকগণ উদারপন্থী বিরোধিতা দমনে দমনমূলক নীতি গ্রহণে পশ্চাদপদ ছিলেন না। সর্বোপরি ছিল বিদেশী প্রাধান্য। ভিয়েনা সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারেই উত্তর ইতালির লম্বারদি এবং ভেনেসিয়ার উপর অস্ট্রিয়ার প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ তো বজায় রইলোই, অন্যান্য অঞ্চলের উপরও অস্ট্রিয়ার পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ বজায় ছিল। এর ফলে ইতালি ভৌগোলিক সংজ্ঞায় পরিণত হলো। ফলে শুরু হলো ইতালির ঐক্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। ইতালির তখনকার অবস্থা সম্পর্কে ম্যাৎসিনি বলেছিলেন,''আমাদের জাতীয় পতাকা নেই, রাষ্ট্রীয় নাম নেই, ইয়োরোপের জাতিগুলির মধ্যে কোনও মর্যাদা নেই।''এই পটভূমিকাতেই ইতালিতে উদারপন্থী ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পটভূমি প্রস্তুত হয়। এই পটভূমি থেকেই ক্রমে ক্রমে নানা ধারার আন্দোলন মিলে ইতালির ঐক্য সম্পন্ন হয় এবং 1870 খ্রিস্টাব্দে এক এবং ঐক্যবদ্ধ 'ইতালি' রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

নেপোলিয়ান যখন ইতালিতে প্রবেশ করেন (1796 খ্রিঃ) তখন সেখানে বাইশটি ছোট-বড় রাজ্য ছিল। এর মধ্যে পিয়েডমন্ট-সার্দিনিয়া ছিল একমাত্র স্বাধীন এবং তাঁর শাসকরাও ছিলেন ইতালিয় বংশোদ্ভূত। তাছাড়া অন্যান্য অঞ্চলে ছিল বিদেশী প্রাধান্য। যেমন উত্তর ইতালির লম্বারদি এবং ভেনেসিয়াতে ছিল অস্ট্রিয়ার হ্যাপস্‌বার্গ সাম্রাজ্যের প্রাধান্য, মধ্য ইতালির রাজ্যগুলি ছিল পোপের অধীন এবং দক্ষিণ ইতালিতে নেপলস্‌ এবং সিসিলিতে ছিল স্পেনীয় বুরবোঁ রাজবংশ।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইতালিতে জাতীয়তাবাদ এবং ঐক্য ও সংহতি বিষয়ে জনমানসে চেতনা আনার ক্ষেত্রে নেপোলিয়ান অনুঘটকের কাজ করেছিলেন। কিন্তু কি ভাবে? লিপসন লিখেছেনঃ "A new epoch began when Italy was drawn into the vortex of Napoleonic conquest. The Austrians and the Bourbons were driven from the Peninsula, the Papal States were annexed and a uniform system of law and administration was everywhere established." সমগ্র ইতালিবাসীরা যে এক শাসনে আসতে পারে এই বোধ তাদের মনে জাগ্রত হয়। তাদের আশা-আকাঙ্খা এবার ঐক্য প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হলো। সুতরাং ইতালির রাজ্যগুলির মধ্যেকার বিভেদ দূর হয়ে জাতীয় ঐক্য সূচনা নেপোলিয়ানের হাতে। তবে শুধু নেপোলিয়ান নয়, এই সূত্রে নেপলস্ -এর ফরাসি শাসক মুরাত (Murat) -এর কথাও বলা দরকার। তিনিই প্রথম তাঁর শাসনাধীনে সমগ্র ইতালিকে ঐক্যবদ্ধ করার কথা ভেবেছিলেন। মুরাত 1811 খ্রিস্টাব্দেই ইতালির জাতীয়তাবাদী দলগুলির প্রতি ঝুঁকেছিলেন; যে জন্য ফরাসি কর্মচারিবৃন্দ অসন্তুষ্ট হন, এমনকি সম্রাট নেপোলিয়ান বোনাপার্ট পর্যন্ত তাকে তিরস্কার করেন। 1815 খ্রিস্টাব্দে তিনি অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ইতালির জনগণের কাছে দেশের ঐক্যের জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরেও ইতালিবাসী তাকে স্মরণ করে। যাইহোক, 1815 খ্রিস্টাব্দে নেপোলিয়ানের বন্দোবস্ত ভেঙে দেওয়া হলো বটে তবে ঐ সময় থেকে ঐক্য আন্দোলনের সূত্রপাত বলা যেতে পারে।

1815-র পর থেকে ইতালিতে নানা কারণে উদারপন্থার উদ্ভব ঘটে। বস্তুত জাতীয়তাবোধ এবং উদারপন্থা মিলে এক ঐক্য আন্দোলনের জন্ম নেয় যাকে বলা হয় 'রিসরজিমেন্টো' (Risorgimento) বা নবজাগরণ আন্দোলন। *মার্কহ্যাম*-এর মতে নেপোলিয়ানের আগে থেকেই এই নবজাগরণের চিহ্ন দেখা গিয়েছিল। তবে নেপোলিয়ানের কার্যকলাপ একে তরান্বিত করে।[1] এই 'রিসরজিমেন্টো'র চরিত্র সর্বদা যে একরকম ছিল এমন নয়। অধ্যাপক *সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী* লিখেছেন ঃ "বস্তুত এর মধ্যে বিভিন্ন ধারা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সাধারণভাবে এই আন্দোলনের চারটি মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ঃ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, বিদেশী শাসন থেকে মুক্তি, জাতীয় ঐক্য ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা।"[2]

২। ইতালির ঐক্য আন্দোলনের বিভিন্ন স্তর

ইতালির ঐক্য আন্দোলনের ইতিহাসকে মোট তিনটি পর্বে বিভক্ত করা যায়, যথা— প্রথম পর্ব 1815 থেকে 1848 খ্রিস্টাব্দ, দ্বিতীয় পর্ব 1848 থেকে 1860 এবং তৃতীয়

1. In Italy, the administrative Unification under Napoleon, partial and inconsistent as it was, the introduction of code and conscription, hastened the developments of the Resorgimento. signs of which had already appeared before Nepoleon's first invasion of Italy"–Markham

2. সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ 401

পর্ব 1860 থেকে 1870 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। প্রথম দুটি পর্যায় ছিল বিক্ষিপ্ত প্রয়াসের মিশ্রণ এবং তৃতীয় পর্যায়টি ছিল ঐক্য সাধনের সংগঠিত প্রয়াস। যারা এই সংগ্রামে উল্লেখযোগ্য নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে আদর্শবাদী ম্যাৎসিনি; সার্দিনিয়ার জাতীয়তাবাদী, উদার ও দূরদর্শী নরপতি ভিক্তর ইমানুয়েল, তাঁর বিচক্ষণ মন্ত্রী কাউন্ট কাভুর এবং নিরলস সৈনিক গ্যারিবল্দির নাম উল্লেখযোগ্য।

নেপোলিয়ানের পতনের পর ইতালি ঃ 1815 খ্রিস্টাব্দে ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ান বোনাপার্টের পতনের পর ইয়োরোপের পুনর্গঠনের নামে ইয়োরোপের প্রধান চার দেশ (অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, রাশিয়া এবং ইংল্যাণ্ড) ভিয়েনা সম্মেলনে যে সব সিদ্ধান্ত নেয় তাতে রক্ষণশীল চূড়ামণি মেটারনিষের প্রাধান্য ছিল স্পষ্ট। এই কংগ্রেস ইতালির নানা রাজ্যে যে প্রতিক্রিয়াশীল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন, ফরাসি বিপ্লবের আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং নেপোলিয়ানের আমলে জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত ইতালির জনগণ, বিশেষত বুদ্ধিজীবীগণ তা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করতে পারেন নি; অন্য দিকে বিপ্লবীরাও তা মেনে নিতে পারেন নি। বস্তুত 1815-র পর থেকেই সেজন্য ঐক্য আন্দোলনের প্রথম পর্ব শুরু বলা যেতে পারে।

ইতালির ঐক্য আন্দোলনের প্রথম স্তরের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার আগে আমরা তিনটি বিষয় উল্লেখ করতে পারি। 1815 খ্রিস্টাব্দের পর ইতালির আবস্থা, অতঃপর ইতালিতে উদারপন্থী আন্দোলনের সূচনা ও বুদ্ধিজীবীদের প্রভাব এবং পরিশেষে ইতালির ঐক্য আন্দোলনের পথে নানা প্রতিবন্ধকতাগুলি জেনে নেওয়া দরকার।

নেপোলিয়ানের পতনের পর ভিয়েনা সম্মেলনে 'ন্যায্য অধিকার'(Principle of Legitimacy) নীতি প্রয়োগ করে ইয়োরোপীয় নেতৃবর্গ ইতালির জাতীয় দাবিকে উপেক্ষা ক'রে সেখানে আটটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র ঘোষণা করেন। এগুলি হলো লমবারদি (ভেনেসিয়া সহ), পার্মা, টাসকানি, মডেনা, লুক্কা, পোপের রাজ্য, পিয়েডমণ্ট (সার্দিনিয়া সহ) এবং নেপলস্ (সিসিলি সহ)। আবার ইতালি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হলো, ভিয়েনা সম্মেলনের নেতা মেটারনিষের কথায় ইতালি 'ভৌগোলিক সংজ্ঞায়' পরিণত হলো।

এর চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ন্যায্য অধিকার নীতি প্রয়োগ করে ফরাসি বিপ্লবের আগে যে যেখানে শাসন করত তাকে বা সেই বংশকে সেখানে ফিরিয়ে আনা হলো। এর ফলে উত্তর ইতালির লমবারদি এবং ভেনেসিয়া অস্ট্রিয়ার অধীনে তো গেলই, পার্মা, মডেনা ও টাসকানিতে অস্ট্রিয়া সম্রাটের আত্মীয় হ্যাপস্‌বার্গ বংশীয় শাসকের অধীনে গেল। এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে, জার্মানির রাইন অঞ্চলে অস্ট্রিয়ার প্রতিপত্তি সুদৃঢ় করার বদলে অস্ট্রিয়ার যুবরাজ এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী মেটারনিষ ইতালিতে অস্ট্রিয়ার প্রতিপত্তি সর্বাত্মক করতে দৃঢ়সংকল্প ছিলেন। নেপোলিয়ানের ইতালি অভিযানের ফলে সেকাজে বাধা সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু এখন 1815-র পরে লমবারদি ও ভেনেসিয়াতে অস্ট্রিয়ান গভর্নর ক্ষমতায় এলেন। ঐ দুই রাজ্যের শাসনব্যবস্থা উন্নত হলেও তা ছিল অস্ট্রিয়ার

স্বার্থানুকূল এবং ইতালিয় জাতীয়তা বিরোধী। ঐ দুই রাজ্যে প্রভূত কর চাপানো হয়েছিল। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। পার্মার রাণী ছিলেন অস্ট্রিয়ার রাজবংশের কন্যা মারী লুই। তাঁর রাজ্যেও পুলিশ ও রাজকর্মচারীদের নির্যাতন জনগণকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। তেমনি মোডেনাতে আর্চ ডিউক চতুর্থ ফ্রান্সিস-এর নির্মম শাসন এবং সেইসঙ্গে অভিজাত ও যাজক শ্রেণীর সুবিধাভোগ জনমানসে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এছাড়া নেপলস্ এবং সিসিলিতে ক্ষমতায় এসেছিলেন বুরবোঁ বংশীয় প্রথম ফার্ডিনাণ্ড যিনি জনগণকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও ধনসম্পত্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েও ক্রমেই প্রতিক্রিয়াশীল ও দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে ওঠেন। তেমনি 1814 খ্রিস্টাব্দে পোপ সপ্তম পায়াস রোমে ফিরে এসে যাজক শ্রেণীর সাহায্যে অত্যাচারমূলক শাসন বলবৎ করেন। মনে রাখা প্রয়োজন, এই আটটি রাজ্যের মধ্যে একমাত্র পিয়েডমন্ট সার্দিনিয়াতেই ইতালিয় বংশের শাসন ছিল। কিন্তু সেখানে ভিকতর প্রথম ইমানুয়েল ছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল শাসক, যাজক ও অভিজাত শ্রেণীর প্রতি অনুরক্ত।

এই অবস্থায় ইতালির জনগণ স্বাভাবিকভাবেই জাতীয়তাবাদ ও প্রজাতান্ত্রিক চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হলো। ইতালির ঐক্য আন্দোলনের অন্যতম নেতা যোসেফ ম্যাৎসিনি লিখেছিলেন, "And all these states among which we are partitioned are ruled by despotic Governments, in whose working the country has no agency whatever"। এই রাজ্যগুলির কোথাও বাক্স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, যৌথ আন্দোলনের স্বাধীনতা, বিদেশী বই আমদানির স্বাধীনতা ইত্যাদি কিছুই ছিল না। স্বাভাবিকভাবে এই স্বৈরতান্ত্রিক অবস্থা উদারপন্থার জন্ম দেয়।

উদারপন্থী আন্দোলনের সূচনা ও বুদ্ধিজীবীদের প্রভাব ঃ ইতালিতে উদারপন্থী আন্দোলনের সূচনার কারণ একদিকে ফরাসি বিপ্লব ও প্রজাতান্ত্রিক আদর্শের প্রভাব এবং অন্যদিকে ভিয়েনা সম্মেলনের পর নানা রাজ্যে প্রতিক্রিয়াশীল ও নির্যাতনমূলক শাসন। অনেক ঐতিহাসিকের মতে নেপোলিয়ানের প্রভাব থেকেও জাতীয়তাবোধের বিকাশ হয়। 1815 থেকে 1820 পর্যন্ত ইতালির কিছু স্থানে নেপোলিয়ানের সময়কালীন প্রশাসনিক সংস্কার বজায় ছিল। তাছাড়া আর্থনীতিক পরিবর্তন ও তৎপ্রসূত রাজনৈতিক অসন্তোষও উদারপন্থাকে সাহায্য করেছিল।

অধ্যাপক সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তীর মতে,"চিন্তা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন দেখা দেয় তা ইতালিতে উদারপন্থা ও জাতীয়তাবাদকে শক্তি ও উৎসাহ যুগিয়েছিল। অনেক প্রতিভাবান লেখক এ সময়ে ইতালির প্রাচীন ইতিহাস ও গৌরবোজ্জ্বল দিনের ছবি এঁকে জাতীয়তাবাদকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।" এই সব লেখক বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কনফালো-নিয়েরি, বেরচেত, পেলিকো, কনসিলিয়াতোর, তোমাসিও,কাপ্পোনি, কানতু, ত্রোয়া, দাজেগলিও,

লিওপার্দি প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। সমস্ত লেখকরাই 'ঐতিহ্যের সঙ্গে সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্খা জড়িয়ে নতুন ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন ইতালির স্বপ্ন দেখার অভ্যাসটি তৈরি করেন'।

ইতালির রাষ্ট্রীয় ঐক্যের পথে বাধা ঃ প্রথমতঃ, ইতালির রাজ্যগুলির মধ্যে একমাত্র পিয়েডমন্ট-সার্দিনিয়া ছাড়া অন্য কোথাও ইতালির বংশোদ্ভূত শাসক ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে উগ্র প্রাদেশিকতা বিদ্যমান ছিল। দেশের জাতীয় স্বার্থের বিনিময়ে প্রদেশগুলি নিজেদের ঐতিহ্য ও স্বার্থ বিসর্জন দিতে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। তৃতীয়তঃ, বিভিন্ন রাজ্যের রক্ষণশীল ও উদারনীতি বিরোধী শাসনব্যবস্থা জাতীয় সংহতির পরিপন্থী ছিল। চতুর্থতঃ, মধ্য ইতালি এবং রোম ছিল ধর্মনায়ক পোপের নিয়ন্ত্রণে। পঞ্চমতঃ, ইতালির জাতীয় ঐক্যের প্রধানতম অন্তরায় ছিল অস্ট্রিয়ার আধিপত্য। অবশ্য উত্তর ইতালির লমবারদি ও ভেনেসিয়া অস্ট্রিয়া সরাসরি নিজেদের অধিকারে রেখে দেয়; অন্যত্রও বৈপ্লবিক ভাবধারা ও জাতীয় অভ্যুত্থান অস্ট্রিয়া তা দমনে তৎপর ছিল। বস্তুতপক্ষে ইতালির ঐক্য আন্দোলনের পক্ষে সবচেয়ে বড়ো বাধা ছিল অস্ট্রিয়া। অস্ট্রিয়ার মেটারনিষের নীতি এবং তৎ প্রবর্তিত 1815 খ্রিস্টাব্দের ভিয়েনা বন্দোবস্ত। হ্যাজেন, লিপসন প্রমুখ পাঠ্যপুস্তক রচয়িতাগণ যথার্থই লিখেছেন যে ভিয়েনা চুক্তির দ্বারা ইতালির উপর তিন ধরণের অন্যায় ব্যবস্থা কায়েম করা হয়েছিল। এক - রাজনৈতিক দিক থেকে বিভক্ত করে ফেলা; দুই - ইতালির উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে অস্ট্রিয়ার আধিপত্য স্থাপন করা এবং তিন - ইতালির নানা রাজ্যে বিদেশী রাজবংশীয় শাসন স্থাপন করা। এই বাধাগুলি দূর না করতে পারলে ইতালির ঐক্য সম্ভব ছিল না। এই বাধাগুলিই দূর হয়েছিল নানা পর্বে নানা স্তরের মধ্য দিয়ে গিয়ে শেষপর্যন্ত 1870 খ্রিস্টাব্দে।

৩। ইতালির ঐক্য আন্দোলনের প্রথম পর্ব (1815–48 খ্রিঃ)

ইতালির নানাবিধ সমস্যা সত্ত্বেও 1815 খ্রিস্টাব্দের পর জাতীয়তাবাদী ভাবধারা প্রসারিত হয় এবং সেই সঙ্গে ঐক্য প্রচেষ্টাও শুরু হয়। এই জাতীয়তাবাদী ভাবধারা প্রসারের পিছনে দু'টি কারণ ছিল। একদিকে ফরাসি বিপ্লব ও নেপোলিয়ানের শাসনের প্রভাব এবং অন্যদিকে বুদ্ধিজীবীদের রচনার প্রভাব।

ইতালির জাতীয়-আকাঙ্খা উপেক্ষিত হওয়ার বেদনা বুদ্ধিজীবী লেখকগণ তাদের লেখার মধ্য দিয়ে তুলে ধরে ছিলেন। 1815 খ্রিস্টাব্দের পর বিদেশী তথা প্রতিক্রিয়াশীল শাসন থেকে বিভিন্ন ইতালিয় রাজ্যগুলিকে মুক্ত করার জন্য অনেক গুপ্ত-সমিতি গড়ে ওঠে। এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিল 'কার্বোনারি'। কার্বোনারি কথাটির অর্থ জ্বলন্ত অঙ্গার। ভিয়েনা সম্মেলনের পর অস্ট্রিয়া-বিরোধী রাজনৈতিক মনোভাবই গুপ্তসমিতির কার্যকলাপ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী লিখেছেন,"ষড়যন্ত্রের মানসিকতা বা গোপন রাজনৈতিক কার্যকলাপ সম্পর্কে একধরণের রোমান্টিক ধারণা থেকে উদারপন্থী

মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ক্রমশ গুপ্ত সমিতির দিকে ঝুঁকে ছিল।" যেমন কার্বোনারি দলের বিশেষ প্রভাব ছিল পিয়েডমন্ট নেপল্‌স এবং পোপের রাজ্যে। এই গুপ্তদলের সদস্য মূলত সংগ্রহ করা হয়েছিল মধ্যবিত্তদের থেকে। সব শ্রেণীর মানুষের মধ্যে এর প্রভাব ছিল না। এমনকি লমবারদির গুপ্তসমিতি গুয়েলফি বা পিয়েডমন্টের গুপ্তসমিতি আদেলফি সম্পর্কেও একই মন্তব্য করা যায়। তাছাড়া গুপ্ত সমিতিগুলির স্পষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শ বা কর্মসূচি ছিল না।

বিপ্লবী অভ্যুত্থান ঃ কার্বোনারি একদা নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধেও লড়াই করেছিল, ভিয়েনা কংগ্রেসের পর তাদের একমাত্র লক্ষ্য হলো অস্ট্রিয়ার আধিপত্যের অবসান ঘটানো। তাই তারা তাঁদের আদি সংগঠন নেপল্‌স থেকে বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে সমগ্র ইতালিতে ছড়িয়ে দিয়েছিল। কার্বোনারি তথা অন্যান্য গুপ্ত সমিতিগুলির নেতৃত্বে নেপলস্-এ (1820) এবং একমাত্র পিয়েডমন্টে (1821) গণ-অভ্যুত্থান ঘটে। নেপল্‌সে বিদ্রোহ হয়েছিল জেনারেল পপ-এর নেতৃত্বে। 1815 খ্রিস্টাব্দে ভিয়েনা বন্দোবস্তের পর নেপল্‌স-এর বুরঁবো বংশীয় রাজা প্রথম ফার্দিনাণ্ড সিসিলির উদারপন্থী সংবিধান মেনে নেবেন বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। কিন্তু 1816 খ্রিস্টাব্দে তিনি সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ক'রে ঐ সংবিধান বাতিল বলে ঘোষণা করেন। ফলে জনগণের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভের সঞ্চার হয় এবং নেপলস্-এর জনগণ সামরিক বাহিনীর সমর্থনে স্পেনের ধাঁচে সংবিধান দাবি করে। ফার্দিনাণ্ড তা মেনে নিতে বাধ্য হন। কিন্তু অনতিকালের মধ্যেই অস্ট্রিয়ার সামরিক হস্তক্ষেপে বিদ্রোহ দমিত হয়। প্রথম ফার্দিনাণ্ড সংবিধান ছিঁড়ে ফেলেন, বিদ্রোহীদের ফাঁসি কিংবা জেল হয়। অনুরূপভাবে 1821 খ্রিস্টাব্দে সান্তা রোসার নেতৃত্বে পিয়েডমন্টে বিদ্রোহ দেখা দেয়। বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে লমবারদি এবং পোপের রাজ্যে, পার্মা ও মডেনাতে। পোপ ষষ্ঠ গ্রেগরী অস্ট্রিয়ার সাহায্য প্রার্থনা করেন। শেষ পর্যন্ত অস্ট্রিয়ার সামরিক সাহায্যে প্রতিটি বিদ্রোহ দমন করা হয়। একইভাবে 1830 খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের জুলাই বিপ্লবের প্রভাবে ইতালিতে বিপ্লবী-বিক্ষোভ হলেও অস্ট্রিয়ার সাহায্যে তা দমন করা হয়।

প্রধানত কার্বোনারি এবং সেই সঙ্গে আদেলফি, গুয়েলফি ইত্যাদি গুপ্ত সমিতির দ্বারা সংঘটিত বিপ্লবী প্রচেষ্টা ইতালির ঐক্যের পথে তেমন সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। বিদ্রোহগুলির ব্যর্থতার পিছনে অনেক কারণ ছিল। যেমন, বিদ্রোহের সপক্ষে সংগঠিত জনমত গ্রহণ না করা, বিদ্রোহীদের মধ্যে অনৈক্য, গঠনমূলক কর্মসূচির অভাব, সামরিক দুর্বলতা, কৃষক শ্রেণীর দূরে সরে থাকা, নেপল্‌স ও পিয়েডমন্টের মধ্যে নীতিগত পার্থক্য ইত্যাদি। তবে এই বিদ্রোহগুলি ব্যর্থ হলেও তাদের গুরুত্ব ছিল। প্রথমতঃ তারা অস্ট্রিয়াকেই প্রধান শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন এবং দ্বিতীয়তঃ তারা উদারনীতি ও প্রজাতান্ত্রিক আর্দশ দ্বারা ইতালিতে জাতীয়তাবাদের প্রসার ঘটিয়েছিলেন। এই জাতীয়জাগরণের অগ্রদূত ছিলেন গিউসেপ্ ম্যাৎসিনি।

বিপ্লবী আন্দোলনের ব্যর্থতার পরে ইতালিতে বিভিন্ন কারণে যে জাতীয়তাবাদ বা উদারপন্থার উত্থান ঘটেছিল, তার থেকে ক্রমে ইতালির ঐক্য (Unification of Italy) আন্দোলনের জন্ম নেয়। এই আন্দোলনই 'রিসর্জিমেন্টো'(Risorgimento) বা নবজাগরণ আন্দোলন নামে খ্যাত। এই আন্দোলনের চারটি মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল— ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, বিদেশী শাসন থেকে মুক্তি, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা এবং জাতীয় ঐক্য। এই আন্দোলনের প্রধান চার নেতা —ম্যাৎসিনি, কাভুর, ভিক্তর ইমানুয়েল এবং গ্যারিবল্দি।

৪। গিউসেপ্ ম্যাৎসিনি (Giuseppe Mazzini)-র ভূমিকা

কার্বোনারি দলের আন্দোলন অনেকটা রোম্যান্টিক ভাববিলাসকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে উঠেছিল; তবে তার থেকে মুক্ত ছিলেন গিউসেপ ম্যাৎসিনি। তিনি ইতালির রাষ্ট্রীয় ঐক্য গঠনের পথে যে-সব বাধা আছে, সেগুলি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তিনি ইতালিবাসীদের সামনে শুধু যে ঐক্যের আবেদন রেখেছিলেন তা নয়, তিনি স্বাধীনতা ও ঐক্যকে ইতালির মানুষদের জীবনের আদর্শ রূপে গড়ে তুলেছিলেন। গিউসেপ (ইংরেজি উচ্চারণে যোসেফ) ম্যাৎসিনি (1805–1872) ছিলেন জেনোয়া প্রদেশের অধিবাসী, এক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পুত্র এবং পরিণত বয়সে নিজে হন একাধারে বাগ্মী, সুলেখক, চিন্তাবিদ্, বিপ্লবী সংগঠক এবং তেজস্বী দেশপ্রেমিক। বাল্যকাল থেকেই তিনি ইতালির জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। আদর্শবাদী ম্যাৎসিনির নিরলস প্রচেষ্টায় ইতালিবাসীর মনে স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ ইতালির আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছিল। তাই তাঁকে ইতালির স্বাধীনতা সংগ্রামের "পুরোহিত বা মন্ত্রদাতা" বলা হয়।

প্রথম জীবনে তিনি কার্বোনারি বিপ্লবী দলের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন। 1830-এর বিদ্রোহে যোগ দেওয়ার ফলে তাঁকে কারারুদ্ধ হতে হলো (1831)। তিনি উক্ত বিপ্লবী সংস্থার অনেক দোষ-ত্রুটি লক্ষ্য করেছিলেন। তাই তিনি কারামুক্তির পর নতুন নতুন উৎসাহী ও কর্মক্ষম যুবকদের নিয়ে গঠন করলেন *ইয়াং ইতালি* (Young Italy) নামে নতুন একটি সঙ্ঘ (1831)। অবশ্য ইয়াং ইতালির সদস্যপদ নিতে গেলে 'ইতালিকে একটা ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে আমি আমার সমগ্র জীবন উৎসর্গ করব' বলে শপথ নিতে হত।

এখানে বলা দরকার যে, 1830 খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহে কার্বোনারি দলের হয়ে যোগ দিয়ে প্রায় ছ'মাস স্যাভোয়ার জেলে কাটালেও, মুক্তি পেয়ে ম্যাৎসিনি কার্বোনারির সংস্রব ত্যাগ করেন। কারণ সন্ত্রাসবাদে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। তাঁর বিভিন্ন রচনা পিয়েডমন্ট-সার্দিনিয়া সরকার রাজদ্রোহমূলক বিবেচনা করায় তাঁকে দেশ ত্যাগ করতে হয়। বস্তুতপক্ষে 1831 খ্রিঃ তিনি যখন 'ইয়াং ইতালি' গঠন করেন তখন তিনি ফ্রান্সের মার্সেই বন্দর-শহরে অবস্থান করছিলেন। কার্বোনারির কর্মপন্থা ছিল ধ্বংসাত্মক, আর ইয়াং ইতালির কর্মপন্থা ছিল সৃষ্টিধর্মী। তাই অচিরে ইয়াং ইতালির প্রভাব কার্বোনারির আদর্শকে পশ্চাতে

ফেলে রেখে এগিয়ে চলল। পরে দেশে ফিরে এসে প্রচার ও সংগঠন শুরু করেন। নৈতিক আদর্শ এবং যুবশক্তির উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। ম্যাৎসিনির উদ্দেশ্য ছিল চারটি ঃ (১) ইতালি থেকে অস্ট্রিয়ার আধিপত্যের উচ্ছেদ সাধন করে ইতালির ঐক্য সম্পন্ন করা, (২) এই কাজের জন্য ইতালিয়দের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রসার ঘটিয়ে ঐক্যনির্ভর শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তোলা, (৩) যুব শক্তির উপর আস্থা স্থাপন করে বিদেশের সাহায্য না নিয়েই ঐক্যসাধন করা এবং (৪) ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হলে প্রজাতান্ত্রিক সরকার গঠন করা।

"ইয়াং ইতালি" প্রতিষ্ঠার সময় থেকে (1831) ফেব্রুয়ারি বিপ্লব (1848) পর্যন্ত ইতালির বিভিন্ন রাজ্যে মাঝে মাঝে গণ অভ্যুত্থান হলো। কিন্তু অস্ট্রিয়া একে একে সেই সব বিদ্রোহ সামরিক শক্তির সাহায্যে দমন করল। তবে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের সময় (1848) ইতালির জাতীয়তাবাদীগণ দেশের মুক্তির জন্য দেশময় বিপ্লব সৃষ্টি করতে সমর্থ হন। এই আন্দোলনে পিয়েডমন্ট সার্দিনিয়ার রাজা চার্লস অ্যালবার্ট অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। কিন্তু তিনি অস্ট্রিয়-বাহিনীর হাতে পরাজিত হন। রাজতান্ত্রিক প্রয়াস যখন ব্যর্থ হলো তখন ম্যাৎসিনির দ্বারা প্রভাবিত চরমপন্থীরা এগিয়ে এলো। ম্যাৎসিনির নেতৃত্বে রোমে গণ-অভ্যুত্থান হলো এবং রোমে স্থাপিত হলো প্রজাতন্ত্র। ঠিক এই সময় (1849) পিয়েডমন্ট সার্দিনিয়ার রাজা চার্লস অ্যালবার্ট নিজপুত্র ভিক্তর ইমানুয়েলের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হন। অন্যদিকে পোপের অনুরোধে ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়া সহজেই ইতালির গণ-আন্দোলন স্তব্ধ করে দিল।

1815 খ্রিস্টাব্দ থেকে 1848 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ম্যাৎসিনি ইতালির ঐক্য আন্দোলনে জোয়ার আনতে সমর্থ হন। সমগ্র দেশে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ঘটে। এমনকি সমকালীন ইয়োরোপে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতি একটা রোমান্টিক আকর্ষণের সৃষ্টি হয়েছিল।

তবে সকলেই তাঁর সঙ্গে একমত ছিলেন না। ম্যাৎসিনির ব্যক্তিত্ব, আদর্শ ও সুশৃঙ্খল জীবন সম্পর্কে অনেকের শ্রদ্ধা থাকলেও তারা মনে করতেন তিনি বড়ো বেশি চরমপন্থী। তাঁর ব্যক্তিত্ব প্রায় অতীন্দ্রিয় তাঁর ভাষা ছিল অলঙ্কারপূর্ণ। অনেকে মনে করতেন ইতালির সমস্যা সমাধানের জন্য শুধু আদর্শ প্রচার যথেষ্ট নয়, অন্য রকম সমাধান বা ব্যবস্থা নেওয়াও প্রয়োজন। এরকম কয়েকজনের মতামত উল্লেখ করা যেতে পারে

গিয়োবারতি (Gioberti) মনে করতেন ইতালির ঐক্য সম্ভব নয়, তবে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা যেতে পারে। এই যুক্তরাষ্ট্র হবে পোপের নেতৃত্বে। তিনি মনে করতেন রাজতান্ত্রিক আদর্শই ইতালির ঐতিহ্য, প্রজাতান্ত্রিক নয়। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অনেকে, যাঁরা জাতীয় ঐক্য বা সংহতি চাইতেন অথচ বৈপ্লবিক আন্দোলন বা পরিবর্তনকে ভয় পেতেন, তাঁরা গিয়োবারতিকে সমর্থন করতেন। প্রজাতন্ত্রীদের অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টাকে

সমর্থন করেননি শিল্পী, ঔপন্যাসিক এবং রাজনীতিবিদ মাসিমো দ্যাৎসেগলিও (Massimo D' Azeglio)। তিনি মনে করতেন পিয়েডমন্টের রাজার অধীনেই ইতালির ঐক্য হওয়া উচিত। বালবো (Balbo), গিয়োবারতির মতন বিশ্বাস করতেন— ইতালির ঐক্য সম্ভব নয়, একটি যুক্তরাষ্ট্রই গঠন করা যেতে পারে। তবে এই যুক্তরাষ্ট্র পোপের অধীনে নয়, পিয়েডমন্টের রাজা চার্লস অ্যালবার্টের নেতৃত্বে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

1830 এবং 1840 এর দশকে ম্যাৎসিনির মতবাদে আকৃষ্ট জাতীয়তাবাদীরা নানা স্থানে বিদ্রোহ করলেও তার কোনটিই সফল হয়নি। বরং 1833-এ ব্যর্থ অভিযানের নায়ক রুফিনিককে আত্মহত্যা করতে হয়েছিল। 1834 -এ গ্যারিবল্দিকে দক্ষিণ আমেরিকায় পালিয়ে যেতে হয়েছিল।

এই ব্যর্থতার ভিতর দিয়ে যে শিক্ষা অর্জিত হলো সেটাই হলো প্রকৃত লাভ।.প্রথমতঃ, ইতালির নেতারা বুঝলেন যে, স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ ইতালির গঠন শুধুমাত্র জাতীয় সমস্যা নয়; এটি একটি আন্তর্জাতিক সমস্যাও বটে। দ্বিতীয়তঃ, ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন ইতালি গঠনের জন্য যেমন প্রয়োজন জনগণের ঐকান্তিক আগ্রহ ও নিষ্ঠা, তেমনি প্রয়োজন বৈদেশিক শক্তির সাহায্য। তৃতীয়তঃ, ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন ইতালি গঠনের জন্য সর্বাধিক প্রয়োজন রাজতান্ত্রিক নেতৃত্ব। পরবর্তীকালে এই শিক্ষাকে যিনি সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করতে সমর্থ হন তিনি হলেন কাউন্ট কাভুর। তিনি ছিলেন জাতীয়তাবাদী, উদার ও দূরদর্শী নরপতি ভিক্তর ইমানুয়েলের বিচক্ষণ ও দূরদর্শী মন্ত্রী। 1848 খ্রিস্টাব্দ থেকে ইতালির রাজনৈতিক আন্দোলন ক্রমশ কাভুরের নেতৃত্বে আশার সঞ্চার করে এবং শুরু হয় ইতালির ঐক্য আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব।

৫। ইতালির ঐক্য আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব (1848-60)

1848 খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের প্রভাবে রোমে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হলে ম্যাৎসিনির সাফল্যলাভ ঘটলেও অচিরেই ফ্রান্সের তৃতীয় নেপোলিয়ান পোপকে প্রতিষ্ঠা করার অজুহাতে সামরিক হস্তক্ষেপ দ্বারা রোমান প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করেন। ম্যাৎসিনি ভগ্নহৃদয়ে লণ্ডনে চলে যান এবং শেষ জীবন ইংল্যাণ্ডেই কাটান। তবু ইতালির ঐক্য আন্দোলনের ইতিহাসে গিউসেপ ম্যাৎসিনির কৃতিত্ব অপরিসীম। তাঁর বিপ্লবী জীবন, নির্বাসনে কষ্টভোগ, দেশের জন্য স্বার্থত্যাগ, গভীর দেশপ্রেম, প্রজাতন্ত্র ও জাতীয়তার আদর্শ এবং জনসাধারণের প্রতি ভালোবাসা তাকে এক মহিমাময় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে। ম্যাৎসিনির প্রচেষ্টাতেই ইতালির ঐক্য আন্দোলন এক জাতীয় আন্দোলনের জোয়ারে প্রতিষ্ঠিত হয়। একে বলা হত 'রিসর্জিমেন্টো'। দেশে সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, চার্চের ক্ষমতা হ্রাস এবং প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ছিল যার লক্ষ্য। এই রিসর্জিমেন্টোর আন্দোলন ছাপ ফেলেছিল শিল্প-সাহিত্য-নাটক-কবিতায়। ম্যাৎসিনিই ইতালির জাতীয় ইচ্ছাকে প্রথম জনমানসে তুলে ধরেন।

ভিক্তর ইমানুয়েলের ভূমিকাঃ 1848 খ্রিস্টাব্দে ইতালির ঐক্য আন্দোলনের প্রথম পর্ব শেষ হয়। এরপর প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য পরিত্যাগ ক'রে পিয়েডমন্ট-সার্দিনিয়ার নেতৃত্বে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাদের ঐক্য প্রচেষ্টা শুরু হয়। এই আন্দোলনে পিয়েডমন্ট সার্দিনিয়ার স্যাভয় বংশীয় রাজা ভিক্তর ইমানুয়েলের ভূমিকা ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর পিতা চার্লস অ্যালবার্ট 1848 খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবের সময় ম্যাৎসিনির প্রজাতন্ত্রী দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন এবং অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানে সক্রিয়ভাবে যোগ দেন। শেষ পর্যন্ত কাস্টোজা ও নোভারার যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার কাছে পরাজিত হয়ে তিনি পুত্রের অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করেন। ইমানুয়েল অস্ট্রিয়ার ক্রমাগত চাপ সত্ত্বেও রাজ্যে উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থাকে শিথিল করেন নি। তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় পিয়েডমন্ট রাজ্যই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রধানকেন্দ্র হয়, তাঁর জাতীয়তাবোধ ও দৃঢ়তা তাকে জনপ্রিয় ক'রে তোলে। উত্তরকালে গ্যারিবল্দি দক্ষিণ ইতালি জয় ক'রে তাঁর হাতেই অর্পণ করেছিলেন। জনগণ তাকে 'সাধু রাজা' বলে শ্রদ্ধা জানাত।

চার্লস্ অ্যালবার্ট নিজে খুব বেশি যে উদারপন্থী ছিলেন তা নয়। কিন্তু রাজ্যের জন্য নানা সংস্কার করেছিলেন। তারই নির্দেশে মন্ত্রী মারঘেরিতা পিয়েডমন্টে সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটান, আইনের সংকলন প্রকাশ করেন এবং অবাধ বাণিজ্য নীতি অনুসরণ করে আর্থনীতিক উন্নতির ব্যবস্থা করেন। সমগ্র ইতালির সামনে পিয়েডমন্ট সার্দিনিয়া হয়ে ওঠে এক আদর্শ রাজ্যের দৃষ্টান্ত। তদুপরি অ্যালবার্টের সঙ্গে মেটারনিষের সম্পর্কও ভালো ছিল না এবং ফ্রান্সের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক ছিল। সুতরাং পিয়েডমন্ট আশা করেছিল অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে তারা ফ্রান্সের সাহায্য পাবে। তারপর অ্যালবার্ট যখন পুত্র ভিকত্‌র ইমানুয়েলের অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করলেন তখনই ইতালির ঐক্য আন্দোলন এক ধাপ এগিয়ে গেল। জার্মানির ঐক্যে যেমন প্রাশিয়া রাজ্য বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন ইতালির ঐক্যে তেমনি পিয়েডমন্ট সার্দিনিয়া বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো এই যে কাভুর নামে একজন তরুণ অভিজাত ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডে রাজনৈতিক শিক্ষা সমাপ্ত করে ইতালিতে ফিরে আসেন। তিনি রেলপথ বিস্তার ও মুক্তবাণিজ্যের সমর্থক ছিলেন। তাছাড়া তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল জাতীয়তাবাদী। 1847 এ তিনি রিসর্জিমেন্টো নামক পত্রিকা প্রকাশ করে ঐক্য প্রচার শুরু করেন। কূটনৈতিক ও বাস্তব বুদ্ধি সম্পন্ন কাউন্ট কাভুর 1848 খ্রিঃ পিয়েডমন্টের সাংসদে নির্বাচিত হন। পরে ভিকতর ইমানুয়েল তাকে পিয়েডমন্ট সার্দিনিয়ার প্রধানমন্ত্রী করার পর ইতালির ঐক্য আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব দ্রুত অগ্রসর হয়।[1]

---

1. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্র. R. Albercht-Carrie, *Italy from Napoleon to Mussolini;* D. Mack Smith, *Italy: A Modern History* এবং A. J. Whyte, *The Evolution of Modern Italy.*

কাউন্ট কাভুরের ভূমিকা ঃ 1810 খ্রিস্টাব্দে কাউন্ট ক্যামিলো ডি কাভুর পিয়েডমন্টের এক অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনে সামরিক শিক্ষালাভ করে কিছুকাল ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে সামরিক বিভাগে চাকরিও করেন। এরপর তিনি ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স ভ্রমণ ক'রে রাজনীতি ও অর্থনীতি সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। কাভুর (Cavour)-এর ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড একাধিকবার ভ্রমণের ফলে মনের মধ্যে গণতান্ত্রিক ও নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের প্রতি আস্থা জন্মায়। তিনি পেশায় প্রযুক্তিবিদ হলেও তার প্রকৃত নেশা ছিল সাংবাদিকতা। প্রভূত বিত্তের অধিকারী হয়েও তিনি অভিজাততন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন না। স্বদেশের বৃহত্তর সমস্যার দিকে দৃষ্টি দিয়ে 1832 খ্রিস্টাব্দে তিনি 'অ্যাসোসিয়জন অ্যাগ্রারিয়া' নামে এক সংগঠন স্থাপন করেছিলেন, যা ছিল পরবর্তীকালে তাঁর রাজনৈতিক প্রভাবের হাতিয়ার। এছাড়া 1847 খ্রিঃ থেকে তিনি 'রিসর্জিমেন্টো' নামে পত্রিকা সম্পাদনার মাধ্যমে সক্রিয় রাজনীতিতে প্রবেশ করেন এবং 1848 খ্রিস্টাব্দে পিয়েডমন্ট সার্দিনিয়াতে উদারনৈতিক শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হন।

1850 খ্রিস্টাব্দে তিনি নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে পিয়েডমন্টের মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন এবং 1852 খ্রিস্টাব্দে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হবার পর আমৃত্যু (1861) ঐ পদে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। কাউন্ট কাভুরের চিন্তা ও কর্মপন্থা ছিল বাস্তবতাভিত্তিক।

কাভুর ছিলেন ধুরন্ধর বাস্তববাদী এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতির (Realpolitik) ভক্ত। তিনি ম্যাৎসিনির প্রজাতন্ত্রবাদকে অবাস্তব মনে করতেন এবং নিজে ছিলেন নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের প্রবল সমর্থক। তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল বিদেশী শক্তির সাহায্য নিয়ে ইতালির ঐক্যকে সফল করে তোলা। এই উদ্দেশ্যে তিনি পিয়েডমন্টকে জাতীয় নেতৃপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। এছাড়া তিনি দেশের আভ্যন্তরীণ উন্নতি ঘটিয়ে এবং সঠিক বৈদেশিক নীতি গ্রহণের মাধ্যমে ইয়োরোপীয় নেতৃবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে তাদের সাহায্য চেয়েছিলেন।

ইতালির মুক্তিসংগ্রামে পিয়েডমন্ট-সার্দিনিয়ার নেতৃত্বকে যোগ্য ও আকর্ষণীয় করে তুলবার জন্য কাভুর ঐ রাজ্যের আভ্যন্তরীণ নানা সংস্কারে মনোনিবেশ করলেন। অচিরে সার্দিনিয়ার অভ্যন্তরে কৃষি-বাণিজ্যের উন্নতি বিধান, রেলপথের প্রসার, পোস্ট-অফিস ও কলকারখানা স্থাপন, বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন, সামরিক ও নৌবাহিনীর পুনর্গঠন—ইত্যাদি বহুবিধ উন্নয়নমূলক ও সংস্কারমূলক কর্ম সম্পাদন করেন। পিয়েডমন্ট-সার্দিনিয়া-ইতালির মধ্যে অল্পদিনের ভিতরে একটি উন্নত, জনপ্রিয় আদর্শ রাষ্ট্ররূপে পরিগণিত হলো।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ও কাভুর কর্তৃক বৈদেশিক সহানুভূতি অর্জন ঃ কাউন্ট কাভুর বৈদেশিক নীতি হিসেবে দুটি পন্থা অবলম্বন করলেন। প্রথমটি হলো, ইয়োরোপের রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাকে ইতালির সমস্যার প্রতি আকর্ষণ করা এবং দ্বিতীয়টি হলো ইতালির জন্য সুযোগ্য মিত্রশক্তি সংগ্রহ করা। ইয়োরোপকে ইতালি সম্পর্কে সচেতন করার জন্য

তাঁরই উৎসাহে একদল শক্তিশালী লেখক ও সাংবাদিক সংবাদপত্রে ইতালির পক্ষে এবং অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে নিয়মিত প্রবন্ধ ও সংবাদ প্রচার করতে লাগলেন। অচিরে তিনি ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের সহানুভূতি অর্জন করলেন। জাতীয়তাবাদের পৃষ্ঠপোষক তৃতীয় নেপোলিয়ান নানাভাবে কাভুরকে সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি দিলেন। দ্বিতীয় পন্থা অনুসারে কাভুর আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রাখলেন। অচিরেই ক্রিমিয়ার যুদ্ধ (1854) শুরু হলো। দূরদর্শী ও বিচক্ষণ কাভুর রাশিয়ার বিরুদ্ধে তুরস্ক, ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের পক্ষে যোগদান করে বিশ্বের রাজনীতিবিদদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ এবং প্যারিসের সন্ধি (1856) থেকে কাভুর ফরাসি সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ানের সহানুভূতি অর্জন করলেন। কাভুর এবং তৃতীয় নেপোলিয়ানের মধ্যে প্লোমবিয়ার্সের গোপন চুক্তি (Pact of Plombiers) সম্পাদিত হলো। চুক্তির শর্তে ঠিক হলো যে, অস্ট্রিয়ার সঙ্গে সার্দিনিয়ার যুদ্ধে ফ্রান্স সামরিক সাহায্য দেবে। এর বিনিময়ে ফ্রান্স পাবে স্যাভয় ও নিস। চুক্তির শর্তে ইতালিকে চারটি খন্ডে বিভক্ত করার কথাও বলা হয়; কিন্তু চুক্তিটি ছিল অলিখিত এবং মৌখিক।

প্লোমবিয়ার্সের চুক্তি অনুসারে কাভুর অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। কারণ যুদ্ধটা অস্ট্রিয়ার পক্ষ থেকে শুরু হওয়া প্রয়োজন, কারণ অস্ট্রিয়া যদি সার্দিনিয়া আক্রমণ করে তবেই ফ্রান্স সামরিক সাহায্য দেবে। তবে অস্ট্রিয়াকে উত্তেজিত করার জন্য তিনি সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করলেন এবং অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করলেন। শেষে অস্ট্রিয়ার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল। অস্ট্রিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করল (1859)। অস্ট্রিয়া ইয়োরোপের রাজন্যবর্গের নিকট আক্রমণকারীরূপে নিন্দিত হলো। ফ্রান্সের তৃতীয় নেপোলিয়ান সার্দিনিয়ার সাহায্যে সামরিক বাহিনী প্রেরণ করলেন। সম্মিলিত ফরাসি-সার্দিনিয়ার বাহিনী ইতালির বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত স্বেচ্ছাসেবক দল ম্যাজেন্টা এবং সালফারিনোর যুদ্ধে অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করে লমবারদি অধিকার করল। লমবারদি লাভ ছিল ইতালির ঐক্যের প্রথম সোপান।

লমবারদি দখলের পর অন্যত্র আক্রমণের প্রস্তুতি চলছে—ঠিক এমন সময় তৃতীয় নেপোলিয়ান ভিলাফ্রাঙ্কা নামক স্থানে অস্ট্রিয়ার সম্রাটের সঙ্গে মিলিত হয়ে যুদ্ধ-বিরতির চুক্তিতে আবদ্ধ হন (1859)। তারপর মাস চারেকের মধ্যে হলো জুরিখ-এর সন্ধি। এই সন্ধিতে ঠিক হলো যে, সার্দিনিয়া পাবে লমবারদি; কিন্তু ভেনেসিয়া থাকবে অস্ট্রিয়ার অধিকারে। মধ্য ইতালির বিতাড়িত শাসকরা এই সন্ধির শর্ত অনুসারে স্ব-স্ব পদ ফিরে পাবেন। তৃতীয় নেপোলিয়ানের এই প্রতারণায় কাভুর বিক্ষুব্ধ হলেন। তিনি ভিক্তর ইমানুয়েলকে জুরিখের শর্তে স্বীকৃতি দিতে নিষেধ করলেন; কিন্তু বাস্তববাদী ও সংযমী ইমানুয়েল মন্ত্রী কাভুরের অনুরোধ রক্ষা করলেন না। বাধ্য হয়ে কাভুর মনক্ষুণ্ণ হয়ে সাময়িকভাবে প্রধানমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করলেন। আপাতত জুরিখের সন্ধিতে সাক্ষর করে

ভিক্তর ইমানুয়েল সঙ্কটের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করলেন। কাভুর অবশ্য ছয়মাস পরে পুনরায় নিজপদে ফিরে এসেছিলেন।

উত্তর ও মধ্য ইতালির ঐক্যঃ এদিকে জুরিখের সন্ধি অনুসারে মধ্য ইতালির পার্মা মডেনা, টাস্কানি ও রোমনাতে বিতাড়িত শাসকরা ফিরে এলেন, কিন্তু জনসাধারণ তাদের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করল। তারা পিয়েডমন্ট অন্তর্ভুক্তির পক্ষে স্বীকৃতি জানাল। ইতোমধ্যে কাভুরও পূর্বপদে প্রত্যাবর্তন করলেন। এই সময় ইংল্যাণ্ডের ও ফ্রান্সের সম্মতি অনুসারে কাভুরের প্রস্তাব মতো গণ-ভোটের মাধ্যমে মধ্য ইতালির রাষ্ট্রগুলি সার্দিনিয়ার অন্তর্ভুক্ত হলো। তৃতীয় নেপোলিয়ানের সম্মতির পুরস্কারস্বরূপ স্যাভয় ও নীস ফ্রান্সের হাতে অর্পণ করা হলো। 1860 খ্রিস্টাব্দে ভিক্তর ইমানুয়েল উত্তর ও মধ্য ইতালির নরপতি রূপে অধিষ্ঠিত হলেন। কাভুর 1861 খ্রিস্টাব্দে মাত্র একান্ন বছর বয়সে অকালে প্রাণ ত্যাগ করেন। কিন্তু মৃত্যুর আগেই ইতালির ঐক্যের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত হতে দেখে কাভুর শেষ বাণীতে বলেছিলেন: 'ইতালি গঠিত হয়েছে, সবদিকই এখন নিরাপদ"। বস্তুত পিয়েডমন্ট-সার্দিনিয়ার অধীনে ইতালির জাতীয় ঐক্য আন্দোলনকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য কাউন্ট কাভুরের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। সমসাময়িক ইংরেজ রাজনীতিবিদ লর্ড পামারস্টোন তাই মন্তব্য করেছিলেন, "Cavour left a name, to point a morale and adorn a tale"।

যোসেফ গ্যারিবল্দির ভূমিকাঃ ইতালির মুক্তিযুদ্ধের বীর সৈনিক যোসেফ গ্যারিবল্দি (Garibaldi) ছিলেন নিখাদ দেশপ্রেমিক এবং স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত। 1807 খ্রিস্টাব্দে নিস-এর এক শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। একদা তিনি নৌবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন কিন্তু নির্বাসিত ইতালির স্বদেশপ্রেমিকদের শিক্ষায় ও প্রেরণায় তাঁর জীবনধারার পরিবর্তন ঘটে। গ্যারিবল্দি 1833 খ্রিস্টাব্দে ম্যাৎসিনির সংস্পর্শে আসেন এবং ইয়াং ইতালির সদস্য হন। 1834 খ্রিস্টাব্দে দেশে মুক্তি আন্দোলনে যোগ দিয়ে ইয়াং ইতালির ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি দক্ষিণ আমেরিকায় চলে গিয়েছিলেন এবং সেখানে উরুগুয়ে-র প্রজাতান্ত্রিক স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। 1848 খ্রিঃ স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর গ্যারিবল্দি দেশের মুক্তি আন্দোলনে পূর্ণভাবে যোগ দেন এবং তার বিখ্যাত দল 'লাল কুর্তা' (Red Shirts) তৈরি করেন।

উত্তর ও মধ্য ইতালির মিলনের পর জাতীয়তাবাদী ইতালিয়ানদের নজর পড়ল দক্ষিণ ইতালির দিকে। উত্তর ও মধ্য ইতালির মিলনের সংবাদ পেয়ে দক্ষিণ ইতালির প্রজাপুঞ্জের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দেয়। তারা গ্যারিবল্দিকে এই আন্দোলনে সাহায্য করার জন্য আহ্বান জানাল। গ্যারিবল্দি তিন মাসের মধ্যে সিসিলি অধিকার করে নেপল্‌সে অবতরণ করলেন (1860 খ্রিঃ)। বিজয়োন্মত্ত গ্যারিবল্দি এই সময় রোম ও ভেনেসিয়া অধিকার করার পরিকল্পনা নিয়ে উত্তর দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। ইতোমধ্যে পিয়েডমন্ট সার্দিনিয়ার বাহিনী

রোম ভিন্ন পোপ-অধিকৃত অন্যান্য অঞ্চল দখল করল এবং নেপল্‌সে উপস্থিত হয়ে গ্যারিবল্দির লাল কুর্তা বাহিনীর সম্মুখীন হলো। গ্যারিবল্দি তখন ভিক্তর ইমানুয়েল-এর নিকট স্বীয় আনুগত্য স্বীকার করলেন এবং তাঁর তরবারি ও পতাকা রাজার হস্তে অর্পণ করে ক্যাপবেরা দ্বীপের কৃষিফার্মে চাষ-আবাদের কাজে জীবন কাটিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। গ্যারিবল্দির স্বদেশপ্রেম, বীরত্ব ও আত্মত্যাগ অসামান্য। তিনি ছিলেন দক্ষিণ ইতালি জয়ের নায়ক। তিনি তাঁর লালশার্ট বাহিনীর এক হাজার স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে 1860 খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে বুরবোঁ বংশীয় শাসকদের হটিয়ে সিসিলি ও নেপলস্ অধিকার করেন। তিনি ছিলেন ঘোর প্রজাতন্ত্রী অথচ 1860 খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে যখন পিয়েডমন্ট-সার্দিনিয়ার রাজা ভিক্তর ইমানুয়েলকে সিসিলি ও নেপলস্-এর রাজা হিসেবে ঘোষণা করা হয় তখন বীর ও সিংহ-হৃদয় গ্যারিবল্দি সমগ্র জনগণকে সকল বিভেদ ভুলে রাজানুগত্য স্বীকারে আহ্বান জানান। অসাধারণ রণকুশলতার সঙ্গে চরম আত্মত্যাগ ছিল বলেই ইতালির ঐক্য সফল হয়। স্বদেশসেবার কর্মে যখনই সরকারের পক্ষ থেকে ডাক এসেছে তখনই তিনি দেশ সেবার কর্মে নিজেকে নিয়োগ করেছেন।

৬। ইতালির ঐক্য আন্দোলনের শেষ পর্ব (1860-1870)

জুরিখের সন্ধিতে সাক্ষর করে ভিক্তর ইমানুয়েল দেশকে তৎকালিন সংকটের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। সন্ধির শর্ত অনুযায়ী ভেনেসিয়া অস্ট্রিয়ার অন্তর্গত হয়। এছাড়া, রোমে পোপের রাজ্য বলবৎ ছিল। তাই উত্তর-মধ্য এবং দক্ষিণ ইতালির ঐক্য সাধনের পর ভেনেসিয়া ও রোমের জন্য ভিক্তর ইমানুয়েল সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগলেন। অচিরে সেই সুযোগ উপস্থিত হলো। 1866 খ্রিস্টাব্দে প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হলে ইতালি প্রাশিয়ার পক্ষে যোগদান করল। অস্ট্রিয়ার পরাজয়ে ভেনেসিয়া ইতালির অন্তর্ভুক্ত হলো। অবশিষ্ট রইল রোম। 1870 খ্রিস্টাব্দে প্রাশিয়ার সঙ্গে ফ্রান্সের যুদ্ধ উপস্থিত হলো। তখন ইতালি প্রাশিয়ার পক্ষে যোগদান করল। ফ্রান্সের তৃতীয় নেপোলিয়ান রোম রক্ষণাবেক্ষণে রত ফরাসি বাহিনীকে অপসারণ করে ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ার বা সেডানের যুদ্ধে প্রেরণ করলেন। ঐ যুদ্ধে ফ্রান্স পরাজিত হলো। তখন সার্দিনিয়ার বাহিনী রোমে প্রবেশ করে পোপের রাজ্য অধিকার করল। ভিক্তর ইমানুয়েল ইতালির রাজধানী রোমে স্থানান্তরিত করলেন। ইয়োরোপের ইতিহাসে ঐক্যবদ্ধ অখণ্ড ইতালির সৃষ্টি হলো। 'ইতালি' নামের ভৌগোলিক সংজ্ঞা এবার প্রকৃত রাজনৈতিক সংজ্ঞায় বাস্তবায়িত হলো।

ইতালির ঐক্য আন্দোলনে ম্যাৎসিনি, কাভুর ও গ্যারিবল্দির ভূমিকার মূল্যায়নঃ ইতালির ঐক্য আন্দোলনের যে কাহিনী পূর্বে বর্ণিত হয়েছে তাতে ম্যাৎসিনি, কাভুর এবং গ্যারিবল্দির ভূমিকা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। উপসংহারে আমরা

তাঁদের ভূমিকার মূল্যায়ন করতে পারি। *J. A. S. Greenville* তাঁর *Europe Reshaped* গ্রন্থে লিখেছেন যে, ম্যাৎসিনি হচ্ছেন 'The intellectual apostle of republican unity।' *চার্লস্ হ্যাজেন*ও মন্তব্য করেছেন যে, ম্যাৎসিনি ছিলেন ইতালির পুনর্জাগরণের উদ্গাতা (Prophet)। ম্যাৎসিনির কৃতিত্ব এই যে তিনিই জাতীয়তাবাদকে দেশের প্রেরণাদাতা শক্তি হিসেবে জনসমক্ষে তুলে ধরেছিলেন। তরুণ সমাজকে উদ্বুদ্ধ করায় তিনি সফল। তবে বাস্তববোধের অভাব ও সঠিক পন্থা নির্ধারণে ব্যর্থতা ছিল তাঁর মূল ত্রুটি। *বোস্টন কিং, এডগার হল্ট* প্রমুখের মতে জাতীয় মুক্তির সঙ্গে জনসাধারণের যোগসূত্র স্থাপন ছিল গিউসেপ ম্যাৎসিনির সবিশেষ কৃতিত্ব। তবে ইতালিকে নিজ শক্তির উপর নির্ভরশীল হয়ে ঐক্যবদ্ধ করা— তাঁর এই পন্থা বাস্তবে কাজে লাগেনি।

কাউন্ট ক্যামিলো দি কাভুরের কৃতিত্ব এই যে তিনি ছিলেন কূটনৈতিক জ্ঞান সম্পন্ন এবং বাস্তববোধ সম্মত। ইতালিকে অস্ট্রিয়ার প্রভাব থেকে মুক্ত করতে হলে বিদেশী সাহায্য যে প্রয়োজন তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। ইতালির সমস্যাকে তিনিই প্রথম আন্তর্জাতিক নেতৃবৃন্দের সামনে তুলে ধরেন। ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড তাঁর কাছে সাহায্যকারী দেশ বলে মনে হয়েছিল। তবে তৃতীয় নেপোলিয়ানের উপর নির্ভর করে তিনি বুদ্ধির পরিচয় দেন নি। মধ্যপন্থী কাভুর ম্যাৎসিনির মতন প্রজাতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন না, তিনি ছিলেন সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের সমর্থক। পিয়েডমন্ট সার্দিনিয়া ছাড়াও মধ্য ইতালি তাঁর আমলেই মুক্ত হয়েছিল। অনেক ঐতিহাসিকের মতে কাভুর বাস্তব রাজনীতির সুযোগ নিয়ে কার্যসিদ্ধি করেছিলেন যদিও মৃত্যুকালে সমগ্র ইতালিকে ঐক্যবদ্ধ তিনি দেখে যেতে পারেন নি।

আবেগ প্রবণতা ও স্বদেশ প্রেমের মূর্ত প্রতীক ছিলেন গ্যারিবল্দি। তাঁর দুঃসাহসিক নেতৃত্বেই নেপলস্ এবং সিসিলি সহ দক্ষিণ ইতালি, উত্তর ও মধ্য অংশের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। নিজে প্রজাতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন অথচ জাতীয় প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে ভিকত্র ইমানুয়েলের হাতে বিজিত রাজ্য তুলে দিয়েছিলেন। ইতালি ঐক্যবদ্ধ হলে শেষ জীবন তিনি স্বেচ্ছায় এক খামারে সাধারণ মানুষদের মতন দরিদ্র জীবন যাপন করে মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন।

অধ্যায় ৭

জার্মানির ঐক্য ও শক্তিবৃদ্ধি

(Syllabus: *Unification and Consolidation of Germany*)

১। সূচনা

জার্মানি একটি শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে 1870 খ্রিস্টাব্দে। অথচ তার প্রায় একশো বছরেরও আগে জার্মানি বলে কোনও দেশের অস্তিত্ব ইয়োরোপে ছিল না। পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে জার্মান ভাষাভাষী মানুষদের অঞ্চলসমূহের ভিতরে বহু রাজ্য ছিল। অধ্যাপক *লিপসন* লিখেছেন, "On the eve of the French Revolution, Germany was the most divided country in Europe. It comprised over two hundred states owning a nominal obedience to the Emperor, but practically independent in the management of their internal affairs and in their external relations with one another।"[1] এই রাজ্যগুলির মধ্যে সবচাইতে শক্তিশালী ছিল প্রাশিয়া এবং এই প্রাশিয়ার নেতৃত্বেই শেষ পর্যন্ত জার্মানি বিদেশী প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল।[2]

হ্যাপসবার্গ বংশীয় তথাকথিত পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য ছিল অস্ট্রিয়ার নিয়ন্ত্রণে এবং এই সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল জার্মানির বাইরে ভিয়েনাতে। ফরাসি বিপ্লবের সময় নেপোলিয়ান বোনাপার্ট জার্মানির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি জয় ক'রে উনচল্লিশটি রাজ্যে পরিণত ক'রে জামার্নির ঐক্যের পটভূমি রচনা করেন। নেপোলিয়ানের চেষ্টায় এই রাজ্যগুলিকে নিয়ে 'রাইন রাষ্ট্রসংঘ' (Confederation of the Rhine) নামে একটি যুক্তরাষ্ট্রের পত্তন হয়। নেপোলিয়ানের অনুরূপ শাসনে ঐ রাজ্যগুলির মনে জাতীয়তাবাদের জাগরণ ঘটে। ফরাসি বিপ্লবের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার প্রভাবও সেখানকার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে।

কিন্তু নেপোলিয়ানের পরাজয়ের পর ভিয়েনা কংগ্রেসের শর্তাবলী জার্মান জাতীয়তাবাদকে অবদমিত করল। তবে এই কংগ্রেস জার্মানির 39টি রাজ্যকে ভেঙে আর ছোট ছোট রাজ্য সৃষ্টি করেনি ; বরং উক্ত রাজ্যগুলির সমবায়ে একটি শিথিল রাষ্ট্রসংঘ গঠন ক'রে তার নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল অস্ট্রিয়াকে। এই ব্যবস্থায় জার্মানির

---

1. লিপসন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

2. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্র. A.J.P. Taylor, *The Courses of German History;* A. Ramm, *Germany 1789-1919 : A Political History ;* R. Flenley, *Modern German History* এবং T.S. Hamerow, *Restoration, Revolution, Reaction, Economic and Politics in Germany (1815-1871)*

উদারপন্থীরা খুশি হতে পারেনি। কারণ ভিয়েনা কংগ্রেসের মস্তিষ্ক অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলার মেটারনিষ জার্মানির উদারনৈতিক জাতীয়তাবাদীদের দমনের জন্য সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন।

বস্তুতপক্ষে 1648 খ্রিস্টাব্দে দীর্ঘকাল যুদ্ধের পর যখন ওয়েস্টফেলিয়ার সন্ধি-স্বাক্ষরিত হয় তখনই জার্মানিকে প্রায় দু'শো রাজ্যে বিভক্ত করা হয়েছিল এবং প্রায় দেড়শো বছর সেরকম থাকার পর নেপোলিয়ান যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে জার্মানদের মধ্যে ঐক্যবোধ জাগ্রত করেন। যদিও এক জার্মানি নয়, 39টি রাজ্যে তিনি জার্মানিকে বিভক্ত করেছিলেন এবং তবু তাদের মধ্যে কনফেডারেশন বা যুক্তরাষ্ট্র তৈরি করা হয়। আবার নেপোলিয়ানের আসল উদ্দেশ্য ছিল সংগঠিত জার্মানিকে ফ্রান্সের অধীনস্থ না হলেও তাঁবেদার রাজ্যে পরিণত করা। কিন্তু এতে ঐক্যের ক্ষেত্রে তিনি অনুঘটকের কাজ করেন। আর নেপোলিয়ানের পতনের পর রাষ্ট্রসংঘ (Bund) রইলো বটে তবে তা ছিল শিথিল। এই রাষ্ট্রমণ্ডল 39টি রাজ্যের শাসকদের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত ছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে প্রত্যেক জার্মান রাজ্যের স্বতন্ত্রতা অব্যাহত থাকার ফলে এই ব্যবস্থায় জার্মান ঐক্যবোধ ব্যাহত হয়। তদুপরি এই রাষ্ট্রমণ্ডলের সভাপতি ছিল অস্ট্রিয়া। অঙ্গরাজ্যগুলির নিজস্ব বা আভ্যন্তরীণ শাসনের ব্যাপারে রাষ্ট্রমণ্ডলের কোনও ক্ষমতা ছিল না।

আসলে জার্মানির ঐক্যের পথে অনেকগুলি অন্তরায় ছিল। প্রথমতঃ, ভিয়েনা চুক্তির প্রভাব ছিল জার্মানির ঐক্যের পথে বাধা। দ্বিতীয়তঃ, জার্মানির রাজ্যগুলির মধ্যে প্রাদেশিকতা ও বিচ্ছিন্নতাবোধ প্রবল থাকায় অখণ্ড জার্মানি গঠন করা ছিল কঠিন। জার্মানদের মধ্যে ভাষাগত, জাতিগত মিল থাকলেও রাজনৈতিকভাবে প্রাশিয়া, স্যাক্সনি, ব্যাভেরিয়া প্রমুখ স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাস করত। তৃতীয়তঃ, ধর্মীয় ব্যাপারেও পার্থক্য ছিল। উত্তরাঞ্চলের রাজ্যগুলি ছিল মূলত প্রোটেস্টান্ট এবং দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলি রোমান ক্যাথলিক। চতুর্থতঃ, জার্মানিতে উদারপন্থী গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে চরমপন্থী গোষ্ঠীগুলির আদর্শগত পার্থক্য ছিল। উদারপন্থী দলের প্রধান সমর্থন আসত ধনী সম্পত্তিভোগী বুর্জোয়াদের কাছ থেকে। বিপরীতপক্ষে, চরমপন্থী জার্মান জাতীয়তাবাদীরা সর্বসাধারণের ভোটাধিকার প্রবর্তন, প্রজাতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রবাদের দ্বারা জার্মানির ঐক্যকে অর্জন করার ইচ্ছা পোষণ করত। পঞ্চমতঃ, অস্ট্রিয়ার আধিপত্য ছিল জার্মানির ঐক্যের পথে ছিল প্রধান বাধা। অস্ট্রিয়াকে বাদ দিয়ে জার্মানির ঐক্য প্রচেষ্টা সম্ভব ছিল না। অস্ট্রিয়া তাতে বাধা দিত। আবার অস্ট্রিয়া সহ জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব ছিল না, কেননা অস্ট্রিয়াতে জার্মান ছাড়াও চেক, স্লোভাক, ক্রোয়েট, ম্যাগিয়ার, স্লাভ প্রমুখ জাতির লোক ছিল।

২। জার্মানির ঐক্য আন্দোলনের প্রথম পর্ব (1815-48)

জার্মানির অবস্থা যখন এরকম তখন দুটি ভিন্নমুখী শক্তি জার্মান জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার পথে এগিয়ে নিয়ে গেল। প্রথমটি ছিল জাতীয় চেতনায় বিপ্লব সৃষ্টির প্রয়াস এবং দ্বিতীয়টি ছিল অর্থনৈতিক ঐক্যসাধনের প্রয়াস। প্রথমটিকে বলা হয় জাতীয় ঐক্যসাধনের

আন্দোলন (Movement for Pan-Germanism) এবং দ্বিতীয়টিকে শুল্কসংঘ বা জোলভেরাইন (Zollverein) প্রতিষ্ঠার আন্দোলন।

একথা সত্য যে, ভিয়েনা সম্মেলনের পরে জার্মান দেশপ্রেমিক মানুষেরা হতাশ হয়েছিলেন। এবং জার্মান রাজ্যগুলিতেও ইয়োরোপের অন্য অনেক জায়গার মতন পুরোনো পরিবর্তন-বিমুখ ব্যবস্থার সঙ্গে পরিবর্তনকামী ঐতিহাসিক শক্তির সংঘাত লক্ষ্য করা যায়। পরিবর্তনকামীদের সাধারণত বলা হত উদারপন্থী (Liberal)—যদিও এদের মধ্যে নানাগোষ্ঠী ছিল, সাংবিধানিক রাজতন্ত্রী থেকে শুরু করে কট্টর প্রজাতন্ত্রী বা গণতন্ত্রী পর্যন্ত। পরিবর্তনকামী শক্তিগুলির মুখ্য লক্ষ্য ছিল দুই ধরনের : জাতীয় ঐক্য সাধন এবং উদারপন্থী সরকারের প্রতিষ্ঠা। আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি যে এই উদ্দেশ্য সাধনের পথে অনেক অন্তরায় ছিল। সেই কারণগুলি ছাড়াও বলা যায় যে জার্মানির বেশিরভাগ জায়গাতেই অভিজাত শ্রেণীর দাপট ছিল। তারা পরিবর্তনের বদলে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। প্রাশিয়াতেও ভূস্যাধিকারী অভিজাত (Junker) শ্রেণীর আধিপত্য ছিল। আরও একটি অদ্ভুত ব্যাপার ছিল, ভিয়েনা সম্মেলনের পরে গঠিত যুক্তরাষ্ট্রীয় সংসদে (Federal Diet) শুধু যে অস্ট্রিয়ার প্রতিনিধি সভাপতি হিসেবে ছিলেন তাই নয়, বিদেশী শাসকেরাও তাদের জার্মান রাজ্যের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত থাকতেন। যেমন হ্যানোভার রাজ্যের প্রতিনিধি হিসেবে ইংল্যাণ্ডের এবং হলস্টাইন এর প্রতিনিধি হিসেবে হল্যাণ্ডের রাজারা উপস্থিত থাকতেন। স্বাভাবিকভাবে জার্মানিতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অনুকূল পরিস্থিতি ছিল না।

তৎসত্ত্বেও সর্বজার্মানবাদ এবং জোলভেরাইন বা শুল্ক সংঘকে কেন্দ্র ক'রে বাধাগুলি দূর হতে শুরু করে। কতকগুলি ব্যাপার জার্মানদের সাহায্যও করেছিল। যেমন নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ যে অভূতপূর্ব দেশপ্রেম ও উৎসাহের সৃষ্টি করেছিল তার স্মৃতি। কিংবা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব। মধ্যবিত্তরাই বাণিজ্যের প্রয়োজনে আভ্যন্তরীণ শুল্কপ্রাচীর তুলে দিয়ে আভ্যন্তরীণ বাজারের সম্প্রসারণ ও জাতীয় ঐক্য দাবি করেছিল।

প্রথমটির ক্ষেত্রে (Pan-Germanism) জেনা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠিত হলো জাতীয়তাবাদী সংস্থা। তাদের স্লোগান ছিল 'ঐক্য, ন্যায়বিচার ও স্বাধীনতা'। জেনা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র ক'রে ছাত্র সংগঠন দু'বছরের মধ্যে প্রায় ষোলটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছড়িয়ে পড়ল। বস্তুতপক্ষে 'সর্বজার্মানবাদ' বা প্যান- জার্মানইজম ছড়িয়ে দেওয়ার পিছনে বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রদের বিশেষ ভূমিকা ছিল। বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আর্নট, যোসেফ ফন গোরেস, ডালমান, লিস্ট প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক লুডেনের উদ্যোগে ছাত্ররা 'বুরশেন শাফ্ট' (Burschen schaft) নামে এক গুপ্ত সমিতি গঠন করেছিলেন। প্রতিক্রিয়াশীল মেটারনিষ এসব লক্ষ্য করেন। তিনি অচিরে জার্মানির জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে কুখ্যাত কার্লসবাড ডিক্রি (Carlsbad

Decrees) জারি করলেন (1819)। আরও বলা দরকার যে, 1819 খ্রিস্টাব্দে ফন কোৎসবু নামে এক প্রতিক্রিয়াশীল নাট্যকারকে হত্যা করার পরই মেটারনিষ কুখ্যাত কার্লসবাড ডিক্রি জারি করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ, ছাত্র আন্দোলন বন্ধ করা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গোয়েন্দা রাখা। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দ্বারা যাতে কোনও উদারনৈতিক মতবাদ প্রচারিত না হতে পারে তার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতা গৃহে পর্যন্ত গুপ্তচর রাখার নির্দেশ দেওয়া হলো। এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত কোনও ছাত্র যাতে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতে না পারে সেদিকেও সতর্কতা অবলম্বন করা হলো। তবু 1830 খ্রিস্টাব্দে জুলাই বিপ্লবের প্রভাবে উদারনীতির প্রসার ঘটে।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বেশ কিছু শক্তিশালী কবি জার্মান জাতিকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেন। এদের মধ্যে আর্নট (Arndt)-এর কথা আগেই বলা হয়েছে। কিংবা যোসেফ ফন গোরেস (Joseph Von Gorres) এর কথাও, যিনি 'রাইনিশ ম্যরকুর' (Rheinische Merkur) সম্পাদনা করতেন। এছাড়া গোরেস 1816 খ্রিস্টাব্দে 'ভবিষ্যৎ জার্মান সংবিধান' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ডালমান (Dahlmann) বা লিস্ট (List) প্রমুখ বুদ্ধি-জীবীরাও ছাত্রসমাজের উপরে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। জেনাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক লুডেন (Luden) 'সৌভ্রাতৃত্বমূলোক সমিতি' গঠন করেছিলেন। এই ধরনের সৌভ্রাতৃত্বমূলক সমিতি (Burschen schaft) অন্যান্য অনেক স্থানে গঠিত হয়। 1817-তে ভারটবুর্গে (Wartburg) মার্টিন লুথারের আন্দোলনের তিনশো বছর এবং লাইপজিগ যুদ্ধের স্মরণে এক উৎসবের আয়োজন করা হয় এবং ঐখানে বিভিন্ন বুরশেনশ্যাফটকে একত্র করে এক জাতীয় লীগ তৈরি করা হয়। এইটি প্রথম জার্মান জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এই উদারপন্থী জোয়ারের উৎসাহেই কার্ল স্যাণ্ড (Karl Sand) প্রতিক্রিয়াশীল লেখক ও রুশ এজেন্ট হিসেবে পরিচিত কোৎসবু (Kotzebue)-কে হত্যা করেন এবং তার প্রতিক্রিয়াতেই মেটারনিষ কালর্সবাড ডিক্রি জারি করেন। এই আইনে বুরশেনশ্যাফট্‌গুলি ভেঙে দেওয়া হলো, সংবাদপত্রের উপর কণ্ঠরোধ করা হলো, রাজনৈতিক, বিশেষত বিপ্লবী বিক্ষোভ সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার জন্য মেইনৎস (Maintz)-এ একটি কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা (Federal Commission) গঠন করা হয়। আর্নটকে বান (Bonn) বিশ্ববিদ্যালয়ের পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়। গোরেস স্ত্রাসবুর্গে পালিয়ে যায়। এই অবস্থা চলে 1830 পর্যন্ত।

1830 খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের জুলাই বিপ্লবের প্রভাব পড়ে জার্মানির রাজ্যগুলিতেও। এর ফলেই ব্রানস্উইক এর শাসক বিতাড়িত হয়েছিলেন; হ্যানোভার, হেসকাসেল ও স্যাক্সনিতে সংবিধান জারি করা হয়েছিল। কিন্তু মেটারনিষ আবার সক্রিয় হন। তিনি জার্মান সংসদকে তাঁর আইনের সংশোধন বা 'Six Articles' মেনে নিতে বাধ্য করেন। এই আইনের ফলে কেন্দ্রীয় সংসদ বিভিন্ন প্রদেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে।

এই আইন সংশোধনের উদ্দেশ্য ছিল যাতে ভবিষ্যতে কোনও রাজ্য বা তার শাসক উদারনৈতিক সংবিধান জারি করতে না পারে। অধ্যাপক সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী লিখেছেন, "প্রতিক্রিয়া একটি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছয় যখন ১৮৩৭ সালে হ্যানোভারের সংবিধান বাতিল করা হয়। ডালমান ও গেরভিনুস (Gervinus) প্রমুখ সাতজন অধ্যাপককে বরখাস্ত করা হয়। এমনকি কবি হাইনে (Heine) বা বোরন্ (Borne) -এর নেতৃত্বে 'নতুন জার্মানি' নামে যে চিন্তার আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তার ওপরেও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির আঘাত নেমে আসে। এই আন্দোলন জার্মান জাতীয়তাবাদকে তার ফরাসী-বিরোধী মনোভাব থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছিল। ১৮৩৫-এ গুৎস্‌ক (Gutzkow) পরিচালিত ডয়েট্‌শ রেভ্যুর (Deutsche Revue) প্রকাশন নিষিদ্ধ করা হয়।"[1]

এখানে বলা দরকার যে, ভিয়েনা সম্মেলনের ঠিক পরেই দক্ষিণ জার্মানির কয়েকটি রাজ্যে ব্যাভেরিয়া বা ব্যাডেন-এ সংবিধান চালু হয়েছিল। এর ফলে পুরোপুরি সাংবিধানিক রূপ না নিলেও প্রাদেশিক সংসদগুলিকে অন্তত পরামর্শ দেওয়ার সুযোগ হয়। ইয়োরোপীয় শক্তি সমবায়ের অন্তর্গত ট্রপোর কংগ্রেসে মেটারনিখ অনেক চেষ্টা করেও দক্ষিণ জার্মানির এই সব রাজ্যের সংবিধান বাতিল করাতে পারেন নি। কিন্তু মেটারনিখের প্রভাবে সর্ববৃহৎ জার্মান রাজ্য হয়ে উঠেছিল পুরোপুরি প্রতিক্রিয়াশীল।

জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ধারা ছিল জোলভেরাইন (Zollverein) বা শুল্ক সংঘ। এটি 1818 খ্রিস্টাব্দে প্রাশিয়ার নেতৃত্বে প্রথম স্থাপিত হয়। এই সংঘের উদ্যোক্তা ছিলেন জার্মান অর্থনীতিবিদ মাজেন (Massen)। প্রাশিয়া প্রবর্তন করল শুল্ক সংস্কার আইন (Tariff Reform Law)। এই আইনে অন্তর্দেশীয় শুল্ক-ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হয়। এর ফলে প্রাশিয়া হয়ে দাঁড়াল অবাধ বাণিজ্য এলাকা। প্রাশিয়া অচিরে আর্থিক দিক থেকে লাভবান হতে থাকে। তখন জার্মানির অন্যান্য রাজ্যও ক্রমে ক্রমে এই শুল্ক সংঘের সদস্য হতে থাকে। ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্য দিয়ে জার্মানির রাজ্যগুলির মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও আত্মীয়তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ক্রমশ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রাশিয়ার প্রগতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং প্রাশিয়ার রাজনৈতিক নেতৃত্ব দানের যোগ্যতাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাই জার্মানির ঐক্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে জোলভেরাইনের অবদান ছিল অসামান্য বলে *কেটেলবি* মন্তব্য করেছেন।

জার্মানির ঐক্য আন্দোলনের প্রথম পর্বে জাতীয়তাবাদী ও উদারপন্থী আন্দোলন, কনফেডারেশন, জোলভেরাইন ইত্যাদির প্রভাবে জাতীয় চেতনা বৃদ্ধি পেতে থাকে। একটি প্রশ্ন অনেকের মনে উদিত হয়, তা হলো, নানা রাজ্যে বিভক্ত জার্মান রাজ্যগুলির নেতৃত্ব দেবে কে? একমাত্র প্রাশিয়া ছাড়া তা সম্ভব নয়। কিন্তু প্রাশিয়া প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের অধীন। তারপক্ষে কি সম্ভব হবে জাতীয়তাবাদী উদারপন্থী মেনে নেওয়া? বাডেনে ফ্রাইবুর্গ

1. সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ 393-394

বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন অধ্যাপক রটেক (Rotteck) এবং ভেলকার (Welcker) স্বৈরাচারী ক্ষমতার বিরুদ্ধবাদী ছিলেন এবং ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা প্রচার করেন।

এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে জার্মান জাতীয় ঐক্য প্রাশিয়ার নেতৃত্ব ছাড়া সম্ভব ছিল না। আমরা পরে দেখব যে, 1840 খ্রিস্টাব্দে ঐ রাজ্যে চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়াম সিংহাসনে বসার পর ক্রমশ অবস্থার বদল হতে থাকে। বন্দীদের মুক্তি দেওয়া, সেন্সর ব্যবস্থা শিথিল করা, প্রাদেশিক সংসদের (ডায়েটের) বিতর্ক প্রকাশ করার ব্যবস্থা ইত্যাদি কাজ উদারপন্থীদের মনে আশা জাগায়। অন্যদিকে জোলভেরাইনের ফলে প্রাশিয়া ও অন্যত্র ক্রমশ বুর্জোয়াদের আধিপত্য বৃদ্ধি পেলে তারা সরকারের সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করার ক্রমবর্ধমান দাবি জানাতে শুরু করে। বিশেষত রাইন প্রদেশের বুর্জোয়া শ্রেণী ছিল এ ব্যাপারে সক্রিয়। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান বা নাগরিক অধিকার ব্যতীত স্বাধিকার অর্জন সম্ভব নয়, এই বোধ ছড়িয়ে পড়ে। দাবি ওঠে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের। তবে আরও অপেক্ষাকৃত র‍্যাডিকাল জনগণ সার্বজনীন ভোটাধিকার এমনকি প্রজাতন্ত্রের পর্যন্ত দাবি জানান। সুতরাং 1848 -এর বিপ্লবের আগেই জার্মানিতে জাতীয়তাবাদী এবং উদারপন্থার অগ্রগতি কিছু পরিমান হয়েছিল, সে কথা সহজেই ' বলা যেতে পারে।

জুলাই বিপ্লবের মতো ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের (1848) প্রভাব জার্মানিতে বিস্তৃত হলো। ফ্রান্সের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের প্রভাব ইয়োরোপের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। তাই 1848 খ্রিস্টাব্দকে বলা হয় বিপ্লবের বৎসর। এর ফলে অস্ট্রিয়াতে মেটারনিখের পতন হয়। জার্মানির সর্বত্র, যেমন ব্যাভেরিয়া, স্যাক্সনি, হ্যানোভার, শ্লেজভিগ, হলস্টাইন ইত্যাদি অঞ্চলে গণবিদ্রোহ দেখা দেয়। এর ফলে অনেক রাজা শাসনসংস্কারে বাধ্য হন। সর্বত্রই জাতীয়তাবাদীরা নাগরিক অধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, নিয়মতান্ত্রিক সংস্কার সাধনের দাবি করে। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পূর্বেই প্রাশিয়ার সিংহাসনে বসেন ফ্রেডারিক চতুর্থ উইলিয়াম (1840)। তিনি ছিলেন ইচ্ছাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রবল। তিনি নিজেকে "স্বাধীন ও নব জার্মানির নেতা" হিসেবে ঘোষণা করলেন (Leader of a "free and new-born German nation")। তাঁরই ইচ্ছা অনুসারে ফ্রাঙ্কফুর্ট নামক স্থানে একটি সংবিধান সভার আহ্বান করা হয় (31 মার্চ 1848)। এই সভায় ঠিক হলো যে, পঞ্চাশ হাজার জনসংখ্যা পিছু একজন নির্বাচিত সদস্যের ভিত্তিতে তৈরি হবে একটি পার্লামেন্ট। পার্লামেন্টে ঠিক হলো যে, অস্ট্রিয়াকে বিতাড়িত করে প্রাশিয়ার ফ্রেডারিক চতুর্থ উইলিয়ামকে ঐক্যবদ্ধ জার্মানির সম্রাটপদ গ্রহণে অনুরোধ করা হবে। কিন্তু ফ্রেডারিক উইলিয়াম এরূপ গণতান্ত্রিক উপায়ে সম্রাট-পদ গ্রহণে রাজি হলেন না। অচিরে প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগণ পার্লামেন্ট ভেঙে দিলেন। অস্ট্রিয়া পুনরায় জার্মানির উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সক্ষম হলো। আসলে 1845 খ্রিস্টাব্দেই সমগ্র প্রাশিয়ার জন্য একটি পার্লামেন্টের দাবি করা হয় এবং 1847 খ্রিস্টাব্দে ফ্রেডারিক চতুর্থ উইলিয়াম সমস্ত প্রাদেশিক সংসদের প্রতিনিধিদের এক সভা

ডেকেছিলেন। ঐ বছর অফেনবুর্গ সম্মেলনের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত একটি জাতীয় সংসদের দাবি পেশ করা হয়। শেষ পর্যন্ত 1848 খ্রিস্টাব্দের 31 মার্চ হাইনরিষ ফন গ্যাগার্ন এর সভাপতিত্বে 550 সদস্যের ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্ট বসেছিল। কিন্তু ইতোমধ্যে ক্রমে ক্রমে অস্ট্রিয়া জার্মানির গণ-আন্দোলন দমন করতে সমর্থ হয় এবং প্রাশিয়ার রাজার মানসিক দুর্বলতা, অস্ট্রিয়ার বিরোধিতা এবং ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির বিরোধিতার ফলে ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্ট ভেঙে যায়। ঐতিহাসিক *চার্লস হ্যাজেন* এর মতে, সদস্যদের বাগাড়ম্বর, ভুলনীতি ও মতভেদের ফলেই সংসদ ব্যর্থ হয়।

ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্টের সমস্যা, কার্যকলাপ এবং পতন প্রসঙ্গে আরও কিছু কথা বলা দরকার। ঐ পার্লামেন্টের লক্ষ্য ছিল শান্তিপূর্ণ ও সাংবিধানিক পথে গণতান্ত্রিকভাবে যাতে জার্মান রাজ্যগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করা যায়। এর পিছনে ছিল উদারপন্থী জার্মান জাতীয়তাবাদী নেতারা, যাঁরা জানতেন ভিয়েনা চুক্তির দ্বারা জার্মানির ব্যবচ্ছেদের বেদনা। 1848 খ্রিঃ ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের প্রতিক্রিয়ায় জার্মানিতে বিপ্লব ঘটলে অনেক জাতীয়তাবাদী নেতা এক জাতীয় পার্লামেন্ট আহ্বানের প্রস্তাব দেন। অধ্যাপক গ্রেনভিল লিখেছেন যে তার জন্য প্রস্তুতি সভা বসে এবং ঐ সভার পরামর্শক্রমে জার্মানির প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ নাগরিকদের ভোটে জাতীয় পার্লামেন্টের সদস্যগণ নির্বাচিত হন। এই সদস্যরা মিলিত হয়েছিলেন ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে। এই সদস্যদের মধ্যে বুদ্ধিজীবী, আইনজীবী প্রমুখের প্রাধান্য ছিল অর্থাৎ পাতি বুর্জোয়া শ্রেণীর চরিত্র লক্ষ্য করা যায়। সদস্যদের মধ্যেও তীব্র মত পার্থক্য সমস্যা সৃষ্টি করেছিল।

ইতিহাসবিদ *এরিক আইক* দেখিয়েছেন যে, ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্টের হাতে বিশেষ কোনও ক্ষমতা ছিল না। যা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তা কার্যকর করারও ব্যবস্থা ছিল না। ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্ট কতকগুলি প্রশ্নের মীমাংসা করতে পারেনি। সেগুলি হলো: কিভাবে রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে তোলা যাবে ? সেই ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রে রাজতন্ত্র না প্রজাতন্ত্র, কি ধরনের সরকার থাকবে? নব গঠিত জার্মানির সীমানা কি হবে ? শেষপর্যন্ত অবশ্য অনেক তর্ক - বিতর্কের পর ঐক্যবদ্ধ জার্মানির সাংবিধানিক রাজপদ দেওয়ার প্রস্তাব হলো প্রাশিয়ার রাজা চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়ামকে। সেই প্রস্তাব গৃহীত হয়। ঐ পার্লামেন্টে শ্লেজভিগ-হলস্টেইন সমস্যারও কোনও মীমাংসা করা সম্ভব হয়নি। প্রাশিয়ার রাজা অবশ্য ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্টের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন কারণ নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে তার আস্থা ছিল না। মনে রাখা দরকার, ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্টের প্রস্তাবও সর্বসম্মত ছিল না। হ্যানোভার, স্যাক্সনি, উর্টেমবার্গ এবং ব্যাভেরিয়ার মতন রাজ্য এবং অবশ্যই অস্ট্রিয়ার অসহযোগিতার জন্য শেষ পর্যন্ত পার্লামেন্ট ভেঙে যায়। তাছাড়া সদস্যদের মধ্যে মতভেদ ও বক্তৃতাই সার হলো। এই পরিস্থিতিতে অটো ফন বিসমার্কের আবির্ভাব এবং তার বিখ্যাত 'রক্ত লৌহ নীতি'র উদ্ভব ঘটল।

৩। জার্মানির ঐক্য আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব (1848-1870) এবং অটো ফন বিসমার্ক

এদিকে ফ্রেডারিক চতুর্থ উইলিয়ামের (1857) মস্তিষ্ক বিকৃত হওয়ায় তার ভ্রাতা প্রথম উইলিয়াম রাজ প্রতিনিধি (Regent) হিসেবে প্রাশিয়ার শাসনকার্য পরিচালনা করতে আরম্ভ করলেন। এরপর 1861 খ্রিস্টাব্দে ফ্রেডারিক চতুর্থ উইলিয়ামের মৃত্যুর পর তিনি হলেন প্রাশিয়ার নরপতি। তিনি ছিলেন সৈনিকসুলভ স্থিরমনা ও বাস্তববাদী এবং ন্যায়পরায়ণ দেশপ্রেমিক। প্রাশিয়ার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল। তিনি প্রথমে সেনাবাহিনীকে শক্ত ও মজবুত করতে চাইলেন। এই সামরিক শক্তি বৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে অর্থ সংগ্রহে মন দিলেন। কিন্তু উদারপন্থীদের পক্ষ থেকে এলো প্রতিবাদ। তিনি প্যারিস থেকে বিসমার্ককে আমন্ত্রণ করে প্রাশিয়ায় নিয়ে এলেন। তাঁকেই তিনি প্রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করলেন (সেপ্টেম্বর 1862 খ্রিঃ)।

বিসমার্ক কিভাবে জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করেন ঃ অটো ফন বিসমার্ক (Otto Von Bismarck 1815-1898) ছিলেন এক ধনী ভূস্বামীর সন্তান। বিসমার্ক ছিলেন শিক্ষিত কিন্তু ঘোর রক্ষণশীল। পার্লামেন্ট, গণতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্রের প্রতি তাঁর কোনও আস্থা ছিল না। তিনি ছিলেন রাজতন্ত্রের একনিষ্ঠ সমর্থক। তবে তাঁর মনে হয়েছিল অকর্মণ্য হ্যাপস্‌বার্গদের বদলে যোগ্যতম রাষ্ট্র হিসেবে প্রাশিয়ার জার্মানিতে গৌরবময় স্থান গ্রহণ করতে হবে। এজন্য প্রাশিয়াকে সামরিক শক্তির উপর নির্ভরশীল হতে হবে এবং জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে প্রাশিয়ার নেতৃত্বে। অসম্ভব কূটনৈতিক দক্ষতা, রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি এবং শক্তিশালী নীতি গ্রহণ করে তিনি জার্মানির ইতিহাসে ঐক্য আন্দোলনের নায়কে পরিণত হন। অধ্যাপক *চার্লস হ্যাজেনের* মতে তাঁর কাছে ন্যায়নীতি ছিল গৌণ, বাস্তবমুখী কূটনীতি ছিল তাঁর আসল পরিচয়।

1847 খ্রিস্টাব্দে বিসমার্ক প্রাশিয়ার ডায়েট -এর সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁর চোখের সামনেই তিনি দেখেছিলেন ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্টের ব্যর্থতা, উদারপন্থীদের পরাজয়, অস্ট্রিয়ার আধিপত্য এবং প্রতিবিপ্লবের প্রাধান্য। প্রাশিয়ার আইন পরিষদে এক বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, "বক্তৃতা দিয়ে বা সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রস্তাব পাশ করিয়ে দেশের সমস্যার সমাধান হবে না, এজন্য গ্রহণ করতে হবে রক্ত ও লৌহ নীতি"। এই রক্ত ও লৌহ নীতি (Policy of blood and iron) হলো সামরিক শক্তির উপর নির্ভরশীলতা। অর্থাৎ বিসমার্কের লক্ষ্য ছিল জার্মানির ঐক্য সফল করার জন্য অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য বিনাশ করা এবং তা করতে হবে বলপূর্বক। সেজন্য সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে এবং কূটনীতির পরিপক্ক ও সার্থক ব্যবহারের মাধ্যমে তিনি জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করেন।

জার্মানির ঐক্য আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বে দেখা যায় যে, এই ঐক্য আন্দোলন ছিল দুই বিশেষ ধারার আন্দোলনের সংমিশ্রণ। একদিকে দেখা যায় যে, জার্মান রাজ্যগুলিতে

জাতীয়তাবাদী ও উদারপন্থী আন্দোলন বিভিন্ন রাজ্যের বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের ভিত দুর্বল করে দিয়েছিল। অন্যদিকে জার্মান রাজ্যগুলির উপর আধিপত্য স্থাপনের জন্য প্রাশিয়ার জোহেনজোলার্ন রাজবংশের সঙ্গে অস্ট্রিয়ার হ্যাপসবার্গ বংশের দ্বন্দ্ব চলছিল।

জার্মানির ঐক্য আন্দোলনের প্রকৃত পর্ব শুরু হয় উনিশ শতকের ষাটের দশক থেকে। প্রাশিয়ার রাজা চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়ামের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই প্রথম উইলিয়াম প্রাশিয়ার রাজা হন 1861 খ্রিস্টাব্দে এবং তার পরের বছরই তিনি বিসমার্ককে প্রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করেন। প্রাশিয়ার সম্রাট প্রথম উইলিয়াম এবং অটো ফন বিসমার্ক এই দুইয়ের নেতৃত্বে এবং প্রাশিয়ার উদ্যোগে জার্মান রাজ্যগুলিকে শেষ পর্যন্ত একতাবদ্ধ করা সম্ভব হয়। প্রথম উইলিয়াম ছিলেন সাহসী, ন্যায়পরায়ণ, দেশপ্রেমিক, সৎ এবং বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন। তবে প্রাশিয়ার স্বার্থ তাঁর মাথায় ছিল অবশ্যই। *কেটেলবি* লিখেছেন, 'He had a natural gift of perceiving what was attainable and an unembarrassed clearness of view, which was shown above all, in his almost unerring judgement of man!' তিনি ছিলেন সামরিক শক্তিতে বিশ্বাসী এবং প্রাশিয়ার সৈন্য ও অস্ত্রবৃদ্ধির পক্ষে। এই নিয়ে প্রাশিয়াতে জাতীয় প্রতিনিধি সভার সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ হলে তিনি 1862 খ্রিস্টাব্দে বিসমার্ককে প্রধানমন্ত্রী পদে গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানান।

বিসমার্কের মত ছিল সম্রাটের মতের অনুরূপ। তিনি মনে করতেন যে, 'The great questions of the day will not be solved by speeches or by majority decisions, but by the policy of blood and iron' অর্থাৎ তিনি বক্তৃতা বা সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের তোয়াক্কা না করে সামরিক শক্তির সাহায্যে জার্মানির ঐক্য সাধন চেয়েছিলেন। বস্তুতপক্ষে রাষ্ট্রপরিচালনা সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল স্পষ্ট এবং দৃঢ়। প্রাশিয়ার রাজশক্তির ক্ষমতা হ্রাসও তাঁর অভীষ্ট ছিল না। বস্তুত বিসমার্কের দৃঢ় ধারণা ছিল যে, (ক) প্রাশিয়ার রাজবংশের নেতৃত্বেই জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে এবং (খ) সামরিক শক্তির দ্বারাই তা করা সম্ভব। তিনি আরও মন্তব্য করেন যে, 'জার্মানি একটি ছোট দেশ। অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া দুই শক্তির স্থান এই দেশে সঙ্কুলান হবে না। সুতরাং অস্ট্রিয়াকে অন্যত্র সরে যেতেই হবে, অন্তত প্রাশিয়ার স্বার্থে'।

সম্প্রতি ঐতিহাসিকগণ শুধু মাত্র রক্ত ও লৌহনীতি (Policy of blood and iron) অর্থাৎ সামরিক শক্তিই যে ঐক্য আন্দোলনের সাফল্যের পিছনে ছিল একথা মনে করেন না। তারা জার্মানিতে 'কয়লা ও লৌহ' (Coal and iron) নীতি অর্থাৎ শিল্পায়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক শক্তি অর্জনের উপরেও জোর দিয়েছেন। আবার *এরিখ আইক* লিখেছেন যে, যতদিন জার্মান রাজ্যগুলিকে ভিয়েনা চুক্তির দ্বারা স্থাপিত কেন্দ্রীয় সভা (Bund) ও অস্ট্রিয়ার নেতৃত্বের প্রতি আস্থাশীল থাকবে ততদিন জার্মানির ঐক্য সম্পূর্ণ হবে না— একথাও বিসমার্ক বুঝতেন। এজন্য তিনি জার্মান ডায়েট বা বুন্দ এ অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য নাশ, ক্ষুদ্র জার্মান রাজ্যগুলিকে সংগঠনের চেষ্টা, বিভিন্ন ইয়োরোপীয় দেশগুলির সঙ্গে

মিত্রতাস্থাপন ইত্যাদি করতে শুরু করেন। জার্মান যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান সংশোধনের কথাও তিনি বলেছিলেন। 1862 খ্রিস্টাব্দে বিসমার্ক ফ্রান্সের সঙ্গে প্রাশিয়ার বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করেন। ফ্রান্সের সঙ্গে প্রাশিয়ার বন্ধুত্ব তৈরি হয়। ঐ বছরই পোল জাতি স্বাধীনতা লাভের জন্য রাশিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে তিনি রাশিয়াকে বিদ্রোহ দমনে সাহায্য করেন। ফলে রাশিয়ার সঙ্গেও বন্ধুত্ব তৈরি হয়। সব কিছুরই আসল উদ্দেশ্য ছিল অস্ট্রিয়াকে মিত্রহীন করা।

আবার প্রাশিয়ার প্রতিনিধি সভার বিরোধিতা সত্ত্বেও বিসমার্ক সামরিক শক্তি বৃদ্ধিতে মনোযোগী হন। প্রতি বছরই এজন্য অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করতেন (1862 থেকে 1866) এবং প্রতিনিধি সভা বাজেট প্রত্যাখ্যান করা সত্ত্বেও বিসমার্ক কর বসিয়ে আদায়ীকৃত অর্থ সামরিক সংগঠনের কাজে লাগাতেন। অবশ্য জার্মান সংসদ নিরপেক্ষ বাজেট পাশ না করলেও উর্ধকক্ষ বরাবরই বিসমার্কের পিছনে ছিল। এই পরিস্থিতিই তাঁর হাত শক্ত করে।

1862 খ্রিস্টাব্দে প্রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ার পর বিসমার্ক তাঁর রক্ত ও লৌহকঠিন দৃঢ়তার নীতির সাহায্যে সামরিক বাহিনীকে শক্তিশালী করলেন। প্রাশিয়ার রাজতন্ত্রের অধীনে জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য তিনি সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। পরিপক্ক কূটনীতি এবং শেষপর্যন্ত তিনটি যুদ্ধের মাধ্যমে তাঁর সামরিক শক্তি ও কূটনীতি জয়যুক্ত হলো। এই তিনটি হলো যথাক্রমে— ডেনমার্কের সঙ্গে যুদ্ধ (1864), অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বা স্যাডোয়ার যুদ্ধ (1866) এবং ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধ বা সেডানের যুদ্ধ (1870)।

ডেনমার্কের সঙ্গে যুদ্ধঃ বিসমার্কের উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রথম সুযোগ উপস্থিত হলো শ্লেজভিগ ও হলস্টাইন নামক দুটি অঞ্চলের অধিকার প্রসঙ্গে। এখানে বসবাস করত জার্মান ও ডেন জাতি। পূর্বেকার (1852) লণ্ডন সন্ধির শর্ত ভেঙে দিয়ে ডেনমার্কের নরপতি 1863 খ্রিস্টাব্দে উক্ত অঞ্চল দুটিকে ডেনমার্কের অন্তর্ভুক্ত করলেন। বিসমার্ক বুঝতে পেরেছিলেন যে ডেনমার্কের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। কারণ সমুদ্রে বাণিজ্য করার জন্য অঞ্চল দুটি জার্মানির প্রয়োজন ছিল। তাই তিনি অস্ট্রিয়াকে আগেই নিজ পক্ষভুক্ত করেন এবং ডেনমার্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। শ্লেজভিগ হলস্টাইনের যুদ্ধে ডেনমার্ক পরাজিতহলো এবং ভিয়েনা চুক্তিতে (অক্টোবর 1864) ডেনমার্ক শ্লেজভিগ হলস্টাইন পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলো। কিন্তু এই দুটি অঞ্চলের অধিকার নিয়ে অচিরে প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হলো। এই বিবাদ মীমাংসার জন্যে গ্যাসস্টাইনের চুক্তি (1865) সম্পাদিত হলো। চুক্তির শর্ত অনুসারে ঠিক হলো যে, অস্ট্রিয়ার শাসনাধীনে থাকবে হলস্টাইন এবং শ্লেজভিগ থাকবে প্রাশিয়ার শাসনাধীনে। এছাড়া চুক্তি অনুসারে প্রাশিয়া হলস্টাইনের অন্তর্ভুক্ত কিয়েল বন্দর এবং একটি খাল খননের অধিকারসমূহ অন্যান্য-সুযোগ-সুবিধা লাভ করল।

ডেনমার্কের যুদ্ধ ছিল বিসমার্কের প্রথম সাফল্য (1864 খ্রিঃ)। এই সাফল্যের তাৎপর্য বুঝতে গেলে শ্লেজভিগ (Schleswig) এবং হলস্টাইন (Holstein) সমস্যার স্বরূপ আরও একটু বোঝা প্রয়োজন। এই ডাচি দুটি আইনত ডেনমার্কের হলেও, প্রকৃতপক্ষে তারা ছিল স্বাধীন। হলস্টাইনের অধিবাসীরা প্রায় সকলেই জার্মান, শ্লেজভিগেরও দুই-তৃতীয়াংশ জার্মান। হলস্টাইনের ডিউক হিসেবে ডেনমার্কের রাজা জার্মান সংসদের (ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্টেরও) সদস্য ছিলেন, কেননা হলস্টাইন আগে থাকতেই জার্মান কনফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। 1848 খ্রিস্টাব্দে এই ডাচি দুটি বিদ্রোহ ক'রে ডেনমার্কের অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে জার্মানির সঙ্গে সংযুক্তি চেয়েছিল। প্রাশিয়াও তাই চাইত কিন্তু ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গের চাপে 1852 তে লণ্ডন প্রোটোকল অনুসারে ডাচি দুটিতে ডেনমার্কেরই প্রাধান্য স্বীকৃত হলো, যদিও শ্লেজেভিগ-হলস্টাইনের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার বজায় রইল।

এই অবস্থার পরিবর্তন হলো 1863-তে। ডেনমার্ক পার্লামেন্টের জাতীয়তাবাদী দল পোল্যাণ্ডের বিদ্রোহে ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গের ব্যস্ততার সুযোগ নিয়ে শ্লেজভিগ-হলস্টাইনে এক নতুন শাসনতন্ত্র স্থাপন করে এবং তাদের স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতা উঠিয়ে দিয়ে রাজা নবম ক্রিশ্চিয়ান রাজ্য দুটিকে ডেনমার্কের অন্তর্ভুক্ত করেন। এখানে দুটি কথা মনে রাখা দরকার। এক, বিসমার্ক শ্লেজভিগ-হলস্টাইন সমস্যাকে জার্মানির ঐক্যের কাজে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। দুই, ঐ রাজ্য দুটি প্রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত করার পিছনে আসল উদ্দেশ্য ছিল অর্থনৈতিক, কেননা ঐ রাজ্যগুলির মধ্যে দিয়ে সমুদ্র বন্দরে যাওয়া বাণিজ্যের পক্ষে অনুকূল ছিল।

বিসমার্ক প্রথমে অস্ট্রিয়াকে নিজের দিকে আনলেন। সেই মুহূর্তে ফ্রান্সের সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ানের ইতালীয় নীতির ফলে ভীত অস্ট্রিয়া-প্রাশিয়ার সঙ্গে মিত্রতা করল। এক সন্ধির দ্বারা ঠিক হলো যে, বুন্দ বা জার্মান জাতীয় সভার বাইরে অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া দ্বি-পাক্ষিক ভিত্তিতে ডাচি দুটির সমস্যা সমাধান করবে। এবার বিসমার্ক অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যৌথভাবে ডেনমার্কের রাজা নবম ক্রিশ্চিয়ানকে লণ্ডন প্রোটোকলের শর্ত মেনে ডাচি দুটিকে ডেনমার্কের রাজ্য থেকে আলাদা রাখতে প্রস্তাব করলে ডেনমার্কের রাজা সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। বিসমার্ক জানতেন ডেনমার্ক এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবেই। তাহলে তার দুটি উদ্দেশ্য সাধিত হবে। এক, ডেনমার্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার কারণ পাওয়া যাবে এবং দুই, ভবিষ্যতে অস্ট্রিয়ার সঙ্গেও বিবাদের পথ তৈরি করে রাখা হবে। এইভাবে ডেনমার্ক শ্লেজভিগ-হলস্টাইনের উপর অধিকার ত্যাগ করতে অস্বীকার করা মাত্র প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া যুক্তভাবে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল (ফেব্রুয়ারি, 1864)। যুদ্ধে ডেনরা হেরে যায় এবং ঐ বছরই ভিয়েনা চুক্তি অনুসারে (অক্টোবর 1864) শ্লেজভিগ-হলস্টাইন ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। *এরিখ আইক* দেখিয়েছেন ঐ যুদ্ধে বিসমার্ক ফ্রান্সকেও নিরপেক্ষ রেখেছিলেন। কিন্তু যুদ্ধ জয়লাভের পর শ্লেজভিগ-হলস্টাইন নিয়ে

অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে মতবিরোধ হয়; যদিও গ্যাসস্টাইনের চুক্তিতে তা ধামা চাপা দেওয়া হয়।

বিসমার্কের উদ্দেশ্য ছিল শ্লেজভিগ-হলস্টাইনের প্রাশিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা এবং অপরপক্ষে অস্ট্রিয়া ও ঐ ডাচি দুটির অধিবাসীগণ চেয়েছিল এই দুটি রাজ্য নিয়ে রাইন কনফেডারেশনের অধীনে একটি পৃথক রাজ্য। এই নিয়ে প্রায় যুদ্ধ বাধার উপক্রম হলে গ্যাসস্ট্যাইনের চুক্তিতে বিরোধের সাময়িক মীমাংসা করা হলো। ঠিক হলো, আপাততঃ শ্লেজভিগ প্রাশিয়ার অধিকারে এবং হলস্টাইন অস্ট্রিয়ার অধিকারে থাকবে। হলস্টাইনের অন্তর্গত লায়েনবার্গ নামক অঞ্চলটি অবশ্য প্রাশিয়া অস্ট্রিয়ার কাছ থেকে কিনে নেয়। গ্যাসস্টাইনের চুক্তির দ্বারা আরও ঠিক হয় যে ভবিষ্যতে দ্বি-পাক্ষিক ভিত্তিতে ডাচি দুটি সম্পর্কে পাকা ব্যবস্থা করা হবে এবং ততদিন অস্ট্রিয়া এই ডাচি দুটি নিয়ে জার্মান কেন্দ্রীয় সভায় প্রশ্ন উত্থাপন করবে না।

অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ (1866) **ঃ** জার্মানির উপর থেকে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য বিনষ্ট করতে হলে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে প্রাশিয়ার একটা যুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য নির্দেশ করেই বিসমার্ক ডেনমার্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় অস্ট্রিয়াকে দলভুক্ত করেছিলেন। কূটনীতিজ্ঞ বিসমার্ক গ্যাসস্টাইনের চুক্তির দ্বারা শ্লেজভিগ ও হলস্টাইনকে এমনভাবে বাঁটোয়ারা করলেন যার মধ্যে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের সম্ভাবনা সুস্পষ্ট ছিল। তাই ঐতিহাসিক *এ. জে. পি.* টেলার মন্তব্য করেছিলেন যে, "গ্যাসস্টাইনের চুক্তির মধ্যে ছিল সীমাহীন বিবাদের বীজ। তাই গ্যাসস্টাইনের চুক্তি ছিল যুদ্ধের সুযোগ সৃষ্টিকারী-প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার সম্পর্কের 'ফাটলের উপর কাগজের প্রলেপ'।"

অস্ট্রিয়ার সঙ্গে অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধের প্রস্তুতিস্বরূপ ইতোমধ্যে বিসমার্ক সামরিক ও রাজনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। আধুনিক অস্ত্রসম্ভারে সামরিক বিভাগকে সুসজ্জিত করা হলো। বৈদেশিক সাহায্য ও সহানুভূতির প্রয়োজনে তিনি ইয়োরোপীয় কয়েকটি রাষ্ট্রকে নিজের পক্ষভুক্ত করলেন এবং কোনও কোনও রাষ্ট্রকে নিরপেক্ষ রাখার চেষ্টা করলেন। এইভাবে তিনি অস্ট্রিয়াকে মিত্রহীন করে রাখলেন। যেমন, ডেনিস যুদ্ধের পর বিসমার্ক বিয়ারিটৎস (Biarritz) নামক স্থানে তৃতীয় নেপোলিয়ানের সঙ্গে গোপনে এক চুক্তি করলেন (1865)। এই চুক্তিতে ঠিক হলো যে, সম্ভাব্য অস্ট্রো-প্রাশিয়ার যুদ্ধে তৃতীয় নেপোলিয়ান নিরপেক্ষ থাকবেন এবং পরিবর্তে জার্মানি থেকে কিছু ভূখণ্ড ফ্রান্সকে দেওয়া হবে। ইতালির ভেনেসিয়া ছিল অস্ট্রিয়ার দখলে। তাই বিসমার্ক ইতালির সঙ্গে অন্য এক গোপন চুক্তিতে ঠিক করলেন যে, অস্ট্রো-প্রাশিয়া যুদ্ধের সময় ইতালিও অস্ট্রিয়া আক্রমণ করবে। ভেনেসিয়া দখলের জন্য বিসমার্ক ইতালিকে সাহায্য করবেন। অন্যদিকে পোলিশ বিদ্রোহ দমনে সাহায্য করার জন্য রাশিয়া প্রাশিয়ার প্রতি সন্তুষ্ট ছিল। তাছাড়া জার্মানি রাশিয়ার সামুদ্রিক পথের অধিকার অর্জনে সাহায্য করবে এ-প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হলো।

এইভাবে সামরিক ও মিত্রশক্তিতে নিজেকে শক্তিশালী করে প্রাশিয়া গ্যাসস্টাইনের চুক্তি ভঙ্গের অজুহাতে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল (1866)। জার্মানির অন্যান্য রাজ্য যাতে অসন্তুষ্ট না হতে পারে তার জন্যে জার্মান জাতীয়তাবাদের ব্যাখ্যাসহ জোর প্রচারের ব্যবস্থা করলেন। অস্ট্রো-প্রাশিয়া যুদ্ধ মাত্র সাত সপ্তাহ স্থায়ী হয়েছিল। অবশেষে স্যাডোয়ার রণক্ষেত্রে প্রাশিয়ান বাহিনী নব-আবিষ্কৃত উন্নত ধরনের বন্দুক ব্যবহার করে অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করল (1866)। যুদ্ধ শেষ হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিসমার্ক অস্ট্রিয়ার সঙ্গে প্রাগের সন্ধিতে মিলিত হলেন (23 আগস্ট, 1866)। সন্ধির শর্ত অনুসারে (i) অস্ট্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ থেকে ভেনেসিয়া ইতালির নিয়ন্ত্রণে চলে গেল; (ii) দক্ষিণের কয়েকটি রাজ্য ছাড়া উত্তর জার্মানি নিয়ে গঠিত হলো উত্তর জার্মান যুক্তরাষ্ট্র (North German Confederation)। এই যুক্তরাষ্ট্রের উপর অস্ট্রিয়ার পরিবর্তে প্রাশিয়ার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলো; (iii) পূর্বেকার জার্মান রাষ্ট্রসংঘের বিলুপ্তি হলো। হ্যানোভার এবং হেসে ক্যাসেল, শ্লেজভিগ—হলস্টাইন প্রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হলো। জার্মানির ঐক্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অস্ট্রো-প্রাশিয়ান যুদ্ধের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। প্রথমতঃ, জার্মানির প্রধান শত্রু অস্ট্রিয়ার পরাজয়ে জার্মানির উপর থেকে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য বিলুপ্ত হলো। প্রাশিয়ার মাধ্যমে জার্মানির ঐক্যবিধানের পথ পরিষ্কার হলো। দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধে জয়লাভের ফলে মধ্য ইয়োরোপে প্রাশিয়া প্রথম শ্রেণীর শক্তিরূপে স্বীকৃতি লাভ করল। তৃতীয়তঃ, বিসমার্কের 'রক্ত ও লৌহ নীতি' এত দিনে জার্মানির সকল শ্রেণীর মন আকর্ষণ করল। উদারনৈতিক পার্লামেন্টের শাসনে বিশ্বাসীরাও বিসমার্কের উপর আস্থা স্থাপন করল। প্রাশিয়া জার্মান জাতির স্বাধীনতা ও ঐক্য স্থাপনের যোগ্যনেতারূপে স্বীকৃতি পেল। চতুর্থতঃ, ভেনেসিয়া প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ইতালি ঐক্যবিধানের পথ অনেকখানি এগিয়ে গেল। পঞ্চমতঃ, বহু জাতি ও ভাষাভাষী মানুষ নিয়ে গঠিত অস্ট্রিয়া বুঝল যে, জাতীয়তাবাদের আংশিক স্বীকৃতি না দিলে অস্ট্রিয়াকে রক্ষা করা যাবে না। তাই এই সময় অস্ট্রিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতিগোষ্ঠী ম্যাগিয়ারদের আংশিক স্বাধীনতা দেওয়া হয় এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বাবধি অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী নামে এই রাষ্ট্র শাসিত হতে থাকে।

1866 খ্রিস্টাব্দে স্যাডোয়ার রণক্ষেত্রে অস্ট্রিয়ার পরাজয়ের পরেও জার্মানির ঐক্যসাধন প্রয়াস সম্পূর্ণ হলো না। জার্মানির দক্ষিণ অংশের চারটি রাজ্য পৃথক সত্তা বজায় রেখেছিল। জার্মানির ঐক্যের জন্য এই চারটি রাজ্যকে প্রাশিয়ার সঙ্গে একীভূত করার প্রয়োজন ছিল। অথচ এখানকার অধিবাসীরা ফরাসি সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ানকে তাদের পৃষ্ঠপোষক বলে মনে করত। প্রাশিয়ার উপর তারা বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেনি। তাই বিসমার্ক এই অঞ্চলের অধিবাসীদের মনে জার্মান জাতীয় চেতনা সঞ্চারের উদ্দেশ্যে সন্তুষ্টি বিধান ও সাহায্যের নীতি অবলম্বন করলেন।

এদিকে দক্ষিণ জার্মানির পাশাপাশি ফ্রান্স অস্ট্রো-প্রাশিয়ার যুদ্ধে প্রাশিয়ার আশ্চর্যজনক সাফল্যে দারুণ ঈর্ষান্বিত হলো। ফ্রান্সের জনসাধারণ যুদ্ধের পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু তৃতীয়

নেপোলিয়ান নিজের অক্ষমতা ও অদূরদর্শিতার জন্যে নিরপেক্ষ রইলেন। এর ফলেই ফ্রান্স-সীমান্তের পাশে গড়ে উঠল এক শক্তিশালী রাষ্ট্র প্রাশিয়া। ফরাসি রাজনীতিবিদ তিয়ের (Theirs) তাই বলেছিলেন, "স্যাডোয়ার অস্ট্রো-প্রাশিয়ার যুদ্ধে আসলে পরাজয় হয়েছে ফ্রান্সের।" তৃতীয় নেপোলিয়ান জনসাধারণের চাপে বাধ্য হয়ে অস্ট্রো-প্রাশিয়া যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকার পুরস্কারস্বরূপ রাইন অঞ্চলের ভূখণ্ড দাবি করলেন। কিন্তু বিসমার্ক তৃতীয় নেপোলিয়ানকে কোনও ভূখণ্ড না দিয়ে কালক্ষেপ করতে শুরু করলেন।

চার্লস হ্যাজেন তাঁর Europe Since 1815 গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, "The year 1866 was a turning point in the history of Prussia, Austria , France and Europe" প্রকৃত অর্থে কথাটি সত্যি। ঐ বৎসর অস্ট্রো-প্রাশিয়াতে যুদ্ধে বিসমার্কের 'রক্ত ও লৌহ নীতি' সাফল্য লাভ করে এবং এর ফলে প্রাশিয়াতে তার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। উদারপন্থীরাও তাকে সম্মান জানান। অন্যান্য জার্মান রাজ্যেও তাঁর প্রভাব বৃদ্ধি পায়। শুধু তাই নয়, এই যুদ্ধের ফলে ফ্রান্স, ইতালি সহ ইয়োরোপের নানা দেশেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। বস্তুত এরপরে ইতালির ঐক্য লাভ এবং প্রাশিয়ার সঙ্গে ফ্রান্সের সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী ছিল। স্যাডোয়ার যুদ্ধকে তাই 'টার্নিং পয়েন্ট' বলা ভুল নয়।

প্রথমতঃ, এই যুদ্ধে জয়ের ফলে একদিকে যেমন ইয়োরোপে প্রাশিয়ার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধিপায়, তেমনি মধ্য ইয়োরোপের রাজনৈতিক ভারসাম্য বদলে যায়। দ্বিতীয়তঃ, মধ্য ইয়োরোপের রাজনৈতিক কেন্দ্র ভিয়েনার পরিবর্তে বার্লিনে স্থানান্তরিত হয়। তৃতীয়তঃ, ফ্রান্সের সীমানায় ঐক্যবদ্ধ জার্মানি ফরাসি স্বার্থের পক্ষে অনুকূল ছিল না। কিন্তু ফ্রান্স তা বুঝতে পারেনি। চতুর্থতঃ, স্যাডোয়ার যুদ্ধে প্রাশিয়ার পক্ষ অবলম্বন করা ইতালির পক্ষে লাভজনক হয় এবং ফলে অস্ট্রিয়ার কাছ থেকে তারা ভেনেসিয়া ছিনিয়ে নিতে পারে। পঞ্চমতঃ, এই যুদ্ধ প্রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ ইতিহাসে তথা জার্মান রাজ্যগুলির মধ্যে বিসমার্কের ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। ষষ্ঠতঃ, এই যুদ্ধে প্রমাণিত হয় যে, সামরিক দিক থেকে প্রাশিয়া অস্ট্রিয়া অপেক্ষা ক্ষমতাশালী। সপ্তমতঃ, অস্ট্রিয়ার অভ্যন্তরেও এই যুদ্ধের ধাক্কায় জাতীয়তাবাদী চেতনা এবং প্রতিক্রিয়াশীল সরকার পরিবর্তনের আকাঙ্খা বৃদ্ধি পায়।

ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধ (1870) **:** **বিসমার্ক জানতেন একদিন না একদিন ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধ হবেই, কারণ ফ্রান্সের স্যাডোয়ার যুদ্ধের ফলে কিছু লাভ হয়নি তা ফ্রান্স বুঝতে পেরেছিল। উপরন্তু ফ্রান্সের পূর্ব সীমান্তে ঐক্যবদ্ধ জাতীয়তাবাদী জার্মান রাষ্ট্রের উত্থান হলে ফ্রান্সের নিরাপত্তা বিপন্ন হতে পারে বলে ফরাসি রাজনীতিবিদরা মনে করতেন। তৃতীয় নেপোলিয়ান কোনও রাজ্য পাননি, সবচাইতে বড়ো কথা হলো যে, অস্ট্রো-প্রাশিয়ার যুদ্ধে উত্তর জার্মান রাজ্যগুলির ঐক্য স্থাপিত হলেও দক্ষিণ জার্মান রাজ্যগুলির উপর**

ফ্রান্সের প্রভাব ছিল এবং আলসাস লোরেন সহ্ দক্ষিণের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধ অঞ্চলের প্রাশিয়ার সঙ্গে যুক্তির প্রয়োজন ছিল। তাই বিসমার্ক জানতেন যুদ্ধ হবেই ('A war with France lay in the logic of history')। তবে তিনি চাইছিলেন যুদ্ধ আগে ফ্রান্স শুরু করুক। এই সময় স্পেনের সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে গোলযোগ সৃষ্টি হলো। স্পেনের রানী ইসাবেলা গণ-বিদ্রোহের ফলে সিংহাসনচ্যুত হলেন। স্পেনের জনগণ জার্মান বংশীয় প্রিন্স লিওপোল্ডকে স্পেনের সিংহাসনের জন্য মনোনীত করল। এই ঘটনায় ফ্রান্সে দারুণ বিক্ষোভ দেখাদিল। কারণ ফ্রান্সের পূর্বে জার্মানি ও পশ্চিমে স্পেনে যদি একই বংশীয় নরপতি থাকেন তাহলে ফ্রান্সের সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট হবার সম্ভাবনা সর্বাধিক। ফ্রান্সের এই বিক্ষোভের জন্য লিওপল্ড স্বেচ্ছায় স্পেনের সিংহাসনে বসতে অস্বীকার করলেন। কিন্তু প্রাশিয়া যাতে ভবিষ্যতে স্পেনে কোনও জার্মান বংশীয় নরপতিকে না বসান তার জন্যে ফ্রান্সের তৃতীয় নেপোলিয়ান জার্মানির নরপতি প্রথম উইলিয়ামের নিকট থেকে স্বীকৃতি-পত্র আদায় করতে চাইলেন এবং এই কাজের জন্য দূত প্রেরণ করলেন। প্রথম উইলিয়াম এরূপ অপমানজনক প্রতিশ্রুতি দিতে অস্বীকার করলেন। এই ঘটনাটি ঘটে এমস (Ems) নামক একটি স্থানে। প্রথম উইলিয়াম এখানে বায়ু-পরিবর্তনের জন্য কিছুকাল ছিলেন। তিনি তারবার্তায় সংবাদটি বিসমার্কের নিকট প্রেরণ করলেন। (13 জুলাই, 1870)। তাই ইতিহাসে এর নাম *'এমস টেলিগ্রাম'*।

বিসমার্ক এতদিন ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধের সূত্র সন্ধানে ছিলেন। তিনি এবার এমস টেলিগ্রামের বিশেষ বিশেষ কয়েকটি শব্দ বাদ দিয়ে সংবাদপত্রে এমন ভাবে প্রকাশ করলেন যেন মনে হলো ফরাসি দূত বেনেদেত্তি প্রাশিয়ার নরপতি প্রথম উইলিয়াম কর্তৃক অপমানিত হয়েছেন। ফ্রান্স এই ঘটনাকে জাতীয় অবমাননা হিসেবে গ্রহণ করল এবং প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। বিসমার্কের প্রত্যাশা পূর্ণ হলো। তিনি বললেন, "গলদেশের (ফ্রান্সের) ষাঁড়কে বস্ত্রখণ্ড দেখিয়ে খেপিয়ে দেওয়া হলো।"

সেডানের যুদ্ধ ঃ ফ্রান্সের পক্ষ থেকে যুদ্ধ ঘোষণা করায় বিসমার্কের কূটনীতি জয়যুক্ত হলো। সমগ্র ইয়োরোপের চোখে ফ্রান্স আক্রমণকারী দেশরূপে প্রতিপন্ন হলো। মিত্রহীন ফ্রান্সকে একাই প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে হলো। সেডানের (Sedan) রণক্ষেত্রে ফরাসি বাহিনীকে চূড়ান্তভাবে পরাজয় বরণ করতে হলো। তৃতীয় নেপোলিয়ান স্বয়ং শত্রুর হাতে বন্দী হলেন। তাকে অপমানজনক সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করতে হলো। প্রথমে ভার্সাইতে, পরে ফ্রাঙ্কফুর্টে (Peace of Frankfurt, May, 1871) চূড়ান্ত সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সন্ধির শর্তে জার্মানি পেল আলসাস ও লোরেন প্রদেশদ্বয়। ফ্রান্স প্রাশিয়াকে পাঁচ'শ মিলিয়ন ডলার বা কুড়ি কোটি পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হলো। ক্ষতিপূরণ না পাওয়া পর্যন্ত জার্মান-বাহিনী ভার্সাইতে থেকে গেল। 1871 খ্রিস্টাব্দে ভার্সাইয়ের কাঁচনির্মিত

প্রাসাদে (Hall of Mirror) পালিত হলো বিজয়োৎসব। সেখানে প্রাশিয়ার সম্রাট প্রথম উইলিয়াম জার্মানির সম্রাট বা 'কাইজার' হিসেবে ঘোষিত হলেন। এইভাবে জার্মানির ঐক্যবিধানের প্রয়াস সফল হলো।

সেডানের যুদ্ধ এবং তার ফলাফল সম্পর্কে *কেটেলবি* লিখেছেন যে, "The Franco-Prussian War made Bismarck the master of Germany and Germany the mistress of Europe"। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধজয় শুধুমাত্র জার্মানির ঐক্য আন্দোলনকে চূড়ান্ত সাফল্য দিয়েছিল এমন নয়, সমগ্র ইয়োরোপেরও ভাগ্য বদল ঘটিয়েছিল। এই যুদ্ধের ফলাফল এবং তাৎপর্য স্বতন্ত্রভাবে মনে রাখা দরকার। বস্তুতপক্ষে অধ্যাপক *এ. জে. পি.* টেলার যথার্থই লিখেছেন যে, "European diplomacy took a new character after the battle of Sedan।"

প্রথমতঃ, সেডানের যুদ্ধের ফলে তৃতীয় নেপোলিয়ান এবং দ্বিতীয় ফরাসি সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল। দ্বিতীয়তঃ, এই যুদ্ধের ফলে জার্মানির ঐক্য সম্পূর্ণ হলো। দক্ষিণ জার্মানির রাজ্যগুলি যেমন ব্যাভেরিয়া, উর্টেমবুর্গ প্রভৃতি উত্তর জার্মান রাজ্যগুলির সঙ্গে মিলে গেল। তৃতীয়তঃ, রোম থেকে ফরাসি সৈন্য দূর হয় এবং ইতালির ঐক্য সম্পূর্ণ হয়। চতুর্থত, ইয়োরোপের দেশগুলির মধ্যে জার্মানি এক শক্তিশালী দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। পঞ্চমতঃ, এরপর থেকে জার্মানির পররাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্য হলো ফ্রান্সকে মিত্রহীন করে রাখা, যাতে ফ্রান্স পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে না পারে। ষষ্ঠতঃ, রাশিয়া পুনরায় ইয়োরোপীয় রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা লাভ করল। সপ্তমতঃ, *ডেভিড টমসন* লিখেছেন যে, একদিক দিয়ে বিচার করলে 1848 এর আশা আকাঙ্খাই 1870 খ্রিস্টাব্দে পূর্ণতা পেয়েছিল। এই কথার অর্থ এই যে, ইয়োরোপে ভিয়েনা বন্দোবস্তের শেষ রেশটুকু মুছে যায় এবং জাতীয়তাবাদ ও উদারনীতি নতুন পরিস্থিতিতে নতুনভাবে জয়লাভ করে।

৪। জার্মানির ঐক্য ও ইয়োরোপের নতুন শক্তিসাম্য

ফ্রান্স-প্রাশিয়ার যুদ্ধের ফলে ইয়োরোপে এক নতুন যুগের সূত্রপাত হয়। নতুনত্ব হলো শক্তিসাম্যের (Balance of Power) পরিবর্তন। জার্মানি এবং ইতালি নামে দুটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি হলো। জার্মানির উত্থানে বিসমার্কের কূটনীতির জয় সূচিত করল। জয় সূচিত করল সামরিক শক্তিরও। ইয়োরোপের প্রাণকেন্দ্র প্যারিস থেকে স্থানান্তরিত হলো বার্লিনে। ফ্রান্সে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের পতন হলো। ফ্রান্স এবং অস্ট্রিয়ার দুর্বলতার সুযোগে 1871 এরপর জার্মানি হলো ইয়োরোপের প্রধান শক্তি। তাঁর চ্যান্সেলার বিসমার্ক জার্মানিকে 'পরিতৃপ্ত দেশ' ঘোষণা ক'রে একাধারে আভ্যন্তরীণ নীতির মাধ্যমে জার্মানির অগ্রগতি এবং বৈদেশিক নীতির মাধ্যমে ফ্রান্সকে একঘরে ক'রে রাখার কাজে অগ্রসর হয়েছিলেন।

এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, জার্মানির ঐক্য আন্দোলনের প্রধান স্থপতি ছিলেন বিসমার্ক। তবে এ নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে নানা মত ও বিতর্ক দেখা গেলেও বিসমার্কের ভূমিকা সকলেই স্বীকার করেছেন। সম্প্রতি উইলিয়ামসন লিখেছেন যে বিসমার্ক এককভাবে জার্মানির ঐক্যকে সম্ভব করে তোলেন নি—তিনি ঐক্যের শক্তিশালী উপাদান সমূহকে সার্থকভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন মাত্র।[1] অধ্যাপক *এ. জে. পি টেলারের* মতে, 'ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধের প্রয়োজনেই বিসমার্ক দক্ষিণ জার্মানির রাজ্যগুলিকে উত্তর জার্মানির সঙ্গে একত্রীভূত করেন, ঐক্যের প্রয়োজনে তিনি ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন নি।' এই মত আংশিক সত্য, কারণ দক্ষিণ রাজ্যগুলিকে বিশ্বাস না করলেও বিসমার্ক বাস্তব বুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন। পরিস্থিতি অনুযায়ী তিনি সিদ্ধান্ত নিতেন। তবে একথা মনে করা যেতে পারে যে, বিসমার্কের সীমাহীন প্রাশিয়-স্বার্থ অনুসরণের উপ-ফসল (By-product) হলো জার্মানির ঐক্য। 1870 খ্রিস্টাব্দে প্রাশিয়ার সম্রাটই সমগ্র জার্মানির সম্রাট বা কাইজার হন এবং ইয়োরোপের মানচিত্রে সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল দেশ হিসেবে জার্মান সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান হয়।

---

1. D. G. Williamson, *Bismarck and Germany*, London, 1986, p. 1

অধ্যায় ৮

রাশিয়ার ইতিহাস

(Syllabus: Russia–Attempts at Reforms by Alexander II)

১। সূচনা

তিনশো বছর ধরে (1611 - 1917) রাশিয়া ছিল রোমানভ (Romanov) বংশীয় জারতন্ত্রের শাসনাধীনে। রাশিয়ার রাজাকে বলা হত জার (Tsar কিংবা Czar) এবং রাণীকে বলা হোত জারিনা। জারতন্ত্রের শাসনাধীনে রাশিয়া মধ্যযুগীয় সভ্যতা বর্জন করে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করে। এখানে পাশ্চাত্য বলতে পশ্চিম ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির কথা বুঝতে হবে। পিটার দ্য গ্রেট (1685-1725), দ্বিতীয় ক্যাথারিন (1762 - 1792) প্রমুখ কয়েকজন উদারনৈতিক মানবহিতৈষী জার ও জারিনার আমলে রাশিয়া আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রক্ষেত্রে মর্যাদা লাভ করে। কিন্তু সাধারণভাবে জারদের শাসনব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ রক্ষণশীল, সম্পূর্ণ কেন্দ্রীভূত ও স্বৈরতন্ত্রী। রাশিয়ায় তখন লিপিবদ্ধ কোনও আইন ছিল না। ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে জারের হুকুম ও ঘোষণাপত্রই দেশের আইন। আমলাতন্ত্র ও পুলিশতন্ত্রই ছিল জারের প্রধান সহায়ক। জনসাধারণকে রাষ্ট্রশাসনের কোনও অধিকার দেওয়া হয়নি।

অন্যদিকে সরকারি কর্মচারিবৃন্দের নিয়োগ ও ছাঁটাই নির্ভর করত জারের খেয়ালখুশির উপর। অষ্টাদশ ও উনিশ শতকে ইয়োরোপের সব কটি দেশে যখন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটাতে থাকে তখন রাশিয়াতে ছিল সেই প্রাচীন স্বৈরাচারী, কেন্দ্রীভূত শাসন। পশ্চিম ইয়োরোপের গণতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র, উদারনৈতিকতা, বিপ্লব বা সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার কথা রাশিয়াতে প্রবেশ করতে পারেনি। উনিশ শতকের ইয়োরোপীয় বিপ্লবের ধারা থেকে রাশিয়ার জার ও জারিনারা কোনও শিক্ষালাভ করতে পারেন নি। জারেদের প্রধান সহায়ক ছিল প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ত শ্রেণীর অভিজাতেরা; সংবাদপত্রের কণ্ঠ ছিল রুদ্ধ, শিক্ষাক্ষেত্রে আলোচনা ও চিন্তার স্বাধীনতা ছিল না।

রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে অবশ্য অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে রাশিয়া ইয়োরোপের অন্যতম শক্তি হিসেবে পরিগণিত ছিল। ফরাসি বিপ্লবের সময় রাশিয়ার জারিনা ছিলেন দ্বিতীয় ক্যাথারিন। তাঁর মৃত্যু হয় 1796 খ্রিস্টাব্দে। ইয়োরোপে বা ফ্রান্সে পুরনো সমাজ ব্যবস্থা বলতে যা বোঝানো হত, সেই ব্যবস্থার মতাদর্শে এবং চেহারায় তীব্র আঘাত হানে 1789 খ্রিস্টাব্দের ফরাসি বিপ্লব। কিন্তু তখনও রাশিয়ার রাজধানী সেন্ট পিটার্সবার্গে জারতন্ত্র বহালতবিয়তে বিরাজমান। রাশিয়াকে তখনও পুরনো ব্যবস্থার অন্যতম বৃহৎ ঘাঁটি বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। বস্তুত রাশিয়ার সামরিক শক্তি বা রাজনৈতিক প্রভাব প্রকৃতপক্ষে না বাড়লেও রাশিয়ায় রক্ষণশীল রাজতন্ত্র ছিল অটুট।

পিটার দ্য গ্রেট এর সম্প্রসারণশীল নীতি অনুসরণ করে দ্বিতীয় ক্যাথারিন রাশিয়ার সীমারেখা যথেষ্ট বিস্তারে সক্ষম হয়েছিলেন। মনে রাখা দরকার যে, পোল্যাণ্ডের বিভাজন—বিশেষত শেষ দুটি ব্যবচ্ছেদ, পশ্চিমদিকে রাশিয়ার সীমান্ত অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছিল। ফলে নিস্টার (Dniester) থেকে আজফ্ (Azov) পর্যন্ত কৃষ্ণসাগরের (Black Sea) উপকূলে রাশিয়ার প্রাধান্য অনেকটাই বেড়ে গিয়েছিল। এমনকি মধ্য এশিয়াতেও রুশ প্রভাব বৃদ্ধি পায়—ক্যাস্পিয়ান থেকে চীনের সীমান্ত পর্যন্ত। তবে সাইবেরিয়া অঞ্চলে তখন জনবসতি ছিল খুব কম।

অষ্টাদশ শতকের শেষে বা উনিশ শতকের গোড়ায় পশ্চিম ইয়োরোপের তুলনায় রাশিয়া কিন্তু ছিল অনেক পশ্চাৎপদ। মূলত কৃষি প্রধান রাশিয়াতে সাধারণ কৃষকদের এবং বিশেষত ভূমিদাস বা সার্ফদের (Serf) অবস্থা ছিল খুবই খারাপ এবং দুর্দশাগ্রস্থ। অথচ অভিজাত সম্প্রদায় পশ্চিম ইয়োরোপের কায়দা কানুন ভালোভাবেই রপ্ত করেছিলেন। তাদের জীবনযাত্রা, বিলাসিতা, আভিজাত্যে, প্রশাসনে পশ্চিম ইয়োরোপের প্রভাব পড়েছিল। উদারপন্থা বা ফরাসি বিপ্লবের আদর্শ রাশিয়ায় পৌঁছালেও দেশের অভ্যন্তরে কোনও শক্ত ঘাঁটি তৈরি করতে এই আদর্শ সমর্থ হয়নি। *লিপসন* যথার্থই মন্তব্য করেছেন: "Catherine the Great (1762-1796) enhanced the European status of her kingdom and made it a factor of the greatest weight in foreign politics, but she did not attempt to grapple with the really vital problems of internal reconstruction."[1] এই আভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন না করা এবং আভ্যন্তরীণ সংকটের সমাধান না হওয়ার ফলেই শেষ পর্যন্ত বিংশ শতাব্দী রুশ বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করেছিল।

এই পরিস্থিতির মধ্যে উনিশ শতকের গোড়া থেকে পরপর পাঁচ জন জার রাশিয়াতে ক্ষমতাসীন ছিলেন। এরা হলেনঃ *প্রথম আলেকজান্ডার* (1801-1825), *প্রথম নিকোলাস* (1825-1855), *দ্বিতীয় আলেকজান্ডার* (1855-1881), *তৃতীয় আলেকজান্ডার* (1881-1894) এবং *দ্বিতীয় নিকোলাস* (1894-1917)। এদের আমলেই রাশিয়া ইয়োরোপের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়। এজন্য বলা হয় যে, 'রাশিয়া ছিল ইয়োরোপীয় সভ্যতার শেষ সন্তান'। তবে সমগ্র উনিশ শতক জুড়েই রাশিয়াতে প্রগতি- প্রতিক্রিয়ার লড়াই চলেছিল।[2]

উনিশ শতকের গোড়ায় রাশিয়ার অবস্থাঃ উনিশ শতকের গোড়ার দিকে রাশিয়া ছিল আধা ইয়োরোপীয় আধা এশিয়া শক্তি। রাশিয়া গঠিত ছিল ইয়োরোপের এবং এশিয়ার

---

1. E.Lipson, *Europe in the 19th & 20th Centuries*, Lond, 1970, p. 81

2. উনিশ শতক সম্পর্কে লিপসনের মন্তব্য, "...the keynote to Russian history is to be found in the incessant struggle between the forces of progress and reaction, and while the latter repeatedly gained the upperhand, the subterranian working of Liberalism nevertheless undermined the whole fabric of the Czarist regime"

এক বৃহৎ অংশ নিয়ে। জনগণও ছিল নানা জাতিগোষ্ঠীর। তবে অধিকাংশই স্লাভ জাতিগোষ্ঠীয় যাদের মধ্যে তিনটি প্রধান ভাগ— রাজধানী মস্কোকে কেন্দ্র ক'রে মধ্যবর্তী অঞ্চলের রুশগণ বা 'গ্রেট রাশিয়ান', কিয়েভকে কেন্দ্র ক'রে দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের রুশগণ এবং লিথুয়ানিয়া অঞ্চলের শ্বেতরুশগণ।

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বিশাল রুশ সাম্রাজ্য পশ্চিম ইয়োরোপের তুলনায় অনেক পিছিয়ে ছিল। জনসংখ্যা যদিও বৃদ্ধি পাচ্ছিল, তবে সাইবেরিয়া অঞ্চলে জনগণ কমই বসবাস করত। 1800 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত জনসংখ্যা ছিল তিন থেকে চার কোটির মধ্যে। মোট জনসংখ্যার প্রায় শতকরা নব্বই ভাগ জনগণ ছিল কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল। এদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি ছিল ভূমিদাস বা 'সার্ফ'। সার্ফদের অবস্থা ছিল অসহনীয়। বাকিদের অধিকাংশই ছিল রাষ্ট্রীয় কৃষক। এরা সম্রাটের পরিবারের বা অন্য সরকারি খামারে কাজ করত। এদের অবস্থা সার্ফদের থেকে সামান্য ভালো। কৃষিজীবী ছাড়াও ছিল শহুরে শ্রমিক প্রায় পনের লাখ। আর প্রায় পাঁচলক্ষ বংশানুক্রমিক অভিজাত, প্রায় আড়াই লক্ষ উচ্চ রাজকর্মচারী, পাঁচলক্ষ যাজক এবং তাদের পরিবারবর্গ নিয়ে সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত দশ লক্ষ মানুষকে অনুৎপাদক শ্রেণী বলা যায়।

রাশিয়ার সমাজব্যবস্থা ছিল মধ্যযুগীয়; জনসংখ্যার মধ্যে ইয়োরোপীয় জনসংখ্যার মতন এশিয় জাতিগোষ্ঠীর লোকজনও ছিল। রাশিয়ার জনগণের প্রধান ধর্ম ছিল অর্থোডক্স গ্রিক খ্রিস্টধর্ম। গির্জা ছিল জারের স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের সমর্থক। রুশ চার্চ জনগণকে এই শিক্ষা দিত যে, জারগণ ঈশ্বরের আদিষ্ট পুরুষ। তবে রাশিয়াতে যাজক সম্প্রদায় বিরাট সংখ্যায় ছিল না। সমাজ ছিল মূলত কৃষক এবং অভিজাত শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রায় দেড় লক্ষ অভিজাত পরিবার ছিল। এই অভিজাত শ্রেণীর অধীনে বড়ো বড়ো জমিদারী, ম্যানর এবং বহু সার্ফ বা ভূমিদাস ছিল। বুর্জোয়া কিংবা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তখনও উদ্ভব হয়নি। অধ্যাপক *সেটন ওয়াটসনও* দেখিয়েছেন যে, রাশিয়ার অধিবাসীদের অধিকাংশই কৃষক— যাদের মধ্যে ভূমিদাস এবং স্বাধীন কৃষক দুইই ছিল। আগেই বলা হয়েছে, মোট রাশিয়ার জনসংখ্যার নব্বই ভাগেরও বেশি ছিল কৃষক, যাদের মধ্যে অধিকাংশই সার্ফ।

রাশিয়াতে সার্ফদের অবস্থা ছিল সব থেকে দুর্দশাগ্রস্থ। ষোড়শ শতক থেকে রাশিয়াতে ভূমিদাস প্রথার প্রচলন ঘটে। দ্বিতীয় ক্যাথারিনের আমলে তা ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। এই সার্ফগণ জমিদার বা অভিজাত ভূস্বামীদের ম্যানর বা খামারের সংলগ্ন গ্রামে বাস করত এবং জমিদারদের জমি চাষ করত; প্রায় বিনা পারিশ্রমিকেই বলা যায়। সামান্য যা পেত তার থেকে কর দিতে হত। আসলে রুশ আইনে সার্ফগণ ছিল জমিদারদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। তাদের কোনও অধিকারই ছিল না। অনেক সময়ই তাদের দৈহিক নির্যাতন সহ্য করতে হত। এই অসহনীয় অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তারা মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করলে তা বলপূর্বক দমন করা হত। 1826 খ্রিস্টাব্দ থেকে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের

মধ্যে এরকম 712টি কৃষি বিদ্রোহ ঘটেছিল। *ডেভিড ল্যান্ডস* এবং *গারশেক্রন*-এর মতে সামন্ত প্রথার প্রভাবেই কায়িক শ্রমের কাজকে হীন চোখে দেখা হত। অনেক সময় ইউক্রেন বা ভলগার অপর প্রান্তে চলে যেত সার্ফরা। তবে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা সামান্যই। ভূমিদাসদের অবস্থা একমাত্র আমেরিকার ক্রীতদাসদের (slave) সঙ্গেই তুলনীয় ছিল। যদিও সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন *রাব* (Rab) বা ক্রীতদাস কথাটির ব্যবহার নিষিদ্ধ করে দেন। অধ্যাপক সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী লিখেছেন: "মালিকের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ বা তার বিচারের আশা ভূমিদাসেরা করতে পারতেন না, সামরিক বাহিনীতে তাদের যথেচ্ছ পাঠানো যেত, এমনকি বিক্রীও করা যেত। তারা জমিও ভোগ করতে পারত না। ক্যাথারিন বা পলের আমলে অপেক্ষাকৃত মুক্ত 'রাষ্ট্রীয় কৃষক'দের অনেককে এই অবস্থায় ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। এ সত্ত্বেও ভূমিদাস বা কৃষকেরা জাতীয় অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল। ১৮০৫ সালে সাধারণ রাজস্বের প্রায় দুই পঞ্চমাংশ এদের দেওয়া কর থেকে আসত।"

বাণিজ্যে ও শিল্পেও রাশিয়া অনেক পিছিয়ে ছিল। রাশিয়ার জনগণ শিল্প-বাণিজ্যে কাজ করাকে নিচু চোখে দেখত। ধনবন্টন না হওয়াতে সমাজে মুষ্টিমেয় ধনী অভিজাতগণের হাতেই অর্থ ছিল, তা বাণিজ্য পুঁজিতে রূপান্তরিত হয়নি। দ্বিতীয় ক্যাথারিনের আমলে থেকে কিছু কিছু শিল্প কেন্দ্র গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। শিল্পেও মুক্ত শ্রমিকদের বিশেষ ভূমিকা ছিল না।

জার পল : দ্বিতীয় ক্যাথারিনের মৃত্যুর পরই অবশ্য প্রথম আলেকজান্ডার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন নি। ক্যাথারিনের মৃত্যুর (1796) পর জার হন তার পুত্র পল। তাঁর মায়ের জীবদ্দশায় পল দেশে নির্বাসিতের জীবন যাপন করছিলেন। ক্যাথারিনের মৃত্যুর সময় তিনি ছিলেন উলফা শহরে। যাই হোক, পল ছিলেন অভিজাতদের বিরোধী। প্রথমদিকে কিছু দক্ষতা প্রদর্শন করলেও তাঁর মানসিক ভারসাম্যের অভাব প্রকট ছিল। লাওনেল কোচান লিখেছেন— 'He betrayed symptoms of severe mental unbalance।'[1] তিনি সার্ফদের কিছু সুবিধে দেবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তা বিশেষ ফলপ্রসূ হয়নি। বরং এর ফলে সার্ফদের মুক্তির আশা জাগে, তাদের ক্ষোভ আরও বৃদ্ধি পায় এবং ফলে পলকেই বিক্ষোভ দমনের ব্যবস্থা করতে হয়। অন্যদিকে ফরাসি বিপ্লবের আদর্শকেও তিনি দেশের বাইরে রাখতে কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।

তবে তিনি অভিজাতদের ক্ষমতা খর্ব করার চেষ্টা ক'রে প্রশাসনের প্রভাবশালী অংশকেই ক্ষুব্ধ করে দিয়েছিলেন। তিনি সরকারি কাজ থেকে খুশি মতন অভিজাতদের ছাঁটাই করতেন। বস্তুত 1785 খ্রিঃ ক্যাথারিনের আমলে অভিজাতদের যে সব সুযোগ

1. Lionel Kochan, *The Making of Modern Russia*, Penguin, 1968, p. 137.

সুবিধা দেওয়া হয়েছিল তা জার পল বাতিল করেন। অভিজাতদের সম্পত্তির উপর কর ধার্য হয়। এর ফলে 1801 খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে এক ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে রাজপ্রাসাদের শয়ন কক্ষে তাঁকে হত্যা করা হয়। এই ষড়যন্ত্রের কথা তাঁর পুত্র আলেকজান্ডার সম্ভবত জানতেন যদিও তাঁর ভূমিকা খুব স্পষ্ট নয়। সম্ভবত পলকে সিংহাসনচ্যুত করার ব্যাপারে তার ইচ্ছা থাকলেও হত্যাকাণ্ডের মধ্যে তিনি ছিলেন না। তবে এই হত্যাকান্ড হলো উনিশ শতকের একেবারে গোড়ায় (1801 খ্রিস্টাব্দে) এবং এরপর থেকে জার বিরোধী প্রচার,আন্দোলন, এমনকি হত্যার প্রচেষ্টা এবং হত্যার ঘটনা ঘটেছে। তখন তা শুধু রাজ প্রাসাদে বা রক্ষীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। বস্তুত 1801 খ্রিস্টাব্দ থেকে যে নতুন যুগ শুরু হয় তার কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের দিকে ইতিহাসবিদ কোচান দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন: 'রাশিয়ার স্বৈরতন্ত্র যেরূপে রাশিয়ায় বিদ্যমান ছিল, তা অচল হয়ে পড়েছিল একথা ক্রমেই বোঝা যেতে লাগল।[1]

জার প্রথম আলেকজান্ডার থেকে দ্বিতীয় নিকোলাস পর্যন্ত পাঁচজন জারের আমলে কখনও কখনও সংস্কার প্রচেষ্টা হলেও স্বৈরতান্ত্রিক রাজতন্ত্র অব্যাহত ছিল। আমরা বর্তমান অধ্যায়ে জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার এবং তার সংস্কার প্রচেষ্টাই মূলতঃ আলোচনা করব। কিন্তু আলোচনার পূর্ণাঙ্গতার স্বার্থে পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের রাজত্বকালের (1855-1881) উপর দৃষ্টি দেওয়ার আগে প্রথম আলেকজান্ডার এবং প্রথম নিকোলাসের রাজত্বকাল আলোচনা করে এবং পরবর্তী অংশে তৃতীয় আলেকজান্ডারের রাজত্বকাল আলোচনা করা হবে।[2]

২। প্রথম আলেকজান্ডার (1801-1825)

প্রথম আলেকজান্ডার রাশিয়ার সিংহাসনে বসেন 1801 খ্রিস্টাব্দে। আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি যে, ঐ বৎসর মার্চ মাসে তাঁর পিতা জার পল আততায়ীর দ্বারা রাজপ্রাসাদেই নিহত হয়েছিলেন। এই ষড়যন্ত্র এবং হত্যাকান্ডের কথা তিনি সম্ভবত জানতেন যদিও তিনি নিজে এতে অংশ গ্রহণ করেন নি। তবে অনেক ঐতিহাসিকের ধারনা এর ফলে সারাজীবন তিনি এক গভীর পাপবোধের দ্বারা তাড়িত হয়েছিলেন। প্রিয় বন্ধু জারটোরিস্কিকে তিনি নাকি তার মানসিক আঘাতের কথা জানিয়েছিলেন। যাই হোক, তরুণ বয়সে আলেকজান্ডার কিছুটা উদার পন্থার দ্বারা উদ্বুদ্ধ ছিলেন। তার শাসন সংস্কারের ইচ্ছা ছিল। তাঁর শিক্ষক লা হার্প-কে লিখিত পত্রে তাঁর সংস্কার-ইচ্ছার কথা

1. "The nocturnal coup marked, in a highly symbolical way, the end of a phase in Russia's political evolution....This widened concern with politics was one important symptom of the new age."–L. Kochan, Op. cit, p 138

2. তৃতীয় আলেকজান্ডার এবং দ্বিতীয় নিকোলাসের রাজত্বকাল বর্তমান গ্রন্থের অষ্টাদশ অধ্যায়ে পাঠ্যসূচি অনুযায়ী আলোচনা করা হয়েছে।

ব্যক্ত হয়েছে। অবশ্য উনিশ শতকের গোড়ায় রুশ সাম্রাজ্যের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা এতই বেশী ছিল যে সংস্কার ছিল অবশ্য প্রয়োজনীয়।

জারের ব্যক্তিত্ব ও নীতি : জার প্রথম আলেকজান্ডার ছিলেন স্ববিরোধিতার প্রতিমূর্তি— তাঁর চরিত্রে অস্পষ্ট উদারপন্থার সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার সংমিশ্রন দেখা যায়, যেজন্য তাকে বলা হত 'মুকুটধারী হ্যামলেট'। একদিকে কৃষকদের কিছু কিছু স্বাধীনতা দেওয়ার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন আবার প্রতিক্রিয়ার নীতিও বজায় রেখে ছিলেন। তৎসত্ত্বেও রাশিয়াতে ফরাসি বিপ্লবের আদর্শের প্রভাব ও উদারপন্থার বিকাশ একেবারে বন্ধ করা যায় নি। উনিশ শতকের গোড়ার দিক থেকে অর্থাৎ তার রাজত্বকালে কিছু কিছু গুপ্ত সমিতিও গঠিত হতে থাকে।

প্রথম আলেকজান্ডারের আভ্যন্তরীণ নীতিঃ গৃহ শিক্ষক লা হার্পা এবং জারটোরিস্কি, স্ট্রগানোভ, নোভোসিৎসভ, কোচুচি প্রমুখের প্রভাবে জার প্রথম আলেকজান্ডারের উদারতন্ত্রবাদের প্রতি কিছু অনুরাগ ছিল। তিনি সাম্রাজ্যের একটি পরিষদ গঠন করেছিলেন এবং প্রশাসনকে আধুনিক করতে চেয়েছিলেন। মস্কো, ডরপাট, ভিলনার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে পুনর্গঠিত করা এবং কাজান ও খারকভে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা ছাড়াও শিক্ষার প্রসারে উদ্যোগী হন। 1818 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সার্ফদের মুক্তির জন্য কিছু কিছু কাজ করেও ছিলেন। এরপর থেকে অবশ্য তিনি পুরোপুরি স্বৈরতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়েন। ফন ক্রুডেনার নামে এক সন্ন্যাসিনীর প্রভাবে তিনি ধর্মীয় ব্যাপারে প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব গ্রহণ করেন।

জারের বৈদেশিক নীতি : প্রথম আলেকজান্ডার নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং ভিয়েনা সম্মেলন অন্যতম নেতা ছিলেন। 1801 খ্রিস্টাব্দে জার হওয়ার পর তিনি প্রথম দিকে নেপোলিয়ানের সম্পর্কে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু নেপোলিয়ান জার্মানি জয় করবার পর তিনি নিরপেক্ষতা ত্যাগ করে তৃতীয় শক্তিজোটে যোগ দেন। ফ্রান্সের কাছে ফ্রিডল্যান্ডের যুদ্ধে তার পরাজয় ঘটে। এরপর আবার 1807 খ্রিস্টাব্দে নেপোলিয়ানের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে টিলসিটের সন্ধিতে স্বাক্ষর করেন। আবার নেপোলিয়ানের তথাকথিত মহাদেশীয় অবরোধ প্রথমে সমর্থন করেও পরে প্রত্যাক্ষাণ করলে নেপোলিয়ানের সঙ্গে তার বিরোধ হয়। নেপোলিয়ান তার মস্কো অভিযানের মধ্যে জারকে শিক্ষা দিতে চাইলেও নিজেরই ক্ষতি করেন। এরপর জার নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে তিনি সক্রিয় হন। ভিয়েনা সম্মেলন অথবা ইয়োরোপীয় শক্তি সমবায় গঠনের ক্ষেত্রে তাঁর উদ্যোগ লক্ষ্যণীয়। শক্তি সমবায়ের পবিত্র চুক্তির তিনিই ছিলেন উদগাতা। প্রথম আলেকজান্ডার পরে মেটারনিখের রক্ষণশীল নীতিরও এক সক্রিয় সমর্থক ছিলেন। তবে তাঁর বৈদেশিক নীতি যে চূড়ান্ত সফল তা লাভ করেছে এমন বলা যায় না।

৩। প্রথম নিকোলাস (1825-1855)

1825 খ্রিস্টাব্দে জার প্রথম আলেকজান্ডারের মৃত্যু হলে রাশিয়ার সিংহাসনের উত্তরাধিকারের প্রশ্নে কিছু গোলযোগ উপস্থিত হয়। কারণ প্রথম আলেকজান্ডার ছিলেন অপুত্রক। তাঁর দুই ভাই— কনস্টানটাইন এবং নিকোলাস ছিলেন সিংহাসনের বৈধ উত্তরাধিকারী। প্রথম আলেকজান্ডার মৃত্যুর আগেই তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিকোলাসকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করে গিয়েছিলেন। তবু কনস্টানটাইন জ্যেষ্ঠ হওয়াতে তার দাবি ছিল অগ্রগণ্য। তিনি জনপ্রিয় ও উদার ছিলেন। ফলে জনগণ চাইছিলেন যে তিনিই জার হ'ন। কিন্তু তিনি তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিকোলাসের অনুকূলে সিংহাসন ছেড়ে দেন। ফলে প্রথম নিকোলাসই জার হলেন।

ডেকাব্রিস্ট অভ্যুত্থান ঃ জার প্রথম নিকোলাস 1825 খ্রিস্টাব্দ থেকে 1855 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালের একেবারে গোড়ার দিকে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল ডেকাব্রিস্টদের অভ্যুত্থান। এই বিদ্রোহ 1825 খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে হয়েছিল বলে একে *ডিসেম্বরের অভ্যুত্থান*ও বলা হয়ে থাকে। জার প্রথম নিকোলাসের রাজত্বকালের একেবারে শেষ দিকে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল পূর্ব ইয়োরোপে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ, যাতে রাশিয়া জড়িয়ে পড়েছিল। (এই যুদ্ধের কথা পরে আমরা যথাস্থানে আলোচনা করব)

1825 খ্রিস্টাব্দের 26 ডিসেম্বর রাশিয়াতে ডেকাব্রিস্ট বা ডিসেমব্রিস্টদের বিদ্রোহ ঘটে। এই বিদ্রোহের কারণ শুধু জনপ্রিয় কনস্টানটাইনের বদলে নিকোলাসের সিংহাসনে আরোহণ নয়। একথা সত্য যে নিকোলাস ছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবাপন্ন। তাঁর ক্ষমতালাভে সেনাদলের একাংশ, দেশপ্রেমিক মানুষ এবং বিপুল সংখ্যক সার্ফদের মনে বিক্ষোভ ও হতাশার সৃষ্টি করেছিল। বিদ্রোহের মূল কারণ ছিল জারতন্ত্রের চরিত্র—এর স্বৈরতান্ত্রিকতা এবং বিপুল সংখ্যক মানুষদের অসহণীয় অবস্থা। কিছু সেনানী এবং দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবী পশ্চিম ইয়োরোপীয় ধাঁচের সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। এমনকি কিছু অভিজাত মানুষও এমন কামনা করতেন। এদেরই উদ্যোগে 1816 খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ার তৎকালীন রাজধানী সেন্ট পিটার্সবার্গে 'ইউনিয়ন অফ স্যালভেশন' নামে একটি গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠিত হল। এই ভাবে উত্তর রাশিয়া এবং দক্ষিণ রাশিয়ার জন্য দুটি স্বতন্ত্র সমিতি স্থাপিত হয়। ইউনিয়ন অফ স্যালভেশন সম্পর্কে অধ্যাপক *কোচান* লিখেছেন, 'Its objects were to abolish serfdom and to install a constitutional regime'।[1] এই ধরণের বহু গুপ্ত সমিতিগুলির ক্রিয়াকলাপের শেষ পরিণতি ডিসেমব্রিস্ট বা ডেকাব্রিস্ট বিদ্রোহ। গোপনে প্রস্তুতি, দলে লোক নিয়োগ, প্রচার ইত্যাদির পর বিদ্রোহের কথা ভাবা হয় প্রথম আলেকজান্ডারের আমলে। তাকে হত্যারও পরিকল্পনা ছিল কিন্তু তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যুর পর নিকোলাসের আমলেই বিদ্রোহ ঘটে। এই প্রস্তুতি পর্বে বিদ্রোহের নেতাদের

1. লায়োনেল কোচান, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. 144

মধ্যে পেস্টেল, মুরাভিয়ভ, ট্রবেটস্কি প্রমুখের নাম করা যায়। এই বিদ্রোহ আদৌ সফল হয়নি। জার নিষ্ঠুরভাবে বিদ্রোহ দমনও করতে পেরেছিলেন। কিন্তু উনিশ শতকের বিপ্লবী ঘাতপ্রতিঘাতে প্রভাতী সঙ্গীত এই বিপ্লবের মধ্যে বেজে উঠল। তৎকালীন ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত লণ্ডনে এই ঘটনা জানিয়ে যে বার্তা পাঠিয়েছিলেন তাতে ছিল আশ্চর্য ভবিষ্যদ্বাণী: 'The late conspiracy failed for want of management, and want of head to direct it and was too premature to answer any good purpose, but I think the seeds are sown which one day will produce important consequences'। তাই দেখা যায় একশো বছরের মধ্যেই ঘটেছিল রুশ বলশেভিক বিপ্লব।

প্রথম নিকোলাসের নীতি ঃ জার প্রথম নিকোলাস ছিলেন বাস্তববাদী এবং চতুর। অন্তত প্রথম আলেকজান্ডারের মতন আধা আদর্শবাদী তিনি ছিলেন না। তবে স্বৈরতান্ত্রিক জারতন্ত্রে তাঁর বিশ্বাস ছিল গভীর। মনে প্রাণে তিনি ছিলেন রুশ। ডিসেমব্রিস্ট বা ডেকাব্রিস্ট অভ্যুত্থানের অভিজ্ঞতা তাকে প্রতিক্রিয়াশীল নীতিই গ্রহণ করতে প্ররোচিত করেছিল। তাঁর রাজত্বকালে (1825-1855 খ্রিঃ) তিনি এই মনোভাব নিয়েই বিশ্বাস করতেন পশ্চিম ইয়োরোপের তৎকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক আদর্শ রাশিয়ার পক্ষে বিপজ্জনক। প্রথম নিকোলাস যে সম্পূর্ণ সংস্কার বিরোধী ছিলেন বা প্রশাসনে দুর্নীতি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না এমন নয়, কিন্তু সবই জারের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল ছিল। বাস্তবে বিদেশ ভ্রমণের উপর নিষেধাজ্ঞা, বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ, প্রকাশনার উপর সেন্সর, রাজনৈতিক কার্যকলাপের উপর কঠোর দৃষ্টি রাখার জন্য গোপন পুলিশী ব্যবস্থা ইত্যাদির মাধ্যমে স্বৈরতন্ত্রই ছিল তাঁর আভ্যন্তরীণ নীতির বৈশিষ্ট্য।

সুতরাং একথা বলা হয়ে থাকে যে, 'গোঁড়ামি স্বৈরতন্ত্র এবং রুশী জাতীয়তাবাদ' ছিল প্রথম নিকোলাসের নীতি। স্বাধীন চিন্তা ও সমালোচনাকে বন্ধ করার জন্য যে সেন্সর বোর্ড গঠন করা হয় তাঁর প্রধান ছিলেন কাউন্ট উভারভ। জার নিকোলাস থার্ড সেকশন নামে এক গুপ্ত পুলিশ বাহিনীও গঠন করেছিলেন। তবে প্রথম নিকোলাসের আমলে রাশিয়াতে প্রথম শিল্পায়ন প্রচেষ্টা শুরু হয় এবং রুশ সাহিত্যেরও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটে।

প্রথম নিকোলাসের বৈদেশিক নীতিঃ জার প্রথম নিকোলাসের স্বৈরতান্ত্রিক এবং রক্ষণশীল নীতির ছাপ তাঁর বৈদেশিক নীতির মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। ভিয়েনা সম্মেলনে মেটারনিখ যে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার ও বিপ্লব বিরোধী নীতির সূচনা করেন নিকোলাস ছিলেন তার সমর্থক। এই সঙ্গে অবশ্য রুশ সাম্রাজ্যের স্বার্থ এবং আগ্রাসী মনোভাবও তিনি বজায় রেখেছিলেন। বিপ্লব দমনে ইয়োরোপে যেমন তিনি ছিলেন উৎসাহী, তেমনি পূর্ব ইয়োরোপে রুশ অধিকার বৃদ্ধিতে তৎপর। দুর্বল তুরস্কের বিরুদ্ধে আগ্রাসন নীতির ফলে অবশ্য রাশিয়াকে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয়। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স তুরস্কের পক্ষ নিয়ে রাশিয়াকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে।

পোল্যান্ডে জার নিকোলাস সমস্ত স্বাধিকারের বিলোপ সাধন করেছিলেন। মনে রাখা দরকার যে, নেপোলিয়ানের তৈরি করা 'গ্র্যাণ্ড ডাচি অফ ওয়ার্‌শ'র বিলোপ ঘটিয়ে ভিয়েনা সম্মেলন যে পোল্যাণ্ড রাজ্য গঠন ক'রে, তা রাশিয়ার অধীনে রেখেছিল। ঠিক হয়েছিল পোল্যাণ্ডের জাতিগত বৈশিষ্ট্য মেনে চলা হবে। দু'কক্ষ বিশিষ্ট আইন সভা হবে—অভিজাত ও বিশপদের নিয়ে সিনেট (রাজার দ্বারা মনোনীত) এবং সংসদ (Diet) যা হবে নির্বাচিত। মন্ত্রিসভা, আলাদা বাজেট, সংবাদপত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং জাতীয় সেনা বাহিনী, জাতীয় পতাকা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়। সরকারি কাজে পোলিশ ভাষার ব্যবহার করার নীতি গৃহীত হয়। কিন্তু ক্রমে ক্রমে রাশিয়া পোল্যাণ্ডের উপর রুশীকরণ (Russification) নীতি নিয়ে পোল্যাণ্ডের স্বাধিকার খর্ব করলে জাতীয়তাবাদী পোলরা ক্ষুব্ধ হন। ফ্রান্সে জুলাই বিপ্লবের (1830) প্রভাবে পোল্যাণ্ডে বিদ্রোহ দেখা দেয়। জারের ভাই কনস্ট্যানটাইন যিনি পোল্যাণ্ডে সেনাবাহিনীর দায়িত্বে ছিলেন তিনি পালিয়ে যান। বিদ্রোহীরা অস্থায়ী সরকার গঠন করে কিন্তু শেষ পর্যন্ত জার সৈন্য পাঠিয়ে এই বিদ্রোহ দমন করেন। এরপর নিকোলাস আরও দমননীতি গ্রহণ করেন।

জার প্রথম নিকোলাস 1848 খ্রিঃ ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের প্রভাবে অস্ট্রিয়ার হ্যাপস্‌বর্গ সাম্রাজ্যে বিপ্লবী আন্দোলন হলে অস্ট্রিয়ার অনুরোধে আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনের জন্য সামরিক সাহায্য প্রেরণ করেন। হাঙ্গেরীতে বিপ্লব দমনে ঐ সেনাবাহিনী কাজে লাগান হয়। প্রাশিয়ার রাজা চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়াম যাতে জার্মানির জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে সমর্থন না করেন সেদিকেও জার দৃষ্টি রেখেছিলেন। আবার তুরস্কের বিরুদ্ধে গ্রিসে বিদ্রোহ শুরু হলে জার বিদ্রোহীদের পক্ষ নেন।

তবে তুর্কি সুলতান গ্রিক বিদ্রোহ দমনের জন্য মিশরের সাহায্য নেন। এই সাহায্যের বিনিময়ে মিশর তুর্কি সুলতানের সাম্রাজ্যের অংশ অধিকার করে নিতে উদ্যোগী হলে তুরস্কের সুলতান রাশিয়ার সাহায্য প্রার্থনা করেন। রাশিয়া এক্ষেত্রে সাহায্য করে কিন্তু তার বিনিময়ে উনকেয়ার স্কেলেশির সন্ধি (1832) দ্বারা দার্দানালিস প্রণালীতে অবাধে রুশ জাহাজ চলাচলের অধিকার লাভ করে এবং অন্য ইয়োরোপীয় শক্তি ঐ প্রণালী ব্যবহারে বঞ্চিত হয়। ইংল্যাণ্ড রাশিয়ার এই ক্ষমতা বৃদ্ধি আদৌ ভালোভাবে নেয়নি। যিশুখ্রিস্টের জন্মস্থানের অর্থাৎ জেরুজালেমের (যা তুর্কি সুলতানের রাজ্যভুক্ত) গির্জার অধিকার নিয়ে অর্থোডক্স গ্রিক চার্চের সঙ্গে ল্যাটিন চার্চের বিবাদ বাধে। ল্যাটিন চর্চ অর্থাৎ ক্যাথলিক গির্জার সমর্থক ছিল ফ্রান্স এবং অর্থোডক্স গ্রিক চার্চের সমর্থক ছিল রাশিয়া। শেষ পর্যন্ত তুরস্কের সঙ্গে রাশিয়ার যুদ্ধ বাধলে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স তুরস্কের পক্ষ নেয়। এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হয় 1856 খ্রিস্টাব্দে প্যারিসে সন্ধির দ্বারা। তার আগেই অবশ্য জার প্রথম নিকোলাসের মৃত্যু হয়েছে। তবে পূর্বোক্ত যুদ্ধে, যা *ক্রিমিয়ার যুদ্ধ* নামে পরিচিত, রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা যেমন প্রকট হয়, তেমনি রাশিয়ার মর্যাদাও হ্রাস পায়। রাশিয়ার স্বৈরতান্ত্রিক জার শাসন, ভূমিদাস প্রথা এবং সংস্কারের অভাব দেশের অগ্রগতির পক্ষে যে বাধা স্বরূপ তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

৪। জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার ও তাঁর সংস্কার

1855 খ্রিস্টাব্দে জার প্রথম নিকোলাসের মৃত্যুর পর তার পুত্র দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার রাশিয়ার জার হন। যখন তিনি সিংহাসনে বসেন তখন সর্বস্তরের মানুষ তাঁকে সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু 1881 খ্রিস্টাব্দে তিনি হয়ে পড়েন জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন;[1] তার মৃত্যু হয় বিপ্লবীদের হাতে গুলি খেয়ে। অথচ এমন হওয়ার কথা ছিল না। তিনি একদা বলেছিলেন, "আমরা যে যুগে বাস করছি, সেই যুগের মর্মকথা বুঝে যদি আমরা ওপর থেকে সংস্কারের চেষ্টা না করি, তবে নীচ তলার লোকেরাই ওপরের লোকেদের ওপর সংস্কার চাপিয়ে দেবে। নীচতলা থেকে সংস্কারের দাবী মেনে নেওয়া অপেক্ষা, ওপর থেকে সংস্কার করা ভাল।" রাশিয়ার ক্রিমিয়ার যুদ্ধে পরাজয় রাশিয়ার দুর্বলতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল। তাই দ্বিতীয় আলেকজান্ডার কিছু সংস্কার গ্রহণে আগ্রহী ছিলেন।[2] কিন্তু তাঁর সংস্কার প্রচেষ্টার ব্যর্থতাই তাকে ক্ষুব্ধ ক'রে ঘোর প্রতিক্রিয়াশীলে পরিণত করে।

রাশিয়ার ইতিহাসে দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের রাজত্বকাল এক যুগ সন্ধিক্ষণ, পুরাতন ঐতিহ্য থেকে দিক পরিবর্তন। ইতিহাসবিদ *সেটন ওয়াটসন* লিখেছেন যে, ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয় রাশিয়ার পচনশীল অবস্থা স্পষ্ট করেছিল এবং নতুন জার সংস্কারের দ্বারা তা দূর করতে চেয়েছিলেন। রাশিয়ার পচনশীল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল স্বৈরাচারী শাসনের অবক্ষয় এবং ভূমিদাস প্রথার ফলে সৃষ্ট আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার কারণে। শিল্প ও কৃষিতে যেমন রাশিয়া ছিল পশ্চিম ইয়োরোপের তুলনায় অনেক বেশি পশ্চাদ্‌পদ, তেমনি পশ্চিম ইয়োরোপের গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ এখানে প্রবেশ করেনি। এই কারণে জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার কিঞ্চিৎ উদারনৈতিক সংস্কার প্রবর্তন ক'রে বাস্তববুদ্ধির পরিচয় দেন। তবে তাঁর রাজত্বকালের শেষ দিকে বিপ্লবী আন্দোলনের প্রসার ঘটে।

প্রথম আলেকজান্ডারের অবাস্তব আদর্শবাদ কিংবা প্রথম নিকোলাসের সামরিক প্রীতি থেকে দ্বিতীয় আলেকজান্ডার অনেকাংশ মুক্ত ছিলেন। দেশকল্যাণে তাঁর উৎসাহ ছিল কিন্তু যুগের প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে তা যথেষ্ট ছিল না। রাশিয়ার সেই সময়কার অবস্থা সম্পর্কে উনিশ শতকের রুশ ঐতিহাসিক *ভিনো গ্রেডফ* লিখেছিলেন, "রাশিয়ার অধিকাংশ জনসাধারণ ছিল দাস প্রথা ও অজ্ঞানতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ, যাতায়াত ব্যবস্থাও ছিল মধ্যযুগীয়; তাছাড়া ছিল আদর্শবাদের অভাব এবং শাসনক্ষমতা ছিল বৃহৎ জমিদার বা রুশ অভিজাতশ্রেণীর কাছে আবদ্ধ।" বিশেষত অগণতান্ত্রিক শাসনের পরিবর্তন এবং ভূমিদাসদের উন্নতি ছাড়া পরিবর্তন সম্ভব ছিল না। তবু দ্বিতীয় আলেকজান্ডার চেষ্টা করেছিলেন।

প্রাথমিক সংস্কার ঃ প্যারিসের সন্ধির অব্যবহিত পরে (1856 খ্রিঃ) জার ঘোষণা করেছিলেন যে, 'আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাদির উন্নতি সাধন করা হবে; বিচারালয়ে ন্যায়বিচার

1. W.E. Masse, *Alexander II and the Modernization of Russia*, London, 1958, pp. 162-63.
2. L. Kochan, op. cit, p. 165.

ও ক্ষমা প্রদর্শিত হবে, শিক্ষার বিস্তার করা হবে।" অচিরেই তিনি দমননীতি প্রত্যাহার করে নিলেন। ডেকাব্রিস্ট বা ডিসেমব্রিস্ট বিদ্রোহীদের মধ্যে যারা তখনও কারাগারে আটক ছিল তিনি তাদের মুক্তি দেন। তারপর ক্রমে ক্রমে বিদেশ যাত্রা সম্পর্কে যে নিষেধাজ্ঞা ছিল তা প্রত্যাহার করে নেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করেন এবং বোর্ড অফ সেন্সর বা সেন্সর দপ্তরের ক্ষমতা হ্রাস করেন। সংবাদপত্রে উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। থার্ড সেকশন নামক যে গুপ্ত পুলিশ বাহিনী ছিল তা লোপ করা হয়। এই সব উদারনৈতিক সংস্কারের ফলে কয়েক বছরের মধ্যেই দ্বিতীয় আলেকজান্ডার জনগণের শুভেচ্ছা লাভ করেন।

ভূমিদাস প্রথার বিলোপ আইন (Emancipation of the Serfs, 1861) **:** দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সংস্কার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় 1861 খ্রিস্টাব্দে যখন তিনি বিশেষ আইন (Edict) দ্বারা ভূমিদাস বা সার্ফদের মুক্তির (Emancipation) কথা ঘোষণা করেন। আমরা বর্তমান অধ্যায়ের শুরুতেই সার্ফ বা ভূমিদাস প্রথা (Serfdom) কিভাবে রাশিয়াতে গড়ে উঠেছিল এবং তার বৃদ্ধি কিভাবে রাশিয়াকে দুর্বল করে ফেলেছিল সে-বিষয়ে আলোচনা করেছি। উনিশ শতকে এই কুপ্রথার ফলে রাশিয়ার দুর্বলতা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, সামাজিক ক্ষেত্রে, এমনকি সামরিক ক্ষেত্রে পর্যন্ত প্রকট হয়ে উঠেছিল। কারণ রাশিয়ার জনগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠই ছিল কৃষক সম্প্রদায়ের এবং তাদের অধিকাংশই ভূমিদাস ছিল। মোট জনসংখ্যার অর্ধাংশেরও বেশি সার্ফ যারা প্রায় বিনাবেতনে দৈহিক ও মানসিক নির্যাতনের মধ্যে দিয়ে কর্মে নিযুক্ত ছিল। জারের এবং চার্চের অধিকারভুক্ত জমিতে এবং অভিজাত জমিদার শ্রেণীর জমিতে সার্ফগণ চাষ-আবাদ করত। তাদের বস্তুত কোনও অধিকার ছিল না এবং জীবন ছিল দুর্বিসহ। ফলে তাদের মনের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ ও ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়েছিল।

এই ক্ষোভের ফলে প্রায়শই বিদ্রোহ ঘটত, যদিও সেগুলি বলপূর্বক দমন করা হত। এই ঘন ঘন বিদ্রোহের ফলে রাষ্ট্রের সামাজিক ও রাজনৈতিক শান্তি যে বিপন্ন হত তাতে সন্দেহ নেই। 1801 খ্রিস্টাব্দ থেকে 1861 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সাড়ে পাঁচশোটি (অপর এক পরিসংখ্যার অনুযায়ী 1467টি) কৃষি বিদ্রোহ হয়। তবে জারের অনুগত সৈন্যবাহিনী এবং কসাক অশ্বারোহী সৈন্য দ্বারা নিষ্ঠুরভাবে সেগুলি দমন করা হয়। দ্বিতীয় আলেকজান্ডার জার হওয়ার পরে পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে তিনি উপলব্ধি করেন, রাশিয়াতে স্থিতাবস্থা এবং স্বৈরতান্ত্রিক শাসন বজায় রাখতে গেলে ভূমিদাসদের মুক্তি দেওয়া দরকার। জার নিকোলাসও মৃত্যুর আগে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ের পর বুঝে গিয়েছিলেন যে উদ্যমহীন ও হতাশ গ্রস্ত দাস পরিবারের লোকেদের নিয়ে গঠিত সেনাবাহিনী দিয়ে আধুনিক যুদ্ধে জয়লাভ সম্ভব নয়। লিপসনের মতে নিকোলাস দ্বিতীয় আলেকজান্ডারকে সংস্কারের কথা বলে গিয়েছিলেন।

রাশিয়াতে জারের শাসনের প্রধান শক্তিই ছিল যেহেতু অভিজাত শ্রেণী, তাই ভূমিদাস প্রথা উচ্ছেদ করলে তাদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই কোনও আইন করার আগে জার অভিজাত শ্রেণীকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ভূমিদাসদের মুক্তি দেবার আহ্বান জানিয়ে এক ভাষণে বলেন, "You know that the present system of serfs ownership cannot remain as it is; it is better that we should abolish it from above than wait it begins to abolish from below,... Gentlemen, I beg you examine how this reform can be made" (আপনারা জানেন যে দাস মালিকানার যে পদ্ধতি এখন যেমন আছে তা বজায় থাকতে পারে না। আমরা যদি নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে উপর থেকে এই প্রথা বিলোপ করি তাই হবে ভালো, নতুবা অপেক্ষা করলে সার্ফগণ নিচের থেকে নিজেরাই তা বিলোপ করবে। সুতরাং ভদ্রমহোদয়গণ, কিভাবে এই সংস্কার সাধন করা যায় সে— বিষয়ে ভাবুন)। কিন্তু অভিজাতরা নিজেরা উদ্যোগী হয়ে ভূমিদাস প্রথা বন্ধ করতে এগিয়ে আসেনি।

তবে এই প্রসঙ্গে দু'একটি কথা বলা দরকার। রাশিয়ার উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণী এবং ক্ষেত মালিকরা বুঝেছিল যে ভূমিদাস ক্ষেতমজুর অপেক্ষা স্বাধীন কৃষক অনেক বেশি উৎপাদনে সক্ষম। জারও তাই বুঝতেন। অর্থনৈতিক দিক থেকে ভূমিদাস প্রথা যে লাভজনক নয় তা অনেকেই বুঝতে পেরেছিলেন, এমনকি শিল্পেও শ্রমিক হিসেবে সার্ফরা নিযুক্ত হয়েও কোন লাভ হয়নি। তাছাড়া তারা মুক্তি না পেলে শিল্প শ্রমিক হিসেবে তারা দক্ষ হতে পারবে না, ধনী ভূস্বামীরা যদি তাদের খামারে প্রচুর ফলন ঘটিয়ে উদ্বৃত্ত শস্য রপ্তানি করে পুঁজি যোগাড় করে তাহলেও ভূমিদাস প্রথা লাভজনক নয়। সুতরাং অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দাস প্রথার বিলোপ দরকার হয়ে পড়ে। এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেন জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার। তিনি প্রথমে পরীক্ষামূলকভাবে 1857 খ্রিস্টাব্দের 3 ডিসেম্বর এক আদেশনামা জারি করে রাশিয়ার অন্তর্গত লিথুয়ানিয়া প্রদেশের সার্ফদের মুক্ত বলে ঘোষণা করেন। অধ্যাপক *সেটন ওয়াটসন* দেখিয়েছেন যে, এর আগেই তিনি সেনাপতি রোস্টোভস্টেভের নেতৃত্বে এক কমিটি গঠন করে ভূমিদাস প্রথা উচ্ছেদের পরিকল্পনা নেন। তিনি নিজেও নানা শহরে প্রচার চালান। পাঁচ বছর প্রস্তুতির পর শেষ পর্যন্ত (1861 খ্রিস্টাব্দের 19 ফেব্রুয়ারি জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার ভূমিদাস বা সার্ফদের মুক্তির ঘোষণাপত্র জারি করেন)। এই আইন (Edict of Emancipation) ছিল বৈপ্লবিক এবং ঐতিহ্যের থেকে ভাঙন। (যদিও কাজের কাজ হয়নি, তা পরে যথাস্থানে আলোচিত হবে।)

ভূমিদাস পদ্ধতির বিলোপ সাধন করে যে ঘোষণা পত্র বা আইন রচিত হয়, তার ভিত্তি ছিল কতকগুলি নীতি। যেমন (১) ভূমিদাসদের মুক্ত কৃষক হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। অর্থাৎ তাদের উপর মালিকদের সকল অধিকার ও কর্তৃত্বের বিলোপ সাধন করা হবে; (২) মুক্ত ভূমিদাসদের জীবিকার জন্য জমি দিতে হবে। অর্থাৎ জমির মালিকানা

জমিদার ও কৃষকদের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে, (৩) সমগ্র ব্যবস্থাটি শান্তিপূর্ণ উপায়ে করতে হবে; (৪) অভিজাত বা সামন্তদের আর্থিক ক্ষতি যাতে না হয় সেজন্য নজর রাখা হবে। অর্থাৎ তারা ক্ষতিপূরণ পাবেন।

ভূমিদাস প্রথা উচ্ছেদ আইনের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এই আইনে বলা হলো যে, (১) রাষ্ট্রীয় জমি এবং অভিজাতদের জমিতে যে-সব ভূমিদাস আছে তারা এখন থেকে সকলেই স্বাধীন প্রজার মর্যাদা পাবে (২) ভূমিদাসদের রাজনৈতিক অধিকার থাকবে (৩) স্বাধীন সার্ফদের উপর জমিদারদের আর কোনও অধিকার থাকবে না। (৪) ভূস্বামীদের জমির প্রায় অর্ধাংশ ভূমিদাসদের হবে। সেখানে কৃষকরা স্বাধীনভাবে চাষ করতে পারবে। (৫) এই জন্য জমিদাররা ক্ষতিপূরণ পাবে। এই ক্ষতিপূরণ আপাতত দেওয়া হবে সরকার থেকে। (৬) কৃষকরা সেই অর্থ সরকারকে শোধ করবে 49 বছরের কিস্তিতে। (৭) সরকারের অর্থের উপর কৃষকদের মূল অর্থ ছাড়া 6.5% হারে সুদ দিতে হবে। (৮) কৃষকদের প্রদত্ত জমির মালিকানা ও পরিচালনা থাকবে 'মির' বা গ্রাম পঞ্চায়েত -এর বা কমিউনের হাতে। অর্থাৎ কৃষকরা জমিতে চাষাবাদ করলেও বিক্রি বা দান করতে পারবে না। (৯) প্রতি গ্রামের গৃহস্থরা মিলে গ্রাম প্রধান বা স্টার কোস্টা নির্বাচন করবে। (১০) কয়েকটি কমিউন মিলে হবে ক্যান্টন বা ভোলোস্ট। (১১) জমি সংক্রান্ত বিবাদের বিচার হবে এবং (১২) গ্রামীন 'মির' (Mir) সরকারি কর আদায়, সরকারের কাছে সেই কর জমা দেওয়া, সেনা সংগ্রহ, জমি বন্টন ইত্যাদি দায়িত্ব পালন করবে। আর ভূস্বামীদের জমির কোন অংশ এবং কতখানি জমি কৃষকরা পাবে তা স্থির করার দায়িত্ব একটি কমিশনের হাতে দেওয়া হবে।

দ্বিতীয় আলেকজান্ডারকে কি মুক্তিদাতা জার বলা সঙ্গত? দ্বিতীয় আলেকজান্ডার প্রবর্তিত ভূমিদাস প্রথার মুক্তি আইন রাশিয়ার ইতিহাসে তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমতঃ, ভূমিদাস প্রথা উঠে যাওয়া এক দীর্ঘদিনের চলমানতা থেকে উল্লঙ্ঘন। *লাওনেল কোচানের* মতে "The emancipation was not only epoch-making in itself in its effects on rural Russia; it also opened the way to further reforms". সুতরাং এই সংস্কার এক নতুন যুগের সূচনা করে। দ্বিতীয়তঃ, এর ফলে দেশের প্রচলিত রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামোতে পরিবর্তন অনিবার্য করে তোলে। তৃতীয়তঃ, স্বাধীন কৃষকদের পদমর্যাদা অবশ্যই বেড়েছিল, তারা স্বাধীন নাগরিকের মর্যাদা পায়, অর্থাৎ বিবাহ, নিজের নামে সম্পত্তি, বিচারালয়ে আইনের আশ্রয় গ্রহণ, ব্যবসা করা ইত্যাদি করতে পারত স্বাধীনভাবে; তাদের নিজেদের পণ্য হিসেবে কেউ বিক্রি করতে পারত না। এজন্য জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার ভূমিদাস প্রথা উচ্ছেদ আইনের ফলেই রুশ জনগণের নিকট 'মুক্তিদাতা জার' (Tsar Liberator) নামে পরিচিত হন।

তবে আধুনিক ঐতিহাসিকদের সকলেই তাকে মুক্তিদাতা জার আখ্যা দেওয়া সঙ্গত বলে মনে করেন না। যেমন *গ্রেনভিল* লিখেছেন যে তাকে মুক্তিদাতা জার বলা এক

'নিষ্ঠুর পরিহাস' মাত্র।[1] *ডেভিড টমসনও* মন্তব্য করেছেন যে এই মুক্তি আইন কৃষকদের কিংবা সমগ্র দেশের অর্থনৈতিক মুক্তি আনতে পারেনি। একথা ঠিকই যে, রাশিয়ার সমাজব্যবস্থার গভীর কলঙ্ক ও অন্যায় দূর করে জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেন। এর ফলে কৃষকদের আশা বৃদ্ধি পায়; সংস্কার প্রচেষ্টা আধুনিকীকরণে সাহায্য করে। মুক্তি নির্দেশ বিধি রাশিয়াতে শিল্পায়নে সাহায্য করে। কিন্তু এই আইনের কতকগুলি গুরুতর ত্রুটি থাকার ফলে জারের সংস্কার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এবার সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে।

(ক) অভিজাত ভূস্বামীগণ সার্ফদের যে জমি হস্তান্তর করে তার জন্য যে অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসেবে ধরা হয়েছিল, তা হস্তান্তরিত জমির ন্যায্য দামের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। সেটন ওয়াটসন দেখিয়েছেন যে, দক্ষিণ রাশিয়ার কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চলে যে জমি সার্ফদের দেওয়া হয়েছিল তার ন্যায্য দাম ছিল 284 রুবল অথচ কৃষকদের ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছিল 341 রুবল। (খ) রাশিয়ার কালো মাটির বাইরের অঞ্চলে সার্ফগণ জমিদারদের জমিতে বেগার চাষ না করে মালিকদের শিল্প কারখানায় কাজ করত। সার্ফরা মুক্ত হলে এইসব মালিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (গ) দক্ষিণ রাশিয়ার উর্বরা কালোমাটির অঞ্চলে ভূস্বামীগণ সার্ফদের প্রাপ্য জমি হস্তান্তর না করে বেশি জমি ধরে রাখার চেষ্টা করে। 1861-র পর ঐ অঞ্চলে বারবার কৃষি বিদ্রোহ ঘটে। আবার ক্ষতিপূরণের দাবি মেটাতে গিয়ে সার্ফদের জীবন কেটে যেত। স্বাধীনতা ছিল অলীক মাত্র। (ঘ) ভূমিদাসদের মুক্তি আইনে সার্ফদের হাতে জমির মালিকানা দেওয়া হয়নি, অথচ সেই জমির জন্য তাদের ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা হয়েছিল। জমির স্বত্ব কৃষকদের পরিবর্তে দেওয়া হয়েছিল গ্রামীণ কমিউন বা মিরগুলির হাতে। কমিউন বা মিরগুলি কৃষকদের উপর অত্যাচার করত। (ঙ) সাধারণ কৃষকদের অবস্থার কোনও উন্নতি হয়নি। (চ) ভূমিদাসদের জমি বন্দোবস্ত করার সময় ম্যাজিস্ট্রেট ও গ্রাম সভাগুলি দুর্নীতির আশ্রয় নিত। ভালো জমি নিজেদের হাতে রেখে খারাপগুলি সার্ফদের দেওয়া হয়। (ছ) ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায় করার দায়িত্ব গ্রাম সভাগুলির হাতে দেওয়া হয়েছিল, তারা চাষীদের উপর প্রবল চাপ দিত। অথচ জমিদারদের তেমন ক্ষতি হয়নি, কারণ তাদের হাতে ছিল অর্ধেক জমি, উপরন্তু তারা ক্ষতিপূরণ পেয়েছিল। (জ) ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পদ্ধতির ফলে কৃষকদের অর্থনৈতিক মুক্তি হয়নি। (ঝ) দীর্ঘ দু'বছর ধরে তিনটি পর্যায়ে 'মুক্তির আইন'-কে কার্যকর করার ব্যবস্থা হয়েছিল।

সুতরাং দ্বিতীয় আলেকজান্ডারকে 'মুক্তিদাতা' বলা চলে না। যদিও তাঁর সংস্কারের ফলেই রাশিয়াতে বিরাট এক সামাজিক অবিচারের অবসান ঘটে এবং রাশিয়াতে আধুনিক

---

1. "The notion that henceforth, that is from 1861 onwards, the serfs were emancipated was cruel joke"— J.A.S. Greenville, *Europe Reshaped*, Fontana, 1981, p. 285.

যুগের প্রকৃত সূচনা হয়। জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের কৃতিত্ব স্বীকার করে নিয়ে একথাও মানতেই হবে যে, সাধারণ কৃষক বা সার্ফগণ ভূমিদাসত্ব থেকে রাজনৈতিক মুক্তি পেলেও স্বাধীন হতে পারেনি।

স্বায়ত্তশাসনব্যবস্থার প্রবর্তন ঃ ভূমিদাসদের মুক্তি আইন ছাড়া জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার যে সব আভ্যন্তরীণ সংস্কার গ্রহণ করেছিলেন তার অন্যতম ছিল স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন। এই ব্যাপারে 1864 খ্রিস্টাব্দের আইন উল্লেখযোগ্য। এতে অভিজাত শ্রেণী ও কৃষক সম্প্রদায়ের জন্য স্বতন্ত্র সভার বিলোপ ঘটিয়ে একই সভায় সকল শ্রেণীর সদস্য গ্রহণের নিয়ম গৃহীত হয়। ঠিক হয় যে, সর্ব সাধারণের ভোটে জেলা পরিষদের সদস্যদের নির্বাচিত করা হবে। সর্বসাধারণ বলতে বোঝান হলো, (১) নগরবাসী, (২) জমির ব্যক্তিগত মালিক, কৃষক এবং গ্রামীণ কমিউন। স্বায়ত্ত শাসনব্যবস্থার প্রথম ধাপ ছিল জেলা পরিষদ (Volost)। এই পরিষদ বা ভোলোস্ট-এর সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হতে হত। পরের ধাপ প্রাদেশিক সভা (Zemestvo)। জেলা পরিষদের সদস্যদের উপর দায়িত্ব ছিল রাস্তাঘাট নির্মাণ, পুল তৈরি, প্রাথমিক শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি। বছরে একবার প্রাদেশিক সভা বা জেমেস্টভো-র অধিবেশন ডাকা হত। এই সভায় সমগ্র প্রদেশের পূর্ত বিভাগীয় কাজকর্ম, শিক্ষা জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হত। নীতি নির্ধারিত হত এবং সেই নীতি অনুযায়ী জেলাস্তরে কাজকর্ম হত। জেলা পরিষদের কার্য নির্বাহের জন্য বেতনভোগী কর্মচারী নিয়োগ করে এক শাসন কাঠামো গঠন করা হয়।

বলা বাহুল্য, পুরাতন ব্যবস্থার চাইতে এই শাসনতান্ত্রিক সংস্কার ছিল উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। তৎসত্ত্বেও জারের স্বায়ত্তশাসন আইন জনপ্রিয় হয়নি। এর কারণ হলো দেশে গণতান্ত্রিক শাসন, নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র বা সংসদীয় শাসন প্রবর্তন না করে শুধুমাত্র স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন দ্বারা পরিবর্তন আনা সম্ভব ছিল না। তাছাড়া সংস্কারের বেশ কিছু ত্রুটি ছিল। যেমন, প্রাদেশিক ও জেলা সভাগুলির হাতে জনকল্যাণমূলক কাজের দায়িত্ব থাকলেও প্রয়োজনীয় অর্থ ছিল না। এজন্য তাদের সরকারের অর্থাৎ জারের উপর নির্ভর করতে হত। জেমেস্টভো নিজেদের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজকর্ম চালানোর জন্য জনসাধারণের কাছ থেকে কর আদায় করতে পারত না। তাছাড়া প্রাদেশিক সভাগুলির কাজে সরকারি কর্মচারীগণ হস্তক্ষেপ করতেন। উপরন্তু জেমেস্টভোগুলিতে ভূস্বামী জমিদারদের সংখ্যাই ছিল বেশি। জেলাস্তরের নীচে কোনও স্বায়ত্তশাসন না থাকায় গ্রামীণ সমস্যা বুঝতে অসুবিধা হত। সাধারণ মানুষজন যেমন হতাশ হন তেমনি বুদ্ধিজীবী ও উদারপন্থীরা পার্লামেন্টারি শাসন না পেয়ে ক্ষুব্ধ হন।

বিচারবিভাগীয় সংস্কার ঃ দ্বিতীয় আলেকজান্ডার বিচার বিভাগের ক্ষেত্রেও কিছু কিছু সংস্কার সাধন করেছিলেন। যেমন তিনি বিচার বিভাগে জুরি প্রথা এবং নির্বাচনের

মাধ্যমে ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করেন। শাসনবিভাগকে বিচার বিভাগ থেকে আলাদা করা হয় এবং তার ফলে বিচার বিভাগে প্রশাসনিক আমলাদের হস্তক্ষেপ বন্ধ হয়। বিচারকদের নিয়োগ করা হত আমৃত্যুকাল পর্যন্ত কাজের ভিত্তিতে। বিচারকদের কাজের নিরাপত্তা বাড়ানোর ফলে তারা নির্ভীক ও নিরপেক্ষ হতে পারল। বন্ধ করা হয় গোপনে বিচার। অভিযুক্তগণ (এমনকি স্বাধীন সার্ফগণ পর্যন্ত) আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য আইনজীবী নিয়োগ করতে পারত। বিচারব্যবস্থার সর্বোচ্চ আপিল আদালত হিসেবে সিনেটকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। এর নিচে কেন্দ্র, প্রাদেশিক এবং জেলাস্তরে বিচার হত। আগেকার অবস্থার তুলনায় বিচার বিভাগীয় সংস্কার অনেক উন্নতি সাধন করে যদিও যথেষ্ট সংখ্যক আইনজ্ঞের অভাবে ব্যবস্থার বিলুপ্তি হয়। তবু বলা যায় পক্ষপাতদুষ্ট বিচারব্যবস্থার অনেকাংশ বন্ধ হয়।

শিক্ষা বিভাগীয় সংস্কার ঃ জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার শিক্ষা বিভাগীয় সংস্কারের জন্যও উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর শিক্ষামন্ত্রী সোলোভনিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষার জন্য একটি নিয়মনীতি বা কোড প্রণয়ন করেন। রাশিয়াতে পুরাতন এবং নতুন প্রতিষ্ঠান মিলে মোট আটটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল; সেগুলিতে স্বায়ত্ত শাসন দাবি করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর নির্বাচিত হবেন অধ্যাপকদের ভোটে, তবে জারের অনুমোদনে তিনি কাজে যোগ দেবেন। অধ্যাপক পদে প্রার্থী মনোনয়ন করত অধ্যাপক সমিতি এবং তাদের নিয়োগপত্র দেবেন শিক্ষামন্ত্রী। পঠন-পাঠনের ব্যাপারে অবশ্য অধ্যাপকদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ছিল। পোলোভনিনের পর শিক্ষামন্ত্রী হন দিমিত্রি তলস্তয়। তিনি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচি সংশোধন করেন। বিজ্ঞান শিক্ষার গুরুত্ব কমিয়ে তিনি গ্রিকভাষা ও অঙ্কশাস্ত্রের উপর জোর দেন। আসলে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থাকে তিনি সন্দেহের চোখে দেখতেন। প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয় *সেমন্টভোগুলির* উপরে। এ সময় স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার ঘটে। মেয়েরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্যন্ত পড়তে পারত। এছাড়া মেধাবী গরিব ছাত্রদের বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়। সাধারণভাবে রাশিয়াতে স্বাক্ষরতারও প্রসার ঘটে।

শিল্প বিভাগীয় সংস্কার ঃ অধ্যাপক *সেটন ওয়াটসন* তাঁর "দ্য ডিক্লাইন অফ ইম্পিরিয়াল রাশিয়া' গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, ভূমিদাস প্রথা উচ্ছেদ হওয়ার ফলে গ্রাম থেকে বহু সার্ফ বা ভূমিদাস কৃষিকাজ ছেড়ে শিল্প শ্রমিকের কাজ গ্রহণ করে এবং শহরে গিয়ে বসবাস শুরু করে। এটি সম্ভব হয়েছিল দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের আমলে রাশিয়াতে শিল্পায়ন প্রচেষ্টা শুরু হওয়ার ফলে। তাছাড়া নতুন পরিস্থিতিতে যে শিল্পগুলি ভূমিদাস মজুরের বদলে নগদ মজুরের উপর নির্ভরশীল ছিল তাদের বিশেষ সুবিধা হয়। রেলপথ বিস্তার এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি শিল্পায়নে সাহায্য করে। জারের এই সংস্কার উল্লেখযোগ্য। বস্ত্র শিল্প সমেত ভারী শিল্পের উদ্যোগ এতে বৃদ্ধি পায়। রাশিয়াতে শিল্পপুঁজির এক বড়ো অংশ এসেছিল রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে।

মূল্যায়ন ঃ জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের নানাবিধ সংস্কার প্রচেষ্টা রাশিয়ার ইতিহাসে ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বস্তুত পিটার দ্য গ্রেটের পরে তার মতন আভ্যন্তরীণ সংস্কারের উদ্যোগ আর কেউ নেন নি। তিনি পশ্চিম ইয়োরোপের দেশগুলির সমকক্ষ হতে চেয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত রাশিয়ার সমাজের পশ্চাদ্‌গামিতা এবং শ্রেণীবৈষম্য, জারের শাসনের স্বৈরতান্ত্রিক চরিত্র এবং শাসন কাঠামোর অগণতান্ত্রিক চরিত্রের জন্য অধিকাংশ সংস্কারই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। সন্দেহ নেই যে, সংস্কারের ফলেই কৃষক সমাজের স্বাধীনতা, জাতীয় চেতনার অগ্রগতি এবং আধুনিকতার পথ সুগম হয়েছিল। তবে সংস্কার বলবৎ করতে হলে যে আর্থিক সামর্থ্য প্রয়োজন, তা জারের ছিল না। তাছাড়া মনে রাখা দরকার যে, রাষ্ট্রের সমস্যা সমাধানের জন্য যে সৃজনশীল মন ও অন্তরের প্রসারতার প্রয়োজন তা জারের ছিল না। সর্বোপরি সংস্কার চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল উপর থেকে। এর পর 1866 খ্রিস্টাব্দে জারকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র প্রকাশ হয়ে পড়ে। তারপর থেকেই তিনি সংস্কারের বদলে প্রবল প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে ওঠেন। ফলে শেষপর্যন্ত তার রাজত্বকালে উল্লেখযোগ্য নানা সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নেওয়া সত্ত্বেও বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাজ হয় নি।

দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের বৈদেশিক নীতি ঃ ক্রিমিয়ার যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ের পর প্রথম নিকোলাসের মৃত্যুর পর জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার সিংহাসনে বসেন। তাকে প্যারিসে সন্ধি স্বাক্ষর করতে হয়েছিল। এই সন্ধির ফলে রাশিয়ার পূর্ব ইয়োরোপে অগ্রগতি ব্যহত হয়। রাশিয়া ইয়োরোপীয় রাজনীতি থেকে সাময়িকভাবে সরে গেলেও পরে দ্বিতীয় আলেকজান্ডার কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিদেশনীতিতে স্বকীয়তার পরিচয় দেন। জারের বিদেশমন্ত্রী গোচাকফ্ ইয়োরোপে স্থিতাবস্থা বজায় রেখেও রুশবিস্তার নীতি বজায় রাখার পক্ষপাতী ছিলেন।

1863 -তে পোলগণ বিদ্রোহী হলে ফরাসি সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ান বিদ্রোহীদের সাহায্য করেছিলেন। এর ফলে রাশিয়ার জারের সঙ্গে ফ্রান্সের মৈত্রী হয়। তখন জার প্রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। প্রাশিয়ার মন্ত্রী বিসমার্ক বিদ্রোহ দমনে রাশিয়াকে সাহায্য করে। এর ফলে পরবর্তীকালে জার্মানির ঐক্যসাধন সহজ হয়।

প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানি ঐক্যবদ্ধ হলে 1870 এর পর নতুন পরিস্থিতি জার্মানির চ্যান্সেলার বিসমার্ক ফ্রান্সকে কূটনৈতিক ক্ষেত্রে একঘরে করবার জন্য অস্ট্রিয়া, রাশিয়া এবং জার্মানির সম্রাটদের মধ্যে 'তিন সম্রাটের চুক্তি' (ড্রাইকাইজারবুন্ড) স্বাক্ষর করান। যদিও এর ফলে জার্মানিরই লাভ হয়েছিল, রাশিয়ার নয়।

ক্রিমিয়ার পরাজয়ের পর রাশিয়া ইয়োরোপের বদলে এশিয়াতে বিস্তার-নীতি গ্রহণ করে। জার দূর প্রাচ্যে শাখালিন দ্বীপ পুঞ্জ (1875) অধিকার করেন। চীনের মাঞ্চু সম্রাটের কাছ থেকে সাইগুনের সন্ধি দ্বারা মঙ্গোলিয়া আমুর উপত্যকা আগেই পাওয়া গিয়েছিল।

দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের আমলে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে ভ্লাডিভস্টক বন্দর স্থাপিত হলো এবং ট্রান্স সাইবেরীয় রেলপথ নির্মাণ করে তা রাজধানী সেন্ট পিটার্সবার্গের সঙ্গে যুক্ত করা হলো। মধ্য এশিয়ার তুর্কি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি রুশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করা হলো, এর ফলে আফগান সীমানা পর্যন্ত রুশ সাম্রাজ্য প্রসারিত হয়। শুধু তাই নয়, ভারতে ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসন বলবৎ থাকাতে এবং ইংল্যাণ্ডে রুশ আক্রমণের আশঙ্কা করায় ইঙ্গ-রুশ বিরোধের বীজ থেকে যায়।

1866 খ্রিস্টাব্দের অস্ট্রো-প্রাশিয়া এবং 1870 খ্রিস্টাব্দে ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়া যুদ্ধের সময় জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার নিজ স্বার্থে নিরপেক্ষ ছিলেন। 1870 খ্রিঃ সেনাদের যুদ্ধের সুযোগে জার প্যারিসের সন্ধির চাপিয়ে দেওয়া শর্তগুলি অস্বীকার করে কৃষ্ণসাগর থেকে দার্দানালিস প্রণালীর পথে পুনরায় যুদ্ধ জাহাজ ভূমধ্যসাগরে প্রবেশ করাতে সমর্থ হন। ফলে ইঙ্গ -রুশ বিরোধ বাড়ে। এরপর পূর্ব ইয়োরোপে তুরস্কের শাসনের বিরুদ্ধে শ্লাভ জাতিগুলির মুক্তি আন্দোলন বৃদ্ধি পেলে, বিশেষত বুলগেরিয়াতে খ্রিস্টানরা বিদ্রোহ করলেএবং সেই বিদ্রোহ দমনে তুর্কি সরকার অমানুষিক অত্যাচার চালালে রাশিয়া বুলগেরিয়ার সমর্থনে তুরস্ক আক্রমণ করে। তুরস্ক পরাজিত হয় এবং স্যান স্টিফানোর সন্ধি (1877 খ্রিঃ) মেনে নিতে বাধ্য হয়। তুরস্ক রাশিয়াকে বাটুম, বেসারাবিয়া এবং দোব্রুজা অঞ্চল ছেড়ে দেয়। রাশিয়ার এই অগ্রগতি ইংল্যাণ্ড ও অস্ট্রিয়া ভালোভাবে মেনে নেয় নি। পূর্ব ইয়োরোপের সমস্যা সমাধানের জন্য 1878 খ্রিঃ বিসমার্কের সভাপতিত্বে যে বার্লিন কংগ্রেস বসে কারস তাতে স্যান স্টিফানোর সন্ধির শর্ত অনেকখানি পরিবর্তন করা হয়। বাটুম, বেসারাবিয়া, কারস অঞ্চল ধরে রাখতে পারলেও দার্দানালিস প্রণালীতে রুশ জাহাজ চলাচলের অধিকার নিয়ন্ত্রিত হয়। বৃহত্তর বুলগেরিয়াকে রাশিয়ার তাঁবেদার রূপে না রেখে তা ব্যবচ্ছেদ করে রুশ প্রভাব খর্ব করা হয়। সুতরাং জারের কাছে বার্লিন কংগ্রেস ছিল কূটনৈতিক পরাজয়।

জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের বিদেশনীতি ইয়োরোপে সাফল্য না পেলেও, এশিয়াতে সাইবেরিয়া অঞ্চলে সাফল্য পেয়েছিল।

জারের শেষ জীবন : জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের শেষ জীবন সুখের ছিল না। একদিকে সদিচ্ছা সত্ত্বেও তার সংস্কারগুলির ব্যর্থতায় তিনি প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে ওঠেন। অন্যদিকে রাশিয়াতে নানা বিপ্লবী ও গুপ্ত আন্দোলন গড়ে ওঠে। এগুলির মধ্যে নিহিলিস্ট বা নৈরাজ্যবাদী এবং নারোদনিকি বা জনবাদী আন্দোলন ছিল প্রধান। জার এগুলির বিরুদ্ধে দমন নীতি গ্রহণ করেন। তিনবার জারকে হত্যার চেষ্টা করা হয় এবং চতুর্থবারে 1881 খ্রিস্টাব্দে বিপ্লবীদের বোমার আঘাতে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র তৃতীয় আলেকজাণ্ডার সিংহাসনলাভ করেন।

তৃতীয় পর্ব

উনিশ শতকের ইয়োরোপের সমাজ ও অর্থনীতি

(Society and Economy in Nineteenth Century Europe)

অধ্যায় ৯

ইংল্যাণ্ড ও ইয়োরোপীয় মহাদেশে শিল্পায়ন

(Syllabus: ***Industrial Advances in England and the Continent)***

১। সূচনা

শিল্পায়ন বলতে বোঝায় শিল্পের অগ্রগতি (Industrial advances)। এই শিল্পায়ন (industrialization) ঘটেছিল উনিশ শতকের গোড়ার দিক থেকে ইয়োরোপে। বস্তুতপক্ষে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার ফলে ইয়োরোপে এবং ক্রমে ক্রমে উত্তরকালে পৃথিবীর সর্বত্র শিল্পায়ন শুরু হয়। যেহেতু শিল্প-বিপ্লব প্রথম দেখা গিয়েছিল ইংল্যাণ্ডে এবং তার পিছনে নানা কারণও ছিল; তাই ইয়োরোপীয় দেশগুলির মধ্যে ইংল্যাণ্ডেই শিল্পায়ন শুরু হয় আগে এবং তার প্রসারও ঘটে সর্বপ্রথমে। পরে অবশ্য ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জার্মানি, হল্যাণ্ড, রাশিয়া প্রমুখ দেশেও শিল্পায়ন প্রচেষ্টা শুরু হয়। বর্তমান অধ্যায়ে ইংল্যাণ্ড এবং ইয়োরোপীয় মহাদেশে শিল্পায়নের সূত্রপাত, প্রসার এবং ফলাফল আমাদের উপজীব্য বিষয়। তা আলোচনা করার আগে শিল্প বিপ্লব বলতে কি বোঝায় এবং বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য কি, কেনই বা ইয়োরোপের মধ্যে ইংল্যাণ্ডেই প্রথম শিল্প-বিপ্লব ঘটেছিল তা আলোচনা করা দরকার।

শিল্পায়নের ফলে মানবসভ্যতার ইতিহাসে এক আমূল পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। শিল্পবিপ্লব যেমন কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ অর্থনীতির এবং কুটির বা কারিগরী শিল্পের বদলে শহরে ভারী শিল্পভিত্তিক অর্থনীতির সূচনা ক'রে মানবজাতির জীবনযাত্রা, মূল্যবোধ, আচরণ এবং সম্পর্ক বদলে দিয়েছিল, তেমনি শিল্পের অগ্রগতি সেই পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে বাস্তব রূপ দিয়েছিল। ফরাসি বিপ্লবের সময় থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ইয়োরোপের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতিতে যে আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল তার অন্যতম প্রধান কারণই ছিল শিল্পায়ন। শিল্পায়নের দুটি পর্যায় ছিল। প্রথম পর্বে এর মূল উপজীব্য ছিল বস্ত্রশিল্প এবং দ্বিতীয় পর্বে কয়লা-লোহা-ইস্পাত ব্যবহার করে একদিকে রেলপথ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি এবং অন্যদিকে প্রযুক্তিগত নানা শিল্পের বিকাশ ঘটতে থাকে। বস্ত্রশিল্পও বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় পর্যায়ে শিল্পায়নের ভিত্তি ছিল অনেক দৃঢ় এবং তা অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও বিকাশের পক্ষেও ছিল অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

আঠারো শতকের মধ্যভাগেও ইয়োরোপীয় দেশগুলির অর্থনীতির দিকে তাকালে দেখা যায় যে, তা অনেক পরিমাণে কৃষির উপরে নির্ভরশীল। গোটা আঠারো শতক ধরে অর্থনীতির অগ্রগতি লক্ষ্যণীয়। ঐ শতকের শেষ দিকে পশ্চিম ইয়োরোপে অর্থনীতির প্রগতি সত্যি চমকপ্রদ। একথা সত্য যে, অর্থনৈতিক উন্নতি সমগ্র ইয়োরোপে সমানভাবে ছড়িয়ে পড়েনি। বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছিল। বিশেষ করে সামুদ্রিক বাণিজ্যে (Maritime

trade)। এক্ষেত্রে অবশ্যই ইংল্যাণ্ড ছিল প্রধান শক্তি। তবে ফ্রান্সও একদম পিছিয়ে ছিল না। পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে হল্যাণ্ডের গুরুত্ব কমে গেলেও তখনও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার বিশেষ প্রসার ঘটেছিল। পশ্চিম ইয়োরোপের তুলনায় জার্মানি বা মধ্য ইয়োরোপ, স্পেন ও ইতালি অনেকটা পিছিয়ে ছিল। আরও পিছিয়ে ছিল রাশিয়া এবং পূর্ব ইয়োরোপ।

অধ্যাপক সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী লিখেছেন, "শতাব্দীর শেষভাগে অর্থনীতির ক্ষেত্রে সব থেকে চমকপ্রদ ঘটনা শুরু হয় ইংল্যাণ্ডে। পরে এই পরিবর্তন ক্রমশ ফ্রান্স ও ইয়োরোপের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে। উৎপাদনে যন্ত্র ব্যবহারের ফলে উৎপাদন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়। অর্থনীতির ক্ষেত্রে এই ব্যাপক ও মৌলিক পরিবর্তনকেই ঐতিহাসিক শিল্প-বিপ্লব বা প্রথম শিল্প বিপ্লব বলে।"[1] অর্থনীতিতে যে বিরাট পরিবর্তন এসেছিল তা বোঝা যায় মোট উৎপাদন ও সম্পদের পরিবর্তন থেকে। এই পরিবর্তনের মূল কারণ শিল্পায়ন। আবার এর সামাজিক প্রতিক্রিয়াও ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। শিল্প শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব ও শ্রমজীবী আন্দোলন শিল্পায়নেরই প্রতিক্রিয়া।

২। শিল্প বিপ্লব—পটভূমিকা এবং বৈশিষ্ট্য

'শিল্প বিপ্লব' কাকে বলে ঃ 'বিপ্লব' কথাটির অর্থ দ্রুত এবং আমূল পরিবর্তন। একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। জল সাধারণ অবস্থায় জল, তা গরম হলে গরম জল, ঠাণ্ডা হলে ঠাণ্ডা জল। ঠাণ্ডা কম বা বেশি হতে পারে। তখনও তা জলই থাকে। এই ক্রমিক পরিবর্তনকে বলা যায় বিবর্তন (Evolution)। কিন্তু জল ঠাণ্ডা হতে হতে যদি শূন্য ডিগ্রি তাপাঙ্কের নিচে নেমে যায় তখন তা হয়ে যায় বরফ। তখন আমরা জল না বলে বরফ বলি। এই আমূল চারিত্রিক পরিবর্তনই হলো বিপ্লব (Revolution)। সাধারণত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 'বিপ্লব' কথাটি ব্যবহার করা হয় যখন শাসনব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়।

শিল্পের ক্ষেত্রে বিপ্লব কথাটির ব্যবহার করার অর্থ শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে এমন এক পরিবর্তন যার ফলে সমাজ ও সভ্যতার রূপই বদলে গেল। শিল্প বিপ্লবের সংজ্ঞা হিসেবে তাই বলা যায়, *পুরাতন কুটির এবং কারিগরী শিল্প উৎপাদন ধারার পরিবর্তে আমূল পরিবর্তনশীল এমন এক যান্ত্রিক শিল্প উৎপাদন পদ্ধতি, যার বিকাশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসারের সঙ্গে যুক্ত এবং যার ফলে সমাজের মানুষজনের পারস্পরিক সম্পর্কের ধারার পরিবর্তন ঘটেছে।* জন সংখ্যার তাৎপর্যপূর্ণ বৃদ্ধি, বাণিজ্যের প্রসার ও মূলধনের সঞ্চয় ও বিনিয়োগ, কৃষির উন্নতি ইত্যাদি একদিকে সামাজিক-রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এবং অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শিল্প উৎপাদনে যে চরিত্রগত পরিবর্তন ঘটায় তাই **'শিল্প বিপ্লব'** নামে পরিচিত।

1. সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ 56

শিল্প-বিপ্লবের কাল : সাধারণভাবে দুটি কথা ধরে নেওয়া হয়। এক, শিল্প বিপ্লব প্রথম দেখা দিয়েছিল ইংল্যাণ্ডে এবং দুই ,1750 খ্রিঃ থেকে 1850 খ্রিঃ পর্যন্ত যুগকেই শিল্প বিপ্লবের কাল বলা চলে। প্রথম কথাটি নিয়ে বিতর্ক নেই। কিন্তু দ্বিতীয় কথাটির ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকরা একমত নন। *আর্নল্ড টয়েনবি*-র মতে 1740 থেকে 1760 খ্রিঃ ছিল বিপ্লবের সূচনা কাল (Take off stage)। কিন্তু *ফিলিস ডীন* এর মতে 1760-1780 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ধরা উচিত। কোল্, হবসব্যম, রস্টো প্রমুখ মোটামুটি এই মতের সমর্থক। আবার নেফ প্রমুখ ঐতিহাসিক নির্দিষ্ট কালসীমা নির্ণয়ের বিরুদ্ধে।

কুটির এবং কারিগরি শিল্পের বদলে শিল্প অর্থনীতি যখন থেকে কল-কারখানাকেন্দ্রিক হয়ে উঠতে থাকে তখনই শিল্প বিপ্লবের সূচনা কাল বলে *রস্টো* (*W.W. Rostow*) মনে করেন। *নেফ* (*J. U. Nef*) অবশ্য শিল্প বিপ্লবের সূচনা কালকে পিছিয়ে ইংল্যাণ্ডের ক্ষেত্রে টিউডর-স্টুয়ার্ট যুগের কালকে ধরেছেন। কিন্তু তা সমর্থনীয় নয়, কারণ তখন শিল্প-বিপ্লব প্রকৃত অর্থে শুরু হয়নি। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে কাজে লাগিয়েই বিপ্লব ঘটে। বিশেষত বাষ্পীয় শক্তির আবিষ্কার। শিল্প উৎপাদনের যন্ত্রগুলি বাষ্পীয় শক্তির সাহায্যে চলার ফলে উৎপাদন শত সহস্রগুণ বৃদ্ধি পায়। এই উৎপাদন এবং ব্যবস্থায় বিপ্লব বৃহত্তর শিল্প-বাণিজ্যের বিপ্লব এবং পরিণামে সমাজবিপ্লব ঘটায়। অধ্যাপক *ডেভিড টমসনের* মতে, প্রকৃতির সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত হয়ে শিল্প উৎপাদনের এই বিরাট ও গভীর মূল পরিবর্তনই শিল্প বিপ্লব।[1] ব্যাপক অর্থে তার কাল 1750 থেকে 1850 খ্রিস্টাব্দ।

• **শিল্প বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য :** 1837 খ্রিস্টাব্দে ফরাসি দার্শনিক অগস্ট ব্লাঁকি শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনকে লক্ষ্য করে শিল্প বিপ্লব কথাটি ব্যবহার করেন। এরপর ফ্রেডরিক এঙ্গেলস্ (1844), কার্ল মার্ক্স (1867) সহ অনেকেই শব্দটি ব্যবহার করেন। ঐতিহাসিক *টয়েনবি* তাঁর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতায় শব্দটি গ্রহণ করেন। তবে উত্তরকালে অনেক ঐতিহাসিক যেমন দ্রুত শিল্পায়ন ও তার ফলাফলকে 'বিপ্লব' আখ্যা দিতে নারাজ, তেমনি বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য নিয়েও নানা মত আছে।[2]

'শিল্প বিপ্লব' কথাটি ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবি-ও 1880-81 খ্রিস্টাব্দে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতামালায় ব্যবহার করেন। যাইহোক, 'শিল্প বিপ্লব' কথাটির সংজ্ঞা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। *ফিশার* মনে করেন, "দৈহিক শ্রমের পরিবর্তে

---

1. ডেভিড টমসন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ 140-41.

2. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্র. T.S. Ashton. *The Industrial Revolution* 1760-1830 ; E. J. Hobsbawm. *Industry and Empire* ; D S. Landes, *The Unbound Prometheus: Technological change in Europe since* 1750; P Deane, *The First Industrial Revolution*।

যন্ত্রশক্তির দ্বারা শিল্পসামগ্রীর উৎপাদনকে শিল্প-বিপ্লব বলা হয়।" কিন্তু লক্ষ্য করা যায় শুধুমাত্র যন্ত্রের আবিষ্কার ও উৎপাদনক বৃদ্ধির মাধ্যমে শিল্প-বিপ্লব হয় না। *ফিলিস ডীন*-এর মতে শিল্প-বিপ্লবে বহু বিষয় জড়িয়ে থাকে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান এবং এর সঙ্গে প্রযুক্তিবিদ্যার সমন্বয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজার, পরিবহন, যোগাযোগ ব্যবস্থা, চাহিদা-যোগান, পুঁজি বিনিয়োগ ইত্যাদি নানা উপাদান শিল্প বিপ্লবের সঙ্গে জড়িত। ফিলিস ডীনের মতে এসবের সমন্বিত যোগাযোগকে শিল্প-বিপ্লব বলা যেতে পারে। শিল্প-বিপ্লব গতানুগতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন ঘটায়। শিল্প-বিপ্লবের সঙ্গে মানুষের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী। *কার্লো সিপোলার* মতে, শিল্প-বিপ্লব মানুষকে কৃষক-পশুপালক থেকে উন্নত করেছিল বাষ্পচালিত যন্ত্রের পরিচালকদের স্তরে।[1] যাই হোক, শিল্প-বিপ্লবের বৈশিষ্ট্যগুলিকে কয়েকটি সহজসূত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়, যেমন—(ক) শিল্প-পুঁজির বিনিযোগ দ্বারা বৃহৎ কলকারখানা স্থাপন; (খ) যান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার মাধ্যমে শিল্প-উৎপাদনের প্রাচুর্য; (গ) এই উৎপাদন প্রক্রিয়াতে মজুরির বিনিময়ে শ্রমিকদের নিয়োগ; (ঘ) মূলধন এবং শ্রমিক ছাড়াও উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল যোগাড় করা; (ঙ) মালপরিবহনের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং (চ) উৎপাদিত পণ্য বাজারে বিক্রি করে মুনাফা অর্জন। অর্থনীতির ক্ষেত্রে পরিবর্তিত অবস্থায় এই বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল বলেই তাকে শিল্প-বিপ্লব বলা হত।

শিল্প-বিপ্লব ইংল্যাণ্ডে প্রথম হয়েছিল কেন ঃ একথা ঐতিহাসিক সত্য যে, ইংল্যাণ্ডেই প্রথম শিল্প-বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল। সর্বপ্রথম ইংল্যাণ্ডে শিল্প বিপ্লব ঘটবার কতকগুলি কারণ ছিল। প্রথমতঃ, পঞ্চদশ শতকের শেষ ও ষোড়শ শতকের প্রথমভাগে ভৌগোলিক আবিষ্কার ইয়োরোপীয় উপকূলবর্তী বণিকদের সমুদ্র যাত্রা, উপনিবেশ স্থাপন বহির্বাণিজ্যে উদ্বুদ্ধ করে। স্পেন ও পর্তুগাল প্রথম স্তরে অগ্রণী হলেও শেষ পর্যন্ত নতুন দেশ আবিষ্কার, উপনিবেশ স্থাপন ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইংল্যাণ্ড সর্বাধিক সাফল্য অর্জন করে। শিল্প বিপ্লবের অনেক আগে থেকে ইংল্যাণ্ডের বণিকরা ভারত, চীন ও আমেরিকা উপনিবেশের সঙ্গে বাণিজ্যের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন ক'রে এবং প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ ও সঞ্চয় করতে সক্ষম হয়। এই মুনাফা ও মূলধন ছিল শিল্প-বিপ্লবের ক্ষেত্রে পরমসহায়ক।

দ্বিতীয়তঃ, ঔপনিবেশিক বাণিজ্যে সাফল্যবাদের সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যাণ্ড মনোনিবেশ করে ঐ মূলধন স্বদেশে শিল্প সামগ্রী উৎপাদনের দিকে বিনিয়োগে। ইংল্যাণ্ডের সরকার এই ব্যাপারে শিল্পপতিদের উৎসাহ ও স্বাধীনতা দিত। ইংল্যাণ্ডের উপনিবেশগুলি থেকে কাঁচামাল আমদানি করা ও শিল্পজাত সামগ্রী উপনিবেশের বাজারে বিক্রয় করার সুবিধার ফলে ইংল্যাণ্ডের শিল্প-বিপ্লব তরান্বিত হলো।

---

1. দ্র. সি. এম. সিপোলা (সম্পা), ফনটানা ইকনমিক হিস্ট্রি অফ ইয়োরোপ

তৃতীয়তঃ, কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে শ্রমিকের প্রয়োজন হয় না, কেননা তাতে যুক্ত থাকে শিল্পের মালিক স্বয়ং অথবা কারিগরগণ। কিন্তু কলকারখানার ভারী শিল্পের জন্য প্রয়োজন বিপুল সংখ্যায় শ্রমিক সরবরাহ। ইয়োরোপের অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ইংল্যাণ্ড এই সুবিধা প্রথমেই পেয়ে গেল। ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ইংল্যাণ্ডেই প্রথম ভূমিদাস প্রথা লোপ পেয়েছিল; সামন্ততন্ত্রের অবসান হয়েছিল। এই কৃষি শ্রমিকরা প্রথমে গ্রাম ছেড়ে শহরে কলকারখানার কর্মের সন্ধানে আসে। আবার সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে ইংল্যাণ্ড সহ ইয়োরোপের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে ইংল্যাণ্ডে বাড়তি মানুষ একত্র হওয়ায় শিল্প-কারখানার জন্য শস্তায় শ্রমিক প্রাপ্তির সুবিধা অনেক বেড়ে গেল।

চতুর্থতঃ, টিউডর বংশের রাজত্বকালে (1485-1603) ইংল্যাণ্ডে নানা দিক থেকে পরিবর্তন এসেছিল। এই যুগেই যাজক ও সামন্ত শ্রেণীর প্রভুত্ব লোপ পায়। নৌশক্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় এই যুগেই উপনিবেশ বিস্তার ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। ইয়োরোপের যে-কোনও দেশের তুলনায় ইংল্যাণ্ডের সমাজ ছিল গতিশীল। এখানকার অভিজাতরাও ধনী-বণিক গোষ্ঠীর সঙ্গে শিল্পের উন্নয়নমূলক কাজে নিজেদের ব্যাপৃত করেন। স্টুয়ার্ট যুগে (1603-1714) ব্যবসা-বাণিজ্য তথা নতুন বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রভাব আরও বাড়ে। মূলধনী শ্রেণীর ক্ষমতা সুদৃঢ় হয়।

পঞ্চমতঃ, ইংল্যাণ্ডের প্রাকৃতিক পরিবেশ ছিল শিল্প-বিপ্লবের অনুকূল। বিশেষত ইংল্যাণ্ডের আদ্র জলবায়ু বয়ন শিল্পের পক্ষে উপযুক্ত ছিল। সমুদ্র কাছে থাকায় যোগাযোগের সুবিধা হয়।

ষষ্ঠতঃ, ইংল্যাণ্ডের সমাজব্যবস্থা গতিশীল হওয়ায় এখানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অভাবনীয় সমন্বয়-ঘটেছিল। ইংল্যাণ্ডে ছিল উদ্যোগী শিক্ষিত মানুষের আধিক্য। এই উদ্যোগী শ্রেণী মূলধন, বাজার, কাঁচামাল, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা, শস্তায় শ্রমিকের যোগান ইত্যাদি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মামুলী যন্ত্রপাতির পরিবর্তে নতুন নতুন যন্ত্র আবিষ্কার, যন্ত্রের জন্য কারখানা সৃষ্টি ও উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে মনোনিবেশ করতে পেরেছিল। অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার শিল্প-বিপ্লবের অন্যতম প্রধান কারণ। শুধুমাত্র প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক কারণ বা সামাজিক-রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা দিয়ে শিল্প-বিপ্লবের ব্যাখ্যা করা যায় না। তবে ইংল্যাণ্ডের আরও কতকগুলি বৈশিষ্টের দিকে প্রসঙ্গক্রমে দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে। যেমন, গৌরবময় বিপ্লবের পর উদ্যমী পিউরিটান সম্প্রদায়ের আর্থিক বিকাশের আকাঙ্খা, কেবল জ্যেষ্ঠ পুত্রের পিতার সম্পত্তির অধিকারী হওয়ার আইন এবং আধুনিক ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার সূত্রপাত ইত্যাদি। এসবই মূলধনী সম্প্রদায়ের উদ্ভবের ক্ষেত্রে কাজ করেছিল।

সর্বশেষে বলা যায় যে, উপরোক্ত কারণগুলি ছাড়াও *এরিক হবসবৃ্যম* আরও কতকগুলি অর্থনৈতিক কারণ নির্দেশ করেছিলেন। শিল্প-বিপ্লবের প্রসঙ্গে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও যন্ত্রের ব্যবহার ছিল একটি অপরিহার্য বিষয়। কিন্তু শিল্প-বিপ্লবের প্রধান সহায়ক ছিল ইংল্যাণ্ডের কৃষি বিপ্লব। অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষের ফলে দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধি। কৃষির সঙ্গে সঙ্গে পশুপালনেও বিজ্ঞান সম্মতব্যবস্থা গৃহীত হলো। এর ফলে কৃষিক্ষেত্রে

উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুধ, মাংস, চামড়া ইত্যাদির সরবরাহ বহুগুণ বৃদ্ধি পেল। কৃষি ও পশুপালনে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য উৎপাদনও বাড়ল। খাদ্যের দিক থেকে স্বয়ম্ভর হওয়াতে ইংল্যাণ্ড অতি সহজে শিল্প-বিপ্লবকে সার্থক করতে সক্ষম হলো এবং একই সঙ্গে ঘটল জনসংখ্যা বৃদ্ধি।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, শিল্পবিপ্লব এবং শিল্পায়ন ঃ ইংল্যাণ্ডে শিল্প বিপ্লবের সূচনা হলেও এর অগ্রগতিতে দুটি পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। প্রথম পর্যায় 1760 থেকে 1815 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় পর্যায় 1815 খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে ইংল্যাণ্ডে ভারী শিল্পের উদ্ভব, বিশেষত বয়ন শিল্পে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটে। লৌহ ও ইস্পাত শিল্পেও উন্নতি হয়। এই সময় ইংল্যাণ্ডে নানা বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত আবিষ্কার এ ব্যাপারে সহায়ক হয়।

রবার্ট বেকওয়েল বৈজ্ঞানিক উপায়ে পশুখাদ্য ও সার আবিষ্কার করেন ; ফলে কৃষির উন্নতি ঘটে। ইংল্যাণ্ডে শিল্প বিপ্লবের পক্ষে বাষ্পশক্তির আবিষ্কার এক যুগান্তকারী ঘটনা। ঐতিহাসিক *ডেভিড টমসনের* মতে, 'বাষ্পশক্তি চালিত ইঞ্জিনের ব্যবহারই ছিল শিল্প-বিপ্লবের ভিত্তি।' 1767 খ্রিস্টাব্দে জেমস্ ওয়াট বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন। তবে বয়ন শিল্পেই আবিষ্কার ও যন্ত্রের প্রভাব প্রথম পরিলক্ষিত হয়। 1733 খ্রিঃ জন কে ফ্লাইং শাটল্ বা দ্রুত চলমান স্বয়ংক্রিয় মাকু আবিষ্কারের ফলে বস্ত্র উৎপাদনের ক্ষেত্রে তাঁতিদের দক্ষতা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। এরপর ক্রমে জেমস্ হারগ্রীভস্ আবিষ্কার করলেন 'স্পিনিং জেনি' বা সুতো তৈরির যন্ত্র (1754 খ্রিঃ) । রিচার্ড আর্করাইট আবিষ্কার করেন ওয়াটার ফ্রেম (1769 খ্রিঃ) বা জলচালিত কাপড় তৈরির যন্ত্র। তারপর স্যামুয়েল ক্রপটন আবিষ্কার করেন 'স্পিনিং মিউল' (1779) এবং এডমণ্ড কার্টরাইট বাষ্পচালিত তাঁত বা 'পাওয়ারলুম' আবিষ্কার করলে (1780) অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটে।

অন্যদিকে 1793 খ্রিঃ আমেরিকাতে অ্যানি হুইটনি তুলো থেকে অতি দ্রুত বীজ ছড়াবার যন্ত্র 'কটন জিন' আবিষ্কার করেন। 1760 খ্রিঃ জন স্টীটন আবিষ্কৃত লৌহগলানোর চুল্লি বা 'ব্লাস্ট ফার্নেস' আবিষ্কারের পর লৌহশিল্পের যুগ শুরু হয়। জেমস্ ওয়াটের বাষ্পীয় ইঞ্জিনের পর আর এক যুগান্তকারী আবিষ্কার জর্জ স্টীফেনসন কর্তৃক রেলইঞ্জিন আবিষ্কার (1814) ; তার আগেই বাষ্পীয় শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ম্যাথুবোস্টন ও জেমস্ ওয়াট বেশ কিছু বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন। একইভাবে মেটকফ, জন ম্যাকাডস্, টমাস টেলফোর্ড প্রমুখ ব্যক্তিরা খালখনন, পিচের রাস্তা, পাকা সেতু ইত্যাদি নির্মাণকৌশল আবিষ্কার করেন। 1815 খ্রিঃ হামফ্রি ডেভি 'সেফটি ল্যাম্প' আবিষ্কার করায় কয়লা ও লৌহখনিতে কাজ করা সহজ হয়। সিমিংটন, রবার্ট ফুলটন, হেনরি বেল প্রমুখের দ্বারা ক্রমে বাষ্পীয় জলযান আবিষ্কার হলো। রেলগাড়ি ও স্টীমার পরিবহন ব্যবস্থায় বিপ্লব ঘটালো। সুতরাং নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার শিল্প বিপ্লবের যেমন সহায়ক হয়েছিলো, তেমনি এরপরই শুরু হলো শিল্পায়নের যুগ বা শিল্প উদ্যোগের যুগ।

শিল্পক্ষেত্রে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ঢেউ এলো তার পিছনে শুধু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার নয়, নানাবিধ আর্থনীতিক পরিবর্তনের প্রভাব ছিল। স্বাভাবিক কারণেই পরিবর্তনের জোয়ার অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রকেই স্পর্শ করে। সুতরাং 'শিল্প বিপ্লব' কথাটিতে আপত্তি করা অর্থহীন। অধ্যাপক *নেফ* মনে করেন যে, শিল্প বিপ্লব এক দীর্ঘ প্রক্রিয়া। অধ্যাপক *ফিশার (F. G. Fisher)* সপ্তদশ শতকের আর্থনীতিক উন্নতি ও সামাজিক পরিবর্তনকে আঠারো শতকের পরিবর্তনের পূর্বশর্ত হিসেবে দেখেছেন। তবু 1750-1850 -এর মধ্যবর্তী পরিবর্তন ব্যপ্তিতে ছিল চূড়ান্ত, বিশেষত বস্ত্র, যন্ত্র বা লৌহশিল্পে। ইতিহাসবিদরা দেখিয়েছেন যে, 1780 খ্রিঃ-র পর থেকেই ব্রিটেনের শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি পায় অনেক বেশি যা পর্যায় ক্রমে বাড়তে থাকে। এই গতিবৃদ্ধিকেই বলা হয় দ্রুত আরম্ভের যুগ বা 'টেক অফ স্টেজ'। এরপর শিল্পায়ন থেমে থাকেনি। ব্রিটেনের অর্থনীতিতে যে পরিবর্তনের সূচনা হলো তার প্রভাব সমাজকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। ক্রমে শিল্পায়ন ইয়োরোপের নানা দেশে প্রসারিত হয়। এর ফলে সমাজ ও সভ্যতায় নাটকীয় পরিবর্তন হয়। *কার্লো সিপোলা* মন্তব্য করেছেন যে, "No revolution has been as dramatically revolutionary as the Industrial Revolution"। *এরিক হবস্‌বম* -এর মতে মানবজীবনে সব চেয়ে মৌলিক পরিবর্তন এনেছিল শিল্পবিপ্লব ("The most fundamental transformation of human life")। তবে শিল্পায়ন প্রক্রিয়াতে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে ইয়োরোপীয় দেশগুলির যথেষ্ঠ পার্থক্য ছিল।

৩। ইংল্যাণ্ডে শিল্পায়ন

শিল্পায়নের পটভূমি ঃ আগেই বলা হয়েছে যে, জনসংখ্যার তাৎপর্যপূর্ণ বৃদ্ধি, বাণিজ্যের প্রসার, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, মূলধনের সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ইত্যাদি আর্থনীতিক পরিবর্তন সামাজিক-রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে পশ্চিম ইয়োরোপে অর্থনীতির চেহারা বদলে দিয়েছিল। এর মধ্যে অগ্রণী ছিল ইংল্যাণ্ড। ক্ষেত্র ও পরিকাঠামো অনুকূল থাকায় সেখানেই শিল্প-বিপ্লব ঘটে প্রথম। এই বিপ্লবকে কাজে লাগিয়েই শিল্পায়ন বা শিল্পের অগ্রগতি চলতে থাকে। সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী লিখেছেন: "পরিবর্তনের সব থেকে চমকপ্রদ ফল লক্ষ্য করা যায় শিল্পে এবং শিল্পে যন্ত্রের ব্যবহারে। আর্থনীতিক প্রয়োজন নতুন উদ্ভাবনের প্রেরণা যুগিয়েছিল। নতুন আবিষ্কৃত যন্ত্রসমূহ ও নতুন চালিকা-শক্তি (যেমন বাষ্প) শিল্প উৎপাদনে প্রযুক্ত হয়ে সমাজ ও অর্থনীতিতে মৌলিক পরিবর্তন এনেছিল।"[1]

কেন ব্রিটেন শিল্পে অগ্রণী হলো তার কিছু কারণও আছে। বাণিজ্যিক অগ্রগতির ফলে ইংল্যাণ্ডের শিল্পজাত সামগ্রীর জন্যে একটা বিশেষ চাহিদা সৃষ্টি হয়েছিল। এই বর্ধিত

1. সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ 76

চাহিদা পুরাতন উৎপাদন ব্যবস্থায় মেটানো সম্ভব ছিল না। আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক উভয়বিধ চাহিদা ছিল। নতুন আবিষ্কারের এবং শিল্পে এই সব নতুন যন্ত্রের ব্যবহারের ফলেই উৎপাদন অনেক বেড়ে যায় এবং বর্ধিত চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয়। আঠারো শতকের মাঝামাঝি ইয়োরোপীয় দেশগুলিতে মোটামুটি একই ধরনের প্রযুক্তি থাকলেও, উন্নত প্রযুক্তির এবং শিল্পে ব্যাপক যন্ত্রের ব্যবহারের ফলেই ইংল্যাণ্ডে শিল্পের অগ্রগতি সম্ভব হয়। তাছাড়া আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি যে, ইংল্যাণ্ডের কিছু কিছু বিশেষ সুবিধা ছিল। ইংল্যাণ্ডের সমাজ, ইতিহাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ অর্থনীতির সহায়ক ছিল। যেমন, (1) ব্রিটেনের মানসিক ও চিন্তার পরিবেশ অন্যান্য দেশ থেকে আলাদা, (2) বিজ্ঞানচর্চার প্রসারের ফলে অর্থনীতি সম্পর্কেও একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা সহজ হওয়া; (3) বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কাজে লাগানো। ব্রিটেনে ভূ-স্বামী অভিজাতরা উদ্বৃত্ত অর্থ শিল্পে বিনিয়োগে উৎসাহী ছিল। সম্পদশালী এক মূলধনী শ্রেণীর উদ্ভব, ধর্মীয় স্বাধীনতা, ঔপনিবেশিক শক্তি, বৈদেশিক বাণিজ্য শিল্পায়নে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে যে মুনাফা পাওয়া গেল তা নতুন যন্ত্র আবিষ্কারের জন্য, কলকারখানা স্থাপনের জন্য ও মূলধন হিসেবে বিনিয়োগ করা হয়েছিল। সমুদ্র পারের উপনিবেশ এবং বাজারগুলিতে ব্রিটেনের পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়, এই চাহিদা মেটানোর জন্য নতুন প্রযুক্তির প্রয়োজন হলো। অধ্যাপক এরিক হবস্‌ব্যম দেখিয়েছিলেন যে 1700 থেকে 1750 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে যে-সব শিল্প শুধুমাত্র ব্রিটেনের আভ্যন্তরীণ বাজারের কথাভেবে উৎপাদন করত তাদের বৃদ্ধির হার ছিল 7% অথচ যে শিল্পের লক্ষ্য ছিল রপ্তানি তাদের উন্নতির হার ছিল 76%। এই বৃদ্ধির অনুপাত 1750-80 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে যথাক্রমে সাত থেকে এবং আশি শতাংশ। তবে শিল্পায়নের পিছনে আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক দু'ধরনের বাজারের চাহিদাই পটভূমি সৃষ্টি করেছিল। বস্তুতপক্ষে কোনও একটি কারণ দিয়ে ইংল্যাণ্ডের শিল্পায়নকে ব্যাখ্যা করা অযৌক্তিক। মোটামুটি ইংল্যাণ্ডে শিল্পায়নের পিছনে বিশেষভাবে যে পটভূমিকা মনে রাখা দরকার তা হলো, পরিবর্তনশীল সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, শিক্ষার বিস্তার, ক্রমবর্ধমান বৈদেশিক বাজার, বর্ধিত জনসংখ্যা, কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধি, আভ্যন্তরীণ চাহিদা, মূলধনের সঞ্চয়, মূলধনী শ্রেণীর প্রভাব বৃদ্ধি, উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা এবং নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। সব মিলে ইংল্যাণ্ডে আর্থনীতিক পরিবর্তনের জোয়ার এসেছিল। তাছাড়া একইরকম গুরুত্বপূর্ণ ছিল প্রাকৃতিক সম্পদ, খনিজ, ধাতু ও কাঁচামালের যোগান, আবহাওয়ার আনুকূল্য।

ইংল্যাণ্ডে শিল্পায়ন (1760-1800 খ্রিঃ) অর্থাৎ ইংল্যাণ্ডের শিল্পের অগ্রগতির প্রথম পর্ব বা Take off Stage ছিল আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধ; রক্ষণশীল মতে 1760-80 খ্রিঃ। এই সময়ে শিল্প-বিস্তারের এক নিরবিচ্ছিন্ন গতি লক্ষ্য করা যায়। ইংল্যাণ্ডের কয়লা এবং আকরিক লোহা প্রচুর পরিমাণে ছিল। কয়লাখনিগুলি ছিল জলের কাছাকাছি। তাই খনিজ

এবং জল সম্পদ ব্যবহার করা সহজ হয়েছিল। টিন ও তামাও ছিল প্রচুর। তবে একটি সমস্যা ছিল জ্বালানীর, কেননা লোহা গলাবার জন্য কাঠ কয়লার অভাব ছিল। ডারবি (Darby) যখন কাঠকয়লার পরিবর্তে খনিজ জ্বালানী বা কয়লা দিয়ে লোহা গলানোর প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করলেন তখন এই সমস্যা দূর হলো। শিল্পের অগ্রগতিতে এর গুরুত্ব অপরিসীম। এর ফলে ধাতু শিল্পের অগ্রগতি তড়ান্বিত হলো।

এরপর বাষ্পীয় শক্তির ব্যবহার শিল্প বিপ্লবের ক্ষেত্রে প্রকৃত বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে এলো। নতুন যন্ত্রের আবিষ্কার ইংল্যাণ্ডের শিল্প বিপ্লবের সূচনা করলেও মনে রাখা দরকার, এই বিপ্লব মূলত বস্ত্রবিপ্লব। এই প্রসঙ্গে *হবস্‌ব্যম* -এর একটি সুন্দর মন্তব্য আছে— "ইংল্যাণ্ডে শিল্পবিপ্লব বলতে একমাত্র বোঝায় বস্ত্র এবং বস্ত্র এবং বস্ত্র"। 1785-তে সূতিবস্ত্র শিল্পে প্রথম বাষ্পচালিত সুতো বানানোর যন্ত্র চালানো হয়; 1765 থেকে ইংল্যাণ্ডে তুলো আমদানি ক্রমশই বাড়তে থাকে, উৎপাদনও ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। আবার ইংল্যাণ্ড থেকে যে-সব পণ্য রপ্তানি হত তার অর্ধেকেরও বেশিই ছিল বস্ত্রশিল্প জাত। একাজে জেমস্ ওয়াটের বাষ্পীয় ইঞ্জিন নতুন শক্তি (energy) ব্যাপকভাবে প্রয়োগের সূচনা করে। ধাতু শিল্পেও তা কাজে লাগে। ওয়াটের আবিষ্কার কাজে লাগিয়ে 1800 খ্রিঃ নাগাদ বোলটন অ্যাণ্ড ওয়াট কোম্পানি 500 ইঞ্জিন তৈরি করে।

শিল্পায়ন—উনিশ শতকের সংযোজন ঃ ইংল্যাণ্ডের শিল্প বিপ্লব প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, উনিশ শতকে নতুন নতুন আবিষ্কার শিল্পায়নকে আরও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। যেমন, খনি থেকে কয়লা উত্তোলন প্রসঙ্গে শ্রমিকদের কোনও নিরাপত্তা ছিল না। 1815 খ্রিস্টাব্দে হামফ্রি ডেভি 'সেফটি ল্যাম্প' আবিষ্কার করার ফলে খনিতে শ্রমিকদের জীবন নিরাপদ হলো। বাষ্পচালিত রেল ইঞ্জিন নির্মাণের পর (1814) পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে রেলপথের ব্যাপক সম্প্রসারণ শুরু হলো (1825)। অনতিবিলম্বে ম্যাঞ্চেস্টার থেকে লিভারপুল পর্যন্ত রেললাইন পাতা হলো। 1850 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রায় 6000 মাইলেরও বেশি দৈর্ঘ্য রেলপথে ট্রেন যাতায়াত করতে শুরু করে। তারপর রেলপথ সংক্রান্ত আইনগুলি পার্লামেন্টে পাস করা হয়। জেমস্ ওয়াট কর্তৃক বাষ্পচালিত ইঞ্জিন আবিষ্কারের পর থেকেই বিভিন্ন কলকারখানায় যন্ত্রপাতি, খনিজ সামগ্রী উত্তোলন, রেল চালনা, বাষ্পীয় পোতচালনা ইত্যাদির জন্য উন্নততর বাষ্পীয় ইঞ্জিন তৈরি হতে থাকে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাষ্পীয় পোত ছিল অপরিহার্য সামগ্রী। জাহাজগুলিকে টেকসই ও মজবুত করার উদ্দেশ্যে ইস্পাত যেমন ব্যবহার করা হলো তেমনি জাহাজে মালপত্র ওঠানো নামানোর জন্যও তৈরি হলো বাষ্পচালিত মেসিন। অবশেষে কয়লাচালিত ইঞ্জিনের পরিবর্তে এলো ডিজেল চালিত ইঞ্জিন। যোগাযোগ ও যানবাহন পরিচালনার ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ ব্যবহারের পূর্বাবধি এটি ছিল উন্নততর জ্বালানী। 1860 খ্রিস্টাব্দের পর অবশ্য গ্যাসের আবিষ্কার ও ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এরপর পরবর্তী দশ বছরের মধ্যে

বিদ্যুতের আবিষ্কার ও ব্যবহার আরও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। শিল্পায়নের ক্ষেত্রে-তার ব্যবহার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। বৈদ্যুতিক যুগে পৌঁছে শিল্পায়ন সত্যিই আধুনিক যুগে পদার্পণ করল। বিদ্যুতের মত জ্বালানি হিসেবে প্রেট্রোলিয়ামের ব্যবহার শিল্প বিপ্লবকে আরও তরান্বিত করে তুললো। পরবর্তী দুটি মহাযুদ্ধে যেসব যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণের কারখানা গড়ে ওঠে তার পেছনেও ছিল এই শিল্প-বিপ্লবেরই অবদান।

ফ্যাক্টরি প্রথা ও শিল্পে ইংল্যাণ্ডের অগ্রগতি ঃ বিশ্বের যে-কোনও দেশের মতো শিল্প-বিপ্লবের পূর্বে ইংল্যাণ্ড ছিল কৃষিনির্ভর এবং কুটির শিল্পের দেশ। কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে কারিগর নিজেই ঘরে বসে পণ্য সামগ্রী উৎপাদন করত। তাকে অন্যের উপর নির্ভর করতে হত না। কিন্তু শিল্প-বিপ্লবের প্রাথমিক স্তরে নানা যন্ত্রপাতির ব্যবহার যখন আবিষ্কৃত হলো তখন ঐ যন্ত্রের সাহায্যে অধিক উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ছোট কারখানা স্থাপনের প্রয়োজন হলো। এই সময় কারখানার মালিক নিজ গৃহে কারখানা স্থাপন করে সামগ্রী উৎপাদন করত। প্রয়োজন অনুসারে শ্রমিক বা সহায়ক কর্মী নিয়োগ করাও হত।

বাষ্পচালিত যন্ত্রাদি আবিষ্কারের পর বৃহদায়তন কারখানা স্থাপনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এরূপ ক্ষেত্রে কারখানা ও পরিচালনার জন্যে প্রয়োজন জমি, মূলধন, শ্রমিক, মালিক ও তত্ত্বাবধায়কদের সংগঠন, শ্রমদানের রীতিনীতি, কাঁচামালের যোগান, উৎপাদিত সামগ্রীর ব্যবহার, ব্যাংকিং প্রথা, জয়েন্ট স্টক বা যৌথ কোম্পানি ইত্যাদি। এই সামগ্রিক ব্যবস্থাপনাই হলো 'কারখানা প্রথা' (Factory System)। শিল্পায়নের ফলে ইংল্যাণ্ডে বয়ন শিল্প, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, রেল, জাহাজ নির্মাণ ইত্যাদি শিল্পের কারখানা ও সংশ্লিষ্ট রীতিনীতি গড়ে উঠল। *ফিশার* মন্তব্য করেছেন যে, "ইংল্যাণ্ড বিশ্বের শিল্পকারখানায় পরিণত হয়েছে।" ইংল্যাণ্ডের নানাস্থানে বয়নযন্ত্রের কারখানা স্থাপিত হয়। এক্ষেত্রে অন্যতম উল্লেখযোগ্য স্থান হলো ম্যানচেস্টার। শেফিল্ড, বার্মিংহাম, ল্যাঙ্কাশায়ার প্রভৃতি অঞ্চলে বড়ো বড়ো লোহার কারখানাও গড়ে ওঠে।

আনুষঙ্গিক অগ্রগতি ঃ শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে পরিবহন ব্যবস্থারও অগ্রগতি হয়। টেলফোর্ড ও ম্যাকাডাস পিচের রাস্তা তৈরির কৌশল আবিষ্কারের পর দ্রুত সড়ক নির্মাণ শুরু হয়। তারপর 1813 খ্রিঃ উইলিয়াম হেডলি 'পাফিং বিলি' নামে একটি গাড়ির ইঞ্জিন নির্মাণ করেন। 1814 খ্রিঃ জর্জ স্টিফেনসন রেল ইঞ্জিনের প্রথম মডেল বানান। ক্রমে তার উন্নতি ঘটে, শুরু হয় রেলপথ নির্মাণ। 1870 খ্রিঃ ফুলটন বাষ্পচালিত নৌকা আবিষ্কার করেন এবং পরে নির্মিত হয় বাষ্পীয় পোত। ফলে শুধু দেশের মধ্যেই নয়, আন্তর্জাতিক যোগাযোগও বাড়ে। শিল্পায়নের গতি দ্রুত হয়। অন্যদিকে ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রসার ঘটলে মূলধনের বা পুঁজির সরবরাহ বাড়ে। হোপ, লাফিট, রথচাইল্ড, পিয়ের ব্রাদ্রার্স, ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যাণ্ড প্রমুখ শিল্পে মূলধন যোগান দেয়। ফলে কল-কারখানা আরও বাড়তে থাকে।

শিল্পের অগ্রগতি ঃ শিল্পের অগ্রগতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিল বস্ত্রশিল্পের উন্নয়ন। তাছাড়া ছিল কয়লা লৌহ ও যন্ত্র শিল্প। 1850 খ্রিঃ নাগাদ শুধু ইংল্যাণ্ড নয়, সমগ্র গ্রেট বিট্রেনের প্রায় 25 লাখ লোক বস্ত্রশিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিল। বস্ত্রশিল্পের প্রয়োজনে তুলা আমদানি ও তৈরি কাপড় (Readymade garments) রপ্তানির জন্যে জাহাজ পরিবহনের উন্নতি হয়। বস্তুত উনিশ শতকের মাঝামাঝি ইয়োরোপে যত জাহাজ চলত তার 60% ছিল ব্রিটিশ জাহাজ। আবার দেশের অভ্যন্তরে রেলপথ নির্মাণ ছিল শিল্পের অগ্রগতির প্রতীক। যেখানে 1830 খ্রিঃ ইংল্যাণ্ডে রেলপথের দৈর্ঘ্য ছিল মাত্র 450 মাইল, 1850 খ্রিঃ তা হয় 6621 মাইল। রেলশিল্পে কয়লা ও লোহার দরকার হত। ফলে কয়লা-লৌহ শিল্প বাড়ে, উৎপাদনের বৃদ্ধি ঘটে, ব্রিটেনের লোহার যন্ত্রপাতি, ছুরি, কাঁচি, সূচ ইত্যাদি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

ফ্যাক্টরি প্রথার নানা উপাদান ও চরিত্র ঃ শিল্পের উদ্ভাবন, সম্প্রসারণ, ক্রমান্নয়ন, ঝুঁকি বহন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ইত্যাদির জন্য প্রয়োজন হলো দক্ষ কারিগর, বৈজ্ঞানিক, বিশেষজ্ঞ, প্রযুক্তিবিদ ইত্যাদি। ফ্যাক্টরি প্রথার সঙ্গে এদের প্রয়োজনীয়তা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এই প্রথার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার ও প্রযুক্তিবিদদের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছিল। বহুকাল যাবৎ ইংল্যাণ্ড এদের সাহায্য পেয়েছিল এবং শিল্পায়ন ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ার ও বিশেষজ্ঞদের প্রভাব ছিল একচেটিয়া। এদেরই প্রচেষ্টায় ব্রিটেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কারখানায় পরিণত হতে পেরেছিল। তাই ফ্যাক্টরি প্রথা উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটেনে শিল্প-কারখানা—শহর গড়ে উঠল। শুরু হলো অধিক মাত্রায় উৎকৃষ্ট সামগ্রী উৎপাদন এবং অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে তার বিক্রয় ব্যবস্থা। ব্রিটেনের বিভিন্ন উপনিবেশগুলি হলো কাঁচামাল সরবরাহ এবং শিল্পজাত সামগ্রী বিক্রয়ের স্থান। এভাবে বিশ্বব্যাপী ব্যবসা-বাণিজ্য এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জন্ম নিল সাম্রাজ্যবাদ।

শিল্পায়নের সমস্যা ঃ প্রাথমিক স্তরে ফ্যাক্টরি প্রথা থেকে ক্রমে ক্রমে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি যেসব সমস্যার উদ্ভব হলো সেগুলি তাৎপর্যপূর্ণ। সেই সমস্যাগুলির সমাধান প্রসঙ্গে নতুন নতুন পদ্ধতি এবং আইন বা বিধি প্রযুক্ত হলো। ভূমিদাস প্রথা বহু আগেই বিলুপ্ত হয়েছিল। দরিদ্র কৃষকদের অনেকেই শ্রমিক হিসেবে শহরে জমায়েত হতে লাগল। ফলে কুটির শিল্পের অবনতি হলো ; কুটির শিল্পের কারিগররাও কারখানায় মজুরের কাজ করতে বাধ্য হলো। এই ভাবে শিল্প শ্রমজীবী সম্প্রদায় (Industrial Working Class) গড়ে উঠল। শ্রমজীবী মানুষের জীবন ও জীবিকার ধরনেও পরিবর্তন হলো। সেই সঙ্গে বেকার সমস্যা প্রকট হলো। বেকারী একটি স্থায়ী সমস্যায় পরিণত হলো। ফ্যাক্টরির শ্রমিকরা ছিল মজুর অর্থাৎ মজুরির বিনিময়ে তারা শ্রম দান করত। উৎপাদিত পণ্যে বা মুনাফায় তাদের অংশ ছিল না।

কাজের সুবিধার জন্য তাদের রাখা হত অস্বাস্থ্যকর ঘনবসতিপূর্ণ বস্তিতে। এর ফলে একদিকে যেমন শ্রমিকের দুরবস্থা বৃদ্ধি পেল, অন্যদিকে মুনাফা থেকে মালিকের প্রচুর অর্থোপার্জন হতে থাকল। এইভাবে সমাজে মালিক এবং মজুরের আর্থিক ও মর্যাদাগত বৈষম্য সৃষ্টি হলো। এইসব সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা কালক্রমে রাজনৈতিক জীবনেও প্রতিফলিত হতে লাগলো। ইংল্যাণ্ডে শ্রমিকদের প্রথমে ভোটাধিকার দেওয়া হলো। ক্রমে ক্রমে শ্রমিক ও মালিকের দ্বন্দ্ব দূর ক'রে শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত পাওনা দিয়ে দেওয়ার সচেতনতা সৃষ্টি হলো। ফ্যাক্টরি প্রথা থেকে উদ্ভূত সমস্যা, অন্যায়, অবিচার, অভাব-অভিযোগ দূর করার জন্য আইন প্রণয়ন হলো। এভাবেই শ্রমিক আন্দোলন থেকেই এলো সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা।[1]

৪। ইয়োরোপীয় মহাদেশে শিল্পায়ন

মহাদেশে শিল্পায়নে বিলম্বের কারণ ঃ ইংল্যাণ্ডে যখন শিল্পবিপ্লবের প্রসার ঘটতে থাকে এবং শিল্পায়নের প্রক্রিয়া শুরু হয় তখন মূল ইয়োরোপ মহাদেশের (Continent) নানা দেশে ছিল সামন্ততন্ত্র। তারা জমিদারী পরিচালনা, সৈন্য সামন্ত নিয়ে যুদ্ধ করা, সরকারি চাকরি, শাসন পরিচালনা ইত্যাদি কাজের মধ্যে মর্যাদার স্বাদ পেত। দেশের অর্থনীতি ছিল কৃষিভিত্তিক। ভূমিদাস প্রথা মূল ইয়োরোপীয় দেশগুলি থেকে উচ্ছেদ করা তখনও সম্ভব হয়নি। তারা ইংল্যাণ্ডের ব্যবসা-বাণিজ্য, কলকারখানা পরিচালনা, কারখানায় শ্রমিকের কাজ ইত্যাদিকে হীন চোখে দেখত। তাছাড়া ইংল্যাণ্ডের তুলনায় ভৌগোলিক সুবিধার অভাব, ঔপনিবেশিক বাণিজ্যে পিছিয়ে থাকা, অনুন্নত যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা, মূলধনী পুঁজি, শ্রমিক এবং কাঁচামালের অভাব ইত্যাদি ছিল ইয়োরোপীয় মহাদেশের অনগ্রসরতার কারণ। ফ্রান্স, হল্যাণ্ড বেলজিয়াম প্রভৃতি পশ্চিম ইয়োরোপের দেশের তুলনায় রাশিয়া বা পূর্ব ইয়োরোপ ছিল আরও পিছিয়ে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে উনিশ শতকে ইয়োরোপীয় মহাদেশের দেশগুলিতে শিল্পের প্রগতি লক্ষ্য করা যায়।[2]

ফ্রান্সে শিল্পায়ন ঃ ফরাসি বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত কুটির শিল্পই ছিল ফ্রান্সের চাহিদা মেটানোর একমাত্র হাতিয়ার। মূলধনের অভাব, ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় পুরাতন নীতি, ঝুঁকি বহনে পুঁজিপতির অভাব, কারিগরী জ্ঞানের অভাব ইত্যাদি ছিল ফ্রান্সে শিল্প বিপ্লবের অন্তরায়। শতেরো শতকে ফরাসি মন্ত্রী কোলবেয়ার (Colbert) কৃষি বিপ্লব ও শিল্প প্রসারের চেষ্টা করলেও সফল হননি। বস্তুত ফ্রান্সে পুরাতন সমাজে (ancient regime) স্বৈর-শাসন এবং সামন্ততন্ত্র, সমাজ সুবিধাভোগী এবং সুবিধাহীন—এই দুই ভাগে বিভক্ত হওয়া আর্থনীতিক অগ্রগতির

1. শিল্পায়নের ফলাফল পরের অংশে দ্রষ্টব্য।
2. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্র. সি. এম. সিপোলা (সম্পা.), ফনটানা ইকনমিক হিস্ট্রি অফ ইয়োরোপ, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড; কেমব্রিজ ইকনমিক হিস্ট্রি অফ ইয়োরোপ, ষষ্ঠখণ্ড; এইচ. জে. হাবাকুক এবং এন এম পোস্তান (সম্পা.) দ্য ইনডাসট্রিয়াল রেভোলিউশন অ্যাণ্ড আফটার।

পথে বাধাস্বরূপ ছিল। এই কারণে আঠারো শতকে কোনও কোনও প্রচেষ্টা হলেও ফ্রান্স শিল্পে এগোতে পারেনি। বুরবোঁ বংশীয় রাজা ষোড়শ লুই-এর মন্ত্রী ক্যালোন শিল্প গঠনের চেষ্টা করেছিলেন তবু কৃতকার্য হয়নি। আসলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, মূলধন সংস্থান, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ইত্যাদি সব ব্যাপারেই ফ্রান্স ইংল্যাণ্ড থেকে অনেক পিছিয়ে ছিল। তাছাড়া ফ্রান্সের অভিজাত শ্রেণীর শিল্পে আগ্রহী ছিল না। এদিকে বুর্জোয়া শ্রেণীরও সামাজিক মর্যাদা ছিল না। উপরন্তু ফ্রান্সে গিল্ড বা নিয়মগুলি স্বাধীন শিল্পের বিকাশে ছিল বাধা স্বরূপ। তারপর ফ্রান্সের আন্তশুল্ক ব্যবস্থা এবং শিল্পের উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণও ছিল শিল্পের অগ্রগতির পথে বাধা। এবং সর্বোপরি ফরাসি বিপ্লবের ফলেও শিল্পে মন্দা এবং মূলধনের অভাব দেখা যায়।

ইংল্যাণ্ডে 1760-1780 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে উন্নয়নের সূচনা হলেও ফ্রান্সে তা হয় 1800 খ্রিস্টাব্দের পর। তবে ফরাসি বিপ্লবের পর ফ্রান্সের অনেক উপনিবেশ হাতছাড়া হওয়াতে কাঁচামালের সরবরাহ এবং উৎপাদিত মালের বাজার না থাকার ফলে শিল্প বিস্তারে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। এমনকি নেপোলিয়ান কর্তৃক ব্যাঙ্ক অফ ফ্রান্স প্রতিষ্ঠা (1800) বা মহাদেশীয় অবরোধ পদ্ধতির সুযোগও ফ্রান্স তেমনভাবে নিতে পারেনি। নেপোলিয়ানের পতনের পর ইতালি-জার্মানির বাজারও ফ্রান্সের হাতছাড়া হয়। তাছাড়া কয়লা সরবরাহে ফ্রান্স ছিল সীমাবদ্ধ। তবু 1800 থেকে 1815 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ফ্রান্সে শিল্পায়ন শুরু হয়, তবে তার গতি ছিল অতি মন্থর। তারপর অষ্টাদশ লুই এবং দশম চার্লসের রাজত্বকাল ছিল নিষ্ফলা। লুই ফিলিপের আমলে ফরাসি দেশে প্রকৃত শিল্পায়নের সূচনা ঘটে এবং তা বৃদ্ধি পায় তৃতীয় নেপোলিয়ানের রাজত্বকালে।

লুই ফিলিপের রাজত্বকালে (1830 - 1848) সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্প বিপ্লবের অনুকূল পরিবেশ গড়ে ওঠে। তিনি মালিকদের স্বার্থরক্ষার প্রতি তৎপর ছিলেন। সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ানের চেষ্টায় ইংরেজ পুঁজিপতিদের সাহায্যে বহু শিল্প প্রতিষ্ঠান, রেলপথ, লৌহশিল্প, বয়ন-শিল্প, বিলাস সামগ্রী তৈরির কারখানা ইত্যাদি ব্যাপক হারে গড়ে ওঠে। ফ্রান্সের এই উন্নয়নে ইংরেজ পুঁজিপতি, ব্যাঙ্কিং পদ্ধতি এবং বিশেষ করে ইংরেজ বিশেষজ্ঞরা ছিলেন প্রধান সহায়ক। ফ্রান্সে শিল্প বিপ্লব বিলম্বে ঘটার যেসব কারণ ছিল লুই ফিলিপ প্রথমে সেগুলি দূর করার চেষ্টা করেন। তার আমলেই ফ্রান্সে প্রথম রেলপথ তৈরি হয়। রেলপথের প্রসার ঘটে তৃতীয় নেপোলিয়ানের আমলে। ফলে পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে লৌহ, ইস্পাত, কয়লা ইত্যাদি শিল্পের প্রসার ঘটে। ব্যাঙ্ক ব্যবস্থায় ফ্রান্সের পুনর্গঠন মূলধনের ক্ষেত্রে প্রভূত সাহায্য করে। ফ্রান্সের বেশির ভাগ কয়লা বেলজিয়াম সীমান্ত অঞ্চল থেকে আসত, পরে আলসাস লোরেন অঞ্চলের আকরিক লৌহখনি প্রয়োজন মেটাত। ক্রমে ক্রমে লিয়ঁ, বর্দো, তুলোঁ প্রভৃতি শিল্প-শহর গড়ে ওঠে। এ ক্ষেত্রে বস্ত্র শিল্প, রাসায়নিক শিল্প, যন্ত্রশিল্প, লৌহশিল্প ইত্যাদি ছিল উল্লেখযোগ্য।

1815 খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সে মাত্র পনেরটি কারখানায় বাষ্পীয় পাম্প ইঞ্জিন হিসেবে ব্যবহার করা হত বলে একটি সমীক্ষায় জানা যায়। ফরাসি বিপ্লবের ফলে পুরাতন সমাজ ভেঙে যায়। তাই বিলম্বে হলেও ফ্রান্সে শিল্পের অগ্রগতি শেষ পর্যন্ত ঘটেছিল। গোড়ার দিকে ব্রিটেন থেকে নানা ধরণের যন্ত্র আমদানি করা হত। 1830 খ্রিঃ পর ফ্রান্সের বিপ্লবী এবং কারিগররা যন্ত্রপাতি তৈরির দিকে মন দেন। 1831 খ্রিঃ থেকে 1837 খ্রিঃ-র মধ্যে ঢালাই লোহার উৎপাদন তিনগুণ বাড়ে। রেলপথ প্রসারিত হতে থাকে, যন্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে যন্ত্র দ্বারা উৎপাদন আরম্ভ হয় 1837 খ্রিঃ থেকে।

তবে, আগেই বলা হয়েছে যে, তৃতীয় নেপোলিয়ানের আমলে ফ্রান্সে শিল্পের প্রকৃত অগ্রগতি হয়। 1850 খ্রিস্টাব্দে যেখানে ছিল মাত্র দু'হাজার মাইল রেলপথ, 1870 খ্রিঃ তা দাঁড়ায় দশ হাজার মাইলে। এছাড়া বহু লোহার কারখানা স্থাপিত হয়। তৃতীয় নেপোলিয়ান শিল্পায়নের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থাও নিয়েছিলেন। ব্যাঙ্ক অফ ফ্রান্সকে শিল্পে ঋণদানের জন্য নির্দেশ দেওয়া, মুলধনী কোম্পানিগুলিকে সরকারি সহায়তায় শিল্পে বিনিয়োগে উদ্বুদ্ধ করা, নানা শিল্প-ব্যাঙ্ক স্থাপন করা, রেলপথ নির্মাণকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া, কয়লা ও লোহার বন্দোবস্ত করা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ফলে ফ্রান্সে বহু ভারী শিল্প গড়ে ওঠে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। বহু শ্রমিক এতে নিযুক্ত হয়। আলসাসে সূতিবস্ত্রের কারখানা, লোরেনে ধাতুশিল্পের কারখানা, লয়ার উপত্যকায় রাসায়নিক কারখানা এবং লিয়ঁতে রেশমশিল্পের কারখানার দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। এরপর ফ্রান্স শিল্প পণ্য রফতানিও শুরু করে।

জার্মানিতে শিল্পায়ন ঃ জার্মানির অনুর্বর উপত্যকায় কয়লা ও লৌহের প্রাচুর্য ছিল। কিন্তু বহু রাজ্যে বিভক্ত জার্মানিতে আর্থিক ও রাজনৈতিক কারণেই শিল্প-বিপ্লবের গতি ছিল অত্যন্ত মন্থর। জার্মানিতে প্রধানত কৃষির উপর নির্ভরতা, উপনিবেশ না থাকায় কাঁচামাল ও বাজারের অভাব এবং শ্রমিকের যোগান কম থাকায় শিল্পায়নের পথে বাধা ছিল। জার্মানিতে প্রথম রেলপথ নির্মিত হয় 1839–1840 খ্রিস্টাব্দে। এ ব্যাপারে ফ্রেডারিষ লিস্ট বিশেষ উদ্যোগ নেন। জার্মানিতে শিল্পায়ন শুরু হয় 1860 খ্রিস্টাব্দের পর। 1820 খ্রিস্টাব্দের পূর্বেই ইংল্যাণ্ড থেকে কিছু যন্ত্রপাতি এনে প্রাশিয়ায় কারখানা স্থাপিত হয়। কিন্তু এতেও শিল্পের বিশেষ উন্নতি হয়নি। ইংল্যাণ্ডের অর্থসাহায্যে 1840 খ্রিস্টাব্দে জার্মানিতে প্রথম রেলপথ তৈরি হলো। ইতোমধ্যে প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জোলভেরাইন বা বাণিজ্যসংঘ গঠিত হওয়ায় শিল্পায়নের পথ পরিষ্কার হলো।

এরপর বিসমার্কের প্রচেষ্টায় বিভিন্ন রাজ্যগুলি ঐক্যবদ্ধ হলে (1870) জার্মানির শিল্পবিপ্লব তরান্বিত হয়। বিসমার্ক সমগ্র জার্মানিতে একই মাপ, একই মুদ্রা ইত্যাদি চালু করেন, ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার সংস্কার করেন, শিল্পে লগ্নীর ব্যবস্থা করেন। ক্রমে লৌহ, ইস্পাত, অভ্র, মোটর ইঞ্জিন, বিমান, রসায়ন, ঔষধ ইত্যাদি শিল্পের প্রসার ঘটে। ক্রমে

ক্রমে জার্মানি ফ্রান্সকে অতিক্রম করে বিশ্ববাণিজ্যে ইংল্যাণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে সমর্থ হয়। বাণিজ্যক্ষেত্রে ইঙ্গ-জার্মান প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ। জার্মানির শিল্প বিপ্লবের মূলে ছিল শুল্ক সংরক্ষণ নীতি, মুদ্রাসংস্কার, ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সংস্কার, রেলপথ ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি। বস্তুতপক্ষে ভিয়েনা সম্মেলনের পরে ইংল্যাণ্ড যখন শিল্পের অগ্রগতিতে প্রথম স্থানে ছিল, তখন জার্মানি ছিল কৃষি প্রধান 39টি রাজ্যের এক কনফেডারেশন। এই জার্মানি একশো বছরের মধ্যে 1914 খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে হয়ে ওঠে ব্রিটেন বা ফ্রান্সের প্রতিদ্বন্দ্বী। জার্মানি যে ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী দেশ হতে পেরেছিল প্রাশিয়ার নেতৃত্বে, তার জন্য বিসমার্কের 'রক্ত ও লৌহ' (Blood and Iron) নীতি দায়ী ছিল ঠিকই, কিন্তু 'কয়লা ও লৌহ' কম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেনি।

জার্মানির শিল্পায়নের এই অগ্রগতিকেও দু'ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম পর্ব 1815 খ্রিস্টাব্দ থেকে 1870 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যখন শিল্পায়ন ছিল বিলম্বিত, মন্থরগতি এবং বিভিন্ন জার্মান রাজ্যে অসম বিকাশ। 1870 খ্রিস্টাব্দ থেকে 1914 পর্যন্ত শিল্পের অগ্রগতি ছিল অতিদ্রুত এবং অবশ্যই চমকপ্রদ। জার্মানিতেও শিল্পায়নের পথে কিছু বাধা-বিপত্তি ছিল। যেমন— জার্মানির রাজনৈতিক বিভাজন, কেন্দ্রীয় মুদ্রা না থাকা, কেন্দ্রীয় আইন না থাকা, যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার অভাব, উপনিবেশের অভাবে কাঁচামাল এবং শিল্পপণ্যের বাজার না থাকা, মূলধনের অভাব ইত্যাদি। তবু 1815 খ্রিঃ থেকে 1870 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে জার্মানির বিভিন্ন রাজ্যে শিল্পায়নের হাওয়া বইতে শুরু করে। ঐ সময় জার্মানিতে রেলপথের প্রসার হয়। ডেভিড টমসনের মতে জার্মানিতে রেলপথের গুরুত্ব ছিল সবচেয়ে বেশি, কারণ বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে তা ছিল যোগসূত্র। এ ব্যাপারে স্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছিলেন ফ্রেডারিষ লিস্ট। অন্যদিকে জার্মান শুল্ক সংঘ (জোলভেরাইন) শিল্পায়নের পথ সুগম করে। 1850 থেকে 1870 খ্রিঃ মধ্যে কয়লা ও লোহার উৎপাদন বাড়ে। তবে 1870 থেকে 1900 খ্রিঃ—এই তিরিশ বছরের মধ্যে জার্মানির শিল্পের ব্যাপারে অগ্রগতি ছিল চমকপ্রদ ও অতুলনীয়। বেসরকারি পুঁজি শিল্পায়নে প্রধান ভূমিকা নিলেও জার্মান ব্যাঙ্কগুলিও বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। সমরাস্ত্র এবং রাসায়নিক শিল্পে জার্মানি ইয়োরোপে প্রথম স্থান গ্রহণ করে। জার্মান শিল্পায়নের প্রভাব পড়ে বিশ্বের সর্বত্র।

রাশিয়ায় শিল্পায়ন ঃ উনিশ শতকে রাশিয়া ছিল মূলত কৃষি প্রধান দেশ। জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের আমলের আগে রাশিয়াতে শিল্প বিপ্লব ঘটে নি। অর্থাৎ পশ্চিম ইয়োরোপের অনেক পরে রাশিয়াতে শিল্প গড়ে ওঠে। তবে জার আমল শেষ হয়ে বলশেভিক বিপ্লবের পর (1917) রাশিয়ায় প্রকৃত শিল্পায়ন শুরু হয়। গ্রসমান, গারশেনক্রন প্রমুখ অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদ্‌দের মতে জার আমলেই উনিশ শতকের শেষ দিকে রাশিয়াতে শিল্পায়নের ভিত্তি গড়ে ওঠে। তবে ব্যক্তিগত বা বেসরকারি উদ্যোগে নয়, রাশিয়াতে শিল্পায়ন শুরু হয় মূলত রাষ্ট্রীয় বা সরকারি উদ্যোগে।

রাশিয়াতে শিল্পের অগ্রগতি যে বিলম্বে শুরু হয়েছিল তার অনেক কারণ আছে। যেমন জার সরকারের স্বৈরতান্ত্রিক নীতি, সামন্ততান্ত্রিক কৃষি অর্থনীতি, মূলধন এবং মূলধনী সম্প্রদায়ের অভাব এবং সর্বোপরি সার্ফ বা ভূমিদাস প্রথা প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে। ভূমিদাসদের কোনও স্বাধীনতা ছিল না। জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের আমলে তারা মুক্তি পায় (1861)। ভারী শিল্প গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় লোহা ও কয়লার ব্যবস্থা না করে জার আমলে ভোগ্য পণ্যের শিল্পের উপর গুরুত্ব দেওয়া ভুল হয়েছিল। শিল্পায়নের জন্য যে আভ্যন্তরীণ সংগঠন দরকার তা জারতন্ত্রের যুগে বিদ্যমান ছিল না। অধিকাংশ মানুষ গরিব হওয়াতে নানাবিধ কর দেওয়ার পর শিল্প দ্রব্য ক্রয় করার মতন অর্থ হাতে না থাকাতে শিল্প পণ্যের চাহিদা ছিল না। আভ্যন্তরীণ বাজার না থাকাতে শিল্পে উৎসাহ ছিল না। পরিবহন ব্যবস্থা ছিল পশ্চাদ্‌গামী। কোনও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা, মূলধন সঞ্চয় কিছুই ছিল না।

1861 খ্রিস্টাব্দে সার্ফদের মুক্তি আইনের পর শিল্প শ্রমিক পাওয়া সহজ হলো। কিন্তু এই অদক্ষ শ্রমিক উৎপাদন বাড়াতে সক্ষম ছিল না। তবে উনিশ শতকের শেষ দিকে রাশিয়াতে অল্প হলেও বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্ভব হয়। জার আন্তরিকভাবে শিল্প প্রসারের চেষ্টা করেন। কৃষির উন্নতি হলে দেশে কাঁচামাল, সম্পদ যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি জনসংখ্যাও বাড়ে। অধ্যাপক *গারশেনক্রন* দেখিয়েছেন যে, ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে যেমন বেসরকারি উদ্যোগ ছিল প্রধান, রাশিয়াতে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগ ছিল প্রধান। তবে রাশিয়াতে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং প্রযুক্তিবিদ্যা দুইয়েরই অভাব ছিল। জার সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় লোহা, কয়লা, ইস্পাত, শিল্প, রেলপথ নির্মাণ ইত্যাদির মাধ্যমে 1880-1900 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রাশিয়াতে শিল্পায়ন বৃদ্ধি পায়। রাশিয়ায় শিল্পের প্রসারে জার্মান ও ফরাসি প্রযুক্তিবিদ, পুঁজিপতি ও সরবরাহী মূলধনের অবদান ছিল খুব বেশি। তবে রাশিয়াতে শিল্পের প্রসার বিলম্বে হলেও এখানে শ্রমিকের শোষণ ছিল অমানুষিক, তাই সরকারি প্রচেষ্টায় শিল্প বিপ্লব চলতে থাকলেও শ্রমিক বিক্ষোভের পরিণতিই হলো 1917 খ্রিস্টাব্দের রুশ বিপ্লব।

ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে শিল্পায়ন ঃ ফ্রান্স, জার্মানি ও রাশিয়া ভিন্ন ইয়োরোপের অন্যান্য দেশগুলিরও শিল্প-বিপ্লব তরান্বিত হয়। এদের মধ্যে বেলজিয়াম ছিল অগ্রণী। 1799 খ্রিস্টাব্দের ইংরেজ কারিগর উইলিয়াম ককরিল বেলজিয়ামে সুতোর কল প্রতিষ্ঠা করেন। ইংরেজ পুঁজিপতিরা বেলজিয়ামে বিভিন্ন কল-কারখানা ছাড়াও রেলপথ নির্মাণে বিশেষ সাহায্য করেছিলেন। 1870 খ্রিস্টাব্দের পর থেকে সুইডেন, স্পেন, অস্ট্রিয়া, নেদারল্যান্ডস্ প্রভৃতি দেশগুলিতে শিল্প-বিপ্লব দ্রুতগতিতে চলতে থাকে। স্বাধীনতা যুদ্ধে জয়লাভের পর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ক্রমশ শিল্পোন্নত হতে থাকে। এক্ষেত্রেও ব্রিটিশ মূলধন ও ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞদের ভূমিকা ছিল অগ্রণী।

৫। শিল্পায়নের ফলাফল

শিল্প-বিপ্লব প্রথমে ইংল্যাণ্ডে এবং পরে ইয়োরোপের অন্যত্র প্রসারিত হয়। ইয়োরোপে তথা বিশ্বের ইতিহাসে শিল্প-বিপ্লবের ফলাফল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, মৌলিক এবং সুদূর প্রসারী। কেননা অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই বিপ্লবের পরবর্তী যুগ এক নতুন সভ্যতার বিকাশ ঘটায় যার ফলে চিরাচরিত কারিগরী ও কুটির শিল্প, গ্রামীণ অর্থনীতি, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ, রাজতন্ত্রের ঐতিহ্য ও অভিজাত সম্প্রদায়ের বিশেষ সুযোগ সুবিধার রূপান্তর ঘটে। অন্যভাবে বলা যায় যে, সমাজের বস্তুগত পটভূমিকার ক্ষেত্রে সামন্ততন্ত্রের পতন এবং পুঁজিবাদে উত্তরণের যে প্রক্রিয়া মধ্যযুগের অবসানের পর থেকে চলে আসছিল তা দ্রুত পূর্ণতার দিকে ধাবিত হয়। জীবিকা হিসেবে কৃষির স্থান দখল ক'রে নেয় শিল্প। এর সঙ্গে নগর ও নাগরিক জীবন, নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী, উদার নৈতিক ও গণতান্ত্রিক আদর্শ, শ্রমিক সমস্যা ও সামাজিক সমস্যার উন্মেষ ঘটায়। শিল্পের প্রগতি তাই অবিমিশ্র শুভ বার্তা নিয়ে আসেনি।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্র ঃ শিল্প বিপ্লব অর্থনীতিতে পুঁজির বহুমুখী লগ্নির মাধ্যমে শিল্পায়নের প্রসার ঘটায়। শিল্পায়নের ফলে অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ পণ্যসামগ্রীর উৎপাদন শুরু হয়। ইংল্যাণ্ড বিশ্বের কারখানায় পরিণত হয়। ক্রমে ক্রমে ইয়োরোপের অন্য দেশেও যন্ত্র যুগের সূচনা হয়। বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠার ফলে একদিকে যেমন উৎপাদনের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আসে তেমনি বিভিন্ন খনিজ পদার্থের উৎপাদনও বিশেষ বৃদ্ধি পায়। শিল্প-বিপ্লবের ফলে পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি ঘটে এবং ফলে শিল্পজাত সামগ্রীর দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এর ফলে বাণিজ্য পুঁজি (Commercial Capital) ক্রমে শিল্প পুঁজিতে (Industrial Capital) রূপান্তরিত হয়। শিল্প পুঁজিপতি শ্রেণীর মূল লক্ষ্য হয়ে দাড়ায় মুনাফার যথাসম্ভব বৃদ্ধি, দেশের সম্পদ কুক্ষিগত করা এবং উৎপাদনের প্রণালী ও উপাদান নিজেদের অধীনে রাখা। শিল্প- বিপ্লব ব্যক্তিগত মালিকানার সীমাবদ্ধতা থেকে বৃহদায়তন শিল্প পরিচালনার জন্য যৌথ মূলধনী সংস্থার সৃষ্টি করার ফলে লগ্নীপুঁজির ক্ষেত্র বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য আধুনিক শিল্পের প্রসার হয়। সর্বোপরি শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গেই নগরায়নের প্রসার ঘটে, দক্ষ কারিগর শ্রেণীর উদ্ভব হয়, প্রযুক্তিগত উন্নতি হয়, আবার পরিণতিতে অর্থনৈতিক বৈষম্যও বৃদ্ধি পায়।

সামাজিক ক্ষেত্রে শিল্প বিপ্লবের প্রধান ফল হলো শিল্প প্রধান দেশে পুঁজিপতি মালিক এবং শ্রমজীবী, এই দুই শ্রেণীর উদ্ভব। শিল্পোৎপাদনে মূলধন বিনিয়োগ ক'রে যারা তা থেকে মুনাফা লাভ করতে লাগল, তারাই হলো পুঁজিপতি শ্রেণী (Capitalists) এবং যারা বৃহৎ কলকারখানার শ্রম দান ক'রে উৎপাদিত পণ্যের উপর কোনও দাবি না ক'রে শুধু মজুরি পেত, তারা শ্রমজীবী শ্রেণী (Working Class)। শিল্প-বিপ্লবের ফলে এই দুই শ্রেণীর বৈষম্য ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া ইয়োরোপে জনসংখ্যার হার

অভাবনীয়ভাবে বাড়তে থাকে। খনি ও ভারী শিল্পে শ্রমিক শ্রেণীর ব্যাপক কর্মসংস্থান ঘটার সঙ্গে সঙ্গে এক সংঘবদ্ধ সামাজিক শ্রেণী হিসেবে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে নানাবিধ সামাজিক সমস্যা দেখা দেয়। এই সমস্যার ক্ষেত্রে বাসস্থান, খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা সব কিছু ছিল। অন্য দিকে নারী ও শিশু অনেক বেশি পরিমাণে উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত হয়। ফলে শ্রমিক শ্রেণীর সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন কল্পে শ্রমিক সংগঠন গড়ে ওঠে ও শ্রমিক আন্দোলনের সূচনা হয়। ক্রমে ক্রমে সমাজের পূর্বতন অভিজাত সম্প্রদায়ের পরিবর্তে শিল্পপতিরাই প্রাধান্য লাভ করেন। ফলে শিল্প ও বাণিজ্য ভিত্তিক সমাজে সামন্ততান্ত্রিক অবক্ষয় স্পষ্টরূপ পাওয়ায় ধনতান্ত্রিক সমাজের রূপরেখা প্রকট হয়ে ওঠে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্র ঃ শিল্প-বিপ্লবের পরবর্তী যুগে কতকগুলি পরিবর্তন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমতঃ, ভূস্বামী ও অভিজাতদের পরিবর্তে মূলধনী পুঁজিপতি শ্রেণীই রাজনীতিতে প্রাধান্য বিস্তার করতে শুরু করে এবং তারা সামন্ততন্ত্র ও ভূসম্পত্তির উপর ভিত্তি করা সমাজ ব্যবস্থার বদলে গণতান্ত্রিক নির্বাচন সংস্কার দাবি করে এবং নির্বাচনে তাদের সাফল্যও ঘটে। দ্বিতীয়তঃ, শিল্প বিপ্লবের ফলে জাতীয়তাবাদের দাবিও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তৃতীয়তঃ, অবাধ বাণিজ্য নীতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়। চতুর্থতঃ, বিভিন্ন প্রচালিত সামন্ততান্ত্রিক আইন, যাজক ও অভিজাত শ্রেণীর বিশেষ সুবিধা ইত্যাদি বাতিল হয়। পঞ্চমতঃ, জাতীয়তাবাদের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিকতার আদর্শ ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ষষ্ঠতঃ, শিল্পায়নের ফলেই যেমন সমাজতন্ত্রবাদের উদ্ভব হয় এবং রাজনৈতিক ধ্যান ধারণার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে তার প্রভাব পড়ে, তেমনি শ্রমিকদের রাজনৈতিক ভূমিকাও বৃদ্ধি পায়। সপ্তমতঃ, শিল্পের অগ্রগতির ফলে ইয়োরোপীয় দেশগুলির মধ্যে উপনিবেশ বিস্তারের জন্য তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। তাই লেনিন লিখেছিলেন যে পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ ধাপ হলো সাম্রাজ্যবাদ। এই ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক থেকেই সাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ শুরু হয় যার পরিণাম হলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।

অধ্যায় ১০

উনিশ শতকে শ্রমজীবী আন্দোলন

(**Syllabus:** *Labour Movements*)

১। শ্রমজীবী শ্রেণীর উদ্ভব

শিল্প-বিপ্লবের পূর্বে সব দেশেই 'শিল্প' বলতে ছিল কুটির শিল্প। এই শিল্পে কারিগর নিজেই ঘরে বসে সামগ্রী উৎপাদন করত; সহায়ক শ্রমিকের প্রয়োজন হলে নির্দিষ্ট কাজের জন্য তা নিয়োগ করা হত। কিন্তু এই কুটির শিল্পের জন্য কারিগরকে অন্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হত না এবং অল্প সময়ে অধিক সামগ্রীর উৎপাদন সম্ভব ছিল না। শিল্প বিপ্লবের প্রাথমিক স্তরে যখন নানা যন্ত্রপাতি আবিষ্কার হলো তখন ঐ যন্ত্রের সাহায্যে অধিক সামগ্রী উৎপাদনের জন্য শ্রমিক এবং ছোট আকারের কারখানা স্থাপনের প্রয়োজন হলো। মালিক নিজেই শ্রমিক নিয়োগ ক'রে উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করত।

বাষ্প চালিত যন্ত্র আবিষ্কারের পর বৃহদায়তন কারখানা স্থাপনের প্রয়োজন হয়ে পড়ল। এক্ষেত্রে প্রয়োজন হলো মূলধন, বহু সংখ্যক শ্রমিক, মালিক ও তত্ত্ববধায়কদের সংগঠন, শ্রমদানের রীতি-নীতি, কাঁচামালের যোগান, উৎপাদিত সামগ্রী সরবরাহ, ব্যাঙ্কিং প্রথা ইত্যাদি। বৃহদায়তন শিল্পের কোনও উৎপাদিত সামগ্রীর এই সব সামগ্রিক ব্যবস্থাপনাই হলো কারখানা প্রথা (Factory System)। বৃহদায়তন শিল্পের এই সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার অন্তর্গত ছিল শ্রম-বিভাজন (Division of Labour)। বিশেষ বিশেষ অংশ তৈরির জন্য শ্রমিকের দক্ষতা প্রয়োজন। কাজের মাধ্যমেই শ্রমিক ঐ বিশেষ কর্মে অধিক দক্ষতা অর্জন করে। ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য এক একটা কারখানায় তখন ভিন্ন ভিন্ন শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। উন্নত ধরণের সামগ্রীর জন্য এই ব্যবস্থা ছিল অপরিহার্য। শিল্প-বিপ্লবের পর ইংল্যাণ্ডের বয়নশিল্প, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, রেল, জাহাজ নির্মাণ ইত্যাদি শিল্পের জন্য কারখানা (Factory) ও সংশ্লিষ্ট রীতিনীতি গড়ে উঠল অর্থাৎ শিল্পায়ন ঘটল। তবে শিল্প বিপ্লবের ফলশ্রুতি শুধু ইংল্যাণ্ডের সীমানায় সীমিত রইল না, ইয়োরোপীয় অন্যান্য দেশেও তার ব্যাপ্তি ঘটল। কিন্তু শিল্প বিপ্লবের এই অগ্রগতির পশ্চাতে যে বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে সেটি হলো শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব।

শিল্প বিপ্লব এবং শিল্পায়নের ফলে সমাজে দুটি শ্রেণীর উদ্ভব হলো— মালিক শ্রেণী এবং শ্রমিক শ্রেণী। মালিক শ্রেণীর প্রবণতা হলো কলকারখানা স্থাপন, মূলধন বিনিয়োগ, সস্তায় শ্রমিক নিয়োগ, অধিক সময় তাদের উৎপাদনের কাজে খাটানো, সুযোগ পেলে

তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করা, উৎপাদিত সামগ্রী অধিক মূল্যে বিক্রয় করা ইত্যাদি। অন্যদিকে কল-কারখানায় কর্মসংস্থান এবং শহরে আরামপ্রদ জীবনযাত্রার আশায় গ্রাম ছেড়ে মানুষ এলো শহরে। সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত ভূমিদাস, প্রান্তিক চাষী, কুটির শিল্প ধ্বংস হওয়ায় সংশ্লিষ্ট কারিগর, অষ্টাদশ শতকে জনসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে উদ্ভূত বাড়তি জনগণ কলকারখানায় ভীড় করল। অথচ সকলেই কর্মসংস্থান করতে পারত না। গ্রামীণ সভ্যতা ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠল শিল্পাশ্রয়ী নতুন ধরনের সভ্যতা। শিল্পাশ্রয়ী সভ্যতার পরিণাম হলো দুর্বিষহ ও অশুভ; কারণ কলকারখানায় কর্মরত মানুষের জীবন হলো যান্ত্রিক। ফলে শ্রমজীবী শ্রেণীর (Industrial Working Class) উদ্ভব হলো। তারা বৃহৎ শিল্পের উৎপাদনে যুক্ত হলো। সংখ্যায় তারা বিপুল। কিন্তু ফসল বা উৎপন্ন পণ্যে তাদের কোনো অধিকার নেই। শ্রমের (Labour) বিনিময়ে তারা মজুরি (Wage) পায়। আর মালিক শ্রেণী উৎপাদিত পণ্যের বিক্রি থেকে উৎপাদন খরচের বাড়তি হিসেবে যা পায় তা হলো মুনাফা (Profit)। শিল্প শ্রমিকের শ্রমের অর্থনৈতিক রূপান্তর ঘটল, তাদের জীবনযাত্রা হলো অনিশ্চিত। শিল্পোৎপাদনে শ্রমের যোগানের সঙ্গী তারা অথচ দারিদ্র্য ও অসহনীয় সামাজিক জীবনের কারণে তাদের বলা হত সর্বহারা (Proletariat)। সেই জন্যই কার্লমার্ক্স বলেছিলেন যে, শ্রমিক শ্রেণীর একমাত্র শৃঙ্খল ছাড়া হারাবার আর কিছুই নেই। ইংল্যাণ্ডে শিল্পায়ন এবং শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব সুন্দরভাবে আলোচনা করেছেন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ই. পি. টমসন।[1]

উৎপাদন পদ্ধতির বদল ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কেননা উৎপাদন সম্পর্কই সামাজিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করে। সেই কারণে 1815-র পর উনিশ শতকে ইয়োরোপে সমাজ-ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন ঘটছিল তা যেমন গভীর তেমনি মৌলিক। যেমন একথা সত্য যে, যন্ত্রের আবির্ভাব, কারখানা ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা, বাষ্পীয় শক্তির ব্যবহার ও শহরাঞ্চলের প্রসার সমাজ ও রাজনীতিকে বদলে দিচ্ছিল; আবার শুধু সমাজকেই নয় সমগ্র সভ্যতাকেই। দামী যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি ব্যবহার, দ্রুত উৎপাদন ব্যবস্থা এবং কারখানা স্থাপনের ফলে তখন বৃহৎ পরিসরে অনেক বেশি শ্রমিককে নিয়ে উৎপাদন সংগঠন করার দরকার হয়েছিল। ফলে ইয়োরোপে কারখানা ব্যবস্থা দ্রুত প্রসার লাভ করেছিল। অন্যদিকে শ্রমজীবী সম্প্রদায় এক গোষ্ঠী হিসেবে আবির্ভূত হলো। সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী লিখেছেন, "বৃহৎ পরিসরে কারখানা ব্যবস্থায় উৎপাদন সংগঠন করা প্রয়োজন হয়ে পড়লে স্বভাবতই কারখানা যেখানে গড়ে উঠেছিল, সেখানে শ্রমিকদের সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি পায়। এই সামাজিক পরিবর্তন উল্লেখযোগ্য। কারখানাগুলি ঘিরে ক্রমশ ছোট বড় শহরের উৎপত্তি হয় এবং এ সমস্ত শিল্প শহরাঞ্চলে শ্রমিকদেরই সংখ্যাধিক্য ছিল।"[2]

1. দ্র: ই. পি. টমসন, *The Making of the English Working Class*

2. সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ 309

এই প্রসঙ্গে তিনটি কথা মনে রাখা দরকার— (ক) শিল্পায়ন এবং শ্রমজীবী শ্রেণীর উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে নগরায়নের (Urbanization) একটা নিকট সম্পর্ক ছিল। (খ) বিরাট সংখ্যক শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু সংখ্যায় ছিল নারী ও শিশু শ্রমিক। পূর্বেকার কুটির শিল্প ও কারিগরী ব্যবস্থার যুগে যা ছিল না। (গ) সবচাইতে বড়ো কথা হলো, এই যে শ্রমের চাহিদার রূপটাই বেশ খানিকটা বদলে যাচ্ছিল। শ্রমজীবীদের অনেকেই প্রয়োজনের থেকে কম মজুরি পেত, খাটতে হত অনেক বেশি অথচ কাজের 'সময়' নির্দিষ্ট না থাকাতে শোষণের সৃষ্টি হয়েছিল। কারণ কোনও আইন না থাকায় মালিকেরা কম মজুরি দিয়ে এবং বেশি খাটিয়ে মুনাফা বৃদ্ধি ও শিল্প প্রসারে উৎসাহী ছিল। এই শোষণের বিরুদ্ধেই শুরু হয়েছিল শ্রমজীবী আন্দোলন। শ্রমজীবীদের আন্দোলন (Labour Movements) সাধারণত নিজেদের অধিকার রক্ষার আন্দোলন হিসেবেই ইতিহাসে দেখা হয়। এই আন্দোলন প্রথমে অসংগঠিত থাকলেও পরে সংগঠিত (Organised) হয়, তখন তাকে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন (Trade Union Movement) বলা হয়। আবার উনিশ শতক থেকে অনেক দেশে অনেক ফ্যাক্টরি আইন (Factory Legislations) প্রবর্তিত হয়। শিল্পায়নের সঙ্গে শ্রমজীবী আন্দোলন এবং ফ্যাক্টরি আইন অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত।

২। শ্রমজীবী আন্দোলনের কারণ

শিল্প বিপ্লবের ফলে ইয়োরোপের ইতিহাসে যে নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় পূর্ববর্তী অধ্যায়ে সে-বিষয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। শিল্পায়নের মাধ্যমে ইংল্যাণ্ডে এবং ইয়োরোপীয় মহাদেশের নানা দেশে শিল্পের অগ্রগতির প্রভাব অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক নানা ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। শিল্প বিপ্লবের পর ইয়োরোপের শিল্পোন্নত দেশগুলির উৎপাদন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন হয়। পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। উৎপাদক সম্পর্কের পরিবর্তন হওয়ার ফলে সামাজিক সম্পর্কও পরিবর্তিত হয়। শিল্প বিপ্লবের ফলে শ্রমিক এবং মালিক শ্রেণীর অভ্যুদয়ের কথাও আগেই বর্তমান অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। একদিকে মালিক শ্রেণীর উদ্বৃত্ত পণ্যের বিনিময়ে প্রচুর মুনাফা অর্জনের ব্যবস্থা এবং অন্যদিকে শ্রমজীবী মানুষের মজুরির বিনিময়ে শ্রমদান-এই বৈপরীত্য এবং শিল্প বিপ্লবের ফলে উদ্ভূত নানান সমস্যাই শ্রমজীবী আন্দোলনের কারণ। অন্যভাবে বলা যায় যে, শিল্প-বিপ্লবের ফলে শ্রমজীবী শ্রেণীর যে সব সমস্যা দেখা দিয়েছিল তার মীমাংসা করার জন্যেই শ্রমজীবী মানুষদের আন্দোলনের সূত্রপাত।

শুধু মালিক শ্রেণী নয়, শিল্প বিপ্লব এবং শিল্পায়নের প্রসারের ফলে ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদের (Capitalism) উদ্ভব ঘটে। এই পুঁজিবাদের বিকাশ কিভাবে হলো তার বিস্তারিত পরিচয় পরবর্তী অধ্যায়ে যথাস্থানে পাওয়া যাবে।[1] আপাতত যা জানা জরুরি

তা হলো পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ফলে উদ্ভূত সমস্যাও শ্রমজীবীদের সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তোলার পিছনে অন্যতম প্রধান কারণ। পুঁজিবাদীরা বা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মূলধনী সম্প্রদায় সংগঠিতভাবে শিল্পে একচেটিয়া আধিপত্য স্থাপন ও একচেটিয়া মুনাফা লাভের জন্য যে নীতি নেয়, তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে শ্রমিকরা সংগঠিতভাবে তাদের দাবি আদায় ও অধিকার রক্ষার জন্যে সংঘ বা ইউনিয়ন গঠনের উদ্যোগ নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এইভাবে শ্রমজীবী আন্দোলনের আবির্ভাব।

ধনতন্ত্র এবং শ্রমজীবী আন্দোলন ঃ এককথায় বলা যেতে পারে যে, শিল্প-বিপ্লবের ফলে, বিশেষত শিল্পায়নের ফলে নানা বৃহদায়তন শিল্পের সৃষ্টি হলে যে বিরাট সম্পদ ও শিল্প-মূলধনের সৃষ্টি হয়, তা মুষ্টিমেয় মালিক শ্রেণীর হাতে থাকার ফলেই ধনতন্ত্র বা ক্যাপিটালিজিমের উৎপত্তি। পুঁজি সম্পর্কে বিশদ আলোচনার জন্য স্মরণীয় কার্ল মার্ক্সের ধ্রুপদী গ্রন্থ 'দাস ক্যাপিটাল' -এর তিনটি খন্ড। শিল্প-বিপ্লবের আগে মধ্যযুগের শেষে, সামন্ততন্ত্র যখন ক্রমিক অবক্ষয়ের মুখে, ব্যবসা-বাণিজ্য যখন ক্রমবর্ধমান তখনই পুঁজিবাদে উত্তরণের পর্যায় শুরু হয় এবং শিল্প-বিপ্লবের পর তা চমকপ্রদভাবে রূপান্তরিত হয়ে পূর্ণতা পায়। মূলধনী সম্প্রদায় ধনতন্ত্রের সুযোগ নিয়ে উৎপাদনের উপাদানগুলি নিজেদের কুক্ষিগত করে। উৎপাদন কেন্দ্রীভূত হয় নানা কল-কারখানায়। মূলধনী মালিক সম্প্রদায় ধনতন্ত্রের সুযোগে উৎপাদিত শিল্পপণ্যের বিক্রি-জাত মুনাফায় ফুলে-ফেঁপে ওঠে। তাদের লক্ষ্য, শ্রমজীবীদের কম মজুরি দেওয়া, অধিক সময় খাটিয়ে অধিক উৎপাদন, উৎপন্ন পণ্য খুশিমতন দামে বিক্রি ক'রে অধিক মুনাফা, পণ্য বিক্রয়ের জন্য দেশে-বিদেশে বাজার অনুসন্ধান করা। ধনতন্ত্রবাদের উৎপত্তিতে রাষ্ট্রের ভূমিকাও ছিল উল্লেখযোগ্য। সরকারি নীতির ফলে শুধু শিল্পের নয়, ধনতন্ত্রেরও প্রসার ঘটেছে। এই ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ ধাপ ছিল সাম্রাজ্যবাদ যা উনিশ শতকের শেষ দিকে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

অন্যদিকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কুফলে শ্রমজীবী আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা তীব্র হয়ে ওঠে। শ্রমিক দরদী চিন্তানায়কগণ দীর্ঘকাল ধরে শ্রমিক সমবায় বা ইউনিয়নের গঠনের তত্ত্ব প্রচার করে শ্রমজীবীদের সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোঝান। তবে আগেই বলা হয়েছে, সরকার বা রাষ্ট্রগুলি ছিল ধনতন্ত্রের সমর্থক, তাই শ্রমিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা এবং নিজেদের লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া খুব সহজ ছিল না। তৎসত্ত্বেও শ্রমজীবী আন্দোলনের প্রসার চলতে থাকে।

শ্রমজীবী আন্দোলনের লক্ষ্যঃ শ্রমজীবী আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল ত্রিবিধ। এর প্রধান লক্ষ্য ছিল পুঁজিপতি শ্রেণীর বহুমুখী শোষণের হাত থেকে শ্রমিক শ্রেণীকে রক্ষা

1. এ বিষয়ে সবচাইতে সুন্দর আলোচনার জন্য দ্র. মরিস ডব, স্টাডিজ ইন দ্য ডেভেলাপমেন্ট অফ ক্যাপিটালইজম

করা। তবে শ্রমিক শ্রেণী যখন সংঘবদ্ধভাবে ও সচেতনভাবে আন্দোলন গড়ে তুলল, তখন তার নেতৃত্ব অনেক সময় শ্রমিকদের নিজেদের হাতে ছিল না, ছিল বুর্জোয়া বা পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে। তৎসত্ত্বেও আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করা। এই লক্ষ্যের মূলে মজুরির হার বৃদ্ধি, শ্রমের সময় হ্রাস ও বেকারত্ব বিরোধী আন্দোলনই ছিল প্রধান। তাছাড়া, শ্রমিক আন্দোলন শ্রমজীবীদের সামাজিক উন্নতি, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন তাদের আন্দোলনের এবং মাধ্যমে প্রশাসনের উপরে চাপ সৃষ্টি, সংসদে প্রতিনিধি প্রেরণ এবং শ্রমিক শ্রেণীর উন্নতিকল্পে আইন প্রণয়নও তাদের অন্যতম লক্ষ্য ছিল।

শ্রমিক 'শ্রেণী' ও শ্রমজীবী আন্দোলনের অনিবার্যতা ঃ শ্রমিক বা শ্রমজীবীদের 'শ্রেণী' (Class) বলা যায় কিনা, শ্রেণী হিসেবে তাদের চৈতন্য (Consciousness) কেমন ইত্যাদি নিয়ে নানা মত ও বিতর্ক আছে। শ্রমিকদের প্রসঙ্গে শ্রমজীবী শ্রেণী, অর্থাৎ শ্রমদান যাদের জীবিকা সেই মজুরদের প্রসঙ্গে শ্রমজীবী শ্রেণী (Working Class) কথাটি উনিশ শতকের গোড়ার দিকে, 1815 খ্রিস্টাব্দে প্রথম ব্যবহৃত হয়। ক্রমে তাদের নিয়ে আলোচনা যেমন শুরু হয়, তেমনি তারা নিজেরাও নানা দাবি দাওয়া নিয়ে আন্দোলন শুরু করে। শ্রমজীবীদের উন্নতি কল্পে শুধু আইন বা সাময়িক সমস্যা সমাধান নয়, অনেকে অর্থনৈতিক কাঠামো, সামাজিক পরিবর্তন এবং অনেকে শ্রেণী সংগ্রামের কথা বলেছেন। তবে এক কথা সকলেই বলেছেন যে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমজীবী শ্রেণীর দারিদ্র্য বেড়েছে, সুতরাং শ্রমজীবী আন্দোলনের লক্ষ্য হওয়া উচিত শ্রমিক শ্রেণীর উন্নতি। তবে এই প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছাড়াও বৃহত্তর রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সামাজিক বিষয়েও শ্রমজীবীরা ক্রমে সচেতন হয়ে উঠেছেন। কারখানা তথা শিল্প নগরীর পরিবেশ, চাকুরির অনিশ্চয়তা, মালিকদের নির্মম অত্যাচার, কম মজুর ইত্যাদি দূর করা, শ্রমের সময় নির্দিষ্ট করা, স্বাস্থ্য-খাদ্য শিক্ষার সুযোগ পাওয়া ইত্যাদি কারণে শ্রমজীবী আন্দোলন অনিবার্য হয়ে ওঠে। মনে রাখা দরকার যে, শিল্পোন্নয়নের প্রথম পর্বে ইয়োরোপে শ্রমজীবীদের অবস্থা ছিল দুর্বিষহ, ফলে নানা ক্ষোভ তাদের মধ্যে জমে ছিল। সুতরাং নিজেদের জীবন সংগ্রামে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখা এবং নিজেদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্যই সংঘবদ্ধ শ্রমজীবী আন্দোলনের সূচনা ও প্রসার ঘটে।

৩। ইংল্যাণ্ডে শ্রমজীবী আন্দোলন

ইয়োরোপ ভূখণ্ডের মধ্যে, যেমন ইংল্যাণ্ডে প্রথম শিল্প বিপ্লব ও তার ফল স্বরূপ শিল্পায়ন দেখা গিয়েছিল, তেমনি শ্রমজীবী আন্দোলনও প্রথম শুরু হয় ইংল্যাণ্ডে অষ্টাদশ শতকের শেষ দিক থেকে।[1] এই সময় সূতি বস্ত্রশিল্পে, রেশম ও পশম শিল্পে এবং শেফিল্ডের ইঞ্জিনিয়ারিং বা যন্ত্র শিল্পে শ্রমিক সংগঠন গড়ে ওঠে। *সিডনি* এবং *বিয়াট্রিচ*

ওয়েব লিখেছেন যে, প্রথম দিকে টোরী দল শ্রমিক আন্দোলনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করলেও পরে হুইগ দলের সমর্থনে শ্রমিক সংগঠনের বৃদ্ধি হয়। এছাড়া শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের সপক্ষে জনমতকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে উইলিয়াম কবেট, জন কার্টরাইট প্রমুখ কলম ধরেছিলেন। এর ফলে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং 1808 থেকে 1818 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে চারটি শ্রমিক ধর্মঘট হয়।

1815 খ্রিস্টাব্দের পর থিসেলউড নামক উগ্রপন্থী শ্রমিক নেতার প্ররোচনায় এক বন্দুকের দোকান লুটের ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে ব্রিটিশ সরকার শ্রমিকদের সভা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। এর প্রতিবাদে ম্যানচেস্টারের কারখানার প্রায় পঞ্চাশ হাজার শ্রমিক সেন্ট পিটার ময়দানে সভা করার সময় ব্রিটিশ সরকার ওয়াটার্লুর যুদ্ধজয়ী সৈন্যদের দিয়ে শ্রমিক সমাবেশে গুলি চালান। ফলে এগারো জন নিহত ও কয়েকশো আহত হয়। শ্রমিকরা সপরিবারে কম্বল কাঁধে সভায় এসেছিল বলে ঐ সভাকে 'March of the Blanketeers' বলা হয়। শ্রমিক সমিতি নিষিদ্ধ করণের আইনের বিরুদ্ধে ফ্রান্সিস প্লেস আন্দোলন সংগঠিত করেন। শেষ পর্যন্ত 1824 খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার শ্রমিক সভা-সমিতির উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন।

1824 খ্রিঃ থেকে 1834 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ইংল্যাণ্ডে প্রথম কয়েকটি ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ব্যাপারে দোহার্টি, রবার্ট আওয়েন প্রমুখ নেতৃত্ব দেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'গ্র্যান্ড ন্যাশানাল কনসলিডেটেড ট্রেড ইউনিয়ন' (1833)। আবার 1832 খ্রিস্টাব্দে ভোটাধিকার আইন পাশ হলে শ্রমিক শ্রেণীর বিশেষ সুবিধা না হলেও পার্লামেন্টের চরিত্র হয় গণমুখী। ফলে 1833 খ্রিঃ ফ্যাক্টরি আইন, 1834 খ্রিঃ দারিদ্র্য সহায়তা আইন (Poor Law), 1842 খ্রিস্টাব্দের শ্রমিক আইন ইত্যাদি পাশ হয়।

1836 খ্রিস্টাব্দের উইলিয়াম লভেট এবং ফ্রানসিস প্লেস 'লণ্ডন ওয়ার্কিং মেনস্ অ্যাসোসিয়েশন' গঠন করেন এবং এই সংগঠন ছয় দফা দাবি বা সনদ রচনা করেন। এই সনদের (Peoples Charter) ভিত্তিতে যে আন্দোলন শুরু হয় তা চার্টিস্ট আন্দোলন (Chartist Movement) নামে পরিচিত। মূল দাবিগুলি ছিল— (ক) বাৎসরিক পার্লামেন্ট নির্বাচন, (খ) জন সংখ্যার ভিত্তিতে সমান আয়তনের নির্বাচন কেন্দ্র গঠন, (গ) সার্বজনীন ভোটাধিকার, (ঘ) সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটাধিকার আইন বাতিল ঘোষণা, (ঙ) গোপন ব্যালট প্রথার মাধ্যমে ভোট দান, (চ) পার্লামেন্টের সদস্যদের ভাতা প্রদান ইত্যাদি। আপাততঃ চার্টিস্ট আন্দোলন নানাকারণে সফল না হলেও ভবিষ্যতে প্রায় সব দাবিই সরকার মেনে নেয়। 1868 খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস স্থাপিত হলে ব্রিটেনে শ্রমজীবী আন্দোলন আরও জোরদার হয়।

---

1. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্র. ইন্টারন্যাশানাল ওয়ার্কিং ক্লাস মুভমেন্ট, প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, মস্কো, প্রথম খণ্ড।

যেহেতু পৃথিবীতে সর্বপ্রথম ইংল্যাণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের প্রথম বিকাশ ঘটে এবং কারখানা প্রথার প্রবর্তন হয়, তাই ইংল্যাণ্ডেই প্রথম সংঘবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন দেখা যায়। ইংল্যাণ্ডেই সর্ব প্রথম কারখানার শ্রমিকদের দুর্বিষহ অবস্থা প্রকট হয়ে ওঠে এবং ক্রমে ক্রমে একই অবস্থা ইয়োরোপের অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশগুলিতেও দেখা যায়। 1870 খ্রিস্টাব্দের পর শিল্পের অগ্রগতি ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কারখানার শ্রমিকদের সুখ-সাদৃশ্যের প্রতি ইয়োরোপীয় দেশগুলির সরকার ধীরে ধীরে সজাগ হয়ে ওঠে। এই ব্যাপার উচ্চ ও মধ্যবিত্ত মানবতাবাদীগণ অনেক দিন ধরেই সক্রিয় ছিলেন। 1871 খ্রিস্টাব্দে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোন ইংল্যাণ্ডের শ্রমিকদের বৈধ ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকারকে স্বীকৃতি দিলে এক স্মরণীয় ঘটনা ঘটে। এর ফলে একদিকে যেমন শ্রমজীবী আন্দোলন মান্যতা ও স্বীকৃতি পায়, তেমনি ইংল্যাণ্ডে শ্রমিক দলের জন্ম হয়। ক্রমে বিভিন্ন শিল্পোন্নত দেশগুলির সরকার শ্রমিক কল্যাণমূলক নানা আইন এবং সামাজিক সংস্কারে মনোযোগী হন। আসলে 'কারখানা প্রথা'ই কারখানার শ্রমজীবীদের সংঘবদ্ধ হবার সহায়ক হয় এবং নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য তারা ট্রেড ইউনিয়ন বা শ্রমিক সংঘ গড়ে তুলতে যত্নবান হন। এই ব্যাপারে গ্রামীণ শ্রমিকদের চেয়ে, শহরের শ্রমজীবী সম্প্রদায় অনেক বেশি সোচ্চার ছিলেন।

1871 খ্রিস্টাব্দে ট্রেড ইউনিয়ন আইন প্রবর্তন করা হলে ইংল্যাণ্ডে শ্রমজীবীদের অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ দাবি পূরণ হলো। এই আইনের দ্বারা ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে সম্পত্তি বিষয়ক কিছু অধিকার দেওয়া হলো। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে দেখা হলো যে শ্রমজীবীগণ যাতে কলকারখানায় পিকেটিং বা হিংসাত্মক ধর্মঘট না করতে পারে। 1871 খ্রিস্টাব্দের আইন ছিল এক দিক পরিবর্তন যদিও তা ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের কাছে সন্তোষজনক মনে হয়নি। ডিসলরি মন্ত্রি সভা 1871 খ্রিস্টাব্দের আইনের বাধানিষেধগুলি প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন এবং 1877 খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট একটি ব্যাপক কারখানা আইন-বিধি প্রবর্তন করেছিলেন। সুতরাং উনিশ শতকের সত্তরের দশক থেকে প্রকৃতপক্ষে ইংল্যাণ্ডে শ্রমজীবী আন্দোলন বলিষ্ঠভাবে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু উনিশ শতকের প্রথম ষাট বছরের মধ্যেই এর ভিত্তি রচিত হয়েছিল। শিল্প বিপ্লবের পর শিল্পায়ন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রমিক অসন্তোষ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সরকার যেহেতু ছিল শিল্পায়নের পক্ষে, তাই শ্রমজীবীদের উন্নতি কল্পে তারা প্রথমে প্রয়াসী হয়নি। 1799 এবং 1800 খ্রিস্টাব্দে 'কম্বিনেশন অ্যাক্টস্' নামক আইন পাশ করে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট শিল্পোৎপাদনে কোন প্রকার বাধা সৃষ্টি করাই শ্রমিকদের পক্ষে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন। এর বিরুদ্ধে শুরু হয় আদিপর্বের শ্রমিক আন্দোলন, যা অনেকাংশে অ-সংগঠিত ছিল। এই সময় 'লুডাইট আন্দোলন' (Luddite Movement) শুরু হয়েছিল। যা প্রকৃত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন নয়, নিজেদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশমাত্র। শ্রমিকগণ মালিক নয়, যন্ত্রপাতিকেই

নিজেদের শত্রু মনে করে তা ভাঙতে শুরু করেছিল। 1824 খ্রিঃ ব্রিটিশ পার্লামেন্ট আগেকার (1799-1800) আইনগুলি বাতিল করে এক নতুন আইন পাশ করে, যার দ্বারা মালিক ও শ্রমিক উভয়ের অসুবিধাগুলি দূর করার চেষ্টা করা হয়। এতে শ্রমজীবীদের উপর যে নিষেধাজ্ঞা চাপানো হয়েছিল তা প্রত্যাহার ক'রে মালিক পক্ষের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হবার সুযোগ দেওয়া হয়। শ্রমজীবী মানুষজন অবশ্য তাদের দাবি আদায়ের জন্য ধর্মঘট করা অব্যাহত রাখে।

ইংল্যাণ্ডের শ্রমজীবীগণ বুঝেছিলেন যে যতদিন পর্যন্ত নির্বাচনে তারা ভোটাধিকার না পাবে এবং পার্লামেন্টে তাদের প্রতিনিধি পাঠাতে না পারবে, ততদিন তাদের দাবি পূরণ হওয়া কঠিন। এই উদ্দেশ্যেই 'চার্টিস্ট আন্দোলন' গড়ে উঠেছিল, যার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই আন্দোলনকারীরা তিনবার সংসদের কাছে আবেদন জানিয়েও ব্যর্থ হয়েছিল। পরে অবশ্য তাদের দাবি মেনে নেওয়া হয়। শ্রমজীবী আন্দোলনের ইতিহাসে চার্টিস্ট মুভমেন্ট তাই গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাসবিদ *জ্যাক ড্রজ* লিখেছেন যে, এই আন্দোলন থেকে মার্ক্স-এঙ্গেলস্‌ও প্রেরণা পেয়েছিলেন।

অ্যাণ্ড্রু কার্নেগী বলেছিলেন যে, "শিল্প মালিক বা শিল্প-উৎপাদক শ্রেণীর পক্ষে জোটবদ্ধ হওয়া যেমন একটি পবিত্র অধিকার, শ্রমিকদের পক্ষে জোটবদ্ধ হওয়া সেরূপ একটি পবিত্র অধিকার বলে গণ্য হওয়া উচিত।" শ্রমজীবী আন্দোলন অনেক সহায়তা লাভ করেছিল সমাজতন্ত্রী চিন্তানায়কদের কাছ থেকে। আদি যুগের এই সব চিন্তাশীল মানুষজন অনেকে নিজেরাই আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত শ্রমজীবী আন্দোলন সফল হয়। তবে পথ ছিল বন্ধুর, আদৌ মসৃণ নয়। 1866 খ্রিস্টাব্দে লণ্ডনের হাইড পার্কে ভোটাধিকারের দাবিতে এক জনসভা ডাকা হয়েছিল কিন্তু সরকার তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করায় ক্রুদ্ধ শ্রমিকরা হাইড পার্কের রেলিং উপড়ে-ভেঙে এক লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে দেয়, পুলিশ গুলি চালায়। এই ঘটনা গোটা ইয়োরোপের টনক নড়িয়ে দেয়। এর ফলেই 1870 এর পর ভোটাধিকার এবং ট্রেড ইউনিয়নের স্বীকৃতি দুটোই আসে। তবে ট্রেড ইউনিয়নগুলির উপর নানা কারণে হয়রানি এবং নির্যাতন অব্যাহত থাকে।

৪। ফ্রান্সে শ্রমজীবী আন্দোলন

উনিশ শতক থেকে ফ্রান্স, জার্মানি, রাশিয়া প্রমুখ ইয়োরোপের অন্যান্য দেশেও ব্রিটেনের মতোই শ্রমজীবী আন্দোলন সংগঠিত হয়। তবে যেমন শিল্প বিপ্লবের ক্ষেত্রে, তেমনি শ্রমজীবী আন্দোলনের ক্ষেত্রেও ইয়োরোপীয় দেশসমূহ ইংল্যাণ্ডের তুলনায় পিছিয়ে ছিল। ফ্রান্সে শ্রমজীবী আন্দোলন শুরু হয় জুলাই বিপ্লবের পর থেকে। 1831 খ্রিঃ থেকে 1834 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্যারিস, লিয়ঁ, বোর্দো প্রভৃতি শহরে শ্রমিক শ্রেণী আন্দোলন শুরু করে মূলত কাজের সময়সীমা নির্দিষ্ট করা এবং মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে। 'বুর্জোয়া

রাজা' লুই ফিলিপ সৈন্যদল দ্বারা শ্রমিক বিক্ষোভ দমন করেন। সেই পর্বে সাঁ সিমোঁ, অগাস্ত ব্লাঁকি প্রমুখ আদি যুগের সমাজতান্ত্রিকগণ শ্রমিক আন্দোলনকে সমর্থন জানান।

1847 খ্রিস্টাব্দে শস্যহানির ফলে খাদ্য শস্যের দাম বাড়লে শ্রমিকদের দুর্দশা বাড়ে। ঐ সময় লুই ব্লাঁ তার Organisation of Labour তত্ত্ব প্রচার করেন। ফ্রান্সে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের সময় (1848) শ্রমজীবী সম্প্রদায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ফ্রান্সে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হবার পর শ্রমজীবীদের কাজের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। শুরু হয় শ্রমিকভাতা দেওয়া। এজন্যে জাতীয় কর্মসংস্থার কেন্দ্র বা 'ন্যাশানাল ওয়ার্কশপ' স্থাপন করা হলেও, নতুন প্রজাতন্ত্রী সরকার এগুলি বন্ধ করে দেন। ফলে সমাজতন্ত্রীদের নেতৃত্বে হাজার হাজার শ্রমিক বিদ্রোহ করে এবং প্যারিসের রাস্তার ব্যারিকেড তৈরি করে। সরকার সেনাবাহিনী দিয়ে এই আন্দোলন দমন করেন। তৃতীয় নেপোলিয়ান ক্ষমতায় এসে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার, বিশেষ ক্ষেত্রে ধর্মঘটের অধিকার স্বীকার করেন। 1895 খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সে কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠন (C.G.T.) গঠিত হলে শ্রমজীবী আন্দোলন জোরদার হয়।

বস্তুতপক্ষে 1830 খ্রিস্টাব্দের জুলাই বিপ্লবের পর যে সংসদীয় ব্যবস্থা ফ্রান্সে কায়েম হয়েছিল তাতেই ফরাসি শ্রমজীবীগণ নিজেদের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রথম সচেতন হয়। সেই সময় শ্রমিকরা নিজেদের মুখপত্র প্রকাশ করতে শুরু করে এবং তার মাধ্যমে নিজেদের সমস্যা সম্পর্কে সরকার ও জনগণের কাছে মূল চিত্র তুলে ধরে। শুধু তাই নয়, ফরাসি শ্রমজীবীদের মধ্যে যে একটি প্রতিবাদের ও প্রতিরোধের মনোভাব জাগ্রত হয়ে উঠছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় লিয়ঁর বিদ্রোহে। লিয়ঁর রেশমশিল্পীরা শুধু স্বীকৃতি পাবার জন্যে সংঘবদ্ধভাবে আন্দোলন চালায় এবং তাতে সফল হয়। লিয়ঁর রেশমশিল্পীদের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে অন্যান্য কিছু শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকরাও সংঘ গড়ে তুলেছিলেন। 1839-40 খ্রিস্টাব্দে অর্থনৈতিক মন্দার সময় শ্রমজীবীগণ দিনে দশ ঘণ্টা কাজের দাবিতে ফ্রান্সে এক ব্যাপক ধর্মঘট করেন। তবু ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের আগে শ্রমিক সংহতি জোরদার হয়নি। 1848 খ্রিস্টাব্দে অবশ্য শুধু কলকারখানার শ্রমজীবী সম্প্রদায় নয়, সাধারণ কারিগর দর্জি, কামার, সূত্রধর প্রমুখ অসংগঠিত শিল্প শ্রমিকরাও বিপ্লবে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

ফ্রান্সে শ্রমজীবীদের ট্রেড ইউনিয়নের মান্যতা দিয়েছিলেন ফরাসি সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ান। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ধর্মঘটের অধিকার পর্যন্ত মেনে নেওয়া হয়। কিন্তু 1871 খ্রিস্টাব্দের 'প্যারিস কমিউন' নানা কারণে স্মরণীয়। বিদ্রোহের ফল স্বরূপ বলা যায় যে তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি তিয়ের শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের উপর অনেক নিষেধাজ্ঞা চাপালেও শ্রমজীবী আন্দোলন বন্ধ হয়নি। বরং তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের আমলে ফ্রান্সে শহরের শ্রমজীবীগণ ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন ও পরিচালনা করার দাবিতে

জোরদার হয়ে উঠেছিল। 1884 খ্রিস্টাব্দে একটি নতুন ট্রেড ইউনিয়ন আইনও প্রবর্তিত হয়, যা পূর্বেকার 1864 খ্রিস্টাব্দের আইনের ফাঁক পূরণ করেছিল।

৫। জার্মানিতে শ্রমজীবী আন্দোলন

জার্মানিতেও 1840 খ্রিস্টাব্দ থেকে শ্রমজীবী মানুষদের মধ্যে জাগরণ শুরু হয় এবং তাদের আন্দোলনের সূচনা লক্ষ্য করা যায়। এই আন্দোলন মুখ্যত ধর্মঘটের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে এবং এর ফলে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ফ্রান্সের মতন জার্মানিতেও শ্রম আইনগুলি ছিল কঠোর। ফলে শ্রমিক সংগঠন করা কঠিন ছিল। 1863 খ্রিস্টাব্দে ফার্দিনাণ্ড লাসাল প্রথম শ্রমিক দলের প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর 1869 খ্রিঃ অগাস্ট বেবেল নামে মার্ক্সের এক অনুগামী স্থাপন করেন সোস্যাল ডেমোক্র্যাট পার্টি। 1847 খ্রিঃ তাঁদের বিখ্যাত ধর্মঘট, 1848 -এর রেল ধর্মঘট ইত্যাদির যুগ পার হয়ে 1870 খ্রিঃ ধারাবাহিক ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সূচনা হয়। কিন্তু অটো ফন বিসমার্ক ক্ষমতাসীন থাকা পর্যন্ত (1890 খ্রিঃ) শ্রমিক আন্দোলন বা সমাজতন্ত্র জার্মানিতে তেমন প্রসারিত হতে পারেনি।

1844 খ্রিস্টাব্দে সাইলেশিয়ার বয়নশিল্পীরা যে আন্দোলন করেছিল তাতে ইয়োরোপের মানুষজন বিস্মিত হয়েছিল। এই আন্দোলনের কারণ ছিল আমেরিকার বস্ত্র রপ্তানির পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার ফলে বয়নশিল্পীরা যে চরম আর্থিক দুর্দশার মধ্যে পড়ে ছিল তার প্রতিবাদ করা। সেনাবাহিনীর সাহায্যে নির্লজ্জভাবে ঐ প্রতিবাদী আন্দোলন দমন করা হলেও তা জনমানসে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। সমসাময়িক জার্মান সাহিত্যিকদের রচনায় তার ছাপ আছে। কর্ম হীনতা, মজুরি হ্রাস ইত্যাদি কারণেও জার্মান শ্রমজীবীগণ সোচ্চার হয়েছিল। তারা নিজেদের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা সভাও আহ্বান করত। ক্রমে জার্মানিতে ফার্দিনাণ্ড লাসাল থেকে শুরু করে অনেকেই শ্রমজীবীদের নেতৃত্ব দেন। জার্মান সোস্যাল ডেমোক্র্যাট দলই শ্রমজীবী আন্দোলনে বিশেষ উদ্যোগ নেয়। বিসমার্ক যদিও সমাজতন্ত্রের, মার্ক্সবাদের এবং শ্রমজীবীদের উত্থানের বিরোধী ছিলেন তবু তাঁর আমলেই শ্রমজীবীদের জন্য জার্মানিতে 'কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক আইন' পাশ হয়। 1883 খ্রিস্টাব্দে শ্রমিকদের কল্যাণে অসুস্থবীমা চালু করা এবং পরের বছর থেকে এই বীমা চালু করার জন্য শিল্পপতিদের বাধ্য করা, 1887 খ্রিঃ আইনের দ্বারা কলকারখানায় নারী ও শিশু শ্রমিক নিয়োগ নিষিদ্ধ করা, শ্রমিকদের কাজের সময় সীমা নির্দিষ্ট করা, রবিবার ছুটির দিন ঘোষণা করা, 1889-এর আইনে বার্ধিক বীমা প্রবর্তন ইত্যাদির কথা এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে। হেজ মন্তব্য করেছেন যে, এর ফলে জার্মানি শিল্পোন্নত দেশ হতে পেরেছিল।"[1]

1. Carlton Hayes, *Contemporary Europe Since 1870, p. 145*

অন্যান্য দেশে শ্রমজীবী আন্দোলন : ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানির মতন ইয়োরোপের অন্যান্য দেশেও শ্রমজীবী আন্দোলন উনিশ শতকেই শুরু হয়েছিল। অবশ্য দেশ, কাল ও পাত্র ভেদে কিছু তারতম্য দেশগুলির মধ্যে ছিল। অস্ট্রিয়া, ইতালি, স্পেন প্রমুখ দেশে শ্রমজীবীদের সংগঠনগুলির মধ্যে মার্ক্সীয় প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। রাশিয়াতে সংঘবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন উনিশ শতকের শেষ দশকে শুরু হয়। তবে জোরদার হয় 1905 খ্রিস্টাব্দের অসফল বিপ্লবের পর। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, শ্রমজীবীদের ইউনিয়ন করবার অধিকার আইনী স্বীকৃতি পায় ইংল্যাণ্ডে 1871, ফ্রান্সে 1884, অস্ট্রিয়াতে 1870, জার্মানিতে 1890, স্পেনে 1881 এবং রাশিয়াতে 1906 খ্রিস্টাব্দে।

রাশিয়াতে 1906 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন নিষিদ্ধ ছিল। তবু 1878 খ্রিস্টাব্দ থেকে 1905 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণী বিভিন্ন আন্দোলনের মাধ্যমে সংগঠিত হতে শুরু করে। সেন্ট পিটার্সবার্গে শ্রমিক ধর্মঘট (1878-79); পুনরায় 1895 খ্রিস্টাব্দে এবং মস্কোর মরজোভ কারখানায় ধর্মঘট (1885) ইত্যাদির পাশাপাশি মার্ক্সবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত রাজনৈতিক দলগুলিও শ্রমজীবী মানুষদের সমর্থন করে। স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর উত্থানই রাশিয়ার ইতিহাসে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। 1905 খ্রিঃ থেকে 1917 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শ্রমিক শ্রেণীর ক্ষমতা ও সংহতি বৃদ্ধি পাওয়ার ফলেই 1917 খ্রিস্টাব্দের বলশেভিক বিপ্লব রাশিয়াতে সাফল্য লাভ করে।

অধ্যায় ১১

কাল্পনিক সমাজতন্ত্র এবং মার্ক্সবাদ

(**Syllabus:** *Utopian Socialism and Marxism*)

১। সমাজতন্ত্র কাকে বলে

সমাজতন্ত্র (Socialism) বা সমাজতন্ত্রবাদের (Socialist thought) সঠিক সংজ্ঞা নির্ধারণ করা সহজ নয়। মূলত সমাজতন্ত্র অন্যায়মূলক বা বৈষম্যমূলক সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দরিদ্র ও শোষিত সম্প্রদায়ের প্রতিবাদের রূপ বা আদর্শ। ন্যায্য অধিকার ও সাম্য লাভ করাই এর উদ্দেশ্য। চিন্তাবিদরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমাজতন্ত্র বা সমাজবাদের ব্যাখা দিয়েছেন।

তবে মূলসূত্রের দিকে লক্ষ্য বা দৃষ্টি রেখে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে যে সব কথা বলা যায় তা হলো—উৎপাদনের উপাদান (যেমন জমি, মূলধন,শ্রম) এবং বন্টন ব্যবস্থা থেকে ব্যক্তিগত মালিকানা দূর ক'রে বা লুপ্ত ক'রে রাষ্ট্র যদি সমগ্র সমাজের কল্যাণে সমস্ত দায়িত্ব নিজের নিয়ন্ত্রণাধীনে নিয়ে নেয় তাহলে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। কারণ সমাজতন্ত্র ব্যক্তিগত পুঁজিবাদের পরিবর্তে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থায় সমষ্টিগত বা সমাজগত মালিকানায় বিশ্বাসী। এই মতবাদ পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে উৎপাদনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত শ্রমজীবীদের স্বার্থরক্ষায় বিশ্বাসী। রাষ্ট্রই হলো একটা দেশের, সমগ্র সমাজের প্রতিনিধি। সুতবাং রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে এলে কেউ মুনাফা লুটে নিতে পারবে না। কেউ শোষিত ও নির্যাতিতও হবে না। উৎপাদন ও বণ্টনের মাধ্যমে যে অর্থ সঞ্চিত হবে তা সমাজের কল্যাণেই ব্যয়িত হবে। সুতরাং ব্যক্তিগত মালিকানার বিলোপ এবং উৎপাদনের উপাদানের রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও পুঁজিবাদের উচ্ছেদ— এই তিনটি হলো সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য।

২। সমাজতন্ত্রের উদ্ভব

আধুনিক বিশ্বের এক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও রাজনৈতিক মতাদর্শ (ideology) হলো সমাজতন্ত্র (Socialism)। সমাজতন্ত্রকে সমাজবাদ বা সমাজতন্ত্রবাদও বলা হয়। এর উদ্ভব প্রসঙ্গে বলা যায় যে, সমাজবাদ প্রকৃতপক্ষে শিল্প বিপ্লবের প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি। শিল্প-বিপ্লবের পর সৃষ্টি হলো একদিকে শিল্পপতি মূলধনী সম্প্রদায়, আর অন্যদিকে শিল্প শ্রমিক বা মেহনতী মানুষের দল। পূর্বের অধ্যায়ে আমরা এ বিষয়ে আলোচনাও করেছি। পুঁজিবাদ বা ধনতন্ত্র (Capitalism) উপরোক্ত এই দুই শ্রেণীর মধ্যে দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি করল।

ধনী হলো আরও ধনী আর গরিব হলো আরও গরিব। ধনতন্ত্রের এই ফলশ্রুতি উনবিংশ শতাব্দীতে শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবী ও চিন্তানায়কদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তাঁরা লক্ষ্য করলেন, পুঁজিপতি আর মেহনতী মানুষদের ক্রমবর্ধমান ব্যবধান সমাজ দেহের উপর নিদারুণ প্রভাব বিস্তার করেছে। সেই প্রভাব ও প্রতিফলনকে কেন্দ্র করে যে চিন্তাধারার উদ্ভব হলো তাই সোস্যালিজম বা সমাজতন্ত্র নামে খ্যাত।

অন্যভাবে বলা যায় যে শিল্পবিপ্লব, শিল্পায়ন এবং ফ্যাক্টরি প্রথার থেকে উদ্ভূত নানাবিধ দোষত্রুটি দূরীকরণের প্রয়োজনে একদিকে যেমন শ্রমজীবী আন্দোলনের উদ্ভব, তেমনি অপর দিকে দুই পরস্পর বিরোধী শ্রেণীর বৈষম্য দূরীকরণের রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসেবেই সমাজতন্ত্রের উদ্ভব হলো। শিল্পের প্রগতির পর প্রত্যেক দেশের জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি পেলেও সম্পদের বন্টন ব্যবস্থার মধ্যে ত্রুটি থাকার ফলে বৈষম্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। সম্পদ মুষ্টিমেয় ব্যক্তিবর্গের হাতে সঞ্চিত হয়। শ্রমজীবী সম্প্রদায় শ্রম মজুরির বিনিময়ে বিক্রি ক'রে, সামান্য পারিশ্রমিকে, দারিদ্র জীবনযাপন করতে থাকে। এইপার্থক্য কি করে দূর করা যায় সেই কথা সমাজতন্ত্রের মাধ্যমে বলার চেষ্টা হলো। তবে সমাজতন্ত্র ধীরে ধীরে যে রূপ পেতে থাকে তাতে দেখা যায় যে, তার ব্যাপক উদ্দেশ্যের মধ্যে প্রধান হলো শ্রেণী বৈষম্যহীন সমাজ। তাতে শুধু শিল্পপতি বা মূলধনী সম্প্রদায়ের সঙ্গে শিল্প শ্রমিকদের পার্থক্য নয়, কৃষক বা অন্যান্য সর্বহারা শ্রেণীর উন্নয়নের কথাও ভাবা হয় এবং সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের লক্ষ্য নির্ধারিত হয়।

পুঁজিবাদের উদ্ভব ঃ যেহেতু সমাজতন্ত্রের উদ্ভব পুঁজিবাদ বা ধনতন্ত্রের উদ্ভবের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ তাই সমাজতন্ত্রের স্বরূপ আলোচনা করার আগে সংক্ষেপে, পুঁজিবাদের উদ্ভব ও বিকাশ সংক্ষেপে আলোচনা করে নেওয়া দরকার। মূলসূত্রগুলি মনে রাখলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

(1) মধ্যযুগের অবসানের নানা লক্ষণগুলির অন্যতম হলো সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয় ও অবসান এবং সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণ (Transition from Feudalism to Capitalism); (2) এই উত্তরণ প্রক্রিয়া দীর্ঘসময় ধরে চলেছিল, একদিনে হয়নি। ফলে আধা সামন্ততান্ত্রিক আধা পুঁজিবাদী অবস্থাও অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়; (3) রেনেশাঁস, রিফর্মেশন এবং ভৌগোলিক আবিষ্কারের পর যখন ক্রমে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটল, তখন নবউত্থিত বণিক শ্রেণী একদিকে যেমন ক্ষমতাবান হলো, তেমনি অন্যদিকে তাদের হাতে পুঁজি জমল। এই পুঁজি বাণিজ্য প্রসূত তাই একে বাণিজ্য পুঁজি (Commercial Capital) বলা যায়। (4) শিল্প বিপ্লবের পর ইয়োরোপের নানা দেশে শিল্পায়নের যে দ্রুত বিকাশ হয় এবং তার ফলে সম্পদ বাড়ে তাতেই ধনতন্ত্র পূর্ণ বিকশিত হয়ে ওঠে; (5) শিল্প বিপ্লবের ফলে মূলধন বিনিয়োগ ক'রে উৎপাদিত শিল্প পণ্য থেকে মুনাফার মারফৎ যে শিল্প পুঁজি (Industrial Capital) সৃষ্টি হয়,তা জমতে থাকে মুষ্টিমেয়

পুঁজিবাদী শ্রেণীর (Capitalist class) হাতে; (6) এই পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদান সম্পূর্ণভাবে থাকে পুঁজিবাদী শ্রেণীর হাতে। শ্রমজীবী শ্রেণী শুধু শ্রমের বিনিময়ে মজুরি পায়,পণ্য বা মুনাফা থেকে তারা বঞ্চিত। (7) ধনতন্ত্রের বিকাশে উনিশ শতকের ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলি বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিল। (8) ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার পুনর্গঠন করে বিভিন্ন রাষ্ট্র শিল্পে লগ্নীর ব্যবস্থা করেন। শিল্পের লগ্নী এবং অগ্রগতি অবশ্য হয়েছিল দুই ধারায় — সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগে। এই শেষোক্ত বিভাগেই ধনতন্ত্রের ভূমিকা লক্ষ্যণীয়ভাবে সক্রিয় ছিল; (9) সরকার সহায়ক শুল্ক সংরক্ষণ নীতির মাধ্যমেও ধনতন্ত্রের বিকাশে সহায়তা করে; (10) শিল্পবিপ্লবের গোড়ার পর্বে পুঁজিবাদী শ্রেণী শ্রমজীবী মানুষদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত ক'রে নিজেদের মুনাফা অবাধে বাড়াবার চেষ্টা করে। ক্রমে শিল্পে একচেটিয়া কারবার যেমন দেখা যায় তেমনি পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাও দেখা যায়; (11) ধনতন্ত্রের ফলে তাই দেখা যায় দেশের মধ্যে বাজার দখলের লড়াই; (12) এইভাবে লড়াই চলতে চলতে তা জাতীয় সীমা লঙ্ঘন করে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। তখন শুরু হয় উপনিবেশ দখলের লড়াই, বাণিজ্যিক দ্বন্দ্ব এবং তার থেকে রাজনৈতিক বৈরিতা। এই স্তরকে সাম্রাজ্যবাদ বলা যেতে পারে, যা হচ্ছে লেনিনের ভাষায়, 'The highest stage of capitalism.

পুঁজিবাদ বা ধনতন্ত্রের ত্রুটি এবং সমাজতান্ত্রিক আদর্শের উদ্ভব ঃ ক্রমে ক্রমে দেখা গেল ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার নানাবিধ কুফল এবং সেই ঘটনার প্রতিক্রিয়াতেই ত্রুটিগুলি দূর করার জন্য সমাজতান্ত্রিক আদর্শের উদ্ভব ঘটল। অন্যভাষায় বলা যায় যে, ধনতন্ত্র ছিল এক বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থা এবং তার বিরোধী তত্ত্ব হিসেবে সমাজতন্ত্রের অভ্যুদয়।

ধনতন্ত্রে সম্পদ সমাজের মুষ্টিমেয় পুঁজিবাদী শ্রেণীর মানুষের হাতে জমা হয়। অর্থাৎ সম্পদের বণ্টনের মধ্যে গুরুতর ত্রুটি থেকে যায়। এই পুঁজিবাদী শ্রেণীর দ্বারা অন্যরা শোষিত হওয়ার ফলে অসাম্যের সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়তঃ, পুঁজিবাদী মালিক শ্রেণী নিজেদের মুনাফা বৃদ্ধির জন্য শ্রমজীবীদের শোষণ করে, এমনকি শ্রমিক অসন্তোষের সম্মুখীন হলে তারা দমনমূলক ব্যবস্থা পর্যন্ত গ্রহণ করে। এ ছাড়া তারা প্রভাব খাটিয়ে সরকারকে দিয়ে তাদের শ্রেণীর পক্ষে সহায়ক আইন পর্যন্ত রচনা করায়। অথচ শ্রমিকদের শ্রমের ফলেই শিল্পপণ্য উৎপাদিত হয়। তৃতীয়তঃ, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দেশের সাধারণ ক্রেতারাও ক্ষতিগ্রস্থ হয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অনেক সময় একচেটিয়া পুঁজি ও শিল্পের উদ্ভব হয়। যার উদ্দেশ্য থাকে যথাসম্ভব পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি। চতুর্থতঃ, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উদ্বৃত্ত পণ্য বিক্রয়ের জন্য বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়ার ফলে আন্তর্জাতিক বিরোধ বাড়ে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদক শ্রেণীর লক্ষ্য থাকে কাঁচামাল সংগ্রহ এবং শিল্পজাত পণ্য বিক্রয়ের জন্য বিদেশের বাজার দখল করা। ফলে উপনিবেশ দখলের জন্য

সাম্রাজ্যবাদী লোভ নগ্নভাবে আত্মপ্রকাশ করে। এই সাম্রাজ্যবাদের রূপ উনিশ শতকের শেষ দিকে আমরা দেখতে পাই। অবশ্য উনিশ শতকের প্রথমদিকেই দেখা গেল শ্রমজীবী শ্রেণীর দূরাবস্থা ও সামাজিক বৈষম্য। এসব দূর করার জন্য এক শ্রেণীর চিন্তানায়কগণ সম্পদের উৎপাদন এবং তাতে সমাজের অধিকার সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতে শুরু করেন। তারা সমাজে সম্পদের উৎপত্তি এবং তার সুষম বণ্টনের উপর জোর দেন। এই চিন্তা থেকেই সমাজতন্ত্রের আদর্শের সৃষ্টি।

৩। কাল্পনিক সমাজতন্ত্র কা'কে বলে

পটভূমিকা : সমাজতন্ত্রবাদের সূচনা হয় উনিশ শতকে অর্থাৎ আধুনিক যুগে। তবে এর উদ্ভবের আগেও প্রাচীন ও মধ্যযুগে অস্পষ্ট এক চিন্তাধারার আভাস পাওয়া যায় যা ঠিক সমাজতান্ত্রিক না হলেও অসাম্যদূরীকরণের চেষ্টা বলা যেতে পারে। বাইবেলে এক ধরণের আদিম সমাজতন্ত্রের কথা আছে বলে কিছু লোক বিশ্বাস করেন। ষোড়শ শতকে ইয়োরোপে রিফর্মেশন আন্দোলনের সময় অ্যানা ব্যাপটিস্ট আন্দোলনের মধ্যে এক শ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক ভাবনার প্রকাশ দেখা যায়। টমাস মোর তার 'ইউটোপিয়া' গ্রন্থেও এক ধরণের কাল্পনিক সমাজতন্ত্রের আভাস দিয়েছিলেন। এছাড়া কাম্পাসেনল্লা, উইনস্ট্যানলি, লেভেলার্সপন্থী চিন্তাবিদগণ অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে সাম্য এবং সমাজ পরিবর্তনের কথা বলেছিলেন। ফরাসি বিপ্লবের আগে রুশোও ছিলেন অসাম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার। এই সব ভাবনা উনিশ শতকে আবির্ভূত সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের পটভূমিকা রচনা করে।

সমাজতন্ত্রের দুটি পর্যায় : সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার উদ্ভবের ইতিহাসে আমরা দুটি পর্যায় লক্ষ্য করি। আদি সমাজতন্ত্রবাদীদের প্রচারিত সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে বলা হয় কাল্পনিক বা স্বপ্নবিলাসী (Utopian) সমাজতন্ত্র। উত্তরকালে কার্ল মার্ক্স এবং তাঁর সহযোগী ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস্ যে সমাজতন্ত্রের কথা বলেছেন, যা বর্তমানে মার্ক্সবাদ (Marxism) নামে পরিচিত, তাকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র (Scientific Socialism) বলা হয়।

আদিযুগের সমাজতন্ত্রের প্রবক্তাদের মধ্যে ইংল্যাণ্ডের রবার্ট আওয়েন এবং ফ্রান্সের সাঁ সিমোঁ (ইংরেজি উচ্চারণে সেন্ট সাইমন) সমধিক পরিচিত। সুষম ধন বণ্টন এবং শ্রমজীবী শ্রেণীর অবস্থার উন্নতিই ছিল তাদের লক্ষ্য। মনে পড়ে যায় যে ফরাসি বিপ্লবের সময়েই জ্যাকবাঁ পন্থী *এবের* (Hebert), *ব্রিসো* (Brissot) প্রমুখ সাম্যবাদী ধনবণ্টনের কথা বলেছিলেন এবং *ববুফ* (Babeuf) যে 'সাম্যের ষড়যন্ত্র' করে অভিযুক্ত হন, তাতেই সম্পত্তি বিলোপ করে এক সাম্যবাদী সমাজ ছিল মূল লক্ষ্য। যাই হোক ক্রমে ক্রমে আওয়েন এবং সাঁ সিমোঁ ছাড়াও শার্ল ফুরিয়ে, যোসেফ প্রাঁধো, লুই ব্লা, ফার্দিনাণ্ড লাসাল, মাইকেল বাকুনিন, অগাস্ট ব্লাঁকি প্রমুখ তাত্ত্বিকগণ সমাজতান্ত্রিকদর্শনের কথা বলেছিলেন।

এদের মধ্যে প্রুঁধো, বাকুনিন প্রমুখকে সমাজতন্ত্রী না বলে নৈরাজ্যবাদী (Anarchist)

রূপেই চিহ্নিত করা হয়। আর রবার্ট আওয়েন, সাঁ সিমোঁ, ফুরিয়ে প্রমুখ সমাজবাদীগণ শোষণের সমালোচনা করলেও এবং অসাম্যের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক দর্শনের কথা বললেও সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের কোনও বাস্তব দিক বা পদ্ধতি প্রসঙ্গে সূত্র নির্দেশ করেন নি। তাই আদি যুগের সমাজতন্ত্রীদের কাল্পনিক সমাজতন্ত্রী বলা হয়। মনে রাখা দরকার যে, কার্লমার্ক্স স্বয়ং 'সোস্যালিজম ইউটোপিয়ান অ্যাণ্ড সায়েন্টিফিক' গ্রন্থে পূর্বসূরী সমাজতন্ত্রীদের কাল্পনিক আখ্যা দিয়েছেন। তবে সমাজবাদী চিন্তাধারার ইতিহাসে আদি যুগের কাল্পনিক সমাজতন্ত্রীদের অবদান অস্বীকার করা যায় না। সেজন্য ইতিহাসের আলোচনায় কয়েকজন ইউটোপিয়ান সোস্যালিস্ট বা কাল্পনিক সমাজবাদীদের সম্পর্কে ধারণা থাকা দরকার। আমরা সেই আলোচনার আগে সোস্যালিজম বা সমাজতন্ত্রের মূলসূত্রগুলির সংক্ষেপে উল্লেখ করে দিতে চাই।

সমাজতন্ত্রের মূলসূত্র ঃ যদিও কাল্পনিক সমাজতন্ত্রের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের গুরুতর পার্থক্য আছে তবু উভয় ধরণের সমাজতন্ত্রের মধ্যে মিলও আছে। মোটামুটিভাবে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার কুফল এবং সুষম সম্পদ বণ্টন, শোষণের সমালোচনা, অসাম্যের বিরুদ্ধে মত স্পষ্ট। সমাজতন্ত্রের মূলসূত্রগুলিকে নিম্নলিখিত সূত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা যেতে পারে। (ক) প্রাকৃতিক সম্পদে সকল ব্যক্তির সমান অধিকার আছে। যেমন— জমি, জল, অরণ্য ইত্যাদি কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয় কারণ এগুলি কারো পরিশ্রমের দ্বারা সৃষ্ট হয়নি। প্রকৃতিই এগুলি সৃষ্টি করেছে। সুতরাং এগুলির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা থাকতে পারে না। (খ) কোনও গোষ্ঠী বা শ্রেণী বা ব্যক্তি যদি প্রাকৃতিক সম্পদের একচেটিয়া অধিকার বা মালিকানা দাবি করে তবে তা অসংগত। ব্যক্তিগত সম্পদ (Private property) থেকে নানা অসাম্যের সৃষ্টি। (গ) জীবিকার অধিকার (Right to work) প্রতি নাগরিকেরই থাকা দরকার। কারো কর্মসংস্থান না থাকলে রাষ্ট্রের কর্তব্য হলো তার কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। অন্যভাষায় বলা যায় যে, বেকারি দূরীকরণ রাষ্ট্রের কর্তব্য। (ঘ) যেহেতু পুঁজিবাদী সমাজে মুষ্টিমেয় এক শ্রেণীর হাতে সম্পদ পুঞ্জিভূত হয় এবং অন্যেরা থাকে বঞ্চিত, তাই রাষ্ট্রের কর্তব্য সঞ্চিত সম্পদের পুনর্গঠন করা। (ঙ) সাম্য বা সম অধিকার স্থাপনই সমাজতন্ত্রের মূলকথা। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মূল লক্ষ্য সাম্যবাদ (Communism)। সমাজতন্ত্র হলো সাম্যবাদী সমাজে উত্তরণের প্রথম পর্যায়। (চ)সমাজতন্ত্রে উৎপাদনের উপাদান রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে থাকে। ব্যক্তিগত শিল্প উদ্যোগ ও সম্পত্তির অধিকারের বিলোপ সাধন করে ব্যক্তি বা শ্রেণীভিত্তিক মুনাফা লাভের ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে শোষণ বন্ধ করে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে অসাম্য লুপ্ত হয়। (ছ) এই ভাবে চলতে পারলে সমাজে শ্রেণী বৈষম্য দূর হতে পারে। শ্রমজীবীদের শ্রমদ্বারা উৎপন্ন সম্পদ সুষমভাবে বণ্টিত হলে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সর্বহারার একনায়কত্ব (Dictatorship of the Proletariat)।

৪। রবার্ট আওয়েন (Robert Owen, 1771 - 1858)

আওয়েন ছিলেন ব্রিটিশ সমাজতন্ত্রের জনক। তিনিই প্রথম 'সোস্যালিজম' কথাটি ব্যবহার করেছিলেন। তিনি স্বয়ং 1800 খ্রিস্টাব্দে স্কটল্যান্ডের নিউ লানার্ক নগরে একটি আদর্শ কারখানা স্থাপন করেন। সেখানে মালিকের স্বার্থ ক্ষুন্ন না করেও শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হত। 1805 খ্রিঃ কারখানাটি পুনর্গঠিত হয়। তিনি 1824–25 খ্রিস্টাব্দে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানাতে স্বেচ্ছাক্রমে স্বয়ংশাসিত অর্থনীতিযুক্ত একটি সমাজতান্ত্রিক সমবায় সমিতি গড়ে তোলার চেষ্টা করেন।

তিনি এই নব সমাজের নাম দিয়েছিলেন 'নবসমন্বয়' বা 'New Harmony'। তিনি বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠার ও শ্রমিক শোষণের তীব্র বিরোধী ছিলেন এবং মানুষের নৈতিক উন্নতি অপেক্ষা সামাজিক পরিবর্তনের উপর জোর দিয়েছিলেন। নিউ হারমনিতে সম্পূর্ণ ঐক্য এবং সকলের অংশ গ্রহণের ভিত্তিতে একটি যৌথ সমাজ গড়ে তোলার চেষ্টা হয়। অধ্যাপক সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী লিখেছেন ঃ "তাঁর আদর্শের বাস্তব রূপায়নের প্রচেষ্টা সফল না হলেও, তাঁর আদর্শ হারিয়ে যায়নি। এছাড়া ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তোলার ব্যাপারেও তাঁর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য ছিল। ওয়েন একটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন (Grand National Consolidated Trades Union)। ওয়েন-এর সমবায়ের ভিত্তিতে কাজ করার আদর্শও কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছিল।"

একথা সত্য যে, রবার্ট আওয়েনের প্রায় সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। কিন্তু তিনিই যে ইংল্যাণ্ডে সমাজতন্ত্রের আদর্শ প্রচার ও বাস্তবে তাঁর প্রয়োগের চেষ্টা করেছিলেন সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ব্রিটেনের অনেক কারখানায় ছোট আকারে ধর্মঘট হয়। ডরসেটশায়ারে একটি ইউনিয়নের সদস্য হিসেবে 'বেআইনী শপথ' নেবার অভিযোগ ওঠে কিছু শ্রমিকের বিরুদ্ধে। তাদের শাস্তিও দেওয়া হয়। ক্রমে আওয়েন ও তার অনুগামীরা সমবায় আন্দোলনের দিকে বেশি ঝুঁকে পড়েছিলেন। আওয়েন-এর অনুপ্রেরণায় 1844 খ্রিঃ ল্যাঙ্কাশায়ারে সমবায়ের ভিত্তিতে একটি ছোট দোকান খোলা হয়েছিল। তা মোটামুটি সফলও হয়। 1851 খ্রিঃ উত্তর ইংল্যাণ্ডে এবং স্কটল্যাণ্ডে এই ধরনের প্রায় 130 টি সমবায় দোকান খোলা হয়েছিল। রাজনীতিতে অবশ্য আওয়েনের তেমন প্রভাব ছিল না।

আরও দুটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক, রবার্ট আওয়েন -এর মতবাদ 'নিউ ভিউ অফ সোসাইটি' এবং 'রিপোর্ট টু দ্য কাউণ্টি অফ লানার্ক' নামক গ্রন্থ দুটিতে বিষদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দুই, ভারতীয় নবজাগরণের অগ্রদূত রাজা রামমোহন রায় শেষ জীবনে ইংল্যাণ্ডে যান এবং সেখানেই তাঁর প্রয়াণ ঘটে বাথ শহরে। রামমোহন রায় আওয়েন-এর কাজকর্মের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং শোষণের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের

অধিকার রক্ষার দাবির সমর্থকও ছিলেন। অর্থাৎ তিনি আওয়েনের মতাদর্শে বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

৫। সাঁ সিমোঁ (Saint Simon, 1730-1825)

ফরাসি দার্শনিকদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সমাজতন্ত্রের জনক। এক শিক্ষিত পরিবারে জন্মেও তিনি দরিদ্র ও নিপীড়িতদের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি মূলধনী সম্প্রদায় ও শ্রমিকদের মধ্যে সুষ্ঠু সহযোগিতার কথা প্রচার করেন। তাঁর মতবাদের মূলকথা হলো অর্থনৈতিক সাম্যের উপর ভিত্তি করে প্রতিযোগিতাহীন ব্যক্তিগত স্বার্থশূন্য সমাজ গঠন। তিনি শ্রমিক-মালিক সহযোগিতা ও সমবায়ের উপর গুরুত্ব দেন। ইতিহাসের অগ্রগতির সঙ্গে প্রত্যেকের কর্মসংস্থানে রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা, বিশ্বজনীন সংহতি ইত্যাদি ছিল তাঁর মূল আলোচ্য বিষয়।

অভিজাত বংশের সন্তান ছিলেন সাঁ সিমোঁ। ফরাসি বিপ্লবের সময় তিনি নিজের উপাধি ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর বক্তব্যের মূলকথা ছিল 'মানুষের কাজ করা দরকার' বা 'মানুষকে অবশ্যই কাজ করতে হবে'(Man must work)। সম্পত্তির অধিকার তার সামাজিক উপযোগিতার উপরেই নির্ভরশীল হওয়া প্রয়োজন বলে তিনি মনে করতেন। ইংল্যাণ্ডে যেমন রবার্ট আওয়েন রাজনীতিতে বেশি প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি, তেমনি ফ্রান্সেও সাঁ সিমোঁ-র খুব বেশি প্রভাব ছিলনা। তাছাড়া তিনি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে সন্দিগ্ধ ছিলেন। তবে সাঁ সিমোঁ-র বক্তব্য অনুধাবন যোগ্য। যেমন, তিনি বলেছিলেন শিল্প সমাজের সমস্যা বুঝতে গেলে অর্থনৈতিক সমস্যার স্বরূপ বুঝতে হবে। ধনবন্টনের দ্বারা ধনী দরিদ্রের যে বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে তা দূর না হলে সমাজে শান্তি ও স্থিতি আসবে না। সমাজে মানুষ যাতে দরিদ্র ও অবহেলিত শ্রেণীর উন্নয়নে ব্রতী হয় সেজন্য নীতিবোধ ও শিক্ষার প্রসার হওয়া দরকার। এজন্য মানবতাবাদী ব্যক্তিদের উদ্যোগ নেওয়া দরকার। বিশেষত শ্রমিক মালিকের সহযোগিতা ও সমবায়ের উপর সাঁ সিমোঁ গুরুত্ব আরোপ করেন।

৬। শার্ল ফুরিয়ে (Charles Fourier, 1772-1837)

শার্ল ফুরিয়ে ছিলেন সাঁ সিমোঁর সমসাময়িক। তাঁর মতে সমাজে প্রতিযোগিতা এবং মুনাফার লোভ হলো অসাম্যের কারণ। এজন্য তিনি সহযোগিতামূলক সামাজিক সংগঠনের (ফরাসি ভাষায় ফ্যাল্যানস্তার) কথা বলেছেন। এই সংগঠন বা কমিউন ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, সাম্যের বিনিময়ে সম্পদ বন্টিত হবে। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে ('তিওরি দ্য কাতর মুভর্মঁ') যৌথ বসতি, কাজ, শ্রম ও সম্পদ ভোগের কথা বলেছেন।

শার্ল ফুরিয়ে বাণিজ্যের প্রভাবের তীব্র বিরোধী ছিলেন। কাজকে আকর্ষণীয় করার জন্যে প্রত্যেক শ্রমিককেই তার উৎপাদনের অংশ দেওয়া প্রয়োজন বলে তিনি মনে

করতেন। ফুরিয়ে প্রতিযোগিতার পরিবর্তে বিভিন্ন মানুষের সমবেত প্রচেষ্টার ওপরে জোর দিয়েছিলেন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানেও তাঁর আদর্শের ভিত্তিতে রচিত সমাজ গড়ে ওঠে। ফুরিয়ের লেখাও বেশ আদৃত ছিল; তবু বাস্তবে তাঁর অস্পষ্ট আদর্শ তেমন প্রভাব ফেলতে পারে নি। ফুরিয়ের মতে সমাজে যদি সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণ না হয় তাহলে পুঁজিবাদ সব কিছুই গ্রাস করে ফেলবে।

শার্ল ফুরিয়ের মতে অর্থনৈতিক শোষণ বন্ধ করতে হলে নিজের শ্রমে প্রস্তুত দ্রব্য নিজে ভোগ করা দরকার। তাই স্বয়ং কমিউন বা ফ্যাল্যানস্তার প্রতিষ্ঠা করা দরকার। এই কারণেই তিনি দেড় হাজার লোক নিয়ে এক একটি ফ্যালানস্তার বা কমিউন গঠনের কথা বলেছেন। এই সব কমিউনে জনগণ নিজ পরিশ্রমে খাদ্য-বস্ত্র প্রভৃতি উৎপাদন ও ভোগ করতে পারবে। তাঁর মতে ফ্যালানস্তারগুলি হবে নিম্নতম জনসংগঠন। এই সব কমিউনে বিভিন্ন আয়ের, বিভিন্ন পেশার মানুষজন একত্রে বসবাস করে এবং তাদের আয় তারা এই কমিউনের জন্য ব্যয় করবে। কমিউন আবার তা নিজ সদস্যদের প্রয়োজন মত ব্যয় করবে। তিনি জাতীয় সম্পত্তির আয়ের ভাগ মালিক বা পুঁজিপতি শ্রেণী, শ্রমজীবী সম্প্রদায় এবং কলাকুশলী, বিজ্ঞানী, পরিচালকদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন।

৭। লুই ব্লাঁ (Louis Blanc, 1811-1882)

লুই ব্লাঁ তাঁর 'রিভু দ্যু প্রগেস' গ্রন্থে সমাজতন্ত্রের আদর্শ প্রচার করেন। এই গ্রন্থে তিনি ধনতন্ত্রের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। তাছাড়া শ্রমিকের সংগঠনতত্ত্ব গ্রন্থে তিনি সরকারকে শ্রমিক কল্যাণমূলক আইন রচনায় বাধ্য করার জন্য শ্রমিক আন্দোলনের কথা বলেন। তিনি যখন তাঁর 'শ্রমের সংগঠন' শীর্ষক পুস্তক প্রকাশ করলেন তখন তাঁর প্রভাব ব্যাপ্তি লাভ করেছিল। তাঁর মতে সামাজিক সংস্কার সাধনের একমাত্র উপায় হলো রাজনৈতিক সংস্কার।সমাজবাদ রাষ্ট্রের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠা করার কথা তিনি বলেন। কাজের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও দুর্বল শ্রেণীর মানুষকে রক্ষা করা হলো রাষ্ট্রের কর্তব্য। লুই ব্লাঁ 'সামাজিক কারখানা' প্রতিষ্ঠার কথাও বলেন। ফ্রান্সে 1848 খ্রিস্টাব্দে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পরে লুই ব্লাঁ-র কিছু তত্ত্ব রূপায়িত করার চেষ্টা করা হয়।

বস্তুত আদি যুগের সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে ফ্রান্সের লুই ব্লাঁ বিখ্যাত ছিলেন। শিল্প-বিপ্লবের ফলে ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে ধনতন্ত্রের প্রসার ও প্রভাব লক্ষ্য করে তিনি চিন্তিত ছিলেন। তিনি শ্রমের সংগঠন বা Organisation of Labour লিখে বিশেষ খ্যাতি পান। তাঁর মতে, শ্রমজীবী সম্প্রদায় গণভোটের দ্বারা ভোটাধিকার পেলে রাষ্ট্র বাধ্য হয়েই শ্রমজীবীদের স্বার্থে আইন রচনা করবে। তাই শুধু কল-কারখানায় অন্যায়ের প্রতিবাদে ধর্মঘট করলে চলবে না, শ্রমিকদের লাভ করতে হবে গণভোটের অধিকার।

কারণ, তাঁর মতে, রাষ্ট্র শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষ সমর্থন করে আইন রচনা করবে, নতুবা মালিকশ্রেণী স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে শ্রমিক শোষণ বন্ধ করবে না।

লুই ব্লাঁ-র মতে, শ্রমজীবী সম্প্রদায় যদি ভোটাধিকার পায় তবে তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা শ্রমজীবীদের স্বার্থরক্ষার জন্য আইন রচনা করবে। ব্লাঁ-র অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন। আবার ব্লাঁ ব্যক্তিগত উদ্যোগে শিল্প স্থাপন পছন্দ করতেন না। তাঁর মতে ব্যক্তিগত উদ্যোগের অর্থই হলো মুনাফালাভের জন্য দ্বন্দ্ব এবং প্রতিযোগিতা। এই দ্বন্দ্বের মধ্যে শ্রমিক শোষণ ঘটতে বাধ্য। শিল্পেও সংকট দেখা দিতে পারে। সেই কারণেই তিনি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে শিল্পস্থাপন চাইতেন। তাঁর মতে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে স্থাপিত বৃহদায়তন কল-কারখানায় যদি উৎপাদন হয় তাহলে ব্যক্তিগত মালিকানা, উদ্যোগ এবং শোষণ বন্ধ হবে। এই সব রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে দক্ষতা অনুযায়ী শ্রমদান করে নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী পারিশ্রমিক পেলে শ্রমজীবী শ্রেণীর উন্নতি ঘটবে। লুই ব্লাঁ-র চিন্তাধারার অন্যতম প্রধান সূত্রছিল 'জাতীয় কারখানা' বা 'ন্যাশানাল ওয়ার্কশপ' স্থাপন,যা ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পরে ফ্রান্সে স্থাপন করবার চেষ্টা হয়েছিল। যদিও শেষ পর্যন্ত বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরোধিতায় তা পরিত্যক্ত হয়। তাঁর চিন্তার আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল 'কাজের অধিকার' বা Right to work স্বীকার করে নেওয়া। তিনি এই আদর্শ প্রচারও করতেন। বস্তুত মার্ক্সবাদের অব্যবহিত আগে সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে লুই ব্লাঁ বিশেষ স্মরণীয়।

৮। অন্যান্য সমাজতন্ত্রীগণ

রবার্ট আওয়েন, সাঁ সিমোঁ, শার্ল ফুরিয়ে, লুই ব্লাঁ -এই চারজন ছিলেন আদি কাল্পনিক সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধি। সেই কারণে এদের সম্পর্কে আমরা স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করেছি। এছাড়া আরও তিনটি কথা মনে রাখা দরকার। (ক) এরা ছাড়াও আরও কেউ কেউ ছিলেন যারা আদি সমাজতন্ত্রী গোষ্ঠীভুক্ত হওয়ার যোগ্য। তারা সকলেই ধনতন্ত্রের বিপক্ষে এবং শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে কথা বলেছিলেন। (খ) আরেক ধরণের চিন্তাবিদ আবির্ভূত হয়েছিলেন যাদের ঠিক সমাজতন্ত্রী না বলে নৈরাজ্যবাদী (anarchist) বলা ভালো। এরাও ছিলেন পুঁজিবাদের বিপক্ষে এবং শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে। তবে কাল্পনিক সমাজতন্ত্রীরা যেমন মার্ক্সবাদের পূর্বসূরী, নৈরাজ্যবাদীরা অনেকে সমসাময়িক। (গ) এছাড়া উনিশ শতকে ইয়োরোপে নানা সমাজবাদী গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল।

অন্যান্য আদি সমাজতন্ত্রীগণ : 1834 খ্রিস্টাব্দে পিয়ের ল্যরু (Pierre Leroux) প্রথম ফ্রান্সে 'সমাজবাদ' কথাটি ব্যবহার করেছিলেন। ক্রমে ফুরিয়ে, সাঁ সিমোঁ, লুই ব্লাঁ বা প্রুঁধ প্রমুখ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ত্রুটি ও বৈষম্য সম্পর্কে তীক্ষ্ন মন্তব্য করেন এবং প্রচলিত ব্যবস্থাকে তীব্রভাষায় আক্রমণ করেন। এদের অনেকেই শুধু রাজনৈতিক ও

সামাজিক সাম্যই নয়, আর্থনীতিক সাম্যেরও দাবি করেছিলেন। এছাড়া অনেকে ছিলেন, যেমন অগাস্ট ব্লাঁকি (Blanquie 1805-1881), কিংবা ফিলিপ বুয়েনারোতি (1767-1837)। এদের মধ্যেও অস্পষ্ট সমাজবাদের ধারণা জড়িয়েছিল। ব্লাঁকি সম্ভবত 1837 খ্রিস্টাব্দে প্রথম 'শিল্পবিপ্লব' কথাটি ব্যবহার করেছিলেন। ব্লাঁকি বলেছিলেন যে, মূলধনী শ্রেণী নিজের থেকে মুনাফা ও শোষণমূলক মনোবৃত্তি ত্যাগ করবে না। কারণ তাদের স্বার্থ ভিন্ন। তাদের মধ্যে সমন্বয় গঠন সম্ভব নয়। শ্রমজীবীদের মজুরি ও মালিকশ্রেণীর মুনাফাকে তিনিই বৈষম্য হিসেবে দেখান। ফ্রান্সের মতন জার্মানিতে লাসাল, লাইবনিৎস্ প্রমুখ সমাজবাদী অস্পষ্ট সমাজতন্ত্রের দ্বারা প্রণোদিত হয়েছিলেন। ফার্দিনাণ্ড লাসালের মত ছিল যে শিল্প-কারখানার মালিকানা সমজীবীদের বা শ্রমিক সমবায়ের হাতেই থাকা উচিত। এজন্য প্রয়োজনীয় আইন রাষ্ট্রের উদ্যোগেই করতে হবে। শিল্প সমবায় গড়ে তোলার জন্যও শ্রমিক সমবায়গুলিকে রাষ্ট্রের ঋণ দেওয়া উচিত। এই সব সমবায় দ্বারা পরিচালিত কল-কারখানা থেকে শ্রমিকগণ তাদের মজুরি ছাড়াও মুনাফার অংশ পেতে পারবে।

নৈরাজ্যবাদীগণ ঃ নৈরাজ্যবাদীদের (Anarchist) সঙ্গে শুধু ক্যাথলিক সমাজতন্ত্রীদের নয়, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের অর্থাৎ মার্ক্সবাদেরও ঘোরতর পার্থক্য রয়েছে। নৈরাজ্যবাদীদের সঙ্গে সমাজতন্ত্রীদের মিল এইখানে যে, তাঁরাও ধনতন্ত্র ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সমালোচনা করেছিলেন। তারাও শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের ভালো চাইতেন। কিন্তু নৈরাজ্যবাদীরা মার্ক্সবাদের সমালোচক ছিলেন।

নৈরাজ্যবাদীদের মধ্যে দুজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এরা হলেন ফরাসি প্রুঁধো এবং রুশ বাকুনিন। তাছাড়া ক্রপোটকিনও এক উল্লেখযোগ্য নৈরাজ্যবাদী। উনিশ শতকের ফ্রান্সের অন্যতম চিন্তাবিদ যোসেফ প্রুঁধো (Proudhon,1809-1865) ছিলেন নৈরাজ্যবাদের জনক। সদাচারী এবং মধুর স্বভাবের জন্য তিনি জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি সাঁ সিমোঁ ও শার্ল ফুরিয়ে-র সমাজতন্ত্রী মতবাদের বিরোধী ছিলেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে সংস্কারের কর্মসূচি দ্বারা সমাজ পরিবর্তন সম্ভব নয়। প্রুঁধো সততা, ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা ইত্যাদি নৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। মানুষের পূর্ণ বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ করা দরকার — একথাও তিনি প্রচার করেন। তাঁর মতে জনগণের দ্বারা গঠিত যে-কোনও প্রকার সরকার হলো নির্যাতনের যন্ত্র। নৈরাজ্য ও শান্তির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে না পারলে সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন যে সম্ভব নয় তা তিনি মনে করতেন। প্রুঁধো মার্ক্সবাদ তথা কমিউনিজমের বিরোধী ছিলেন। প্রুঁধোর মতে, "সম্পত্তির অধিকারের অর্থ যদি সবল কর্তৃক দুর্বলের শোষণ হয়, তাহলে সাম্যবাদ হলো দুর্বলের দ্বারা যৌথভাবে সবলকে শোষণ করা।" তিনি ভাবতেন কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে সকল ক্ষমতার আধার হল রাষ্ট্রা, যে জনগণের শোষকে পরিণত হয়। মার্ক্সের সঙ্গেও প্রুঁধোর তীব্র মতপার্থক্য ঘটেছিল।

মাইকেল বাকুনিন (Bakunin, 1814-1876) ছিলেন রুশ অভিজাত পরিবারের সন্তান; কিন্তু বিপ্লবী, সন্ত্রাসবাদী। রুশ সামরিক বিভাগের কর্মচারী হিসেবে কিছুকাল পোল্যাণ্ডে কাজ করবার পর রাশিয়ার স্বৈরতন্ত্রী শাসনে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি পদত্যাগ করেন। এরপর 1847 খ্রিঃ প্যারিসে এসে প্রুঁধোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তার দ্বারা প্রভাবিত হন। 1848 খ্রিঃ ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের সময় তিনি প্যারিসের রাস্তায় দরিদ্র শ্রেণীর পক্ষে যুদ্ধে অংশ নেন। পরে 1849 খ্রিঃ বোহেমিয়ার ড্রেসডেনে গণকারাদণ্ড ভোগ করার পর, তাকে সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করা হয়। সেখানে থেকে পলায়ন করে তিনি সুইটজারল্যাণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সমাজতন্ত্রী আন্দোলনে অংশ নেন (1860) বাকুনিন 1869 খ্রিঃ প্রথম ইন্টারন্যাশানালে যোগ দেন এবং সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর নেতা রূপে পরিচিত হন। কিন্তু মার্ক্স তথা অন্যান্য সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে বিরোধিতার জন্য তাকে 'প্রথম আন্তর্জাতিক' থেকে বহিষ্কার করা হয়। প্যারিস কমিউনে বিপ্লবের সময় (1871) বাকুনিন ফ্রান্সের লিয়ঁ শহরে এক কমিউন স্থাপন করেন। 62 বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়।

বাকুনিন 'সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স' নামে এক সংস্থা প্রতিষ্ঠা ক'রে তার মাধ্যমে নিজ আদর্শ প্রচার করেন। তাঁর আর্দশের বৈশিষ্ট ছিল যে, মানুষ সাধারণত মৌলিকভাবে সৎ কিন্তু পরে বিভিন্ন সংস্থা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সে দুর্নীতিগ্রস্ত হয়। রাষ্ট্র মানুষের উপর বলপ্রয়োগ করে। চার্চ এবং ধনতন্ত্রও মানুষকে শোষণ করে। সুতরাং মানুষের সৃষ্ট এইসব প্রতিষ্ঠান না মেনে প্রকৃতির নিয়ম মেনে চললেই মানুষ স্বাধীন হবে। 'গড অ্যাণ্ড স্টেট' নামক গ্রন্থে তার মতবাদের পরিচয় পাওয়া যায়। ক্রপোটকিন (1842-1921) তার লেখা "Anarchist : Its philosophy and Ideal", "Modern science and Anarchist", 'The Conquest of Bread' ইত্যাদি গ্রন্থের মাধ্যমে নৈরাজ্যবাদী আদর্শ প্রচার করেছিলেন। রুশ অভিজাত পরিবারের সন্তান ক্রপোটকিন একদা সামরিক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করে, সামরিক বাহিনীতে কাজ করে পদত্যাগ করেন। পরে সুইটজারল্যাণ্ডে গিয়ে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘে যোগ দেন। পরে এই সংঘও ছেড়ে দিয়ে রাশিয়াতে ফিরে যান এবং নিহিলিস্ট আন্দোলনে যোগ দিয়ে গ্রেপ্তার বরণ করেছিলেন।

বিভিন্ন সমাজবাদী গোষ্ঠী ও সংস্থা ঃ উনিশ শতকের গোড়ার দিক থেকে ইয়োরোপের নানা জায়গায় নানান ধরণের সমাজবাদী গোষ্ঠী নিজেদের সংঘবদ্ধ করার চেষ্টা করে। 1830 খ্রিঃ ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে 'লীগ অফ দ্য জাস্ট' নামে একটি সমিতির পত্তন হয়। এই সংগঠনের নাম পরিবর্তন করে হয় কমিউনিস্ট লীগ। কার্ল মার্ক্স 1847 খ্রিস্টাব্দে এই সংগঠনের সদস্য হন। মার্ক্স ও তাঁর সহযোগী এঙ্গেলস্ যৌথভাবে এই লীগের জন্য একটি ইশতেহার রচনার দায়িত্ব নেন। 1848 খ্রিস্টাব্দের

ফেব্রুয়ারি মাসে লণ্ডন থেকে ঐ ইশতেহার প্রকাশিত হয় এবং তা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজবাদী চিন্তাধারা 'কাল্পনিক' থেকে 'বৈজ্ঞানিক'স্তরে উন্নীত হয়। মার্ক্স-এঙ্গেলস্ লিখিত এই ইস্তাহারটির নাম 'ম্যানিফেস্টো অফ দ্য কমিউনিস্ট পার্টি'।

৯। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র এবং মার্ক্সবাদ

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের উদ্ভব ঃ কাল্পনিক সমাজতন্ত্রের ত্রুটিগুলি সংশোধনের দ্বারাই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের উদ্ভব। এর উদ্গাতা ছিলেন কার্ল মার্ক্স ও তাঁর সহযোগী ফ্রেডারিষ এঙ্গেলস্। কাল্পনিক সমাজতন্ত্রী ইউটোপিয়ান সোস্যালিস্টগণ তাদের আদর্শকে সাফল্যমণ্ডিত করতে সক্ষম হন নি। তবে তাদের মতাদর্শ এবং সমাজতান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ শ্রমজীবী মানুষদের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। সমসাময়িক সমাজ ও রাজনীতির উপরও তা প্রভাব ফেলেছিল। ক্রমে ক্রমে এই আদর্শের প্রতি মানুষদের আস্থা বাড়ে। কিন্তু কাল্পনিক সমাজতন্ত্রীদের সবচেয়ে বড় ত্রুটি ছিল এই যে, সমাজতন্ত্রকে প্রকৃতপক্ষে বাস্তবে কার্যকরী করে তুলবার উপায় তারা বলতে পারেন নি। কার্ল মার্ক্স তাঁর অধীত বিদ্যা, সমসাময়িক অভিজ্ঞতা এবং ঐতিহাসিক জ্ঞানের সাহায্য সমাজতন্ত্রবাদকে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগের পন্থা দেখাবার ফলে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ (Scientific Socialism) -এর উদ্ভব হলো।

কাল্পনিক সমাজতন্ত্রীরা ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার তত্ত্ব জানতেন না। মূলধনী মালিক শ্রেণী শ্রমজীবীদের শোষণ করেই যে স্ফীত হয় সে কথা তারা বুঝতে পারেন নি। তারা অনেকেই মূলধনী মালিক এবং শ্রমজীবীদের মধ্যে সম্পর্ক ভালো করার কথা বলেছিলেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র পূর্বের ত্রুটিগুলি দূর করে। মার্ক্স-এঙ্গেলস্ এর ঘোষণা হলো, সমগ্র বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষদের এক হওয়া প্রয়োজন। কারণ তাদের 'শৃঙ্খল' ছাড়া হারাবার আর কিছুই নেই—এক নতুন দিগন্ত খুলে দেয়। শিল্প বিপ্লবের ফলে যে সামাজিক-আর্থনীতিক পরিবর্তন হয়েছিল এর ফলে তাকে স্পষ্ট ও বৈপ্লবিক চেহারা দেওয়া সম্ভব হলো। মনে রাখা দরকার 1848 খ্রিস্টাব্দে 'ম্যানিফেস্টো অফ দ্য কমিউনিস্ট পার্টি' প্রকাশিত হয়। তেমনি 1848 -এর বিপ্লবে উদারপন্থী, গণতন্ত্রী এমনকি সমাজবাদীরাও একত্রে ব্যারিকেডের পাশে দাঁড়িয়ে প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। কিন্তু লড়াই শেষ হবার আগেই তাদের স্থান হয়ে যায় ব্যারিকেডের দু'পাশে। এর পরবর্তী পর্বে, ক্রমে নতুন ঐতিহাসিক শক্তির নিজস্ব প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম হয়। প্রথম ইয়োরোপে ও পরে সর্বত্র তা, বৈপ্লবিক চেহারা নেয়।

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র কাকে বলে? বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র বলতে এক কথায় মার্ক্সবাদকে বোঝায়। সমসাময়িক কাল্পনিক সমাজতন্ত্রীদের মতাদর্শের অনেকখানি গ্রহণ ক'রে এবং তার দোষ-ত্রুটি, সীমাবদ্ধতাগুলি দূর করেছিলেন মার্ক্স ও তার সহযোগী

এঙ্গেলস। তাছাড়া জার্মান দার্শনিক হেগেল-এর দর্শনের ঐতিহাসিক দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া গ্রহণ করে এবং সেই প্রক্রিয়াকে ভাববাদী রূপ থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে বস্তুবাদী পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপন করে এবং দান্দ্বিক দর্শনের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র গড়ে ওঠে।

কাল্পনিক সমাজতন্ত্রীরা ছিলেন অনেকাংশে অবাস্তব ও কল্পনাবিলাসী। মূলধনী মালিক এবং শ্রমজীবীদের স্বার্থ যে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও বিপরীতমুখী তা তারা জানতেন না। ফলে শ্রেণী সংগ্রামের কথা তারা বলেন নি। সেজন্য তারা মালিক-শ্রমিক সুসম্পর্কের কথাই বলেছিলেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে দেখানো হয় যে, তা অবাস্তব। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র অনুসারে অর্থনৈতিক শক্তিই হলো ইতিহাসের চালিকা শক্তি। যে, কোনও সমাজব্যবস্থায় উৎপাদন ব্যবস্থাই সমাজকে চালিত করে। সুতরাং পটভূমিকার পরিবর্তন ঘটিয়ে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বদলে সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠাই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র বা মার্ক্সবাদের মূলকথা। পূর্ববর্তী কাল্পনিক সমাজতন্ত্রীদের 'সমাজতন্ত্র' শব্দটির পরিবর্তে সেজন্য 'সাম্যবাদ' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে।

১০। কার্ল মার্ক্স এবং ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস

মার্ক্স (Karl Marx, 1818-1883)ঃ আধুনিক বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের জনক কার্ল মার্ক্স ছিলেন জার্মান এবং তার পূর্ব পুরুষরা ছিলেন ইহুদী। তাঁর পিতামাতা অবশ্য ইহুদীধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেন। সুতরাং মার্ক্স খ্রিস্টান। 1818 খ্রিস্টাব্দের 5th মে প্রাশিয়ার রাইনল্যাণ্ড অঞ্চলের ট্রিয়া শহরে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। মার্ক্স বাল্যকালে লেখাপড়ায় বিশেষ মেধাবী ছিলেন, জার্মানির বন এবং বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি আইন, দর্শন এবং ইতিহাস নিয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। তবে ইতিহাস ও দর্শনে তাঁর অনুরাগ ছিল বেশি। হেগেলের দর্শন তাকে বেশি আকর্ষণ করত। দর্শনশাস্ত্রের উপর তিনি গবেষণামূলক থিসিস দাখিল করেন (1841)। তিনি দর্শনে ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন ইয়েরা বিশ্বাবিদ্যালয় থেকে। অধ্যাপনার উপরে আকর্ষণ থাকলেও শেষ পর্যন্ত তিনি সাংবাদিকতার পথ বেছে নেন। চল্লিশের দশকে জার্মানির যুবসমাজের মনের মধ্যে যে গভীর জাতীয়তাবাদী, ঐক্যপন্থী এবং গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্খা জাগ্রত হয়েছিল মার্ক্স তা সমর্থন করতেন। ক্রমে মার্ক্স সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী হন এবং শ্রমজীবী সমাজের উন্নয়নের কাজে আত্ম নিয়োগ করেন। ঐ সময় তিনি 'রেনিশ গেজেট' নামে একখানি চরমপন্থী গণতান্ত্রিক সংবাদপত্র সম্পাদনা করতেন। প্রাশিয়ার সরকার মার্ক্স-এর প্রগতিশীল পত্রিকা পছন্দ করে নি। অচিরেই সরকারি আদেশে মার্ক্স নির্বাসিত হলেন এবং পত্রিকাটি বন্ধ করে দেওয়া হলো। মার্ক্স ফ্রান্সে চলে আসেন। প্যারিসে তিনি সমাজতন্ত্রী নানা পণ্ডিত ও নৈরাজ্যবাদীদের সংস্পর্শে আসেন। এদের মধ্যে ছিলেন যোসেফ প্রাঁধো, হাইনরিখ

হাইনে, পিয়ের ল্যরু প্রমুখ। মনে রাখা দরকার যে, সে-সময়কার বহু সমাজতান্ত্রিক, বিপ্লবী এবং কমিউনিস্ট প্যারিস, লণ্ডন, ব্রাসেলস্, জেনেভা প্রভৃতি শহরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে নির্বাসিত অবস্থায় কাজ চালাতেন। অবশেষে এই প্যারিসেই মার্ক্স ফ্রেডারিষ এঙ্গেলস্ নামক জার্মানির এক খ্যাতনামা সমাজতন্ত্রীর সাহচর্য ও বন্ধুত্ব লাভ করেন। মার্ক্স এর মতন তিনিও ছিলেন অর্থনীতি, ইতিহাস ও দর্শনে অনুরাগী। এ ছাড়া কারখানার শ্রমিকদের অসহনীয় জীবনযাত্রা বিষয়ে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল। তাই দু'জনের মধ্যে গড়ে উঠল প্রগার বন্ধুত্ব, তাঁরা হলেন পরবর্তী চল্লিশ বছরের সহকর্মী, গবেষক ও চিন্তাবিদ্; সবচেয়ে খ্যাতনামা তাত্ত্বিক জুটি।

সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে মার্ক্স-এর মেলামেশা ফরাসি সরকারের পছন্দ হলো না। অবিলম্বে মার্ক্স ফ্রান্স থেকেও বিতাড়িত হলেন। এর পিছনে প্রাশিয়ার সরকারের ইঙ্গিত ছিল। যাই হোক, মার্ক্স বেলজিয়ামের ব্রাসেলস্ শহরে চলে এলেন (1845) এবং সেখানে তিন বছর ছিলেন। 1830 খ্রিস্টাব্দে কয়েকজন নির্বাসিত জার্মান সমাজতান্ত্রিক প্যারিসে 'লীগ অফ দ্য জাস্ট'(League of the Just) নামে একটি সমাজতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন। পরে ঐ সংগঠনের নাম হয় 'কমিউনিস্ট লীগ'। মার্ক্স 1847 খ্রিস্টাব্দে ঐ লীগের সদস্য হন। বস্তুত কার্ল মার্ক্স ফ্রান্সে থাকার সময় হেগেলবাদী আর্নল্ড রুগের সঙ্গে যুগ্মভাবে একটি পত্রিকা প্রকাশ করে সমাজতন্ত্রের কথা বলেছিলেন। 1845 খ্রিস্টাব্দে তিনি এঙ্গেলস্ এর সঙ্গে ব্রিটেনে গিয়ে শ্রমজীবী শিল্পী সংস্থার সঙ্গে পরিচিত হন। তাতে অনুপ্রাণিত হয়ে মার্ক্স ব্রাসেলস্ এ ফিরে গিয়ে 'ওয়ার্কিং মেনস্ অ্যাসোসিয়েশন' গড়ে তোলেন। 1847 খ্রিস্টাব্দে লণ্ডনে বামপন্থী শ্রমজীবীদের সংগঠন 'কমিউনিস্ট লীগ' যে গড়ে তোলা হয় তা আসলে পূর্বোক্ত লীগ অফ দ্য জাস্ট-এর নতুন রূপ। মার্ক্স এই সংস্থার দ্বিতীয় সম্মেলন উপলক্ষে এঙ্গেলস্-এর সহযোগিতায় রচনা করেন বিখ্যাত 'কমিউনিস্টম্যানিফেস্টো' বা Manifesto of the Communist Party। এটি হলো মার্ক্সবাদের অন্যতম প্রধান ভিত্তি।

এঙ্গেলস্ (Frederich Engels, 1820-1895) : মার্ক্সের অন্তরঙ্গ বন্ধু এঙ্গেলস্ প্যারিসে যোগাযোগের পর মার্ক্সের মৃত্যু (1883) পর্যন্ত সহযোগী ছিলেন। এমনকি, মার্ক্সের মৃত্যুর পরেও তিনি কাজ চালিয়ে যান। মার্ক্স এঙ্গেলস্-এর যৌথ রচনা এবং আলাদা আলাদা রচনা সবই মার্ক্সবাদের অন্তর্গত। প্রথমতঃ, উল্লেখযোগ্য যে, তিনি 1844 খ্রিস্টাব্দে The Conditions of Working Classes in England নামে গ্রন্থ প্রকাশ করে পুঁজিবাদের কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। এছাড়া 1847 খ্রিস্টাব্দে শ্রমিক সংঘ নতুন করে স্থাপন করার ব্যাপারে তিনি ছিলেন মার্ক্সের সহযোগী এবং 1847 খ্রিঃ লণ্ডনে ঐ 'কমিউনিস্ট লীগ' -এর প্রথম সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন। 1848 খ্রিস্টাব্দে ঐ লীগের দ্বিতীয় সম্মেলন উপলক্ষে সংগঠনের ইশতেহার হিসেবে মার্ক্স এবং এঙ্গেলস্ উভয়ে রচনা করেন 'ম্যানিফেস্টো অফ দ্য কমিউনিস্ট পার্টি।'

সাম্যবাদী তত্ত্বের উপর রচিত এই বিখ্যাত অথচ ক্ষুদ্রায়তন গ্রন্থখানি অচিরেই সাম্যবাদী ও সমাজবাদীদের নিকট বাইবেল রূপে পরিগণিত হলো। এই সেই গ্রন্থ যার মধ্যে সমাজতন্ত্রের বৈজ্ঞানিক, কার্যকরী এবং অভিনব এক রূপ; বৈপ্লবিকভাবে সর্বপ্রথম উদ্‌ঘাটিত হলো এবং তখন থেকে আজ পর্যন্ত যার পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ হয়নি। গ্রন্থখানির প্রথম পংক্তিই ছিল 'অদ্যাবধি মনুষ্য সমাজের ইতিহাস হলো শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস'। যাই হোক ঐ বছরই (1848) মার্ক্স জার্মানি ফিরে যান এবং সাম্যবাদী পত্রিকা প্রকাশে মনোযোগ দেন। কিন্তু এবারেও তাকে বিতাড়িত হতে হলো। এবারও তিনি ফিরে এলেন ইংল্যাণ্ডে(1849)। এইখানে এবার তিনি প্রকাশ করলেন তাঁর বিখ্যাত 'দাস ক্যাপিটাল' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড এবং শ্রেণী সংগ্রাম বিষয়ক বহু প্রবন্ধ। Das Capital গ্রন্থের তিনটি খণ্ড শেষ পর্যন্ত শেষ হয়। মার্ক্স তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত (1883) লেখাপড়ার ভিতর দিয়ে জীবন অতিবাহিত করেন। 'ক্রিটিক অফ পলিটিকাল ইকোনমি', 'পভার্টি অফ ফিলজফি', 'সিভিল ওয়ার ইন ফ্রান্স', 'এইটিনথ ব্রুমের অফ লুই বোনাপার্ট' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। যেমন এঙ্গেলস্ -এর লেখা 'অ্যান্টি ডুরিং', 'অরিজিন অফ দ্য ফ্যামিলি', 'প্রাইভেট প্রপার্টি অ্যাণ্ড দ্য স্টেট ' ইত্যাদি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। মার্ক্স-এঙ্গেলস্ -এর চিন্তা ও কর্মের প্রভাব আজ বিশ্বের অন্যতম শক্তিরূপে পরিগণিত।

১১। মার্ক্সবাদের মূলসূত্র

মার্ক্সবাদ ঃ আধুনিক তথা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের জনক হিসাবে কার্ল মার্ক্স এর নাম জগদ্বিখ্যাত। বস্তুত শুধু দ্বাদশ শতকের নয়, সমগ্র পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসেই তিনি অমর হয় আছেন। হেগেলের দর্শন এবং সমসাময়িক সমাজতন্ত্রবাদের সংমিশ্রণে গঠিত হয়ে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র, যার থেকেই সাম্যবাদের (Communism) মতাদর্শের উদ্ভব। এই মতাদর্শই মার্ক্সবাদ (Marxism) নামে সাধারণভাবে পরিচিত। মার্ক্সবাদের প্রতিপাদ্য মূল সূত্রগুলি হলো— (১) ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা (২) দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ (৩) শ্রেণী সংগ্রাম (৪) শ্রমের মূল্যতত্ত্ব (৫) শ্রেণীহীন সমাজগঠন এবং (৬) আন্তর্জাতিকতাবাদ। ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিটি সূত্র সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন।

ইতিহাসের বস্তুবাদী বা অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা ঃ ইতিহাসের বিচিত্র ঘটনার সমাবেশের মধ্যে কার্ল মার্ক্স এক অবিছিন্ন ধারা লক্ষ্য করেছেন। প্রাক্ ঐতিহাসিক যুগ থেকে আরম্ভ করে বর্তমান কাল পর্যন্ত পর্যালোচনা করে মার্ক্স লক্ষ্য করেছেন যে, ইতিহাসের গতি উৎপাদন নীতিকে কেন্দ্র ক'রে অগ্রসর হচ্ছে। মানব সমাজের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ এবং সমস্যাকে কেন্দ্র ক'রে সামগ্রিক মানবজাতির সমাজ ও সভ্যতা আবর্তিত হয়। তাঁর মতে মানব সভ্যতার যে সব অত্যাবশ্যক উপকরণ আছে যেমন— শিল্প, সাহিত্য,

দর্শন, ধর্ম, দয়া-মায়া, প্রেম, স্বাদেশিকতা প্রভৃতি সব কিছু হলো উপরি কাঠামো; (Superstructure) মূল উৎস হলো অর্থনীতি। অর্থনীতি হলো একমাত্র মাস্টার কি (Master key) বা চাবিকাঠি। এর মাধ্যমে মানব সভ্যতার অন্য যে-কোনও বিষয়ের দ্বার উন্মুক্ত করা সহজ সাধ্য। এটিই ইতিহাসের বস্তুবাদী বা অর্থনৈতিক ব্যাখ্য (Materialistic or Economic Interpretation of History)।

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদঃ মার্ক্সীয় দর্শন দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ (Dialectical Materialism) নামে পরিচিত। মার্ক্স -এর মতে প্রগ্রেস বা অগ্রগতি ইতিহাসের প্রাণকেন্দ্র। সংঘর্ষমূলক দুই বিরোধী শক্তির সমন্বয়ের উপর এই অগ্রগতি নির্ভর করে। জাগতিক সমস্ত সংগঠনের মধ্যে মোট তিনটি অবস্থা লক্ষ্য করা যায়। যথা— ভাব, অ-ভাব ও সমন্বয়। মার্ক্স এর ভাষায় একে থিসিস, অ্যান্টিথিসিস ও সিন্থেসিস বলা যেতে পারে। ঘটনার মধ্যে যে শক্তি বর্তমান অবস্থাকে ধরে রাখতে চায় তার নাম থিসিস বা পজিটিভ। যে শক্তি বর্তমান অবস্থাকে বাতিল করে দিয়ে নতুন অবস্থার সৃষ্টি করতে চায় তার নাম অ্যান্টিথিসিস বা নেগেটিভ। এই থিসিস আর অ্যান্টিথিসিস এর মধ্যে দ্বন্দ্ব (Dialectics) আছে। এই দুইয়ের সমন্বয়ের মধ্য থেকে পরে জন্ম নেয় সমন্বয় বা সিন্থেসিস। আবার সিন্থেসিস থেকে পুনরায় থিসিস ও অ্যান্টিথিসিসের জন্ম। মার্ক্স এর মতে, এই তিনটি বিষয়ের চক্রাকারে আবর্তনের দ্বারা ঐতিহাসিক বিবর্তন সম্ভব হয়, মার্ক্সের এই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ব্যাখ্যা হেগেলের ভাববাদী দ্বন্দ্ববাদের কাছে ঋণী। হেগেলের মতে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক চৈতন্য শক্তির (spirit) লীলা ক্ষেত্র। খণ্ড খণ্ড চিন্তা ও কর্মের মাধ্যমে এই লীলা অখণ্ড চৈতন্যের দিকে এগিয়ে যায়। মার্ক্স বলেন, চৈতন্য বা অচৈতন্য সব কিছুরই ভিত্তি হলো জীবন-জীবিকা অর্থাৎ জড়বস্তু বা বিষয় সম্পত্তি। মানুষের জীবন-জীবিকার সমস্যা মানুষের ইতিহাসকে এগিয়ে নিয়ে চলে। হেগেলের মতন তিনিও বিশ্বাস করতেন যে, পরস্পর বিরোধী দ্বন্দ্বের ফলস্বরূপ ঐতিহাসিক বিবর্তন ঘটছে— শুধু তিনি ভাববাদী তত্ত্বকে বস্তুবাদী ব্যাখ্যায় নতুনভাবে হাজির করেছেন। জার্মান দার্শনিক হেগেলের মতে আদর্শের (Ideas) সংঘাত ইতিহাসকে চালিত করে, মার্ক্স তা স্বীকার করেননি। মার্ক্সবাদ অনুসারে অর্থনৈতিক শক্তিই ইতিহাসের চালিকা শক্তি। কেন? এর উত্তর হলো যে, কোনও সমাজব্যবস্থায় সম্পদের উৎপাদন ব্যবস্থাই সমাজকে চালিত করে। উৎপাদন পদ্ধতি এবং উৎপাদনের উপাদানের উপর নিয়ন্ত্রণ দ্বারাই সমাজ চালিত হয়। উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎপাদনের উপাদানের উপর দখলের জন্য দ্বন্দ্বই হলো ইতিহাসের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ।

শ্রেণী সংগ্রাম ঃ ইতিহাসের বিভিন্ন ধারা বিশ্লেষণ করে মার্ক্স দেখিয়েছেন যে, ধনবানের সঙ্গে ধনহীনের সংঘর্ষের মধ্যে সংগ্রাম চলছে। শুধু এখন নয়, এই দুই

পরস্পরবিরোধী শ্রেণীর মধ্যে যে সংগ্রাম তা মানবসভ্যতার গোড়া থেকেই চলে আসছে। যেহেতু সভ্যতার অগ্রগতির চাবিকাঠি হলো অর্থনীতি তাই সমাজের এক শ্রেণীর লোক সম্পদ দখল করেই হাতে ক্ষমতা চায়। শুধু তাই নয়, তারা নিজ নিজ ক্ষমতাকে দীর্ঘস্থায়ী করার লালসায় আরও সম্পদ সংগ্রহ কার। তারা ধনহীনদের শোষণ করতেও কুণ্ঠিত হয় না। শোষণের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য শোষিতরা শোষকদের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হয়। এই শ্রেণী সংগ্রামই (Class Struggle) ইতিহাসের মৌলিক প্রতিপাদ্য বিষয়। তাই লক্ষ্য করা যায়, প্রাচীন গ্রিস ও রোমে স্বাধীন নাগরিক ও ক্রীতদাসে, অভিজাত ও সাধারণ নাগরিকে; মধ্যযুগে সামন্তপ্রভু ও ভূমিদাসে এবং শিল্প বিপ্লবের পর পুঁজিবাদী ও সর্বহারা শ্রমজীবীদের মধ্যে সংগ্রাম চলছে। এই শ্রেণী সংগ্রামে শ্রমিক শ্রেণী ঐক্যবদ্ধ হলে তার জয় অবশ্যম্ভাবী। এটাই মার্ক্সের ভবিষ্যৎ বাণী ও ইতিহাসের শিক্ষা। তাই *মার্ক্স-এঙ্গেলস্* লিখেছেন, "সাম্যবাদী বিপ্লবের আঘাতে শাসক শ্রেণী কেঁপে উঠুক। এই বিপ্লবে শ্রমজীবী মানুষ বা সর্বহারাদের শৃঙ্খল ছাড়া হারাবার আর কিছুই নেই। দুনিয়ার মজদুর এক হও।"

শ্রমের মূল্যতত্ত্ব ঃ শ্রেণী সংগ্রামের ন্যায্যতা সম্পর্কে মার্ক্স উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্ব (Theory of Surplus Value) উত্থাপন করেছেন। তাঁর মতে সম্পদ উৎপাদনের ভিত্তি হলো শ্রমিকের শ্রম। মূলধন, জমি, কাঁচামাল ইত্যাদি প্রকৃতির দান। শ্রমিকের শ্রমে এগুলি থেকে নতুন নতুন সামগ্রী বা সম্পদ উৎপন্ন হয়। কিন্তু শ্রমিক সেগুলি ভোগ করতে পারে না। তারা বঞ্চিত হয়। উৎপাদন থেকে লব্ধ মুনাফা ভোগ করে মালিক বা পুঁজিপতি বা 'বুর্জোয়াগণ'। মার্ক্সের মতে শ্রমিকের শ্রম থেকে উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রয় করে যে মুনাফা হবে তা শ্রমিকেরই প্রাপ্য। এই মুনাফা থেকে যাতে তারা বঞ্চিত না হয় তার জন্য তাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম করতে হবে।

শ্রেণীহীন সমাজ ঃ মার্ক্সবাদের অন্যতম লক্ষ্য হলো শোষণমুক্ত সমাজ গঠন। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি মানুষকে শোষক ও শোষিত— এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। তাঁর মতে শ্রমিক যদি রাষ্ট্রযন্ত্র অধিকার ক'রে উৎপাদন ও বন্টন নিয়ন্ত্রণ করে তাহলে পুঁজিবাদের উচ্ছেদ হবে এবং মানুষ নিজ নিজ দক্ষতা অনুসারে উৎপাদনে অংশ গ্রহণ ক'রে ন্যায়সঙ্গত পারিশ্রমিক বা মুনাফার অংশ পাবে। এই পদ্ধতিতে তৈরি হবে শোষণ মুক্ত সমাজ। একটা সমাজে যদি কেউ শোষিত না থাকে তাহলে তৈরি হয় শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থা, যাতে শ্রেণী বৈষম্য থাকবে না।

আন্তর্জাতিকতা ঃ আন্তর্জাতিকতা হলো মার্ক্সবাদের অন্যতম আবেদন। মার্ক্সের মতে বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ এক ও অভিন্ন। তাই বিশ্বের সকল শ্রমজীবী মানুষ যদি সংঘবদ্ধ না হয় তাহলে তারা দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারবে না। সংঘবদ্ধতার মাধ্যমে

তাদের শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। তাই তিনি 1864 খ্রিস্টাব্দে লণ্ডন শহরে প্রথম আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘের (International Workingmens' Association) আহ্বান করেন। এটি *প্রথম আন্তর্জাতিক* নামে পরিচিত। এরপর উত্তরকালে 1889 এবং 1919 খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় ও তৃতীয় আন্তর্জাতিক আহ্বান করা হয়েছিল।

মার্ক্সবাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা : মতাদর্শ হিসেবে কিংবা দর্শনের এক ধারা হিসেবে মার্ক্সবাদের বিরুদ্ধে নানা সমালোচনা উঠেছে। যে সব কথা বলা হয়েছে তার মূল কথাগুলি এরকমঃ-(১) ইতিহাসের গতি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় না। এর পশ্চাতে যুগে যুগে মনীষীদের অবদান, সামাজিক রীতি-নীতি, ঐতিহ্য, দেশাত্মবোধ, ধর্মীয় আদর্শ ইত্যাদি নানা প্রভাব ক্রিয়াশীল। (২) মার্ক্স শ্রেণী সংগ্রামের অপরিহার্যতার কথা বলেছেন। হিংসাত্মক বিপ্লবের মাধ্যমে শ্রমিক জয়লাভ করবে। কিন্তু ইতিহাসে লক্ষ্য করা যায়— বিপ্লবী সংগ্রামই একমাত্র পন্থা নয়। নির্বাচনের মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণী রাষ্ট্রযন্ত্র হাতে নিয়ে শ্রমিকের ন্যায্য পাওনা আদায় করতে পারে। আবার হিংসাত্মক সংগ্রাম ছাড়াই কোনও কোনও ধনতান্ত্রিক পুঁজিপতি দেশ আইনের মাধ্যমে শ্রমিক সমাজের সুখ সুবিধা আদায় করেছে। পার্লামেন্টীয় আইন প্রয়োগ করে শোষণহীন সমাজ গঠন করা সম্ভব। এর জন্য হিংসাত্মক বিপ্লবের প্রয়োজন হয় না। (৩) মার্ক্স শ্রেণীহীন যে সমাজের কথা বলেছেন আজও কোনও কোনও সমাজতান্ত্রিক দেশে তা প্রতিষ্ঠিত হয় নি। প্রত্যেকটি সমাজতান্ত্রিক দেশ থেকে এই অভিযোগ পাওয়া যায়। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য যে ক্ষেত্রে একটি বৈজ্ঞানিক সত্য সেই ক্ষেত্রে সমাজ দেহেও স্বাতন্ত্র্য অথবা বৈষম্য যে থাকবে এটাও বৈজ্ঞানিক সত্য। (৪) মার্ক্স জাতীয়তাবাদকে অবহেলা করে আন্তর্জাতিকতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। 'দুনিয়ার মজদুর এক হও'—এটি একটি শ্লোগান মাত্র। এর বাস্তবতা সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। শ্রমিক শ্রেণীর কোনও জাতিভেদ নেই। কিন্তু লক্ষ্য করা যায়, রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণী এবং চীন বা ভিয়েতনামের শ্রমিকদের মধ্যে নানা পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে— শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে মত বিরোধের জন্য এক সাম্যবাদী দেশের সঙ্গে অন্য সাম্যবাদী দেশের বিবাদ লক্ষ্য করা যায়।

মার্ক্সবাদের গুরুত্ব, ফল ও প্রভাব : উনিশ শতকে মার্ক্সবাদ প্রচারিত হয়। এই তত্ত্ব তখনকার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই তত্ত্বও মতাদর্শের কিছু অসঙ্গতি বা ভুলত্রুটি দেখা গেলেও শোষণহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ডাক দিয়ে মার্ক্স নিপীড়িত জনগণের মনে ও ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন। উনিশ শতকে সমাজতন্ত্রের গুরুত্ব যেমন ছিল অসীম, বর্তমানেও তেমনি আছে। ঐতিহাসিক তত্ত্ব নির্ধারণ ও তার বিশ্লেষণে মার্ক্সীয় সাম্যবাদ বিশ্বের অন্যতম বিস্ময়। সেই যুগের কারখানা প্রথা ছিল মালিকের পক্ষে শ্রমিক শোষণ ও নির্যাতনের

তীক্ষ্ণ হাতিয়ার। সেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কার্ল মার্ক্স পুঁজিবাদী ধনিক শ্রেণীর উচ্ছেদ এবং শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির জন্য যে শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার বাণী প্রকাশ করলেন, তার ফলে খেটে-খাওয়া মানুষের অমানুষিক অবস্থার প্রতি শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। অন্যদিকে শোষিত মানুষের মনে উদ্দীপিত হলো আশা ও উৎসাহ। বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে প্রথম বিশ্বসমরের মধ্যেই রাশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হলো প্রথম মার্ক্সবাদী সরকার, যার লক্ষ্য ছিল সমাজতন্ত্র। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে পূর্ব-ইয়োরোপের বহু রাষ্ট্রসহ পূর্ব এশিয়ার বৃহত্তম রাষ্ট্র চীনেও প্রতিষ্ঠিত হলো সাম্যবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বিশ্বের যেসব রাষ্ট্র ক্রমশ রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করল সেইসব দেশের শাসনব্যবস্থাতেও মার্ক্সবাদী প্রবণতা অনুপ্রবেশ করেছে। বাধ্য হয়ে তখন ধনতান্ত্রিক দেশগুলিও জনকল্যাণকর আইন প্রয়োগ করে শোষিত মানুষের জন্য মানবিক অধিকার প্রদানে বাধ্য হয়েছে। সুতরাং ফলশ্রুতির বিচারে বিশ্বের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থার রূপান্তর ঘটাতে মার্ক্সবাদ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। মার্ক্সবাদের এই ঐতিহাসিক প্রভাবকে কোনও ক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। মার্ক্সীয় দর্শন বিশ্বের নানা দেশের মানুষদের কাছে সমাজ পরিবর্তন ও সাম্যবাদী সমাজ গঠনের প্রেরণা ও আদর্শ। সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তন, শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামী ভূমিকা, শোষণহীন সমাজের আদর্শ হিসাবে মার্ক্সবাদ আজও প্রাসঙ্গিক।

অধ্যায় ১২

ইয়োরোপীয় শিল্প ও সংস্কৃতি, সাহিত্য ও বিজ্ঞান ঃ উনিশ শতকের আলোকে

(**Syllabus:** *Art and Culture, Literature and Science*)

১। গোড়ার কথা ঃ রোমান্টিকতা ও বাস্তববাদ

আঠারো শতকের শেষ দিক থেকে উনিশ শতকের শেষ দিক পর্যন্ত ইয়োরোপের ইতিহাসে নানা ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এবং অগ্রগতি ঘটেছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ফরাসি বিপ্লব (1789) যে দিক পরিবর্তনের সূচনা করে, ক্রমে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রে ভাঙন, জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের প্রসার, নতুন শক্তি-সাম্য প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তা শেষ হয়। সামাজিক.ক্ষেত্রে সামন্ততন্ত্রের ভাঙনের পর নতুন বুর্জোয়া শ্রেণীর অভ্যুদয়, মূলধনী মালিক শ্রেণী ও শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের উদ্ভব এবং নতুন সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠা ইত্যাদি লক্ষ্য করা যায়। আর্থনীতিক ক্ষেত্রে শিল্প বিপ্লব এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিক্রিয়া সমাজ ও সভ্যতার উপর প্রভাব ফেলে। কৃষি ও বাণিজ্যের অগ্রগতি ঘটে। সব মিলে উনিশ শতকের ইয়োরোপের ইতিহাসে তাৎপর্যপূর্ণ এবং সুদূর প্রসারী ফলাফল সম্বলিত ঘটনা দেখা যায়। আবার তেমনি সাংস্কৃতিক ইতিহাসেও উনিশ শতক ছিল অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। সাহিত্য, শিল্প, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, সঙ্গীত, বিজ্ঞানচর্চা ইত্যাদি নানাদিকেই ঐ সময় ইয়োরোপ অগ্রগতির স্বাক্ষর রেখেছিল।

সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আলোচ্য যুগে নানা ভাবধারা প্রভাব ফেলেছিল। আঠারো শতকের শেষ দিকে কিছু পরিমাণে এবং উনিশ শতকের প্রথমার্ধে চিন্তাধারার ইতিহাসে যে ভাবধারার অভ্যুদয় ঘটেছিল এবং যা শিল্প ও সংস্কৃতি, সংগীত, সাহিত্য প্রভৃতি সাংস্কৃতিক সৃজনশীল ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছিল তা হলো রোমান্টিকতাবাদ বা Romanticism। কার্লটন হেস এবং অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ দেখিয়েছেন যে প্রচলিত সংস্কার এবং ধ্রুপদী বা ক্লাসিকাল ঐতিহ্য বর্জন ক'রে, যুক্তিবাদের বদলে ভাবাবেগের দ্বারা ইয়োরোপীয় মানসিকতা আপ্লুত হয়েছিল। এজন্য মন্তব্য করা হয়েছে যে, 'In the history of thought, literature and fine arts, the first half of the nineteenth century is often called the Age of Romanticism'. শুধু সৃজনশীল মানুষজনই নয়,সংস্কৃতিপ্রেমী যে-কোনও মানুষের উপরেই এই নব্য ভাবধারা অর্থাৎ রোমান্টিকতার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। হেস্ এর মতে, 'রোমান্টিকতা যুগের ফ্যাসন হয়ে দাঁড়িয়েছিল'। রোমান্টিকতার পূর্ণ পরিণতির কাল ধরা হয় সাধারণভাবে 1830 খ্রিঃ থেকে 1880 খ্রিস্টাব্দ।

রোমান্টিকতা যেমন এক উল্লেখযোগ্য ভাবধারা— যা ইয়োরোপীয় মনন ও শিল্প-সাহিত্যের উপর প্রভাব ফেলেছিল তেমনি উনিশ শতকের শেষ দিকে আর একটি ভাবধারার প্রভাব ক্রমে লক্ষণীয়ভাবে প্রকাশ পেতে থাকে। এই ভাবধারাকে বলা যেতে পারে আধুনিক বাস্তববাদ (Modern Realism)। বাস্তববাদের প্রভাব সাহিত্য, শিল্প, সংগীত প্রভৃতি ক্ষেত্রেও দেখা যায়। শুধু তাই নয়—বিজ্ঞান, ইতিহাসচর্চা থেকে সমাজবিদ্যা সবকিছুর উপরই বাস্তববাদ প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং বলা যেতে পারে উনিশ শতকে ত্রিধারার মিলন ঘটেছিল; ধ্রুপদী বা ক্লাসিকালবাদ, রোমান্টিসিজম্ বা রোমান্টিকতাবাদ এবং রিয়েলিজম্ বা বাস্তববাদ।

রোমান্টিকতা ও তার প্রভাব ঃ রোমান্টিকতাবাদকে একটি বিশেষ আদর্শ ও ভাবধারা বলা যেতে পারে এবং রোমান্টিকতার প্রতিক্রিয়াকে একটি আন্দোলনের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। এই তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব নানাক্ষেত্রে কিরূপ ফুটিয়ে তুলেছিল তা আলোচনা করার আগে রোমান্টিকতা কাকে বলে তা জেনে নেওয়া দরকার। যুক্তি ও বুদ্ধির ফর্ম বা ছক, শৈলী বা স্টাইল, বিষয়বস্তু বা কনটেন্ট ভেঙে কল্পনাবাদ ও অনুভূতিকে প্রাধান্য দান এবং হৃদয়ের ভাবাবেগের দ্বারা প্রকৃতি ও সুন্দরকে সত্য বলে গ্রহণ করাই এক কথায় রোমান্টিকতাবাদ বা রোমান্টিসিজম্।

তবে রোমান্টিকতার সংজ্ঞা ভাষায় দেওয়া কঠিন। যেমন এক দিক থেকে বলা যেতে পারে যে, প্রাচীন ধ্রুপদী ঐতিহ্য এবং জ্ঞানালোকের যুগের যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াকেই রোমান্টিকতা বলা যেতে পারে। আবার অন্যদিক থেকে বলা যায়, প্রকৃতির মধ্যে যা সত্য বলে মনে হয় এবং প্রাচীনের মধ্যে যা সুন্দর বলে মনে হয়, সেই সত্য ও সুন্দরকে চর্চা করাকেই রোমান্টিকতাবাদ বলা যেতে পারে। ইংরেজ কবির সেই অমোঘ বাক্যটি এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে—'সত্যই সুন্দর, সুন্দরই সত্য'। যে ভাবপ্রবণতা এই সত্য ও সুন্দরের পূজা করে তাই রোমান্টিকতাবাদ। জার্মান দার্শনিক হেগেল মন্তব্য করেছিলেন, 'রোমান্টিকতাবাদ হলো বহির্জগতের উপর অন্তর্জগতের বিজয় ঘোষণা'।

রোমান্টিকতাবাদ কাকে বলে সেই নিয়ে আরও সহজভাবে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রাচীনযুগের যে সাংস্কৃতিক আদর্শ তাকে বলা হয় ক্লাসিকাল বা ধ্রুপদী আদর্শ। এর ছাপ পড়েছিল সাহিত্য, শিল্পের নানা শাখায় যেমন চিত্রকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য ইত্যাদির ক্ষেত্রে। এই ঐতিহ্য বজায় ছিল মধ্যযুগেও যদিও রীতি, প্রকরণ, আঙ্গিকে নতুনত্ব এসেছিল। পনেরো ষোলো শতকের পর অর্থাৎ রেনেশাঁস আন্দোলনের মধ্যে যে আধুনিকতা জ্ঞান-সন্ধান এবং অপার্থিব বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার মানসিকতা সৃষ্টি করে তার থেকে গড়ে ওঠে এক বুদ্ধিবিভাসিত সংস্কৃতি। একে বলা যেতে পারে নব ক্লাসিকাল (Neo Classical)। যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে, ধর্মীয় বিষয়ের বদলে পার্থিব বিষয়ের

মধ্যে, সাহিত্য ও শিল্পের মধ্যে শিল্পী মননের প্রকাশ পেত। ক্রমে সাহিত্যে ও শিল্পে এক বাঁধা ছক গড়ে উঠল যা স্বতঃস্ফূর্ত নয়, ছাঁচে ফেলা। ফলে আবেগ, প্রেরণা, মনোজগতের বিবিধ তরঙ্গ হয়েছিল রুদ্ধ। এই জীবনবোধের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ মস্তিষ্কের পরিবর্তে হৃদয়ের অনুভূতিকে প্রাধান্যের সপক্ষে যে ভাবধারা সৃজনশীলতার উপর ছাপ ফেলে, তাই রোমান্টিকতাবাদ।

রোমান্টিকতাবাদীরা স্বাভাবিকভাবেই যুক্তি অপেক্ষা অনুভূতি, মস্তিষ্ক অপেক্ষা হৃদয়, নিয়ম অপেক্ষা প্রকৃতি শ্রেষ্ঠ মনে করতেন। তারা শৈল্পিক প্রকাশে আগ্রহী ছিলেন। জার্মান কবি গ্যয়টে বলেছেন, 'অনভূতিই হলো সবকিছু'। জার্মান রোমান্টিকতাবাদী নোভালিসের মন্তব্য, ''বিশ্বভুবনকে বোঝার চাবিকাঠিই হলো হৃদয়'। আসলে ধ্রুপদীবাদ বা নবধ্রুপদীবাদের বাধাধরা ছক, ধারণা শৈলী এবং বিষয়বস্তু থেকে বেরিয়ে এসে মনের আবেগকে নির্ভর করে সত্য ও সুন্দরের পূজাই রোমান্টিকতাবাদের মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে। অনেক ঐতিহাসিক -এর উদ্ভবের পিছনে ভক্তিধর্মের উপলব্ধিকেও হাজির করেছেন।

রোমান্টিকতাবাদ হৃদয়, আবেগ, অনুভূতি এবং কল্পনাকে প্রাধান্য দেয়। আসলে রোমান্টিকতাবাদ নগরমুখী, কৃত্রিম ও যান্ত্রিক জীবনযাত্রার বদলে প্রকৃতির মধ্যে সত্য খুঁজে পায়। আবার রোমান্টিকতাবাদের মধ্যে অজানাকে জানার এক ব্যাকুলতা থাকে এবং ফলে শিল্পীরা অবহেলিত বিষয়বস্তুর মধ্যেও অনেক বস্তু খুঁজে পান। তাছাড়া যে বিষয়টি মাথায় রাখা দরকার তা হলো, ফরাসি বিপ্লবের পরে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও প্রসার, দেশপ্রেম ও ইতিহাসের আবেগময় বিশ্লেষণ, স্বাজাত্যবোধ ইত্যাদি চেতনা রোমান্টিকতাবাদকে সাহায্য করে। তেমনি কান্ট, হেগেল, বেকন প্রমুখ দার্শনিকদের আদর্শবাদ ও স্বাধীনতাবোধও রোমান্টিকতাবাদকে পুষ্ট করে।

রোমান্টিক আন্দোলনের প্রভাব কম-বেশি সমসাময়িক প্রত্যেক শিল্পী এবং ভাবুককেই প্রভাবিত করেছিল। আঠারো শতকে যদি যুক্তিকে সবার আগে স্থান দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে উনিশ শতকে দেওয়া হলো ভাবাবেগকে। ফলে রোমান্টিসিজম্ -এর ঢেউ চিত্রকলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য সমেত শিল্পের নানা শাখায়, সংগীতে এবং অবশ্যই সাহিত্যে প্রভাব ফেলে এবং ঐ সব সাংস্কৃতিক মাধ্যমের বিকাশ ঘটায়।

বাস্তববাদ ও তার প্রভাব ঃ রেনেশাঁস -এর পরবর্তী যুগের ধ্রুপদী (Classical) এবং উনিশ শতকের রোমান্টিক (Romantic)– এই উভয় ভাবধারাই উনিশ শতকের ইয়োরোপে চলে আসছিল। কিন্তু উনিশ শতকের শেষ পর্বে আরও একটি ভাবধারা ইয়োরোপীয় মনন ও সৃজনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। এই ভাবাদর্শ হলো বাস্তববাদ। আধুনিক পৃথিবীতে বাস্তববাদ (Realism) সাহিত্য, চিত্রকলা, স্থাপত্য, সংগীত ইত্যাদি নানা মাধ্যমের উপর ছাপ ফেলে। ফলে রোমান্টিকতার সঙ্গে যুক্ত কলা কৈবল্যবাদ—যাকে ইংরেজিতে বলে Art for Art's Sake-এর বদলে, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি

তুলে ধরে। ফলে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক বিচার-বিশ্লেষণ; পরিবার, শ্রেণী ও সামাজিক সমস্যা, অর্থনৈতিক তথা বস্তুগত পটভূমিকা ইত্যাদি প্রাধান্য পায়। বিংশ শতাব্দীতে আধুনিক বাস্তববাদ আরও বেশি প্রসারিত হয়। অধ্যাপক সি. জে. এইচ. হেস্ লিখেছেন যে, গদ্য সাহিত্যেই বাস্তববাদের প্রভাব বেশি। বর্ণনার খুঁটিনাটি বা ডিটেলের দিকে নজর, তথ্যগত ভিত্তি মজবুত, দৃষ্টি বিজ্ঞানসম্মত এগুলি বাস্তববাদী সাহিত্যের বৈশিষ্ট বলে হেস্ মনে করেন। যেন সমাজের বিশ্লেষণ করে সামাজিক একটি বিচ্যুতি সম্বন্ধে পাঠক বা দর্শকদের সচেতন করার লক্ষ্যই হলো বাস্তববাদী শিক্ষা ও সাহিত্যের মূল কথা। সুতরাং বাস্তববাদ সাংস্কৃতিক ইতিহাসে তাৎপর্যপূর্ণ।

২। সাহিত্য

রোমান্টিক সাহিত্য : রোমান্টিকতাবাদের প্রভাব সবচেয়ে বেশি দেখা গিয়েছিল সাহিত্যে। ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, রুশ, এমনকি স্লাভ, স্পেনীয়, পর্তুগিজ, ইতালিয় ইত্যাদি ভাষার সাহিত্যেও রোমান্টিসিজম্-এর প্রভাব দেখা যায়। ইংরেজি সাহিত্যে রোমান্টিক যুগ তো স্বর্ণযুগ। রবার্ট ব্রাউনিং, আলফ্রেড টেনিসন, উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ, ডি. কুইনসি, শেলী, কীটস্, বায়রন প্রমুখ অনেক কবির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়।

ইংরেজি সাহিত্য : আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইংরেজি সাহিত্যে রোমান্টিকতাবাদের বিশেষ প্রভাব লক্ষ্যণীয়। প্রকৃতির নানা বিকাশ এবং সমাজের সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের অনুভূতির বিশ্লেষণ এই সাহিত্যের মূল বিষয়বস্তু হয়ে দাড়ায়। এতে প্রেম সহ অন্যান্য ভাবাবেগও প্রাধান্য পায়। শিল্পের জন্য সৃষ্টি হয় শিল্প— এই নীতিকে বলে কলাকৈবল্যবাদ। কবিতায় তো বটেই, গদ্যেও তার পরিচয় পাই। 1798 খ্রিস্টাব্দে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ ও কোলরিজের যুগ্ম সম্পাদনায় Lyrical Ballads নামক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এটিকে ইংরেজি সাহিত্যের প্রথম শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক-রচনা সংকলন বলা যায়।

উইলিয়াম ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ তাঁর রোমান্টিক রচনায় সাধারণ মানুষের সরল গ্রাম্য জীবনের অনুভূতির গভীরতা ও অকৃত্রিমতা পরিস্ফুট করেছেন। তাঁর Ode to Immortality কবিতায় তিনি মানুষের জন্ম এবং পার্থিব জীবনের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া প্রকৃতির এক সুন্দর কাল্পনিক চিত্র এঁকেছেন। কোলরিজ ছিলেন তাঁর বন্ধু, কোলরিজের Rhyme of the Ancient Mariner কবিতা রোমান্টিকতার এক উজ্জ্বল উদাহরণ। আলফ্রেড টেনিসন কিং আর্থার, লেডি অফ শ্যালট প্রভৃতি কাব্য রচনার দ্বারা ইংরেজদের মনে স্বদেশপ্রেমমূলক ভাবাবেগের সৃষ্টি করেন। In Memoriam কাব্য গ্রন্থে তিনি লিখেছেন: It is better to have loved and lost, than never to have loved at all. পার্সি

শেলি শেলী ছিলেন রোমান্টিক গীতি কবিতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার। তাঁর বিখ্যাত প্রেমের কবিতাগুলির মধ্যে To the Skylark, Ode to the West Wind, Ode on a Grecian Urn প্রভৃতি চিরস্মরণীয়। তাঁর Prometheus Unbound -এ প্রেম ও মানবতাবাদের যুগলবন্দি ধ্বনিত হয়েছে। মনে পড়ে তার এক বিখ্যাত পংক্তি: If winter comes, can spring be far behind? জন কীটস্ ছিলেন রোমান্টিক কবিদের মধ্যে বিশেষ স্মরণীয়। অকালমৃত এই কবি Ode to the Nightingale নামক অসাধারণ এক কবিতা রচনা করেন। সত্যই সুন্দর, সুন্দরই সত্য ছিল তাঁর মত। মহাকবি বায়রন নিজের সুখ-দুঃখ-বেদনা ও আনন্দকে কাব্য ও শিল্পের ভাষায় প্রকাশ করেন। তাঁর কবিতায় রোমান্টিকতা বিষাদ দুইই পাওয়া যায়। Don Juan, Child Harolds Pilgrimage আজও পাঠকদের মুগ্ধ করে।

থ্যাকারে, চার্লস রীড, জর্জ এলিয়ট, চার্লস ডিকেন্স, ম্যারিয়ট, ওয়াল্টার স্কট প্রমুখ ঔপন্যাসিক রোমান্টিক সাহিত্যের ধারার উল্লেখযোগ্য নাম। স্কটের লেখায় ইতিহাসের প্রভাব স্পষ্ট। তাঁর Ivanhoe কে পড়েন নি! কিংবা ডিকেন্সের Oliver Twist, A Tale of Two Cities!

ফরাসি সাহিত্য ঃ ফরাসি রোমান্টিক সাহিত্যের প্রকৃত পথিকৃৎ বলা হয় সেতোব্রিয়াঁকে। তার লেখা 'জিনিয়াস অফ ক্রিশ্চিয়ানিটি' এবং আতালা ছিল বিখ্যাত রোমান্টিক রচনা। লামার্তিনের 'মেডিটেশনস্' ভাবাবেগের প্রণোদনায় রচিত। কবিতার ক্ষেত্রে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য নাম অবশ্যই ভিক্তর উগো (Victor Hugo)। উগো-র 'ক্রমওয়েল' কিংবা 'হারনান্জি' নাটকে রোমান্টিকতার ছাপ দেখা যায়। আর উগোর উপন্যাসের মধ্যে 'লা মিজারেবলস্' 'নাইনটিথ্রি', 'Hunchback of Nottredam' বিখ্যাত। ফ্রান্সের আর একজন রোমান্টিক সাহিত্যিক ছিলেন আলেকজাণ্ডার ডুমা (Dumas), যাঁর The Three Musketeers সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। তাছাড়া 'The Count of Monte Christo' সমধিক পরিচিত। এছাড়া বালজাক, জর্জ স্যান্ড প্রমুখের নাম এক্ষেত্রে করা যায়।

রুশ সাহিত্য ঃ উনিশ শতকে রোমান্টিক সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে রুশ সাহিত্যরথীরাও কম ছিলেন না। আলেকজাণ্ডার পুশকিন, তুর্গেনিভ, গোগোল, ডস্টয়েভস্কি প্রমুখের নাম এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। পুশকিনের 'দ্য কাপটেনস্ ডটার' উল্লেখযোগ্য। তুর্গেনিভ এর লেখার মধ্যে বিষাদ ও দুঃখবাদ থাকলেও রুশ সমাজের চিত্র তাঁর রচনায় স্পষ্ট। তাঁর অন্যতম সেরা রচনা 'Fathers and Children'। ডস্টয়েভস্কি রুশ সমাজের দারিদ্র্যের মধ্যেও মঙ্গলের বীজ দেখেছেন। কৃষকদের প্রতি তাঁর গভীর সহানুভূতি ছিল। তাঁর 'Poor People', 'Crime and Punishment' ইত্যাদি বিখ্যাত রচনা। গোগোল এর 'ওভার কোট' গল্প তো সবারই জানা।

জার্মান সাহিত্য ঃ জার্মান রোমান্টিক সাহিত্যের আদিগুরু ছিলেন জেনাথান গটফ্রিড হার্ডার। তারই প্রভাবে জার্মান রোমান্টিক সাহিত্যে Streem and Drang নামে একটি গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। মহাকবি গ্যয়টেও এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এদের পরে জার্মান রোমান্টিক সাহিত্যে নোভালিস, শ্লেগেল, ফিকিউ, স্নায়েরমাক প্রমুখ সাহিত্যিকগণ 'রোমান্টিক গোষ্ঠী' গঠন করেন, যারা মধ্যযুগের ইয়োরোপ, সামন্ত প্রথা, শিভ্যালরি, ক্রুসেড প্রভৃতি অতিশয়োক্তিপূর্ণ বর্ণবহুল রচনা প্রকাশ করেছিলেন।

বাস্তববাদী সাহিত্য ঃ ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া, জার্মানি, ভিন্ন পোল্যাণ্ড, ইতালিয়, স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ান, চেক, স্প্যানিশ প্রভৃতি ভাষার সাহিত্যেও রোমান্টিকতার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। উনিশ শতকের শেষ দুই দশক থেকে বিশ শতকের প্রথম তিন দশকের মধ্যে রোমান্টিসিজম্-এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। এই প্রতিক্রিয়া দেখা যায় 'আধুনিকতা' এবং 'বাস্তববাদিতা'র প্রবণতার প্রভাবে। প্রকৃতপক্ষে সমাজের সব শ্রেণীর সমস্যার উদ্ঘাটন করাই বাস্তববাদী সাহিত্যের আদর্শ হয়ে ওঠে।

বাস্তববাদী সাহিত্যিকদের মধ্যে ফ্রান্সের গুস্তাফ *ফ্লবেয়ার* (Flaubert), আলফোনসি *দোদে* (Daudet), *মপাসাঁ* (Maupassant), জ্যাক থিবোল্ট, জোলা, আনাতোল ফ্রান্স উল্লেখযোগ্য। ইংরেজিতে জর্জ মেরিডিথ, টমাস হার্ডি, বার্নার্ড শ, এইচ জি ওয়েলস্, নরওয়ের হবসেন; রাশিয়ার তলস্তয়, চেকভ, ম্যাক্সিম গর্কি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ফ্লবেয়ার ছিলেন আইনজীবী। তাঁর 'মাদাম বোভারি' এক উৎকৃষ্ট সাহিত্যকীর্তি। দোদের Tartarin of Tarascon; গী দ্য মপাসাঁর ছোটগল্পগুলি (বিশেষত বুলে দ্য সুইফ); এমিল জোলার 'নানা', থিবো-র The Crime of Sylvestere Barnard' ইত্যাদি ফরাসি সাহিত্যের উজ্জ্বল উদাহরণ। রুশ বাস্তববাদী সাহিত্য জগতবিখ্যাত। লিও তলস্তয় নিজে অভিজাত বংশের ব্যক্তি হয়েও দরিদ্র মানুষদের জন্য দরদী ছিলেন, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ত্যাগ করে দার্শনিক ভাবামগ্ন তলস্তয় War and Peace নামে বিখ্যাত উপন্যাস লেখেন। তাছাড়া 'অ্যানা কারেনিনা', 'রেজারেকশন' 'দ্য ক্রয়েটজার সোনাটা' ইত্যাদি গ্রন্থের নাম উল্লেখযোগ্য। ম্যাকসিম গর্কির 'মা' (Mother) অসাধারণ রচনা। তিনিও সমাজের নিম্ন শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে আত্মিক যোগ অনুভব করতেন। চেকভও কৃষকদের জীবন নিয়ে লেখেন। ইবসেন নরওয়ের বিখ্যাত নাট্যকার। একদা ভাবপ্রবণ হলেও পরে বাস্তববাদ দ্বারা প্রভাবিত হন। 'Doll's House', 'Ghosts' প্রভৃতি রচনা স্মরণীয়। আর ইংরেজিতে টমাস হার্ডির 'Far from the Madding Crowd', 'Mayor of Castorbridge' থেকে শুরু করে বার্নাড শ, ওয়েলস প্রমুখের নানা রচনায় বাস্তববাদী সাহিত্য উজ্জ্বল হয়ে আছে। এক কথায় বলা যায়, উনিশ শতকে বিভিন্ন ইয়োরোপীয় সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছিল।

৩। শিল্প ও সংস্কৃতি

এক কথায় 'শিল্প' শব্দটি উচ্চারণ করলেও এর মধ্যে চিত্রকলা (Painting), স্থাপত্য (Architecture), ভাস্কর্য (Sculpture) ইত্যাদি শিল্পের নানা শাখার কথাই বোঝায়। উনিশ শতকের আগে থেকেই রোমান্টিকতাবাদ চিত্র শিল্পে তার প্রভাব ফেলে। রোমান্টিক আন্দোলনে প্রভাবিত শিল্পীরা কোনও নির্দিষ্ট নিয়মের অধীনে ছিলেন না। তাঁরা তাদের মনের স্বাধীনতা ও প্রতিভার দ্বারা অনুভূতি ও প্রেরণাকে সুষমমণ্ডিত করে প্রকাশ করেছেন। ভাবপ্রবণতার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে রোমান্টিক শিল্পীরা ছিলেন স্বতঃপ্রবৃত্ত এবং স্বতঃস্ফূর্ত; বিষয়বস্তুর পরিবর্তে অন্তরের গভীরতম আবেগ সহজ সরলভাবে ফুটিয়ে তোলাই যেন ছিল তাদের উদ্দেশ্য।

রোমান্টিক চিত্রকলার বিখ্যাত প্রতিনিধি ছিলেন *Eugene Delacroix* (1799-1863)। দেলাক্রোয়ার চিত্রে উজ্জ্বল রঙ এবং রেখা ও তুলির ব্যবহারের যেন তুলনা নেই। তিনি প্রচলিত অঙ্কন রীতি বা ক্লাসিকাল ঐতিহ্য থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। দেলাক্রোয়ার অবাধ বিচরণ আমরা লক্ষ্য করি ইতিহাসের গতিপথে। মধ্যযুগের প্রতি তার এক সহজাত আকর্ষণ থাকলেও সমসাময়িক যুগের প্রতিও তিনি আকৃষ্ট ছিলেন। স্বাধীনতার আকাঙ্খা তার ছবির মধ্যে ফুটে উঠত। ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে উজ্জ্বল রঙ ও রেখার টানে এবং পরিবেশের সঙ্গে শিল্পীর চেতনা-সঞ্জাত অনুভূতি মিলিয়ে দেলাক্রোয়া অনির্বচনীয় সৌন্দর্যের আঁধার চিত্রগুলি এঁকে ছিলেন। আগেই উল্লেখ করেছি যে, মধ্যযুগের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল। 'Entrance of the Crusaders into Constantinople' এবং 'Templers carrying off Rowena' নামক দুই বিখ্যাত চিত্রে ঐ মনোভাবের প্রকাশ দেখা যায়, যেখানে শিল্পী স্বাধীনতার আকাঙ্খাকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। আমরা বলতে পারি ঐতিহাসিক ঘটনাবলী তাঁর মনের অনুভূতি, চেতনার সবুজ, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য কামনা ইত্যাদিতে জড়িত হয়েছিল। 1830 খ্রিস্টাব্দের ফ্রান্সে জুলাই বিপ্লবের পটভূমিকায় তাঁর আঁকা Liberty Leading the People. কিংবা তুর্কি অটোমান অপশাসনের বিরুদ্ধে গ্রিকদের সংগ্রামের প্রতীক 'The Massacre of Scio' (1824)—ইত্যাদি চিত্র সমগ্র ইয়োরোপে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে।

দেলাক্রোয়া ছাড়াও *Gericault* (1791-1824) ফ্রান্সে তাঁর চিত্রের মধ্যে দিয়েও ব্যক্তি অনুভূতির প্রকাশ ঘটিয়ে ছিলেন। নেপোলিয়নের যুগের এই শিল্পী যে-সব চিত্র এঁকে ছিলেন তার মধ্যে দিয়ে অঙ্কন শৈলী, রঙের ব্যবহার, বিষয়বস্তু সব কিছুতেই ক্লাসিকতা-বাদের ফর্ম ভেঙে রোমান্টিকতাবাদের প্রকাশ দেখা যায়। জেরিকো-র চিত্রগুলিতে ঐতিহাসিক বিষয়ের মধ্যে নাটকীয় মুহূর্তগুলিও ব্যক্তির মনের ব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছে। 'An Wounded Soldier in a Cart', 'The Return from Russia', 'The Raft of

the Meduza' ইত্যাদি চিত্রে নেপোলিয়ানের যুগ অক্ষয় হয়ে আছে। এই চিত্রগুলির প্রভাব শুধু ফ্রান্সে নয়, সারা ইয়োরোপে ছড়িয়ে পড়ে। এছাড়া দাভিদ, আতোঁয়ান, জেরাক, দেলাক্রুশ প্রমুখ শিল্পীরা রঙ ও তুলির টানে এমন সব চিত্র উপহার দিয়েছেন যা এখন ইতিহাসের অমূল্য সম্পদ হিসেবে বিবেচিত। আতোঁয়ান ও জেরাকের চিত্রে নেপোলিয়ানের যুগ, কোরো-র চিত্রে নিসর্গ ধরা পড়েছে।

বিখ্যাত স্প্যানিশ চিত্রশিল্পী গোয়া (Goya, 1746-1828) যে-সব নিসর্গ চিত্র ও স্পেনের জীবনযাপনের দৃশ্য এঁকেছিলেন তার উপর রোমান্টিকতাবাদের প্রভাব স্পষ্ট। নিজস্ব অনুভূতি ও উপলব্ধি দ্বারা এক অনির্বচনীয় সুষমায় মানুষের সুখ-দুঃখ যেন জীবন্ত হয়ে ধরা দিয়েছে তাঁর চিত্রে। স্পেনে তিনি রোমান্টিক চিত্রকর হিসেবে নব ক্লাসিকবাদের ফর্ম বা অঙ্গাদি ভেঙে তাঁর অনুভূতিকে স্বাধীনতা দেন।

উনিশ শতকের ইয়োরোপীয় চিত্রকলার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল ফ্রান্স। সেখানে পূর্বোক্ত শিল্পীরা ছাড়াও করো, বারবিজ, আঁরি দোমিয়ে প্রমুখ ছিলেন খ্যাতনামা শিল্পী। তবে চিত্রশিল্পের অপর এক কেন্দ্র ছিল ইংল্যান্ড। ফরাসি শিল্পীদের মতন ইংরেজ চিত্রকররাও ক্লাসিকাল শৈলকলা থেকে সরে এসে নতুন বিষয়বস্তু ও শিল্পী-শৈলীর অবতারণা করেছিলেন। রোমান্টিক যুগের ইংরেজ শিল্পীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন কনস্টেবল (*Constable*)। তাছাড়া টারনার, বার্ণ হোনস্, রসেটি, হান্ট প্রমুখ চিত্রশিল্পীর নাম করা যায়। কনস্টেবল তাঁর মনোহর নিসর্গ চিত্রগুলির মধ্যে দিয়ে এক অসাধারণ কীর্তির ছাপ রেখে গেছেন। প্রকৃতির সবকিছু আলো-বাতাস-গাছপালা-নদী যেন ব্যক্তিগত অনুভূতি রঙে নতুনভাবে হাজির হয়েছে। দর্শকরা তাঁর চিত্রে তাই প্রাণের স্পন্দন অনুভব করত। টারনারও বেছে নিয়েছিলেন প্রকৃতি তবে তা শান্ত, সমাহিত নয়, বরং উত্তাল তরঙ্গমালা বা ঝড়ের দৃশ্য, ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ শস্য ক্ষেত্র বা উত্তুঙ্গ পর্বতমালা তার তুলিতে অপূর্ব সুষমায় ফুটে উঠত।

C.J.H. Hayes লিখেছেন যে, "মধ্যযুগের শেষে রেনেশাঁস প্রসূত ক্লাসিকাল শিল্পের ধারা এবং উনিশ শতকের প্রথম দিক থেকে ভাবাবেগ সর্বস্ব রোমান্টিকতার ধারা ইয়োরোপের শিল্পকলার উপর প্রভাব বিস্তার করে চলছিল।" ক্রমে নিসর্গ চিত্র বা ঐতিহাসিক চিত্রকলার পারস্পরিক রূপকচিত্র জনপ্রিয়তা লাভ করে। তবে যা মনে রাখা দরকার তা হলো সাহিত্যের মতন চিত্রকলার ক্ষেত্রেও ক্রমে বাস্তববাদের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। ফলে মার্তে, ডেগা, কেজান, গগাঁ বা ভ্যান গগের মতন পৃথিবী বিখ্যাত শিল্পীদের এ সময় আবির্ভাব ঘটেছিল।

চিত্র শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে রোমান্টিক যুগে ইয়োরোপের ভাস্কর্যেরও বিকাশ ঘটেছিল, যেমন ঘটেছিল স্থাপত্যের ক্ষেত্রে। ভাস্কর্যের মধ্যে ক্লাসিকাল যুগ থেকে বেরিয়ে আসার

মানসিকতা লক্ষ্য করা যায়। তারা সুন্দরী রমণীর নগ্ন দেহের মডেল আঁকা পরিত্যাগ করে সাধারণ মানুষ, এমনকি শ্রমজীবীদের জীবন যাপন পর্যন্ত ভাস্কর্যের বিষয়বস্তু করে নেন। গৃহহীন কোয়েকারদের বাসস্থান পর্যন্ত ভাস্কর্যের বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। এই সব রোমান্টিক ভাস্করদের মধ্যে অনেকে ছিলেন সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত। এই ভাস্করদের মধ্যে আঁরি দোমিয়ে (*Daumier*) খুবই খ্যাতিমান। The Refugees তার এক বিখ্যাত ভাস্কর্য কীর্তি। এক্ষেত্রে মনে পড়ে আমাদের দেশে শান্তিনিকেতনে রামকিঙ্কর বেজ সাধারণ মানুষদের সুখ-দুঃখ ভাস্কর্যে ফুটিয়ে তুলতেন।

স্থাপত্যের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, গ্রিক ও ল্যাটিন ধর্মী ক্লাসিকাল বা ধ্রুপদী স্থাপত্য-শৈলীর পরিবর্তে ইয়োরোপে মধ্যযুগে গথিক স্থাপত্যরীতির প্রতি আগ্রহ বাড়ে। সে-যুগের গির্জা বা অট্টালিকার মধ্যে তার প্রমাণ অজস্র ছড়িয়ে আছে। রোমান্টিকতার যুগে ইয়োরোপে গথিক ধর্মী স্থাপত্যের প্রতি আবার আগ্রহ বাড়ে। 1830 খ্রিস্টাব্দের পর ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন স্থাপত্যের মধ্যে গথিক রীতির পুনরুজ্জীবন লক্ষ্য করা যায়। এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন খ্যাতনামা স্থপতি অগাস্টাস পুগিন (*Pugin*)। মধ্যযুগীয় স্থাপত্যরীতি কলাকৌশলের উপর তাঁর যে মনের টান ছিল, সেই আকর্ষণের পরিচয় পাওয়া যায় উইণ্ডসর প্রাসাদের জন্য নির্মিত আসবাবপত্রগুলির মধ্যে। আরও যা বিখ্যাত তা হলো, 1840-1860 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে স্যার চার্লস বেরি নামক খ্যাতনামা স্থপতিকৃতইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত ওয়েস্টমিনস্টার প্রাসাদটির নির্মাণ কার্য। এটিও রোমান্টিকতার প্রভাবে তৈরি। এই যুগে গ্রিক ও ল্যাটিন রীতির ঐতিহ্যবাহী গম্বুজ ও থামের বদলে চূড়া ও খিলানযুক্ত গৃহ, গির্জা নির্মাণের দিকেপ্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। হোরেস ওয়ালপোল তাঁর ক্যাসল অফ ওট্রাণ্টায় গথিক স্থাপত্যের প্রতি ঝোঁক দেখিয়েছিলেন। ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্ট গৃহেও গথিক শৈলীর প্রভাব বর্তমান। 1834 খ্রিস্টাব্দে এক অগ্নিকাণ্ডে পুরাতন সংসদের ক্ষতি হয়। শুধু-ইংল্যাণ্ড নয়, ফ্রান্স, জার্মানি সহ ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশেও রোমান্টিক শৈলীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। জার্মানিতে মহাকবি গ্যয়টে, ফ্রান্সে সেতোব্রিয়া এবং স্লেগেল গথিক স্থাপত্য রীতির জয়গান করার ফলে,ইয়োরোপে এই শৈলীর স্থাপত্য জনপ্রিয়তা লাভ করে। ফ্রান্স ও জার্মানির বহু আশ্চর্য সুন্দর স্থাপত্য কীর্তি আজও তার সাক্ষ্য বহন করছে। ফ্রান্সে পুনরুজ্জীবিত গথিক রীতির অন্যতম প্রধান প্রবক্তার নাম *Violitle Le duc*। তাঁরই উদ্যোগে ফ্রান্সের বিখ্যাত নোতরদাম গির্জার পুনর্নির্মাণ হয়। লুই ফিলিপ এবং তৃতীয় নেপোলিয়ান এই রোমান্টিক শিল্প শৈলীকে পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। ইংল্যাণ্ডেওভিক্টোরিয়ার যুগে সরকারি, বেসরকারি বাড়ি, রেলস্টেশন, ডাকঘর প্রভৃতিতে গথিক স্থাপত্যে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। উনিশ শতকের শেষ দিকে বাস্তববাদের প্রভাবে স্থাপত্যে গথিক রীতির পরিবর্তে আধুনিক রীতির প্রবর্তন হতে শুরু করে।

৪। সংগীত

উনিশ শতকের রোমান্টিকতার প্রভাব সাংস্কৃতিক মাধ্যম হিসেবে সংগীতের ভিতর দিয়েও লক্ষ্য করা যায়। মনে রাখা দরকার, রোমান্টিক যুগের আগেকার সংগীত ছিল ধ্রুপদী বা ক্লাসিকাল, তার বৈশিষ্ট্য ছিল সংগীতে গলার কাজ, সুরের খেলা, রাগ-রাগিণীর বিশুদ্ধতা। সংগীতের মধ্যে শিল্পীর স্বাধীনতা বা আবেগ কিংবা গায়কের নিজস্ব সৃষ্টির উজ্জ্বল প্রকাশের সুযোগ সেখানে নেই। সেবাষ্টিয়ান *বাখ* (Bach) কিংবা *মোৎসার্ট* (Mozart) -এর মতন অমর এবং পৃথিবী বিখ্যাত সুরকার প্রাক্-রোমান্টিক যুগের প্রতিনিধি। উনিশ শতকে রোমান্টিকতাবাদ ছড়িয়ে পড়লে সংগীতে তার খুবই বেশি প্রভাব পড়ে। হেস্ -এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য: "Music during the era from 1830 to 1878 was the most thoroughly romantic of all the arts"। বস্তুতপক্ষে রোমান্টিক ধারার সংগীতে সুরকার বা গায়কগণ আবেগ ও অনুভূতি সুরের বর্ণনায় সোনালী সূর্যের মতন ছড়িয়ে দেন। ব্যক্তিগত অনুভূতি ক্রমেই সার্বজনীন ব্যঞ্জনা পায়। ইয়োরোপের সর্বত্রই ভাবাবেগ সংগীতের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করার ফলে স্বাদেশিকতার মনোভাব প্রাধান্য পায়। সব দেশেই জাতীয় সংগীত রচিত ও গীত হতে শুরু করে। শুধু জাতীয় সংগীত রচনা ও প্রসার দ্বারা রোমান্টিক যুগ চিহ্নিত ছিল এমন নয়। লোক সংগীত উদ্ধার, সংগ্রহ, প্রচার ও প্রসার দ্বারাও ক্লাসিকাল রীতি থেকে উত্তরণ ঘটে। সব জায়গাতেই লৌকিক যাত্রাভিনয়, অপেরাধর্মী সংগীত, লৌকিক নৃত্য ও ব্যালে এবং লোক সংগীত (Folk song) জনগণের কাছে আদৃত হতে থাকে। এই সাংগীতিক ঐতিহ্য পরবর্তী যুগেও অব্যাহত ছিল। অপেরা (Opera) ধর্মী বা সংগীত প্রধান নাটকে বাজনার ব্যবহারও ছিল অতি চমকপ্রদ।

রোমান্টিক যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সংগীতকার ছিলেন *লুডভিগ বেটোফেন* (Ludwig Beethoven)। বেটোফেন প্রথম দিকে ছিলেন ক্ল্যাসিকাল বা ধ্রুপদী শিল্পী কিন্তু ক্রমে ক্রমে তিনি সংগীতে ব্যক্তিগত অনুভূতি ও আবেগকে প্রাধান্য দিয়ে সুরের ঝংকার তোলেন। তাঁর সৃষ্ট সুরগুলির মধ্যে Pastoral Symphony স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করার মতন। তাঁর এই অসাধারণ কম্পোজিশনের মধ্যে দিয়ে ঝংকৃত হয়েছে গ্রাম্য নৃত্যের উল্লাস, পাখির কলতান, মেষপালকদের বাতাসে ভেসে যাওয়া সাংগীতিক মূর্ছনা, গ্রাম্য লৌকিক সুর। ঐপর্যায়ের রচনাগুলির মধ্যে এগমন্ট ও ব্যারিওল্যানাসের নাচ উল্লেখ করা যায়। আসলে সংগীতের বা সুরের মাধ্যমে কিভাবে ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রকাশ করা যায় তা দেখিয়েছেন স্বনামধন্য বেটোফেন। তিনি সাতটি সিম্ফনি রচনা করেছিলেন।

রোমান্টিক যুগে সংগীতের অন্যতম শ্রেষ্ঠপ্রতিনিধি ছিলেন জার্মান সংগীতজ্ঞ ফ্রানজ্ *সুবার্ট* (Schubert, 1797-1828)। সুবার্টকে অনেকে সংগীতের জনক বলেন। *লীজ* (Liszt) নামে এক জার্মান সংগীতজ্ঞ বলেছিলেন, যখনই কেউ সুবার্টের সংগীত শ্রবণ

করত, তার কাব্যিক সৌন্দর্যে ও সুরের ঝংকারে মুগ্ধ হত। সুর শুনেই বোঝা যেত এটি সুবার্টের। মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে তাঁর অকাল মৃত্যু ঘটে। তিনি ছিলেন একাধারে সুরকার এবং গীতিকার। তাঁর সিম্ফনি এবং কোয়াট্রেটগুলি লিরিকধর্মী। মৃত্যুকালে অনেক গীতি কবিতা ও কম্পোজিশন তিনি রেখে যান।

পোলিশ সংগীতজ্ঞ *শপাঁ* (Chopin, 1809-1849) রোমান্টিক যুগের অপর এক বিখ্যাত সংগীত শিল্পী। যৌবনে প্যারিসে ছিলেন, দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন কাটিয়েছেন, ছাত্রদের সংগীত শিখিয়েই জীবন নির্বাহ করতেন। তিনি পিয়ানোর মাধ্যমেই মনোমুগ্ধকর সুরের ঝংকার তুলতেন। তাঁর সংগীতের মধ্য দিয়েই পোল জাতির ধ্রুপদী ঐতিহ্য; অতীত ঐতিহাসিক গৌরব যেমন বোঝা যেত তেমনি পোল্যাণ্ডের পরাধীনতার গভীর মর্মবেদনাও। আসলে তাঁর ভাবাবেগের মধ্যে পোলিস জাতীয়তাবাদ যেমন পরিস্ফুট, তেমনি ব্যক্তির দুঃখের অনুভূতি, যাকে অনায়াসেই পোলিস জনগণের অভাব অভিযোগের প্রতীক হিসেবে ধরা যায়। জার্মান সংগীতজ্ঞ শুম্যান শপাঁকে 'The boldest and proudest poetic spirit of the time' বলে সম্মান জানিয়েছে।

সুরকার এবং সংগীত সমালোচক রবার্ট *শুম্যান* (Schumann, 1810-1856) ছিলেন জার্মান। 1834 খ্রিস্টাব্দে তিনি একটি পত্রিকার প্রবর্তন করেন এবং সেই পত্রিকার মাধ্যমে সংগীতে রোমান্টিক ভাবধারা প্রসারে ব্রতী হন। সংগীত তাঁর কাছে ছিল মনের ভাব প্রকাশের ভাষা। তাঁর সৃষ্ট সিম্ফনিগুলি সংগীতের জগতে এক মহান সৃষ্টি বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। জার্মানির আরও দুজন অসামান্য সংগীতকার এই যুগেরই প্রতিনিধি। একজন হলেন ফেলি পা *মেণ্ডেলসন* (Mendelson) এবং অপরজন *ভাগনার* (Wagner)। মেন্ডেলসন ছিলেন ধনী সন্তান। তার সুরের যাদুতে জার্মান জাতিকে তৃপ্ত করে। তার কম্পোজিশনগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য A Midsummer Night's Dream। ভাগনার তাঁর ভাবপ্রবণ সুরলহরীর মধ্য দিয়ে জার্মান জাতির জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটানোর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাছাড়া তাঁর প্রতিষ্ঠিত অপেরা ও যাত্রানুষ্ঠানের জন্য ভাগনার মধ্যযুগের জার্মান সাহিত্য ও লোকগীতি থেকে বিষয়বস্তু সংগ্রহ করেছিলেন।

রোমান্টিক যুগে ইতালির একজন বিখ্যাত সুরস্রষ্টা ছিলেন *ভারদি* (Verdi)। ভাগনারের দ্বারা অপেরা সংগীতে বিশেষ পুষ্টি ঘটেছিল। তেমনি ভারদি ইতালীর সংগীতে দেশবাসীকে মুগ্ধ করেছিলেন। এছাড়া রোমান্টিক সংগীতের জগতে ব্রামস, লিস্ট, রোসিনি, বেলিনি, দোনিজেডি প্রমুখ অপেরাধর্মী সংগীত ও ভাবাবেগ দ্বারা নতুন ধারাকে সমৃদ্ধ করেন। ভাগনারের সংগীত প্রধান বা অপেরাধর্মী নাটকগুলির মধ্যে Parsifal, Lohengein প্রভৃতি উল্লেখ্য। এছাড়া আর একজন সুরকার ছিলেন গোনো।

সাহিত্যের মতন সংগীতের ক্ষেত্রেও উনিশ শতকের শেষ দিকে বাস্তববাদের প্রভাব পড়ে। *Gounod, Wagner, Verdi* প্রমুখ 1870 খ্রিস্টাব্দের পরেও জীবিত ছিলেন এবং পরবর্তীকালেও রোমাণ্টিকতার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়েছিলেন। ফ্রান্সে গোনোর কাজ পরে এগিয়ে নিয়ে যান ক্যামিলে, যিনি ফরাসি অপেরার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। জার্মানিতে ভাগনার এর কাজ এগিয়ে নিয়ে যান রিচার্ড স্ট্রাস। স্ট্রাস অবশ্য পরে নীৎসের প্রভাবে সিম্বলিক গীতিকাব্য রচনা করতেন। ইতালিতে ভারদির কাজ এগিয়ে নিয়ে যান পুচিনি। চেক্, নরওয়েজিয়ান, রুশ প্রভৃতি সংগীতেরও পুষ্টিলাভ হয় বাস্তববাদের প্রেরণায়। মুসরগস্কি, রিমস্কিকোরসাকভ প্রমুখ বাস্তবাদী সংগীত শিল্পী রাশিয়াতে অর্কেস্ট্রার মাধ্যমে লোক সংগীতের অবতারণা করেন। বিংশ শতকে অবশ্য সংগীতের ক্ষেত্রে নতুন যুগের অভ্যুদয় ঘটে।

৫। বিজ্ঞান

উনিশ শতক থেকে বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে ইয়োরোপে স্মরণীয় অগ্রগতি ঘটে। তাঁর পূর্ণ পরিণতি দেখা যায় বিংশ শতকে। এর মধ্যে যুগান্তকারী ঘটনা হলো প্রকৃতি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে চার্লস ডারউইন এবং তাঁর পরিবর্তনবাদের উপর গবেষণা, মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সিগমণ্ড ফ্রয়েডের গবেষণা এবং পদার্থবিদ্যায় অ্যালবার্ট আইনস্টাইন আর তার আপেক্ষিক তত্ত্ব। তেমনি উনিশ-বিশ শতকের বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে অনন্যসাধারণ ঘটনা অনু-পরমাণু বিষয়ক গবেষণা, অ্যাটম এবং হাইড্রোজেন বোমার আবিষ্কার এবং তার ব্যবহার। তবে ব্যাপকভাবে বললে গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন শাস্ত্র, জীববিদ্যা, প্রাণি বিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, চিকিৎসা শাস্ত্র ইত্যাদি বিজ্ঞানের নানা শাখাতেই আলোচ্য যুগের অগ্রগতির স্বাক্ষর রয়েছে।

উনিশ শতককে বলা যেতে পারে পূর্ববর্তী শতকের প্রস্তুতি আর পরবর্তী শতকের প্রগতির মধ্যে সেতুস্বরূপ। আঠারো শতক পর্যন্ত বিজ্ঞানের জগতে যেসব সাফল্য অর্জিত হয়েছিল সেগুলিকে উনিশ শতকে নতুন করে যাচাই করে নেওয়া, শ্রেণীবদ্ধ ও সুগঠিত করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হয়। যেমন দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, গণিতশাস্ত্রবিদ এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ আইজাক নিউটনের তত্ত্বকে আরও প্রসারিত করেন। পদার্থবিদ্ এবং রসায়নবিদগণ পরমাণুতত্ত্ব নিয়ে আরও গভীর অনুসন্ধান শুরু করেন।

আরও উদাহরণসহ বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পারে। উনিশ শতকে লাপ্লেস নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব (Law of Gravitation) নিজস্ব পদ্ধতি অনুসারে আরও একবার প্রমাণ করেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে লেভেরিয়ার গাণিতিক হিসাবের সাহায্যে এবং

প্যারিসের মানমন্দিরে নিরীক্ষণের মাধ্যমে 'নেপচুন' গ্রহের সন্ধান পান 1846 খ্রিস্টাব্দে। উত্তরকালে এরপর প্লুটো গ্রহ আবিষ্কৃত হয়। এভাবেই পদার্থবিজ্ঞানীরা শিল্প বিপ্লবের অনেক চাহিদা মেটাতে সমর্থ হন। যে বিষয়গুলির উপর গবেষণা চলে সেগুলি হলো অপটিকস্, ম্যাগ্নেটিজম্, ইলেকট্রিসিটি এবং থার্মোডায়নামিক্স। এই গবেষণাগুলিতে শুধু বিজ্ঞান নয় শিল্পেরও অগ্রগতি হয়। এই সময়কার পদার্থবিদদের মধ্যে জুলে ফন হেলমোজ, কেলভিন প্রমুখের নাম করা যায়। পরমাণু তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে আধুনিক রসায়নশাস্ত্র নতুন মোড় নেয়। জন ডালটন, অ্যাভোগ্যাডরো প্রমুখ এবিষয়ে কাজ করেন।

ডারউইন এবং তার বিবর্তনবাদ : *চার্লস্ ডারউইন* (Charles Darwin, 1809-1882) ছিলেন ইংরেজ নিসর্গবিদ এবং জীববিজ্ঞানী। 1859 খ্রিস্টাব্দে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ The Origin of Species প্রকাশিত হলে সমগ্র ইয়োরোপে বুদ্ধিজীবী মহলে মহা আলোড়নের সৃষ্টি হয়। 1871 খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় ডারউইনের দ্বিতীয় গ্রন্থ The Descent of Man। গ্রন্থগুলির মধ্যে ডারউইন বিবর্তনবাদের ক্ষেত্রে যে তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন তার প্রতিক্রিয়া ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। পিতামহ ছিলেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও লেখক এরাসমাস ডারউইন। তাঁর প্রেরণায় চার্লস প্রকৃতির রহস্য বিষয়ে আগ্রহী হন। তিনি 1831 থেকে 1836 খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত দক্ষিণ আমেরিকার সংলগ্ন গালাপাস্ অঞ্চলে আগ্নেয়গিরি এলাকা পরিভ্রমণ করে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। তারপর তিনি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত বহু জীবাশ্ম (ফসিল) পরীক্ষা করে বিবর্তনবাদ বা অভিব্যক্তিবাদের তত্ত্ব (Theory of Evolution) নামে এক মতবাদ প্রচার করেন। এই তত্ত্বের মূলকথা হলো, জগতের প্রাণী বা উদ্ভিদ অভিযোজনের ফলেই বিশেষ স্থানের উপযোগী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়। তারফলে বিশেষ প্রজাতির উৎপত্তি। সৃষ্টির শুরু থেকে জীবজগতের নানা প্রাণী বহু বিবর্তনের ভেতর দিয়ে বর্তমান স্তরে এসে পৌঁছেছে এবং বিবর্তনের ফলেই পৃথিবীর প্রথম সৃষ্ট জীব বা প্রাণীর সঙ্গে বর্তমানকালের প্রাণীর তফাৎ। সৃষ্টির আদি যুগ থেকেই স্থান ও খাদ্যের জন্য বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে প্রতিনিয়ত এক নির্মম সংগ্রাম চলে আসছে। ডারউইনের মতে, এই সংগ্রামের নাম 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' (Natural Selection)। এই সংগ্রাম ছিল প্রকৃতি, জলবায়ু ও পরিবেশ এবং সেগুলির পরিবর্তনের সঙ্গে। যে-সব জীব সেই সংগ্রামের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারল তারাই আধুনিক যুগে এসে পৌঁছল।

ডারউইনের তত্ত্বের মূলকথা হলো—(১) ভূস্তরের বিভিন্ন স্তর খনন কার্যের ফলে যে জীবাশ্মগুলির নমুনা পাওয়া গেছে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ডারউইন সিদ্ধান্তে আসেন যে, যে-সব প্রাণীর অস্তিত্ব এখন আমরা দেখতে পাই, তারা বহু হাজার বা লক্ষ বছর

ধরে বির্বতনের পথে বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। (২) প্রতিকূল পরিবেশ, প্রকৃতি, আবহাওয়া ও অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে বেঁচে থাকার সংগ্রাম নিরন্তর প্রবহমান এবং তাতে যে প্রাণীগুলি খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছে তারাই বর্তমানকালে টিকে আছে। (৩) এই প্রাকৃতিক নির্বাচনে যারা যতখানি সক্ষম তাদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা তত বেশি। অর্থাৎ যোগ্যতমেরই বেঁচে থাকার অধিকার আছে। এই তত্ত্ব, ইংরেজিতে যাকে বলে Survival of the Fittest. ঈশ্বর কর্তৃক প্রাণী ও মানুষের সৃষ্টির তত্ত্বকে বাতিল করে দেয়।

ডারউইনের তত্ত্বকে টি. এস. হাক্সলি এবং আর্লিস্ট হেকেল বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করে প্রচার করেন। ডারউইনের বিবর্তনবাদ সমাজবিজ্ঞান ও দার্শনিক চিন্তাধারার উপরেও গভীর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ডারউইনের তত্ত্ব অনুসারে মানুষ হলো সবচেয়ে 'ফিট'। পরবর্তী কালে ডারউইনবাদ শুধু প্রাণিবিদ্যার ক্ষেত্রেই নয়, এক শ্রেণীর মানুষ সামাজিক ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করার পক্ষপাতি ছিলেন।

সিগমণ্ড ফ্রয়েড (Sigmund Freud 1856-1939) **ও তার মনোবিজ্ঞান ঃ** উনিশ শতকের বিজ্ঞানের নানা শাখার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের (Psychology) ক্ষেত্রেও যথেষ্ট উৎকর্ষ দেখা যায়। এ বিষয়ে যুগান্তকারী অবদান নিয়ে এসেছিল অধ্যাপক সিগমণ্ড ফ্রয়েডের গবেষণা ও রচনাবলী। উনিশ শতকে আত্মা থেকে মনকে আলাদা বস্তু হিসেবে গণ্য করে মনোবিদ্যা বা মনোবিজ্ঞানকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিশ্লেষণ শুরু হয়। আগে ছিল এটি Philosophy বা দর্শনের একটি শাখা মাত্র। ফলে প্রাধান্য পেত আত্মা এবং স্বতন্ত্র হওয়ার ফলে প্রাধান্য পেল মন।

মনের ইচ্ছা, চিন্তা, অনুভূতি ইত্যাদি বিশ্লেষণই হলো মনোবিদ্যা। মনোবিদ্যার প্রধান কথাই হলো মানুষের মনের প্রকাশ দেহের ভিতর দিয়ে ঘটে। সুতরাং দৈহিক প্রকাশগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মনের অবস্থা বুঝতে হয়। উনিশ শতক থেকে কিছু কিছু বিজ্ঞানী এই বিদ্যাচর্চা শুরু করেন। ভুণ্ড (Wundt) নামে জার্মানি মনোবিজ্ঞানী 1874 খ্রিস্টাব্দ থেকে মনোবিদ্যার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রচার করেন। তিনি জোর দিয়েছিলেম মনের বিশেষ অবস্থার উপর। ব্রেন্টানো বলেছিলেন মনের ক্রিয়ার সঙ্গে বাহ্যবস্তুর সম্বন্ধ আছে। সুতরাং মনোবিদ্‌দের কাজ হলো কি পরিস্থিতিতে বাহ্যবস্তুর সঙ্গে কিরূপ প্রতিযোজনের ফলে কিরূপ মানসিক ক্রিয়া হয় তা বিশ্লেষণ করা। ব্রেন্টানোর প্রচার করা এই ক্রিয়াবাদ্যমূলক মনস্তত্ত্ব জনপ্রিয়তা লাভ করে। জে. আর. এঙ্গেল এই ক্রিয়াবাদ বিশ্লেষণে গ্রহণ করেন। ক্রিয়াবাদী বিশ্লেষণের মূলকথা হলো মানুষের আচরণগুলি লক্ষ্য করলে তার আচরণের মনস্তাত্বিক কারণও বোঝা যায়। জার্মান ভিলহেলস, হেবার ফকনার প্রমুখ ক্রিয়াবাদী

(Functional) মনোবিজ্ঞানী মনোবিদ্যার চর্চা করেন। মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছিলেন রুশ মনোবিজ্ঞানী অধ্যাপক প্যাভলভ। এছাড়া জন হপকিনস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন ওয়াটসন আচরণবাদী মনস্তত্ত্ব বা Behaviourism মতের প্রচার করেছিলেন। কোনও ব্যক্তির আচরণ বিশ্লেষণ করে চৈতন্য, মানসিকতা, অনুভূতি ইত্যাদি নিরূপণ করাই এদের মূল কথা। মনোবিদ্যা ক্রমে হলো *গেস্টাল্টবাদী* (Gestalt) মনোবিদ্যা। গেস্টাল্ট কথাটির অর্থ হলো অ-সাকার বা রূপ। এই মতবাদ অনুসারে কেবলমাত্র বিশ্লেষণের দ্বারা মনের স্বরূপ বোঝা যায় না। সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে ও মনস্তত্ত্বের সম্পর্ক আছে বলে তারা মনে করেন।

তবে, আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছিলেন সিগমণ্ড ফ্রয়েড। ক্রমে গেস্টাল্টবাদীদের বিকল্প হিসেবে ফ্রয়েডীয় মনোবিদ্যা প্রাধান্য পায়। ফ্রয়েড 1851 খ্রিস্টাব্দে অস্ট্রিয়ার অন্তর্গত মোরাভিয়া প্রদেশের ফ্রেইকো শহরে পশম ব্যবসায়ী এক ইহুদীপুত্র। ফ্রয়েড ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা বিজ্ঞান বিভাগে ছাত্র ছিলেন। পরে তিনি মনোরোগের চিকিৎসক হন। ফ্রয়েড যে তত্ত্ব প্রচার করেন তার মূলকথা হলো মনোবিদ্যা অন্যান্য বিজ্ঞান থেকে আলাদা। শারীরবৃত্তবিদ্যার সঙ্গে এর সম্বন্ধ নেই। সব সময় আচরণবাদের দ্বারাও মনস্তত্ত্ব বোঝা যায় না। এজন্য বুঝতে হবে মনের প্রতিক্রিয়া। মানুষের মনকে তিনি তিনটি স্তরে ভাগ করেন। (ক) অবচেতন মন, প্রাক্ চেতন মন, চেতন মন। প্রথম স্তরে (ইদ বা সাব কনশাস্ স্তর) মানুষের কামনা-বাসনা লুকানো থাকে। ফ্রয়েডই প্রথম যৌনতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। দ্বিতীয় স্তরে (প্রি কনশাস স্তর) মানুষের মতের অহং বা ইগো (Ego) মনে প্রভাব বিস্তার করে। তৃতীয় স্তরে সুপার ইগো বা বিবেক কাজ করে। ফ্রয়েড ক্রমে মনঃসমীক্ষা (Psychoanalysis) পদ্ধতির প্রচলন করেন। স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেন। শেষজীবনে ফ্রয়েড হিটলারের অত্যাচারে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

পদার্থবিদ্যা ও আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব : বর্তমান শতাব্দীতে বিজ্ঞানের যে অসাধারণ জয়যাত্রা হয়েছে তা আমাদের পাঠ্যসূচির অন্তর্গত না হলেও প্রাসঙ্গিকতা বোধে এখানে আলোচনা করা দরকার। বিদ্যুৎ থেকে বিমান কত কিছু এসেছে, বেতার থেকে প্রযুক্তির বৈপ্লবিক উন্নতিও লক্ষ্য করা গেছে, পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে এ-সব উন্নতি খুবই উল্লেখযোগ্য। তিনটি ক্ষেত্রে পদার্থবিদ্যার অগ্রগতি হলো মৌলিক। এগুলি যথাক্রমে (১) কোয়ান্টাম তত্ত্ব, যার আবিষ্কর্তা জার্মান পদার্থবিদ ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক। তিনি 1901 খ্রিঃ প্রমাণ করেন যে পদার্থের শক্তির স্ফুরণ ও বিলয় কিছু সময় অন্তর অন্তর হয়, একনাগারে হয় না। অনেকটা জোয়ার ভাটার মতো। এর থেকেই Quantum theory-র সৃষ্টি।

(২) অ্যালবার্ট আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিক তত্ত্ব (Theory of Relativity) এবং ঐক্যবদ্ধ ক্ষেত্র তত্ত্ব (Unified Field Theory) দ্বারা পদার্থবিদ্যায় বিশেষ অবদান রাখেন। (৩) আর পরমাণুবিক তত্ত্ব আবিষ্কারের ক্ষেত্রে অনেক বিজ্ঞানী যুক্ত ছিলেন— এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাদারফোর্ড, নীলস্ বোর, অটোহান, কাপিৎজা, ওপেনহাইমার প্রমুখ। বংশগতি তত্ত্বের উপর গবেষণা করেন *মেণ্ডেল* (Mendel)। শারীরবৃত্ত, শল্যবিদ্যা, রসায়ন, চিকিৎসাবিজ্ঞান, থেকে প্রযুক্তির নানা শাখায় উনিশ শতক থেকেই বিজ্ঞানচর্চা এগিয়ে চলেছে।

চতুর্থ পর্ব

আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ (১৮৭১-১৯১৪ খ্রিঃ)

(Modern Imperialism 1871-1914)

অধ্যায় ১৩

1871 খ্রিস্টাব্দের ইয়োরোপ এবং নতুন শক্তিসাম্য

(Syllabus: *Europe in 1871–New Balance of Power***)**

১। সেডানের যুদ্ধ এবং তার ইয়োরোপীয় প্রতিক্রিয়া

1870 খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে প্রাশিয়ার সৈন্যবাহিনীর হাতে ফরাসি দুর্গ মেজ (Metz)-এর যখন পতন হলো তখন ব্রিটিশ ঐতিহাসিক, লেখক এবং দার্শনিক টমাস কার্লাইল, যিনি আজীবন ছিলেন জার্মান সংস্কৃতির অনুরাগী, লণ্ডনের *The Times* পত্রিকায় লিখেছিলেন: "That noble, deep, pious and solid Germany should be at length weilded into a nation and become queen of the Continent instead of vapouring, vainglorious, gesticulating, quarrelsome and over-sensitive France, seems to me the hopefullest public fact that has occured in my time."[1] টমাস কার্লাইলের ভবিষ্যদ্বাণী আশ্চর্যজনকভাবে মিলে গিয়েছিল। 1870 খ্রিস্টাব্দে সেডানের যুদ্ধে ফ্রান্সকে পরাজিত ক'রে প্রাশিয়া শুধুমাত্র সমগ্র জার্মান রাজ্যগুলিকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ জার্মানির সৃষ্টি করেছিল এমন নয়, প্রকৃতপক্ষে জার্মানি হয়েছিল মহাদেশের রাণী (কার্লাইলের ভাষায় কুইন অফ দ্য কনটিনেন্ট)।

প্রাশিয়ার হাতে ফ্রান্সের পরাজয় ছিল অবশ্যম্ভাবী। আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে জার্মানির ঐক্যের ইতিবৃত্ত প্রসঙ্গে সেকথা আলোচনাও করেছি। বস্তুত 1866 খ্রিস্টাব্দের স্যাডোয়ার যুদ্ধে যখন অস্ট্রিয়ার পরাজয় ঘটল প্রাশিয়ার হাতে, তখনই তা বিসমার্কের কূটনীতির সাফল্য প্রমাণ করল। তেমনি বিসমার্কের কূটনৈতিক চালে ফরাসিরাজ তৃতীয় নেপোলিয়ান যখন অস্ট্রিয়ার পক্ষে গেলেন না, প্রকৃতপক্ষে তখনই ফ্রান্সের পরাজয় ঘটে। ফরাসি রাজনীতিবিদ তিয়ের (Thiers) মন্তব্য করেছিলেন—'It was France who was defeated at Sadowa'। প্রাশিয়ার সঙ্গে ফ্রান্সের যুদ্ধ ছিল শুধু সময়ের প্রতীক্ষা। ইতিহাসবিদের সেই মন্তব্য মনে পড়ে 'A war with France lay in the logic of history'। সেই যুদ্ধ অর্থাৎ ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধ যখন শেষ হলো এবং তারপরই ক্রমে যে শক্তিশালী জার্মানির আবির্ভাব হলো, তা ইয়োরোপীয় ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি বদলে দিল।[2]

---

1. উদ্ধৃতির জন্য দ্র. James Joll, *Europe since 1870* (Penguin, 4th edn, 1990), গ্রন্থের 'The New Balance of Power' শীর্ষক প্রথম অধ্যায় পৃ 1.

2. বিস্তারিত আলোচনার জন্য Michael Howard, *The Franco-Prussian War* (Lond, 1967), Gordon Craig, *Germany 1860-1945* (London, 1978) এবং A.J.P. Taylor *Bismarck: The Man and the Statesman* (London, 1961).

জার্মানির এই বৃহৎ শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশের মূল কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন অটো ফন বিসমার্ক। অধ্যাপক *জেমস্ জোল* তাই মন্তব্য করেছেন, "Germany's emergence as a great power was largely Bismarck's work, a fact that was recognised both in Germany and abroad. And Germany's place in the new European balance of power by her victory in 1870 was also determined by Bismarck।"[1] আসলে ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে 1870 খ্রিস্টাব্দের সেডানের যুদ্ধ এক যুগান্তকারী ঘটনা এবং জলবিভাজিকা। কারণ জার্মানির বৃহৎশক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ আন্তর্জাতিক ইতিহাসের উপর এবং ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলির শক্তিসাম্যের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল।

1871 খ্রিস্টাব্দ থেকে ইয়োরোপীয় মহাদেশে যে নতুন যুগ শুরু হলো তার প্রকাশ শুধু-রাজনৈতিক নয়, নানা ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায়। কূটনৈতিক ক্ষেত্রের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, পরবর্তী ক্ষেত্রে আবার যথাস্থানে আলোচিত হবে। তাছাড়া 1870 খ্রিস্টাব্দ থেকেই সামরিক বাহিনীর দৃষ্টিভঙ্গি, অস্ত্রের ব্যবহার, যুদ্ধের কৌশল সবকিছুই নতুন মোড় নেয়। তার চাইতেও বড়ো কথা ক্রমশই সামরিক বাহিনীর লোকজন এবং যুদ্ধাস্ত্রের নির্মাতাগণ রাজনীতিবিদ ও রাষ্ট্রনায়কদের উপর প্রভাব ফেলতে শুরু করে। ফলে ক্রমে ক্রমে জোটবদ্ধ হওয়া এবং ভবিষ্যৎ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতির মনোভাব বৃদ্ধি পায়। আবার অন্যদিকে নতুন যুগের বৈশিষ্ট্য হিসেবে ইয়োরোপীয় রাজনীতিতে ফ্রান্সের শক্তি ও মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়ে জার্মানির প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পিছনে এক প্রধান কারণ ছিল অর্থনৈতিক সামঞ্জস্য। 1861 থেকে 1871 এর মধ্যে শিল্পের অগ্রগতি জার্মানির ক্ষেত্রে চমকপ্রদ সাফল্য এনে দিয়েছিল; জার্মানির কয়লা উৎপাদন ছিল ফ্রান্স এবং বেলজিয়ামের মিলিত উৎপাদনের চেয়ে বেশি। 1850 থেকে 1874 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে জার্মানিতে লৌহ উৎপাদন পাঁচ গুণ বৃদ্ধি পায়। এজন্য আধুনিক ঐতিহাসিকরা বিসমার্কের 'Blood and Iron' নীতি অর্থাৎ সামরিক শক্তি ও কূটনীতির চালের পাশাপাশি জার্মানির 'Coal and Iron'-এর সঙ্গত কারণ উত্থাপন করেছেন। ক্রমশ ইয়োরোপীয় অন্যান্য দেশগুলির সঙ্গে জার্মানির বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাও বেড়ে যায়।

যেহেতু নতুন যুগের প্রভাব রাজনৈতিক, কূটনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়; তাই সেডানের যুদ্ধকে এক দিক পরিবর্তনের জল বিভাজিকা হিসেবে গণ্য করা যায়। সেই জন্য কেটেলবির মন্তব্য "The Franco-Prussian war made Bismarck the master of Germany and Germany the mistress of Europe"। জার্মানি তার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, সামরিক শক্তি, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বৃহদায়তন

---

1. জেমস্ জোল, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. 5

শিল্প এবং রেলপথের সাহায্যে ইয়োরোপে এক নতুন 'কলোসাস' হিসেবে আর্বির্ভূত হয়। 1871 খ্রিস্টাব্দের ভার্সাই এর রাজপ্রাসাদে প্রাশিয়ার রাজা চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়াম জার্মানির সম্রাটরূপে ঘোষিত হন। এর ফলে ঐক্যবদ্ধ জার্মানির শক্তি বাড়ে আবার অন্যদিকে সেডানের যুদ্ধে পরাজিত ফ্রান্স জার্মানির সঙ্গে ফ্রাঙ্কফোর্টের সন্ধিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়। এই চুক্তি ফ্রান্সের পক্ষে ছিল অপমানজনক। শর্তানুসারে ফ্রান্সকে পাঁচ লক্ষ বিলিয়ন ফ্রাঁ ক্ষতিপূরণ বাবদ দিতে হয় এবং ঠিক হয় যতদিন ফ্রান্স কর্তৃক এই অর্থ পরিশোধ করা না হবে, ততদিন পর্যন্ত জার্মান সৈন্য ফ্রান্সের উত্তরাঞ্চলে থাকবে। এর চাইতে অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার ছিল ফ্রান্সের উত্তরভাগের দুটি প্রদেশ আলসাস্ (Alsace) এবং লোরেন (Lorraine) জার্মানিকে ছেড়ে দিতে হয়। এই প্রদেশগুলি ছিল লৌহ তথা শিল্প সমৃদ্ধ। এদের সাহায্যে জার্মানির শক্তি আরও অনেক বেড়ে যায়। যেহেতু সেডানের যুদ্ধ জার্মানির পক্ষে সর্ব অর্থে সহায়ক হয়েছিল, সেজন্য জার্মানির পক্ষে স্বাভাবিক ছিল তা বজায় রাখা, ফ্রান্স যাতে পরাজয়ের শোধ তুলতে না পারে তা লক্ষ্য রাখা। এই প্রশ্ন মাথায় রেখেই আবর্তিত হলো পরবর্তী দশকগুলির ইয়োরোপীয় রাজনীতি। শক্তি সাম্যের পরিবর্তনের সূচনা তাই 1871 থেকে। এর পূর্বাবধি ইয়োরোপের বিভিন্ন শক্তিগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া দরকার।

২। 1871 খ্রিস্টাব্দের ইয়োরোপে বিভিন্ন দেশের অবস্থা

অধ্যাপক জেমস জোল লিখেছেন, "After 1870 Germany, France, Britain, Austria-Hungary and Russia were undoubtedly the great powers of Europe, with Italy staking a claim to be regarded as one of them"। সুতরাং জার্মানি, ফ্রান্স, ব্রিটেন, অস্ট্রিয়া, রাশিয়া এবং ইতালি— এই ছ'টি দেশের দিকে আমরা দৃষ্টি দেব। এই ছয় দেশের গোষ্ঠীরাজনীতিও 1871 থেকে নতুন খাতে প্রবাহিত হয় এবং উত্তরকালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগেই তিনটি করে দেশ দু'পক্ষে বিভক্ত হয়ে দুই পরস্পরবিরোধী শিবিরে অবস্থান নেয়।

জার্মানি : জার্মানি ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পর যে নতুন সংবিধান গৃহীত হয়, সেই অনুসারে জার্মানিকে একটি যুক্তরাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়। তবে বলা হলো জার্মান সাম্রাজ্যে প্রাশিয়ার রাজা চতুর্থ উইলিয়াম হবে সম্রাট, বা জার্মান ভাষায় কাইজার (Kaiser)। দেশের প্রধানমন্ত্রী বা চ্যান্সেলার হলেন অটো ফন বিসমার্ক। জার্মানি ইয়োরোপের প্রধান সামরিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল। পরবর্তী কুড়িবছর 1871 থেকে 1890 পর্যন্ত বিসমার্কই ছিলেন সর্বেসর্বা। তিনি জার্মানিকে পরিতৃপ্ত দেশ বলে ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পরে জার্মানির আভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন। তিনি ব্রিটেনের

মডেলে সাংবিধানিক রাজতন্ত্র পছন্দ করতেন না। তবে শেষ পর্যন্ত তিনি উদারপন্থীদের সঙ্গে একটি সমঝোতা করে নিয়েছিলেন। আসলে রক্ষণশীল হলেও জনসাধারণের আশা আকাঙ্ক্ষাকে তিনি মর্যাদা দিতে চেয়েছিলেন। 1871-এর পর জার্মানির ক্যাথলিক চার্চের সঙ্গে বিসমার্ককে যেমন মোকাবিলা করতে হয়েছিল তেমনি করতে হয়েছিল সমাজতন্ত্রের সঙ্গেও। তবে বিসমার্কের মূল উদ্দেশ্যই ছিল ইয়োরোপের আন্তর্জাতিক মানচিত্রে ফ্রান্সকে কূটনৈতিকভাবে এক ঘরে করে রাখা, যাতে ফ্রান্স সেডানের যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে না পারে। যতদিন বিসমার্ক ক্ষমতায় ছিলেন তিনি এই কাজে সফলও হয়েছিলেন। আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে যথাস্থানে সে-সব কথা আলোচনা করব। তবে এখন যে কথা বলা দরকার তা হলো, ইয়োরোপীয় শক্তিসাম্যে নতুন অধ্যায় সংযোজন করার পিছনে জার্মানির ভিত্তি শুধু সেডানের যুদ্ধ জয় নয়, আরও দুটি কারণ ছিল। প্রথম কারণ হলো জার্মানির শিল্প সমৃদ্ধি এবং অন্যটি হলো জনসংখ্যা বৃদ্ধি।

ফ্রান্স ঃ 1870 খ্রিস্টাব্দে ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয় তার আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে যেমন পরিবর্তনের পথ সুগম করে তেমনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও দেশের সম্মান এবং শক্তি অনেকাংশেই হ্রাস করে। ফ্রান্সে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের পতন হয়। প্রজাতন্ত্রের সমর্থকগণ তৃতীয় নেপোলিয়ানের পর্যুদস্ত হওয়ার সুযোগে ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে। এটি ছিল ফ্রান্সের তৃতীয় প্রজাতন্ত্র। নবনির্বাচিত সংসদে রাজতন্ত্রের সমর্থক থাকলেও ক্রমে প্রজাতন্ত্রের সমর্থনেই দেশের জনগণ এগিয়ে আসেন। এর পরেই হয় 'প্যারী কমিউন' এর বিদ্রোহ (1871)। প্যারিস বা প্যারী শহরের জনসাধারণ নানাকারণে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ফরাসি সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ক্রমে এই বিদ্রোহের ঢেউ ফ্রান্সের অন্যান্য শহরে ব্যাপ্তি লাভ করে যেমন-লিয়ঁ, মার্সেই, তুলোঁ প্রমুখ শহরে। বিদ্রোহের মধ্যে নানা কারণ ছিল, নানা অঞ্চলের মধ্যে ভিন্নতাও ছিল।[1] তবে কেন্দ্রীভূত সরকারের বিকেন্দ্রীকরণ সকলেরই কাম্য ছিল। প্যারী কমিউন অবশ্য শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। উনিশ শতকের সত্তরের দশকে ফ্রান্সে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে যে বৈশিষ্ট্য সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে তা হলো রাজতান্ত্রিক বনাম প্রজাতান্ত্রিক রাজনীতিবিদদের দ্বন্দ্ব। অধ্যাপক ডি. ডবলু ব্রোগাণ, আলফ্রেড কোবান, থিওডোর জেলডিন প্রমুখ অনেক ঐতিহাসিকের রচনায় তা স্পষ্ট। বিশেষভাবে এক্ষেত্রে স্মরণীয় হলো *তিয়ের* (Theirs) এর ভূমিকা। এখানে আরও একটি কথা বলা দরকার। ডেভিড টমসন দেখিয়েছেন যে, প্যারিস্ কমিউনের চরিত্রের মধ্যে অনেক ক্ষুদ্র চরিত্র ও মাত্রা ছিল—সেডানের পরাজয়ের বিরুদ্ধে

1. এ বিষয়ে সবচেয়ে সুন্দর আলোচনা পাওয়া যাবে অমলেন্দু সেনগুপ্ত-লিখিত 'পারী কমিউন' শীর্ষক বাংলা বইতে।

গণ প্রতিবাদ; রাজতান্ত্রিক সাংসদের বিরুদ্ধে প্রজাতান্ত্রিক প্রতিবাদ; ক্ষুধার্তদের সামাজিক প্রতিবাদ; শহরে শ্রমিক শ্রেণীর সমাজবাদী প্রতিবাদ। কিন্তু মূল দাবি ছিল বিকেন্দ্রীকরণ।[1] কমিউনকে দমন করে তিয়ের ইতিহাসে কাভুর, বিসমার্ক বা অ্যাব্রাহাম লিংকনের সঙ্গে নিজের স্থান করে নিয়েছেন বলে ডেভিড টমসনের মন্তব্য অবশ্য বিতর্কিত।[2] ফ্রান্স অবশ্য সেডানের যুদ্ধের পরাজয়ের গ্লানি পরে অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছিল, নিজের সামরিক বাহিনীকে পুনর্গঠিত করতে পেরেছিল এবং পরিশেষে আবার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিজেকে তুলে ধরতে পেরেছিলেন।

ইতালি ঃ ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধের ফলে যেমন ঐক্যবদ্ধ জার্মানির অভ্যুদয় ঘটে, তেমনি এর ফলে 1870 খ্রিস্টাব্দে ইতালির ঐক্যও সম্পন্ন হয়। ম্যাটসিনি, কাভুর এবং গ্যারিবল্ডির স্মরণীয় ভূমিকার ফলে যে নতুন ইতালি জন্ম নিল, তার সামনে আভ্যন্তরীণ সমস্যা ছিল অনেক। অন্যতম প্রধান ছিল রোমান ক্যাথলিক চার্চ এবং পোপের সঙ্গে সম্পর্ক সহজভাবে মীমাংসা করার কাজ। উন্নত উত্তর ইতালির সঙ্গে অনুন্নত দক্ষিণ ইতালির পার্থক্য ছাড়াও নানা সামাজিক অর্থনৈতিক প্রশ্ন ছিল। ধীরে ধীরে সমস্যাদি সমাধানসূত্রে ইতালি ইয়োরোপের অন্যতম বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হয়। আমরা পরে দেখব যে জার্মানি, অস্ট্রিয়া, ইতালি মিলিত ইয়োরোপে এক ত্রিশক্তি মৈত্রী গঠন করে।

অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি ঃ অধ্যাপক জোল লিখেছেন, "The rise of national states in Germany and Italy had a profound effect on the balance of power in all Europe, but no country was more affected than Austria."[3] অর্থাৎ একথা বলা যেতে পারে যে, জার্মানি এবং ইতালির ঐক্য এবং জাতীয় রাষ্ট্র হিসেবে উত্থান সমগ্র ইয়োরোপে শক্তি সাম্যের উপরে প্রভাব ফেলেছিল ঠিকই তবে সব চাইতে বেশি প্রতিক্রিয়া দেখি অস্ট্রিয়ার উপর। বস্তুত অস্ট্রিয়া এবং হাঙ্গেরী দুই প্রতিবেশী দেশ একই রাজবংশের অধীনে (যার নাম হ্যাপস্‌বার্গ) এনে যে দ্বি-রাজতন্ত্র 1867 খ্রিস্টাব্দে সম্রাট ফ্রান্‌জ যোসেফ গড়ে তোলেন তা ছিল যুগের পক্ষে অচল। মধ্য ইয়োরোপে একদা অস্ট্রিয়ার যে দাপট ছিল অন্তত মেটারনিষের যুগে তা 1848 খ্রিস্টাব্দেই বিরাট ধাক্কা খায়। তারপরও যা ছিল তা প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মান ঐক্য আন্দোলনে পর্যুদস্ত হতে থাকে, বিশেষত 1866 খ্রিঃ স্যাডোয়ার যুদ্ধের পরাজয়ে। ইতালির ঐক্য আন্দোলনের

1. "The Commune was many things: a protest of civic pride aganist the humiliation of defeat; an extreme republican protest against the predominantly monarchist assembly; a social rising prompted by the sufferings of seige and hunger; a socialistic revolt of the urban workers". David Thomson, পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ. 321.

2. তদেব।

3. জোল। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ 9

ফলেও লমবারদি ও ভেনেশিয়া থেকে অস্ট্রিয়াকে হটিয়ে দেওয়া হয়। ফলে শেষপর্যন্ত 1870 খ্রিঃ অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি বৃহৎ শক্তি হিসেবে থাকলেও তার শক্তি কমে আসে। অন্য দিকে দেশের অভ্যন্তরে প্রধান সমস্যা হয়ে দেখা দেয় জাতিগত প্রশ্ন। ক্রোয়েট, সার্ব, রুমানিয়ান, শ্লোভাক, ম্যাগেয়ার, জার্মান, চেক প্রমুখ নানা জাতির মধ্যে সামাজিক সংহতির কাজ ছিল কঠিন, আর বৈদেশিক ক্ষেত্রে অস্ট্রিয়ার মূল লক্ষ্য ছিল বলকান অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করা। এটি ছিল আবার রাশিয়ার স্বার্থের পরিপন্থী। ফরাসি ঐতিহাসিক আলবেয়ার সবুল এই সমস্যার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

গ্রেটব্রিটেন ঃ 1871 খ্রিস্টাব্দে ইয়োরোপের অন্যতম প্রধান শক্তি ছিল গ্রেটব্রিটেন। তবে এখানেও বলা দরকার, জার্মানির উত্থান ব্রিটেনের উপরও গভীর প্রভাব ফেলেছিল। অধ্যাপক জেমস জোল লিখেছেন, "The Franco-Prussian war and the emergence of the German Empire as the strongest military and potentially the strongest industrial power of the continent were bound in the long run to affect the positions of Great Britain."। কিভাবে জার্মানির উত্থান ব্রিটেনকে বিব্রত করেছিল তা বুঝতে গেলে তিনটি জিনিস মনে রাখা দরকার। প্রথমতঃ, ব্রিটেন উনিশ শতকে সাধারণত ইয়োরোপীয় মহাদেশের অভ্যন্তরের সমস্যায় মাথা ঘামাত না। নিজেদের 'চমৎকার স্বাতন্ত্র্যের' মধ্যে রেখে দিয়েছিল। এই নীতিকে বলে 'Splendid isolation'। কিন্তু উনিশ শতকের শেষদিকে জার্মানির উত্থানের পরে ইয়োরোপীয় জোটের রাজনীতি বদলে যেতে থাকে। বিসমার্ক যে জার্মানি-অস্ট্রিয়া-ইতালিকে নিয়ে ত্রিপাক্ষিক মৈত্রী বা 'ট্রিপল্ অ্যালায়েন্স' গঠন করেছিলেন তার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। এই তিন শক্তির বিরুদ্ধে পরে গঠিত হয় অপর এক ত্রিশক্তি মৈত্রী বা 'ট্রিপল আঁতাত'। এই আঁতাতের অন্তর্গত ছিল ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং রাশিয়া।

শুধুই কি রাজনৈতিক বা কূটনৈতিক কারণে ব্রিটেন তার স্বাতন্ত্র্যের নীতি পুনর্বিবেচনার পরে ত্যাগ করেছিল? নিশ্চয়ই নয়। এখানে দ্বিতীয় বিষয়টি হলো অর্থনৈতিক। জার্মানি ক্রমে শিল্পে উন্নত দেশ হয়ে ওঠা এবং ব্রিটেনের নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ জানানোর ব্যাপারটিও মনে রাখতে হবে। তৃতীয় বিষয়টি হলো সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসেবেও ব্রিটেনকে চ্যালেঞ্জের সামনে দাড় করিয়েছিল জার্মানি। সাম্রাজ্যের প্রসার ঘটাতে গিয়ে ব্রিটেন সারা বিশ্বে উপনিবেশ গড়ে তুলে, নৌশক্তিতে বলীয়ান হয়ে বাণিজ্যের ব্যাপ্তি ঘটিয়েছিল। বলা হত যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সূর্য অস্তমিত হয় না। জার্মানি এই ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার আসরে ইয়োরোপীয় দেশগুলির মধ্যে সবচেয়ে শেষে এসেও প্রবলভাবে নেমে পড়েছিল। সুতরাং বিষয়টি ব্রিটেনকে ভাবতে হয়েছিল। তাই সব দিক থেকেই 1871 খ্রিঃ নূতন যুগের সূত্রপাত।

রাশিয়া : 1871 খ্রিস্টাব্দে রাশিয়াও ইয়োরোপের অন্যতম বৃহৎ শক্তি ছিল, যদিও পশ্চিম ইয়োরোপের দেশগুলির তুলনায় নিশ্চিত ভাবেই পিছিয়ে ছিল। তাছাড়া আভ্যন্তরীণ সমস্যা তাকে বিব্রত করে রেখেছিল, যার মধ্যে একদিকে মুক্ত হয়েও প্রকৃত বিচারে মুক্ত না হওয়া সার্ফ বা ভূমিদাসদের সমস্যা এবং বিপ্লবী আন্দোলন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে পরাজয় রাশিয়ার দুর্বলতাকে সব দিক দিয়েই প্রকট করে দিয়েছিল। তারপর জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার ক্ষমতায় এসে কিছু কিছু সংস্কার গ্রহণ করে আভ্যন্তরীণ উন্নতির চেষ্টা করেছিলেন। এসব সংস্কারের মধ্যে সবচেয়ে স্মরণীয় ছিল 1861 খ্রিস্টাব্দের সার্ফদের মুক্তি আইন। তাছাড়া উল্লেখযোগ্য যে, দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার শিল্পায়নের পথেও রাশিয়াকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তবে পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে উল্লেখ করার মতো হলো এই ক্রিমিয়ার যুদ্ধে পরাজয়ের পর রাশিয়া পূর্ব ইয়োরোপে বা বলকান অঞ্চলে তার সম্প্রসারণ করতে ব্যর্থ হওয়াতে এশিয়ার দিকে নজর দেয়। কিন্তু অটোমান তুরস্কের দুর্বলতার সুযোগে 1871 -এর দশকে রাশিয়া পুনরায় বলকান অঞ্চলে আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে দৃষ্টি দেয় এবং এর ফলে জটিলতার সৃষ্টি হয়।

অটোমান সাম্রাজ্য : একদা এশিয়ার দেশ তুরস্ক ইয়োরোপের অনেকখানি অঞ্চল নিজেদের ক্ষমতায় আত্ম অধিকারে এনে গড়ে তুলেছিল অটোমান সাম্রাজ্য। উনিশ শতকে সেই অটোমান সাম্রাজ্য শক্তিহীন হয়ে পড়ে। তাকে বলা হত 'ইয়োরোপের দুর্বল ব্যক্তি' (Sickman of Europe)। এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই পূর্বাঞ্চল সমস্যা বেড়ে ওঠে। 1871 -এর পর এই সমস্যা অত্যন্ত গুরুতর আকার ধারণ করে। এই সমস্যার মূলে ছিল তিনটি কারণ বা সূত্র—(ক) তুরস্কের দুর্বলতার সুযোগে পূর্ব ইয়োরোপের দেশগুলির স্বাধীন হওয়ার আকাঙ্ক্ষা; (খ) ইয়োরোপের বলকান অঞ্চলের নানা জাতিগত সত্তার লড়াই এবং এই জাতিসত্তার ভিত্তিতে নিজস্ব দেশ ও সীমানা গড়ে তোলার স্পৃহা (গ) এই দ্বন্দ্বে পারস্পরিক বিরোধী স্বার্থ নিয়ে ইয়োরোপের বৃহৎ দেশগুলির অংশ গ্রহণ। শেষ পর্যন্ত এই সমস্যা সমাধান না হওয়াতে বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত।

৩। ইয়োরোপে নতুন শক্তিসাম্য

উনিশ শতকে শক্তিসাম্যের নানা পর্ব : শক্তিসাম্যের বিচারে ইয়োরোপের ইতিহাসকে চারটি পর্বে বিভক্ত করতে পারি আলোচনার সুবিধার্থে। এগুলি হলো যথাক্রমে— (ক) 1800-1815, (খ) 1815-1848, (গ) 1848-1870 এবং (ঘ) 1871-1900 খ্রিস্টাব্দ। প্রথম পর্ব ইয়োরোপীয় শক্তিসাম্য নেপোলিয়ানের অঙ্গুলী হেলনে উলোটপালট হয়ে যায়। দ্বিতীয় পর্বে মেটারনিখ, নেপোলিয়ানের পতনের পর নতুন ব্যবস্থার দ্বারা বেঁধে ফেলেন। ভিয়েনাতে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এই ব্যবস্থা অনুমোদন পায়। তৃতীয় পর্বে 1848 এর বিপ্লবী অভ্যুত্থানের বছরে ইয়োরোপীয় ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে

এবং ক্রমে উদারনীতি ও জাতীয়তাবাদের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। জাতীয় চেতনার উল্লেখ্য ফল দেখা যায় জার্মানি ও ইতালির ঐক্য আন্দোলনের সাফল্যের মধ্যে। চতুর্থ পর্বে জার্মানির উত্থান, নতুন শক্তিসাম্যের সৃষ্টি এবং শেষ পর্যন্ত ইয়োরোপ দুই পরস্পরবিরোধী রাজনৈতিক শিবিরে বিভক্ত হয়ে যায়।

শক্তিসাম্য কথাটির মধ্যে দুটি ব্যঞ্জনা ও অর্থ থাকে। একদিকে, আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রাখা এবং অন্যদিকে এক দেশ যেন অপর দেশ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হয়ে উঠতে না পারে, সেই দিকে লক্ষ্য রাখা। 1815 খ্রিস্টাব্দে ভিয়েনা সম্মেলন যেমন শান্তি বজায় রাখতে চেয়েছিল, তেমনি ইয়োরোপীয় শক্তি সমবায় সাম্য বজায় রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু চাইলে কি হবে, বৃহৎ দেশগুলির নিজ নিজ স্বার্থ কখনোই ত্যাগ করত না। আর সেই কারণেই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হত। সুতরাং জাতীয় স্বার্থের চেয়ে ঐক্যমতের ভিত্তিতে সঠিক সিদ্ধান্তের কথা বলা হলেও কার্যত সর্বদা তা পালন করা হত না। তবু মোটামুটিভাবে 1815-র পরবর্তী ব্যবস্থা 1848 পর্যন্ত বজায় ছিল, অন্তত বড়ো কোনও যুদ্ধ হয়নি। কিন্তু 1848 খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবের ঢেউ এবং তারপর জাতীয় চেতনার ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় ঐক্যের আন্দোলন ইয়োরোপের রাজনৈতিক মানচিত্র বদলে দেয়। তেমনি 1870 এর পরে ইয়োরোপীয় দেশগুলির শক্তিসাম্য সম্পূর্ণ বদলে যায়। ফ্রান্স নয়, জার্মানি হয়ে ওঠে প্রধান শক্তি।

শক্তিসাম্যের রূপবদল ঃ 1870 খ্রিস্টাব্দের পর ইয়োরোপের প্রধান শক্তিময় দেশ বলতে ছিল জার্মানি, ফ্রান্স, ব্রিটেন, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি, রাশিয়া এবং কিছু পরিমাণে ইতালি। আমরা আগেই দেখেছি অটোমান সাম্রাজ্য ছিল ক্ষয়িষ্ণু। স্পেন, পর্তুগাল, ডেনমার্ক, বেলজিয়াম, নেদারল্যাণ্ড কিংবা সুইডেন প্রমুখ দেশগুলি ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। শক্তি সাম্যের বদল ঘটতে থাকে যখন বৃহৎ দেশগুলি কূটনৈতিক এবং সামরিক মৈত্রীলাভের জন্য তাদের নীতি নির্ধারিত করেই জোটভুক্ত হয়। কিন্তু অবস্থার ক্রমে রূপবদল ঘটছিল। জেমস্ জোল লিখেছেন, "But during the period upto 1914 the situation was changing, not only in the changing relations of the great powers to each other in their attempts to tip the balance of power in their own favour and in their reactions to the rise of Germany, but also in the emergence of new forces in international politics".[1]

সেডানের যুদ্ধের পর জার্মানির মূল লক্ষ্য হয়ে দাড়ায় ফ্রান্সকে কূটনৈতিকভাবে একঘরে করে রাখা। শুধু জার্মানি নয়, প্রতি দেশের কাছেই নিজেদের জাতীয় স্বার্থ হয়ে উঠল প্রধান। ফলে দেশগুলির মধ্যে পরস্পর বৈরিতা বৃদ্ধি পেল। শুরু হলো

---

1. জেমস্ জোল, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ 22

মিত্র খোঁজার প্রচেষ্টা, শিল্পের ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা, ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তবে জার্মানির উত্থানের সঙ্গে সবই যেন জড়িত। ডেভিড টমসনের মন্তব্য 'The settlement of 1871 was, in origin and nature, a new arrangement of European frontiers and relationships dictated by events and imposed by German military power"।[1] এই পরস্পর দ্বন্দ্ব থেকেই ক্রমে জন্ম নেয় পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ, অস্ত্র সজ্জার প্রতিযোগিতা এবং এক ধরণের উগ্র জাতীয়তাবাদ। বস্তুত 1870 খ্রিস্টাব্দের পরে শক্তিসাম্যের প্রকৃতি বা চরিত্রেরই বদল ঘটে।[2] এই পরিবর্তন ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে বিশ্বযুদ্ধে (1914) গিয়ে শেষ হয়।

---

1. ডেভিড টমসন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ 323

2. টমসন লিখেছেন, "With uneasy relations prevailing between the six great powers of Europe, the whole nature of the balance of power underwent a transformation"। তদেব, পৃ. 322.

অধ্যায় ১৪

অ্যাফ্রো-এশিয় দেশগুলিতে উপনিবেশের সম্প্রসারণ

(Syllabus: *Scramble for Colonies in Asia and Africa***)**

১। সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতা

1916 খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর সুপরিচিত *Imperialism, the highest stage of Capitalism* পুস্তিকায় লেনিন সাম্রাজ্যবাদকে ব্যাখ্যা করেছিলেন ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর হিসেবে। লেনিন সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব এবং তার প্রসার প্রসঙ্গে আরও দেখিয়েছিলেন যে ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাও সাম্রাজ্যবাদেরই অংশ মাত্র। লেনিনের মতে, ইয়োরোপে শিল্পের অগ্রগতির সঙ্গে যখন মুষ্টিমেয় ব্যক্তিদের হাতে মূলধন সঞ্চিত হলো এবং সেই ব্যাপারে শিল্প সংগঠন ও ব্যাঙ্কগুলি যখন তাদের সহায়ক হলো, তখন সর্ববিধ শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রয়াসে নুতন করে বিনিয়োগ করা শেষ দিকে লাভজনক না হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিল। কারণ পণ্য বিক্রির ইয়োরোপীয় বাজার তখন দখল হয়ে গেছে, অন্তর্বাণিজ্য তেমন ফলদায়ক নয়। সেই সময় প্রয়োজন হলো আবশ্যিকভাবে বিদেশে বিনিয়োগ করার। শুধু বিনিয়োগ নয়, উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করে মুনাফা নিয়ে আসা কিংবা পণ্য উৎপন্নের আগে কাঁচামাল সংগ্রহ করার জন্য বিদেশে ঘাঁটি গাড়া, বাজার সম্প্রসারণ করা এবং প্রয়োজনে প্রত্যক্ষভাবে সেই দেশ দখল করা। এর থেকেই সাম্রাজ্যবাদ চূড়ান্ত আকার ধারণ করে। তারই ফলে উপনিবেশ দখল করা নিয়ে কাড়াকাড়ির (scramble for colonies) দ্বন্দ্ব তীব্রতর করে তোলে। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ঔপনিবেশিকতার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ।

এখানে অবশ্য আগে দুটি সাধারণ কথা মনে রাখা দরকার। প্রথম কথা হলো, ইয়োরোপীয় বিস্তারনীতি শুরু হয়েছে ধনতন্ত্রের উত্থানের অনেক আগে থেকেই। সুতরাং ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের ফলেই উপনিবেশের সৃষ্টি হয়েছে তা বলা যায় না। তবে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই, পূর্বেকার ঔপনিবেশিক উদ্যম ভিন্নতর এবং প্রবলতর মাত্রা পেয়ে যায় উনিশ শতকে ধনতন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদের পূর্ণতার সঙ্গে সঙ্গে। সেই কারণে এশিয়া এবং আফ্রিকা মহাদেশে উপনিবেশ দখলের জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। দ্বিতীয়তঃ, উনিশ শতকে অ্যাফ্রো-এশিয় দেশগুলিতে সাম্রাজ্য বিস্তারের পিছনে শুধুই অর্থনৈতিক নয়, নানাবিধ কারণ ছিল। যেমন—অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, সামরিক ইত্যাদি। অধ্যাপক জেমস্ জোল লিখেছেন যে, "This movement of imperialist expansion has been

explained in a number of different ways ; and perhaps no single explanation is sufficient to account for developments which differed widely in different parts of the world"[1] অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণ ঘটার ফলে উপনিবেশ দখল করা নিয়ে যে কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছিল তার পিছনে বহুবিধ কারণ ছিল, কোনও একটি বিশেষ কারণ দিয়ে একে ব্যাখ্যা করা যায় না। আবার স্থান বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য ছিল; সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিরও উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন ভিন্ন।

সূত্র দুটিকে আরও একটু সম্প্রসারিত করা যেতে পারে। ইয়োরোপে রেনেশাঁস এবং রিফর্মেশন আন্দোলনের সময় থেকেই অর্থাৎ পঞ্চদশ-ষোড়শ শতক থেকেই ইয়োরোপীয় দেশগুলি ভৌগোলিক আবিষ্কারের আগ্রহে সমুদ্রাভিযান শুরু করে। নবজাগরণের পরবর্তী সময়ে ইয়োরোপবাসীর জীবনযাত্রার যে পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল তা-ও তাদের নতুন নতুন দেশ আবিষ্কারে উৎসাহিত করেছিল। এ ব্যাপারে বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা নেয় স্পেন ও পর্তুগাল। তারপর অন্যান্য দেশ। নতুন নতুন দেশ আবিষ্কার এবং জলপথ সুগম হওয়ার ফলে যে ব্যাপারটি বিশেষ অর্থবহ হয়ে ওঠে তা হলো বাণিজ্যের প্রসার এবং ইয়োরোপীয় দেশগুলির সামুদ্রিক ক্রিয়াবিলাস বৃদ্ধি। ক্রমে স্পেন, পর্তুগাল, হল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ডেনমার্ক প্রমুখ দেশ এ ব্যাপারে অগ্রণী হয় এবং শেষ পর্যন্ত সমুদ্রশক্তিতে শ্রেষ্ঠ দেশ হিসেবে ইংল্যাণ্ড বহু দেশের সঙ্গে শুধু বাণিজ্য সম্পর্ক নয়, উপনিবেশ স্থাপনের ব্যাপারেও এগিয়ে যায়। এইভাবে বাণিজ্যের প্রসারের ও সাম্রাজ্যবাদী ইচ্ছা থেকেই উপনিবেশ স্থাপনের সূত্রপাত। কিন্তু আঠারো শতকের শেষদিকে এবং উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবিস্তারের ইচ্ছা কতক পরিমাণে কমে যায়। কেননা উত্তর আমেরিকায় ব্রিটেনের উপনিবেশগুলি ব্রিটেনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম করে শেষপর্যন্ত স্বাধীন হয়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের (United States of America) জন্ম দেয়। পর্তুগাল এবং স্পেনের যে-সব উপনিবেশ দক্ষিণ বা ল্যাটিন আমেরিকায় ছিল, সেগুলির মধ্যেও ক্রমে বলিভিয়া, আর্জেন্টিনা, ভেনেজুয়েলা, চিলি, নিউগ্রানাডা, মেক্সিকো, প্যারাগুয়ে, উরুগুয়ে, কোলম্বিয়া, ইকুয়েডর, ব্রাজিল ইত্যাদি দেশ ঔপনিবেশিকতা থেকে মুক্ত হয়। ফ্রান্স, ব্রিটেন, স্পেন, পর্তুগাল সকলেই ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য হারায়। ডেভিড টমসন লিখেছেন 1870-এর দশক পর্যন্ত ইয়োরোপে জনমত ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধেই ছিল।

এই পরিস্থিতিতে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নানা কারণে নতুনভাবে উপনিবেশ গড়ার উদ্যোগই শুধু নয়, ইয়োরোপীয় দেশগুলির মধ্যে এক প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করা যায়। একে নতুন ঔপনিবেশিকতা বলা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে ডেভিড টমসন লিখেছেন যে, "The naked power politics of the new colonialism were the projection, on to an

1. দ্র. জেমস্ জোল, *Europe since 1870- An International History*, Penguin Books, London, 1990 , p 79.

overseas screen, of the inter-state frictions and rivalries of Europe' । অর্থাৎ নয়া ঔপনিবেশিক উদ্যোগের মধ্যে ইয়োরোপের রাষ্ট্রগুলির মধ্যেকার দ্বন্দ্ব এবং বিরোধের প্রতিফলন ঘটেছিল।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, এই নতুন উপনিবেশ গড়ার উদ্যোগের পিছনে নানা কারণ ছিল। এই কারণগুলির প্রধান অবশ্যই অর্থনৈতিক। এই অর্থনৈতিক প্রণোদনার মধ্যে ছিল একদিকে মূলধন বিনিয়োগের ইচ্ছা এবং শিল্প পণ্যের জন্য নতুন বাজারের সন্ধান । কিন্তু অর্থনৈতিক কারণের চেয়ে রাজনৈতিক কারণ কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না।[1] এছাড়া প্রত্যেক দেশই নিজেদের জাতীয় স্বার্থ ও নিরাপত্তার কারণে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নৌঘাঁটি নিজের দখলে রাখতে চেয়েছিল। যেমন সাইপ্রাস এবং কেপ অফ দ্য গুড হোপ ব্রিটেন নিজের দখলে রাখতে চেয়েছিল। কোনও কোনও দেশ জনবল বৃদ্ধি করতে চেয়েছিল, যেমন ফ্রান্স আফ্রিকার উপনিবেশ থেকে জনবল বৃদ্ধি করতে চেয়েছিল। কারও ক্ষেত্রে উপনিবেশ বাড়িয়ে জাতীয় সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি প্রবণতা ছিল, যেমন ইতালির লিবিয়া দখলের প্রবণতা। তাছাড়া আরও কতকগুলি কারণ ছিল, যেমন অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় পর্যটকদের ক্রিয়াকলাপ। খ্রিস্টান ধর্মযাজকদের ভূমিকাও উপনিবেশিকতার ক্ষেত্রে কম নয়। কিছু ব্যক্তি কোন কোন দেশের ক্ষেত্রে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠায় সক্রিয়-ভূমিকা পালন করেছিলেন। ব্যবসা-বাণিজ্যিক শক্তি, নৌশক্তি, সামরিক শক্তি, শিল্পের শক্তি-সবদিক দিয়ে বলীয়ান ইয়োরোপীয় দেশগুলির ঔপনিবেশিকতার আগ্রাসন রুখে দেওয়া এশিয়ার কিংবা আফ্রিকার দেশগুলির পক্ষে কঠিন ছিল।

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, উনিশ শতকের কাছাকাছি পর্যন্ত ইয়োরোপের অনেক দেশের জনমতই উগ্র ঔপনিবেশিকতার পক্ষে ছিল না অথচ ঐ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেই অবস্থা বদলে গেল কেন? এর এক কথায় উত্তর, নয়া সাম্রাজ্যবাদ (New Imperialism)। এই নয়া সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র না বুঝলে উনিশ শতকের শেষ দিকে উপনিবেশ স্থাপনের উদগ্র বাসনা এবং তা নিয়ে তীব্র দ্বন্দ্ব বোঝা যাবে না। ডেভিড টমসন লিখেছেন যে, "The chorus of anti-colonialism before 1870 was so strange a prelude to an era of especially hectic colonial scramble that some extraordinary explanation seems to be called for" (অর্থাৎ 1870 খ্রিস্টাব্দের আগেকার উপনিবেশ-বিরোধী মনোভাবের সঙ্গে পরবর্তী উপনিবেশ দখলের কাড়াকাড়ি একেবারেই খাপ খায় না এবং অদ্ভুত মনে হতে পারে। একমাত্র অসাধারণ কিছু কারণ দিয়ে এই পরিবর্তন ব্যাখ্যা করা যেতে পারে)।

প্রাচীন বা মধ্যযুগের এমনকি আধুনিক যুগের প্রাথমিক পর্বের সাম্রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে নয়া সাম্রাজ্যের চরিত্রগত পার্থক্য ছিল আকাশ-পাতাল। আগেকার যুদ্ধে ভূমি অধিকার

1. টমসন লিখেছেন, "It was in these economic and political circumstances that the urge to exploit backward territories by the investment of surplus capital could make so much headway" (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ 495)

ছিল মুখ্য; 1870 -এর পর তার বদলে শিল্পোন্নত দেশগুলি কাঁচামাল সমৃদ্ধ এবং সম্ভাব্য বাজার সমৃদ্ধ দেশগুলিতে উপনিবেশ স্থাপন করে মুনাফা অর্জনের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ফলে এই ইয়োরোপীয় দেশগুলির মধ্যেও রেষারেষি তীব্র হয়। অর্থনীতিবিদ হবসন সাম্রাজ্যবাদের বিস্ফোরণের ব্যাখ্যা করেন তার Imperialism-A study গ্রন্থে (1902)। মূলধনের পাহাড় (Glut of Capital) থেকেই নয়া সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের সৃষ্টি। অবশ্য শুধুই অর্থনৈতিক কারণে উপনিবেশবাদের ব্যাখ্যা অতি সরলীকরণ। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, লেনিন 1916 খ্রিস্টাব্দে Imperialism, the Highest Stage of Capitalism গ্রন্থে কীভাবে পুঁজিবাদের বৃদ্ধির ফলে শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদ এবং উপনিবেশবাদ বাড়ে তা দেখিয়েছেন। অর্থনৈতিক তত্ত্ব নব সাম্রাজ্যবাদের একমাত্র কারণ না হলেও অন্যতম প্রধান কারণ ছিল। সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আমরা আগেই দেখিয়েছি অর্থনৈতিক কারণের সঙ্গে রাজনৈতক কারণ, মিশনারীদের ধর্মপ্রচারে আগ্রহ, অভিযাত্রীদের অভিযান সহ উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই ফ্রান্স উত্তর আফ্রিকার আলজেরিয়ায় এবং ব্রিটেন অহিফেন যুদ্ধে (Opium War) চীনকে পরাজিত করে আফ্রিকা ও এশিয়াতে উপনিবেশ স্থাপন এবং বাণিজ্যিক ঘাঁটি দখলের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

1870 খ্রিস্টাব্দে কার্যতঃ ইয়োরোপীয় মানচিত্রের ছবি বদলে যায়। ক্রমে জার্মানি হয়ে ওঠে ইয়োরোপের সবচেয়ে শক্তিশালী। আর পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্য বিস্তারে সর্বাপেক্ষা অগ্রণী ছিল ব্রিটেন। শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে না। একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে 1871 খ্রিস্টাব্দ থেকে ইয়োরোপের শক্তিসাম্য বদলে যেতে থাকে। ইয়োরোপে জোট রাজনীতির নতুন ইতিহাস রচিত হতে থাকে। 1870 খ্রিস্টাব্দ থেকে 1914 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে উগ্র জাতীয়তাবাদ ভীষণভাবে বেড়ে যায়, আর বেড়ে যায় সামরিক মনোভাব (Militarism)। প্রত্যেক দেশ নিজেদের স্বার্থে অপর দেশকে ঈর্ষা ও সন্দেহ করতে শুরু করে। এতে ইন্ধন যোগায় এক ধরনের সংকীর্ণ ও বিকৃত সাংবাদিকতা যাকে ইংরেজিতে বলে 'ইয়েলো জার্নালিজম্'। এর প্রত্যেকটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ছিল বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

২। এশিয়া মহাদেশে উপনিবেশের সম্প্রসারণ

ব্রিটেন ঃ শুধু এশিয়া মহাদেশের মূল ভূখণ্ড নয়, সমগ্র পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্যবিস্তারে অগ্রণী ছিল ইংল্যাণ্ড বা সঠিকভাবে বললে ব্রিটেন। ক্রমে তার দেখাদেখি ফ্রান্স, হল্যাণ্ড প্রমুখ দেশ এগিয়ে আসে। স্পেন, পর্তুগাল, ব্রিটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, রাশিয়া, জার্মানি, ইতালি, এমনকি পশ্চিম গোলার্ধের আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র পর্যন্ত উপনিবেশ তথা বাণিজ্য ঘাঁটি দখলে তৎপর হয়। আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি যে, ব্রিটেন আমেরিকা মহাদেশের মূল ভূখণ্ডে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল সপ্তদশ শতকে কিন্তু অষ্টাদশ শতকে আমেরিকার

তেরোটি উপনিবেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করে (1776 খ্রিস্টাব্দের 4th জুলাই) এবং একদা মাতৃভূমি ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধেই স্বাধীনতা যুদ্ধে জয়লাভ করে স্বাধীন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করে (1783)। তার প্রথম রাষ্ট্রপতি হন জর্জ ওয়াশিংটন।

ব্রিটেন অবশ্য শুধু আমেরিকা নয়, ক্যানাডা, নিউ ব্রান্সউইক, নোভাস্কোশিয়া, নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড, প্রিন্স এডওয়ার্ড আইল্যাণ্ড, হাডসন উপসাগর, জামাইকা, ত্রিনিদাদ-টোবাগো সহ কিছু ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বীপে প্রভুত্ব বিস্তার করেছিল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র হাতছাড়া হলেও, এগুলি হাতছাড়া হয়নি। তেমনি অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ডেও (এগুলিকে অন্য মহাদেশ বলা হয়)[1] ব্রিটেন উপনিবেশ স্থাপন করে। এশিয়া মহাদেশ সম্পর্কে বলার আগে এই বিষয়ে দু-একটি কথা বলা দরকার। কানাডায় ব্রিটেন এবং ফ্রান্স উভয়ের দৃষ্টি ছিল। কানাডার বিভিন্ন এলাকার মধ্যে কুইবেক সবচেয়ে বড়ো এবং তার অধিকাংশ অধিবাসী ছিলেন ফরাসি ঔপনিবেশিক। তারা ব্রিটেন বিদ্বেষী হওয়া সত্ত্বেও 1762 খ্রিস্টাব্দে কুইবেক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। 1774 খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লর্ড নর্থ কুইবেক অ্যাক্ট পাস করে ঐ অঞ্চলের জনসাধারণকে ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দিলেন। কিন্তু আমেরিকায় স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে তার প্রভাব ক্যানাডায় ছড়িয়ে পড়ে। তাছাড়া ইংরেজ ও ফরাসিদের মধ্যে বিরোধ লেগেই থাকত। এই সুযোগ নিয়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র যদি ক্যানাডায় আধিপত্য বিস্তার করে— এই আশঙ্কায় ব্রিটিশ সরকার 1791 খ্রিস্টাব্দে ক্যানাডা অ্যাক্ট পাস করে ক্যানাডাকে দু-ভাগে বিভক্ত করে (Lower Canada এবং Upper Canada)। প্রথমোক্ত অংশ ফরাসিদের এবং শেষোক্ত অংশে ইংরেজদের প্রাধান্য ছিল। এই দুই অংশেই সংসদীয় শাসনপদ্ধতি চালু হয় কিন্তু ক্যানাডাবাসীদের তা মনঃপূত হয়নি। শেষপর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার লর্ড ডারহ্যামের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে 1840 খ্রিস্টাব্দে ক্যানাডার উভয় অংশকে একত্রিত করে একটি অখণ্ড রাষ্ট্র গঠন করে এক দায়িত্বশীল সরকারের হাতে শাসনভার অর্পণ করে। পরিশেষে 1867 খ্রিস্টাব্দে এক বিশেষ আইন দ্বারা এই ক্যানাডার সঙ্গে নোভাস্কোশিয়া এবং নিউ ব্রান্সউইক যুক্ত করে 'ডোমিনয়ান অফ ক্যানাডা' গঠন করে তাদের হাতে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয়। রাজধানী হয় অটোয়া।

সপ্তদশ শতকে ডাচ আবিষ্কারকগণ সর্বপ্রথম অস্ট্রেলিয়ার কথা জানতে পারলেও সেখানকার আভ্যন্তরীণ অবস্থার খোঁজ পাননি, উপনিবেশও গড়তে পারেন নি। আঠারো শতকের শেষ দিকে ইংরেজ নাবিক এবং আবিষ্কারক ক্যাপটেন কুক একাধিকবার সমুদ্রযাত্রা করেছিলেন দক্ষিণ মেরুর দিকে। এই যাত্রা পথে তিনিই অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড আবিষ্কার করেন। তিনি অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূল বোটানি হ্রদে সর্বপ্রথম ব্রিটিশ পতাকা উত্তোলন

১। এশিয়া, ইয়োরোপ, আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়া এই ছ'টি মহাদেশে লোক বাস করে। উত্তর মেরু (আর্কটিকা) এবং দক্ষিণ মেরু (অ্যান্টার্কটিকা) মহাদেশ হলেও জনবসতি বিহীন।

করেন। 1776 খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণার পর সেখানে ব্রিটেনের নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদের প্রেরণ করা নিষিদ্ধ হলে ব্রিটেন তাদের দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অস্ট্রেলিয়াতে নির্বাসন দেওয়া শুরু করে। 1787 খ্রিঃ নটি জাহাজে প্রথম ইংরেজ অপরাধীদের অস্ট্রেলিয়ায় পাঠানো হয়। অস্ট্রেলিয়ায় আদিবাসীরা থাকলেও সেখানে সর্বত্র বাসস্থানের উপযুক্ত ছিল না, কিন্তু গভর্নর ম্যাক্য়ার -এর উদ্যোগে রাস্তাঘাট, চার্চ, সেতু নির্মাণ এবং কৃষি ও মেষপালনের প্রভূত উন্নত হওয়াতে ক্রমে অস্ট্রেলিয়া ইংরেজ উপনিবেশ রূপে গড়ে ওঠে। অনেকে স্বেচ্ছায় অস্ট্রেলিয়ায় গিয়েছিল বিশেষত 1851-52 খ্রিঃ সেখানে সোনার খনি আবিষ্কারের পর। তাদের প্রতিবাদেই অস্ট্রেলিয়াতে দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ব্রিটেন থেকে পাঠানো বন্ধ হয়। ক্রমে নিউ সাউথ ওয়েলস্, কুইন্সল্যাণ্ড, ভিকটোরিয়া, সাউথ অস্ট্রেলিয়া ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া এবং টাসমানিয়া অঞ্চলে উপনিবেশ গড়ে ওঠে। এখানে তাদের স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয়।

অস্ট্রেলিয়ার বারোশো মাইল পূর্বে নিউজিল্যাণ্ডে ইংরেজরা উপনিবেশ স্থাপন করে 1815 খ্রিস্টাব্দের পর। 1839 খ্রিস্টাব্দে উপনিবেশটি সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ অধিকারে আসে। এখানে উপনিবেশ স্থাপনে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন ওয়েকফিল্ড। 1907 খ্রিস্টাব্দে নিউজিল্যাণ্ড ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস লাভ করে। যাইহোক, প্রসঙ্গক্রমে আমরা আমেরিকা, ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ডের কথা বলে নিলেও উপনিবেশ বিস্তার প্রসঙ্গে এবার এশিয়া মহাদেশের দিকে দৃষ্টি দিতে পারি।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের মুকুটে শ্রেষ্ঠ মণি ছিল ভারতবর্ষ। এখানে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি। তার বহু আগেই ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করলেও আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে তাদের আত্মপ্রকাশ ঘটে। এখানে দুটি কথা উল্লেখ করা দরকার। এক, ভারতবর্ষে বিভিন্ন ইয়োরোপীয় দেশের বণিকদের আগমন ঘটলেও শেষ পর্যন্ত ইংরেজ এবং ফরাসিদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর ইংরেজরাই উপনিবেশ প্রতিষ্ঠায় সফল হয়। দুই, বণিকদের হাতে ভারতের শাসনভার সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নয় বিবেচনা করে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট মাঝে মাঝে আইন দ্বারা তাকে বৈধতা দিয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ রেগুলেটিং আইন (1773), পিটের ভারত আইন (1784), বিভিন্ন সনদ ও চার্টার আইনের (1793, 1813,1833,1853) কথা বলা যায়। পলাশির যুদ্ধ (1757) থেকে একশো বছরের মধ্যেই ভারতে ব্রিটিশরা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হয়। মারাঠা, মহীশূর, পাঞ্জাব, অযোধ্যা সহ সব রাজ্যই তাদের অধিকারে আসে—বাংলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ তো আগেই ছিল। 1857 তে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সর্ববৃহৎ বিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ার পর কোম্পানীর শাসনের অবসান হলেও ব্রিটিশ সরকার সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে শাসনভার হাতে নিয়ে উপনিবেশ আরও শক্তিশালী করে তোলে।

যেহেতু ভারতীয় সাম্রাজ্য (রাজধানী ছিল কলকাতা 1911 খ্রিঃ পর্যন্ত, পরে দিল্লি) ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যমণি তাই ভারতের কাছাকাছি অন্যান্য অঞ্চলের উপর যাতে অন্য কোনও ইয়োরোপীয় শক্তি ক্ষমতা বিস্তার করতে না পারে তা ব্রিটেনের লক্ষ্য ছিল। বিশেষত ব্রিটেন উত্তর দিকে রাশিয়ার আগ্রাসনের আশঙ্কায় ভীত ছিল। পূর্বে ব্রহ্মদেশ এবং পশ্চিমে আফগানিস্তান এবং বালুচিস্তানের উপর তারা ক্ষমতা দখল করে। উত্তরে তিব্বতের সঙ্গে সমঝোতা করে। দক্ষিণে ভারত মহাসাগরে সিংহল দ্বীপও ছিল ব্রিটিশ উপনিবেশ।

এছাড়াও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার সিঙ্গাপুর ছিল গুরুত্বপূর্ণ ব্রিটিশ উপনিবেশ। তেমনি গুরুত্বপূর্ণ ছিল হংকং, মালাক্কা প্রভৃতি। 1874 খ্রিঃ তারা ফিজি দ্বীপপুঞ্জে উপনিবেশ স্থাপন করে। তবে ব্রিটেনের উল্লেখযোগ্য কার্যকলাপ ছিল চীনদেশে। চীনের মূল ভূখণ্ডের উপর ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য ইয়োরোপীয় দেশগুলির মধ্যে ব্রিটেনই প্রথম উদ্যোগী হয়। উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত চীন ইয়োরোপের কাছে রুদ্ধ ছিল। 1839-40 খ্রিঃ প্রথম অহিফেন যুদ্ধে (First Opium War) চীনকে পরাজিত করে ব্রিটেন চীনের উপর নানকিং -এর সন্ধি (1842) চাপিয়ে দেয়, যা ছিল চীনের বা মাঞ্চু সরকারের উপর বৈষম্যমূলক। এই সন্ধির ফলেই ব্রিটেন হংকং পায়। দক্ষিণ চীনের ক্যান্টন সহ পাঁচটি বন্দর ব্রিটেনকে বাণিজ্যের জন্য খুলে দিতে হয়। এই বন্দরগুলিতে ব্রিটেন অতিরাষ্ট্রিক অধিকার (Right of Extra-territoriality) লাভ করে। সমস্ত আমদানি-রপ্তানি দ্রব্যের উপর মাঞ্চুসরকার 5% শুল্ক পাবে বলা হলো। ব্রিটেনের মতই ফ্রান্স প্রভৃতি অন্যান্য ইয়োরোপীয় দেশগুলি নানকিং সন্ধির মতন শর্ত চীনের উপর চাপিয়ে দেয়। চৈনিক সরকার নানকিং সন্ধির শর্ত মানতে না চাইলে দ্বিতীয় অহিফেন যুদ্ধ শুরু হয়। ক্যাথলিক মিশনারীদের হত্যা করা হয়েছে এই অজুহাতে ফ্রান্সও ব্রিটেনের পক্ষ নেয়। বস্তুত ব্রিটেনের মূল লক্ষ্য ছিল চীনকে উন্মুক্ত করে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার লাভ করা। চীন দ্বিতীয় অহিফেন যুদ্ধে হেরে গিয়ে টিয়েন্টসিন এবং পিকিংএর সন্ধি মেনে নিতে বাধ্য হয় এবং দক্ষিণ চীনের আরও বহু বন্দর খুলে দিতে বাধ্য হয়।

এর পর ব্রিটিশরা প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নিউগিনি, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ, টোঙ্গা, গিলবার্ট দ্বীপপুঞ্জ, মালয় দ্বীপপুঞ্জ ইত্যাদিতে ক্ষমতা বিস্তার করে।

ফ্রান্স ঃ আঠারো শতকের মধ্যভাগে শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধের পরাজয়ের ফলে ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ভারতে তাদের আশা ধূলিসাৎ হয়। শুধু চন্দননগর, পণ্ডিচেরি, কারিকল এবং মাহে এই চারটি স্থানে তাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ছিল। সেন্ট লরেন্স ও মিসিসিপি ফ্রান্সের হস্তচ্যুত হয়। নেপোলিয়ানের পরাজয়ের ফলে ফ্রান্সের অবস্থা আরও খারাপ হয়। এশিয়াতে ফ্রান্সের উল্লেখযোগ্য উপনিবেশ ছিল আনাম ও ইন্দোচীন (বর্তমানে যার নাম ভিয়েতনাম)। তাছাড়া 1872 এরপর কম্বোজ

(কাম্পুচিয়া), টনকিন প্রভৃতি অঞ্চলের উপর ফ্রান্সের আধিপত্য বিস্তৃত হয়। এছাড়া প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত নিউ ক্যাসিডোনিয়া ও নিকটবর্তী কয়েকটি দ্বীপ ফ্রান্সের অধিকারে আসে। এই মহাসাগরে ফ্রান্সের অপর উপনিবেশ ছিল তহিতি দ্বীপের। তৃতীয় নেপোলিয়ানের আমল থেকে ফরাসি উপনিবেশবাদ বৃদ্ধি পায়।

হল্যাণ্ড বা নেদারল্যাণ্ডস্ ঃ হল্যাণ্ডের অধিবাসী ডাচগণ বিশেষ ক্ষমতা বিস্তার করতে পেরেছিল ইন্দোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জে। ডাচ বা ওলন্দাজার জাভা বা ব্যাটাভিয়া দখল করে সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করে। তাদের শাসনে জাভার জনসংখ্যা বাড়তে থাকে। ডাচরা প্রচুর মূলধন বিনিয়োগ করে জাভার জাতীয় জীবনে অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটান। এছাড়া বোর্নিও, সুমাত্রা, সেলিবিস দ্বীপপুঞ্জ এবং নিউগিনির একাংশে ডাচ উপনিবেশ গড়ে ওঠে।

রাশিয়া ঃ ক্রিমিয়ার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে প্যারিসের সন্ধির ফলে রাশিয়া সাময়িকভাবে ইয়োরোপে বা বলকান অঞ্চলে বিস্তারনীতি বন্ধ করতে বাধ্য হলে এশিয়া মহাদেশের দিকে দৃষ্টি দেয়। ইয়োরোপ মহাদেশের মতো এশিয়া ভূখণ্ডে রাশিয়ার লক্ষ্য সমুদ্রের দিকে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করার দিকে ছিল। উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে রাশিয়া দক্ষিণে পারস্য ও আফগানিস্তান এবং পূর্বদিকে চীনের দিকে সম্প্রসারণে উদ্যোগী হয়। দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হয়ে রাশিয়া ক্যাস্পিয়ান সাগরীয় অঞ্চল দখল করে পারস্য, আফগান এবং ভারত সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছায়। মধ্যএশিয়ার অনেক এলাকা তার অধিকারে যায়। রাশিয়ার অগ্রগতির ফলে ব্রিটেনের ভারতীয় সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা বিপন্ন বলে ব্রিটিশ সরকার মনে করে। ফলে ইঙ্গ-রুশ সম্পর্ককে কেন্দ্র করে ভারতের পররাষ্ট্রনীতিতে জটিলতা দেখা দেয়। ভারত সরকার আফগানিস্তানের উপর নিজেদের প্রভাব বৃদ্ধিতে প্রয়াসী হয়। অপরপক্ষে রাশিয়ার প্রতি আফগানিস্তানের মৈত্রীভাবও ব্রিটেনের উদ্বেগের কারণ হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত দুটি ইঙ্গ আফগান যুদ্ধের দ্বারা আফগানিস্তানের সিংহাসনে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন এক আমীরকে স্থাপন করা হলে আফগানিস্তানের রুশ অগ্রগতি রুদ্ধ হয়। অবশ্য এই অঞ্চলে অগ্রগতি বন্ধ হলে রাশিয়ার দৃষ্টি অন্যদিকে দেখা দেয়। 1881 থেকে 1884 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রাশিয়া তুর্কিস্থান, মার্ভ, পাঞ্জদেহ দখল করে আফগান সীমান্তে এসে পৌঁছায় এবং ফলে আবার রুশ-ব্রিটেন সংঘর্ষের সম্ভাবনা দেখা যায়। শেষ পর্যন্ত 1907 খ্রিস্টাব্দে ইঙ্গরুশ মৈত্রী (Anglo-Russian Convention) দ্বারা দুই দেশের বন্ধুত্ব স্থাপিত হলে ভারতের ব্রিটিশ সরকার নিরুদ্বিগ্ন বোধ করে।

পূর্বদিকে সাইবেরিয়া ছাড়িয়ে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে রাশিয়ার সম্প্রসারণ হয়েছিল বিনা বাধায়। এখানে বলা যেতে পারে, নৌশক্তির সাহায্য ছাড়াই রাশিয়া এশিয়াতে সাম্রাজ্যবিস্তার করতে পেরেছিল। উনিশ শতকের মধ্যভাগে চীন দেশে তাইপিং বিদ্রোহ, ব্রিটেনের ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধ ইত্যাদি ডামাডোলের সুযোগে রাশিয়া চীনের সঙ্গে আইগুণ

এর সন্ধি (Treaty of Aigun) সম্পন্ন করে (1858)। সন্ধির শর্তানুসারে রাশিয়া আমুর নদী পর্যন্ত ভূখণ্ড লাভ করে। 1860 খ্রিস্টাব্দে রাশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে ভ্লাডিভস্টক বন্দরটি চীনের কাছ থেকে লাভ ক'রে প্রায় কোরিয় সীমান্ত পর্যন্ত এগিয়ে যায়। এর ফলে চীনের মাঞ্চুরিয়া রুশ সাম্রাজ্যের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়। বাশিয়ার এই অগ্রগতি এশিয়ার অন্যতম শক্তিশালী দেশ জাপান উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করে এবং কোরিয় অঞ্চলের বিবাদকে কেন্দ্র ক'রে 1904-05 খ্রিস্টাব্দে রুশ-জাপান যুদ্ধ (Russo-Japanese War) সংঘটিত হয়। এতে জাপান জয়লাভ করলে এই প্রথম এক এশিয় শক্তির কাছে ইয়োরোপীয় শক্তি পরাজিত হয়। রাশিয়াকে জাপানের সঙ্গে পোর্টস্‌মাউথের সন্ধি (1905) মেনে নিতে হয়, যার ফলে জাপান লিয়াও টুং উপদ্বীপ পুনরায় লাভ করে। পরিণতিতে বিংশ শতকে জাপান এশিয় সাম্রাজ্যবাদী দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশের সুযোগ পায়।

জাপান ঃ কোরিয়া এবং চীনের নানা অঞ্চলের উপর জাপানের লোভ ছিল। 1902 খ্রিস্টাব্দে জাপান ব্রিটেনের সঙ্গে এক মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করেছিল। এর সাহায্যে দুই দেশই নিজেদের ক্ষমতা বাড়ায়। জাপান কোরিয়াকে সম্পূর্ণ দখল করে (1911), প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে চুক্তি অনুযায়ী জাপান তার মিত্র ব্রিটেনের শত্রু জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। তারপর জাপান চীনের জার্মান উপনিবেশ শাংটুং দখল করে নেয়। আসলে এটা দখল করাই ছিল জাপানের যুদ্ধে যোগদানের প্রকৃত উদ্দেশ্য। চীনের উপর তার সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টি, চীন-জাপান যুদ্ধ (Sino-Japanese War, 1895) এবং তাতে চীনের পরাজয়ের পর সিমোনসেকির সন্ধি ইত্যাদি দ্বাবা নিজেদের ক্ষমতা বাড়ায়। তারপর বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে জাপান চীনেব উপব একুশ দফা দাবি (Twentyone Demands) চাপিয়ে দেয় এবং মাঞ্চুরিয়া জাপানের প্রভাবাধীন অঞ্চলে (Sphere of influence) পরিণত হয়।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ঃ আমেরিকার ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিই অষ্টাদশ শতকে ব্রিটেনের অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন 'আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠা করেছিল। 1823 খ্রিস্টাব্দে আমেরিকা মনরো-নীতি (Monroe Doctrine) ঘোষণা করে। বাষ্ট্রপতি মনরোর ঘোষণার মূলমন্ত্র ছিল আমেরিকা আমেরিকাবাসীদের জন্য। এর দ্বারা আমেরিকা শুধু উত্তর আমেরিকা নয়, দক্ষিণ আমেরিকাতেও ইয়োরোপের ঔপনিবেশিক আক্রমণ প্রতিহত করে। কিন্তু উনিশ শতকের শেষ ভাগে যখন ইয়োরোপীয় দেশগুলির মধ্যে উপনিবেশ গড়ার জন্য কাড়াকাড়ি শুরু হয়, তখন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রও নিজেদের সাম্রাজ্যবৃদ্ধি এবং নিরাপত্তা বিধানে প্রবৃত্ত হয়।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আমেরিকার স্বার্থ ছিল সবচেয়ে বেশি। 1890 খ্রিঃ আমেরিকা সামোয়া দ্বীপপুঞ্জ দখল করে, পরে জার্মানির সঙ্গে বিবাদ হলে তারা দ্বীপটি জার্মানির সঙ্গে ভাগ করে নেয়। ক্রমে পুয়েরটোরিকো এবং ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের অনেক এলাকায় যেমন আমেরিকার উপনিবেশ গড়ে ওঠে, তেমনি ফিলিপাইনস্‌ এবং হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জও তারা

দখল করে। চীনে যখন পশ্চিমী শক্তির অনুপ্রবেশ ঘটে তখন জাপান রুদ্ধ করার চেষ্টা করলেও আমেরিকার অনুপ্রবেশ ঘটে। 1854 খ্রিঃ মার্কিন সরকারের নির্দেশে নৌসেনাপতি পেরী জাপানের উপর অসাম্যমূলক সন্ধি চাপিয়ে দেয়। এক্ষেত্রে পরবর্তী কালে ইন্ধন যোগায় অন্যান্য ইয়োরোপীয় শক্তি। পরে অবশ্য জাপান আত্মশক্তির জোরে এই বৈষম্যমূলক সন্ধি অস্বীকার করে এবং নিজেই সাম্রাজ্যবাদী দেশে পরিণত হয়।

চীনদেশে ইয়োরোপীয় আগ্রাসন : শুধু জাপান বা রাশিয়া নয়, উনিশ শতকের শেষ দিকে সব ইয়োরোপীয় শক্তিই চীনের উপর নগ্নভাবে আগ্রাসী নীতি প্রয়োগ করে। ঐতিহাসিক *হ্যারল্ড ভিনাকি* সেজন্য মন্তব্য করেছেন যে, 'তরমুজকে যেমন লোকে খণ্ড খণ্ড করে খায়, সেইভাবে ইয়োরোপের ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি Chinese Melon বা চীনা তরমুজকে খণ্ড খণ্ড করে আহার করতে উদ্যত হয়।' কিছু উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে :-(i) রাশিয়া লিয়াও টুং উপদ্বীপ এবং পোর্ট আর্থার দখল করে নেয়, (ii) জার্মানি কিয়াচাও বন্দর দখলের পর শাণ্টুং প্রদেশেও তার অধিকার কায়েম করে, (iii) ব্রিটেন ওয়াইহ্যাওয়ে অধিকার করে এবং তার ফলে ইয়াংসি উপত্যাকা তার প্রভাবাধীন অঞ্চলে পরিণত হয়, (iv) ফ্রান্স ইন্দোচীন বা আনাম থেকে চীনের ভিতর পর্যন্ত তার নিয়ন্ত্রিত রেলপথ গঠনের অধিকার পায় এবং ফলে ইউবান, কোয়াংলি ইত্যাদি অঞ্চলের খনিজ সম্পদ ফ্রান্স রেলদ্বারা নিয়ে যাবার সুযোগ পায়। এর ফলে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র মনে করল যে মাঞ্চুরিয়ার পতন অবশ্যম্ভাবী। তাছাড়া সব দেশ মিলে চীন দখল করে নিলে মার্কিন বাণিজ্যের আর সুযোগ থাকবে না। এই কারণে 1900 খ্রিস্টাব্দে মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব (Secretary of State) জন হে তার *Open Door Policy* বা উন্মুক্ত দ্বার নীতি ঘোষণা করেন। এই নীতিতে বলা হয় যে, চীন সব দেশের কাছে সমান এবং বিভিন্ন শক্তির দ্বারা অধিকৃত অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সমান বাণিজ্যিক অধিকার দিতে হবে। জওয়াহরলাল নেহরু তাঁর Glimpses of World History গ্রন্থে এই নীতিকে বলেছেন 'অদৃশ্য সাম্রাজ্যবাদ' (Invisible Imperialism)। কথাটি সত্যি, কেননা নগ্নভাবে সাম্রাজ্যবাদী অগ্রাসান না করেও আমেরিকা সমান ঔপনিবেশিক সুযোগ পায়।

জার্মানি : ব্রিটেন, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, রাশিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের মতন জার্মানি ও অন্যান্য ইয়োরোপীয় দেশগুলিও ঔপনিবেশিক প্রচেষ্টা থেকে মুক্ত ছিল না। তবে জার্মানির সমস্যা ছিল প্রকট। তারা ইয়োরোপের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ অথচ ঔপনিবেশিক মঞ্চে তাদের প্রবেশ সবচেয়ে পরে। তা সত্ত্বেও তারা আফ্রিকা এবং এশিয়াতে উপনিবেশ গড়ায় আত্মনিয়োগ করে। ইতালিও আফ্রিকায় উপনিবেশ গঠনে মনোযোগী হয়। জার্মানি নিউগিনির একটি অংশ, বিসমার্ক দ্বীপপুঞ্জ, মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ, সামোয়া দ্বীপের অংশ, চীনে শাণ্টুং প্রভৃতি অঞ্চল নিজেদের প্রভাবাধীনে আনে। জার্মানি তুরস্কের সাম্রাজ্যেও মূলধন লগ্নী করে।

এশিয়ায় ঔপনিবেশিকতা বিস্তারের ফলাফল ঃ এশিয়ার নানা অঞ্চলে ঔপনিবেশিক বিস্তারের ফল হয় সুদূরপ্রসারী। কয়েকটি প্রধান বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে:-(ক) বিভিন্ন ইয়োরোপীয় দেশের সংস্পর্শে এশিয়ার দেশগুলিতে ইয়োরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটে। (খ) এশিয়াতে খ্রিস্টধর্মের প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধি পায়। (গ) এশিয়ার দেশগুলি থেকে কাঁচামাল ইয়োরোপে নিয়ে যাওয়া হয়। (ঘ) শিল্পোন্নত পণ্য ইয়োরোপ থেকে এশিয়ার বাজারে এনে বিক্রি করে মুনাফা আবার ইয়োরোপ-আমেরিকায় নিয়ে যাওয়া হয়। (ঙ) এশিয়ার দেশগুলিতে শিল্পে ইয়োরোপীয় মূলধন লগ্নী করা হয়। (চ) ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক দ্বন্দ্ব ইয়োরোপীয় দেশগুলির মধ্যে সংঘাত বাড়িয়ে দেয়। (ছ) ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে কিছু এশিয় দেশে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম শুরু হয়।

৩। আফ্রিকার দেশগুলিতে উপনিবেশের সম্প্রসারণ

ইয়োরোপের চোখে আফ্রিকা ঃ উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত ইয়োরোপ আফ্রিকাকে বলত 'অন্ধকার মহাদেশ' (The Dark Continent), কেননা আফ্রিকা সম্বন্ধে তাদের স্পষ্ট কোনও ধারণা ছিল না। যে সব জাতি আফ্রিকার সংস্পর্শে এসেছিল তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি উপকূল বা উপকূলবর্তী দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল। যেমন উত্তর আফ্রিকার আলজিরিয়া ছিল ফরাসি উপনিবেশ এবং দক্ষিণে বুয়র (Boer) রাষ্ট্র আর কেপকলোনি ছিল ইংল্যাণ্ডের দখলে; টিউনিস এবং ত্রিপোলি ছিল তুর্কি সাম্রাজ্যভুক্ত। বাকি আফ্রিকা অংশ ছিল অনাবিষ্কৃত।

কৃষ্ণবর্ণের মানুষদের বাসভূমি আফ্রিকা সমুদ্র পরিবেষ্টিত এবং অরণ্যানী মণ্ডিত এক বিচিত্র মহাদেশ। সত্যি আফ্রিকার বৈচিত্র্যের যেন শেষ নেই। সাহারার মতন পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মরুভূমি, নাইল এর মতন বিশাল নদী, বিশাল মালভূমি, গভীর অরণ্য, দুর্গম পর্বতমালা, দুরন্ত সব নদী ও জলপ্রপাত আর অসংখ্য জাতির মানুষ আফ্রিকার বৈশিষ্ট্য। আর ছিল গরিলা, সিংহ, শিম্পাঞ্জি, জিরাফ, জেব্রা সহ বন্যপ্রাণী। এই আফ্রিকাতেই মিশরে পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। আফ্রিকা ছিল ইয়োরোপের সবচেয়ে কাছের অথচ উনিশ শতক পর্যন্ত ইয়োরোপের চোখে ছিল দূরবর্তী। ঐ শতকে স্কট, স্পেক, লিভিংস্টোন, স্ট্যানলি, পিটার্স, দিব্রাজা প্রমুখ দুঃসাহসী অভিযাত্রী ধর্মপ্রচারক এবং পর্যটকদের অভিযানের ফলে আফ্রিকা ইয়োরোপবাসীর সামনে উন্মুক্ত হয়। ইয়োরোপবাসীর মনে এক উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। তেমনি আরম্ভ হয় বাণিজ্য কেন্দ্র এবং উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা।

আফ্রিকা ব্যবচ্ছেদ (Partition of Africa) ঃ উনিশ শতকে ইয়োরোপীয় দেশগুলি আফ্রিকা সম্বন্ধে জানার পরেই ঐ মহাদেশকে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেয়। আফ্রিকার ব্যবচ্ছেদ প্রসঙ্গে দুটি বৈশিষ্ট্য প্রথম দিকে লক্ষ্য করা যায়। প্রথম কথা হলো, আফ্রিকা ব্যবচ্ছেদ নিয়ে ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কোনও যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। 1870 খ্রিস্টাব্দের পর জার্মানি ও ইতালি প্রবল বিক্রমে আবির্ভূত হলে এবং ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য জাতীয় গৌরবের মানদণ্ড স্বরূপ— এই মনোভাবের বশবর্তী হয়ে

তারা আফ্রিকার সাম্রাজ্যস্থাপনের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয় এবং ঐ মহাদেশে আধিপত্য বিস্তারের জন্য ইয়োরোপীয় দেশগুলির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেড়ে যায়। দ্বিতীয় কথা হলো, এশিয়ার মতন আফ্রিকার ঔপনিবেশ ধীরে ধীরে গড়ে ওঠেনি। আফ্রিকার ব্যবচ্ছেদ হয়েছে অতি দ্রুত গতিতে। মাত্র তিরিশ -চল্লিশ বছরের মধ্যে ইয়োরোপ আফ্রিকার দেশগুলিকে নিজেদের অধিকার ভুক্ত করে ফেলে। এই ভাবে দ্রুত উপনিবেশীকরণ শুরু হয় 1870 খ্রিস্টাব্দের পর।

আফ্রিকার উপনিবেশ (1800-1870) ঃ সমগ্র আফ্রিকার খুব সামান্য অঞ্চলই উনিশ শতকের প্রথম সত্তর বছরের মধ্যে ইয়োরোপীয়দের উপনিবেশে পরিণত হয়। ডাচ এবং পর্তুগিজরা এ ব্যাপারে ছিল পথিকৃৎ। 1652 খ্রিস্টাব্দ থেকেই ডাচগণ কেপ কলোনি এবং কেপ অফ দ্যা গুড হোপ দখল করে নিজেদের অধিকারে রেখেছিল। তারা ভারতে যাওয়ার পথে একটি বন্দর হিসেবেই কেপ অফ দ্য গুড হোপ বা 'উত্তমাশা অন্তরীপ'কে ব্যবহার করত। ডাচগণ স্থানীয় দাস শ্রমিকদের উপর নির্ভরশীল ছিল ; কিন্তু ক্রমে ডাচগণ অনেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাস শুরু করে, কৃষিকাজে মন দেয় এবং আফ্রিকাতেই থেকে যায়। তারা এবং তাদের মিশ্র সন্তানগণ ক্রমে বুয়র (Boer) নামে পরিচিত হন। 1806 খ্রিস্টাব্দে ডাচরা অবশ্য কেপ কলোনি ইংরেজদের কাছে বিক্রি করে দেয়। পর্তুগিজরা আফ্রিকার সঙ্গে যোগাযোগ ঘটালেও ব্যবসা-বাণিজ্য অপেক্ষা লুঠতরাজেই বেশি মনোযোগী ছিল। ক্রমে ক্রমে আফ্রিকায় তিনটি পর্তুগিজ উপনিবেশ গড়ে ওঠে— গিনি উপকূল, শোফালা এবং অ্যাঙ্গোলা। ফ্রান্সও উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই উত্তর আফ্রিকার আলজিরিয়াতে এক অভিযান চালিয়ে দখল করে নেয় এবং পরে আলজিরিয়াকে কেন্দ্র করেই তাদের উপনিবেশ গড়ে ওঠে। ফরাসিদের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে ডাচরাও লিমপোপো নদী পর্যন্ত বিশাল অঞ্চলে উপনিবেশ গড়ে তোলে, যেগুলির নাম নাটাল, অরেঞ্জ উপত্যকা এবং ট্রান্সভাল। তবে 1870 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কঙ্গো উপত্যকা এবং নাইল উপত্যকা ইয়োরোপীয়দের কাছে অপরিচিত ছিল।

আফ্রিকার ব্যবচ্ছেদ এবং দ্রুত উপনিবেশীকরণ (1870-1914) ঃ আফ্রিকায় আধিপত্য বিস্তারের ক্ষেত্রে বেলজিয়ামের রাজা দ্বিতীয় লিওপোল্ড অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। 1876 খ্রিস্টাব্দে দুঃসাহসী অভিযাত্রী স্ট্যানলি কঙ্গো আবিষ্কার করলে আফ্রিকা সম্পর্কে ইয়োরোপবাসীদের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। এরপরেই 1878 বেলজিয়ামের রাজা দ্বিতীয় লিওপোল্ড ব্রাসেলস্ শহরে ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলির এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলনে আফ্রিকা মহাদেশের অভ্যন্তরে ব্যবসা-বাণিজ্য করার সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা হয়। সভাপতি দ্বিতীয় লিওপোল্ডের প্রস্তাব অনুসারে আফ্রিকার সভ্যতা, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিশদভাবে তথ্যাদি সংগ্রহ করার জন্য এক

আন্তর্জাতিক ভৌগোলিক সমিতি গঠন করা হয়। কিন্তু সমিতির আন্তর্জাতিক চরিত্র অচিরেই লুপ্ত হলো এবং প্রত্যেক দেশ উপনিবেশ গড়তে ব্যগ্র হয়ে উঠল। বেলজিয়ামও দেরি না করে কঙ্গো অধিকার করে নেয়।

বস্তুতপক্ষে স্ট্যানলিকে মুখপত্র করে ব্রাসেলস্ সমিতি নাইজার নদীর উপত্যকায় বিরাট কঙ্গো দেশের খনিজ সমৃদ্ধ অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপনেই বেশি আগ্রহী ছিল। বেলজিয়ামের এই মনোভাব পুরানো ঔপনিবেশিক শক্তি ব্রিটেন এবং পর্তুগালের মনঃপূত হলো না। তাছাড়া ব্রিটেন ও ফ্রান্সের কঙ্গো নদী দিয়ে অবাধে চলাচল করার প্রয়োজন ছিল। তাঁরা ইঙ্গ-পর্তুগাল কঙ্গো নদী কমিশন নামে এক যুগ্ম কমিশন গঠন করল ; ব্রিটেন অ্যাঙ্গোলার উপর পর্তুগালের অধিকার স্বীকার করে নিল এবং কঙ্গো নদীর মোহনার উপর ইঙ্গ-পর্তুগিজ অধিকার দাবি করল। বেলজিয়াম এই অবস্থায় জার্মানি এবং ফ্রান্সের সাহায্য চাইল। ফ্রান্স কঙ্গো নদীর উত্তরে এবং জার্মানি ক্যামেরুনস এ উপনিবেশ বিস্তারে আগ্রহী ছিল। আন্তর্জাতিক বিবাদ মেটানোর জন্য 1884-85 খ্রিস্টাব্দে ইয়োরোপের নানা দেশের প্রতিনিধিগণ বার্লিনে এক সম্মেলনে মিলিত হন । এখানে স্থির হয় যে, কোনও রাষ্ট্র আফ্রিকার কোনও দেশ দখল করলে অপরাপর ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গকে তা জানাতে হবে। ঐ শর্তের ফলে ইয়োরোপীয় শক্তিগুলির মধ্যে আফ্রিকা দখলের জন্য এক তীব্র দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতা শুরু হয়।

বার্লিন সম্মেলনে আরও ঠিক হয়েছিল যে কঙ্গো নদী আন্তর্জাতিক নদী হিসেবে স্বীকৃত হবে ; সব রাষ্ট্রের ধর্মপ্রচারক ও অভিযাত্রীদের কঙ্গোর অভ্যন্তরে প্রবেশ করবার অধিকার থাকবে ; আফ্রিকায় দাসব্যবসা বন্ধ করতে হবে ; নাইজার নদীও সকল দেশের চলাচলের জন্য সমভাবে খোলা থাকবে। কঙ্গোর বেলজিয়ামের অধিকার স্বীকৃত হলো। আসলে 1885 খ্রিস্টাব্দে বার্লিন চুক্তির দ্বারা আফ্রিকা ভাগাভাগি করে নেওয়ার ব্যবস্থা পাকা হলো। বেলজিয়াম Congo Free State নামক আফ্রিকার বিরাট দেশে (বেলজিয়ামের আয়তনের প্রায় দশগুণ) উপনিবেশ স্থাপন করল এবং বেলজিয়ামের উৎসাহে ফ্রান্স, পর্তুগাল, জার্মানি, ব্রিটেন, ইতালি প্রভৃতি কেউই পিছিয়ে রইল না।

ফ্রান্স : আলজিরিয়া ফ্রান্সের অধিকারে আগেই ছিল। 1882 খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্স টিউনিস দখল করে। তারপর ক্রমে 1884 তে কঙ্গো নদীর দক্ষিণ উপকূলে চ্যাড, 1896 খ্রিঃ আফ্রিকার পূর্ব দিকে মাদাগাস্কার দ্বীপ এবং 1912 খ্রিঃ উত্তর আফ্রিকার মরক্কো ফ্রান্সের দখলে চলে যায়। এছাড়া সেনেগাল, কঙ্গো নদীতে আইভরি কোস্টের মধ্যবর্তী অঞ্চলেও ফরাসি অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ফরাসি স্থপতির উদ্যোগে সুয়েজখাল খনন করা হলে ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরকে যুক্ত করার আন্তর্জাতিক জলপথ হিসেবে সুয়েজ ও মিশরের গুরুত্ব বাড়ে। ফ্রান্সের তত্ত্বাবধানে সুয়েজখাল খনন করা হলেও ব্রিটেনও ঐ খালে নিয়ন্ত্রণ দাবী করল। 1875 খ্রিঃ মিশরের খিদিভ ইসমাইল পাশা তাঁর অর্থাভাবের

কারণে সুয়েজ খালে মিশরের শেয়ার বিক্রি করে দিলে ব্রিটেন তা কিনে নেয়। ফ্রান্স আপত্তি জানালে, মিশরে পরোক্ষভাবে ইঙ্গ-ফরাসি ঔপনিবেশিক অনুপ্রবেশ ঘটে যখন সুয়েজ এলাকায় যুগ্ম ইঙ্গ-ফরাসি কনডোমনিয়াম স্থাপিত হয় (1876)। পরে অবশ্য ব্রিটেনের ক্ষমতাই অনেক বেড়ে যায়। সমগ্র সাহারা মরুভূমিই ছিল ফরাসি অধিকারে।

পর্তুগাল ঃ পর্তুগাল ক্ষুদ্র দেশ হলেও ঔপনিবেশ বিস্তারে মনোযোগী ছিল। তারা কঙ্গোর দক্ষিণ উপকূলে এবং আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল অ্যাঙ্গোলা দখল করে। তাছাড়া আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে মোজাম্বিক বা পর্তুগিজ পূর্ব আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপন করে। অ্যাঙ্গোলা ও মোজাম্বিকের মধ্যে যোগাযোগ অবশ্য তারা ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও ব্রিটিশ বিরোধিতায় করে উঠতে পারেনি।

জার্মানি ঃ বিসমার্ক উপনিবেশ বিস্তারের কাজে উদাসীন থাকলেও জার্মানির সাম্রাজ্যবাদী দলের চাপ, বুর্জোয়াদের চাপ এবং সরকারি সমর্থন পুষ্ট ফ্রোটেভেরাইন সমিতির ইচ্ছায় জার্মানিও ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমে পড়ে। জার্মানি দ্রুতগতিতে ডেলগোয়া উপসাগর অঞ্চল, দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকা, সেন্টলুসিয়া উপসাগরীয় অঞ্চল, জ্যাম্বোডি টোগোল্যাণ্ড, পূর্ব আফ্রিকা এবং ক্যামেরুন অঞ্চলে তাদের উপনিবেশ স্থাপন করে।

ব্রিটেন ঃ আফ্রিকায় সবচেয়ে বেশি জায়গায় এবং গুরুত্ব পূর্ণ স্থানে ব্রিটেনের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলো। দক্ষিণে ডাচদের কাছ থেকে তারা কেপ কলোনি পেয়েছিল, পরে তার উত্তরাংশে অগ্রসর হয়ে নাটাল, অরেঞ্জ রিভার কলোনি এবং বুয়রদের পরাজিত করে ট্রান্সভাল ব্রিটেন দখল করে। এই সব অঞ্চল নিয়ে 1910 খ্রিস্টাব্দে ব্রিটেন Union of South Africa গঠন করে। আফ্রিকার উত্তরে মিশর এবং সুদানে ব্রিটেন তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে। ব্রিটিশ পূর্ব আফ্রিকা, উগান্ডা বেচুয়ানাল্যাণ্ড, রোডেশিয়া, ন্যাসাল্যাণ্ড প্রভৃতিও তাদের অধিকারে আসে। প্রথম জার্মানি পূর্ব আফ্রিকার mandate ব্রিটেনকে দেওয়া হলে মিশর-সুদান থেকে কেপ কলোনি পর্যন্ত বিশাল ভূখণ্ডে যোগাযোগ সহজ হয়। এছাড়া গাম্বিয়া, সিয়েরালোন, গোল্ড কোস্ট, নাইজেরিয়া এবং সোমালিল্যাণ্ডের একাংশও ব্রিটেন অধিকারে আসে। দক্ষিণ আফ্রিকার ব্রিটিশ প্রশাসক সিসিল রোডস্ (Cecil Rhodes) Cape to Cairo যোগাযোগের পরিকল্পনা করেছিলেন।

ইতালি ঃ আফ্রিকা দখলের প্রতিযোগিতার আসরে ইতালি বিলম্বে অবতীর্ণ হয়। 1883 খ্রিস্টাব্দে ইতালি লোহিত সাগরে অবস্থিত ইরিস্ট্রিয়া এবং সোমালিল্যাণ্ডের একাংশ দখল করে। এই দুটি অঞ্চলের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের জন্য ইতালি আবিসিনিয়া (ইথিওপিয়া) দখলের চেষ্টা করলেও স্যাডোয়ার যুদ্ধে ফ্রান্সের কাছে পরাজিত (1896 খ্রিঃ) হয়। পরবর্তীকালে মুসোলিনি আবিসিনিয়া দখল করে নিয়েছিলেন। তার পূর্বে 1812 খ্রিঃ ইতালি তুরস্কের কাছ থেকে ট্রিপলি অধিকার করে নেয়।

আফ্রিকা ব্যবচ্ছেদের ফলাফল : উনিশ শতকের শেষ দিকে আফ্রিকা ভাগাভাগি করে নেওয়ার ফলাফল ছিল গুরুত্বপূর্ণ। (ক) অন্ধকারময় মহাদেশ আফ্রিকা ইয়োরোপীয়দের কাছে পরিচিত হয়ে ওঠে এবং আফ্রিকার দেশগুলিতে ইয়োরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়ে। (খ) আফ্রিকার নানা জনজাতির ভাষা থাকলেও অনেক লিপি ছিল। ফলে ক্রমে ইংরেজি, ফরাসি প্রভৃতি ভাষা ও লিপিই সেই সব উপনিবেশের ভাষা ও লিপি হয়ে ওঠে। (গ) আফ্রিকা থেকে বহু শ্রমিক সস্তায় অন্যত্র চালান করা হয় এবং প্রথমদিকে ক্রীতদাস সংগ্রহ করা হলে পরে অবশ্য দাস-ব্যবসা নিসিদ্ধ হয়। (ঘ) আফ্রিকায় শিক্ষার প্রসার ঘটে। (ঙ) খ্রিস্টধর্ম প্রচারের ফলে ঐ ধর্মে বহু ব্যক্তি দীক্ষিত হয়। (চ) আফ্রিকার ব্যাপক বাজারে ইয়োরোপীয় পণ্য বিক্রি শুরু হয় এবং আফ্রিকা থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করাও সহজতর হয়।

তবে আফ্রিকার দেশগুলিও উপনিবেশের সম্প্রসারণের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রতিক্রিয়া হলো ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি এবং সংঘর্ষের সূত্রপাত। 1875 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আফ্রিকার দশভাগের এক ভাগ মাত্র ছিল ইয়োরোপীয় উপনিবেশ কিন্তু 1895 এর মধ্যে দশ ভাগের নয় ভাগই তাদের উপনিবেশে পরিণত হয়। প্রথম দিকে আফ্রিকা ব্যবচ্ছেদ নিরুপদ্রবে হলেও ক্রমে ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। ইংল্যাণ্ডের সঙ্গেফ্রান্সের,জার্মানির,আবার ফ্রান্সের সঙ্গে ইতালির, ফ্রান্সের সঙ্গে জার্মানির বিরোধের উপস্থিতি আমরা লক্ষ্য করি। এই দ্বন্দ্বের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। (ক) বিসমার্কের প্ররোচনায় ফ্রান্স টিউনিস দখল করলে ইতালির সঙ্গে ফ্রান্সের মনোমালিন্য ঘটে এবং ফলে ইতালি জার্মানি-অস্ট্রিয়ার মৈত্রীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে ত্রিপাক্ষিক মৈত্রী বা ট্রিপল্ অ্যালায়েন্স গঠন করে। (খ) দক্ষিণ আফ্রিকান ডাচ বুয়ররা ব্রিটিশ আধিপত্য মানতে অস্বীকার করলে তাদের সঙ্গে ব্রিটেনের যুদ্ধ হয়। জার্মানি বুয়রদের সাহায্যের কথা বললেও ব্রিটিশ হুমকিতে তা, পিছিয়ে যায়। (গ) মিশর ও সুদান নিয়ে ইঙ্গ-ফরাসি বিরোধ বাধে এবং নাইল নদের উৎস ক্ষেত্র নিয়ে ফ্যাসোডা অঞ্চলে যুদ্ধ বাধার উপক্রম হয়। শেষপর্যন্ত অবশ্য উভয়পক্ষ মীমাংসা করে নেয়। (ঘ) মরোক্কোকে কেন্দ্র করে ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যে বিবাদে এক আন্তর্জাতিক সংকট সৃষ্টি হয়। তবে আফ্রিকার ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পথ সুগম করেছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

অধ্যায় ১৫

পূর্বাঞ্চল সমস্যা

(Syllabus : The Eastern Question in later Nineteenth Century)

১। পূর্বাঞ্চল সমস্যা কাকে বলে

ইয়োরোপের ইতিহাসে 'পূর্বাঞ্চল' কথাটি পূর্ব-ইয়োরোপের বিভিন্ন অঞ্চলের কথা ব্যক্ত করে। এইসব অঞ্চলের রাজনৈতিক সমস্যাগুলি পূর্বাঞ্চল সমস্যা (Eastern Question) নামে পরিচিত। পূর্ব-ইয়োরোপের বিভিন্ন জাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলকে 'বলকান' অঞ্চলও বলা হয়। এই অঞ্চল প্রাচ্যের নিকটবর্তী বলে পশ্চিম ইয়োরোপে এই অঞ্চলকে নিকট-প্রাচ্যও (Near East) বলে। এই বলকান উপদ্বীপ অঞ্চল পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ছিল তুর্কি অটোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত।

পূর্বাঞ্চল সমস্যা কাকে বলে, তার উত্তর এক কথায় দেওয়া কঠিন। কারণ সমস্যাটি বেশ জটিল। তবে বলা যেতে পারে অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে তুর্কি সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়লে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও শূন্যতার সৃষ্টি হয় এবং সেই কারণে যে সমস্যার উদ্ভব হয়, তাই পূর্বাঞ্চল সমস্যা।[1] তুরস্ক সাম্রাজ্যের শক্তিহ্রাসের ফলে তাকে বলা হত 'ইয়োরোপের রুগ্ন ব্যক্তি'। অটোম্যান সাম্রাজ্যের দুর্বলতা, রাশিয়া-অস্ট্রিয়া-ব্রিটেন-ফ্রান্স প্রভৃতি বৃহৎ ইয়োরোপীয় শক্তির প্রতিযোগিতা ও স্বার্থের বিরোধ এবং আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে জাতীয়তবাদের আবির্ভাব, বিকাশ ও তার সংঘাত পূর্বাঞ্চল সমস্যা সৃষ্টি করেছিল।[2] তবে আমরা ভারতীয়রা এটিকে বলকান অঞ্চলের সমস্যা (Balkan problem) বললেই সঠিক কাজ করব, কেননা ঐ অঞ্চল আমাদের পূর্বদিকে নয়। লর্ড মর্লি-র সংজ্ঞা অনুসারে পূর্বাঞ্চল সমস্যা হলো তেমন সমস্যা যা প্রায়শই স্থান বদল করে, যার হদিশ করা যায় না, নিয়ন্ত্রণ করা যায় না,পরস্পরস্বার্থবিরোধী জটিলতায় জড়িত এবং পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন ধর্মবিশ্বাসী মানুষদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ।

বস্তুত পূর্ব ইয়োরোপে বা বলকান অঞ্চলে সমস্যার সৃষ্টি হয় উনিশ শতকে। ঐ শতকের প্রথমার্ধে এই সমস্যার বহিঃপ্রকাশ খুব বেশি পরিমানে হয়নি। কিন্তু এর দ্বিতীয়ার্ধে ক্রমে ক্রমে এই সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করে। পূর্বাঞ্চল সমস্যার স্বরূপ তিনটি মূল

1. দ্রঃ ডবল্যু মিলার, *দ্য অটোম্যান এম্পায়ার অ্যান্ড ইটস্ সাকসেসার্স*

2. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রঃ এস. এস. অ্যাণ্ডারসন, *দ্য ইস্টার্ন কোশ্চেন*; জে. এ. আর ম্যারিয়ট, *দ্য ইস্টার্ন কোশ্চেন* প্রভৃতি গ্রন্থ।

সূত্রের মধ্যে নিবদ্ধ। এগুলি হলো যথাক্রমে—(ক) অটোমান তুর্কি সাম্রাজ্য যা পূর্ব ইয়োরোপ বা বলকান অঞ্চলের বিশাল এলাকা দখল করে ছিল, তার দুর্বল হয়ে যাওয়া। তুরস্কের বা অটোমান সাম্রাজ্যের রোগের অর্থাৎ দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই বলকান অঞ্চলের জাতীয়তাবাদী স্পৃহা, নানা জাতির স্বাধীন দেশ লাভের ইচ্ছা প্রকট হয়। (খ) যেহেতু পূর্ব ইয়োরোপে বহু জাতির মানুষ বাস করত তাই তাদের মধ্যে পরস্পরের স্বার্থ এবং লক্ষ্যের ভিন্নতা ছিল। এই ভিন্নতা থেকে নানা জাতির মধ্যে বৈরিতা এবং দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। (গ) পূর্ব ইয়োরোপীয় এই সমস্যাগুলিতে ফ্রান্স, রাশিয়া, ব্রিটেন, অস্ট্রিয়া প্রমুখ বৃহৎ ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গ জড়িয়ে পড়ে। এই দেশগুলি মুখে আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রাখা, শক্তিসাম্য বজায় রাখা, অটোমান সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখা ইত্যাদি বললেও তাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল নিজ নিজ দেশের স্বার্থ রক্ষা করা। সেই জন্য সব দেশ জড়িয়ে পড়ায় সমস্যা বাড়ে এবং বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত এই সমস্যার সমাধান হয়নি।

আমরা এই সমস্যার সম্পর্কে আরও একটু বিস্তারিত আলোচনা করতে পারি। বলকান অঞ্চলে বৃহৎ দেশগুলির মধ্যে সব চেয়ে বেশি স্বার্থ ছিল রাশিয়ার। আঠারো শতকের শেষ দিকেই কৃষ্ণসাগর বা ব্ল্যাক সি (Black Sea) অঞ্চলে রাশিয়া নিজের আধিপত্য খানিকটা বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল। আসলে রাশিয়ার দু'ধরনের স্বার্থ ছিল— কৃষ্ণসাগর থেকে ভূমধ্যসাগরে যাওয়া এবং ঐ জলপথে প্রবেশের উপরে নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করা। এছাড়া অটোমান সাম্রাজ্যের ইয়োরোপীয় অংশের রাজারা প্রধানত গ্রিক অর্থোডক্স চার্চের অনুগামী। একই ধর্মের অনুরাগী হিসেবে রাশিয়া এদের স্বার্থের দিকেও নজর রাখত। রাশিয়ার মত অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যেরও বলকান অঞ্চলে স্বার্থ ছিল। ফ্রান্স ও ব্রিটেনও তুরস্কের শক্তিহীনতা এবং তার ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত ছিল। মূলত ব্রিটেন রাশিয়ার আগ্রাসন একেবারেই চাইত না।

উনিশ শতকের গোড়ায় ইয়োরোপে ফরাসি বিপ্লব ও নেপোলিয়ানের আমলে যে তুমুল ঐতিহাসিক পরিবর্তন ঘটেছিল, তুরস্ক সাম্রাজ্য মোটামুটিভাবে তার বাইরে ছিল। ভিয়েনা সম্মেলনের পরে ক্রমে ফ্রান্স, রাশিয়া, ব্রিটেন, অস্ট্রিয়া প্রমুখ বৃহৎ ইয়োরোপীয় শক্তির প্রতিযোগিতা ও স্বার্থের বিরোধ এবং আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদের আবির্ভাব, বিকাশ ও তজ্জনিত সংঘাত অবস্থা বদলে দেয়। এই জাতীয়তাবাদ প্রথম স্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ ঘটে গ্রিসের স্বাধীনতা সংগ্রামে। 1820 খ্রিস্টাব্দ থেকে 1832 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত গ্রিস স্বাধীন হয়। দীর্ঘ, জটিল এবং রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর গ্রিসের স্বাধীনতা ক্ষয়িষ্ণু অটোমান সাম্রাজ্যের দুর্বলতা আরও প্রকট করে তোলে।

২। পূর্বাঞ্চল সমস্যার কারণ

অষ্টাদশ শতক থেকে বিশ শতকের প্রথমাংশ বা প্রথম মহাযুদ্ধের সূত্রপাত পর্যন্ত যেসব রাজনৈতিক সমস্যা ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌দের নিকট জটিল সমস্যারূপে দেখা দিয়েছিল তার মধ্যে নিকট প্রাচ্য সমস্যাই ছিল জটিলতম। এই সমস্যাকে কেন্দ্র করেই সংঘটিত হয়েছে সার্বিয়ার যুদ্ধ, গ্রিসের স্বাধীনতা যুদ্ধ, ক্রিমিয়ার যুদ্ধ, রুশ-তুর্কি যুদ্ধ, বলকান যুদ্ধ এবং শেষ পর্যন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। ক্রিমিয়া যুদ্ধের পর (1856) থেকে এসব সমস্যার জটিলতা অনেক বেশি বৃদ্ধি পায়। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই জটিলতা বৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান করলে প্রধান দুটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। (ক) তুরস্ক বা অটোমান সাম্রাজ্যের ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা এবং (খ) ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গের স্বার্থপর মনোভাব ও আচার-আচরণ। পূর্বাঞ্চলীয় সমস্যার উপাদান বা কারণ হিসেবে এই দুটি বিষয় ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

অটোম্যান সাম্রাজ্যের অবক্ষয় ও বলকান জাতীয়তাবাদ ঃ অষ্টাদশ শতক থেকে বিশাল অটোমান সাম্রাজ্যের অবক্ষয় সূচিত হয়। সামরিক শক্তির উপর অটোমান বা তুর্কি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু সেই সামরিক শক্তি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে ও শাসন পরিচালনার অযোগ্যতা প্রকাশ পায় । তুর্কি শাসকরা ছিলেন স্বেচ্ছাচারী ও সংস্কার-বিরোধী। সমকালীন বিশ্বের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি ছিল রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তিতে আধুনিক ও উন্নত। আভ্যন্তরীণ দুবর্লতার ফলে প্রাদেশিক শাসকগণ ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। তুর্কি সাম্রাজ্যের ভিত্তি এমন শিথিল হয়ে পড়ল যে, ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রনেতারা একে বলতেন 'ইয়োরোপের রুগ্ন-ব্যক্তি' (Sickman of Europe)। তুরস্কে তখনও ছিল স্বৈরাচারী শাসকের শাসন, সমাজে ছিল মধ্যযুগীয় রীতি-নীতি, সামরিক বাহিনী ছিল গতানুগতিক ও পুরাতনপন্থী তুরস্কের তিনজন সুলতান যথা—আবদুল মাজিদ (1839-61) আবদুল আজিজ (1861-76) ও আবদুল হামিদ (1876-1909) ছিলেন স্বেচ্ছাচারী অথচ দুর্বল, ব্যাভিচারী, অত্যাচারী এবং সংস্কারবিমুখ। তুলনামূলক বিচারে ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গের সামরিক বাহিনী ছিল অনেক বেশি অগ্রসর ও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত।

পূর্ব ইয়োরোপের মধ্যেকার বলকান অঞ্চলটি ছিল তুর্কি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। দানিয়ুব নদী ও ইজিয়ান সাগরের মধ্যবর্তী পাবর্ত্য অঞ্চলটুকু হলো বলকান অঞ্চল। এই অঞ্চলে গ্রিক, সার্ব, বুলগার, শ্লাভ ইত্যাদি বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর মানুষ বাস করত। স্বভাবতই তারা স্ব-স্ব গোষ্ঠী বা জাতি অধ্যুষিত ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত ছিল। তুরস্কের অবক্ষয়ের যুগে তারা উক্ত প্রবণতা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। তাছাড়া ধর্মীয় বিশ্বাসে বলকানবাসীরা অধিকাংশই ছিল খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী। সুতরাং এশিয়াবাসী কৃষ্ণবর্ণ এবং

ইসলামধর্মী তুর্কি শাসকদের অধীনে বসবাস করতে তারা পছন্দ করত না। বলকান অঞ্চলের জাতি, ধর্ম ও গোষ্ঠীগত বৈষম্য অটোমান সাম্রাজ্যের দুর্বলতাকে মাত্রাতিরিক্ত প্রকট করেছিল।

তুরস্কের ক্রম ভগ্নদশা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে বলকান অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। বলকান জাতিগুলি চেয়েছিল নিজস্ব রাষ্ট্র এবং তুরস্কের অধীনতা থেকে মুক্তি। গ্রিসের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাফল্য এবং তুরস্ক অ্যাড্রিয়ানোপল-এর সন্ধি মেনে নেওয়া (1829) এই জাতীয়তাবাদের প্রথম পদক্ষেপ। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, তুরস্ক যে ভেঙে পড়ছিল তা শুধু বলকান অঞ্চল নয়, অন্যত্রও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, আফ্রিকার মিশর ছিল অটোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত কিন্তু তাঁরাও নিজেদের স্বাধীন বলে ঘোষণা করে (1841)। যাই হোক, ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর (এই যুদ্ধের কারণ ফলাফল ইত্যাদি আমরা পরবর্তী অনুচ্ছেদেই আলোচনা করব) প্যারিসের সন্ধি (1856) এই বলকান জাতীয়তাবাদের সমস্যা মেটাতে পারেনি। ফলে ক্রমে ক্রমে রুমানিয়া, ক্রিট, সার্বিয়া, বসনিয়া-হার্জেগোভিনা, বুলগেরিয়া ইত্যাদি অঞ্চলে সমস্যার সৃষ্টি হয়। তবে এখানে একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে, শুধুমাত্র অটোমান সাম্রাজ্য থেকে স্বাধীন হওয়া নয়, পূর্বাঞ্চল সমস্যার আরও বড়ো সমস্যা ছিল বলকান জাতি ও রাষ্ট্রগুলির আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, নিজেদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক সীমানা নির্ণায়ক সমস্যার সমাধান করা।

ইয়োরোপীয় শক্তিপুঞ্জের মনোভাব ঃ তুরস্ক সাম্রাজ্যের পাশে অবস্থিত অন্যতম ইয়োরোপীয় রাষ্ট্র রাশিয়া। রাশিয়ার চিরন্তন সমস্যা ছিল স্বদেশ থেকে বহির্বিশ্বে যাওয়ার জলপথের অভাব। একসময় বাল্টিক সাগর দিয়ে জলপথে বাইরে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল ; কিন্তু বাল্টিক সাগর বছরের সব সময় বরফমুক্ত থাকে না। তাই রাশিয়া কৃষ্ণ সাগরের দিকে দৃষ্টি দেয়। কৃষ্ণসাগর থেকে দার্দানেলিস প্রণালী পেরিয়ে সহজে ভূমধ্যসাগরে পাড়ি দেওয়া যায়; কিন্তু এই অঞ্চলটি ছিল অটোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। তাই রাশিয়ার জার পিটার দি গ্রেট থেকে শুরু করে পরবর্তী জারগণ তুরস্কের দিকে সম্প্রসারণ নীতি গ্রহণ করেন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পূর্বাবধি রাশিয়া এরূপ সম্প্রসারণ নীতির মাধ্যমে তুরস্কের বহু অংশ অধিকার করে ও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু প্যারিসের সন্ধিতে (1856) রাশিয়ার অগ্রগতি ব্যাহত হয়। এই সন্ধিতে কৃষ্ণসাগরকে নিরপেক্ষ এলাকা, দানিয়ুবকে আন্তর্জাতিক নদী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এই সন্ধির সময় পৃথক এক অধিবেশনে ইংল্যাণ্ড, অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্স তুরস্কের স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। তুরস্কের সুলতানও সাম্রাজ্যের সংস্কারমূলক কর্মসূচি পরিচালনার কথা স্বীকার করেছিলেন।

প্যারিসের সন্ধির পর তুরস্কের দুর্বলতা আরও প্রকট হয়ে দেখা দিল। ফলে ইয়োরোপের রুগ্নব্যক্তি যেন আরও রুগ্ন হয়ে পড়ল । তখন ইয়োরোপের শক্তিবর্গের মনোভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। প্রথমতঃ, তুরস্কের সুলতান সাম্রাজ্য সংস্কারের প্রতিশ্রুতি পালন করেননি। ফলে বলকান অঞ্চলটি ক্রমশ অশান্ত হয়ে উঠল। বলকানের সঙ্গে ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গের স্বার্থ বিশেষভাবে জড়িত ছিল। তাই বলকানের প্রতি তারা উদাসীন থাকতে পারল না। রাশিয়ার লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল বলকান অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার ক'রে তুর্কিদের বিতাড়িত করা ও কনস্ট্যান্টিনোপল পর্যন্ত রাশিয়ার কর্তৃত্বাধীনে নিয়ে আসা। দ্বিতীয়তঃ, পার্শ্ববর্তী অস্ট্রিয়া পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে রুমানিয়া ও হার্জেগোভিনা দখল করার দিকে মনোনিবেশ করল। কারণ রাশিয়ার অগ্রগতিতে অস্ট্রিয়া বিব্রত বোধ করত। বলকান নিয়ে রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতা বলকান সমস্যাকে জটিল করে তুলেছিল। তৃতীয়তঃ, ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বিস্তারে অগ্রণী। তুরস্কের অখন্ডতা রক্ষা করতে পারলে তাদের ঔপনিবেশিক স্বার্থ ও বাণিজ্যিক যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে। তাই ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড তুরস্কের স্বাধীনতা ও অখণ্ডতা বজায় রাখার পক্ষপাতী ছিল। তারা চেয়েছিল 'রুগ্ন ব্যক্তি' তুরস্ককে বাঁচিয়ে রাখতে। সুতরাং উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে যে জটিল বলকান সমস্যার সৃষ্টি হয় তার দুটি প্রধান উপাদান বর্তমান। একদিকে তুরস্ক সাম্রাজ্যের ভাঙন, বলকান জাতিগুলির স্বাধীনতা-স্পৃহা, বলকান জাতীয়তাবাদের উদ্ভব, তাদের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ইত্যাদি এবং অন্যদিকে ইয়োরোপের বৃহৎ শক্তিবর্গের পরস্পর-বিরোধী স্বার্থ। এই সমস্যার প্রথম প্রকাশ আমরা দেখি ক্রিমিয়ার যুদ্ধে।

গ্রিসের স্বাধীনতা যুদ্ধে মিশরের পাশা মহম্মদ আলি তুর্কির সুলতানকে সাহায্য করলেও গ্রিসের স্বাধীনতা লাভের পর মিশরের শাসকের সঙ্গে তুরস্কের বিরোধ বাধে। পূর্বের সাহায্যের জন্য তুরস্ক মিশরকে ক্রীট দ্বীপ দিতে চাইলেও, মহম্মদ আলি তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে সিরিয়া দখল করেন। ফলে তুর্কি-মিশর যুদ্ধের সূচনা হয়। মিশরের আধুনিক সৈন্যবাহিনীর কাছে তুর্কি সেনাদের পরাজয় নিশ্চিত ছিল। এইজন্য তুর্কি সুলতান ইয়োরোপীয় শক্তিগুলির কাছে সামরিক সাহায্যে প্রার্থনা করেন। ফ্রান্স মিশরের পক্ষ নেয়, ব্রিটেন নিরপেক্ষ থাকে, রাশিয়া তুরস্কের পক্ষে যোগদান করে। উনকিয়ারস্কেলেসি-র সন্ধির (1833 খ্রিঃ) দ্বারা (1) রাশিয়া তুরস্কের স্বাধীনতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয় (2) দার্দানেলিস প্রণালীতে রুশ যুদ্ধজাহাজের অবাধ চলাচলের অধিকার তুরস্ক স্বীকার করে এবং (3) যুদ্ধের সময় এই প্রণালীতে অন্য জাতির যুদ্ধ জাহাজ চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়।

ব্রিটেন আশঙ্কা করে যে, এই সন্ধির দ্বারা রাশিয়ার ক্ষমতা বাড়বে। আবার মিশরে ফ্রান্সের প্রভাব বাড়লেও ব্রিটেন বা রাশিয়া কেউই তা চায়নি। বাধ্য হয়ে ফ্রান্স মিশরের পক্ষ ত্যাগ করে। ব্রিটেন তুরস্কের উপর রাশিয়ার প্রভাব বৃদ্ধিরও বিরোধিতা

করে। 1840 খ্রিঃ লণ্ডনের সন্ধির দ্বারা উনকিয়ারস্কেলেসির সন্ধির আপত্তিজনক শর্তগুলির পরিবর্তন করা হয়। এর ফলে মহম্মদ আলি মিশরের স্বাধীন বংশানুক্রমিক শাসক হিসেবে স্বীকৃত হলেন। তিনি সিরিয়া ও ক্রীটের উপর থেকে তার দাবি ত্যাগ করেন। তিনি লণ্ডনের সন্ধি মানতে অস্বীকার করলে ব্রিটেন ও অস্ট্রিয়ার নৌবহর বেইরুট ও সিডন বন্দর আক্রমণ করে মহম্মদ আলির পুত্র ইব্রাহিমকে তাড়িয়ে দেয়। ব্রিটিশ সেনাপতি স্যার চালর্স নেপিয়ার আকার দুর্গ দখলের পর আলেকজান্ড্রিয়া বন্দরের কাছাকাছি পৌঁছে গেলে মহম্মদ আলি লণ্ডনের দ্বিতীয় সন্ধি (1841 খ্রিঃ) মানতে বাধ্য হন এবং তাতে স্বাক্ষর করেন। অধ্যাপক *ম্যারিয়ট* লিখেছেন যে এর ফলে তুর্কি সুলতান তার রাজ্যগুলি ফিরে পান এবং অন্যদিকে মহম্মদ আলিকে নামে মাত্র অটোমান সুলতানের অধীনে রেখে মিশরে বংশানুক্রমিক শাসন ফিরিয়ে দেওয়া হয়। একথাও ঠিক হয় যে, তুরস্ক সাম্রাজ্য যদি কোনও যুদ্ধ লিপ্ত না থাকে তাহলে দার্দানালিস ও বস্ফোরাস অঞ্চলে কোনও দেশের যুদ্ধ জাহাজ ঢুকতে পারবে না।

তবু উনিশ শতকের প্রথমার্ধে তুরস্ক সাম্রাজ্য যে 'ইয়োরোপের রুগ্ন মানুষ' হয়ে উঠেছিল, সে কথা সহজেই বোঝা যায়। তাকে সমস্যা মীমাংসার জন্য নির্ভর করতে হত ব্রিটেন এবং অন্যান্য ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গের উপরে। 1814 খ্রিস্টাব্দে গ্রিসে 'ফিলকে হেটইরিয়া' (Philike Hetaireia) নামে জাতীয় মুক্তি সংঘ প্রতিষ্ঠা, 1821 খ্রিস্টাব্দে মোলদাভিয়া এবং ওয়ালাচিয়া প্রদেশে গ্রিক স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রকাশ, 1822 খ্রিঃ গ্রিসের স্বাধীনতা ঘোষণা, ইয়োরোপীয় দেশগুলির সঙ্গে তুরস্কের যুদ্ধ, শেষপর্যন্ত তুরস্কের পক্ষ থেকে স্বাধীন গ্রিসকে মেনে নেওয়া, 1832 খ্রিঃ রাজা অটোর সিংহাসন লাভ, মিশর-তুরস্ক বিবাদ এবং শেষপর্যন্ত লণ্ডনের সন্ধি দ্বারা মীমাংসা ইত্যাদি ঘটনাবলী থেকেই তা স্পষ্ট। তবে পূর্বাঞ্চল সমস্যার আসল কারণ কিন্তু তুরস্কের দুর্বলতা নয়। আসল কারণ বলকান জাতীয়তাবাদের অভ্যুদয় ও তাদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব এবং অপরপক্ষে ইয়োরোপীয় বৃহৎশক্তিগুলির স্বার্থ ও তাদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব। এইসব কারণে 'পূর্বাঞ্চল সমস্যা' উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তীব্র আকার ধারণ করে।

৩। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ : কারণ, ফলাফল ও তাৎপর্য

সূচনা : 1815 খ্রিস্টাব্দে ভিয়েনা সম্মেলনের পর প্রায় চল্লিশ বছর ইয়োরোপে তেমন বড়ো কোনও যুদ্ধ হয়নি। এমন নয় যে ইয়োরোপীয় দেশগুলির মধ্যে কোনও দ্বন্দ্ব ছিলনা, কিন্তু তৎসত্ত্বেও মোটামুটি শান্তি বজায় ছিল। তবে পূর্বাঞ্চল সমস্যার ফলে বলকান অঞ্চলে কৃষ্ণসাগরের তীরে রুশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে তুর্কি সাম্রাজ্যের বিরোধকে কেন্দ্র ক'রে ইয়োরোপীয় দেশগুলি জড়িয়ে পড়লে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ শুরু হয়। তবে এই যুদ্ধের কারণ

ছিল অতি তুচ্ছ। ফরাসি রাজনীতিক তিয়ের মন্তব্য করেছিলেন যে, ক সন্ন্যাসীকে গ্রোটোর গির্জার চাবি হস্তান্তর করার জন্যেই যেন ক্রিমিয়ার হয়। অধ্যাপক *ডেভিড টমসন* লিখেছেন, "It was a fumbling war, probably unnecessary, largely futile, certainly extravagant, yet rich in unintended consequences". যত তুচ্ছ কারণেই ক্রিমিয়ার যুদ্ধ হোক, এর মধ্যে পূর্বাঞ্চল সমস্যা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের কারণ সত্যই খুব তুচ্ছ ছিল। যিশুখ্রিস্টের জন্মস্থান জেরুজালেম ছিল তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। জেরুজালেমের গ্রোটোর গির্জা ছিল খ্রিস্টানদের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। তুরস্কের অন্তর্গত চার্চগুলির কর্তৃত্ব নিয়ে ল্যাটিন চার্চ (ইতালির) এবং অর্থোডক্স চার্চ (গ্রিক) এই দুই গির্জার মধ্যে রেষারেষি ছিল। ফ্রান্স ল্যাটিনচার্চকে এবং রাশিয়া অর্থোডক্স চার্চকে সমর্থন করত। আঠারো শতকের এক সন্ধির ফলে ফ্রান্স তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্গত জেরুজালেম ও তার সন্নিহিত এলাকার কয়েকটি পবিত্রস্থান সহ গ্রোটোর গির্জার উপর কর্তৃত্ব করার অধিকার লাভ করেছিল। ফরাসি বিপ্লবের সুযোগে সেই কর্তৃত্ব কেড়ে নেয় রাশিয়া তথা গ্রিকচার্চ। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর ক্ষমতাধীন হয়ে তৃতীয় নেপোলিয়ান জেরুজালেমের উপর তাদের পুরাতন অধিকার দাবি করেন এবং তুরস্কের সুলতান তা মেনে নেন। 1853 খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ার জার প্রথম নিকোলাস তুরস্কের কাছে দাবি জানায় যে, সুলতান যেন খ্রিস্টান প্রজাদের ধর্মীয় স্বার্থরক্ষার ক্ষেত্রে জারের একমাত্র অধিকার স্বীকার করে নেন এবং গ্রোটোর চার্চের চাবি রাশিয়াকে অর্পণ করেন। তুরস্ক অসম্মতি জানালে রাশিয়া তুরস্ক সাম্রাজ্যের উত্তরে অবস্থিত মোলডাভিয়া এবং ওয়ালেচিয়া আক্রমণ করে। ফলে তুর্কিসুলতান জারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন (অক্টোবর, 1853)। এই ভাবে তুরস্ক ও রাশিয়ার মধ্যে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ শুরু হয়। সুতরাং ধর্মস্থানকে কেন্দ্র ক'রে বিবাদ ছিল যুদ্ধের প্রত্যক্ষ বা তাৎক্ষণিক কারণ।

কিন্তু এই ধর্মীয় বিবাদ ছিল ক্রিমিয়ার যুদ্ধের অছিলা (Pretext) মাত্র, মৌলিক কারণ নয়। যুদ্ধের প্রকৃত কারণ হলো তুরস্কের সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে রাশিয়ার ক্রমবর্ধমান আগ্রাসী মনোভাব এবং ইয়োরোপের রাষ্ট্রগুলির স্বার্থপ্রণোদিত আচরণ। মনে রাখা দরকার, এই যুদ্ধ শুধুমাত্র রাশিয়া এবং তুরস্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। রাশিয়া মোলডাভিয়া-ওয়ালেচিয়া আক্রমণ করলে অস্ট্রিয়া রুশ-তুর্কি আপস করতে গিয়ে ব্যর্থ হয় এবং ফলে নিরপেক্ষ থাকে। কিন্তু ছ'মাসের মধ্যেই ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও পিয়েডমণ্ড-সার্দিনিয়া তুরস্কের সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষার কথা বলে তুরস্কের পক্ষে যোগাদান করে। আসলে তারা রাশিয়াকে প্রতিহত করতে চেয়েছিল এবং প্রত্যেকের ছিল নিজ নিজ স্বার্থ। ইংল্যাণ্ড বলকান অঞ্চলে রুশ আগ্রাসন চাইত না, রুশ আতঙ্কে ভীত ছিল এবং ভারত সাম্রাজ্য রক্ষার্থে তুরস্ক সাম্রাজ্য বজায় রাখতে চাইত। ফরাসি সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ান ফ্রান্সের

গৌরব বৃদ্ধি, ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে থেকে দেশের অভ্যন্তরে উদারপন্থীদের খুশি করা এবং ধর্মীয় অভিভাবক সেজে ক্যাথলিকদের সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন। পিয়েডমণ্ট-সার্দিনিয়া অস্ট্রিয়ার নিরপেক্ষতার সুযোগে ইতালির ঐক্য আন্দোলনের সমস্যার দিকে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই তাদের দিকে যোগ দিয়েছিল। সুতরাং বৃহৎ শক্তিবর্গের স্বার্থই ছিল ক্রিমিয়ার যুদ্ধের প্রকৃত কারণ। অনেক ঐতিহাসিক সেই কারণে এই যুদ্ধকে 'অপ্রয়োজনীয়' বলেছেন।

যুদ্ধের কারণ প্রসঙ্গে আরও দু'চারটি কথা বলা দরকার। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকেই রাশিয়ার জার তুরস্কের দুর্বলতার সুযোগে তুরস্কের ব্যবচ্ছেদের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তিনি ব্রিটেনের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এ কাজ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু জার নিকোলাসের প্রস্তাব ব্রিটেনের পছন্দ হয়নি। তবে রুশ আগ্রাসন প্রতিহত করার নাম করে ব্রিটেনও 'যুদ্ধং দেহি' মনোভাব গ্রহণ করেছিল। ফরাসি সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ানও নিজের স্বার্থে যুদ্ধ চেয়েছিলেন বলে *এ জে পি টেলার* মন্তব্য করেছেন। অধ্যাপক টেলারের মতে যুদ্ধ ছিল অনিবার্য। সুতরাং অপ্রয়োজনীয় এবং নিষ্ফলা হলেও যুদ্ধ বিনা কারণে হয়নি।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ যদিও কৃষ্ণসাগরের পশ্চিমে এবং বাল্টিকে হয়েছিল, তবুও তুরস্ক-ফ্রান্স-ইংল্যাণ্ড-পিয়েডমণ্ট মিলে যে মিত্রপক্ষ, তার প্রধান আক্রমণ সংঘটিত হয়েছিল ক্রিমিয়া উপদ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সেবাস্তিপোল নৌঘাঁটির উপরে। প্রথমে শীতের প্রকোপে তাদের প্রভূত বিপদ হলেও, শেষপর্যন্ত যুদ্ধে রাশিয়ার চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে। অথচ গোড়ার দিকে তুরস্কের সুলতান জার প্রথম নিকোলাসের চরমপত্র অগ্রাহ্য করলে রাশিয়া মোলদাভিয়া এবং ওয়ালোচিয়া অধিকার করেছিল। তুরস্কের সুলতান যুদ্ধ শুরু করে; সিলিষ্ট্রিয়া অঞ্চলে তুরস্ক ও রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ চলে। তারপর ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সৈন্য রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামলে রাশিয়া দানিয়ুব থেকে সেনা সড়িয়ে নেয়। মিত্র সৈন্য তখন ক্রিমিয়াতে প্রবেশ করে রুশ দুর্গ সেবাস্তিপোল অধিকার করে। বালাক্লাভা ও ইনকার মেইনের যুদ্ধে ইঙ্গ-ফরাসি বাহিনী জয়লাভ করে। রাশিয়া পরাজয় স্বীকার করে।

প্রথম নিকোলাসের মৃত্যুর পর পরবর্তী জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার পরাজয় স্বীকার করে নেন এবং **প্যারিসের সন্ধি** (1856) দ্বারা ক্রিমিয়ার যুদ্ধের অবসান হয়। এই সন্ধির ফলে (i) রাশিয়া তুরস্ককে মোলডাভিয়া, ওয়ালেচিয়া ও বেসারাবিয়া প্রত্যার্পণ করে, (ii) বৃহৎ শক্তিবর্গ তুরস্কের স্বাধীনতা ও সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয়, (iii) তুরস্ককে ইয়োরোপের রাষ্ট্রমণ্ডলের এবং আন্তর্জাতিক আইনের এক্তিয়ারভুক্ত করা হয়, (iv) তুরস্কের সুলতান আধুনিকীকরণে ও ধর্মান্ধতা পরিত্যাগে সম্মত হন, (v) দার্দানেলিস প্রণালীতে শান্তির সময় কোনও দেশের যুদ্ধ জাহাজ চলাচল নিষিদ্ধ হয়, (vi) রাশিয়া

তুরস্কের খ্রিস্টান ইয়োরোপীয় প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণের দাবি ত্যাগ করে, (vii) মোলডাভিয়া এবং ওয়ালেচিয়াকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া হয়, (viii) তুরস্কের সুলতান সার্বিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করে, এছাড়া (ix) কৃষ্ণসাগরের তীরে নৌঘাঁটি নির্মাণে তুরস্ক ও রাশিয়াকে নিষেধ করা হয়।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ কিংবা প্যারিসের সন্ধি বলকান জাতীয়তাবাদীদের সমস্যা যেমন মেটাতে পারেনি তেমনি বৃহৎ শক্তিবর্গের স্বার্থও পূরণ হয়নি। সাময়িকভাবে পরিসমাপ্তি ঘটানো হয় মাত্র। ডেভিড টমসন লিখেছেন যে, এই যুদ্ধ অপ্রয়োজনীয় এবং উদ্দেশ্যহীন হলেও অনাকাঙ্ক্ষিত ফল বহন করে এনেছিল। বস্তুত এর ফলে রাশিয়ার দুর্বলতা ধরা পড়ে, ফ্রান্সের সম্মান বাড়ে, জার্মানি ও ইতালির ঐক্যের পথ প্রশস্ত হয় এবং বলকান সমস্যা নতুন মোড় নেয়। যুদ্ধের তাৎপর্য প্রসঙ্গে আরও মনে রাখা দরকার যে, এই যুদ্ধে তুরস্কের অখণ্ডতা ও স্বাধীনতা স্বীকৃত হলেও মোলদাভিয়া-ওয়ালেচিয়া (বর্তমানে রুমানিয়ার এলাকা) এবং সার্বিয়া কিছুটা স্বাধীনতা অধিকার লাভ করেছিল। ফলে ইয়োরোপীয় শক্তিসমবায় বিরাট ধাক্কা খায়। কিন্তু যা আদৌ মীমাংসা হয়নি তা হলো ইয়োরোপের শক্তিবর্গের মধ্যে দ্বন্দ্ব। *ডেভিড টমসন* লিখেছেন "The outcome of the Crimean War as indecisive as its outset had been casual"। তেমনি বলকান অঞ্চলে নানা জাতির স্পৃহা ও আশা জাতীয়তাবাদেরসৃষ্টি করেছিল তারও সুষ্ঠু মীমাংসা হয়নি।

৪। রুমানিয়া সমস্যা

রুমানিয়া নামে কোনও দেশ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের আগে ইয়োরোপে ছিল না। রুমানিয়ার অধিবাসীরা মোলডাভিয়া ও ওয়ালেচিয়া নামে দুটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। তুরস্কের সাম্রাজ্য থেকে গ্রিস বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন হয়ে গেলে সুলতান আব্দুল আজিজ এক সনদে অ-তুর্কি প্রজাদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিলেও রুমানিয়ান প্রদেশ দুটিতে মৌলবাদী তুর্কিরা ঘোরতর অত্যাচার আরম্ভ করে। ফলে 1830 থেকেই মোলডাভিয়া ও ওয়ালেচিয়া প্রদেশের অধিবাসীরা সংযুক্ত হয়ে একটি জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের ইচ্ছা পোষণ করত। তাদের ভাষা ও ঐতিহ্য ছিল এক, নিজেরা পরিচয় দিত রুমানিয়ান বলে। এটিই হলো রুমানিয়া সমস্যা। রুমানিয়ান জাতির একাংশ অস্ট্রিয়াতেও বসবাস করত। তারাও নিজেদের জন্য নতুন দেশ চাইত। 1850 খ্রিস্টাব্দে তৃতীয় নেপোলিয়ান যখন জেরুজালেমের উপর তার পুরাতন অধিকার দাবি করেন তখন তুরস্কের সুলতান ফ্রান্সের অধিকার মেনে নেন। আবার রাশিয়া সুলতানের উপর চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তুরস্কের অন্তর্ভুক্ত মোলডাভিয়া (Moldavia) ও ওয়ালেচিয়া (Wallachia) প্রদেশ দুটি অধিকার করে। এই ঘটনা থেকে

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ (1854-56) সংঘটিত হলো। যুদ্ধের পর প্যারিসের সন্ধি (1856) অনুসারে রাশিয়া মোলডাভিয়া ও ওয়ালেচিয়া অঞ্চল দুটি তুরস্ককে ফেরৎ দিতে বাধ্য হয়। তবে তুরস্কের অধীনে থেকেও রাজ্য দুটি স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ করে। এই সময় তুরস্কের সুলতান তাঁর সাম্রাজ্যে প্রজাকল্যাণকর শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনে অঙ্গীকারবদ্ধ হলেন। বাস্তবত, তিনি তা পালন করেননি। ফলে বলকান জাতিগুলির মধ্যে তুর্কিবিরোধী মনোভাব জেগে উঠল।

দানিয়ুব নদীর উভয় তীরে অবস্থিত মোলডাভিয়া ও ওয়ালেচিয়া প্রদেশ দুটির জনগণ ধর্মে ও রক্তে, কৃষ্টি ও সভ্যতায় এক ও অভিন্ন ছিল। 1848 খ্রিস্টাব্দে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের প্রভাবে রুমানিয় জাতীয়তাবাদ জেগে ওঠে। তখন ওয়ালেচিয়ার বুখারেস্ট শহরে এক অস্থায়ী জাতীয় সরকারও গঠিত হয়। এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রাণপুরুষ ছিলেন রুমানিয় ঐতিহাসিক নিকোলাস বেলসেস্কো। কিন্তু পরে রুশ ও তুর্কিসেনা যৌথভাবে মোলডাভিয়া ও ওয়ালেচিয়া দখল করে নেয়। তবে ছাত্র আন্দোলনের ফলে রুশ সেনা সরে যায়। তারপর ক্রিমিয়ার যুদ্ধ এবং শেষে প্যারিসের সন্ধিতে প্রদেশ দুটি স্বায়ত্তশাসন পায়। ঐ সন্ধির শর্তানুসারে রুমানিয় ভাষাভাষী বেসারাবিয়া প্রদেশও রাশিয়া ফিরিয়ে দিলে তা মোলডাভিয়া-ওয়ালেচিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়। এবার সুলতানের অবহেলার জন্য তারা তুর্কি-বিরোধী আন্দোলন শুরু করল। জাতীয় প্রতিনিধিরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে, তারা দুটি প্রদেশকে একত্র ক'রে একটি অখণ্ড স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করবে। ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে ফ্রান্স ও রাশিয়া এই দাবি সমর্থন করলেও অস্ট্রিয়া ও ইংল্যাণ্ড এর বিরোধিতা করল। তখন নেতৃবৃন্দ কর্নেল আলেকজাণ্ডার কুজা (Col. Alexander Couza) নামক এক সেনানায়ককে একত্রীভূত রাষ্ট্রের (মোলডাভিয়া ও ওয়ালেচিয়া) নরপতি রূপে মনোনীত করলেন (1859)। এরপর শুরু হলো ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের শলাপরামর্শ। অবশেষে 1861 খ্রিস্টাব্দে ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রবর্গ উক্ত দুটি প্রদেশের মিলনকে স্বীকৃতি জানাল। পরের বছর 1862 খ্রিঃ স্বাধীন প্রদেশ দুটির মিলিত নাম হলো রুমানিয়া। এর রাজধানী হলো বুখারেস্ট। ইংল্যাণ্ড, অস্ট্রিয়া এবং তুরস্ক মোলডাভিয়া ও ওয়ালেচিয়ার সংযুক্তিকরণে আপত্তি করেছিল কারণ তা প্যারিস সন্ধির পরিপন্থী ছিল। অপরপক্ষে ফরাসি সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ান রুমানিয় জনগণের জাতীয়তাবাদী আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। রাশিয়ার জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারও আপত্তি করেন নি। ফলে স্বাধীন রুমানিয়া রাষ্ট্রের সৃষ্টি হলো। আলেকজাণ্ডার কুজা (1859-66) ভূমিদাস প্রথার উচ্ছেদ, মঠ উচ্ছেদ, আধুনিক শিক্ষাবিস্তার ইত্যাদির মাধ্যমে রুমানিয়াকে শক্তিশালী করেন এবং পরবর্তী শাসক ক্যারল (1866-1914)-এর আমলে রুমানিয়ার আরও সমৃদ্ধি ঘটে।

৫। বার্লিন চুক্তি (1878) ঃ পটভূমিকা, শর্ত ও মূল্যায়ন

প্যারিসের সন্ধি পূর্বাঞ্চল সমস্যার কোনও স্থায়ী সমাধান করতে পারেনি। ঘটনা পরম্পরায় বিচার করলেই কথাটি সত্য। প্রথমতঃ, তুর্কি সুলতানি শাসনের স্বরূপ বদলায়নি। প্যারিসের সন্ধি তুরস্কের আভ্যন্তরীণ উন্নয়নে ব্যর্থ। দ্বিতীয়তঃ, বলকান জাতিগুলির জাতীয় আকাঙ্ক্ষার ও আশার বাস্তব রূপায়ন ঘটাতে ঐ সন্ধি ব্যর্থ ছিল। তৃতীয়তঃ, ইয়োরোপীয় বৃহৎ শক্তিবর্গ তাদের স্বার্থপর দৃষ্টিভঙ্গি বদলায়নি।

সর্ব-শ্লাভবাদ ঃ তুরস্কের সুলতানের সংস্কারবিমুখতা এবং অ-মুসলিম প্রজাদের উপর অত্যাচার বলকান জাতীয়তাবাদের প্রেরণা বাড়িয়ে দেয়। বলকান অঞ্চলে অ-তুর্কি প্রজাদের এক বড়ো অংশ ছিল শ্লাভ জাতির। তারা সর্বশ্লাভবাদ (Pan Slavism) আন্দোলন গড়ে তুললে রাশিয়া তাকে সমর্থন জানায়। রুমানিয়ার স্বাধীনতা তাদের উৎসাহিত করে। ক্রমে মণ্টিনিগ্রো, সার্বিয়া, বুলগেরিয়া, বসনিয়া প্রভৃতি এলাকায় আন্দোলন হলে রাশিয়া তা সমর্থন করলেও তুরস্ক বর্বর নীতি নিয়ে সেগুলি দমন করে। 1867 খ্রিস্টাব্দে রাশিয়াতে সর্ব শ্লাভ সম্মেলনও বসেছিল। তবে সর্ব-শ্লাভ আন্দোলনের দুর্বলতা ছিল, তাই এর ফলে বৃদ্ধি পায় বলকানদের মধ্যে ধর্মীয় ও জাতিগত বৈষম্য এবং পারস্পরিক বিবাদ।

বলকান বিদ্রোহ ঃ 1875 খ্রিস্টাব্দে অ্যাড্রিয়াটিক উপকূলে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনাতে, পরে ম্যাসিডোনিয়াতে এবং বুলগেরিয়াতে তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে এবং সুলতান সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে বর্বরোচিতভাবে তা দমন করেন। এই অত্যাচার ইয়োরোপের তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তবে তাদের একদিকে জনমতের চাপ অন্যদিকে নিজেদের জাতীয় স্বার্থ— এই দুই টানা-পোড়েনের মধ্যে কাজ করতে হয়। অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স, জার্মানি ও ইংল্যাণ্ড চেষ্টা চালিয়ে যায় যাতে তুরস্ক বলকান জাতিগুলিকে স্বায়ত্তশাসন দেয় কিন্তু তারা কেউই হস্তক্ষেপ করেনি। ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গের প্রেরিত 'আন্দ্রাসি নোট'-এর জবাবে সুলতান 'কনস্তানতিনোপ্‌ল্ প্রতিশ্রুতি' (1876 খ্রিঃ) দিলেও সংস্কারের প্রতিশ্রুতি আদৌ পালন করেনি।

রুশ-তুর্কি যুদ্ধ ও স্যান স্টিফানোর সন্ধি ঃ রাশিয়া কিন্তু চুপচাপ বসে থাকেনি। তারা প্রথমে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে এক আঁতাত সম্পাদন ক'রে গোপনে উভয়ের মধ্যে যে মতভেদ তা দূর করে। তারপর রাশিয়া বুলগেরিয়া হত্যাকাণ্ড এবং বলকান জাতির উপর অত্যাচারের অজুহাতে তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে (1877 খ্রিঃ)। যুদ্ধে তুরস্ক শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় এবং রাশিয়ার সঙ্গে স্যান স্টিফানোর সন্ধি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয় (1877)। এর ফলে সার্বিয়া, মণ্টিনিগ্রো স্বাধীন হয়। রাশিয়া ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ এবং অনেক রাজ্য লাভ করে। পরিণতিতে বৃহৎ বুলগেরিয়া রাজ্য গঠিত হয় এবং বলকানে রুশ প্রভাব বৃদ্ধি

পায়। পক্ষান্তরে স্যানস্টিফানোর সন্ধির দ্বারা তুরস্ক ইয়োরোপের বলকান অঞ্চলের উপর প্রতিপত্তি হারাল এবং ঐ অঞ্চলে রাশিয়ার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেল। তাই এই সন্ধি ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া প্রমুখ শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলিকে খুশি করতে পারল না। **প্রথমতঃ**, ইংল্যাণ্ড নৌ-বাণিজ্যে ও ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যে শক্তিশালী। রাশিয়া যদি বলকান অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করে ও ভূমধ্যসাগরে অবাধে প্রবেশ করতে পারে তাহলে ইংল্যাণ্ডের স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়। সুতরাং ইংল্যাণ্ড এই সন্ধি বাতিল করার জন্য রাশিয়ার উপর চাপ সৃষ্টি করে। **দ্বিতীয়তঃ**, রুশ-তুরস্ক যুদ্ধে রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া রাইখস্ট্যাণ্ডে এক গোপন চুক্তি করে। সেই চুক্তি অনুসারে যুদ্ধের সময় অস্ট্রিয়া ছিল নিরপেক্ষ। যুদ্ধের পর গোপন চুক্তি অনুসারে রাশিয়া অস্ট্রিয়াকে তুরস্ক থেকে বিজিত অংশের ভাগ দিল না। অন্যদিকে বুলগেরিয়ার সীমানা বর্ধিত হওয়ায় অস্ট্রিয়ার সীমান্তে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। ফলে ইংল্যান্ডের মত অস্ট্রিয়াও সন্ধির শর্ত পাল্টাবার জন্য চাপ সৃষ্টি করবে। **তৃতীয়তঃ**, ইংল্যাণ্ড ও অস্ট্রিয়ার চাপের নিকট রাশিয়া যাতে নতি স্বীকার করে সেই উদ্দেশ্য নিয়ে এই সময় এগিয়ে এলেন জার্মানির প্রধানমন্ত্রী বিসমার্ক। 1870 খ্রিস্টাব্দে জার্মানির ঐক্য বিধানের পর তিনি ইয়োরোপে শান্তি ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

তাই বিসমার্ক জার্মানির বার্লিনে ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গের এক অধিবেশন আহ্বান করেন। স্যানস্টিফানোর সন্ধির ফলে রাশিয়ার যে লাভ হয় তা অস্ট্রিয়া, ব্রিটেন, ফ্রান্স, কেউই পছন্দ করে নি। বলকান অঞ্চলে রুশ প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে ব্রিটেন ও অস্ট্রিয়া যুদ্ধে আগ্রহী ছিল। তখন জার্মানির বিসমার্ক এক কংগ্রেস ডেকে 'সাধু দালাল' (honest broker)-এর ভূমিকা নেন। জার্মানির এই আন্তর্জাতিক কংগ্রেস ডাকার কারণ ছিল এই যে, যদি অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ হত তাহলে বিসমার্কের 'ড্রাইকাইজারবুণ্ড' বা তিন সম্রাটের চুক্তি ভেঙে যেত। ফ্রান্সকে মিত্রহীন করে রাখার জার্মান পররাষ্ট্রনীতি তাহলে ব্যহত হত। এজন্য বার্লিন কংগ্রেস ডাকা হলো। সেখানে বিসমার্ক ছাড়াও ব্রিটেনের ডিসরেলি এবং সলস্‌বেরি, রাশিয়ার গোরস্‌চাকফ্‌, ফ্রান্সের ওয়ারিংটন, অস্ট্রিয়ার আন্দ্রেসি এবং ইতালির কোর্তি উপস্থিত ছিলেন। বার্লিন কংগ্রেস আলাপ আলোচনার পর এক চুক্তি স্বাক্ষর করে। ইতিহাসে তা বার্লিন চুক্তি (The Treaty of Berlin) নামে খ্যাত (1878)। বার্লিন সন্ধিতে যে-সব শর্ত গৃহীত হয় সেগুলি হলো: (i) মন্টিনিগ্রো, সার্বিয়া ও রুমানিয়া স্বাধীনতা লাভ করল। (ii) স্যানস্টিফানোতে স্বীকৃত বৃহৎ বুলগেরিয়াকে তিন অংশে বিভক্ত করা হলো, যেমন, (ক) ম্যাসিডোনিয়া অঞ্চল তুরস্ককে দেওয়া হলো, (খ) পূর্ব রুমানিয়া তুরস্কের অধীনে একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলরূপে গণ্য হলো। তুরস্ক এই অঞ্চল শাসনের জন্য একজন খ্রিস্টান শাসক নিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিল। (গ) বাকি অংশটুকু বুলগেরিয়া নামে একটি পৃথক রাষ্ট্ররূপে গণ্য হলো। (iii) বসনিয়া ও হার্জেগোভিনাকে অস্ট্রিয়ার নিয়ন্ত্রণে অর্পণ করা হলো। (iv) রাশিয়া পেল আর্মেনিয়ার কিয়দংশ এবং কারস, বাটুম ও বেসারাবিয়া

অঞ্চল। (v) রুমানিয়াকে দোব্রুজা (Dobrudja) নামক স্থানটি দেওয়া হলো। (vi) ইংল্যাণ্ড পেল সাইপ্রাস দ্বীপ। (vii) ফ্রান্স যাতে উত্তর আফ্রিকার টিউনিস পেতে পারে এরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলো। (viii) গ্রিস যাতে থেসালী (Thessaly) ও এপিরাস (Epirus) পেতে পারে তার ব্যবস্থা করার জন্য তুরস্কের সুলতানকে সুপারিশ করা হলো।

অবশ্য বার্লিন চুক্তির দ্বারা বলকান সমস্যা বা নিকট প্রাচ্য সমস্যার সমাধানের আন্তরিক প্রচেষ্টা হলো না। তবে ইংল্যাণ্ডের প্রাধানমন্ত্রী ডিসরেলি অবশ্য বলেছিলেন যে, "আমি সসম্মানে শান্তিপ্রতিষ্ঠা করেছি।" ইংল্যাণ্ডের দৃষ্টিকোণ থেকে কথাটা বহুলাংশে সত্য। কারণ, এই সন্ধিতে সর্বাধিক লাভবান হলো ইংল্যাণ্ড। কিন্তু লক্ষ্য করা যায়, 1878 এরপর থেকে প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত এই বলকান অঞ্চলই হলো ঝটিকা কেন্দ্র। এই কেন্দ্র থেকে ঝড় উঠেই বিশ্বে প্রলয়কাণ্ড ঘটালো। প্রথমেই, তুরস্কের ভৌগোলিক অক্ষুণ্ণতা বজায় রাখার জন্যে এই সন্ধি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু তুরস্কের প্রায় অর্ধেকটাই স্বাধীন হয়ে গেল। সুতরাং তুরস্ক সম্পর্কে মূলত অবিচার করা হলো। এদিকে রাশিয়া এই সন্ধিতে মোটেই খুশি হতে পারেনি। কারণ বলকান অঞ্চলে তার আগ্রাসী নীতি প্রতিহত হলো। স্যানস্টিফানোর সন্ধিতে রাশিয়ার যে লাভ হয়েছিল তা তাকে হারাতে হলো। তাছাড়া এই সন্ধিতে বলকান জাতীয়তাবাদীদের আশা পূর্ণ হলো না। ম্যাসিডোনিয়ার জাতীয় আশাও পূর্ণ হলো না। এই অঞ্চলটি চলে গেল তুরস্কের নিয়ন্ত্রণাধীনে। পূর্ব রুমেলিয়া তুরস্কের অধীনে স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলরূপে থেকে গেল। বসনিয়া ও হার্জেগোভিনাকে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হলো। এখানকার শ্লাভ জাতি সার্বিয়ার শ্লাভদের সঙ্গে মিলিত হবার আশা করত। ফলে সার্বিয়ার সঙ্গে অস্ট্রিয়ার দ্বন্দ্ব স্বাভাবিক হয়ে উঠল। তাহলে দেখা যাচ্ছে, বলকানে যে কটি স্বাধীন রাষ্ট্র হলো তাদের মধ্যেও স্বার্থগত দ্বন্দ্ব ক্রমশ প্রখর হতে থাকে। আবার তুরস্ক সাম্রাজ্যের মধ্যে এই সময় "তরুণ তুর্কি" দলের আবির্ভাব ঘটল। তুর্কিকরণই ছিল তাদের আদর্শ। ফলে খ্রিস্টান প্রজাদের উপর তাদের অত্যাচার বৃদ্ধি পেল। এদিকে এই সময় জার্মানির কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম সম্প্রসারণের নীতি অবলম্বন করেন। তিনি জার্মানির বার্লিন থেকে বাগদাদ পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। এর ফলে সমস্যা আরও জটিল হলো। ফলতঃ বার্লিন কংগ্রেস বলকান জাতীয়তাবাদের সমস্যা সমাধান করতে তো পারেই নি বরং বহু নতুন প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র তৈরি করেছিল, যেমন অস্ট্রো-রুশ, অস্ট্রো-বুলগেরিয়া, সার্বো-বুলগেরিয়া, অস্ট্রো-সার্বিয় ইত্যাদি সমস্যা বেড়ে যায়। সর্বোপরি বিসমার্ক যদিও নিরপেক্ষ ছিলেন কিন্তু রাশিয়া মনে করল জার্মানি অস্ট্রিয়ার প্রতি পক্ষপাত দেখিয়েছে। এই অভিযোগ তুলে তারা 'তিন সম্রাটের চুক্তি' থেকে বেরিয়ে আসে। ফলে বিসমার্কের পররাষ্ট্রনীতিতে পরিবর্তন দেখা যায়। তিনি প্রথমে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে দ্বৈত চুক্তি (1879) এবং পরে ইতালিকে নিয়ে 'ত্রিপাক্ষিক চুক্তি' (Triple Alliance) করতে বাধ্য হন।

অধ্যাপক *এ. জে. পি. টেলার* মনে করেন যে, বার্লিন কংগ্রেস ইয়োরোপের ইতিহাসের এক জল বিভাজিকা অর্থাৎ নতুন যুগের সন্ধিক্ষণ। এর সামনে রয়েছে তিরিশ বছরের দ্বন্দ্ব এবং পিছনে রয়েছে চৌত্রিশ বছরের শান্তি।[1] *ল্যাঙ্গার*-এর মতে বার্লিন কংগ্রেসের ফলেই ইয়োরোপীয় কূটনীতির পরিবর্তন হয়। *ম্যারিয়ট*-এর মতে ব্রিটেনের চেষ্টাতেই অনিবার্য ধ্বংসের হাত থেকে তুরস্ক রক্ষা পায় বটে তবে এর ফলে বলকান অঞ্চলে নতুন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। *ডেভিড টমসন* ঠিকই লিখেছেন যে, বার্লিন কংগ্রেস প্রত্যেকটি দেশকেই অধিকতর অসন্তুষ্ট ও উদ্রগ্রীব করে ("It left each power dissatisfied and more anxious than before")।[2]

বার্লিন কংগ্রেস প্রসঙ্গে ডেভিড টমসনের একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন যে, বার্লিন কংগ্রেস 'was significant more for its effects on the alignments of the great powers than for its efforts to 'settle' the fate of Turkey'। অর্থাৎ তুরস্কের ভাগ্য 'নির্ধারণ' করার প্রচেষ্টার চেয়েও বৃহৎ শক্তিগুলির মৈত্রী বা জোট গড়ার উপর প্রভাবের ক্ষেত্রে অধিক তাৎপর্য প্রভাব ফেলেছিল বার্লিন কংগ্রেস। যেহেতু প্রত্যেক বৃহৎ শক্তিই আগের চেয়ে অধিক উদ্বিগ্ন এবং অসন্তুষ্ট হলো 1878 এবং পরে, তাই আন্তর্জাতিক জটিলতাও বৃদ্ধি পেল। সুতরাং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডিসরলি যতই শান্তি ও সম্মান ফিরিয়ে আনার কথা বলুন কার্যত তা হয়নি। বলকানের অশান্তি আন্তর্জাতিক অশান্তির সৃষ্টি করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পথ সুগম করে।

৬। বুলগেরিয়ান সমস্যা

বার্লিন সন্ধি (1878) বলকান জাতীয়তাবাদীদের মনে হতাশার সৃষ্টি করে। অন্যদিকে এই সন্ধির শর্ত পূরণের জন্য ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রশক্তিগুলি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। বার্লিন সন্ধির শর্ত অনুসারে বুলগেরিয়াকে দু'ভাগ করে পূর্ব রুমেলিয়া নামে একটি অর্ধস্বাধীন রাষ্ট্র সৃষ্টি করা হয়। বাস্তবত, পূর্ব রুমেলিয়াকে তুরস্কের অধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলরূপে থাকতে হলো। অথচ নতুন তৈরি এই পূর্ব রুমেলিয়ার কৃষ্টি, ভাষা, সংস্কৃতি ছিল বুলগেরিয়ার সমগোত্রীয়। স্বার্থপর ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গ বুলগেরিয়াকে দুর্বল করে রাখার জন্যে এইভাবে তার একটি অংশকে পৃথক করে দিয়েছিল। বার্লিন সন্ধির পরে 1879 খ্রিস্টাব্দে উভয় রাষ্ট্রের জনগণ কৃত্রিম ব্যবচ্ছেদকে অস্বীকার করে বুলগেরিয়ার নরপতি ব্যাটেনবর্গ আলেকজাণ্ডারকে উভয় রাষ্ট্রের নরপতি হিসেবে স্বীকৃতি জানালো। এই যুবরাজ ছিলেন জার্মান-ভাষী এবং রুশ-বিরোধী। তিনি বুলগার সংবিধান এবং বুলগার

---

1. এ. জে. পি টেলার, *দ্য স্ট্রাগল ফর মাস্টারি ইন ইয়োরোপ*, অক্সফোর্ড, 1965, পৃ 255

2. ডেভিড টমসন, পূর্বোল্লিখিত পৃ. 466

পার্লামেন্টের সাহায্যে বুলগেরিয়াতে রাশিয়ার আধিপত্য বিস্তারের পথে বাধার সৃষ্টি করেন। এজন্য তিনি ব্রিটেনে সাহায্য প্রার্থনা করেন। ব্রিটেন উপলব্ধি করে যে, বলকান অঞ্চলে রুশ আগ্রাসন প্রতিরোধের জন্য ক্ষয়িষ্ণু তুরস্ক সাম্রাজ্য অপেক্ষা বলকান জাতীয়তাবাদের উপর নির্ভর করাই শ্রেয়। আলেকজাণ্ডার ব্রিটেনের সমর্থন পাওয়ার পর 1885 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পূর্ব রুমেলিয়া জয় করে অখণ্ড বুলগেরিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন। তুরস্ক বিব্রত হলেও ব্রিটেনের চাপে কিংবা নিজেদের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার কথা ভেবে বুলগেরিয়া আক্রমণে সাহসী হয়নি। রুশ জার তৃতীয় আলেকজাণ্ডারও বুলগেরিয়া আক্রমণ করেননি। এদিকে বুলগেরিয়ার আয়তন বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রতিবেশী রাষ্ট্র সার্বিয়া ক্ষুব্ধ ও ঈর্ষান্বিত হলো। বলকানের শক্তিসাম্য বিনষ্ট হচ্ছে এই অজুহাতে সার্বিয়া উভয় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল (1885); কিন্তু তিন দিনের যুদ্ধে সার্বিয়ার পরাজয় হলো। অস্ট্রিয়া এই অবস্থায় সার্বিয়ার পক্ষে যোগদান করল। সমস্যা যখন গুরুতর হলো তখন ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গের মধ্যস্থতায় উভয়পক্ষে শান্তি স্থাপিত হলো। তারা বুলগেরিয়া ওরুমেলিয়ার মিলনঅনুমোদন করল। সঙ্গে সঙ্গে তুর্কি সুলতানও এই মিলনকে অনুমোদন দিলেন। এভাবেই 1886 খ্রিস্টাব্দে উভয় রাষ্ট্রের মিলন ঘটল।

কিন্তু এই মিলন রাশিয়ার মনঃপুত হলো না। রাশিয়া তাই বুলগেরিয়ার কয়েকজন রাজপুরুষকে প্ররোচিত করে তাদের দ্বারা আলেকজাণ্ডারকে সিংহাসনচ্যুত করল। অবশেষে ফার্দিন্যাণ্ড নামক এক নরপতিকে সিংহাসনে বসিয়ে বুলগেরিয়া ও রুমেলিয়ার অধিবাসীরা তাদের আশা পূরণ করে। 1886 খ্রিস্টাব্দে বুলগার পার্লামেণ্ট স্যাক্স-কোবার্গ বংশীয় ফার্দিন্যাণ্ডকে রাজা হিসেবে নির্বাচন করেন। তিনি 1918 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মন্ত্রী স্ট্যামবুলভ-এর সহায়তায় বুলগেরিয়া শাসন করেন। আলেকজাণ্ডারের পদচ্যুতি ও ফার্দিন্যাণ্ডের সিংহাসন লাভের পরেও ইয়োরোপের বৃহৎ শক্তিবর্গের পারস্পরিক স্বার্থ-দ্বন্দ্ব বুলগেরিয়া সমস্যাকে আরও জটিল ক'রে তুলেছিল।

৭। বার্লিন-বাগদাদ রেলপথ পরিকল্পনার মাধ্যমে জার্মানির সম্প্রসারণ

জার্মানির কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম (1888-1918) পূর্বতন প্রশাসক বিসমার্কের আদর্শ ও নীতি ত্যাগ করে আক্রমণাত্মক সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করেন। জার্মানিকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করাই ছিল তাঁর ইচ্ছা। নিকট প্রাচ্যে ক্ষয়িষ্ণু তুরস্কের উপরও তিনি প্রভাব বিস্তার করলেন। 1894-96 খ্রিস্টাব্দে যখন আর্মেনিয়ার খ্রিস্টান প্রজাদের উপর তরুণ তুর্কিরা অকথ্য অত্যাচার করে তখন কাইজার তুরস্কের সুলতানের সঙ্গে মিত্রতা করে সুবিধা আদায়ে তৎপর হলেন। তিনি নিজেই 1898 খ্রিস্টাব্দে সিরিয়ায় উপস্থিত হয়ে নিজেকে ইসলামের রক্ষক হিসেবে ঘোষণা করেন। এর বিনিময়ে বার্লিন

থেকে বাগদাদ পর্যন্ত সুদীর্ঘ রেলপথ স্থাপনের পরিকল্পনায় সুলতানের স্বীকৃতি আদায় করেন। পরিণতিতে পূর্বাঞ্চলে জার্মানির রাজনৈতিক ও আর্থিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেল। এতদিন রাশিয়া এবং ইংল্যাণ্ড তুরস্কে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল তাকে ক্ষুণ্ণ করে জার্মানি সেখানে প্রতিপত্তি বিস্তার করতে সক্ষম হলো। আসলে বাগদাদ-বার্লিন রেলপথ নির্মাণের পিছনে জার্মানির সম্প্রসারণবাদ কাজ করেছিল। এই সম্প্রসারণের চাপ সৃষ্টি হয়েছিল অনেক কারণে। জার্মানি ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পর জার্মানির শিল্প পুঁজিবাদের দ্রুত উন্নতি ঘটে। রসায়ন শিল্পে, যন্ত্রশিল্পে, অস্ত্রনির্মাণে পণ্যের উৎপাদন বিপুল বৃদ্ধি পায়। অথচ সারা বিশ্বে তাদের আদৌ উপনিবেশ ছিল না যেখানে তারা পণ্য বিক্রির বাজার গড়ে তুলতে পারে। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের কাছে বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক দ্বন্দ্বে পিছিয়ে পড়া জার্মানি তাই পূর্ব ইয়োরোপ এবং তুরস্কের বাজার দখল করতে চেয়েছিল। তাছাড়া বাগদাদ হয়ে তারা পারস্য উপসাগর দিয়ে এশিয়াতে ও মধ্য প্রাচ্যেও পৌঁছতে চেয়েছিল। সুতরাং রাজনৈতিক সম্মান ও মর্যাদা ছাড়াও ছিল জার্মান শিল্পগোষ্ঠীর চাপ। আবার বার্লিন কংগ্রেসের পর ব্রিটেন ও রাশিয়ার সঙ্গে তুরস্কের সম্পর্কের অবনতির সুযোগ নিয়েছিল জার্মানি। জার্মানির এই রেলপথ নির্মাণে অবশ্য ব্রিটেন-ফ্রান্স-রাশিয়া বাধা দেওয়ার ফলে পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে বিলম্ব হয়।

৮। আর্মেনিয়ান সমস্যা

ক্যাস্পিয়ান ও কৃষ্ণসাগরের (Black Sea) মধ্যস্থলে অবস্থিত আর্মেনিয়ার অংশটুকু ছিল তুর্কি সুলতানের অধীন। এখানকার অধিকাংশ অধিবাসী ছিল খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী। বার্লিন সন্ধির (1878) শর্তে এই অংশটি তুরস্কের অধীনে রাখা হয়। ঐ একই সন্ধি-শর্তে সুলতান এখানে জনকল্যাণমূলক শাসন প্রবর্তন করে অধিবাসীদের উপর সদয় ব্যবহারের প্রতিশ্রুতি দেন। বাস্তব ক্ষেত্রে সুলতান সেই প্রতিশ্রুতি পালন করেননি। ফলে এখানকার অধিবাসীরা সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। (1893)। কৃষ্ণসাগরের দক্ষিণ পূর্ব উপকূলে ও রুশ অধিকৃত অঞ্চলে বহু আর্মেনিয় বাস করত। তারা ছিল ক্যাথলিক খ্রিস্টান এবং তাদের উপাসনার স্থানও ছিল। তাছাড়া সুলতান আবদুল হামিদ আর্মেনিয় প্রজাদের মুসলিম কুর্ড উপজাতির আক্রামণ থেকেও রক্ষা করেন নি। বরং প্রতিক্রিয়াশীল সংস্কারবিমুখ সুলতানও নিষ্ঠুরভাবে বিদ্রোহ দমনের ব্যবস্থা করলেন। 1894 থেকে 1896 খ্রিস্টাব্দে তুর্কি সুলতান আর্মেনিয়ান খ্রিস্টানদের উপর অকথ্য অত্যাচার করলেন। ইয়োরোপীয় খ্রিস্টান নরপতিদের পক্ষ থেকে অনেকেই প্রতিবাদ করলেন, কিন্তু কেউ প্রতিকারের ব্যবস্থা করলেন না। অন্যদিকে প্রতিবাদ না করে জার্মানির কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম তুরস্কের সঙ্গে মিত্রতা আদায় করলেন। ইয়োরোপীয় নরপতিদের নির্লিপ্ততার ফলে সুলতানের অত্যাচারে জর্জরিত আর্মেনিয়ান খ্রিস্টানরা যেন জ্বলন্ত অগ্নিপিন্ডের রূপ ধারণ করল।

বস্তুতপক্ষে 1893 এবং 1896 খ্রিস্টাব্দে আর্মেনিয়ার খ্রিস্টান ধর্মামলবম্বী মানুষজন যখন বিদ্রোহ করেছিল এবং বর্বরোচিতভাবে তুরস্ক সেই বিদ্রোহগুলি দমন করেছিল তখন ইয়োরোপীয় বৃহৎ শক্তিবর্গ আপন-আপন স্বার্থে মগ্ন ছিল। ফলে আর্মেনিয়ান সমস্যা আদৌ সমাধান হয়নি। জার্মানির কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম নিজেদের অর্থনৈতিক ও ঔপনিবেশিক স্বার্থে প্রাচ্যের সঙ্গে যোগাযোগ ও বার্লিন-বাগদাদ রেললাইন তৈরিতে ব্যস্ত ছিল, সুতরাং তারা মিত্র তুর্কিদের বিরুদ্ধে নীরব ছিলেন। অস্ট্রিয়া জার্মানির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছিলো। রাশিয়া আর্মেনিয়ার বিপ্লবী অভ্যুত্থানের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র আগ্রহী ছিল না কেননা আর্মেনিয়ান চার্চ ছিল আলাদা। তাছাড়া বুলগেরিয়ার ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে তাদের অভিজ্ঞতা সুখকর ছিল না। গ্রেটব্রিটেন প্রতিবাদ করেছিল কিন্তু আর্মেনিয়ার সাহায্যে এগিয়ে আসে নি। ফ্রান্সও একই নীতি অবলম্বন করল। সুতরাং ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গের পারস্পরিক ঈর্ষা ও নিষ্ক্রীয়তা তুরস্ককে প্রকারান্তরে সাহায্য করে।

৯। তরুণ তুর্কি আন্দোলন

1908 খ্রিস্টাব্দে তুরস্কে 'তরুণ-তুর্কি' আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। তুর্কিরা ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত। এই 'তরুণ তুর্কি' দলের মূলত দুটি উদ্দেশ্য ছিল, যথা— (1) পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক ধারায় তুরস্কে নতুন শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন এবং (2) বিদেশী প্রভাব থেকে মুক্ত করে তুরস্ককে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটি প্রগতিশীল রাষ্ট্রে পরিণত করা। অর্থাৎ অটোম্যান সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ সংস্কার সাধন করে একে এক আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করাই ছিল তাদের মৌলিক উদ্দেশ্য। তরুণ-তুর্কি আন্দোলনের মূল লক্ষ্য এককথায় ছিল দ্বিতীয় আবদুল হামিদের সুলতানি শাসনের অবসান ঘটিয়ে সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ সংস্কার সাধন। কারণ পাশ্চাত্য-শিক্ষিত তরুণদল হামিদের প্রতিক্রিয়াশীল স্বৈরতান্ত্রিক ও মধ্যযুগীয় শাসনে হতাশা বোধ করেছিল। যেহেতু এই আন্দোলনের নেতৃত্ব ছিল জাতীয়তাবাদী ছাত্র-যুবসমাজের হাতে তাই ইতিহাসে তারা 'তরুণ-তুর্কি' বা 'ইয়াং-টার্ক' নামে পরিচিত। প্রথম দিকে তারা কিছু গুপ্ত সমিতি গঠন করে প্রচার চালালেও 1876 খ্রিস্টাব্দে সংবিধান প্রবর্তনের দাবি করে। সৈন্য বাহিনীদের সমর্থনও তরুণ-তুর্কি নেতারা লাভ করেন। সুলতান আবদুল হামিদ 1908 খ্রিস্টাব্দে জাতীয় পার্লামেন্ট ডাকতে সম্মত হলেও অচিরেই তিনি রক্ষণশীলদের সাহায্যে পার্লামেন্ট ভেঙে দেন এবং তরুণ তুর্কিদের দমনের চেষ্টা করেন। ফলে শেষপর্যন্ত তরুণ তুর্কি দল তাকে পদচ্যুত ও বন্দী করে তার ভ্রাতা পঞ্চম মহম্মদকে সুলতান হিসেবে ঘোষণা করল। তারপর সুলতানের তুর্কিকরণ নীতি এবং পার্লামেন্ট কর্তৃক বহু সংস্কার কার্য গ্রহণ কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুসলিম সমাজের গোড়ামির ফলে সংস্কারগুলির ব্যর্থতা তুরস্কের উন্নতি ঘটায় নি। এগুলি তুরস্ক সাম্রাজ্যের

আভ্যন্তরীণ ব্যাপার হলেও কতকগুলি আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও তুরস্কের ডামাডোলের সুযোগে ঘটেছিল। এখানে প্রধান চারটি ঘটনার উল্লেখ করা হলো—

(১) বুলগেরিয়া বার্লিন সন্ধি অগ্রাহ্য করে (1908) পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করে। পরের বছর (1909) তুরস্ক বাধ্য হয়ে বুলগেরিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করল।

(২) বার্লিন সন্ধিতে (1878) অস্ট্রিয়াকে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার উপর নামমাত্র শাসনের অধিকার দেওয়া হয়েছিল। তুরস্কের গৃহ বিবাদের সুযোগ নিয়ে অস্ট্রিয়া উক্ত দুটি অঞ্চল পুরোপুরি নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করল।

(৩) অস্ট্রিয়ার এই কাজে সার্বিয়ার অসন্তোষ বৃদ্ধি পেল। জাতিগোষ্ঠীর বিচারে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার অধিবাসীরা ছিল সার্বিয়ার জাতি-গোষ্ঠীর সমগোত্রীয়। অস্ট্রিয়া এই কাজে জার্মানি, ফ্রান্স, রাশিয়া, ও ইংল্যাণ্ডের সম্মতি ছিল। তাই সার্বিয়াকে নীরবে অপমান সহ্য করতে হলো। মনে রাখা প্রয়োজন, সার্বিয়া ও অস্ট্রিয়ার এই দ্বন্দ্বের ফলেই পরবর্তীকালে মহাযুদ্ধের সূত্রপাত।

(৪) তুরস্কের দুর্দিনে অন্যান্য রাষ্ট্রশক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করছে লক্ষ্য ক'রে ইতালি তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল (1911) এবং যুদ্ধে ইতালি আফ্রিকার কয়েকটি অঞ্চল অধিকার করল। পরাজিত তুরস্ক বাধ্য হয়ে লুসান-এর সন্ধিতে (1912) স্বাক্ষর করল এবং আফ্রিকার ত্রিপোলি ইতালির হস্তে অর্পণ করল।

১০। প্রথম ও দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ

প্রথম বলকান যুদ্ধ ও লণ্ডনের সন্ধি ঃ তরুণ তুর্কি দলের নেতৃবর্গ প্রথম স্তরে গণতান্ত্রিক নীতি প্রবর্তনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু তুরস্কের ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা লক্ষ্য করে তারা 'তুর্কিকরণ' (Turkification) নীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিল। এই নীতি অনুসারে তারা তুরস্কের অ-মুসলিম জাতিগোষ্ঠীর উপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করল। এরই ফলে ম্যাসিডোনিয়া ও আলবেনিয়ায় খ্রিষ্টানরা অকথ্য অত্যাচারের সম্মুখীন হলো। এই অত্যাচারের প্রতিবাদে সার্বিয়া, বুলগেরিয়া, মন্টিনিগ্রো এবং গ্রিস ঐক্যবদ্ধ হয়ে 'বলকান লীগ' গঠন করল (1912 খ্রিঃ)।

এখানে আরও মনে রাখা দরকার যে, বলকান অঞ্চলে কিছু সমস্যা আগে থেকেই ছিল। বুলগেরিয়া বার্লিন সন্ধির দ্বারা তার ব্যবচ্ছেদকে অস্বীকার করে পূর্ব রুমেনিয়াকে তার সঙ্গে যুক্ত করে শক্তি বাড়ায়। এতে সার্বিয়া ইর্ষান্বিত হয়ে বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেও পরাজিত হয়। পরে তুর্কি সুলতান বৃহত্তর বুলগেরিয়া এবং তার স্বাধীনতা মেনে নেন। ক্রিট দ্বীপ নিয়ে তুরস্ক ও গ্রিসের মধ্যে বিবাদে দ্বীপটি গ্রিসের সঙ্গে যুক্ত না হওয়াতে গ্রিস অসন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু যতই নিজেদের অসন্তুষ্টি থাক, তরুণ তুর্কি আন্দোলনের পরে যখন পূর্ব ইয়োরোপের দেশগুলিতে খ্রিস্টান প্রজাদের উপর ইসলাম ধর্মাবলম্বী তুরস্ক

বীভৎস অত্যাচার শুরু করল, তখন সেই সুযোগে বলকান জাতিগুলি নিজেদের রাজনৈতিক স্পৃহা পূরণ করার সংকল্প নেয়। এজন্যই 'বলকান লীগ' তৈরি হয়। ইতিহাসবিদ *ফে (Fay)* লিখেছেন যে, রাশিয়াও গোপনে লীগকে প্ররোচণা দিয়েছিল, কারণ দার্দানালিস প্রণালীতে অবাধে রুশ জাহাজের চলাচল আন্তর্জাতিক কনভেনশন দ্বারা নিষিদ্ধ হওয়াতে রাশিয়া অসন্তুষ্ট ছিল এবং বলকান অঞ্চলে যুদ্ধ চাইছিল।

যাই হোক, বলকান লীগ প্রথমে ম্যাসিডোনিয়ার খ্রিস্টান প্রজাদের উপর অত্যাচার বন্ধের দাবি জানালো। তুরস্ক সেই আবেদনে কর্ণপাত করল না। তখন তারা তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। এটিই প্রথম বলকান যুদ্ধ (1912) নামে পরিচিত। বুলগেরিয়া, সার্বিয়া, মন্টিনিগ্রো এবং গ্রিস, বলকান লীগের চার সদস্য তুরস্ককে চার দিক থেকে আক্রমণ করায় তুর্কি বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলো। অবশেষে 1913 খ্রিস্টাব্দে লণ্ডনের সন্ধিতে প্রথম বলকান যুদ্ধের অবসান হলো। এই সন্ধিতে ঠিক হলো ঃ (১) একমাত্র থ্রেস ও কনস্ট্যানটিনোপল্ ব্যতীত বলকান অঞ্চলের সমগ্র ভূখণ্ডই তুরস্ককে বলকান লীগের হস্তে অর্পণ করতে হবে। (২) ক্রিটকে গ্রিসের হস্তে অর্পণ করতে হবে এবং (৩) অস্ট্রিয়ার একান্ত আগ্রহে সার্বিয়ার ক্ষমতা খর্ব করার জন্যআলবেনিয়াকেস্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি জানানো হয়।

দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ ঃ প্রথম বলকান যুদ্ধের পরে ঈজিয়ান সমুদ্র থেকে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত এলাকা তুরস্ক বলকান লীগের হাতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। প্রথম বলকান যুদ্ধে মূল ব্যাপার যেমন ছিল তুরস্কের সঙ্গে বলকান রাজ্যগুলির বিবাদ, তেমনি বলকান রাজ্যগুলির আভ্যন্তরীণ বিবাদ থেকেই দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধের সূত্রপাত। তুরস্ককে পরাজিত করার পর বলকান অঞ্চলের ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে বলকান লীগের সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হলো। এর ফলে শুরু হলো দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ (1913)। লণ্ডন সন্ধিতেই সার্বিয়ার দাবি অগ্রাহ্য করে অস্ট্রিয়ার দাবিকে মেনে নেওয়ার হয়। কারণ অস্ট্রিয়ার চাপেই সার্বিয়াকে খর্ব করতে স্বাধীন আলবেনিয়া রাজ্য গঠিত হয়।

এবার সার্বিয়া উক্ত ক্ষতিপূরণের উদ্দেশ্যে ম্যাসিডোনিয়া প্রাপ্তির দাবি জানালো। কিন্তু ম্যাসিডোনিয়ার জনসংখ্যার অধিকাংশই ছিল বুলগার। সুতরাং বুলগেরিয়াও ম্যাসিডোনিয়া প্রাপ্তির দাবি জানালো। সার্বরা ম্যাসিডোনিয়ার দাবি পরিত্যাগ করতে অস্বীকার ক-
বুলগেরিয়া সার্বিয়া আক্রমণ করে। ফলেই দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধের সূত্রপাত -
মন্টিনিগ্রো, গ্রিস, রুমানিয়া সার্বিয়ার পক্ষে যোগদান করে। ঠিক এ-
তুরস্ক কিছু হৃত ভূখণ্ড পুনরাধিকারের আশায় বুলগেরিয়া বি-
শেষে অস্ট্রিয়ার মধ্যস্থতায় বুখারেস্টের সন্ধিতে (1913) যুদ্ধে-

বুলগেরিয়া এই সন্ধিতে গ্রিস, সার্বিয়া, ও মন্টিনিগ্রোকে ম্য-
ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো। অন্যদিকে তুরস্ক যুদ্ধে যোগদান করায় আ-

কিছু অংশ ফিরে পেল। যুদ্ধের ফল হিসেবে কতকগুলি কথা উল্লেখ করা দরকার। প্রথমতঃ, ইয়োরোপ থেকে তুরস্ক সাম্রাজ্যের ভৌমিক অধিকার বিলুপ্ত হলো এবং বলকান অঞ্চলের খ্রিস্টান রাষ্ট্রগুলির আয়তন পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হলো। দ্বিতীয়তঃ, এই যুদ্ধের ফলে সার্বিয়া প্রতিবেশী গ্রিস অপেক্ষাকৃতভাবে লাভবান হলো এবং বুলগেরিয়া সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হলো। বলকানের যে-সব রাষ্ট্র সার্বিয়ার মুখের গ্রাস কেড়ে নিল তাদের বিরুদ্ধে সার্বিয়ার মনে বিক্ষোভ জমা রইল। তৃতীয়তঃ, অস্ট্রিয়া ছিল বহু জাতি-গোষ্ঠী ও বিচিত্র ভাষাভাষী রাষ্ট্রের সমষ্টি। তার শ্লাভ প্রজাপুঞ্জ অস্ট্রিয়ার কবল থেকে মুক্তিলাভ করে সার্বিয়ার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার চেষ্টা করত এবং সার্বিয়াও তাদের প্ররোচিত করত। অস্ট্রিয়ার ও সার্বিয়ার এই দ্বন্দ্বে রাশিয়া সাহায্য করত সার্বিয়াকে এবং জার্মানি সাহায্যে করত অস্ট্রিয়াকে। পরিণতিতে জার্মনির সাহায্যপুষ্ট অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার সাহায্য পুষ্ট সার্বিয়ার মনোমালিন্য প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধেরর সূত্রপাত ঘটালো। চতুর্থতঃ, তুরস্ক ও বুলগেরিয়া দুর্বল হওয়ায় এরা যথাক্রমে জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত হলো। জার্মানির সঙ্গে তুরস্কের সৌহার্যা প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে বার্লিন-বাগদাদ রেলপথ নির্মানের পরিকল্পনা গৃহীত হলো। জার্মানির উচ্চাকাঙ্খা অর্থাৎ আন্তর্জাতিক প্রভাব বিস্তারের আশাও ফলবতী হলো। বলকানের শেষোক্ত যুদ্ধ দুটি বল্‌কান সমস্যার সমাধান করলেও অভ্যান্তরে মহাযুদ্ধের বীজ হিসেবে থেকে গেল।

অধ্যায় ১৬

ত্রিপাক্ষিক মৈত্রীব্যবস্থা ও ইয়োরোপের সামরিক মেরুকরণ

(Syllabus : Triple Alliance, Triple Entente and the Emergence of two Armed Camps.)

১। ইয়োরোপীয় মৈত্রীব্যবস্থা

অধ্যাপক *ডেভিড টমসন* তাঁর *Europe since Napoleon* গ্রন্থে লিখেছেন যে, "The most important thing about the First World war is that it was the unsought, unintended and product of a long sequence of events which began in 1871. No man, no nation, worked for this result, which was the total outcome of the interplay of diverse policies and strategies usually aimed primarily at providing national security, stability, even peace" (পেপারব্যাক সং, 1966, পৃ 532)। তাঁর বক্তব্য সঠিক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য কোনও বিশেষ দেশ, বিশেষ ব্যক্তিকে দায়ী করা যায় না; বস্তুত 1871 থেকে ইয়োরোপে যে ঘটনাবলীর দীর্ঘ প্রক্রিয়া চলছিল তারই পরিণতি এই মহাযুদ্ধ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাতের পিছনে নানা কারণ ছিল, আমরা যথাস্থানে তা আলোচনা করব। তবে একথা অনস্বীকার্য যে জাতীয় নিরাপত্তা, শক্তিবৃদ্ধি এবং শান্তির কথা বলা হলেও ইয়োরোপে 1871 খ্রিস্টাব্দের পর এমন কতকগুলি নতুন ব্যাপার ঘটেছিল যা এক নতুন যুগের সূচনা করে।

এই নতুন ঘটনাগুলির অন্যতম ছিল মৈত্রী ব্যবস্থা (System of Alliances)। এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের বন্ধুত্ব বা মৈত্রী গুরুত্বপূর্ণ কোনও ব্যাপার নয়। রেনে ক্যারি তাঁর *A Diplomatic History of Europe since the Congress of Vienna* গ্রন্থে এই ব্যবস্থার গুরুত্ব ও পরিণতি দেখিয়েছেন। কিন্তু 1871 খ্রিস্টাব্দের পর নতুন যে দুটি মাত্রা যুক্ত হলো– তা ইয়োরোপের ইতিহাসে অভিনব।[1] একটি হলো মৈত্রীব্যবস্থার গোপনীয়তা এবং সামরিক শর্তাদির কঠোরতা। অন্যটি হলো দুটি দেশের মধ্যে মৈত্রী নয়, গড়ে তোলা হলো মৈত্রী জোট বা গোষ্ঠী। পারস্পরিক সন্দেহ, উগ্র জাতীয়তা ও নানা স্বার্থের দ্বন্দ্বের

---

1. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্র. A. J. P. Taylor, *The Struggle For Mastery in Europe* (1954), R. J. Sontag, *European Diplomatic History* 1871-1932 (1933), W. L. Langer, *European Alliances and Alignments,* 1871-1890 (1931), *Diplomacy of Imperialism* 1890-1902 (2 vols, 1935), G, F. Kennan, *The Fateful Alliance : France, Russia and the First World War* (1984)

ফলে দুটি ভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী রাষ্ট্রজোট ইয়োরোপকে দুটি সামরিক শিবিরে বিভক্ত করে দিল।

উনিশ শতকের সত্তরের দশকে পূর্বাঞ্চল সমস্যা যে সংকটের সৃষ্টি করেছিল তাতে ইয়োরোপের বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে পারস্পরিক ঈর্ষা এবং সন্দেহ দানা বাঁধে। এই দ্বন্দ্ব ছাই চাপা আগুনের মতন আগেও ছিল, কিন্তু ক্রমে বলকান অঞ্চলের সমস্যাকে কেন্দ্র করে প্রকাশ্যে তা বেরিয়ে পড়ল। এর ফলেই জোট রাজনীতি বা কূটনৈতিক গোষ্ঠী গড়ে তোলার দিকে নজর গেল বলে অধ্যাপক *অ্যাণ্ডারসন* মনে করেন।[1] কথাটিতে সত্যতা আছে, কেননা বার্লিন কংগ্রেসের এক বছরের মধ্যেই জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে 'দ্বি-শক্তি চুক্তি' সম্পাদিত হয়।

আবার, আরেকটি কথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, জার্মানির ঐক্যের রূপকার অটো ফন বিসমার্ক, স্বাধীন এবং ঐক্যবদ্ধ জার্মানির চ্যান্সেলার রূপে 1871 খ্রিস্টাব্দ থেকে 1890 খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই যে পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করেছিলেন তার থেকে কূটনৈতিক ও সামরিক গোষ্ঠী-বদ্ধ হওয়ার রাজনীতির সূত্রপাত। মৈত্রীব্যবস্থার দার্শনিক মতবাদ তাঁর 'মস্তিষ্ক প্রসূত' বলে *ডেভিড টমসন* মনে করেন যদিও 1890 এর পর তাঁর উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ।[2] কেন, এই বিষয় আরও একটু বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। 1870 খ্রিস্টাব্দের সেডানের যুদ্ধ ইয়োরোপের ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যে দ্বন্দ্ব শুধু দুই দেশের নয়, সমগ্র ইয়োরোপ বা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল। ফ্রান্স সেডানের যুদ্ধে পরাজয়ের অপমান এবং আলসাস লোরেন হস্তচ্যুত হওয়ার বেদনা সহজে ভুলতে পারেনি, ভোলাও সম্ভব নয়। বিসমার্ক তাই জার্মানিকে 'পরিতৃপ্ত দেশ' ঘোষণা ক'রে একদিকে আভ্যন্তরীণ পুনর্গঠনে মন দিলেন তেমনি এমন পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করলেন যাতে ফ্রান্স কূটনৈতিকভাবে একঘরে থাকে এবং সেডানের যুদ্ধের পরাজয়ের প্রতিশোধ না নিতে পারে। তখন ইয়োরোপের বৃহৎ শক্তি পাঁচটি— জার্মানি, ফ্রান্স, ব্রিটেন, অস্ট্রিয়া, রাশিয়া— ইতালি বৃহৎ শক্তি হওয়ার পথে। অটোমান তুরস্ক তখন খুবই দুর্বল। সুতরাং পাঁচটি দেশের মধ্যে ফ্রান্সকে বাদ দিয়ে যে তিনটি দেশ রইল তার মধ্যে ব্রিটেন ইয়োরোপীয় রাজনীতি থেকে নিজেদের 'চমৎকারভাবে দূরে রাখবার' (Splendid isolation) নীতি নিয়ে চলছিল; বাকি থাকল অস্ট্রিয়া-রাশিয়া। বিসমার্ক লক্ষ্য রেখেছিলেন কেউই যাতে ফ্রান্সের দিকে না যায়। বিসমার্কের কৃতিত্ব এই যে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে দ্বৈত চুক্তি সম্পন্ন করার (1879 খ্রিঃ) পর ইতালিকে নিয়েও বিখ্যাত

---

1. "It was the events of 1875 to 1878 which had set this dangerous alliance-making process in motion"-M.S. Anderson, *The Eastern Question*, (Macmillan, 1966)

2. ডেভিড টমসন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ 531

ত্রি-পাক্ষিক মৈত্রী বা 'ট্রিপল্ অ্যালায়েন্স' (1882 খ্রিঃ) গড়ে তুলেছিলেন। অথচ রাশিয়াকেও দূরে ঠেলেন নি।

ফ্রান্সকে কূটনৈতিক জগতে বন্ধুহীন করে রাখার এই বিসমার্কীয় মৈত্রী-ব্যবস্থা 1890 খ্রিস্টাব্দের পর কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের পররাষ্ট্রনীতির দ্বারা সফল হয়নি। একদিকে তাঁর উগ্র নীতি এবং অন্যদিকে ফ্রান্স ক্রমে ব্রিটেন এবং পরে রাশিয়াকে এক গোষ্ঠীতে নিয়ে ত্রিশক্তি মৈত্রী বা 'ট্রিপল্ আতাঁত' গঠনের ফলে বিসমার্কীয় মৈত্রীব্যবস্থা ভেঙে যায়। সেই সঙ্গে ইয়োরোপ দুই সামরিক শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। *ডেভিড টমসন* লিখেছেন যে, "Despite occasional and momentary rapprochements between them, the enduring hostility between France and Germany was one of the most constant factors in international diplomacy between 1871 and 1914"। অবশ্য 1890 খ্রিস্টাব্দের পর বিসমার্কের জোট ব্যবস্থায় ফাটল দেখা দিলেও এবং ফ্রান্স ও তার সহযোগী দেশ মিলে 'ত্রিপল্ আঁতাত' গঠন করলেওআপাততইয়োরোপে শান্তি বজায় ছিল। এ যেন অস্ত্রের উপর শান্তি বা সামরিক প্রস্তুতির যুগ, যাকে ইংরেজিতে বলে Age of Armed peace।

সুতরাং 1871 থেকে 1890 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালকে মৈত্রী ব্যবস্থার একটা পর্যায় বলা যেতে পারে। এই পর্যায়ের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো জার্মানি ইয়োরোপের প্রধান শক্তিতে পরিণত হওয়া। জার্মানির ভাগ্য নিয়ন্তা ছিলেন বিসমার্ক। বিসমার্ক তাঁর মৈত্রী ব্যবস্থায় সফল ছিলেন এবং এই মৈত্রীব্যবস্থার মূল কথা ছিল ফ্রান্স যাতে সেডানের যুদ্ধের পরাজয়ের প্রতিশোধ না নিতে পারে সে দিকে লক্ষ্য রাখা। এই পর্যায়ের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো বিসমার্ক তাঁর উদ্দেশ্য মাথায় রেখে প্রথমে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন এবং পরে তার মধ্যে ইতালিকে যুক্ত ক'রে ট্রিপল অ্যালায়েন্স গঠন করেন। কীভাবে, তা আমরা পরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব। এই পর্যায়ের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হলো বিসমার্কীয় ব্যবস্থায় ইয়োরোপে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পেলেও আপাত শান্তি বজায় ছিল।

1890 খ্রিস্টাব্দে জার্মানির সম্রাট কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম একদিক থেকে তার রাজনৈতিক গুরু এবং নবজার্মানির প্রধানতম স্থপতি অটো ফন বিসমার্ককে ক্ষমতাচ্যুত করে সকল ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নেন। ঐ সময় থেকে 1918 খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের একেবারে শেষ পর্যন্ত তিনিই ছিলেন জার্মানির কর্ণধার। অনেক ঐতিহাসিক 1890 খ্রিস্টাব্দকে জার্মানির ইতিহাসের তো বটেই এমনকি ইয়োরোপের ইতিহাসের এক যুগ সন্ধিক্ষণ বলে চিহ্নিত করেছেন। কেননা কাইজার বিসমার্কের কূটনীতির মূল বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করে উগ্র পররাষ্ট্রনীত গ্রহণ করেন। ফলে ফ্রান্সকে কূটনৈতিকভাবে একঘরে ক'রে রাখার নীতি জার্মানি হারিয়ে ফেলে। এবং ক্রমে ক্রমে ফ্রান্স, ব্রিটেন এবং রাশিয়াকে পাশে পেয়ে যায়।

এর ফলে শেষপর্যন্ত এই তিনটি দেশ মিলে ত্রিশক্তি মৈত্রী বা ট্রিপল্ আঁতাত গঠন করতে সমর্থ হয়। এইভাবে দুদিকে তিনটি করে দেশ মৈত্রীজোট গঠন করায় ইয়োরোপ পরস্পর বিরোধী দুই সামরিক শিবিরে বিভক্ত হয়ে যায়।

কাইজারের জার্মানি বিষয়ে সুপরিচিত গবেষক *ইম্যানুয়েল হাইস* (Zeiss) অবশ্য এই ধারণা সঠিক বলে মনে করেন না। তাঁর মতে 1890 খ্রিস্টাব্দেই কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম বিসমার্কের পররাষ্ট্রনীতি সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করেননি। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তিনি 1890 থেকেই নবনীতি গ্রহণ করলেও, বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেননি। সেই কারণে 1890-1895 খ্রিস্টাব্দকে সিদ্ধান্ত বিহীনতার যুগ বলা যেতে পারে। যুগ-সন্ধিক্ষণ এলো 1896 খ্রিস্টাব্দে। উচ্চাকাঙ্খী কাইজার বিশ্বরাজনীতিতে জার্মানির প্রাধান্য স্থাপনের নীতি যখন গ্রহণ করলেন। এই নীতি 'ভেল্টপলিটিক' (Welt politik) নামে পরিচিত এবং এই নীতি প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল যে, "World politics, expansions and navy were the three dominant notes of the Kaiser's foreign policy"। বিশ্বরাজনীতিতে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে, নৌশক্তিতে, ঔপনিবেশিক শক্তিতে বলীয়ান হতে গিয়ে জার্মানি ফ্রান্সকে একঘরে করে রাখার মূল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হলো। শুধু তাই নয় ব্রিটেন তাঁর 'Splendid isolation' নীতি ত্যাগ করতে বাধ্য হলো; নৌশক্তি ও উপনিবেশ বিষয়ে জার্মানির চ্যালেঞ্জই ছিল ব্রিটেনের অবতারণের কারণ। এছাড়া এর ফলে দীর্ঘ দিনের শত্রু রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করল ব্রিটেন। এই সব বিবেচনার মধ্যেই ফ্রান্স-ব্রিটেন-রাশিয়া যুক্তভাবে জার্মানি বিরোধী জোট গঠন করল। কাইজারের নীতি পরিবর্তনের পিছনে অবশ্য নানা চাপ ছিল। সে যাই হোক 1900 খ্রিস্টাব্দ থেকে 1910 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এই ইয়োরোপীয় মৈত্রী ব্যবস্থার পরিণাম হল এই যে, ইয়োরোপ এক বারুদের স্তুপের উপর দণ্ডায়মান হয়ে রইল।

২। ট্রিপল্ অ্যালায়েন্স বা ত্রিপাক্ষিক মৈত্রী গঠন

বিসমার্কের পররাষ্ট্রনীতি : 1871 খ্রিস্টাব্দ থেকে 1890 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কুড়ি বছর বিসমার্ক জার্মানির চ্যান্সেলার হিসেবে শুধু আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে নয় পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রেও প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। বিসমার্কের লক্ষ্য ছিল 1871 খ্রিস্টাব্দের অবস্থা যেন বজায় থাকে এবং এটি ছিল তাঁর বৈদেশিক নীতির মূলকথা। ডেভিড টমসন লিখেছেন, "Bismarck's main purpose was to preserve the settlement of 1871 and to ensure, for Germany at least, a generation of peace in which to consolidate her new-formed national unity".[1] সুতরাং বিসমার্কের পররাষ্ট্রনীতির মূলকথা

1. ডেভিড টমসন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, 21 অধ্যায়, পৃ 524

ছিল ইয়োরোপে শান্তি বজায় রাখা। তেমনি বিসমার্কের পররাষ্ট্র নীতির আর একটি মূল লক্ষ্য ছিল ফ্রান্স যাতে সেডানের যুদ্ধের পরাজয়ের প্রতিশোধ না নিতে পারে তা দেখা। ফ্রান্স এবং জার্মানির শত্রুতা ছিল তৎকালীন ইয়োরোপের আন্তর্জাতিক কূটনীতির মূল দ্বন্দ্ব। সুতরাং ফ্রান্স যাতে কূটনৈতিক বন্ধু (ally) না পায়, তা লক্ষ্য রাখতে হবে। কেননা একা ফ্রান্সের পক্ষে জার্মানির বিরুদ্ধে জয়লাভ সম্ভব নয়। এই ফ্রাঙ্কো-জার্মান দ্বন্দ্বই ছিল বিসমার্কের মৈত্রী ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত ভিত্তি। এ প্রসঙ্গে টমসনের মন্তব্য: "It was on the assumption that this enemity would always, in the end, supervene over all other considerations, that the system of great alliances was built." ত্রিপাক্ষিক মৈত্রীও পরে এই বিবেচনা প্রসূত।

বিসমার্কের উদ্দেশ্য : বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন বিসমার্ক বুঝতে পেরেছিলেন যে ইয়োরোপের দুই বৃহৎ শক্তি অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সকে পরাজিত করে প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানির ঐক্য সম্পন্ন হয়েছে। ইয়োরোপের পুরানো শক্তিসাম্য ভেঙে গেছে। ইয়োরোপের প্রধান শক্তি এখন জার্মানি। এই নেতৃত্বকে স্থায়ী করতে হবে। এদিকে ফ্রান্সের পক্ষে 1870 খ্রিস্টাব্দের যুদ্ধের স্মৃতি সুখের নয়। তাকে প্রভূত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দেওয়া ছাড়াও যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার ফলে জার্মানি তার কাছ থেকে আলসাস এবং লোরেন কেড়ে নিয়েছিল। সুতরাং সুযোগ পেলেই ফ্রান্স জার্মানির বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক আক্রমণ করবে এবং অঞ্চল দুটি কেড়ে নেবে। ফ্রান্স যাতে একাজ করতে না পারে বিসমার্কের তাই ছিল উদ্দেশ্য। তাছাড়া, সাত বছরের মধ্যে (1864-1870) তিনটি যুদ্ধে প্রাশিয়া ডেনমার্ক, অস্ট্রিয়া এবং ফ্রান্সকে হারিয়ে জার্মানির ঐক্য সম্পন্ন করেছিল। জার্মানির সামরিক ক্ষমতা সম্পর্কে ইয়োরোপের নানা দেশের মনে ভীতি দেখা গিয়েছিল। সুতরাং যাতে ইয়োরোপে কোনও জার্মানি-বিরোধী জোট গড়ে উঠতে না পারে তাও বিসমার্ক লক্ষ্য রেখেছিলেন। এই জন্য বিসমার্ক ঘোষণা করলেন যে, জার্মানি এক পরিতৃপ্ত দেশ (a satiated country)। অর্থাৎ তার এখন রাজ্যবিস্তার বা যুদ্ধের প্রয়োজন নেই, বরং শান্তিকামী দেশ হিসেবে সে আভ্যন্তরীণ পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করতে চায়। তাছাড়া উপনিবেশ স্থাপন এবং তার জন্য প্রতিযোগিতায় তাঁর কোনও আগ্রহ নেই, সে কথাও তিনি ঘোষণা করেন। এর ফলে রাশিয়া, ব্রিটেন, অস্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশের আশঙ্কা দূর হয় এবং সেই সঙ্গে জার্মান-বিরোধী জোট গঠনের কাজও আশানুরূপ এগোয়নি।

তিন সম্রাটের চুক্তি : জার্মান-বিরোধী জোট গঠিত না হলেও ইয়োরোপের প্রধান শক্তিগুলি যাতে ফ্রান্সকে মিত্রহীন করে ফ্রান্স-বিরোধী জোট গঠন করে, বিসমার্ক তার চেষ্টা শুরু করলেন। বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে ব্রিটেন ইয়োরোপীয় রাজনীতি থেকে নিজেদের

গুটিয়ে নিয়েছিল। আর ইতালি ঐক্যবদ্ধ দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও তখনও পর্যন্ত শক্তিশালী হয়নি। সুতরাং বিসমার্কের লক্ষ্য হলো জার্মানি, অস্ট্রিয়া এবং রাশিয়ার মধ্যে মৈত্রী। ফ্রান্স বিপ্লবের দেশ, তদুপরি সেখানে প্রজাতান্ত্রিক শাসন। জার্মানি, অস্ট্রিয়া এবং রাশিয়া— এই তিনটি রাজতান্ত্রিক দেশ। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির হ্যাপস্‌বার্গ বংশীয় এবং রাশিয়ার রোমানভ বংশীয় সম্রাটদের প্রজাতন্ত্রের প্রতি ঘৃণা বিসমার্ক জাগিয়ে তোলেন। তিনি জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার এবং অস্ট্রিয়ার সম্রাট ফ্রান্সিস যোসেফের সঙ্গে দেখা করে আলোচনা করেনএবং ফ্রান্সের বিপ্লবী চিন্তাধারা, প্রজাতন্ত্রবাদ, প্যারিস কমিউন, সাম্যবাদ, রুশ দেশের নৈরাজ্যবাদ, নিহিলিস্টবাদ এবং জার্মানির সমাজতন্ত্রবাদ যে ইয়োরোপীয় রাজতন্ত্রগুলির পক্ষে বিপজ্জনক একথাও বিসমার্ক ব্যাখ্যা করেন। *রেনে ক্যারি* লিখেছেন যে, উনিশ শতকে প্রজাতন্ত্রী ফ্রান্সের বিপ্লবী মতাদর্শের প্রতি ইয়োরোপীয় রাজতন্ত্রী দেশ ও দলগুলি সন্দেহ ঘোষণা করত। এই ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে বিসমার্ক 'তিন সম্রাটের চুক্তি' (Drei-Kaiser-Bund) স্বাক্ষর করান।

বিসমার্কের প্রভাবেই রুশ জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির সম্রাট ফ্রান্সিস যোসেফ এবং জার্মান কাইজার প্রথম উইলিয়াম 1873 খ্রিস্টাব্দে এই 'তিন সম্রাটের চুক্তি' স্বাক্ষর করেন। এর ফলে রাশিয়ার ও অস্ট্রিয়ার বন্ধুত্ব লাভ করায় জার্মানি কূটনীতিতে শক্তিশালী হলো, অথচ তাকে কোনও সামরিক সাহায্যের দায়িত্ব নিতে হলো না। সবচাইতে বড়ো কথা হলো এর ফলে ফ্রান্স কূটনৈতিকভাবে মিত্রহীন হওয়াতে বিসমার্কের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো। কারণ ফ্রান্স রাশিয়া কিংবা অস্ট্রিয়াকে তার পাশে পাবে না। ইতালি তখনও বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হয় নি। বাকি থাকল ব্রিটেন। কিন্তু ব্রিটেন ইয়োরোপীয় মহাদেশের রাজনীতি থেকে স্বতন্ত্র ও ঝামেলায় জড়িয়ে না পড়ার নীতি (Splendid isolation) নিয়ে চলছিল, ফলে ফ্রান্সের পক্ষে তাকে পাওয়া সম্ভব ছিল না। তাছাড়া মনে রাখা দরকার তখনও পর্যন্ত জার্মানি শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠন ক'রে ইয়োরোপের বাইরে উপনিবেশ স্থাপনের জন্য সর্বশক্তি নিয়ে ঝাপিয়েও পড়েনি। সুতরাং নৌশক্তি এবং ঔপনিবেশিকতার ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্রিটেনের জার্মানিকে শত্রু মনে করার কোনও কারণ ঘটে নি। এর জন্য ব্রিটেনও তাঁর বিদেশনীতি পরিবর্তন করে ফ্রান্সের দিকে যাবে না, একথাই বিসমার্ক মনে করলেন। সুতরাং স্থিতাবস্থা বজায় রইলো, জার্মানির শক্তি অব্যাহত রইলো এবং ফ্রান্সকে একঘরে করে রাখা সম্ভবপর হলো।

অবশ্য সেডানের যুদ্ধের পর জার্মানির পররাষ্ট্রনীতি, বিশেষতফ্রান্সকে মিত্রহীন করে রাখার জন্য বিসমার্কের যতখানি প্রশংসা করা হয়, ততখানি তার প্রাপ্য কিনা এ নিয়ে কোনও কোনও ইতিহাসবিদ প্রশ্ন তুলেছেন। যেমন *গ্রেনভিল* তার Europe Reshaped বইতে লিখেছেন যে তিন সম্রাটের লীগের প্রধান পরিকল্পনা এবং উদ্যোগ নিয়েছিলেন অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী কাউন্ট অ্যান্ড্রাসি। স্যাডোয়ার যুদ্ধের (1866) পর থেকেই বিসমার্ক

অস্ট্রিয়ার প্রতি সহানুভূতিশীল নরম মনোভাব নিয়েছিলেন। কাউন্ট অ্যান্ড্রাসির উদ্যোগকে বিসমার্ক সফল করার চেষ্টা করেন নিজেদের স্বার্থের অনুকূল মনে করে। অবশ্য তিনসম্রাটের চুক্তি কোনও লিখিত চুক্তি বা দলিল নয়। সুতরাং এই চুক্তি স্বাক্ষরের অর্থ তিন সম্রাট বা তিন দেশের মধ্যে মৌখিক বোঝাপড়া মাত্র। তাছাড়া ব্রিটেন তার নিজস্ব পররাষ্ট্র নীতির জন্য ইয়োরোপীয় জটিলতা থেকে মুক্ত থাকতে চেয়েছিল। সুতরাং ব্রিটেন যে ফ্রান্সের পক্ষে যায় নি, তার জন্য বিসমার্কের আলাদাভাবে কৃতিত্ব নেই। তাছাড়া ডেভিড টমসন যথার্থই দেখিয়েছেন যে, তখনও পর্যন্ত ব্রিটেন ইয়োরোপের শক্তি সাম্যের বিপদ বলে ফ্রান্স কিংবা রাশিয়াকে ভাবতে অভ্যস্ত ছিল। জার্মানি বা অস্ট্রিয়াকে নয়। এবং 'She was slow to appreciate the full implications of German ascendancy, both diplomatic and economic'—অর্থাৎ কূটনৈতিক কিংবা অর্থনৈতিক উভয় দিক থেকেই জার্মানির উত্থানের তাৎপর্য বুঝতে ব্রিটেনের দেরি হয়েছিল।[1]

পূর্বাঞ্চল সমস্যা এবং তিনসম্রাটের মৈত্রীর অবসান : অধ্যাপক *এ. জে. পি. টেলার* মন্তব্য করেছেন যে, 'Suspicion between Vienna and St. Petersburg was the essential flaw in the league of the three Emperors'।[2] অর্থাৎ অস্ট্রিয়ার এবং রাশিয়ার মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহই ছিল তিন সম্রাটের চুক্তির সবচেয়ে বড়ো ত্রুটি। কী ভাবে এই ত্রুটি থেকেই তিন সম্রাটের মৈত্রী ভেঙে গেল তা জানবার জন্য পূর্বাঞ্চল সমস্যার দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। অবশ্য তার আগেই ইয়োরোপে এক যুদ্ধাতঙ্ক (war scare) সৃষ্টির জন্য রাশিয়ার প্রতিবাদের মধ্যেই তিন কাইজারের চুক্তিতে প্রথম ফাটল রচিত হয়।

বিসমার্ক বুঝতে পেরেছিলেন যে যতদিন ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্রী সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকবে, ততদিন উগ্র রাজতন্ত্রী রাশিয়া এবং অস্ট্রিয়ার সঙ্গে তার মৈত্রীবন্ধনের সম্ভাবনা কম। এজন্য ফ্রান্সকে আলসাস লোরেনের ক্ষতিপূরণবাবদ অন্যত্র উপনিবেশ স্থাপনে সাহায্য করে পরোক্ষে প্রজাতন্ত্রী সরকারকে সাহায্যও করেছিলেন। কিন্তু 1875 খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রপতি তিয়েরে-এর পতন ঘটে এবং রাজতন্ত্রী ম্যাকমোহন ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি হন। তিনি ফ্রান্সের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য ফরাসি পার্লামেন্টে একটি বিল এনেছিলেন। বিসমার্ক আশঙ্কা করেন যে ফ্রান্সের সামরিক ক্ষমতা বৃদ্ধি হলে ফ্রান্স জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতে পারে। তাছাড়া রাশিয়া এবং অস্ট্রিয়ার সঙ্গে ফ্রান্স মৈত্রীস্থাপন করতে পারে, তাহলেও তা হবে জার্মানির পক্ষে বিপদের কারণ। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিসমার্ক ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক আক্রমণ চালাবার সংকল্প নেন এবং যুদ্ধের

1. ডেভিড টমসন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ 524
2. এ জে. পি. টেলার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. 220

আতঙ্ক সৃষ্টির জন্য ফ্রান্সকে দায়ী করেন। বস্তুতপক্ষে ফ্রান্সের সামরিক প্রস্তুতির খবরে জার্মানিতে দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। 'ভাই পোস্ট' পত্রিকায় 'যুদ্ধ কি আসন্ন' শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখে বিসমার্ক ফ্রান্সকে এই বলে সতর্ক করে দেন যে, ফ্রান্স সামরিক কর্মসূচি পরিত্যাগ না করলে জার্মানি যুদ্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হবে।

এইভাবে 1875 খ্রিস্টাব্দে ইয়োরোপে পুনরায় ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দেয়। বিসমার্ক আশা করেছিলেন যে তিন সম্রাটের চুক্তির সাহায্যে তিনি ফ্রান্সকে নিবৃত্ত করতে পারবেন। কিন্তু রুশ মন্ত্রী গোরচাকফ্ ছিলেন তিন কাইজারের চুক্তির বিরোধী। গোরচাকফ্ মনে করতেন যে আবার যদি যুদ্ধ হয় এবং ফ্রান্সের পরাজয় ঘটে তাহলে জার্মানির একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে। তার চেষ্টায় রাশিয়া জার্মানিকে সতর্ক করে দেয় যে ফ্রান্স-জার্মানি যুদ্ধ হলে রাশিয়া নিরপেক্ষ থাকবে না। ব্রিটেনও জার্মানিকে এক প্রতিবাদপত্র পাঠায়। শেষ পর্যন্ত ইয়োরোপীয় যুদ্ধের সম্ভাবনা দূর হলেও দুটি বিষয় স্পষ্ট হয় : (ক) ফ্রান্স আত্মরক্ষার স্বার্থে শক্তি বৃদ্ধি করবেই এবং (খ) তিন সম্রাটের চুক্তি আদৌ কূটনৈতিক সাফল্য নয়।

তবে কূটনৈতিক দিক থেকে তিন সম্রাটের বন্ধুত্ব কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয় পূর্বাঞ্চল সমস্যাকে কেন্দ্র করে। বস্তুতপক্ষে বলকান অঞ্চলে রাশিয়ার এবং অস্ট্রিয়ার স্বার্থ ছিল এতই পরস্পর বিরোধী যে তার শান্তিপূর্ণ মীমাংসা ছিল প্রায় অসম্ভব। বিসমার্ককে দুই দেশের মধ্যে যে-কোনও একজনকে বেছে নিতে হতই। বলকান অঞ্চলে রাশিয়ার আগ্রাসী মনোভাব, ফলে তুরস্কের সঙ্গে যুদ্ধ, তুরস্কের পরাজয় এবং রাশিয়া কর্তৃক তুরস্ককে স্যান স্টিফানোর সন্ধি (1877) মেনে নিতে বাধ্য করা অস্ট্রিয়ার মনঃপূত হয়নি। ব্রিটেনেরও নয়। *ডবল্যু এল. ল্যাঙ্গার* তার Bismarck and His System of Alliances গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, বিসমার্ক অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ বাধলে তিন সম্রাটের চুক্তি ধ্বংস হতে পারে ভেবে চিন্তিত হন। তিনি ভেবেছিলেন তুরস্ককে বিতাড়িত করে অঞ্চলটি অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে ভাগ করে দিলে ভালো হয় কিন্তু ব্রিটেনের প্রতিবাদে এই প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি। তখন বিসমার্ক বলকান সমস্যা মেটানোর জন্য এবং যুদ্ধ এড়াবার জন্য নিজে 'সাধু দালাল' এর ভূমিকা নিয়ে 1878 খ্রিস্টাব্দে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলন পূর্বাঞ্চল সমস্যার সমাধান তো করতে পারেইনি, বরং জার্মানি অস্ট্রিয়ার প্রতি পক্ষপাত দেখিয়েছেন এই অজুহাতে রাশিয়া তিন সম্রাটের চুক্তি পরিত্যাগ করে।

মৈত্রী ব্যবস্থার উদ্ভব : আসলে বার্লিন কংগ্রেসের পরেই দেখা যায় যে ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক যা এতদিন ছাইচাপা আগুনের মতন লুকানো ছিল, তা প্রকাশ্যে এসে পড়ে। 1875 খ্রিস্টাব্দ থেকে বলকান অঞ্চলের সমস্যা যে সংকটের সৃষ্টি

করেছিল তাতে ইয়োরোপের বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে দ্বন্দ্ব আরও বাড়িয়ে দেয়। তবে এরপর ইয়োরোপের ইতিহাসে এক নতুন ঘটনার আবির্ভাব ঘটে, তা হলো মৈত্রী ব্যবস্থা (System of Alliances)। এর আগে প্রত্যেক দেশ নিজস্বার্থে পররাষ্ট্র নীতি গ্রহণ করলেও শক্তিবর্গ নিজ নিজ স্বার্থে কোনও মৈত্রীজোট বা গোষ্ঠী গঠন করে নি। এবার পারস্পরিক ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব এবং ভবিষ্যতের কথা ভেবে মৈত্রী ব্যবস্থার উদ্ভব হলো। ইতিহাসবিদ এম. এস. অ্যান্ডারসন তাঁর Eastern Question গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, 1875 খ্রিঃ থেকে 1878 খ্রিঃ ঘটনা সমূহই ইয়োরোপে বিপজ্জনক মৈত্রী গঠনের প্রক্রিয়াকে গতি দান করেছিল। বার্লিন চুক্তির পরে রুশ জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার অভিযোগ করেছিলেন যে ঐ সন্ধিতে জার্মানি অস্ট্রিয়ার প্রতি পক্ষপাত দেখিয়েছে। রুশ মন্ত্রী গোরচাকফ্ তো আরও একধাপ এগিয়ে মন্তব্য করেন, "জার্মানি রাশিয়ার কাঁধে চড়েই এত বড় হয়েছে অথচ তার জন্য জার্মানি রাশিয়ার প্রতি আদৌ কৃতজ্ঞ নয়।" তিন সম্রাটের জোট রক্ষা পেলে ফ্রান্স মিত্রহীন থাকত, ইয়োরোপেরও শক্তিসাম্যের কোনও ক্ষতি হত না, কিন্তু বার্লিন কংগ্রেসের পর রাশিয়া ড্রেইকাইজারবুন্দ পরিত্যাগ করে।

অস্ট্রো-জার্মান দ্বৈত চুক্তি (Dual Alliance) **:** জার্মানির নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে বিসমার্ক অস্ট্রিয়ার সঙ্গে দ্বৈত চুক্তি সম্পাদন করেন 1879 খ্রিস্টাব্দে। বার্লিন কংগ্রেসের পর রাশিয়া তিন সম্রাটের চুক্তি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ফলে জার্মানি এবং অস্ট্রিয়া উভয়েই পরস্পরের কাছে আরও বেশি সংঘবদ্ধ থাকার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। দ্বিশক্তি চুক্তি সম্পাদনের জন্য অস্ট্রিয়ার মন্ত্রী কাউন্ট অ্যান্ড্রাসি হ্যাপস্‌বার্গ সম্রাট ফ্রান্সিস যোসেফকে বোঝান। তাঁর বক্তব্য ছিল জার্মানির কাছে 1866 খ্রিস্টাব্দের পরাজয়ের তিক্ত অভিজ্ঞতা ভুলে অস্ট্রিয়ার উচিত জার্মানির সঙ্গে জোটবদ্ধ হওয়া। এরফলে জার্মানিকে পাশে পেলে অস্ট্রিয়া বলকান অঞ্চলে তার ঈপ্সিত আধিপত্য স্থাপন করতে সক্ষম হবে। বিসমার্কেরও বক্তব্য ছিল, এই চুক্তি করলে অস্ট্রিয়াকে ফ্রান্সের মিত্রতা থেকে দূরে রাখা সম্ভব হবে। কাইজার প্রথম উইলিয়াম প্রথমে রাজী ছিলেন না, কিন্তু বিসমার্ক এবং মন্ত্রিসভার অন্যান্যরা চাপ সৃষ্টি করেন। শেষ পর্যন্ত 1879 খ্রিস্টাব্দের 7 অক্টোবর চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

অধ্যাপক *এ. জে. পি. টেলার* লিখেছেন, 'Bismarck began a manufacture of alliances that was soon to involve every Great power in Europe, and most of the small ones'।[1] সত্যিই তাই হলো, এই যে গোপন সামরিক ও কূটনৈতিক চুক্তি হওয়া শুরু হলো, তিরিশ বছরের মধ্যে ক্রমেই তা সমগ্র ইয়োরোপকে গ্রাস করে ফেলে। পরিণতিতে সমগ্র ইয়োরোপের বৃহৎ শক্তিবর্গ দুই সামরিক শিবিরে বিভক্ত হয়ে যায়।

---

1. টেলার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ. পৃ. 256। তিনি দ্বৈত চুক্তি প্রসঙ্গে অন্যত্র লিখেছেন, 'It was the first thread in a network of alliances which was soon to cover all Europe' (পৃ. 261)।

যাইহোক,অস্ট্রো জার্মান দ্বৈত চুক্তির দ্বারা স্থির হলো যে, (ক) জার্মানি এবং অস্ট্রিয়া এই দুই স্বাক্ষরকারীর মধ্যে কেউ যদি রাশিয়ার দ্বারা আক্রান্ত হয় তবে অপরপক্ষ মিত্রকে সবরকম সাহায্য দেবে; অবশ্য এখানে অস্ট্রিয়ার কথাই বোঝানো হয়েছে, কেননা রাশিয়া দ্বারা জার্মানি আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ ছিল; (খ) যদি দুই স্বাক্ষরকারীর মধ্যে কেউ রাশিয়া ব্যতীত অন্য তৃতীয় শক্তির সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয় তবে অপর পক্ষ নিরপেক্ষ থাকবে। এখানে কিন্তু জার্মানির কথাই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ জার্মানি যদি তৃতীয়শক্তির (ফ্রান্স) সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে তাহলে মিত্র অস্ট্রিয়া নিরপেক্ষ থাকবে। (গ) জার্মানি আক্রান্ত হলে তৃতীয় শক্তির সঙ্গে যদি রাশিয়াও যোগ দেয় তাহলে মিত্র অর্থাৎ অস্ট্রিয়া নিরপেক্ষ না থেকে জার্মানির পক্ষে যোগ দেবে। (ঘ) এই দ্বৈত চুক্তির শর্তাবলী উভয় পক্ষই গোপন রাখবে। বাস্তবত, 1887 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইয়োরোপের কোন দেশই দ্বৈত চুক্তি সম্পর্কে কিছু জানত না, শর্তগুলি ছিল গোপন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত এই মৈত্রী বজায় ছিল এবং অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল জার্মান পররাষ্ট্র নীতির মূল স্তম্ভ। 1887 খ্রিস্টাব্দে এই মৈত্রী সংবাদ প্রকাশিত হলে ইয়োরোপে বিভিন্ন ধরণের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ সলস্‌বেরি অস্ট্রিয়ার শক্তি ও স্বাধীনতার উপর ইয়োরোপের শান্তি ও স্থিতিশীলতা নির্ভরশীল বলে মন্তব্য করেছিলেন। রাশিয়া এই মৈত্রী দুর্ভাগ্যজনক মনে করলেও তা রাশিয়ার পক্ষে বিপজ্জনক নয় বলে মনে করত।

পুনরায় ত্রি-সম্রাটের লীগ ঃ অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির সঙ্গে দ্বৈত চুক্তি সম্পাদন করার পরেই বিসমার্কের মনে হয় যে রাশিয়াকেও স্বপক্ষে রাখা দরকার নতুবা রাশিয়া ফ্রান্সের পক্ষে যোগ দিতে পারে। রাশিয়াও জার্মানির সঙ্গে সদ্ভাবের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল। রাশিয়া শুধুমাত্র জার্মানির সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনে আগ্রহী থাকলেও, জার্মানি অস্ট্রিয়াকেও সঙ্গে রাখার পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু রাশিয়ার সর্বশ্লাভবাদ (Pan Slavism) অস্ট্রিয়ার মনঃপূত ছিল না। শেষপর্যন্ত জার্মানির কাইজার প্রথম উইলিয়ামের প্রচেষ্টায় কোনও সামরিক জোট না হলেও তিন দেশের মধ্যে মৈত্রী পুনরায় স্থাপিত হলো। রাশিয়ায় দ্বিতীয় আলেকজান্ডার 1881 খ্রিস্টাব্দের 13 মার্চ আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছিলেন। নতুন জার তৃতীয় আলেকজান্ডার 1881 খ্রিঃ 18 জুন জার্মানি এবং অস্ট্রিয়ার সম্রাটের সঙ্গে তিন সম্রাটের চুক্তি (The League of the Three Emperors) স্বাক্ষর করেন। অধ্যাপক টেলার যথার্থই লিখেছেন যে, 'The new League had little in common with the League of 1873'। এই সন্ধির শর্তানুসারে, তিন দেশের মধ্যে যে-কোনও শক্তিকে কোনও চতুর্থ শক্তি আক্রমণ করলে অপর দুই মিত্র নিরপেক্ষ থাকবে। এই সন্ধির দ্বারা কৃষ্ণসাগর অঞ্চলে রাশিয়ার নিরাপত্তা বৃদ্ধি পায়। রাশিয়ার প্রস্তাবে ক্রমে জার্মানি ও অস্ট্রিয়া বুলগেরিয়ার সঙ্গে পূর্ব রুমানিয়ার সংযুক্তি স্বীকার করে নেয়। পক্ষান্তরে রাশিয়াও বসনিয়া ও হার্জেগোভিনাতে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য মেনে নেয়।

ত্রিপাক্ষিক মৈত্রী গঠন : রাশিয়া এবং অস্ট্রিয়ার সঙ্গে মৈত্রী করার পর বিসমার্ক ইতালিকেও দলে টানতে সচেষ্ট হন। ইতালি তাঁর ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য ফ্রান্সের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল। ইতালিয় গণতন্ত্রও আদর্শগত দিক থেকে ফ্রান্সের প্রতি অনুগত ছিল। আবার রোমে ফ্রান্সের সাহায্যে পুনরায় পোপের প্রতিষ্ঠারও সম্ভাবনা ছিল। এই পরিস্থিতিতে বিসমার্ক ইতালিকে ফ্রান্স থেকে বিচ্ছিন্ন করার ব্যাপারে মনোযোগী হন। তিন সম্রাটের লীগ (1881) স্থাপিত হলেও বিসমার্ক চঞ্চলমতি রাশিয়ার ব্যাপারে সন্দিগ্ধ ছিলেন। এই সময় উত্তর আফ্রিকার টিউনিস (Tunis) উপনিবেশ স্থাপনের প্রশ্ন নিয়ে বিবাদ ছিল। বিসমার্ক বার্লিন কংগ্রেসের পরেই ফ্রান্সকে গোপনে টিউনিস দখল করার জন্য প্ররোচনা দেন। বিসমার্কের উদ্দেশ্য ছিল ইয়োরোপ থেকে ফ্রান্সের দৃষ্টি ঔপনিবেশিক তৎপরতার দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া এবং যার ফলে ফ্রান্সের সঙ্গে অন্য দেশগুলির প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। ঠিক তাই হয়, ফ্রান্স টিউনিস দখল করলে (1881 খ্রিঃ) ইতালি বিশেষভাবে রুষ্ট হয় কেননা টিউনিস দখল করার ব্যাপারে ইতালিও উৎসাহী ছিল।

ইতালি মিত্র অন্বেষণে মৈত্রী জোটে দৃষ্টি দেয়। ভূমধ্যসাগরে সবচেয়ে শক্তিশালী ব্রিটেন মিত্র হতে পারত কিন্তু ব্রিটেন নিজেই ছিল উপনিবেশের ক্ষেত্রে ইতালির প্রতিদ্বন্দ্বী। সুতরাং ইতালির মৈত্রীর হাত জার্মানির দিকে প্রসারিত হয়। বিসমার্কের প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে ইতালি 1882 খ্রিস্টাব্দের 20 মে জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে মৈত্রী চুক্তিতে স্বাক্ষর করলে বিখ্যাত ত্রিপাক্ষিক মৈত্রী বা Triple Alliance গঠিত হয়। শর্তানুসারে ঠিক হয় যে, (i) যদি ফ্রান্স ইতালিকে আক্রমণ করে তবে জার্মানি ও অস্ট্রিয়া ইতালিকে সাহায্য করবে, (ii) ফ্রান্স যদি জার্মানিকে আক্রমণ করে তবে ইতালি জার্মানিকে সাহায্য করবে, (iii) যদি একাধিক শক্তি কোনও মিত্রকে আক্রমণ করে তবে তিন মিত্রদেশ একত্রে যুদ্ধ করবে, (iv) অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি ও রাশিয়ার মধ্যে সংঘর্ষ হলে ইতালি নিরপেক্ষতা অবলম্বন করবে,তবে যদি কেন্দ্রীয় শক্তিগুলির সঙ্গে ফ্রাঙ্কো-রুশ যুগ্ম দেশের সংঘর্ষ হয় তবে ইতালি সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় শক্তিগুলির পক্ষে যোগ দেবে এবং (v) স্বতন্ত্রভাবে ঘোষণা করা হলো যে, এই চুক্তি ব্রিটেনের বিরুদ্ধে নয়।[1] *জন লো* (Lowe) তার *Rivalry and Accord* গ্রন্থে (লণ্ডন, 1992) সম্প্রতি দেখিয়েছেন যে, অস্ট্রিয়া-জার্মানির দ্বৈতচুক্তি (1879) ইতালিকে নিয়ে 1882 তে ত্রিপাক্ষিক চুক্তিতে রূপান্তরিত হয়নি। ত্রিপাক্ষিক মৈত্রী বা ট্রিপল্ অ্যালায়েন্স নতুন মৈত্রী ব্যবস্থা। এইভাবে জার্মান চ্যান্সেলার অটো ফন বিসমার্কের উদ্যোগে ত্রিপাক্ষিক মৈত্রী সম্পাদিত হয়, ফ্রান্সের বিচ্ছিন্নতা সম্পূর্ণ হয় এবং ট্রিপল্ অ্যালায়েন্সের মাধ্যমে ইয়োরোপে এক শক্তিশালী রাষ্ট্রজোটের সৃষ্টি হয়।

---

1. এ. জে. পি. টেলার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. 275

মৈত্রীব্যবস্থার পরের কথা ঃ বিসমার্ক যে উদ্দেশ্য নিয়ে জার্মানির বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ করেন, তা রূপায়ণের হাতিয়ার হয়ে উঠল 'মৈত্রী ব্যবস্থা'। প্রথমে তিন সম্রাটের চুক্তি (1873), পরে তা ভেঙে গেলে অস্ট্রো-জার্মান দ্বৈত চুক্তি (1879), তারপর আবার অস্ট্রিয়া-জার্মানি-রাশিয়াকে নিয়ে তিন সম্রাটের লীগ (1881) এবং শেষ পর্যন্ত জার্মানি-অস্ট্রিয়া-ইতালিকে নিয়ে ট্রিপল্ অ্যালায়েন্স (1882) গঠন ইত্যাদির মাধ্যমে এক দিকে যেমন জার্মানির নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হয়েছিল, তেমনি ফ্রান্সকেও মিত্রহীন করে রাখা সম্ভব হয়েছিল। এই ব্যবস্থা প্রসঙ্গে আরও বলা দরকার যে, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি 1881 খ্রিঃ গোপনে সার্বিয়ার সঙ্গে এক চুক্তি করেছিলো যার দ্বারা বলকান অঞ্চলে পরস্পরের স্বার্থ মাথায় রেখে শর্ত আরোপ করা হয়েছিল। আবার 1883 খ্রিঃ বিসমার্ক রুমানিয়ার সঙ্গে এক চুক্তি করেন। তুরস্কও পরে জার্মানির পক্ষে যোগ দিয়েছিল, যদিও তা ধর্তব্যের মধ্যে নয়।

ত্রিপাক্ষিক ট্রিপল্ অ্যালায়েন্স প্রথমে করা হয় পাঁচ বছরের জন্য। এর শর্তগুলি এত গোপন ছিল যে ইয়োরোপের অন্য দেশগুলির পক্ষে তা জানা সম্ভব ছিল না। ট্রিপল্ অ্যালায়েন্স 1887 খ্রিস্টাব্দে পুনর্বিবেচনা করে নবীকরণ করা হয় যেমন উত্তরকালে করা হয়েছিল 1891, 1903 এবং 1912 খ্রিস্টাব্দে। যাই হোক, 1887 খ্রিস্টাব্দে ট্রিপল্ অ্যালায়েন্সে একটি নূতন শর্ত সংযোজন করা হয়, তা হলো অস্ট্রিয়া কিংবা ইতালি আগে সিদ্ধান্ত না নিয়ে বলকান অঞ্চলের কোন অংশ দখল করতে পারবে না।

এখানে একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার। বিসমার্কের উদ্ভাবিত তিন সম্রাটের লীগ (1881) এবং ট্রিপল্ অ্যালায়েন্স ছিল স্পষ্টতই পরস্পর বিরোধী (in direct Contradiction)।[1] রাশিয়া ও অস্ট্রিয়াকে এক সঙ্গে বন্ধু হিসেবে পাওয়া কঠিন, সেই কঠিন কাজে বিসমার্ক সাফল্য পেয়েছিলেন। তবু 1887 খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের উচ্চাকাঙ্খী জেনারেল বুলাঙ্গার রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনে উদ্যোগী হন; আবার বুলগেরিয়াকে কেন্দ্র ক'রে রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। এতে তিন সম্রাটের লীগ ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কূটনীতিজ্ঞ বিসমার্ক পাছে রাশিয়া ফ্রান্সের দিকে চলে না যায় সেজন্য রাশিয়ার সঙ্গে পৃথকভাবে 'রি-ইনসিওরেন্স চুক্তি (Re-Insurance Treaty) সম্পাদন করেন 1887 খ্রিস্টাব্দে। এতে ঠিক হয় যে (ক) চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রদ্বয়ের মধ্যে কেউ তৃতীয় দেশ দ্বারা আক্রান্ত হলে অপর রাষ্ট্র নিরপেক্ষ থাকবে। অর্থাৎ যদি জার্মানি ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ বাধে তাহলে রাশিয়া নিরপেক্ষ থাকবে। (খ) জার্মানি রাশিয়ার বিরুদ্ধে বুলগেরিয়াকে সমর্থন না করার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং দার্দানেলিস ও বসফোরাস প্রণালীতে রুশ আধিপত্য মেনে নেয়। বলা বাহুল্য যে, বিসমার্ক যা মেনে নিয়েছিলেন তা বলকান অঞ্চলে অস্ট্রিয়ার স্বার্থের পরিপন্থী কিন্তু চুক্তি গোপন থাকায় অস্ট্রিয়া তা জানতে পারেনি।

1. তদেব, পৃ. 280

বিসমার্ককে সাধারণত কূটনৈতিক যাদুকর বলা হলেও তাঁর মৈত্রী ব্যবস্থার মধ্যে অনেক ত্রুটি ছিল। কেননা ফ্রান্সকে এক ঘরে রাখা সম্ভব হয়নি। রাশিয়া তার শিল্পায়নের জন্য ফ্রান্সের দ্বারস্থ হলে দুদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে ক্রমে কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ব্রিটেনও জার্মানির প্রতি সন্দিগ্ধ হয়ে ফ্রান্স-রাশিয়ার দিকে যোগ দেয়। তবে ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও অন্তত কুড়ি বছর অর্থাৎ 1870 খ্রিস্টাব্দ থেকে 1890 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিসমার্কের পররাষ্ট্রনীতি সফলই ছিল; ইয়োরোপে শান্তিও বজায় ছিল এবং ফ্রান্সও মিত্রহীন ছিল। আরও দুটি কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে। প্রথমত, ফ্রান্স মিত্রহীন থাকলেও রাশিয়া এবং অস্ট্রিয়াকে এক সঙ্গে বেঁধে রাখার বিসমার্কের নীতি দীর্ঘদিন চালানো সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয়ত, 1888 খ্রিস্টাব্দে কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম সম্রাট হওয়ার পর বিসমার্কের কূটনীতির ক্রমশ বদল ঘটে এবং আমরা পরে যথাস্থানে দেখব যে এর ফলেই ইয়োরোপে শক্তি সাম্যের চিত্রও বদলে যায়।

৩। ট্রিপল্ আঁতাত বা ত্রি-শক্তি মৈত্রী গঠন

বিসমার্ক অস্ট্রিয়া ও ইতালিকে নিয়ে ট্রিপল অ্যালায়েন্স গঠন করলেও কূটনীতির গোপন চরিত্রের জন্য মৈত্রীর শর্তাবলী প্রত্যেক দেশ জানতে পারত না। এমন কি ইতালি যখন 1882 খ্রিস্টাব্দে ত্রি-পাক্ষিক মৈত্রীতে স্বাক্ষর করে, তখনও সে নিজেই অস্ট্রো-জার্মান দ্বৈত চুক্তির কথা (1879) জানত না। ফ্রান্স 1883 খ্রিস্টাব্দে ট্রিপল্ অ্যালায়েন্সের কথা শুনলেও, তার শর্তাবলীর বিষয় কিছুই জানত না। *ডেভিড টমসন* লিখেছেন যে, এই সুনির্দিষ্ট ধারণার অভাবের জন্যই বিপক্ষ দেশগুলিও মিত্র-সন্ধানে ঝুঁকে পড়ে। (This lack of precise knowledge intensified fears and stimulated other powers in their incessant search for allies)।[1]

জার্মান পররাষ্ট্রনীতিতে পরিবর্তন : জার্মানি সম্রাট বা কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম 1888 খ্রিস্টাব্দে ক্ষমতাশীল হওয়ার দু'বছরের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী বা চ্যান্সেলার বিসমার্কের সঙ্গে মতভেদ তীব্র হয়ে ওঠে এবং 1890 খ্রিঃ বিসমার্ক পদচ্যুত হন। তারপর দ্বিতীয় উইলিয়াম সকল ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়ে এক উগ্র বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করেন। ইমানুয়েল হাইস (Zeis) অবশ্য মনে করেন যে, আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে নবনীতি গ্রহণ করলেও বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে তিনি 1890 খ্রিস্টাব্দ থেকেই বিসমার্কের নীতি পুরোপুরি ত্যাগ করেন নি। কাইজার 1896 খ্রিঃ থেকে 'ভেলপলিটিক' বা বিশ্বরাজনীতিতে জার্মানির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বিসমার্কের কূটনীতি সম্পূর্ণ বর্জন করেন। তবে 1890 খ্রিস্টাব্দের পর দূরদৃষ্টির অভাবেই বিসমার্কের কূটনৈতিক মৈত্রী ব্যবস্থা জার্মানি বজায় রাখতে পারেনি। অস্ট্রিয়া-

1. ডেভিড টমসন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, প 526

হাঙ্গেরি, রাশিয়া, ইতালি, ব্রিটেন কেউই যাতে ফ্রান্সের সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হতে না পারে, তাই ছিল বিসমার্কের লক্ষ্য কিন্তু কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম উন্মুক্ত রাজনীতি (open diplomacy) শুরু ক'রে, গোপন কূটনীতি পরিত্যাগ ক'রে, কাউকে তোয়াক্কা না ক'রে এগিয়ে যাওয়ার মনোভাব নেওয়ায় ফ্রান্স মিত্র লাভ করতে সমর্থ হয়।

জার্মান সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়াম রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী বজায় রাখতে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন না। 1896 খ্রিস্টাব্দে রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী সুভালভ জার্মানির সঙ্গে পূর্বেকার (1887) 'রিইনসিওরেন্স ট্রিটি' নবীকরণের প্রস্তাব দিলেও কাইজার মন্ত্রী হলস্টাইনের সঙ্গে পরামর্শক্রমে সরাসরি বাতিল করে দেয়। এর ফলে রুশ জার তৃতীয় আলেকজান্ডার অপমানিত বোধ করেন। রাশিয়ার মনে হয়, জার্মানি রাশিয়ার চেয়ে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখতে বেশি আগ্রহী এবং বলকান অঞ্চলে রাশিয়ার বিরুদ্ধে অস্ট্রিয়াকে সমর্থন করতেও জার্মানি ইচ্ছুক। এমতাবস্থায় রুশ মন্ত্রিসভা ঠিক করে যে জার্মানি অস্ট্রিয়া জোটের বিরুদ্ধে রাশিয়ার উচিত ফ্রান্সের সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া।

ফ্রাঙ্কো-রুশ চুক্তি (1894) ঃ শুধু রিইনসিওরেন্স চুক্তি নবীকরণে অনাগ্রহই প্রকাশ নয়, জার্মানি এমন কতকগুলি কাজ করে যা রাশিয়াকে ফ্রান্সের কাছে আসতে বাধ্য করে। রুশ মন্ত্রী কারকফ ছিলেন ফরাসি মৈত্রীর সমর্থক। *রেনে ক্যারি* দেখিয়েছেন যে কীভাবে জার্মান সরকারের সরকারি নীতি রাশিয়ার কাছে অসহনীয় হয়ে দাড়ায়। প্রথমতঃ, জার্মানি 1890 খ্রিঃ রি-ইনসিওরেন্স চুক্তি নবীকরণ প্রত্যাখ্যান করেছিল। দ্বিতীয়তঃ, 1891 খ্রিস্টাব্দে অস্ট্রিয়া ও ইতালির সঙ্গে 'ট্রিপল্ অ্যালায়েন্স' নবীকরণ করে। ফলে রাশিয়ার ধারণা জন্মায় যে রাশিয়া নয়, অস্ট্রিয়ার সঙ্গেই জার্মানি মৈত্রী স্থাপনে আগ্রহী। তৃতীয়তঃ, জার্মানি ব্রিটেনের সঙ্গেও মৈত্রী স্থাপনে আগ্রহ প্রকাশ করে। ব্রিটেনের সঙ্গে রাশিয়ার তিব্বত, ইরান প্রভৃতি দেশ নিয়ে বিবাদ ছিল। তাছাড়া কনস্ট্যানটিনোপল্ এলাকায় রুশ প্রাধান্যের বিরোধী ছিল ব্রিটেন। সুতরাং ব্রিটিশ-জার্মান বন্ধুত্ব হতে পারে আশঙ্কা করে রাশিয়া শঙ্কিত হয়। চতুর্থতঃ, কাইজারের মন্ত্রী ফ্রেডারিষ হলস্টাইন ছিলেন ঘোর রুশ বিরোধী এবং তিনি রাশিয়া সম্পর্কে কটু মন্তব্য করায় রাশিয়া অপমানিত হয়। পঞ্চমতঃ, বুলগেরিয়ার সিংহাসনে এক জার্মান রাজবংশ ক্ষমতাসীন হওয়াতে জার্মান সেনাপতিদের দিয়ে বুলগেরীয় সেনাদল গঠনের চেষ্টা হলেও রাশিয়া অসন্তুষ্ট হয়। অপরপক্ষে নিজ নিরাপত্তা ও জাতীয় স্বার্থের কথা চিন্তা করে ফরাসি সরকারও রাশিয়ার সঙ্গে মিত্রতাবদ্ধ হওয়াতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। *এ. জে. পি. টেলার* লিখেছেন যে, এই বন্ধুত্বের প্রথম সূত্রপাত 1891 এর আগস্ট মাসে।

প্রজাতন্ত্রী ফ্রান্সের সঙ্গে রাজতন্ত্রী জারের যে বিদ্বেষ ছিল ক্রমে তা দূর হয়ে যায়। রাশিয়ার রেলপথ নির্মাণ এবং দ্রুত শিল্পায়নের জন্য যে বিরাট পুঁজি প্রয়োজন ছিল ফ্রান্স অত্যন্ত কম সুদে তা দিতে এগিয়ে আসে। ফরাসি মন্ত্রী ডেলক্যাসেও রুশ মিত্রতার পক্ষে ছিলেন। ফ্রান্স থেকে এক নৌবহর রাশিয়ায় যায় এবং জার নিজে তার অভিবাদন গ্রহণ

করেন। এরপর 1893 খ্রিস্টাব্দে রাশিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে এক সামরিক চুক্তি (Military Convention) সম্পাদিত হয়। ফ্রান্স রাশিয়াকে প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতি দেয়। এক্ষেত্রে স্থির হয় যে, জার্মানি বা অস্ট্রিয়া যদি এককভাবে বা যুগ্মভাবে রাশিয়া আক্রমণ করে তবে ফ্রান্স রাশিয়াকে সাহায্য করবে। অপর পক্ষে জার্মানি, অস্ট্রিয়া বা ইতালি এককভাবে বা যুগ্মভাবে ফ্রান্স আক্রমণ করে তবে রাশিয়া ফ্রান্সের পক্ষে সেনা দিয়ে সাহায্য করবে। শেষপর্যন্ত 1894 খ্রিস্টাব্দের 14 জানুয়ারি ফ্রাঙ্কো-রুশ চুক্তি গোপনে অনুমোদিত হয়। এর ফলে (ক) ফ্রান্সের মিত্রহীনতা দূর হয়, (খ) রাশিয়া জার্মান মৈত্রী বাতিল করে ফ্রান্সের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে এবং (গ) জার্মানির (অস্ট্রিয়া ইতালিরও) ট্রিপল্ অ্যালায়েন্সের বিরুদ্ধে প্রথম শক্তিশালী জোট গড়ে ওঠে।

ইঙ্গ-ফরাসি-মৈত্রী (1904) ঃ ইয়োরোপে ফ্রান্স তার নিঃসঙ্গতা কাটিয়ে উঠে রাশিয়াকে পাশে পেলেও ফ্রান্সকে ব্রিটিশ মৈত্রীর জন্য আরও দশ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। উনিশ শতকের একেবারে অন্তিম পর্বে ব্রিটেন তার ইয়োরোপীয় রাজনীতি থেকে দূরে থাকার নীতি (Splendid Isolation) পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ইংল্যান্ড isolationist policy বা দূরে নিঃসঙ্গ চলার নীতি নিয়ে চলেছিল মূলত তাদের নৌশক্তি, সামুদ্রিক বাণিজ্য এবং পৃথিবীব্যাপী উপনিবেশের মাধ্যমে নিজ স্বার্থ পূরণ হওয়ার ফলে। উপনিবেশের ব্যাপারে জার্মানি তেমন আগ্রহী না থাকায় তার সঙ্গে ব্রিটেনের বিপদ ছিল না, বরং রাশিয়া এবং ফ্রান্সের সঙ্গেই তার বিরোধ ছিল। কিন্তু জার্মান সম্রাট কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের উগ্র বিদেশ নীতি, সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব, নৌশক্তি বৃদ্ধি এবং আফ্রিকার বুয়রদের প্রতি তার মনোভাব ব্রিটেনের চিন্তার কারণ হয়। ব্রিটিশ নেতারা আশঙ্কা করেন যে, নৌশক্তি বৃদ্ধি করে জার্মানি ব্রিটেনকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করবে, উপনিবেশ দখল করবে এবং ব্রিটেনের সাম্রাজ্য কেড়ে নেবে। তৎসত্ত্বেও ফরাসি এবং রুশ বৈরিতার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ ইঙ্গ-জার্মান বন্ধুত্ব স্থাপনে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু তাদের মিত্রতার প্রস্তাব কাইজার অগ্রাহ্য করায় ব্রিটেন ফ্রান্সের দিকে হাত বাড়ায়। এর আগে 1902 খ্রিস্টাব্দে পূর্ব এশিয়াতে তারা জাপানের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন করেছিল।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা ফ্রান্স ও রাশিয়ার সঙ্গে ঔপনিবেশিক বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে মনস্থ করে। জার্মানির ব্রিটিশ বিদ্বেষ ও নৌপরিকল্পনাই এর প্রধান কারণ। অপরপক্ষে ফরাসি মন্ত্রী থিওফিল ডেলক্যাসে ব্রিটেনের সঙ্গে বিরোধ মিটিয়ে জার্মানির বিরুদ্ধে জোট গঠনে আগ্রহী হন। ব্রিটিশ সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড ফ্রান্স পরিদর্শনে গেলে (1903) এই বন্ধুত্বের মনোভাব আরও বেড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত 1904 খ্রিস্টাব্দের 4 এপ্রিল ইঙ্গ-ফরাসি মৈত্রী (Anglo-French Entente Cordiale) স্বাক্ষরিত হয়। এই মিত্রতার দ্বারা স্থির হয় যে, ফ্রান্স ও ব্রিটেন তাদের ঔপনিবেশিক বিবাদ মিটিয়ে ফেলবে;

বিশেষভাবে উত্তর আফ্রিকায়। অধ্যাপক *টমসন* এব্যাপারে মরক্কোর ক্ষেত্রে ফ্রান্সের এবং ইজিপ্টের ক্ষেত্রে ব্রিটেনের অধিকারের স্বীকৃতির দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। (It was in a sense mutual recognition of spheres of interest and influence in North Africa)।[1] কিন্তু অধ্যাপক *টেলার* বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন ব্রিটেনের যতখানি লাভ হয়েছিল, ফ্রান্সের তত হয়নি। (The British gains in Egypt operated immediately; the French gains in Morocco depended on their future exertions)।[2] শুধু উত্তর আফ্রিকা নয়, স্যাম দেশ, মাদাগাস্কার, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড ইত্যাদি সমেত সারা বিশ্বেই নিজ নিজ কর্তৃত্বে এলাকা (sphere of influences) ঠিক করে নেওয়া হয়। আসল কথা হলো পরস্পরের দীর্ঘদিনের শত্রুতা ভুলে ইঙ্গ-ফরাসি মৈত্রী জোটবদ্ধ হয়।

ইঙ্গ-রুশ মৈত্রী (1907) **:** ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী স্যার এডওয়ার্ড গ্রে মনে করেন যে ফ্রান্স বা রাশিয়া নয়, ইয়োরোপের শক্তি সাম্যের পক্ষে সবচাইতে বিপজ্জনক হলো জার্মানি। তাই তিনি ফ্রান্স ও রাশিয়াকে নিয়ে ব্রিটিশ সমঝোতার পক্ষপাতী ছিলেন। ইতোমধ্যে রুশ-জাপান যুদ্ধে (1904-05 খ্রিঃ) জাপান রাশিয়াকে পরাজিত করায়— (ক) দূর প্রাচ্যে রুশ সম্প্রসারণের সম্ভাবনা কমে যায় এবং (খ) রাশিয়া বলকান অঞ্চলে পুনরায় আগ্রহী হয়। এই অঞ্চলে অস্ট্রো-জার্মান মৈত্রী ছিল রাশিয়ার প্রতিবন্ধক। সুতরাং তাঁরা ব্রিটেনের সঙ্গে বিপদ মিটিয়ে নিতে মনস্থ করে। ফরাসি মন্ত্রী এ ব্যাপারে মধ্যস্থতা করেন। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত হ্যারল্ড উইলসনের সঙ্গে রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আইভোলাস্কির সঙ্গে আলোচনার পর 1907 খ্রিস্টাব্দের 31 আগস্ট ইঙ্গ-রুশ মৈত্রী স্বাক্ষরিত হয়।

ত্রিশক্তি আঁতাত বা ত্রিশক্তি মৈত্রী গঠন : এইভাবে ইঙ্গ-ফরাসি আঁতাত কর্ডিয়েল এবং ইঙ্গ-রুশ কনভেনশনের মাধ্যমে ব্রিটেন-ফ্রান্স-রাশিয়া পরস্পরের কাছাকাছি আসায় ত্রিশক্তি মৈত্রী বা 'ট্রিপল আঁতাত' গঠিত হয় 1907 খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ ট্রিপল্ অ্যালায়েন্স গঠিত হওয়ার পঁচিশ বছর পরে। ট্রিপল্ অ্যালায়েন্স ছিল সংযুক্ত মৈত্রীবন্ধন, তা 1882-তে গঠিত হওয়ার পর 1887, 1891, 1903 এবং 1912 খ্রিস্টাব্দে নবীকরণ করা হয়। জার্মানি-অস্ট্রিয়া-ইতালির এই গোষ্ঠীর মতন অবশ্য ফ্রান্স-ব্রিটেন-রাশিয়ার মিশ্র মৈত্রী বন্ধন ছিল না। তবে উভয় মৈত্রী বন্ধনই ছিল গোপন এবং সাময়িক। ত্রিপাক্ষিকশক্তি জোটের বিরুদ্ধে অপর ত্রিশক্তি জোটের উদ্ভব ইয়োরোপীয় রাজনীতিকেই বদলে দিয়েছিল। ত্রিশক্তি আঁতাতের মূল লক্ষ্য ছিল সম্ভাব্য জার্মান আক্রমণের হাত থেকে নিজেদের নিরাপত্তা। অধ্যাপক *ল্যাংসাম* যথার্থই লিখেছেন যে ইয়োরোপের শান্তি এমন অবস্থায় দাড়াল যে যে-কোনও অবস্থায় তা ভেঙে যেতে পারে।

---

1 টমসন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ 527
2. টেলার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. 415

৪। মৈত্রী ব্যবস্থার ফলাফল

শান্তি প্রচেষ্টার বিরূপ প্রতিক্রিয়া : ইয়োরোপীয় মৈত্রী ব্যবস্থার গঠন সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে শান্তি প্রচেষ্টা হিসেবেই এগুলি গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এর বিরূপ প্রতিক্রিয়াতেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা। মৈত্রীব্যবস্থার ফলে 1907 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ইয়োরোপে একদিকে ট্রিপল অ্যালায়েন্স ভুক্ত দেশগুলি এবং ট্রিপল্ আঁতাতভুক্ত দেশগুলি পরস্পর বিরোধী দুই জোটে বিভক্ত হলো। এর কোনও জোটই যুদ্ধের জন্য গঠিত হয়নি। এই ভাগাভাগির আগে বিসমার্ক—যাকে মৈত্রী ব্যবস্থার জনক বলা যেতে পারে, তিনিও শান্তির কথা বলেছিলেন এবং জার্মানিকে পরিতৃপ্ত দেশ ঘোষণা করেছিলেন; কিন্তু জার্মানির স্বার্থ ছিল তাঁর কাছে প্রাধান। তাই মুখে শান্তির কথা বললেও ফ্রান্সকে মিত্রহীন করে রাখাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। সুতরাং তাঁর মধ্যে স্ববিরোধীতা স্পষ্ট।

তেমনি বিসমার্কের পতনের পর জার্মানির উগ্র বিদেশ নীতি গ্রহণ এবং তাঁর সাময়িক জোটসঙ্গীদের নিয়ে কার্যকলাপ বলা হয়েছিল রক্ষণাত্মক—জাতীয় নিরাপত্তার কথা বলা হলেও শান্তির কথাও বলা হয়েছিল। আবার ট্রিপল্ অ্যালায়েন্সের বিপরীতে যখন ট্রিপল্ আঁতাত গড়ে উঠলো, তার নেতৃবর্গ জাতীয় নিরাপত্তা, স্থায়িত্ব এবং শান্তির কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু ঘটনা বয়ে চললো ভিন্ন স্রোতে। *ডেভিড টমসন* লিখেছেন যে, ট্রিপল্ অ্যালায়েন্স এবং ট্রিপল্ আঁতাঁত, উভয়েই যুদ্ধ পরিহার করতে চেয়েছিল। (Both were attempts to prevent war by appearing so strongly embatteled with allies that the other would not dare to launch an attack)। আসলে 1871 খ্রিস্টাব্দ থেকে 1914 পর্যন্ত ক্রমে ক্রমে ঘটনার গতি যে দিকে বয়ে চলেছিল তাতে ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও শান্তি বজায় থাকা সম্ভব ছিল না।

পরস্পর-বিরোধী দুই সামরিক শিবির : শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা থেকে গিয়েছিল কেননা 1907 খ্রিস্টাব্দে ইয়োরোপের বৃহৎ শক্তিবর্গ পরস্পর বিরোধী দুই সামরিক শিবিরে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। একদিকে জার্মানি, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি এবং ইতালি, বিপরীত দিকে ফ্রান্স, ব্রিটেন, রাশিয়া। সুতরাং শান্তির কথা বলা হলেও সশস্ত্র শান্তি (Armed peace) কখনও স্থায়ী হতে পারে না। বাস্তবিকপক্ষে দুই জোট গঠিত হওয়ার ফলে শক্তিসাম্য ও শান্তি স্থাপিত না হয়ে যুদ্ধের সম্ভাবনাই বেড়ে যায়। ক্রমে ক্রমে সামরিক ও কূটনৈতিক শর্ত এমন হয়ে দাঁড়ায় যে যদি জার্মানি-অস্ট্রিয়া-ইতালির কোনও এক দেশ ব্রিটেন-ফ্রান্স-রাশিয়ার কোনও এক দেশের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয় তাহলে ছয় বৃহৎ শক্তিই সেই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে। প্রত্যেক শক্তি এবং তাদের জোট নিজেদের স্বার্থে পরিচালিত হয়েছিল। ডেভিড টমসনের ভাষায়; 'Each power and each of the rival alliances, had consistently aimed not at an equal balance but at preponderance for itself

and its allies" আক্রমণের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা এক্ষেত্রে নিজ স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল, কূটনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল অর্থনৈতিক লালসা যাকে লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন 'স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে।'

জোটব্যবস্থা এবং উগ্রজাতীয়তাবাদ ঃ 1871 খ্রিস্টাব্দ থেকে 1914 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময় 'আন্তর্জাতিক নৈরাজ্যের যুগ' বলা হয়ে থাকে। কেননা আন্তর্জাতিকতার আড়ালে বেড়ে চলেছিল উগ্র জাতীয়তাবাদ (aggressive nationalism), যার দ্বারা মনুষ্যত্বই হয় পদদলিত। দেশপ্রেম ও উগ্র জাতীয়তাবাদ সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। এই উগ্র জাতীয়তাবোধকে উত্তরকালে তীব্রভাষায় সমালোচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই সমালোচনা যথার্থ কেননা, ইয়োরোপ জোট রাজনীতিতে পরস্পর বিরোধী সামরিক শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেলে, দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ, বিদ্বেষ, ঘৃণা ও ঈর্ষা যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি বেড়ে গেল সামরিক প্রতিযোগিতা। এইভাবে শক্তিসাম্যের দ্বারা আন্তর্জাতিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা মীমাংসা না করে, শান্তিকে দৃঢ় করার পরিবর্তে শক্তির আস্ফালন দ্বারা শান্তিকে বিঘ্নিত করার প্রচেষ্টাই প্রবল রূপ নেয়। এব ফলেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত।

পঞ্চম পর্ব

প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৯)

(First World War, 1914-1919)

অধ্যায় ১৭

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা, অগ্রগতি ও ফলাফল

(**Syllabus:** *Origins of the First World War–Issues and Stakes*)

১। বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি ও তৎকালীন ইয়োরোপের পরিস্থিতি

পটভূমি ঃ 1914 খ্রিস্টাব্দের 28 জুলাই অস্ট্রিয়ার সৈন্য বাহিনী যখন বলকান অঞ্চলে ক্ষুদ্র দেশ সার্বিয়া আক্রমণ করে, তখনই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা ঘটে। কেন অস্ট্রিয়া সার্বিয়া আক্রমণ করল তার প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে বলা যায় এক হত্যাকাণ্ড, যাতে অস্ট্রিয়ার যুবরাজ এবং তাঁর পত্নী এক সার্ব সন্ত্রাসবাদীর হাতে নিহত হয়েছিল। ক্রমে কূটনৈতিক ও সামরিক জোটের শর্তানুসারে সার্বিয়ার সমর্থনে রাশিয়া এগিয়ে আসে, তারপর ফ্রান্সও সমর্থন জানায়। অপরপক্ষে অস্ট্রিয়ার সমর্থনে এগিয়ে এসেছিল জার্মানি। ফলে একাধিক দেশ এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল। শুধু তাই নয়, এই যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেল পৃথিবীর নানা প্রান্তে। সেই কারণে এই যুদ্ধকে বিশ্বযুদ্ধ বা World War বলা হয়। ইয়োরোপ তথা পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম কোনও যুদ্ধকে বিশ্বযুদ্ধ বলা হলো। এর ব্যাপ্তি ছিল 1918 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। 1918 খ্রিস্টাব্দের 11 নভেম্বর জার্মানি মিত্রশক্তির কাছে আত্মসম্পর্ণ করে। 1919 খ্রিস্টাব্দে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর কুড়ি বৎসর পর 1939 খ্রিস্টাব্দে আবার একটি বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়েছিল, কিন্তু সে কাহিনী ভিন্ন। বস্তুত 1914 থেকে 1918 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ পৃথিবীর ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায় এবং তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এত ব্যাপক, ভয়াবহ এবং সর্বগ্রাসী যুদ্ধ আগে কখনো হয়নি বলেও একে 'বিশ্বযুদ্ধ' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সৈন্য ও অস্ত্রব্যবহার, সর্বাত্মক প্রকৃতি এবং ধ্বংসাত্মক ফলাফল এবং বিশাল ব্যয়বাহুল্যর জন্যেও একে বিশ্বযুদ্ধ বলা যায়।

বলকান অঞ্চলের সমস্যাই একদিন ইয়োরোপে বৃহৎ যুদ্ধের সৃষ্টি করবে, এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন বিসমার্ক। এই ভবিষ্যৎ-বাণী ফলে গিয়েছিল। বলকান এলাকায় ইয়োরোপের পূর্বাঞ্চল সমস্যা বার্লিন কংগ্রেস সমাধান করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত ঐ পূর্ব ইয়োরোপে অস্ট্রিয়া বনাম সার্বিয়ার বিরোধকে কেন্দ্র করেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত। তারপর বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপ্তি এমন যে, মানবসভ্যতার ইতিহাসে তা আগে কখনও হয়নি। আজ পর্যন্ত এ-নিয়ে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে, বিতর্ক হয়েছে।[1]

---

1. বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসের জন্য দ্র. B. H. Liddel Hart, *History of the First World War* (2nd edn. 1970); Marc Ferro, *The Great War 1914-18* (Eng. tr. 1975); Norman Stone, *The Eastern Front 1914-1917* (1975); F. P. Chambers, *The War behind the War* (1939); C. R. M. F. Cruttwel, *A History of the Great War, 1914-1918* (1934); David Stevenson, *The First World War and International Politics* (1988); Eric J. Leed, *No man's Land: Combat and Identity in World War*I.(1979).

1914 খ্রিস্টাব্দে ইয়োরোপের অবস্থা : বলকান অঞ্চলের সমস্যার সঙ্গে ইয়োরোপের বৃহৎ শক্তিবর্গের স্বার্থজনিত দ্বন্দ্ব মিলে মিশে 1914 খ্রিস্টাব্দে ইয়োরোপে যে বারুদের স্তূপের সৃষ্টি করেছিল তাতে বিশ্বযুদ্ধ একরকম অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাড়িয়েছিল।

পরস্পরবিরোধী শক্তির সামরিক শিবিরে বিভক্ত হয়ে যাওয়াই ছিল আত্মঘাতী। *ডেভিড টমসন* লিখেছেন, "By 1914 the sick man of Europe was no longer Turkey: it was Europe itself, feverish and turbulent, and with strong suicidal tendencies"।[1] এই আত্মঘাতী প্রবণতা 1914 খ্রিস্টাব্দে সৃষ্টি হয়নি। কেউ না চাইলেও তা 1871 খ্রিস্টাব্দের পর থেকে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে সৃষ্টি হয় এবং বিশ্বযুদ্ধ সেই আত্মঘাতী প্রবণতারই বহিঃপ্রকাশ। *টমসন* তাই মন্তব্য করেছেন, "প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই যে, এই যুদ্ধ ছিল অযাচিত, অ-ভাবিত এবং 1871 খ্রিস্টাব্দ থেকে যে দীর্ঘ ঘটনাবলীর স্রোত বইতে থাকে তারই চূড়ান্ত পরিণতি।"[2]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে বিজয়ী শক্তিবর্গ বিশ্বযুদ্ধের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে জার্মানির উপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু তা অতি সরলীকরণ। শুধু জার্মানির জন্য বিশ্বযুদ্ধ হয়েছে এমন ভাবা ঠিক নয়। অধ্যাপক *জেমস জোল* ঠিকই লিখেছেন, "বিশ্বযুদ্ধের কারণ হিসেবে কোনও একক ব্যাখ্যা অতি সরলীকরণ হয়ে যাবে" (Any single explanation for the outbreak of war is likely to be too simple)।[3] একথা সত্য যে 1914 খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে চূড়ান্ত সংকটকালে জার্মান সরকারের আচরণে যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটে। কিন্তু যেভাবে প্রত্যেক দেশ যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েছিল তাতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে এটি ছিল সমন্বিত ঘটনাবলীর মিলিত ফসল। ("The enthusiasm with which war was greeted by large sections of opinion in all the belligerent countries and the assumption by each of the governments concerned that their vital national interests were at stake were the results of an accumulation of factors–intellectual, social, economic, and even psychological, as well as political and diplomatic–which all contributed to the situation in 1914.")[4]

সুতরাং 1914 খ্রিস্টাব্দে ইয়োরোপের অবস্থা একদিনে সৃষ্টি হয়নি, তা যেমন দীর্ঘদিনের ঘটনা পরম্পরার ফল, তেমনি এটি কোনও নির্দিষ্ট কারণেও সৃষ্টি হয়নি, তা

1. ডেভিড টমসন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. 541

2. "The most important thing about the First World War is that it was the unsought, unintended end producet of a long sequence of events which began in 1871". তদেব, পৃ. 532.

3. জেমস জোল, পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ. 169

4. তদেব

নানা কারণের ফসল। ট্রিপল্ অ্যালোয়েন্স এবং ট্রিপল্ আঁতাত ইয়োরোপে শক্তি সাম্য স্থাপনের বদলে এক সংঘাতের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিল। সুতরাং এক্ষেত্রে সকলেরই নৈতিক দায়িত্ব অস্বীকার করা যায় না। তাছাড়া অনেক দেশই পারস্পরিক ঈর্ষা, বিদ্বেষ, ঘৃণা, সন্দেহবাদ; উগ্র জাতীয়তা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সামরিক প্রস্তুতি নিয়ে ছিল।সেই সঙ্গে যুক্ত ছিল ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থ ও দ্বন্দ্ব। সব মিলে যুদ্ধের সম্ভাবনা 1914 খ্রিস্টাব্দে ছিল যথেষ্ট।

২। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ

পটভূমিকা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'লড়াইয়ের মূল' শীর্ষক এক সমসাময়িক রচনায় বিশ্বযুদ্ধের পিছনে অন্যতম প্রধান কারণের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর মতে "সম্প্রতি পৃথিবীতে বৈশ্য রাজক যুগের পত্তন হইয়াছে। বাণিজ্য এখন আর নিছক বাণিজ্য নহে, সাম্রাজ্যের সঙ্গে একদিন তার গান্ধর্ব বিবাহ ঘটিয়া গেছে। এক সময়ে জিনিসই ছিল বৈশ্যের সম্পত্তি, এখন মানুষ তার সম্পত্তি হইয়াছে। এ সম্বন্ধে সাবেককালের সঙ্গে এখনকার কালের তফাত কি বুঝিয়া দেখা যাক: সে আমলে যেখানে রাজত্ব, রাজাও সেইখানেই, জমাখরচ সব একজায়গাতেই। কিন্তু এখন বাণিজ্য প্রবাহের মতো রাজত্বপ্রবাহের দিনরাত আমদানি রপ্তানি চলিতেছে। ইহাতে পৃথিবীর ইতিহাসে সম্পূর্ণ নূতন কাণ্ড ঘটিতেছে—তাহা এক দেশের উপর আর এক দেশের রাজত্ব। এই সেই দুই দেশ সমুদ্রের দুই পারে।" অর্থাৎ ইয়োরোপে যে উগ্রজাতীয়তার সৃষ্টি হয়েছে, তার পিছনে ইন্ধন যুগিয়েছে সামরিকতাবাদ। তাছাড়া উগ্রজাতীয়তা ও সামরিকতা উভয়ের মূল প্রেরণায় বৈশ্যবুদ্ধি অর্থাৎ বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক প্রাধান্য স্থাপনের দ্বন্দ্ব ঘটেছে। সুতরাং 1914 খ্রিস্টাব্দে শুধু জার্মানি নয়, সমগ্র ইয়োরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের মধ্যে'ই যে সাম্রাজ্যবাদী লালসা বেড়ে উঠেছিল তাই লড়াইয়ের মূল কারণ।[1] বিশ্ব-যুদ্ধের কারণ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যেও অনেক বিতর্ক, অনেক আলোচনা হয়েছে।[2] তাই 1914 খ্রিস্টাব্দের ঐ সেরাজেভো হত্যাকান্ড এই সর্বগ্রাসী যুদ্ধের তাৎক্ষণিক ও প্রত্যক্ষ কারণ হলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রকৃত ও মৌলিক কারণ ছিল না। বস্তুত বহুদিন নানাকারণে ইয়োরোপে যে বারুদ জমেছিল 1914 খ্রিস্টাব্দে তাতে অগ্নিসংযোগ হয়। সুতরাং সর্বাগ্রে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মৌলিক (fundamental) কারণগুলির দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

---

1. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'লড়াইয়ের মূল', *কালান্তর*, রবীন্দ্র রচনাবলী, 24 খণ্ড, পৃ. 271-72

2. দ্র. S. B. Fay, *The Origins of the World War* (19310) N. Mansergh, *The Coming of the First World War* (1949); L. C. F. Turner, *Origins of the First World War (1970);* Laurence Lafore, *The Long Fuse* (1965), James Joll, *The Origins of the First World War* (1984); Vladimir Dedijer, *The Road to Sarajevo* (1967) ইত্যাদি।

(i) উগ্র জাতীয়তাবাদ : 1870 থেকে 1914 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ইয়োরোপে উগ্র জাতীয়তাবাদ (Aggressive Nationalism) যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল তা ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে জাতীয়তাবাদ ক্রমে ক্রমে ইয়োরোপে অন্যতম প্রেরণা শক্তি হিসেবে দেখা দেয়। এর সঙ্গে ছিল দেশপ্রেম, বৈপ্লবিক সাম্য, প্রজাতন্ত্র ইত্যাদির যোগ। ফলে জাতীয়তাবাদ রক্ষণশীল ও উগ্র রাজতন্ত্র-বিরোধী জাতীয় মর্যাদা ও গৌরবের প্রতীক হয়ে দাড়ায়। এর ফলেই জার্মানি ও ইতালি ঐক্যবদ্ধ হয় এবং অনেক নতুন রাজ্যের উদ্ভব হয় বলকান অঞ্চলে। কিন্তু 1870 খ্রিস্টাব্দের পর থেকে জাতীয়তাবাদ ক্রমেই সংকীর্ণ ও উগ্র হতে থাকে। ফলে ইয়োরোপের দেশগুলির মধ্যে দেখা দেয় পারস্পরিক ঈর্ষা, সন্দেহ, ঘৃণা ও বৈরী ভাব। ফলে সংঘাত হয়ে ওঠে অনিবার্য। এই উগ্র জাতীয়তাবাদকেই তীব্র সমালোচনা করেছেন *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর* তাঁর 'ন্যাশানালইজম' গ্রন্থে। এই উগ্র জাতীয়তাবাদ ফরাসি, জার্মান, সার্ব, শ্লাভ, রুশ ইত্যাদি সকল জাতির মধ্যেই ছিল। সেডানের যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয়, জার্মানির হাতে প্যারিসের পতন, ফ্রান্সের মূল্যবান কয়লা ও লোহার খনি অঞ্চল আলসাস-লোরেন জার্মান অধিকারে চলে যাওয়া ফরাসি জাতীয়তাবাদে আঘাত দিয়েছিল এবং ফ্রান্স পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর ছিল। জার্মানি নিজেদের টিউটনিক জাতির, ফ্রান্স ল্যাটিন সভ্যতার, ব্রিটেন অ্যাংলো-স্যাক্সন জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে চাইত। আবার উগ্র জাতীয়তাবাদের ফলেই বলকান অঞ্চলে বিভেদ ও বৈরিতার সৃষ্টি করেছিল।

উগ্র জাতীয়তাবাদ জাতির গৌরবের প্রতীক হয়ে দাঁড়াবার পরিবর্তে অনেক সময়ই অপর জাতির বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে পারে। এজন্য খ্যাতানামা ইংরেজ মনীষী লর্ড অ্যাকটন জাতীয়তাবাদকে একটি অবাস্তব ও অপরাধমূলক আদর্শ বলেছেন। উনিশ শতকের শেষ ও বিংশ শতকের গোড়ার দিকে ইয়োরোপে যে জাতীয়তাবাদের প্রসার হয় তা ছিল উগ্র, স্বার্থমগ্ন, সংকীর্ণ। অর্থাৎ নিজের দেশ ও জাতিকে শ্রেষ্ঠ মনে করার সঙ্গে সঙ্গে অপর দেশ ও জাতিকে নিজেদের পদানত করার ইচ্ছা এর মধ্যে নিহিত ছিল। জার্মানিতে ইতিহাসবিদ হাইনবিষ ফন ট্রিটস্কি, বার্ণহার্ডি থেকে কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম পর্যন্ত সকলেই এই স্বপ্নে বিভোর ছিলেন। তারা টিউটনিক জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে ব্যস্ত ছিলেন। ইংরেজ লেখক হোমার লী অ্যাংলো স্যাকসন জাতির, ফ্রান্সে ফ্রেমাঁসু, পয়েনকার প্রমুখ ল্যাটিন জাতির প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। অনেকেই মনে করতেন ল্যাটিন জাতির সঙ্গে টিউটনিক জাতির সংঘর্ষ অনিবার্য। শুধু উগ্র জাতীয়তাবাদই নয়, অতৃপ্ত ও অপূর্ণ জাতীয়তাবাদও ইয়োরোপে যুদ্ধের মানসিকতা সৃষ্টি করেছিল। সেডানের যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয়ের গ্লানি, বিশেষত আলসাস-লোরেন হারাবার বেদনা ফ্রান্সের মনে প্রতিশোধ স্পৃহা জাগিয়ে রেখে ছিল। ইতালি ঐক্যবদ্ধ হলেও ট্রেনটিনো ও ট্রিয়েস্ট নামক ইতালিয় ভাবাভাষী দুটি স্থান অস্ট্রিয়ার অধিকারে থেকে গিয়েছিল। বলকান জাতিগুলির মধ্যেও অপূর্ণ জাতীয়তাবাদ এক অগ্নিগর্ভ অবস্থার সৃষ্টি করেছিল।

(ii) সামরিকবাদ ঃ সামরিকবাদ (Militarism) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দ্বিতীয় কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে। যুদ্ধের পঞ্চাশ বছর আগে থেকে ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের মধ্যে তীব্র সামরিক প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। ভবিষ্যতে আত্মরক্ষার প্রয়োজন অথবা যুদ্ধের কারণে প্রতি দেশই অস্ত্রনির্মাণ, সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি, নৌবাহিনী বৃদ্ধি ইত্যাদিতে মনোনিবেশ করে। যুদ্ধভীতির জন্য তারা বাজেটের বিরাট অংশ সমরসজ্জা ও সামরিক খাতে ব্যয় করত। তাছাড়া সামরিক বিভাগের ব্যক্তিগণ ও যুদ্ধাস্ত্র নির্মাতা শিল্পপতিগণও রাজনীতিবিদদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

স্থল শক্তিতে জার্মানি এবং জলশক্তিতে ব্রিটেন ছিল অপ্রতিহত। ক্রমে জার্মানি ব্রিটেনকে নৌশক্তিতে চ্যালেঞ্জের সামনে দাড় করিয়েছিল। 1897, 1898 এবং 1900 খ্রিস্টাব্দে জার্মানি নৌনির্মাণ আইন পাস করিয়ে বড়ো এবং মাঝারি পাল্লার যুদ্ধজাহাজ এবং সাবমেরিন নির্মাণ শুরু করায় ব্রিটেন ভীতসন্ত্রস্ত হয়। আবার 1903খ্রিঃ থেকে ব্রিটেন জার্মানির নৌচ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে এবং দ্রুত উত্তর সাগরীয় নৌবহর নামে একটি নতুন ন্যাভাল ফ্লিট তৈরি করে। অন্যদিকে ইঙ্গ-ফরাসি আঁতাত কর্ডিয়েল দ্বারা ভূমধ্যসাগরে পাহারাদারীর দায়িত্ব ফরাসি নৌবহরকে দিয়ে ব্রিটেন নর্থ সি এবং ইংলিশ চ্যানেলে তার নৌশক্তিকে সংহত করে। জার্মানি-ব্রিটেন নৌশক্তির প্রতিযোগিতা সামরিকতাবাদের প্রধান উদাহরণ। এছাড়া ফ্রান্স, ব্রিটেন, জার্মানি, রাশিয়া প্রভৃতি দেশগুলির মধ্যে স্থল বাহিনীর সংগঠন এবং অস্ত্রনির্মাণের প্রতিযোগিতাও কম হয়নি। 1913 খ্রিস্টাব্দের ফ্রান্স নতুন সৈন্য গঠন আইন পাস করে এবং প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের তিন বৎসরের জন্য সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করে। একইভাবে রাশিয়াও সাড়ে তিন বছরের জন্য সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করে। 1913 খ্রিস্টাব্দে জার্মানির সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ায় 8,70,000। প্রত্যেক দেশই মারণাস্ত্র তৈরি শুরু করে। বস্তুত সামরিক অস্ত্রনির্মাতা পুঁজিবাদী শিল্পপতিগণ যুদ্ধাস্ত্র বিক্রির প্রয়োজনে যুদ্ধবাজ মিলিটারি নেতৃবর্গ, এমনকি রাজনীতিবিদদের উপরও প্রভাব খাটাতে শুরু করে। 1899 খ্রিঃ এবং 1907 খ্রিস্টাব্দে দুটি আন্তর্জাতিক আইনকংগ্রেস নেদারল্যাণ্ডস্ -এর দ্য হেগ নগরীতে অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখানে আন্তর্জাতিক ঐক্যমত্য ঘটিয়ে অস্ত্রহ্রাসের কথা বলা হলেও তাতে বিন্দুমাত্র কাজ হয়নি। বরং অস্ত্রহ্রাসের প্রস্তাবগুলিকেই সন্দেহের চোখে দেখা হয়। আন্তর্জাতিক রেডক্রসের আবেদনও নিষ্ফল হয়। এই সামরিক প্রতিযোগিতাই বিশ্বযুদ্ধকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে।

(iii) বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ঃ উনিশ শতকের শেষভাগে ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের ঔপনিবেশিক বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রবণতা আন্তর্জাতিক সমস্যাকে বিষাক্ত করে তুলেছিল। বিশ শতকের অনেক আগেই ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, পর্তুগাল, স্পেন ইয়োরোপের বাইরে অনুন্নত ভূভাগগুলি অধিকার করে নিজ নিজ সাম্রাজ্যকে সম্প্রসারিত করে। এদের সকলেই ছিল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপনে অগ্রণী। জার্মানি ও

ইতালি উভয় রাষ্ট্র যখন ঐক্য ও সংহতি বিধানের মাধ্যমে জাতীয় রাষ্ট্র হিসেবে মর্যাদা লাভ করল (1870 খ্রিঃ) তখন থেকে তারাও ইয়োরোপের বাইরে উপনিবেশ স্থাপনের প্রচেষ্টা শুরু করল। কিন্তু তাদের জন্য উর্বর ও বসবাসের উপযোগী কোনও ভূখণ্ডই অবশিষ্ট ছিল না। তবুও বিশ শতকের সূচনা থেকে তারা ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হলো। স্বভাবতঃই এদের ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হলো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা পর্যন্ত এই ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রবণতা ক্রমেই তীব্রতর হলো।

বস্তুতপক্ষে ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলি বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ঔপনিবেশিক বাজার দখলের লড়াই এক যুদ্ধের উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল। এই ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ শিল্পায়নের ফসল বলা যেতে পারে। লেনিন সঠিকভাবেই দেখিয়েছেন যে, 'সাম্রাজ্যবাদ হলো ধনতন্ত্রের সর্বোচ্চ স্তর'। উৎপাদনব্যবস্থার রূপান্তর আর বাড়তি শিল্প পণ্যের সৃষ্টি এবং উদ্বৃত্ত মূলধনের সঞ্চয়ের ফলে শিল্পপতি পুঁজিবাদী শ্রেণী ক্ষমতাবান হন। শাসনব্যবস্থার উপর চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হিসেবে তাদের ভূমিকা ছিল প্রধান। এর ফলেই একদিকে উদ্বৃত্ত পণ্যের লাভজনক বিক্রয় এবং অন্যদিকে সঞ্চিত মূলধনের অর্থকরী বিনিয়োগই পুজিপতি শ্রেণীর চাপে দেশগুলিকে উপনিবেশ দখল ও বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতায় প্ররোচিত করে তোলে। হবসন এই অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ বলেছেন।

ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ *জে. এ. হবসন* বিশদভাবে দেখিয়েছেন যে, ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণের পিছনে সক্রিয়ভাবে ক্রিয়াশীল ছিল শিল্পোন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক শক্তিগুলি। তারই অনুসরণে লেনিন দেখিয়েছিলেন, পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তরই হলো সাম্রাজ্যবাদ। সুতরাং রাজনৈতিক বা অন্য যে-কোনও ব্যাখ্যাই দেওয়া হোক না কেন, এই তত্ত্বে বলা হচ্ছে মূল প্রেরণা হলো অর্থনৈতিক ("This economic explanation of the urge to imperialism is usually taken to mean that the basic motives were also the basest motives and that, whatever political, religious, or more idealistic excuses might be made, the real impulse was always one of capitalistic greed for cheap raw materials, advantageous markets, good investments, and fresh fields of exploitation")।[1] এই যে কাঁচামাল সংগ্রহ, বাজার দখল, বিনিয়োগের স্থান এবং শোষণের ক্ষেত্র দখলের লড়াই, তাই সাম্রাজ্যবাদের বনিয়াদ এবং সেই সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বযুদ্ধের পথ সুগম করেছিল। এই সাম্রাজ্যবাদী উন্মাদনা ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গের মধ্যে তীব্র রেষারেষির সৃষ্টি করে যুদ্ধের দিকে ঠেলে দেয়।

1. ডেভিড টমসন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. 489

(iv) সামরিক চুক্তি ও পরস্পর বিরোধী রাষ্ট্রজোট ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল 1870 খ্রিস্টাব্দ থেকে 1914 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের মধ্যে গোপন সামরিক এবং রাজনৈতিক চুক্তি। এর ফলে শেষপর্যন্ত ইয়োরোপ দুই সামরিক শিবিরে পরিণত হলো। এজন্যই বলা হয়েছিল 'Europe was divided into two armed camps'। জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও ইতালি একত্রে গড়ে তুলল ত্রিশক্তি চুক্তি (Triple Alliance) এবং ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া একত্রে গড়ে তুলল ত্রিশক্তি মৈত্রী (Triple Entente)। দুটি শিবিরই সামরিক শক্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রথম মহাযুদ্ধের পরিবেশ গড়ে তুলল। মহাযুদ্ধের পূর্বাবধি যে শান্তির পরিবেশ গড়ে উঠেছিল সেই আপাত শান্তিকে বলা হয় সশস্ত্র নিরপেক্ষতার যুগ (Age of Armed Neutrality)। এই আপাত শান্তির আড়ালে প্রত্যেকটি দেশ আধুনিক সমর-সজ্জায় সজ্জিত হয়েছিল। ইয়োরোপে মৈত্রী-নীতির (System of Alliances) প্রথম সফল উদ্গাতা বিসমার্ক। 'রক্ত ও লৌহ নীতি' অর্থাৎ সামরিক শক্তির জোরে জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করার পর তিনি কূটনৈতিক মৈত্রীর সাহায্যে শক্তিসাম্য বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। তাঁর মৈত্রীব্যবস্থার মূল কথাই ছিল ফ্রান্সকে মিত্রহীন বা কূটনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন করে রাখা, যাতে ফ্রান্স পরাজয়ের প্রতিশোধ না নিতে পারে। এজন্য বিসমার্ক প্রথমে অস্ট্রিয়া ও রাশিয়াকে নিয়ে তিন সম্রাটের চুক্তি বা ড্রেইকাইজারবুণ্ড এবং তা ব্যর্থ হলে প্রথমে অস্ট্রিয়াকে নিয়ে দ্বৈত চুক্তি (1879) এবং পরে সেই সঙ্গে ইতালিকে মিলিয়ে নিয়ে ত্রিপাক্ষিক জোট (Triple Alliance) তৈরি করেন (1882)। এরপর রাশিয়া যাতে ফ্রান্সের দিকে চলে না যায় সেইজন্য করেছিলেন রি-ইনসিওরেন্স চুক্তি (1887)। পরে বলকান অঞ্চলে অস্ট্রিয়া-রুশ বৈরিতায় কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম অস্ট্রিয়ার পক্ষ নিলে রাশিয়া ফ্রান্সের সঙ্গে চুক্তি করে (1894)। ইংল্যাণ্ডও তাঁর দীর্ঘদিনের 'চমৎকার বিচ্ছিন্নতা' ত্যাগ করে শেষপর্যন্ত ফ্রান্সের সঙ্গে (1904) এবং রাশিয়ার সঙ্গে (1907) চুক্তি করে। ফলে জার্মানি-অস্ট্রিয়া-ইতালির ত্রিশক্তি জোটের বিরুদ্ধে ত্রিপাক্ষিক মৈত্রী বা আঁতাত গড়ে ওঠে ফ্রান্স-ইংল্যাণ্ড-রাশিয়ার মধ্যে। ফলে অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়ায় যে, পরস্পর বিরোধী জোটভুক্ত যে-কোনও দুটি দেশের মধ্যে যুদ্ধ হলে সবাই জড়িয়ে পড়বে।

এইভাবে সমগ্র ইয়োরোপ শেষ পর্যন্ত এমন এক অবস্থায় এসে দাঁড়ায় যে সামান্য দুর্ঘটনা থেকেই সর্বগ্রাসী যুদ্ধ হওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। প্যারিসের জার্মান রাষ্ট্রদূত উইলহেলম্ ফন শোয়েন-এর উক্তি উদ্ধৃত করে অধ্যাপক *ল্যাংসাম* তাঁর 'ওয়ার্ল্ড সিন্স নাইনটিন নাইনটিন' গ্রন্থে লিখেছেন যে, 'Peace remains at the mercy of an accident'। বস্তুতপক্ষে উগ্রজাতীয়তাবাদ, ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক দ্বন্দ্ব, সামরিকতাবাদ ইত্যাদির ফলে পারস্পরিক সন্দেহ, ঈর্ষা, বিদ্বেষ যতই বাড়তে থাকে ততই গোপন

কূটনীতির মাধ্যমে সামরিক শর্তাবলী সমন্বিত গোপন যুক্তির প্রসার ঘটে। ইয়োরোপ দুই বিবাদমান সশস্ত্র সামরিক শিবিরে বিভক্ত হয়ে যায় এবং নিজ নিজ সামরিক শক্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে এক ভয়ংকর যুদ্ধের পরিবেশ গড়ে তোলে।

বিসমার্ক যতদিন জার্মানির চ্যান্সেলার ছিলেন, তার মধ্যেই তিনি জোট ব্যবস্থার উদ্ভাবন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর লক্ষ্য ছিল যাতে ইয়োরোপে শান্তি বিঘ্নিত না হয়। এটি ছিল আপাত লক্ষ্য, আসল লক্ষ্য ছিল ফ্রান্সকে বিচ্ছিন্ন এবং মিত্রহীন করে রাখা। তিনি ট্রিপল্ অ্যালায়েন্স গঠনের মাধ্যমে সফলও হয়েছিলেন। আমরা যথাস্থানে তা আলোচনাও করেছি। কিন্তু নব-নিযুক্ত জার্মান সম্রাট কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের সঙ্গে তার মত পার্থক্য, 1890 খ্রিস্টাব্দে বিসমার্কের পদচ্যুতি এবং কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের বিসমার্কীয় শান্তিবাদী নীতি পরিত্যাগ করে বিশ্বরাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে প্রাধান্য স্থাপন করতে গিয়ে জার্মান বিরোধী রাষ্ট্রজোট গড়ে ওঠে। ফ্রান্সও ব্রিটেন এবং রাশিয়াকে নিয়ে ট্রিপল্ আতাঁত গঠন করতে সমর্থ হয়। আমরা যথাস্থানে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে তাও আলোচনা করেছি। এখানে যা উল্লেখ করা দরকার তা হলো, উভয় জোট শান্তি রক্ষার পরিবর্তে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও ভীতির সঞ্চার করে এবং প্রত্যেকটি রাষ্ট্র এক ভয়াবহ যুদ্ধের আশঙ্কায় কালযাপন করতে থাকে। 1906 খ্রিস্টাব্দ থেকে 1914 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নানা আন্তর্জাতিক সংকটের সময়ে এই পরস্পর বিরোধী দুই সামরিক শিবির সম্মুখীন হলেও যুদ্ধ হয়নি। অবশ্য মরক্কোর ক্ষেত্রে জার্মানি ও ইতালি, আর বলকান যুদ্ধে রাশিয়া অপদস্থ হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত এই সামরিক মৈত্রীর শর্তের ফলেই অস্ট্রিয়া-সার্বিয়ার বিরোধকে কেন্দ্র করে বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়।

(v) **পীত সাংবাদিকতার ভূমিকা** ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে প্রায় পঁচিশ-তিরিশ বছর ধরে ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে একশ্রেণীর সংবাদপত্র যুদ্ধের জন্য প্রচার, পারস্পরিক ঈর্ষা ও সন্দেহ বাড়িয়ে দিয়ে যুদ্ধের ইন্ধন যোগায় এবং মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন ক'রে জনমত উত্তেজিত করে চলেছিল। যুদ্ধোন্মাদনা সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই ধরনের পীত সাংবাদিকতার (Yellow Journalism) ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না।

(vi) **কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংকট** (1906-1914) ঃ ফ্রান্সকে পরাজিত ক'রে জার্মানির চ্যান্সেলার বিসমার্ক মন্তব্য করেছিলেন যে, 'জার্মানি পরিতৃপ্ত দেশ' (Satiated Country)। অন্যদিকে আলসাস ও লোরেন প্রদেশ হস্তচ্যুত হওয়ায় ফ্রান্স ছিল সর্বাধিক বিক্ষুব্ধ। এই ফ্রান্সকে মিত্রচ্যুত করে রাখার উদ্দেশ্যে প্রতিরক্ষাব্যবস্থা হিসাবে বিসমার্ক গড়ে তুলেছিলেন ত্রিশক্তি মৈত্রী (Triple Alliance)। এই ত্রিশক্তির মধ্যে ছিল জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও ইতালি। বিসমার্কের পর কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম (1888-1918) ঔপনিবেশিক

সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতি অবলম্বন করেই বুঝিয়ে দিলেন যে, জার্মানি পরিতৃপ্ত নয়, অপরিতৃপ্ত দেশ। কাইজারের আগ্রাসী নীতি পশ্চিম ইয়োরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির মনে ভীতির সঞ্চার করল। ফলে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার মিলনে গড়ে উঠল ত্রিশক্তি আতাঁত। কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের নিকট এই আঁতাত ছিল তাঁর সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থের পথে প্রবল বাধা। এই বাধা অপসারণে কাইজার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। ফলে সৃষ্টি হলো কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংকট যেগুলি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকা তৈরি করেছিল। এই সংকটগুলি হলো—

(ক) মরক্কো সংকট : মরক্কো হলো আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিমাংশের একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র। ফ্রান্স এখানে অধিকার প্রতিষ্ঠায় তৎপর ছিল। ঔপনিবেশিক দ্বন্দ্ব মীমাংসা উপলক্ষে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স 1901 খ্রিস্টাব্দে ইঙ্গ-ফ্রেঞ্চ কনভেনশন (Anglo-French Convention) নামে এক মৈত্রী চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। এই কনভেনশনে মিশরে ইংরেজ এবং মরক্কোতে ফরাসি অধিকার স্বীকৃত হয়। মরক্কোতে জার্মানিও উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার আশা পোষণ করত। তাই জার্মানি মরক্কোতে ফরাসির বিশেষ অধিকারের প্রতিবাদ করে। কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম নিজেই মরক্কোর অন্যতম শহর তাঞ্জিয়ারে উপস্থিত হয়ে মুসলিমদের স্বাধীনতা ও মরক্কোর অখণ্ডতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের দাবি জানান। সেই দাবি অনুসারে 1906 খ্রিস্টাব্দে আলজিয়ার্স-এ বৈঠক বসে। এই বৈঠকে অবশ্য কোনও পক্ষের বিশেষ কোনও সুবিধা হয়নি। অবশেষে 1909 খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যে স্বাক্ষরিত এক চুক্তিতে ফ্রান্স সমতার ভিত্তিতে মরক্কোতে জার্মানির রাজনৈতিক বিশেষ অধিকার স্বীকার করে।

মরক্কোর সংকট অবশ্য অত সহজে মেটেনি। মরক্কোতে জার্মানি ও ফ্রান্সের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হয়ে ছিল তিনবার এবং পরে আগাদির সংকটও এরই ফসল বলা যেতে পারে। 1895 খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত মরক্কো ছিল অটোমান তুর্কি সাম্রাজ্যের অন্তর্গত; 1894 খ্রিস্টাব্দে সুলতান মুলে হাসানের মৃত্যুর পর ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গ বিশেষত ফ্রান্স ঐ দেশ দখলে উৎসাহী হয়। *ডেভিড টমসন* লিখেছেন যে, "This unhappy land was to prove a source of international dispute on three occasions between 1905 and 1911"। ফ্রান্স নিজের স্বার্থে মরক্কো দখলে রাখতে চেয়েছিল, কারণ পাশের আলজিরিয়া এবং ইকুয়েডর ছিল ফরাসি উপনিবেশ। ব্রিটিশদেরও বাণিজ্যিক স্বার্থ ছিল, সেই কারণেই 1904 খ্রিস্টাব্দের ইঙ্গ-ফরাসি মৈত্রীর পর ফ্রান্স-ব্রিটেন মিলিতভাবে যথাক্রমে মরক্কো এবং ইজিপ্টে নিজেদের স্বার্থ স্বীকার করে নেন। কিন্তু জার্মানির কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম এবং চ্যান্সেলার বুলো মরক্কোর সুলতানের স্বাধীনতার জন্য সমর্থন জানালে সংকটের সৃষ্টি হয়। আসলে জার্মানি ফ্রান্সকে বাধা দিতে চেয়েছিল। পারেনি, বরং ফ্রাঙ্কো-ব্রিটিশ মৈত্রী

আরও দৃঢ় হয়। 1906 -এর আলজিয়ার্স সম্মেলনেও সংকট কাটেনি। 1908 খ্রিস্টাব্দে ফরাসিরা ক্যাসাব্ল্যাঙ্কা শহরে জার্মান দূতাবাস আক্রমণ করলে আবার সংকট সৃষ্টি হয় এবং 1909 খ্রিস্টাব্দে আবার সমঝোতার ভিত্তি সাময়িক মীমাংসা হয়। ফ্রান্স জার্মানির অর্থনৈতিক স্বার্থ মেনে নিলে, তবেই জার্মানি ফ্রান্সের রাজনৈতিক প্রাধান্য মেনে নেয়।

(খ) আগাদির সংকট ঃ উপরোক্ত ফ্রান্স ও জার্মানির সন্ধিতে কাইজার মোটেই খুশি হতে পারেননি। বরং মরক্কোর উপর ফ্রান্সের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব যখন বৃদ্ধি পেল তখন সেই অবস্থা কাইজারকে আরও ক্ষুব্ধ করে তুলল। ঠিক এই সময় (1911) মরক্কোর রাজধানী ফেজ-এ (Fez) এক শ্রেণীর বর্বর উপজাতি বিদ্রোহ করলে ফ্রান্স সেই বিদ্রোহ দমন করতে অগ্রসর হয়। তখন বিক্ষুব্ধ জার্মানি আগাদির বন্দরে এক যুদ্ধ জাহাজ প্রেরণ করল। ফলে ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিল। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইংল্যাণ্ডও ত্রিশক্তি আতাঁতের শর্ত অনুসারে একটি যুদ্ধ জাহাজ প্রেরণ করে। তখন জার্মানি বাধ্য হয়ে মরক্কোতে ফ্রান্সের প্রতিপত্তি স্বীকার করে। অবশ্য ফ্রান্সও সেখানে মুক্তদ্বার নীতি (Open door Policy) স্বীকার করে এবং ফ্রান্স কর্তৃক অধিকৃত ফরাসি-কঙ্গোর কিছু অংশ জার্মানিকে দিতে অস্বীকার করলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব মুহূর্তে এই ঘটনাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কারণ, লক্ষ্য করা যায়, এর দ্বারা ইংরেজ-ফরাসি মৈত্রী বা ত্রিশক্তি আঁতাত সুদৃঢ় হলো। অন্যদিকে জার্মানির ক্ষোভ প্রশমিত হলো না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ হিসেবে এর প্রতিফলনও অবশ্যম্ভাবী হলো।

বস্তুত আগাদির সংকট ছিল মরক্কোর পূর্বোক্ত সংকটেরই পরিণতি। ফরাসি বাহিনী যখন মরক্কোর রাজধানী ফেজ দখল করলো, জার্মানি ক্ষতিপূরণের দাবিতেই 'প্যান্থার' নামক যুদ্ধ জাহাজ পাঠায়। ব্রিটেন ফ্রান্সের সমর্থনে জাহাজ প্রেরণ করলে অবস্থা ঘোরালো হয়ে ওঠে। *ডেভিড টমসন* লিখেছেন যে, আগাদির সংকটের ফলে শুধু ফ্রান্স-জার্মান নয়, জার্মান-ব্রিটেন সম্পর্কেরও অবনতি হয়। দুই দেশের জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী আবহাওয়াই বিশ্বযুদ্ধের পথ সুগম করে ("The main effect of the crisis of Agadir was to accentuate Anglo-German rivalry and distrust and to inflame public opinion in the cause of national prestige")।

(গ) বলকান সংকট ঃ মরক্কোর সংকট অপেক্ষা বলকান সংকট ছিল মাত্রাতিরিক্ত জটিল। এই সংকট শেষ পর্যন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে একটা অনিবার্য ঘটনায় পরিণত করে। পতনোন্মুখ তুরস্কের বলকান ছিল বহু জাতি ও গোষ্ঠী অধ্যুষিত একটা অঞ্চল। ইয়োরোপীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলি এই অঞ্চলের অধিবাসীদের মনে স্বাধীনতার আশা জাগিয়ে তোলে। বলকানের বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা অঞ্চল দুটিতে শ্লাভ জাতির

বসবাস ছিল। সার্বিয়ার শ্লাভদের সঙ্গে তাদের মিল থাকায় তারা সার্বিয়ার সঙ্গে মিলনের আশা পোষণ করত। কিন্তু বার্লিন সন্ধিতে (1878 খ্রিঃ) অস্ট্রিয়াকে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার উপর নামমাত্র শাসনের অধিকার দেওয়া হয়। 1908 খ্রিস্টাব্দে তুরস্কের গৃহবিবাদের (তরুণ তুর্কি আন্দোলন) সুযোগে অস্ট্রিয়া উক্ত দুটি অঞ্চলকে পুরোপুরি নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করে। অস্ট্রিয়ার এই কাজের পেছনে ছিল জার্মানির সমর্থন। শ্লাভ অধ্যুষিত সার্বিয়ার জনগণ এই সংযুক্তিকরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাল। ইংল্যাণ্ড ও রাশিয়া সার্বিয়াকে সমর্থন করল। ইতোপূর্বে রাশিয়া রুশ-জাপান যুদ্ধে (1905 খ্রিঃ) পরাজিত হওয়ায় অনেকখানি শক্তিহীন হয়ে পড়েছিল। তাই অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা তার পক্ষে সম্ভব হলো না ফলে আপাততঃ অস্ট্রিয়া ও জার্মানি কূটনৈতিক সাফল্য লাভ করল। কিন্তু সার্বিয়া ও রাশিয়ার মনে বিক্ষোভ জমে উঠল। সুতরাং 1908 খ্রিস্টাব্দের সংকটের অবসান ঘটল না।

কিছুদিনের মধ্যে অস্ট্রিয়াতেই শুরু হলো সর্ব-শ্লাভ আন্দোলন (Plan-Slav Movement)। বহু জাতি-গোষ্ঠী অধ্যুষিত অস্ট্রিয়ার অখণ্ডতা রক্ষা করা দায় হয়ে পড়ল। বার্লিন-বাগদাদ রেলপথটির নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলো। এই সর্ব-শ্লাভ আন্দোলনের কেন্দ্রর ছিল সার্বিয়া। তাই সার্বিয়াকে দমন করার জন্য অস্ট্রিয়া ও জার্মানি প্রস্তুত হলো। উদ্ভূত হলো দ্বিতীয় বলকান সংকট। বলকান যুদ্ধের (1912-13 খ্রিঃ) সুযোগে অস্ট্রিয়া কিছু ভূখণ্ড ছেড়ে দিতে সার্বিয়াকে বাধ্য করে। ইংল্যাণ্ড ও রাশিয়া সার্বিয়ার পক্ষে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলো। কিন্তু জার্মানির চাপে অস্ট্রিয়া কিছুকাল চুপচাপ ছিল। তবে উভয় পক্ষ তীব্রতর সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হলো।

এখানে উল্লেখ করা দরকার, তুরস্কতে 'তরুণ-তুর্কি আন্দোলন' (Young Turk Movement) -এর প্রতিক্রিয়া হিসেবেই দু'বার বলকান যুদ্ধ সংঘটিত। প্রথম বলকান যুদ্ধ হয়েছিল 1912 খ্রিস্টাব্দে ইয়োরোপীয় কয়েকটি দেশের সঙ্গে তুরস্কের। তুরস্কের তুর্কি করণ নীতি ও অত্যাচারের প্রতিবাদে এবং বলকান জাতীয়বাদের প্রেরণায় 1912 খ্রিস্টাব্দে সার্বিয়া, বুলগেরিয়া, মন্টিনিগ্রো এবং গ্রিস একত্রিত হয়ে 'বলকান লীগ' গঠন করে। তারা ম্যাসিডোনিয়ায় খ্রিস্টান প্রজাদের উপর অত্যাচার বন্ধ করে বিলম্বে সেখানে শাসন সংস্কারের দাবি জানালে তুরস্ক তা প্রত্যাখ্যান করে। বলকান লীগ তখন তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে,যুদ্ধে তুরস্কের শোচনীয় পরাজয় হয় এবং তারা লণ্ডনের চুক্তি (1913) মেনে নিতে বাধ্য হয়। পরে বলকান লীগের সদস্যদের মধ্যেই ম্যাসিডোনিয়া নিয়ে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। আসলে লণ্ডন চুক্তি অনুসারে কনস্ট্যানটিনোপল্ ও থ্রেস ছাড়া সমগ্র বলকান অঞ্চল স্বাধীনতা লাভ করে, ক্রিট দ্বীপ গ্রিসের অধিকারে আসে এবং আলবেনিয়া স্বাধীন রাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। আলবেনিয়া সার্বিয়ার হাতছাড়া হওয়াতে সার্বিয়া ম্যাসিডোনিয়া দখল করে ক্ষতিপূরণ লাভে আগ্রহী ছিল। কিন্তু ম্যাসিডোনিয়ার অধিকাংশ জনগণ বুলগার,

এই কারণে বুলগেরিয়া ঐ স্থান দাবি করে। সার্বিয়া বুলগেরিয়ার দাবি প্রত্যাখ্যান করলে 1913 খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ শুরু হয়। সার্বিয়া-বুলগেরিয়ার যুদ্ধে মন্টিনিগ্রো, গ্রিস ও রুমানিয়া সার্বিয়ার পক্ষে যোগ দেয়, বুলগেরিয়া পরাজিত হয় এবং বুখারেস্টের সন্ধি মেনে নিতে বাধ্য হয়। পূর্বেই আমরা পূর্বাঞ্চল সমস্যা প্রসঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করেছি।

এখানে বলার দরকার হলো এই যে, বলকান অঞ্চলে অস্ট্রিয়া 1908 খ্রিস্টাব্দে শ্লাভ অঞ্চল বসনিয়া এবং হার্জেগোভিনা নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করেছিল। সার্বিয়া নিজেকে শ্লাভ জাতিদের নেতা মনে করত। তারা ক্ষুব্ধ ছিল এবং অস্ট্রিয়া-সার্বিয়ার দ্বন্দ্ব দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধের পর আরও বেড়ে যায়। কারণ ঐ যুদ্ধে সার্বিয়ার বিশেষ লাভ হয় এবং ক্ষুব্ধ বুলগেরিয়া অস্ট্রিয়া-জার্মানির পক্ষ অবলম্বন করে। এই দ্বন্দ্বই মহাযুদ্ধের আগে জমে থাকা বারুদে অগ্নি সংযোগ করে।

৩। সেরাজেভো হত্যা ও বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত

ইয়োরোপীয় পরিস্থিতি যখন পারস্পরিক স্বার্থ-জনিত সংঘাত, সন্দেহ, বিদ্বেষ ও সামরিক প্রস্তুতিতে বারুদের স্তূপে পরিণত হলো, তখন তাতে অগ্নিসংযোগ করল একদিনের একটি ঘটনা। 1914 খ্রিস্টাব্দের 28 জুন অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির অন্তর্গত বসনিয়া প্রদেশের রাজধানী সেরাজেভো শহরে প্রকাশ্য দিবালোকে অস্ট্রিয়ার রাজকুমার ফ্রান্সিস ফার্দিনান্দ ও তার পত্নী সোফিয়া এক অজ্ঞাত আততায়ীর হস্তে নিহত হন। অস্ট্রিয়ার সরকার মনে করল যে, এই ঘটনার পশ্চাতে সার্বিয়ার হাত আছে। কারণ, আততায়ী অস্ট্রিয়ার প্রজা হলেও সে বা তারা জাতিতে ছিল শ্লাভ এবং সার্বিয়ার অধিবাসীদের সমগোত্রীয়। আসলে অস্ট্রিয়া বসনিয়া এবং হার্জেগোভিনা আগে দখল করে নিলেও ঐ দুই অঞ্চলে অধিকাংশ মানুষ ছিলেন শ্লাভ। সার্বিয়া ছিল শ্লাভ রাজ্যগুলির নেতা এবং তারা অস্ট্রিয়ার শ্লাভ অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির স্বাধীনতা এবং সার্বিয়ার সঙ্গে সংযুক্তি চাইত। বসনিয়া হার্জেগোভিন্যায় শ্লাভদের অনেক গোপন সমিতি গড়ে উঠেছিল। সেরাজেভো শহরের এরকম একটি দল ছিল ব্ল্যাক হ্যান্ড,যাদের ইউনিয়ন অফ ডেথও বলা হত। এরা বসনিয়ার গভর্নর অসকার পোলিএরেক-কে হত্যা করতে মনস্থ করেছিল, কিন্তু সেই সময় আর্চডিউক ফার্দিনান্দ ও তাঁর পত্নী সেরাজেভো পরিভ্রমণে আসছেন শুনে সন্ত্রাসবাদীরা তাদের হত্যা করা স্থির করে। প্রথমে মোটরগাড়িতে বোমা নিক্ষেপ করা হলে আর্চডিউক বেঁচে যান কিন্তু পরে ন্যাভরিলো প্রিন্সে রাজপথের উপরে আকস্মিকভাবে গুলি করে যুবরাজ ও তাঁর পত্নীকে হত্যা করে। হত্যাকারী শ্লাভ হলেও অস্ট্রিয়ার নাগরিক। কিন্তু অস্ট্রিয়া মনে করল এই ঘটনার পিছনে সার্বিয়ার প্ররোচনা আছে। সুতরাং এই ঘটনার জন্য অস্ট্রিয়া সার্বিয়াকে দায়ী করল এবং কতকগুলি শর্তযুক্ত একটি চরমপত্র প্রেরণ করল 23 জুলাই 1914 খ্রিঃ।

এই চরমপত্রে ছিল সার্বিয়া আক্রমণের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে এই চরমপত্রের উত্তর চাওয়া হলো। সার্বিয়া 25 জুলাই অনেকগুলি শর্ত মেনে উত্তর দিল। অবশ্য কেবল যেগুলি মানলে তার সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হয় সেগুলি ছাড়া। তাই রাশিয়া সার্বিয়াকে সমর্থন করে মীমাংসার জন্য আন্তর্জাতিক বৈঠকের প্রস্তাব দিল। কিন্তু জার্মানির পৃষ্ঠপোষকতায় অস্ট্রিয়া সেই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করল। ঠিক একই সময় ইংল্যাণ্ডও দ্বিতীয় একটি প্রস্তাব দিল। সেই প্রস্তাবও অস্ট্রিয়া এবং জার্মানি মানতে রাজি হলো না। উপরোক্ত মীমাংসার প্রস্তাব যখন কার্যকরী হলো না তখন (28 জুলাই, 1914) অস্ট্রিয়ার বাহিনী সার্বিয়ার রাজধানী বেলগ্রেড আক্রমণ করল। প্রথম প্রথম ঘটনাটি আঞ্চলিক সমস্যারূপে গণ্য হলো। কিন্তু অবিলম্বে পূর্বোক্ত রাষ্ট্রজোটগুলি ক্রমে ক্রমে সার্বিয়া অথবা অস্ট্রিয়ার পক্ষে যোগদান করল। এসময় ত্রিশক্তি মৈত্রীর শর্ত (Triple Alliance) অনুসারে জার্মানি অস্ট্রিয়ার পক্ষে যোগদান করল। অন্যদিকে ত্রিশক্তি আতাঁতের শর্ত অনুসারে সার্বিয়ার পক্ষে যোগদান করল রাশিয়া। ফ্রান্সও রাশিয়ার সাহায্যে অগ্রসর হলো। এছাড়া অস্ট্রিয়া ও জার্মানির পক্ষে আর যে-সব রাষ্ট্র যুদ্ধে যোগদান করল তাদের মধ্যে তুরস্ক, রুমানিয়া ও বুলগেরিয়া ছিল প্রধান। যুদ্ধের প্রথম দিকে ইংল্যাণ্ড যাতে নিরপেক্ষ থাকে সেই চেষ্টায় রত হলো জার্মানি। কিন্তু জার্মানি যখন নিরপেক্ষ দেশ বেলজিয়াম আক্রমণ করল তখন ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স একত্রে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। এবার অস্ট্রিয়া-সার্বিয়ার যুদ্ধ আর আঞ্চলিক সীমায় সীমিত থাকতে পারল না। তা ছড়িয়ে পড়ল সমগ্র ইয়োরোপে এবং ক্রমশ সারা বিশ্বে। সেরাজেভোর হত্যাকাণ্ড থেকে উদ্ভূত যুদ্ধ এবার বিশ্বযুদ্ধে রূপান্তরিত হলো। বস্তুতপক্ষে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি যেদিন 28 জুলাই 1914 সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, তার সঙ্গে সঙ্গে শুধু সার্বিয়া নয়, সমগ্র শ্লাভ জাতি গর্জে ওঠে। এমনকি রাশিয়া জানিয়ে দেয় যে সার্বিয়া আক্রান্ত হলে তারা নিরপেক্ষ থাকবে না। তবু 27 জুলাই 1914 অস্ট্রিয়া সার্বিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডের উপর কামানের গোলা নিক্ষেপ করা শুরু করল। রাশিয়াও সৈন্য সমাবেশের আদেশ দেয়। এই সৈন্য সমাবেশের ফলে জার্মানি এক চরমপত্র (ultimatum) দিয়ে রুশ সেনা সমাবেশ বন্ধ করতে বললেও রাশিয়া তাতে কর্ণপাত করেনি। ফলে 1914 খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে জার্মানি রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ফ্রান্সকেও জার্মানি এক চরমপত্র দিয়ে জানতে চেয়েছিল রুশ-জার্মানি যুদ্ধে ফ্রান্স নিরপেক্ষ থাকবে কিনা। ফ্রান্স জানায় যে ফ্রান্স রুশ-জার্মান যুদ্ধে নিজের স্বার্থ বিবেচনা করে যা কর্তব্য তাই করবে। জার্মানি মনে করল ফ্রান্স ট্রিপল্ আতাঁত অনুসারে রাশিয়ার পক্ষ নেবে এবং নিজেই 3 আগস্ট 1914 খ্রিঃ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। ইতালি আগেই ট্রিপল্ অ্যালায়েন্স ছেড়ে দিয়েছিল। তারা রইল নিরপেক্ষ। আবার জার্মানি ফ্রান্স আক্রমণ করতে গিয়ে নিরপেক্ষ দেশ বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করায় ব্রিটেন জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল 4 আগস্ট 1914 খ্রিঃ। এই ভাবে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।

৪। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য জার্মানির দায়িত্ব

সেরাজেভোর হত্যাকাণ্ডের পর একটি আঞ্চলিক যুদ্ধ ইয়োরোপীয় যুদ্ধে পরিণত হলো এবং ক্রমে ক্রমে তা বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হলো। এই বিশ্বযুদ্ধের দায়িত্বের প্রশ্নটি নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে নানা মত আছে। ঐতিহাসিকদের অধিকাংশই কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম ও জার্মানিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য প্রধানত দায়ী করলেও, একথা অস্বীকার করা যায় না যে ফ্রান্স, ব্রিটেন, অস্ট্রিয়া, রাশিয়া প্রমুখ দেশের দায়িত্বও কম ছিলনা। ইতিহাসবিদ *এস. বি. ফে.* (Fay) তাঁর *The Origins of First World War* গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, ভার্সাই সন্ধিতে বিজয়ী শক্তিজোট যেভাবে একতরফা কাইজারের জার্মানিকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন, তা ঠিক নয়। *এগমণ্ড জেচলিন* আতাঁত শক্তি জোটের পরিবেষ্টন নীতির প্রতিক্রিয়াকেই জার্মানির যুদ্ধ সৃষ্টির কারণ বলেছেন। *ফ্রিৎস ফিশার*-এর মতে, 1911 খ্রিস্টাব্দ থেকে জার্মানির যুদ্ধাকাঙ্ক্ষা ও প্রস্তুতিই যুদ্ধকে তরান্বিত করেছে। অধ্যাপক *এ.জে.পি টেলার*ও প্রথম যুদ্ধে সকল শক্তির দায়িত্ব মেনে নিয়েছেন।[1] *পিনসন* অবশ্য জার্মানির দায়িত্বের উপর জোর দিয়েছেন।

জার্মানিকে কেন দায়ী করা হয় তার জন্য কতকগুলি কারণ ঐতিহাসকগণ নির্দেশ করেছেন। যেমন—(i) কাইজার কর্তৃক ভেল্টপলিটিক (Weltpolitik) বা বিশ্ব রাজনীতিতে জার্মানির প্রাধান্য স্থাপনের জন্য আগ্রাসী পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ। যেজন্য তিনি বিসমার্কের কূটনীতি ও শক্তিজোট দ্বারা ফ্রান্সকে মিত্রহীন করার নীতি ত্যাগ করেন, (ii) রাশিয়ার সঙ্গে রি-ইনসিওরেন্স চুক্তি বাতিল এবং ফলত ফ্রান্স-রাশিয়া চুক্তির পথ সুগম হওয়া, (iii) ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে নৌ-বাণিজ্যে ও ঔপনিবেশিক দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হওয়া, (iv) বলকান রাজনীতিতে নিজস্বার্থে তুরস্কের সঙ্গে মিত্রতা, (v) একই স্থানে অস্ট্রিয়ার আক্রমণকে সমর্থন এবং (vi) জার্মান পুঁজিপতি, শিল্পপতি, সমরনায়কদের উন্মাদনা এবং উগ্রনীতি গ্রহণ। *ইমানুয়েল হাইস* (Geis)-এর মতে জার্মানির প্ররোচনার ফলে সেরাজেভো সঙ্কট থেকেই বিশ্বযুদ্ধের সূচনা।

তবে সামরিকবাদ, উগ্র জাতীয়তাবাদ, গোপন সামরিক চুক্তি, দুই সামরিক শিবিরে বিভক্ত হওয়া, পীত সাংবাদিকতা, বলকান সমস্যা ইত্যাদি কোনও একটির জন্যও শুধু জার্মানিকে একা দায়ী করা চলে না। তাছাড়া ত্রিশক্তি আতাঁতের দেশগুলি জার্মানিকে বেষ্টন করেছিল। বলকান সমস্যার জন্য সার্বিয়া-রাশিয়া বা অস্ট্রিয়ার দায়িত্বও কম ছিল না। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মনোভাব জার্মানিকে আতঙ্কিত করেছিল, যেমন জার্মানির ভেল্ট পলিটিক ফ্রান্স-ব্রিটেনকে ঈর্ষান্বিত, সন্দেহপ্রবণ ও শত্রুভাবাপন্ন করে তোলে। সুতরাং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য জার্মানির একক দায়িত্ব মানা যায় না।

---

1. এ. জে পি. টেলার, *দ্য অরিজিনস্ অফ দ্য সেকেণ্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার*, পেঙ্গুইন, 1963, পৃ. 48-52

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য জার্মানি কতখানি দায়ী কিংবা কে দায়ী এ নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক চলছে এবং এখনও তার মীমাংসা হয়নি। সেদিকে একটু দৃষ্টি দেওয়া দরকার। তেমনি মনে রাখা দরকার যে, বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই দায়িত্ব বিষয়ে এক দেশ আরেক দেশের উপর দোষ চাপিয়েছে অথবা নিজেদের কূটনৈতিক দলিল পত্র প্রকাশ করে যুদ্ধের জন্য যে তারা দায়ী নয় তা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে। এই দ্বিতীয় বিষয়টির দিকে আগে দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে। German White Book নামে এক সরকারি কূটনৈতিক দলিলের সংকলন বের করে জার্মান সরকার প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে জার্মানি রাশিয়ার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু গ্রন্থটিতে সত্যের সঙ্গে অর্ধসত্য ও অসত্য পরিবেশন করা হয়েছে। ব্রিটেন British Blue Book -এর মাধ্যমে দেখাবার চেষ্টা করেছে যে, যুদ্ধের জন্য জার্মানি ও অস্ট্রিয়াই দায়ী এবং ব্রিটিশ সরকার নানাভাবে শান্তি রক্ষার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। ফ্রান্স French Yellow Book-এ দেখাবার চেষ্টা করেছে যে জার্মানির যুদ্ধ-মনোবৃত্তি কীভাবে ইয়োরোপকে যুদ্ধের দিকে টেনে নিয়ে গেল। রাশিয়া Russian Orange Book প্রকাশ করে তারা শান্তিরক্ষার জন্য কী রকম আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলো, তা যুক্তি তথ্য দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে। বেলজিয়াম Belgium Grey Book-এর মাধ্যমে দেখাতে চাইল কীভাবে জার্মানি আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে নিরস্ত্রীকৃত নিরপেক্ষ দেশের মধ্যে দিয়ে সৈন্য নিয়ে গিয়ে আক্রমণ চালিয়েছে। সার্বিয়া Serbian Blue Book-এ কীভাবে অস্ট্রিয়া সার্বিয়ার উপর অত্যাচার করেছে এবং সেরাজেভো হত্যাকাণ্ডের জন্য অন্যায়ভাবে সার্বিয়ার উপর দোষ চাপানো হয়েছে, তা ব্যাখ্যা করে দেখায়। আবার অস্ট্রিয়া Austrian Red Book প্রকাশ করে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল যে তারা শান্তির প্রস্তাব দিয়েছিল এবং সার্বিয়া তা সর্বতোভাবে উপেক্ষা করেছিল।

এগুলির মধ্যে যুক্তি প্রমাণের দিক থেকে ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের দলিলপত্র ইয়োরোপের কাছে সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছিল। আবার অন্য ব্যাপারও ঘটেছিল। যেমন জার আমলে বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার পর রাশিয়ার নতুন বলসেভিক সরকার যে Orange Book প্রকাশ করেছিল তাতে আগেকার মিথ্যা ও গোপন করা ছবি ছাপিয়ে নিজেরাই স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে জার্মানির চেয়ে ফ্রান্স ও রাশিয়া কম দায়ী ছিল না। অস্ট্রিয়াতেও ডঃ রোডেরিক গুস তাঁর Austrian Red Book প্রকাশ করে অস্ট্রিয়া কীভাবে জার্মানিকে জড়িয়েছিল তা প্রমাণ করে দিয়েছেন।

দলিল, নথি, কূটনৈতিক কাগজপত্র, চিঠি, টেলিগ্রাম, নোটস্ ইত্যাদির সাহায্যে গবেষকগণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সম্বন্ধে দায়-দায়িত্ব বিষয়ে অনেক তথ্য পেয়েছেন। অধ্যাপক ফে লিখেছেন যে, "দলিল পত্রাদি থেকে একথা স্পষ্টভাবে বোঝা গেছে যে, যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে জার্মানি আন্তরিকভাবে বিশ্বযুদ্ধ যাতে না বাধে তার চেষ্টা করেছিল কিন্তু তারা

নিজেরাই বহু দোষ ও ভুল করেছিল বিচার বিবেচনায়। তবু এ সব থেকে এটা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে জার্মানি ইচ্ছা করে যুদ্ধ বাধিয়ে ছিল এমন কথা অতিকথন মাত্র" (It showed scholars that during the critical days before the War, Germany had made real efforts to avert it, but that she had been guilty of blunders and mistakes in judgement which contributed to set fire to the inflammable material heaped up in the course of years. It showed, moreover, that the notion that Germany had deliberately plotted the world war was a pure myth")।

বস্তুত, ইতিহাসবিদদের মধ্যেও সমস্ত দায়িত্ব জার্মানির উপর চাপিয়ে দেওয়া কিংবা কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের উগ্র বিদেশনীতির জন্যই বিশ্বযুদ্ধ ঘটেছে এমত বক্তব্য নিয়ে ভিন্নমত লক্ষ্য করা যায়। ইতিহাসবিদ *হাইস*, জার্মান ইতিহাসবিদ *ফ্রিৎস ফিশার, পিনসন* প্রমুখের মতে জার্মানির দায়িত্ব কোনওভাবেই অস্বীকার করা যায় না। জার্মানি 1911 থেকেই যুদ্ধ চেয়েছে, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে এবং তাদের প্ররোচণাতেই সেরাজেভো ঘটনার জন্য অস্ট্রিয়া সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিয়েছে। তারা জার্মানির বিশেষ দায়িত্ব বোঝাতে গিয়ে কতকগুলি কারণও নির্দেশ করেছেন, যেমন ভেল্টপলিটিক বা বিশ্ব রাজনীতিতে জার্মানির একচ্ছত্র প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য উগ্র বিদেশ নীতি গ্রহণ করা— এর ফলেই তিনি রাশিয়ার সঙ্গে রি-ইনসিওরেন্স চুক্তি বাতিল করেছিলো, ফ্রান্সও ব্রিটেনের বিরুদ্ধে ঔপনিবেশিক দ্বন্দ্বে নেমে পড়েছিলো আগ্রাসী নৌশক্তির ব্যবস্থা করেছিলো, বলকানে অস্ট্রিয়া এবং তুরস্ককে প্রণোদিত করেছিলো, আফ্রিকায় মরক্কোতে ফ্রান্সের এবং বুয়র যুদ্ধে ব্রিটেনের বিপক্ষে ছিল এবং শেষপর্যন্ত অস্ট্রিয়াকে সেরাজেভো হত্যাকাণ্ডের জন্য সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্ররোচনা দিয়েছিলো।

কিন্তু এস. বি. ফে. এগমন্ট জেচলিন, এ. জে. পি. টেলার, উলফগ্যাং হেগ প্রমুখ ইতিহাসবিদ যুক্তিসঙ্গতভাবে দেখিয়েছেন যে ভার্সাই চুক্তিতে মিত্রজোট যেভাবে জার্মানির উপর সমস্ত দায় চাপিয়েছিলো তা ঠিক নয়। যুদ্ধের জন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই কম বেশি দায়িত্ব অস্বীকার করা যায় না। বস্তুত উভয়পক্ষের বক্তব্য অনুধাবন করলে বর্তমানে আমরা নৈর্ব্যক্তিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি যে, জার্মানি অধিক দায়ী হলেও তাকে একা দায়ী করা যায় না, এমনকি ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া, অস্ট্রিয়ার দায়িত্বও অস্বীকার করা যায় না। অধ্যাপক *গর্ডন ক্রেগ* ঠিকই লিখেছেন যে, জার্মানির আগ্রাসী পররাষ্ট্র নীতির মতন, আলসান-লোরেন পুনরুদ্ধারের জন্য ফ্রান্সের উগ্র মনোভাব, কিংবা বলকানে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য অস্ট্রিয়া বা রাশিয়ার উগ্রতা, ব্রিটেনের নৌ-আধিপত্য ও পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য উন্মত্ততা সব কিছুই জার্মানির ভেল্ট পলিটিক (Weltpolitik) -এর চেয়ে কম দায়ী নয়।

৫। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রকৃতি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে একদিকে ছিল ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়া। তারা ইতিহাসে 'মিত্রপক্ষ' (Allied Powers) নামে পরিচিত। যুদ্ধের প্রথম পর্বে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র নিরপেক্ষ থাকলেও জার্মানির সাবমেরিন যখন এলোপাথারি মার্কিন বাণিজ্যতরী সহ বিপক্ষের সব জাহাজ বিনষ্ট করতে শুরু করে তখন আমেরিকাও মিত্রপক্ষে যোগ দেয়। ইতালি একদা যারা ট্রিপল্ অ্যালায়েন্সের অন্তর্ভুক্ত ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগেই জার্মানির পক্ষ ত্যাগ করে এবং পরে মিত্রপক্ষে যোগদান করে। রুমানিয়া, চীন, জাপান, পর্তুগালও মিত্রপক্ষে যোগ দিয়েছিল। অপরদিকে ছিল জার্মানি এবং অস্ট্রিয়া— যাদের বলা হত কেন্দ্রীয় শক্তি (Central Powers)। এই কেন্দ্রীয় শক্তিতে যোগ দেয় বুলগেরিয়া, তুরস্ক। *ল্যাংসাম* -এর মতে, "The First World War which lasted 1556 days, was the bloodliest and costliest war that had yet been fought" অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যা 1556 দিন ধরে চলেছিল তা ছিল মানবসভ্যতার ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা ধ্বংসাত্মক এবং ব্যায়বহুল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় যেমন—

(i) এই যুদ্ধ ছিল সর্বাত্মক।

(ii) জল- স্থল-অন্তরীক্ষ অর্থাৎ আকাশ পথ সর্বত্রই এই যুদ্ধ চলেছিল।

(iii) ইয়োরোপের সীমা অতিক্রম করে এই যুদ্ধ পূর্ব এশিয়া থেকে মধ্যপ্রাচ্য পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

(iv) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এই প্রথম কোনও ইয়োরোপীয় যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।

(v) এই যুদ্ধ প্রথম ভয়ঙ্কর সব মারণাস্ত্র ব্যবহার করা হয়, যেমন— বোমারু বিমান, ভারী কামান, সাবমেরিন, বোমা, বিষাক্ত গ্যাস, ট্যাঙ্ক ইত্যাদি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে এইভাবে ধ্বংসাত্মক কাজে লাগান আগে কখনও হয়নি।

(vi) এই যুদ্ধ আন্তর্জাতিক অর্থনীতিকে তছনছ ক'রে বিশ্বব্যাপী মন্দার সৃষ্টি করে।

(vii) এই যুদ্ধ বিশাল সংখ্যক মানুষকে ব্যাপৃত করেছিল এবং যুদ্ধে আদৌ অংশ নেয়নি এমন দেশের উপরেও যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া বিশেষ লক্ষ্যণীয়।

সুতরাং এককথায় বলা যেতে পারে, এই বিশ্বযুদ্ধ প্রকৃতির দিক থেকে ছিল এক সর্বাত্মক যুদ্ধ (Total War), এমন যুদ্ধ পৃথিবীর ইতিহাসে আগে কখনও হয়নি। এমন কি গির্জা ও শিক্ষায়তনগুলিও এই যুদ্ধের কবল থেকে রক্ষা পায় নি। আবার যুদ্ধরত দেশগুলি যুদ্ধের প্রয়োজনে তাদের সমস্ত আয়োজন জড়ো করেছিল। সমস্ত অর্থনীতি এবং শ্রমশক্তি নিয়োগ করে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়াই ছিল লক্ষ্য। অধ্যাপক *কার্লটন হেস্* লিখেছেন যে সামাজিক ইতিহাসের দিক থেকে এই সামরিক জাতীয় সংহতি বা ঐক্য হলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সর্বাধিক বাস্তব দিক (From the standpoint of social history, this temporary fusion or 'unity, is perhaps the outstanding fact of the world war")[1]

৬। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাবলী

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ প্রায় চার বছর ধরে (1914 খ্রিঃ থেকে 1918 খ্রিঃ) চলেছিল। এই যুদ্ধে আমরা পূর্ব এবং পশ্চিম— এই দু'টি রণাঙ্গন দেখতে পাই। মিত্রপক্ষ প্রথম দিকে জার্মানিকে ও তার সহযোগীদের বাধা দিতে পারেনি। জার্মানির পূর্ব সীমান্তে যুদ্ধ চলেছিল ফ্রান্স এবং পশ্চিম সীমান্তে রাশিয়ার সঙ্গে। 1914 খ্রিস্টাব্দে বেলজিয়ামের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে জার্মানি প্রথমে ফ্রান্স আক্রমণ করেও মিত্রপক্ষীয় বাহিনীর প্রতিরোধের ফলে তা দখল করতে পারেনি। 1915 খ্রিস্টাব্দে পূর্ব সীমান্তে টোটেনবার্গ-এর যুদ্ধে রুশ বাহিনী পরাস্ত হয়। তবে রাশিয়া প্রথমে অস্ট্রিয়ার বাহিনীকে পরাজিত করে গ্যালিশিয়া দখল করেছিল। পরে অস্ট্রিয়ার সমর্থনে জার্মানরা এগিয়ে আসে। জাপান মিত্রপক্ষে যোগ দিয়ে পূর্ব এশিয়ার কিছু জার্মান অধিকৃত অঞ্চল কেড়ে নেয়। বুলগেরিয়া ও অস্ট্রো-জার্মান বাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণে সার্বিয়ার পতন হয়। পশ্চিম রণাঙ্গনে ইপ্রিস-এর যুদ্ধে মিত্রপক্ষের পরাজয় হয়। 1915 খ্রিঃ পর্যন্ত জার্মানির জয় ছিল বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। এর পর 1916 খ্রিস্টাব্দে ভার্ডুন ও সোমির রণাঙ্গনে এবং জুটল্যাণ্ডের নৌ যুদ্ধে মিত্রপক্ষের বিজয় সূচিত হয়। 1917 খ্রিস্টাব্দে রুশ বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে রাশিয়া মিত্রপক্ষ ত্যাগ করলেও, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র মিত্রপক্ষে যোগ দেয়। পূর্ব-রণাঙ্গনে জার্মানি ও রাশিয়ার মধ্যে ব্রেস্টলিটভস্ক-এর সন্ধি দ্বারা রুশ-জার্মান মৈত্রী স্থাপিত হলেও পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্মানির পরাজয় ঘটে। শেষপর্যন্ত 1918 খ্রিস্টাব্দে জার্মানি ও সহযোগীরা মিত্রপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের গতিধারা আরও একটু সবিস্তারে আলোচনার জন্য প্রতি বছরের ধারাবাহিক ঘটনাবলী বলা যেতে পারে। আগেই বলা হয়েছে যে যুদ্ধ হয়েছে পশ্চিম ও পূর্ব— উভয় রণাঙ্গণে। প্রথম দিকে ব্রিটেন, ফ্রান্স বা মিত্রপক্ষ বিশেষ পেরে ওঠেনি। 1914 খ্রিস্টাব্দে দেখা যায় জার্মান বাহিনী নিরপেক্ষ দেশ বেলজিয়ামের প্রতিরোধ চূর্ণ ক'রে অগ্রসর হয় এবং সম্মিলিত ইঙ্গ-ফরাসি বাহিনীকে চূর্ণ করে প্যারিসের প্রায় কাছে পৌঁছে যায়। অবশেষে মিত্রপক্ষের প্রধান জেনারেল ফচ্ -এর নেতৃত্বে মিত্রপক্ষের বাহিনী মার্ন নদীর তীরে জার্মান বাহিনীর গতিরুদ্ধ করে। ফলে জার্মানির ফ্রান্স অধিকারের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয় এবং ইঙ্গ-ফরাসি বাহিনীও শক্তি সঞ্চয় করবার উপযুক্ত সময় পায়। অবশ্য পশ্চিম রণাঙ্গনেই জার্মান বাহিনী বেলজিয়ামের অধিকাংশ দখল করে ডানকার্ক ও ক্যালে বন্দরে পৌঁছবার উদ্যোগ করলেও ইপ্রেস এর প্রথম যুদ্ধে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর প্রচণ্ড প্রতিরোধে জার্মান বাহিনী পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হলো।

1915 খ্রিস্টাব্দে পূর্ব সীমান্তে রুশবাহিনী জার্মানিতে প্রবেশ করার চেষ্টা করেও ট্যালেনবার্গের যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে আশাহত হলো। অস্ট্রিয়া অবশ্য রুশ বাহিনীর কাছে পরাজিত হলো এবং রুশ বাহিনী গ্যালিসিয়া দখল করল। তবে ম্যাকেনসেনের নেতৃত্বে জার্মান বাহিনী অস্ট্রিয়ার সাহায্যার্থে এগিয়ে এসে রুশদের পরাজিত করল। এরমধ্যে

1. C. Hajyes, *Contemporary Europe Since* 1870, p. 369.

অস্ট্রিয়ার অধিকারভুক্ত প্রদেশগুলি পুনরুদ্ধারের আশায় ইতালি মিত্রপক্ষের হয়ে যুদ্ধে যোগ দিল। জাপান পূর্ব এশিয়ায় মিত্রপক্ষে যোগ দিয়ে কিয়াও চাও বন্দর এবং শানটুং দখল করে, আবার তুরস্ক কেন্দ্রীয় শক্তিতে যোগ দিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে দার্দানেলিস প্রণালী দিয়ে মিত্রপক্ষের যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। অস্ট্রো-জার্মানি এবং বুলগেরিয়ার আক্রমণে সার্বিয়া পরাজিত হয়। পশ্চিম রণাঙ্গণে ইপ্রিসের দ্বিতীয় যুদ্ধেও মিত্রপক্ষ পরাজিত হয়। 1916 খ্রিঃ পশ্চিম সীমান্তে ভার্দুন এবং সোমিতে উভয় পক্ষের তুমুল যুদ্ধের পর মিত্রবাহিনী রক্ষা পায়; পূর্ব সীমান্তে রাশিয়া অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে সাফল্য অর্জন করলেও জার্মানির কাছে আটকে গেল। ঐ বৎসরই জুটল্যাণ্ডের নৌযুদ্ধে জার্মানির বিরুদ্ধে ব্রিটেন উল্লেখযোগ্য সাফল্য পায়। রুমানিয়া মিত্রপক্ষে যোগদান করে অস্ট্রো-জার্মানি বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়। 1917 খ্রিঃ বলশেভিক বিপ্লবে রাশিয়ার জারতন্ত্রের পতন হলেও নতুন সরকার যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়ালেও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র মিত্রপক্ষে যোগ দেওয়াতে মিত্রপক্ষ বিশেষ শক্তিশালী হয়। 1918 খ্রিঃ জার্মানি পশ্চিম সীমান্তে আমিয়াঁ (Amiens)-র দিকে অগ্রসর হয়ে মিত্র পক্ষের কাছে আটকে যায়। তুরস্ক, বুলগেরিয়া, অস্ট্রিয়া একে একে পরাজিত হয়। শেষ পর্যন্ত 11 নভেম্বর 1918 খ্রিঃ জার্মানি আত্মসমর্পণ করলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি হয়।

জার্মানির পরাজয়ের কারণ ঃ যুদ্ধের উপকরণের পরিমাণ, সৈন্য সংখ্যা, সমর নায়কদের দক্ষতা ইত্যাদি দিক থেকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হওয়া সত্ত্বেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পরাজয়ের কতকগুলি কারণ ছিল। প্রথমতঃ, জার্মানির যুদ্ধের উপকরণ ছিল স্বল্পমেয়াদী যুদ্ধের উপযোগী। দ্বিতীয়তঃ, জার্মানিকে একই সময় পূর্ব ও পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। অথচ মিত্রপক্ষের ফ্রান্স পশ্চিমে এবং রাশিয়া পূর্বে ভিন্ন ভিন্ন সেনাবাহিনী কাজে লাগিয়েছিল। তৃতীয়তঃ, ব্রিটেনের নৌশক্তির তুলনায় জার্মানির নৌশক্তি দুর্বল ছিল। চতুর্থতঃ, জার্মানির অর্থনীতিতে ঐ সময় প্রচণ্ড আঘাত লেগেছিল। পঞ্চমতঃ, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রপক্ষে যোগদান জার্মানির পক্ষে অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। ষষ্ঠতঃ, জার্মানির কোনও ঔপনিবেশিক রাজ্য ছিল না, যেখান থেকে তারা সাহায্য পেতে পারে। সপ্তমতঃ, ত্রিশক্তি জোটের অন্যতম ইতালি জার্মানির-অস্ট্রিয়াকে তেমন সাহায্য করেনি, পরে পক্ষ ত্যাগ ক'রে ি . পক্ষে যোগ দেয়। সুতরাং জার্মানির পক্ষে একা ব্রিটেন-ফ্রান্স-আমেরিকাকে প্রতিহত করা সম্ভব ছিল না।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পরাজয়ের যেমন অনেক কারণ ছিল তেমনি মিত্রশক্তির সাফল্যেরও অনেক কারণ ছিল—(১) ব্রিটিশ নৌশক্তির প্রাধান্য জার্মানিকে বিপদে ফেলেছিল। (২) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রপক্ষে যোগদান খুবই কার্য কর হয়েছিল। বিশেষত যে সময় রাশিয়া যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়িয়েছিল সেই সময় আমেরিকার রণসম্ভার,

সম্পদ এবং লোকবল মিত্রপক্ষের সহায়ক হয়। তাছাড়া আমেরিকা ব্রিটেন ও ফ্রান্সকে প্রভূত ঋণ দান করেছিল। (৩) ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশগুলির সম্পদ মিত্রশক্তির কাজে লেগেছিল। (৪) দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধ চালাতে গিয়ে জার্মানির জনবল ক্ষয়িষ্ণু পর্যায় এসে পরেছিল। (৫) জার্মানির বন্ধু দেশগুলি জার্মানির পক্ষে বিশেষ সহায়ক তো হয়ইনি বরং তাদের রক্ষা করতে গিয়ে জার্মানিরই অনেক ক্ষতি হয়।

৭। বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা সভ্যতার ইতিহাসে আগেকার যে-কোনও যুদ্ধকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ঐ যুদ্ধে প্রায় সাড়ে ছয় কোটি সৈন্য অংশ গ্রহণ করেছিল, যার মধ্যে এক কোটিরও বেশি লোক হতাহত হয়। প্রভূত পরিমাণ ধন সম্পত্তি বিনষ্ট হয়। বেলজিয়াম, ফ্রান্স, জার্মানি খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়, রাশিয়ার সর্বাধিক সৈন্য মারা যায়। যুদ্ধ জনিত মহামারী, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির ফলেও বহু প্রাণহানি হয়েছিল। শুধু সামরিক ক্ষেত্রে নয়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যুদ্ধের প্রভাব বহু দেশ দীর্ঘ দিন ধরে ভোগ করেছিল। বেকারি, কলকারখানায় মন্দা, মুদ্রাস্ফীতি, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষ্য করা যায়। জার্মানিতে মার্কের মূল্য ভয়ানকভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

রাজনৈতিক দিক থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ইয়োরোপের শক্তিসাম্য সম্পূর্ণভাবে বদলে দেয়। ব্রিটেন ও ফ্রান্স বিজয়ীপক্ষের মধ্যে থাকলেও তাদের পূর্ব গৌরব অনেক হ্রাসপ্রাপ্ত হয়; বিপরীতপক্ষে জার্মানি যা বিশ্বযুদ্ধের আগে ছিল ইয়োরোপের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দেশ, তার প্রভূত সম্মান ও ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। বরং বিশ্বরাজনীতিতে প্রধান শক্তি হিসেবে উত্থান হয় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের এবং সদ্য সৃষ্টি হওয়া সোভিয়েত রাশিয়ার।

বৈষয়িক ক্ষতি, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, সামরিক ক্ষয়ক্ষতি এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার বিন্যাসে রূপান্তর ছাড়াও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইয়োরোপে নৈতিক অবক্ষয়ও লক্ষ্য করা যায়। যুদ্ধের অনেক আগে থেকেই বিভিন্ন রাষ্ট্রশক্তি শত্রু দেশগুলির বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার চালিয়েছিল, শত্রুর ক্ষতি বড়ো করে দেখানো এবং নিজেদের ক্ষতি কম করে দেখানোর প্রবণতা শুধু এক শ্রেণীর লেখক ও পীত সাংবাদিকদের মধ্যেই নয়, ছিল সরকারি স্তরে এবং তা জনজীবনের নীতিবোধেরও ক্ষতি করে।

রাজনৈতিক দিক থেকে বিশ্বযুদ্ধের সময়কালীন দুটি দেশের তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন হয়। যুদ্ধের পর জার্মানিতে কাইজারের পতন, বিদ্রোহ, সমাজতান্ত্রিক দলের বিক্ষোভ এবং শেষ পর্যন্ত ভাইমার প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা নতুন শাসন প্রবর্তন করে। কিন্তু জার্মানির সমস্যা ছিল এতই ব্যাপক এবং প্রকট যে ভাইমার প্রজাতন্ত্র তা দমনে ব্যর্থ হয়। এই ব্যর্থতাই অ্যাডলফ্

হিটলার এবং তার জাতীয় সমাজতন্ত্রী দলের উত্থানের পথ প্রশস্ত করে। তেমনি রাশিয়াতে জারতন্ত্র ছিল স্বৈরাচারী এবং রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ সমস্যাও ছিল বহুবিধ। অথচ রাশিয়া যুদ্ধে যোগ দিয়ে সামরিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শেষ পর্যন্ত জার দ্বিতীয় নিকোলাস বিক্ষোভের চাপে রুশ সংসদ ডেকে অস্থায়ী প্রজাতান্ত্রিক সরকার মেনে নেন (মার্চ 1917)। কিন্তু ঐ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব রাজতন্ত্রের অবসান ঘটলেও সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত 1917 খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষদের সমর্থন নিয়ে বলশেভিক দল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসে। বিশ্বে প্রথম সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

শুধু ইয়োরোপে নয়, ইয়োরোপীয় দেশগুলির পৃথিবীব্যাপী নানা ঔপনিবেশিক দেশগুলির উপরেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। ভারতবর্ষে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে তীব্র থেকে তীব্রতর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লড়াইয়ে নেমে পড়ে। বস্তুত ঔপনিবেশিকতা ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ইতিহাস প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এক নব অধ্যায়ে প্রবেশ করে পৃথিবীর বহু দেশে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের আন্দোলন যেমন জোরদার হয়ে ওঠে, তেমনি নারী জাগরণেরও প্রসার ঘটে। আবার বৈদেশিক নীতিতে জনমতের প্রভাব বেশি করে পড়তে শুরু করে। জনমানসে সংবাদপত্রের প্রভাবও বেড়ে যায়। আবার যুদ্ধের ফলেই সন্ত্রস্ত ইয়োরোপে নিরস্ত্রীকরণ (Disarmament) এবং যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা (Collective Security) জোরদার করার কথা ভাবা হয়।

৯। যুদ্ধের পরে শান্তি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্বেই যুদ্ধের ভয়াবহতা, ব্যাপ্তি, মারণাস্ত্রের ব্যবহার, প্রাণ ও ধনশক্তি বিনাশ, ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ইত্যাদি নানাদিক বিচার করে ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গ যুদ্ধের বদলে শান্তি স্থাপনের কথা ভাবতে থাকেন। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী লয়েডজর্জ 1918 খ্রিস্টাব্দের 5 জানুয়ারি মিত্রপক্ষের যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্পর্কে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তাতে পূর্ব স্বাক্ষরিত চুক্তির ভিত্তিতে শান্তিচুক্তি, আত্ম নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে রাজ্য সমূহের পুনর্বন্টন, আন্তর্জাতিক সংস্থাপনের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের অস্ত্রশস্ত্রে পরিমাণ হ্রাস ইত্যাদির কথা বলেছিলেন। এর তিন দিন পর 1918-র 8th জানুয়ারি মার্কিন রাষ্ট্রপতি *উড্রো উইলসন* বিশ্বে স্থায়ী শান্তিপ্রতিষ্ঠা, গণতন্ত্র রক্ষা ও ইয়োরোপের যথাযোগ্য পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে তাঁর বিখ্যাত *'চৌদ্দ দফার সূত্র'* (Fourteen Points) ঘোষণা করেন। ঐ বছরই 30 সেপ্টেম্বর অস্ট্রিয়া ও বুলগেরিয়ার পতনের পর জার্মান সেনাপ্রধান লুডেনডর্ফ কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামকে শান্তি স্থাপনের পরামর্শ দেন। 4th অক্টোবর জার্মান চ্যান্সেলার প্রিন্স ম্যাক্স জানান যে তারা উইলসনের চৌদ্দ দফা শর্তের ভিত্তিতে শান্তি স্থাপনে আগ্রহী। এর উত্তরে

উইলসন জানান যে জার্মানিকে মিত্রপক্ষের রাজ্যগুলি থেকে সেনা অপসারণ করতে হবে এবং জার্মানিতে স্বৈরতন্ত্রের পরিবর্তে গণতান্ত্রিক শাসন চালু করতে হবে। 20th অক্টোবর জার্মানি ঐ দাবিগুলি মেনে নেয়। জার্মান কাইজার হল্যাণ্ডে পালিয়ে যান। 9th নভেম্বর জার্মান সম্রাটের ক্ষমতাচ্যুতি এবং জার্মানিতে প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হয়। অতঃপর 1918 খ্রিস্টাব্দের 11th নভেম্বর মিত্রপক্ষের সেনাপতি ফচ -এর কাছে জার্মানি বিনাশর্তে আত্ম সমর্পণ করলে বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। এরপরে মিত্রশক্তি ও তার সহযোগী বত্রিশটি দেশের প্রতিনিধিবর্গ ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে এক শান্তি সম্মেলনে মিলিত হন। তাদের নেতা ছিলেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েডজর্জ, ফরাসি প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেসোঁ এবং ইতালির প্রধান মন্ত্রী ভিত্তোরিয়া অর্লাণ্ডো। এদের *চার প্রধান* (Big Four) বলা হত। প্যারিস শান্তি সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল ইয়োরোপের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ, রাজনৈতিক মানচিত্রের পুনর্গঠন, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান এবং পরাজিত কেন্দ্রীয় শক্তির সঙ্গে সন্ধি স্বাক্ষর ও সেই সন্ধিগুলির শর্তাদি নিরূপণ। কীভাবে সে-কাজ সম্পন্ন হলো তা পরবর্তী ঊনবিংশ অধ্যায়ে যথাস্থানে আলোচিত হবে।

অধ্যায় ১৮

রুশ বিপ্লব (1917 খ্রিঃ)

(Syllabus: ***Russian Revolution of 1917)***

১। সূচনা

1917 খ্রিস্টাব্দের রুশ বিপ্লব বলতে ইতিহাসে বোঝায় 1917 খ্রিস্টাব্দের 'বলশেভিক' বিপ্লব। এই বিপ্লবের মূলে ছিল রুশ জনগণের দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ ও বিক্ষোভ স্বৈরতান্ত্রিক জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। অথচ ঐ বিপ্লবের মাধ্যমে যে সোভিয়েত রাষ্ট্র বা সোভিয়েতইউনিয়ন অর্থাৎ 'ইউনিয়ন অফ সোভিয়েত সোস্যালিট রিপাবলিকস্' জন্ম নিয়েছিল তা আজ ভেঙে গেছে। রাশিয়া নামের আগে 'সোভিয়েত' কথাটিও আজ কেবলমাত্র ইতিহাসের পৃষ্ঠায়। সম্প্রতি সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার যে বিপর্যয় ঘটেছে, রাশিয়ায় সরকারের চরিত্র বদল তার মধ্যে প্রধান। সোভিয়েত রাশিয়া ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিলেও ঐতিহাসিক তাৎপর্যের জন্য তাকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না।

1917 খ্রিস্টাব্দের রুশ বিপ্লব আধুনিক যুগের ইতিহাসের এক যুগান্তকারী ঘটনা।[1] তাৎপর্যপূর্ণ ও সুদূরপ্রসরী তার ফলাফল। 1789 -এর ফরাসি বিপ্লবের পর এরকম এক বৃহৎ, ব্যাপক আর সর্বাত্মক বিপ্লব ইতিহাসে দেখা যায়নি। ফরাসি বিপ্লবের প্রেরণা যেমন উনিশ শতককে পথ দেখিয়েছে, তেমনি 1917 খ্রিস্টাব্দের রুশ বিপ্লব শুধু রাশিয়া নয়, সমগ্র বিশ্বে তার প্রভাব ফেলে। এই বিপ্লবের ফলে রাশিয়ার রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে যেমন ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে, তেমনি এই বিপ্লবের ফলেই ইয়োরোপের মানদণ্ডে একটি অতি দুর্বল এবং অনগ্রসর দেশ মাত্র অর্ধশতাব্দীর মধ্যে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। তাছাড়া এই বিপ্লবের পিছনে যে রাজনৈতিক মতাদর্শ ছিল, তার ক্ষয় হয়নি। মার্ক্সবাদের প্রসার ঘটেছিল এই বিপ্লবের মাধ্যমে। সারা দুনিয়ার লাঞ্ছিত, শোষিত এবং নির্যাতিত দরিদ্র জনগণের কাছে আলোর দিশারী হিসেবে তাই মার্ক্সবাদী সমাজতান্ত্রিক আদর্শ এবং রুশ বিপ্লব একসূত্রে গাঁথা। ফলে ইতিহাসে তার

---

1. বিস্তারিত আলোচনার জন্য E. H. Carr, *The Bolshevik Revolution,* 6 vols, London, 1950-59; I. Deutscher, *Trotsky,* (3 vols, Oxford 1954-60); L. Trotsky, *History of the Russian Revolution* (Eng. tr. London, 1954); C. Hill, *Lenin and the Russian Revolution* (1971) R. Pipes, *Formation of the Soviet Union,* Harvard, 1954; N.H. Sukharov (ed & tr. J. Carmichael), *Russian Revolution,* 1917 (Oxford, 1955); D. Shub, *Lenin,* Penguin 1966; I. Deutscher, *Stalin-A Political Biography,* Penguin, 1968; B. Wolfe, *Three who made a Revolution*. New York, 1948 এবং L. Kochan, *Russia in Revolution* (1890-1918), London, 1966.

আলোচনার প্রয়োজনীয়তা সর্বদাই থাকবে। এমনকি যারা ঐ আদর্শের বিরোধী তাদের কাছেও রুশ বিপ্লব ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে স্বীকার্য।

রুশ বিপ্লব বলতে অবশ্য আরও একটি কথা মনে রাখা দরকার। বস্তুত পক্ষে 1917 খ্রিস্টাব্দে রাশিয়াতে দু'বার বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে রুশ জনসাধারণের প্রথম বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা দেখা যায় 1905 খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু ঐ বিপ্লব বলপূর্বক নিষ্ঠুরভাবে দমন করা হয়। এটি ছিল 1917 খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবের ড্রেস রিহার্শাল অর্থাৎ প্রথম পদক্ষেপ। এটি জারতন্ত্রের অবক্ষয় প্রকট করে। এর পরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন 1917 খ্রিস্টাব্দের মার্চ (পুরাতন ক্যালেণ্ডার অনুসারে ফেব্রুয়ারি) মাসে ডুমা বা রুশ সংসদের মাধ্যমে জার দ্বিতীয় নিকোলাস ক্ষমতা ত্যাগ করেন এবং মধ্যবিত্ত ও বুর্জোয়া শ্রেণী ক্ষমতা দখল করে। অভিজাততন্ত্রেরও পতন হয়। রাশিয়ায় প্রজাতন্ত্রী সরকার স্থাপিত হয়। আলেকজাণ্ডার কেরেনস্কি-র নেতৃত্বে এক অস্থায়ী সরকার ক্ষমতাসীন হয়। এরপর 1917 খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে বলশেভিক পার্টি লেনিনের নেতৃত্বে কেরেনস্কি সরকারের পতন ঘটিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর সাহায্যে বিপ্লবী বা সোভিয়েত সরকার প্রতিষ্ঠিত করে। রাশিয়ার 1917 খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসের বিপ্লব ছিল 'বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব' (Bourgeoisie Democratic Revolution)। কিন্তু বুর্জোয়া শ্রেণী তাদের নিজেদের স্বার্থে বিপ্লবকে ব্যবহার করে। ফলে 1917 খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে 'মহান সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব' সংঘটিত হয়।

২। পটভূমিকা

জারতন্ত্র : রাশিয়াতে 1917 খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবের পটভূমি হিসেবে যা আমাদের চোখে পড়ে তা হলো জারতন্ত্রের চূড়ান্ত অপদার্থতা এবং স্বৈরতন্ত্র, দেশের আভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধানে জারদের নিদারুণ ব্যর্থতা। আমরা আগে অষ্টম অধ্যায়ে রাশিয়া সম্পর্কে আলোচনাও করেছি। এখানে শুধু প্রাসঙ্গিকতা বোধে কিছু কথা বলা দরকার।

রাশিয়া 1611 খ্রিস্টাব্দ থেকে 1917 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনশো বছরেরও আধিককাল ধরে ছিল রোমানভ বংশীয় রাজতন্ত্রের শাসনাধীনে। রাশিয়ার রাজাকে বলা হত জার (ইংরেজিতে Tsar অথমা Czar) এবং রাণীকে বলা হত জারিনা। জারতন্ত্রের শাসনাধীনে রাশিয়া মধ্যযুগীয় সভ্যতা বর্জন করে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করে। পিটার দ্য গ্রেট (1685-1725 খ্রিঃ) -এর আমলে রাশিয়া আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে প্রথম মর্যাদা লাভ করে। এর পর জারিনা দ্বিতীয় ক্যাথ্যারিন (1762-1792 খ্রিঃ) জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারের প্রভাবে কিছু সংস্কার প্রচেষ্টার মাধ্যমে দেশের উন্নতির দিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন। ইয়োরোপের চোখে তখন সর্ব প্রথম রাশিয়ার সম্মান লাভ। কিন্তু সাধারণভাবে জারদের শাসনব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ রক্ষণশীল, সম্পূর্ণ কেন্দ্রীভূত ও স্বৈরতন্ত্রী। রাশিয়ায় তখন লিপিবদ্ধ কোনও আইন ছিল না। ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে জারের হুকুম ও ঘোষণাপত্র ছিল দেশের আইন।

আমলাতন্ত্র ও পুলিশতন্ত্রই ছিল জারের প্রধান সহায়ক। জনসাধারণকে রাষ্ট্রশাসনের উল্লেখযোগ্য কোনও অধিকার দেওয়া হয়নি। অন্যদিকে সরকারি কর্মচারীদের নিয়োগ ও ছাঁটাই নির্ভর করত জারের খেয়াল খুশির উপর।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ফরাসি বিপ্লবের পর থেকে ইয়োরোপের অধিকাংশ দেশ যখন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটাতে থাকে তখন রাশিয়াতে ছিল সেই প্রাচীন স্বৈরাচারী ও কেন্দ্রীভূত শাসন, আর শাসকদের সেই অন্ধবিশ্বাস। পশ্চিম ইয়োরোপের গণতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র, সাম্য, মৈত্রী স্বাধীনতা ইত্যাদির কথা রাশিয়াতে প্রবেশ করতে পারেনি। উনিশ শতকের ইয়োরোপীয় বিপ্লবের ধারা থেকে রাশিয়ার শাসকগণ কোনও শিক্ষা লাভ করতে পারেননি। জারেদের প্রধান সহায়ক ছিল প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ততান্ত্রিক অভিজাতবর্গ। সংবাদপত্রের কণ্ঠ ছিল রুদ্ধ— শিক্ষাক্ষেত্রে আলোচনা ও চিন্তার স্বাধীনতা ছিল না।

শুধু সামন্ততান্ত্রিক বললে রাশিয়ার অবস্থা পরিষ্কার করে বোঝানো যাবে না। রাশিয়া ছিল কৃষি প্রধান; তার জনগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠই ছিল কৃষক। তাদের মধ্যে আবার বিপুল গরিষ্ঠ জনতা ছিল ভূমিদাস বা সার্ফ। অধ্যাপক *লাওনেল কোচান* লিখেছেন, সার্ফপ্রথা শুধু অর্থনৈতিক নয়, গভীর রাজনৈতিক এবং নৈতিক সমস্যারও ধারক ও বাহক। প্রয়োজন ছিল এই দিকে দৃষ্টি দেওয়ার[1] ("Serfdom not only posed economic problems, but also had immense political and moral repurcussions. However deeprooted and old-established, it was none the less acknowledged to be an evil that demanded some attention")। দুর্ভাগ্যবশত কেউই এদিকে দৃষ্টি দেন নি।

এই পরিস্থিতির মধ্যে রাশিয়া ইয়োরোপের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হলেও, বলা হয়েছে 'রাশিয়া ছিল ইয়োরোপায় সভ্যতার শেষ সন্তান'। আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার প্রতিফলন দেখা যায় সৈন্য বাহিনীর মধ্যেও। সৈন্য বাহিনীর দুর্বলতা প্রকট হয়ে ধরা পড়েছিল ক্রিমিয়ার যুদ্ধে। উনিশ শতকের গোড়া থেকে রুশ বিপ্লব পর্যন্ত পরপর পাঁচজন জার রাশিয়াতে ক্ষমতাসীন ছিলেন। এরা হলেন: **প্রথম আলেকজান্ডার** (1801-1825 খ্রিঃ), **প্রথম নিকোলাস** (1825-1855 খ্রিঃ), **দ্বিতীয় আলেকজান্ডার** (1855-1881 খ্রিঃ), **তৃতীয় আলেকজান্ডার** (1881-1894 খ্রিঃ) এবং **দ্বিতীয় নিকোলাস** (1894-1917 খ্রিঃ)। উনিশ শতক থেকে রাশিয়ার অর্থনীতি ছিল খুবই পশ্চাদপদ; এ সময় বহু কৃষি বিদ্রোহও ঘটেছিল এবং ক্রমে সৃষ্টি হয় নানা বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির। জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের রাজত্বকাল পর্যন্ত আমরা আগেই সবিস্তারে আলোচনা করেছি, তাই বর্তমানে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। এক্ষেত্রে শুধু তিনটি সূত্র মনে রাখা প্রয়োজন:(ক) জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের সার্ফদের মুক্তি আইন (Edict of Emancipation, 1861 খ্রিঃ) তৎকালীন অবস্থার গুরুত্বপূর্ণ পতন ঘটালেও কাঙ্খিত ফল আদৌ লাভ করতে পারেননি, বাস্তবে রুশ সার্ফগণ 'মুক্ত' হয়নি;

1 কোচান, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. 141-42

(খ) দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের আমলেই রাশিয়াতে প্রথম শিল্পায়নের প্রচেষ্টা শুরু হয় এবং তা কিছুক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হয় এবং (গ) দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের আমলেই রাশিয়াতে বিপ্লবী কার্যকলাপ সক্রিয় হয়ে ওঠে। আমরা রুশ বিপ্লবের পটভূমিকা হিসেবে জার তৃতীয় আলেকজান্ডারের রাজত্বকাল থেকে ঘটনাবলী একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করতে পারি।

জার তৃতীয় আলেকজাণ্ডার ঃ রাশিয়ার 'মুক্তিদাতা' জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের শোচনীয় মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র তৃতীয় আলেকজাণ্ডার (1881-94 খ্রিঃ) সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন সংকীর্ণমনা ও প্রতিক্রিয়াশীল। উদারনীতি, বিপ্লবী ভাবধারা ছিল তাঁর কাছে অসহ্য। "এক জার, এক চার্চ, এক রাশিয়া" (One Czar, one Church, one Russia) এই ছিল তাঁর আদর্শ। ফলে দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার কর্তৃক প্রবর্তিত প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থা তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের আমলে আরও জোরদার হলো।

সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর চিন্তাধারাকে রূপায়ণের উদ্দেশ্যে কঠোর দমননীতির পথ অবলম্বন করলেন। তিনি প্রথমে, (ক) পিতার হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত এরূপ সন্দেহজনক ব্যক্তিদের কারাকক্ষে নিক্ষেপ করলেন অথবা সাইবেরিয়ায় নির্বাসন দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মুদ্রণযন্ত্রের কণ্ঠরোধ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রভর্তি নিয়ন্ত্রণ, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন। (খ) শাসনব্যবস্থায় নির্বাচনের পরিবর্তে মনোনয়ন ব্যবস্থা গৃহীত হলো। পিতা কর্তৃক প্রবর্তিত "মুক্তিনামা"-কে অগ্রাহ্য করে ভূমিদাসদের জমিদারদের অধীনে পুনরায় প্রেরণ করার ব্যবস্থা করলেন। আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হলো ঐ সব জমিদারদের উপর। ফলে দেশে পুনরায় বিকৃত সামন্ততন্ত্র (Bastard Feudalism) চালু হলো। কোনও কোনও ক্ষেত্রে, এই জমিদারদের বলা হত 'ল্যাণ্ড ক্যাপটেন' (Land Captain)। 'জাস্টিস অফ দি পিস (Justice of the Peace) পদের অবলুপ্তি ঘটিয়ে বিচার ও শাসন বিভাগ হলো একত্রিত। (গ) তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের আমলে ইহুদী-নির্যাতন ছিল একটি কলঙ্কজনক কাহিনী। ইহুদীদের তিনি শিক্ষাদীক্ষা, চাকুরি, কৃষি-শিল্প ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করলেন। এটি ছিল তাঁর রুশীকরণ নীতির অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া, রাশিয়াকে একই চার্চের অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে তিনি ইহুদী, পোল, ফিন ইত্যাদি অনেকের উপর রুশীকরণ নীতি প্রয়োগ করেন। এছাড়া রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় চার্চের বহির্ভূত চার্চগুলির ধর্মীয় নীতির উপর বিধিনিষেধ আরোপিত হয়। তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের রুশীকরণ নীতি, ইহুদী-নির্যাতন সাধারণ মানুষের মনে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল। ফ্রান্সের মূলধনে গড়ে ওঠা শিল্প কারখানায় রাশিয়ার শ্রমিকরা প্রাপ্য পারিশ্রমিক থেকে সর্বাধিক বঞ্চিত হলো। এইসবের ভিতর ছিল রাশিয়ার পরবর্তী রাজনৈতিক রূপ পরিবর্তনের সূচনা। এভাবে জনসাধারণের মনে অসন্তোষ, নির্যাতন ও বঞ্চনা সৃষ্টি করে তৃতীয় আলেকজান্ডার 1894 খ্রিস্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

জার দ্বিতীয় নিকোলাস ঃ পিতা তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় নিকোলাস (1894-1917) রাশিয়ার সিংহাসনের আরোহণ করেন। তিনি নিজে ছিলেন দুর্বলমনা ও রাজকর্মে অদক্ষ। আর রাণী আলেকজান্দ্রাভা ছিলেন বুদ্ধিমতী, কর্মক্ষম ও কূটনীতিতে বিশ্বাসী। তিনি আবার রাসপুটিন নামে এক ভণ্ড সন্ন্যাসীর প্রভাবে পড়েন। রাজ্যের শাসনসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি রাণী ও তাঁর প্রিয়পাত্র রাসপুটিনের কথায় ও পরামর্শে পরিচালিত হত। এছাড়া জার নিকোলাস নিজেও ছিলেন স্বৈরতন্ত্রে বিশ্বাসী। সুতরাং পিতার আমলের প্রতিক্রিয়াশীল দমননীতি হয়ে দাঁড়াল তাঁর রাজ্যশাসনের মূলসূত্র।

কঠোর দমননীতি প্রয়োগ ঃ পিতার স্বৈরাচারী প্রতিক্রিয়াশীল নীতিকে দ্বিতীয় নিকোলাস আরও শাণিত উপায়ে কার্যকরী করলেন। প্রথম পর্যায়ে, তিনি দেশের সর্বত্র অসংখ্য গুপ্তচর নিযুক্ত করলেন। তাদের প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি ক'রে তিনি সরকার-বিরোধী এবং আপত্তিকর ধারণার পরিপোষক সকল স্তরের মানুষের উপর নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা কায়েম করলেন। তাঁর মতে বুদ্ধিজীবীরাই ছিলেন বিপ্লবী কর্ম ও চিন্তার ধারক ও বাহক। সুতরাং সন্দেহ হওয়া মাত্রই শিক্ষক, অধ্যাপক ও জ্ঞানীগুণী সকলের উপরই নির্যাতন শুরু হলো। মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় একপঞ্চমাংশ ছাত্রকে এক বছরের মধ্যে কারাগারে নিক্ষেপ করা হলো অথবা সাইবেরিয়ায় নির্বাসন দেওয়া হলো। সেন্সর বিধিকে এত কঠোর করা হলো যে, ঐতিহাসিক গ্রীন-এর 'ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস', ব্রাইস-এর 'আমেরিকান কমনওয়েলথ' ইত্যাদি পর্যায়ের পুস্তকগুলিও রাশিয়ায় নিষিদ্ধ হলো। সরকারের অনুমতি ভিন্ন সংবাদপত্রে সংবাদ প্রকাশ করা নিষিদ্ধ হলো। দেশের রাজনৈতিক দলগুলির কণ্ঠরোধ করা হলো। সন্দেহভাজন সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মচারীও রেহাই পেল না। সর্বত্র পরিচালিত হলো গ্রেপ্তার, নির্যাতন, নির্বাসন, কারাকক্ষে নিক্ষেপ, শারীরিক ও মানসিক পীড়ণ। দ্বিতীয় দফায়, পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিকোলাস রুশীকরণ নীতির চরম প্রয়োগে মনোযোগ দিলেন। পোল, ফিন, জার্মান, ইহুদী ইত্যাদি সকল স্তরের সংখ্যালঘুদের 'এক জার, এক চার্চ এবং এক রাশিয়ার' আওতায় নিয়ে আসার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলো। 1900 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রায় দশ লক্ষ ইহুদী আমেরিকায় আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হলো। রাশিয়ায় বসবাসকারী রুশ ভিন্ন অন্য জাতিগুলি নিজেদের ভাষা, আদর্শ ও সংস্কৃতির পরিবর্তে রাশিয়ার ভাষা, কৃষ্টি-সভ্যতা অনুসরণ করতে বাধ্য হলো। সর্বোপরি, জার নিকোলাসের আমলে রাশিয়ার কৃষক-শ্রমিকের জীবনে নাভিশ্বাস উঠল। প্রাক্তন জারের আমল থেকেই কৃষকরা ঋণভারে জর্জরিত ছিল। দ্বিতীয় নিকোলাসের সময় জাতীয় ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় রাষ্ট্রীয় ঋণের পরিমাণও বৃদ্ধি পেল। দেশ ছেড়ে অনেক কৃষক বিদেশে পালিয়ে গেল। যারা রইল তারা সরকারি করের বোঝা মাথায় নিয়ে অর্ধমৃত হয়েই রইল। অন্যদিকে নিকোলাসের আমলে দেশের শিল্প-বিপ্লব ত্বরান্বিত হলেও প্রতিক্রিয়াশীল শাসকের আশ্রয়পুষ্ট মিল ও কারখানার মালিকরা শ্রমিকশ্রেণীকে নির্বিচারে শোষণ করতে আরম্ভ করল। নির্যাতিত ও শোষিত

শ্রমিক শ্রেণী এই সময় থেকে নির্বিচারে মার্ক্সবাদ ও সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়ে ওঠে। রাশিয়ার মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরাও ক্রমশ এই আন্দোলনে যুক্ত হতে থাকে।

জারের স্বৈরতন্ত্র, অভিজাত ও সামন্তশ্রেণীর বিশেষ অধিকার, কৃষক তথা ভূমিদাস শ্রেণীর উপর নির্যাতন ও শোষণ ইত্যাদির বিরুদ্ধে এবং রাশিয়াতে সাংবিধানিক শাসন, ভোটাধিকার ও সংসদীয় ব্যবস্থা, ভূমিসংস্কার ইত্যাদি প্রবর্তনের জন্য নানা ধরনের বিদ্রোহ ও আন্দোলন রাশিয়ার সর্বত্র দেখা গিয়েছিল। যেমন প্রথম নিকোলাসের আমলে ঘটেছিল ডেকাব্রিস্টদের বা ডিসেমব্রিস্টদের বিদ্রোহ (1825 খ্রিঃ) আর জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার আমলে 'নিহিলিস্ট' (Nihilist) এবং 'নারোদনিক' (Narodniki) আন্দোলন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

নিহিলিস্ট আন্দোলন ঃ নিহিলিস্ট আন্দোলন ছিল ধ্বংসাত্মক এবং নৈরাজ্যবাদী। 'নিহিল' কথাটির অর্থ শূন্য। পুরাতনত ন্ত্র সম্পূর্ণ ধ্বংসসাধন ক'রে নতুন রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলাই ছিল এই আন্দোলনের লক্ষ্য। এর জন্য রাশিয়ার স্বৈরতন্ত্র, সামন্তপ্রথা এবং অর্থোডক্স চার্চ ইত্যাদি সব কিছুই ধ্বংস করা দরকার। তবে নিহিলিস্টদের মধ্যে অনেক গোষ্ঠী ছিল। ডিমিট্রি পিজারেভ নামে এক বিপ্লবী এই নিহিলিস্ট মতবাদ প্রচার করেছিলেন। খ্যাতনামা রুশ সাহিত্যিক তুর্গেনিভ 1862 খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত *Fathers and Sons* উপন্যাসে লিখেছেন, 'A Nihilist is a man who does not bow before any authorities'। পিজারেভ তুর্গেনিভের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। লাভরোভ, কের্নিসেভস্কি প্রমুখ নিহিলিস্টদের এক গোষ্ঠী ছিলেন সমাজতন্ত্রে সমর্থক। আবার মিখায়েল বাকুনিন (1814-76) নৈরাজ্যবাদী বিদ্রোহের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর মতে ধ্বংসের মধ্যে আছে সৃষ্টির বীজ। যাই হোক্ বিপ্লবীদের হত্যা ও সন্ত্রাস নীতি শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি, জার সরকার কঠোরভাবে তা দমন করে।

নারোদনিক আন্দোলন ঃ উনিশ শতকের সত্তরের দশকে রাশিয়াতে (1873-76 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে) আরেকটি গোপন বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই আন্দোলনের মূল স্লোগান ছিল 'জনগণের কাছে যাওয়া' (Going to the people)। রুশ ভাষায় বলা হত hozhdenie v narod । এর থেকে আন্দোলনের নাম হয় নারোদনিক আন্দোলন। এই জনবাদী (Populist) আন্দোলনের কর্মসূচি কৃষকশ্রেণী বুঝতে পারেনি, বরং সরকার এর সম্ভাব্য পরিণতি উপলব্ধি ক'রে কঠোরহাতে এই আন্দোলন দমন করে। আবার নিহিলিস্ট ও নারোদনিক আন্দোলন অনেক সময় একত্রে কাজ করেছে।

৩। প্রথম রুশ বিপ্লব (1905)

দমননীতির বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও অভ্যুত্থান ঃ জার দ্বিতীয় নিকোলাসের রাজত্বকালে সরকারি কাজকর্মের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ জনগণের মনে অসন্তোষ ও সরকার বিরোধী মনোভাব প্রকট হয়ে ওঠে। সরকারের প্রচণ্ড দমননীতি এবং শাসনব্যবস্থার দুর্নীতি দিকে দিকে

সাধারণ মানুষের বিপ্লবী প্রবণতা বৃদ্ধি করল। নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত কৃষকদের অসন্তোষকে ভিত্তি করে জর্জ প্লেখানভ 'ভূমি ও স্বাধীনতা' (Land and Liberty) প্রাপ্তির জন্য বিপ্লবের ডাক দিলেন। কারখানার নির্যাতিত ও শোষিত শ্রমিকেরা জারের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের নামে নিজেদের সংঘবদ্ধ করল। ঠিক এমনই এক সন্ধিক্ষণে রুশ-জাপান যুদ্ধে (1905) রাশিয়া পরাজিত হলো। এই পরাজয় জনগণের মনে তীব্র বিক্ষোভ সঞ্চার করল, তারা সরকারি শাসনতন্ত্র ও সামরিক বাহিনীর উপর বিশ্বাস হারাল। সংস্কারপন্থীরা অবিলম্বে আন্দোলন শুরু করল। সংস্কারপন্থীদের মধ্যে বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীরা কোথাও কোথাও হত্যা ও ধ্বংসাত্মক কার্যে লিপ্ত হলো। রাশিয়ার মধ্যবিত্ত শ্রেণী, বুদ্ধিজীবী থেকে শ্রমিক, কৃষক সকলেই ক্রমশ বুঝতে পারলেন যে জারতন্ত্র স্বেচ্ছায় স্বৈরাচার ত্যাগ করবে না। রাশিয়ার দুর্বলতাও দূর হবে না। আবার একথাও বোঝা গেল যে সংস্কার দ্বারা সমাজ পরিবর্তনের আশা নেই। সুতরাং বিপ্লবই একমাত্র পথ। তবে গুপ্তহত্যা ও সন্ত্রাসের পথে এই বিপ্লব আন্দোলন হবে না। এই বিপ্লবী প্রচেষ্টা প্রথম দেখা গিয়েছিল 1905 খ্রিস্টাব্দে। উত্তরকালে বলশেভিক বিপ্লবের অন্যতম নেতা লিয়ন ট্রটস্কি লিখেছিলেন যে, 1905 -এর বিপ্লব ছিল 1917 খ্রিস্টাব্দের রুশ বিপ্লবের মহড়া বা ড্রেস রিহার্সাল। রাশিয়ার স্বৈরাচারী শাসন, অর্থনৈতিক শোষণ, সামাজিক বৈষম্য, গুপ্ত বিপ্লবের ব্যর্থতা, রুশ-জাপান যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়, ভূমি সমস্যার কারণে কৃষকের তীব্র ক্ষোভ, শ্রমিক দাবি পূরণ না হওয়াতে শ্রমিক সমস্যা যেমন 1905 -এর বিপ্লবের ভিত্তি গড়ে দিয়েছিল, তেমনি নানা রাজনৈতিক দল তা প্রয়োগের চেষ্টা করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সরকার চরম প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে দমননীতির মাত্রা বৃদ্ধি করল।

রক্তাক্ত রবিবার ঃ সরকারি দমননীতি যখন মাত্রাতিরিক্ত হলো তখন একদল ধর্মঘটী জনতা 1905 খ্রিস্টাব্দের 22 শে জানুয়ারি রবিবার ফাদার গ্যাপন নামক এক ধর্মযাজকের নেতৃত্বে পেট্রোগ্রাড শহরে জারের 'উইন্টার প্যালেসে'র দিকে শোভাযাত্রা নিয়ে অগ্রসর হয়। পথিমধ্যে জারের সেনাবাহিনী এই শোভাযাত্রার উপর গুলিবর্ষণ করে এবং তাতে বহু মানুষ হতাহত হয়। এই শোচনীয় ঘটনা ইতিহাসে 'রক্তাক্ত রবিবার' নামে পরিচিত। এই হত্যাকাণ্ড দেশের সর্বত্র দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করল। জনগণ জারের কাছে দাবি জানাতে চেয়েছিল তিনটি —(i) রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি, (ii) সংবিধান সভা আহ্বান এবং (iii) কারখানায় আট ঘণ্টা শ্রমের সময় ঘোষণা। পরিবর্তে তারা খেল গুলি। সেন্ট পিটার্সবার্গের শ্রমিকরা 1904 খ্রিঃ থেকেই বিক্ষোভ দেখাচ্ছিল; 1905 এর 15th জানুয়ারি তারা একটি ধর্মঘট করে; কিন্তু 'রক্তাক্ত রবিবার'-এর ঘটনা দেশব্যাপী তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। শ্রমিক ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়ে অন্যান্য বহু শহরে, শুরু হয় কৃষি বিদ্রোহ এবং নানা স্থানে সন্ত্রাসবাদী হত্যা। ক্রমে জারের সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীতেও বিপ্লবের প্রভাব দেখা দেয় এবং অনেক ক্ষেত্রে সেনাবিদ্রোহ ঘটে। তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল কৃষ্ণসাগরে

যুদ্ধ জাহাজ পোটেমকিন-এর নাবিকদের বিদ্রোহ (জুন, 1905)। এই বিদ্রোহে বহু জমিদার, রাজপুরুষ, এমনকি জারের খুল্লতাত ডিউক সার্জ নিহত হলেন।

প্রথম-চতুর্থ ডুমার অধিবেশন ঃ সরকার এই পরিস্থিতিতে নতুন শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হলো (30th অক্টোবর 1905)। অবিলম্বে জার জাতীয় পরিষদ বা ডুমার অধিবেশন আহ্বান করলেন (1906)। দায়িত্বশীল সরকার গঠনের অনুকূল শাসনপদ্ধতি রচনার প্রয়াস চলল। কিন্তু মতভেদের ফলে তা সম্ভব হলো না। এদিকে সরকারের দমনমূলক কার্যপদ্ধতি অব্যাহত রইল। ফলে বিপ্লবী-আন্দোলনও চলতে থাকল। তাই 1906 থেকে 1912 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে আরও তিনবার ডুমার অধিবেশন বসল। কিন্তু শাসন সংস্কার সম্ভব হলো না। এর দ্বারা জনমতকে কিছুটা স্বীকার করা হলো বটে, কিন্তু সরকারি দমননীতি শিথিল হলো না। ফলে অসন্তোষের আগুন আরও ছড়িয়ে পড়তে থাকল।

1905 খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবের ফলাফল ঃ 1905 খ্রিস্টাব্দের বিপ্লব শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। জার দ্বিতীয় নিকোলাস 1905 খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে যখন 'অক্টোবর ঘোষণাপত্র' (October Manifesto) দ্বারা সংবিধান রচনার প্রতিশ্রুতি দেন এবং পার্লামেন্ট ডাকার আহ্বান মেনে নেন, আর কাউন্ট উইটিকে প্রধানমন্ত্রী করেন, তখন বিপ্লবীদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। মধ্যপন্থীগণ জারের ঘোষণায় সন্তুষ্ট হয়ে বিপ্লব প্রত্যাহারে রাজী হন। মনে রাখা দরকার যে, 1905এর বিপ্লবে বলশেভিক দল মুখ্য ভূমিকা নেয় নি, নিয়েছিল বুদ্ধিজীবী জাতীয়তাবাদী ও সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরা। এরাই নেতৃত্ব দেয়, ফলে তাদের আপসপন্থীদের সঙ্গে উগ্রপন্থীদের অন্তর্বিরোধ কাজে লাগিয়ে, অভিজাত শ্রেণীর চাপে জার দ্বিতীয় নিকোলাস 1906 থেকে পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে পুনরায় কঠোর হাতে গণআন্দোলন দমন করেন। তবে 1905 খ্রিস্টাব্দের বিপ্লব ব্যর্থ হলেও তার তাৎপর্য কম ছিল না। ঐ বিপ্লবই জারতন্ত্রের ভিত্তিতে প্রথম ফাটল ধরায়। সংঘবদ্ধ কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন দ্বারা জারতন্ত্রের পতন না হলে যে রাশিয়ার সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়, তা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

৪। বলশেভিক বিপ্লবের কারণ

রাশিয়ার বিপ্লবী আন্দোলনের উত্থান ও অগ্রগতি ঃ উনিশ শতকের গোড়ার দিকে রাশিয়ার একাধিকবার কৃষক বিদ্রোহ হয়েছে; কিন্তু সেই সব বিদ্রোহ নির্মমভাবে দমন করা হয়। শিল্প-বিপ্লবের ফলে রাশিয়ায় যখন শ্রমিকরা সংঘবদ্ধ হতে থাকে তখন শহরগুলিতে ক্রমে গণবিক্ষোভ, ধর্মঘট ইত্যাদির মাধ্যমে সংস্কারের দাবি সোচ্চার হতে থাকে। অন্যদিকে জারের প্রতিক্রিয়াশীল শাসনও দিকে দিকে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে। এই দ্বন্দ্বের মাঝে রাশিয়ায় গড়ে ওঠে বিভিন্ন চরিত্রের বিপ্লবী দল। বাকুনিন পন্থী নৈরাজ্যবাদীগণ (Anarchists), হত্যা ও ধ্বংস-কার্যে বিশ্বাসী নিহিলিস্টগণ (Nihilists), নরমপন্থী সংস্কারকগণ, মার্ক্সপন্থী

সাম্যবাদীগণ, ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শ ও কর্মসূচি অনুসরণ করত। তবে শিল্প-বিপ্লবের ফলে সংঘটিত শিল্প-শ্রমিকরা ছিল কার্ল মার্ক্সের সমাজতান্ত্রিক মতবাদে বিশ্বাসী। 1883 খ্রিস্টাব্দে কার্ল মার্ক্সের শিষ্য জর্জ প্লেখানভ গঠন করলেন সোস্যাল ডেমোক্রাট দল। প্লেখানভ ছিলেন রুশ-সামজতন্ত্রের জনক। তিনি বলেছিলেন "শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবই হবে রাশিয়ার বিপ্লব, অন্যথায় কোন বিপ্লবই হতে পারে না।"[1] এই দল রাশিয়ার তৎকালীন ছোট ছোট সমাজতান্ত্রিক দলগুলিকে সংঘবদ্ধ ক'রে 1898 খ্রিস্ট্রাব্দে গঠন করে রুশীয় সোস্যাল ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টি (The Russian Social Democratic Labour Party)। বিশ শতকের প্রথম দিকে (1903) সোস্যাল ডেমোক্র্যাটগণ দু'দলে বিভক্ত হলো। এর মধ্যে সংখ্যালঘিষ্ঠ দলটির নাম হলো 'মেনশেভিক দল' (Menshevik Party)। এরা সেই যুগের ফ্রান্স ও জার্মানির রাজনৈতিক দলগুলির মত নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেণ্টারী শাসনে বিশ্বাসী ছিল। এই দলের ধারণা ছিল যে, ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করতে পারলে সমাজের পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে। অন্যদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলটি 'বলশেভিক দল' (Bolshevik) নামে পরিচিত হলো। এই দল বিশ্বাস করত, যে দেশের নাগরিকদের কোনও গণতান্ত্রিক অধিকার নেই, যে দেশে কোনও পার্লামেণ্ট নেই, সেই দেশে পার্লামেণ্টীয় ধাঁচে দল গঠন ও ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টা অনর্থক। তাই তারা দলীয়শৃঙ্খলতার উপরজোর দিত এবং বিপ্লবকেই মুক্তির আসল পথ হিসেবে গ্রহণ করল।

1905 খ্রিস্টাব্দের "রক্তাক্ত রবিবার" ছিল জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদের ফলস্বরূপ। সরকার নির্মমভাবে দমননীতি গ্রহণ করলেও জনসাধারণ অবদমিত হয়নি। তারা নতুন বিপ্লবাত্মক ঘটনার প্রতীক্ষায় রইল। শেষপর্যন্ত রুশ বিপ্লব ঘটল 1917 খ্রিস্টাব্দে। এই যুগান্তকারী পটভূমি ও কারণগুলিঐতিহাসিকগণআলোচনা করেছেন।[2]

উনিশ শতকে নানা গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ফলে ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে যখন প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান, সরকার অথবা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল, তখন রাশিয়ার শাসকগণ (জার) তাঁদের স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থাকে অক্ষুন্ন রেখেছিলেন। প্রচলিত শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণের অংশ গ্রহণের কোনও সুযোগ ছিল না। কোনও কোনও জার শাসন সংস্কারের দ্বারা জনসাধারণের মঙ্গলসাধনের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু উপর থেকে সংস্কার রাশিয়ার আর্থ-সামাজিক কাঠামো, বৈষম্য ও দুর্বলতার কোনও সমাধান করতে পারেনি। বরং জারদের প্রতিক্রিয়াশীল ও দমনমূলক নীতি, আর্থিক শোষণ ও সামাজিক বৈষম্যমূলক শাসন রুশবাসীর জীবন অসহনীয় করে তোলে। তারা জারতন্ত্রের

---

1. "The Russian Revolution will triumph as a revolution of the working class, otherwise it will not triumph at all"–Plekhanov

2. এডওয়ার্ড হ্যালেট কার, *দ্য বলশেভিক রেভোলিউশন*, প্রথম খণ্ড; বারনার্ড পারেস, *দ্য ফল অফ দ্য রাশিয়ান মনার্কি*; লাওনেল কোচান, *রাশিয়া ইন রেভোলিউশন*।

পতন ঘটিয়ে শুধু-রাজনৈতিক পরিবর্তন নয়, সামাজিক-অর্থনৈতিক রূপান্তরও ঘটাতে চেয়েছিলেন বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে। 1905 খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবের প্রথম প্রচেষ্টায় রুশ জনগণ সফল না হলেও 1917 খ্রিস্টাব্দে তারা জারতন্ত্রের পতন ঘটাতে সমর্থ হয়। এই বিপ্লব শুধু রাশিয়ার ইতিহাসে নয়, পৃথিবীর ইতিহাসে এক যুগান্তকারী প্রভাব ফেলেছিল। এই বিপ্লবের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি নানাবিধ কারণ ছিল।

সামাজিক কারণ ঃ শতাব্দীব্যাপী রাশিয়ার সামাজিক বৈষম্য উনিশ শতকের শেষ দিকে তীব্র আকার ধারণ করে। একদিকে ভূমিদাসদের মুক্তি আইনের ব্যর্থতা এবং অন্যদিকে শিল্পায়নের প্রসারের ফলে রাশিয়ার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক-শ্রমিকদের সমস্যাই 1861 খ্রিস্টাব্দ থেকে 1905 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রধান হয়ে দেখা দেয়। রাশিয়ার সমাজকে প্রধান তিনটি শ্রেণীতে ভাগ ক'রে দেখানো যেতে পারে যেমন— নিম্নবর্গে ছিল বিপুল সংখ্যক দরিদ্র কৃষক এবং শিল্পের সঙ্গে যুক্ত শ্রমজীবী মানুষ। উচ্চবর্গে ছিল সংখ্যালঘু অভিজাত সম্প্রদায়। মধ্যবর্গও ছিল সংখ্যালঘু। এদের মধ্যে ছিল জমির মালিকানাকে কেন্দ্র করে মধ্য বর্তীস্তরের কৃষক, শহরের বুদ্ধিজীবী এবং মধ্যবিত্ত। 1905 খ্রিস্টাব্দের রুশ বিপ্লবের ব্যর্থতার পর কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত সকলেরই বিক্ষোভ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই বিক্ষোভই বিপ্লবের সামাজিক কারণ সৃষ্টি করেছিল।

কৃষক অসন্তোষ ঃ আমরা আগেই দেখেছি যে, জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের ভূমিদাস প্রথা বন্ধ করার আইন কৃষকদের অবস্থার কোনও পরিবর্তন করতে পারে নি। মুক্তিপ্রাপ্ত ভূমিদাসরা ক্ষতিপূরণের অর্থ, সরকারি কর ও সামন্তপ্রভুদের অন্যান্য পাওনা মেটাতেই নিঃস্ব হয়ে পড়ে। 1905 খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবের পর ক্ষতিপূরণ বন্ধ করা হয় বটে, তবে ততদিনে শতকরা পচাত্তর ভাগ অর্থ .শোধ হয়ে যায়। 1897-তে লোকগণনা অনুসারে রুশ জনসংখ্যার প্রায় তিন চতুর্থাংশ ছিল কৃষক। ক্রমশ জমির উপর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ পড়ছিল। এই অবস্থায় 1905-এর পর জার দ্বিতীয় নিকোলাসের মন্ত্রী স্তোলিপিন কয়েকটি ভূমিসংস্কার আইন পাস করেন, যার মধ্যে অন্যতম ছিল জমির মালিকানা মির বা কমিউনগুলির হাত থেকে নিয়ে কৃষকদের হাতে দেওয়া। এরফলে রাশিয়াতে ধনী কৃষক বা *কুলাক* (Kulak) শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে, কারণ দরিদ্র কৃষকরা অভাবের ফলে তাদের অধিকাংশ জমিই ধনী কৃষকদের বিক্রি করে দেয়। বিপুল সংখ্যক কৃষক হয় ক্ষেতমজুর, নয়তো ভাগচাষীতে পরিণত হয়। কৃষকশ্রেণীর মধ্যেও এই সামাজিক বৈষম্য জারতন্ত্রের দুর্বলতা প্রকট করে। শিঙ্গারেভ তাঁর লেখা Dying Countryside গ্রন্থে কৃষির অধঃপতনের চিত্র তুলে ধরেছেন। এই বিক্ষুব্ধ দরিদ্র কৃষকদের ধূমায়িত অসন্তোষ 1915 খ্রিস্টাব্দের পর নানা সংঘর্ষে আত্মপ্রকাশ করে।

শ্রমিক অসন্তোষ ঃ শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থাও কৃষকদের চেয়ে ভালো ছিল না। প্রধানত বিদেশী পুঁজির সাহায্যে গড়ে ওঠা রাশিয়ার শিল্পায়নে শ্রমিকদের মজুরি ছিল খুবই অল্প।

স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আহার্য ও বাসস্থান সব ব্যাপারেই ছিল সমস্যা। তাদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের কোনও অধিকার ছিল না। রুশ-শ্রমিক শ্রেণী ধর্মঘট ও বিদ্রোহ দ্বারা 1905-এর বিপ্লবে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল। এরপর কাউন্ট উইটির মন্ত্রিত্বকালে যে শিল্প সংগঠন নীতি চালু হয় তা শ্রমিকদের অবস্থা সামান্যই উন্নতি করতে পেরেছিল। ক্রমে 1905-1916 থেকে শ্রমিক অসন্তোষ বাড়তে থাকে। মজুরির কম হার, দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি, রাজনৈতিক অধিকার না থাকা, আহার্য ও বাসস্থানের নিম্নমান ইত্যাদি বিপ্লবী দলগুলি তাদের মধ্যে প্রচার চালিয়েছিল। 1915 খ্রিস্টাব্দের পর রাশিয়াতে ঘনঘন ধর্মঘট হতে থাকে; তখন থেকেই শ্রমিক শ্রেণীর জাগরণ ছিল বিপ্লবের অশনিসংকেত।

মধ্যবিত্ত ও সংখ্যালঘু জাতিগুলির অসন্তোষ ঃ কৃষক ও শ্রমিক ছাড়াও মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী শ্রেণী জারতন্ত্রের অসারতা এবং তার পতনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিল। তারা অবশ্য সাংবিধানিক সংস্কার ও নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী ছিলেন। তবে এই শ্রেণীর অনেকের মধ্যে বিপ্লববাদও প্রভাব ফেলেছিল। তাছাড়া এই শ্রেণীর উপর রুশ সাহিত্যিকদের এবং ইয়োরোপীয় দার্শনিকদের রচনার প্রভাব পড়েছিল। আবার রুশ বিপ্লবের সামাজিক কারণের মধ্যে বিভিন্ন জাতিসত্তার অসন্তোষ ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। জারের রুশীকরণ নীতির (Russification) ফলে পোল, ফিন, বেলারুশ, ইউক্রেনিয়, তুর্কি, ইহুদী প্রভৃতি ভিন্ন সংস্কৃতির ও ভাষাভাষী মানুষ অত্যন্ত নির্যাতিত হয়। তাদের জমিও কেড়ে নেওয়া হয়। এই বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সমানাধিকারের দাবির পিছনে বলশেভিক দলের সমর্থন ছিল। তারাও শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্তের মতন বিপ্লবের সহায়ক শ্রেণীতে পরিণত হয়।

অর্থনৈতিক কারণ ঃ দ্বিতীয় নিকোলাসের আমলে রুশ অর্থনীতি ঘোরতর বৈষম্যে পূর্ণ ছিল। আধুনিক শিল্পস্থাপনের প্রচেষ্টার সুযোগ নিয়ে পুঁজিবাদী গোষ্ঠীগুলি একচেটিয়া কারবার বৃদ্ধি করেছিল। ব্যাঙ্কগুলি এ ব্যাপারে তাদের সাহায্য করত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পিটার্সবার্গ ইন্টারন্যাশানাল ব্যাঙ্ক দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কারখানাগুলি কেবল যুদ্ধ জাহাজ তৈরি করত। দেশের অভ্যন্তরে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে প্রচুর মুনাফা অর্জনের দ্বারা বিদেশের বাজারে রপ্তানি বৃদ্ধির চেষ্টায়, বিশেষত বিদেশের বাজার দখলের চেষ্টায় তারা দেশের দারিদ্র বাড়িয়ে দেয়। একচেটিয়া কারবার সংগঠনের বৃদ্ধি. আমানতকারী ব্যাঙ্কের সংখ্যা বৃদ্ধি ও শিল্প ব্যবস্থায় তাদের কর্তৃত্ব এবং বিদেশী পুঁজির পরিমাণ বৃদ্ধি—এই তিনটি কারণ রাশিয়াতে অর্থনৈতিক শোষণের ভিত তৈরি করে। রাশিয়ার বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ছিল পর্বতসমান। ধাতু ও কয়লা শিল্পে ফরাসি ও বেলজিয়াম, তেল শিল্পে ব্রিটিশ এবং রসায়ন ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে জার্মান পুঁজির বিনিয়োগ ছিল বেশি। শিল্পের অর্থনীতির চাবিকাঠি বিদেশী পুঁজিপতিদের হাতে আর গ্রামীণ অর্থনীতি কুলাকদের নিয়ন্ত্রণে— এই

উভয়চিত্রই রাশিয়ার অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণ করে। এই শূন্যতা স্বৈরাচারী জারতন্ত্র পূর্ণ করতে পারেনি। তাই জনগণের বিক্ষোভ বিপ্লব আকারে দেখা দেয়।

রাজনৈতিক কারণ ঃ ফরাসি বিপ্লবের পিছনে যেমন সামাজিক-অর্থনৈতিক কারণ থাকা সত্ত্বেও বুরবোঁ রাজতন্ত্রের দায়িত্ব অস্বীকার করা যায় না, তেমনি 1917 খ্রিস্টাব্দের রুশ বিপ্লবের পিছনেও জারতন্ত্রের দায়িত্ব অনস্বীকার্য। এছাড়াও অন্যান্য রাজনৈতিক কারণে শেষপর্যন্ত জারতন্ত্রের পতন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। প্রথমতঃ, রাশিয়ার স্বৈরাচারী জারতন্ত্র ছিল পচনশীল। সামন্তপ্রথা, কৃষক ও শ্রমিকদের অসন্তোষ ইত্যাদি আমূল সংস্কার দ্বারা দূর না করে তারা আমলাতন্ত্রের হাতে দায়িত্ব দেয়। দ্বিতীয় নিকোলাসের দরবারে এক শক্তিশালী গোষ্ঠী ছিল, যার কেন্দ্রে ছিলেন রাসপুটিন নামে জর্জিয়া থেকে আগত এক ভণ্ড সন্ন্যাসী। রাণী আলেকজান্দ্রোভা ছিলেন তার অনুগত। ক্ষমতালোভী রাসপুটিনকে হত্যা করার পরও জার জনসাধারণের বিক্ষোভ দূর করার কোনও চেষ্টা করেননি। দ্বিতীয়তঃ, স্বৈরাচারী জারতন্ত্রের আমলে শাসনব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ অভিজাত সম্প্রদায়ের কুক্ষিগত, বিচারব্যবস্থা ছিল পঙ্গু। তৃতীয়তঃ, 1905 খ্রিস্টাব্দের বিপ্লব ব্যর্থ হলেও ডুমা এবং তার মধ্য দিয়ে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের এক ধারা শুরু হয়। ডুমার মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং শাসনতান্ত্রিক পরীক্ষা সার্থক না হলেও তা পরবর্তী বিপ্লবের পথ তৈরি করে। চতুর্থতঃ, 1907-1912 কালপর্বে স্তোলিপিনের সংস্কার কাঙ্ক্ষিত ফল আনতে ব্যর্থ হয়। পঞ্চমতঃ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার সরকারের যোগদান এবং জার্মান বাহিনীর হাতে পরাজয় রাশিয়ার দৈন্য প্রকট করেছিল। এরফলে রাশিয়াতে চরম খাদ্যাভাব এবং মূল্যবৃদ্ধি বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে। ত্রিশক্তি আতাঁতের সদস্য হিসেবে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া ছিল রাশিয়ার পক্ষে অদূরদর্শিতা। ষষ্ঠতঃ, উনিশ শতকের শেষদিকে রাশিয়াতে বিপ্লবী চেতনার প্রসার, নানা সংগঠনের কার্যকলাপ ইত্যাদি যেমন প্রভাব ফেলেছিল, তেমনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে বলশেভিক দলের বিপ্লবের প্রস্তুতি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। 1912 খ্রিস্টাব্দ থেকে 'প্রাভদা' পত্রিকার মাধ্যমে বলশেভিক দল জারতন্ত্রের উচ্ছেদের জন্য প্রচার চালিয়েছিল।

বিপ্লবের সূচনা ঃ 1917 খ্রিস্টাব্দে দেশের খাদ্যাভাব চরমে পৌঁছালো। 8th মার্চ শ্রমিকরা পেট্রোগ্রাড* শহরে সাধারণ ধর্মঘট ডাকলেন। জার সৈন্যবাহিনী তলব করলেন কিন্তু সৈনিকরাও বিদ্রোহ করল। 1917 খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসের 12 তারিখে পিটার্সবার্গ বিদ্রোহীদের হাতে চলে গেল। রাশিয়ার জাতীয় পরিষদ বা 'ডুমা' একটি অস্থায়ী সরকার (Provisional Government) প্রতিষ্ঠা করল। জারতন্ত্রের পরিবর্তে ঘোষিত হলো প্রজাতন্ত্র। পরের দিন 13th মার্চ, জার সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। এভাবে

---

*সেন্ট পিটার্সবার্গ শহরের পরিবর্তিত নাম পেট্রোগ্রাড। পরে নাম হয়েছিল লেনিনগ্রাড। বর্তমানে আবার পিটার্সবার্গ।

রাশিয়ার সর্বশেষ রোমানভ রাজবংশের অবসান হলো। জারতন্ত্র অবসানের মাধ্যমেই রুশ বিপ্লব (1917) সূচিত হলো।

৫। মার্চ থেকে নভেম্বর (1917 খ্রিঃ)

এখানে বিপ্লবকে কেন্দ্র করে প্রাসঙ্গিক কিছু বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। যেমন প্রথমেই বলতে হয়, 1917 খ্রিস্টাব্দে রাশিয়াতে একবার নয়, দু'বার বিপ্লব হয়েছিল। অধ্যাপক লিপসন অবশ্য বলেছেন যে এটি এক বিপ্লবের দু'টি পর্যায়। প্রথমে রাজনৈতিক পর্যায়ে জারতন্ত্রের অবলুপ্তি এবং পরে সামাজিক পর্যায়ে শ্রমিক প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।[1] দ্বিতীয় বক্তব্য হল প্রথম বিপ্লবটির চরিত্র অনুযায়ী বলা যেতে পারে যে এটি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং দ্বিতীয়টি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। আবার, দ্বিতীয় বিপ্লবের দ্বারাই লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক দল ক্ষমতা দখল করেছিল বলে এটিকে 'বলশেভিক বিপ্লব'-ও বলে। রুশবিপ্লব বলতে প্রকৃতপক্ষে দুটি বিপ্লবকেই বোঝায় যদিও দ্বিতীয়টির গুরুত্ব অনেক বেশি। সর্বশেষ বক্তব্য হল, 1917 খ্রিস্টাব্দের রাশিয়াতে পুরাতন জুলিয়ান ক্যালেণ্ডার চালু ছিল, যা ছিল পশ্চিম ইয়োরোপের কিংবা বর্তমান রাশিয়ার ক্যালেণ্ডার থেকে তেরো দিন পিছিয়ে। ফলে 1917 খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসের রুশ বিপ্লব 'ফেব্রুয়ারি বিপ্লব' নামেও পরিচিত ছিল। কারণ ঐ বিপ্লব 8th-মার্চ থেকে 16th-মার্চ হলেও পুরানো ক্যালেণ্ডার অনুসারে 22শে ফেব্রুয়ারি থেকে ঘটেছিল। তেমনি 'মহান নভেম্বর বিপ্লব' বা বলশেভিক বিপ্লবও পুরানো ক্যালেণ্ডার অনুসারে হয়েছিল অক্টোবর মাসে।

1917 খ্রিস্টাব্দের 4th মার্চ পেট্রোগ্রাডে ধর্মঘট এবং দাঙ্গা শুরু হয়। প্রায় আশি-নব্বই হাজার শ্রমিক এতে অংশগ্রহণ করে। তাদের মূল শ্লোগান ছিল 'স্বৈরতন্ত্র নিপাত যাক' এবং 'যুদ্ধ নিপাত যাক'। জারের আদেশে সামরিক গভর্নর বিক্ষোভকারীদের উপর গুলিবর্ষণের আদেশ দেয়। সৈন্যরা গুলি চালাতে অস্বীকার করে এবং বিপ্লবীদের পক্ষে যোগ দেয়। (10th মার্চ)। পরদিন 11th মার্চ পেট্রোগ্রাডে 'সোভিয়েট' (কৃষক, শ্রমিক এবং সেনাবাহিনীর প্রতিনিধিদের নিয়ে পরিষদ) পুনর্গঠিত হয়। এরপর 12th মার্চ রাশিয়ার রাজধানী পেট্রোগ্রাডে (পরে রাজধানী হয় মস্কো) জার সরকারের পতন ঘটিয়ে ডুমা লুভভের নেতৃত্বে এক অস্থায়ী সরকার গঠন করে এবং পরদিন (13th মার্চ) জার দ্বিতীয় নিকোলাস তার ভাই-এর অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করেন। সুতরাং বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ছিল রক্তপাতহীন।

---

1. "There were two revolutions, though perhaps it would be more correct to say that there was a single revolution which developed into two phases"– ই. লিপসন, *ইয়োরোপ ইন দ্য নাইন্টিনথ্ অ্যান্ড টোয়েন্টিথ্ সেঞ্চুরিজ*, পৃ. 343.

অস্থায়ী সরকার ঃ রোমানভ বংশের অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ায় শান্তি ফিরে এলো না, বিপ্লবও শেষ হলো না। রাশিয়াতে যখন জারতন্ত্রের পতন হয়ে অস্থায়ী সরকার গঠিত হলো তখনও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছে। অস্থায়ী সরকার যুদ্ধ থেকে দেশকে মুক্ত করতে পারেনি। বস্তুত অস্থায়ী সরকারের সামনে সমস্যা ছিল চারটি। যুদ্ধ, ভূমি সংস্কার, শ্রমিকের দাবি এবং অ-রুশ জাতিগুলির স্বায়ত্তশাসন বা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার। এই বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা প্রধান হলেও সরকারে 'ক্যাডেট' ও 'অক্টোব্রিস্ট' পার্টির মধ্যপন্থীদেরই প্রাধান্য ছিল। বলশেভিক দল দেশজুড়ে সোভিয়েত গড়ে তোলার উপরে জোর দেন। শ্রমিক, কৃষক ও সেনাবাহিনীর লোকেদের নিয়ে এই ধরনের সোভিয়েত বা পরিষদগুলির সঙ্গে অস্থায়ী সরকারের বিরোধ বাঁধে। বলশেভিক দল এক ইশতেহার প্রকাশ ক'রে (27 মার্চ 1917) যুদ্ধ বন্ধের দাবি জানায়। বলশেভিক নেতা ভ্লাদিমির লেনিন 1917 খ্রিস্টাব্দের 16th এপ্রিল সুইটজারল্যাণ্ড থেকে রাশিয়াতে এসে উপস্থিত হন এবং অস্থায়ী সরকারের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বলশেভিকরা ধ্বনি দেয় যে "সকল ক্ষমতা সোভিয়েতগুলির হাতে তুলে দিতে হবে।" লেনিন তাঁর 'এপ্রিল থিসিস' প্রকাশ করার কয়েক মাস পরে, বলশেভিকরা ক্ষমতা দখল করতে গিয়ে ব্যর্থ হয় (17-18 জুলাই, 1917), তাদের সামরিক ব্যর্থতা ঘটে, ফলে লেনিন ফিনল্যাণ্ডে চলে যান।

ইতোমধ্যে অস্থায়ী সরকারের বিদেশমন্ত্রী মিলিউকভের যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার গোপন নির্দেশ (1st May 1917) প্রকাশিত হলে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দেয় (3-5 May)। মিলিউকভ সহ দুই মন্ত্রীকে লুভভ পদত্যাগ করতে বাধ্য করেন। যুবরাজ লুভভের নেতৃত্বে নতুন কোয়ালিশন অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়, যাতে মেনশেভিক এবং কিছু সমাজ বিপ্লবী যোগ দেয়। নতুন সামরিক মন্ত্রী হন কেরেনস্কি। বলশেভিকদের মূল লক্ষ্য ছিল যুদ্ধ বন্ধ করা এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করা। শেষপর্যন্ত 21 জুলাই আলেকজাণ্ডার কেরেনস্কির নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠিত হয়।

বলশেভিক বিপ্লব ঃ 1917 খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে কেরেনস্কির সরকার হওয়ার পর ক্রমশ কেরেনস্কি এবং সেনাপ্রধান জেনারেল করনিলভের মধ্যে দ্বন্দ্ব সরকারকে দুর্বল করে দেয়। কেরেনস্কি বলশেভিকদের সাহায্য চাওয়াতে শেষোক্ত দলের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। বলশেভিক দলের ষষ্ঠ কংগ্রেসে (8-16 Aug. 1917) ট্রটস্কি-র দল যোগ দেয়। পেট্রোগ্রাড এবং মস্কো শহরে বলশেভিকদের ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অস্থায়ী সরকারের দুর্বলতার ফলে শেষপর্যন্ত 1917 খ্রিস্টাব্দের 23th অক্টোবর বলশেভিক দলের সেন্ট্রাল কমিটি লেনিনের নেতৃত্বে বলপূর্বক ক্ষমতা দখলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রস্তুতিপর্ব শেষ হলে বলশেভিক সেনাবিপ্লবীরা সমস্ত সরকারি দপ্তর দখল করে (6 নভেম্বর) এবং অস্থায়ী সরকারের উচ্ছেদ ঘোষণার মাধ্যমে সোভিয়েত সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। অস্থায়ী সরকারের প্রধান ছিলেন নরমপন্থী ও উদারনৈতিক ভাবধারায় বিশ্বাসী *কেরেনস্কি* (Kerensky)। কেরেনস্কি ছিলেন

মূলত নরমপন্থী সমাজবাদী বা মেনশেভিক দলের নেতা। তিনি নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে দেশের পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি আভ্যন্তরীণ নানা সংস্কার, শ্রমিক-কৃষকের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান এবং পররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে যুদ্ধ পরিচালনা করে যাওয়ার সংকল্প গ্রহণ করলেন। কিন্তু ক্ষমতায় এসেও এই সরকার শ্রমিক-কৃষকদের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের অনুকূল কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন না। বরং মহাযুদ্ধের পরিবেশে তিনি যুদ্ধ পরিচালনার দিকে সর্বাধিক মনোযোগ দিলেন; কিন্তু কেরেনস্কি বহু চেষ্টা করেও রাশিয়ার অভ্যন্তরে জার্মানির অনুপ্রবেশ রোধ করতে পারলেন না। জার্মানি বাহিনী রিগা অধিকার করে পেট্রোগ্রাড শহরের অতি সন্নিকটে পৌঁছে গেল। এর ফলে দেশের সাধারণ মানুষ আরও বিক্ষুব্ধ হলো। শ্রমিক-কৃষকগণ যুদ্ধ চান নি—তারা চেয়েছিলেন যুদ্ধ থেকে দূরে থেকে রাশিয়ার সার্বিক উন্নয়নে মনোনিবেশ করতে। শ্রমিক-কৃষকের প্রত্যক্ষ শাসনই ছিল তাদের কাম্য। সুতরাং তারা মেনশেভিক দলের উপর বিক্ষুব্ধ হলো। যুদ্ধরত সৈনিকরাও যুদ্ধ ক্ষেত্র বর্জন করল। ইতোমধ্যে ভোগ্যপণ্য ও শিল্পজাত পণ্যের যোগান বিপর্যস্ত হলে আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি চরমে ওঠে। সেনাবাহিনীর মধ্যে বলশেভিকদের বিশেষ প্রভাব ছিল। এই পরিস্থিতিতে লেনিন, স্ট্যালিন, ট্রটস্কি প্রমুখের নেতৃত্বে বলশেভিক দল বিনারক্তপাতে অস্থায়ী সরকারকে উচ্ছেদ করতে সমর্থ হন।

৬। রুশ বিপ্লবে লেনিনের ভূমিকা

লেনিনের প্রথম জীবন ঃ রুশ বিপ্লবের প্রধান কারিগর ছিলেন লেনিন। লেনিন তাঁর আসল নাম নয়, 1902 খ্রিস্টাব্দে পলাতক অবস্থায় যুদ্ধের সময় এই মহান বিপ্লবী ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন লেনিন। তাঁর আসল নাম ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ। 1870 খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ার ভোলগা নদীর তীরে কাজান প্রদেশের সিমব্রিস্কতে তাঁর জন্ম এক মধ্যবিত্ত রুশ পরিবারে। পিতা-মাতা উভয়েই বিদ্যালয় শিক্ষক। বাড়ির আবহাওয়া ছিল প্রগতিশীল। 1887 খ্রিস্টাব্দে তার বড়দাদা আলেকজাণ্ডার জার তৃতীয় আলেকজাণ্ডারকে হত্যার ষড়যন্ত্রের জন্য ধরা পড়ে ফাঁসিমঞ্চে প্রাণ দেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু তরুণ লেনিনের উপর গভীর প্রভাব ফেলে এবং তিনি জারতন্ত্রের পতন ঘটাবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন।[1] মেধাবী ছাত্র লেনিনের উপর অগ্রজের বিশেষ প্রভাব ছিল। কাজন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ছাত্র লেনিনের অপর এক ভ্রাতা ও ভগিনীও পুলিশের নজরবন্দী ছিলেন। ছাত্রাবস্থাতেই এক বিক্ষোভে অংশ গ্রহণ করার জন্য তাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। অবশ্য পরে অধ্যয়নের অনুমতি পান। ছাত্র জীবনেই তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, সন্ত্রাসবাদী পদ্ধতিতে নয়, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমেই জারতন্ত্রের উচ্ছেদ করতে হবে। তিনি বিপ্লবী দলে যোগ দেন, বিপ্লবী কাজের জন্য পুলিশের নজরে পড়েন এবং

1. ডেভিড শাব, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ 16.

রাশিয়া থেকে সাইবেরিয়ার নির্বাসিত হন। সেখান থেকে ছাড়া পেয়ে তিনি সুইটজারল্যাণ্ডের জেনেভায় চলে যান।

বস্তুত 1898 খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ার সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি প্রতিষ্ঠিত হলে লেনিন তার সভ্য হন এবং জার-বিরোধী কাজ-কর্মে যুক্ত থাকার অজুহাতেই তাকে নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল। ঐ নির্বাসনে থাকাকালীন তিনি ভবিষ্যৎ জীবনসঙ্গিনী ক্রুপস্কায়ার সঙ্গে মিলিত হন। 1900 খ্রিঃ রাশিয়ায় ফিরে এলেও পুলিশ তাঁর জীবন অতিষ্ঠ করে তোলে এবং তিনি সুইটজারল্যাণ্ড চলে যান। সেখানে অবস্থান কালে তার সহযোগী প্লেখানভ এর সঙ্গে মিলিত ভাবে ইস্ক্রা (স্ফুলিঙ্গ) নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এরপর ক্রমেই লেনিন একাধারে তাত্ত্বিক, সংগঠক এবং দেশনেতা হিসেবে খ্যাত হন। 1900 খ্রিস্টাব্দের পর থেকে লেনিন মার্ক্সবাদী দর্শন ও বিপ্লব তত্ত্ব স ম্পর্কে পত্র-পত্রিকায় এবং নানা পুস্তকে রচনা প্রকাশ করেন। এগুলির মাধ্যমে রুশ বুদ্ধিজীবী এবং শিক্ষিত মানুষেরা বিপ্লবী ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়।

1903 খ্রিস্টাব্দে রাশিয়া সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির দ্বিতীয় সম্মেলনে নীতিগত প্রশ্নে পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হয়। একদিকে বলশেভিক (বলশেভিক কথাটির অর্থ সংখ্যাগরিষ্ঠ) এবং অন্যদিকে মেনশেভিক (মেনশেভিক অর্থ সংখ্যালঘিষ্ঠ) পার্টি। লেনিন ছিলেন প্রথম দলের অন্যতম নেতা। তাঁর নির্দেশে বলশেভিক দল রাশিয়ার অভ্যন্তরে জারতন্ত্রে উচ্ছেদ, সামন্ত প্রথার অবশসান এবং শ্রমিক কল্যাণের বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে আন্দোলন করে। সংসদীয় প্রথা নয়, রুশ শ্রমিক শ্রেণীয় সাহায্যে মার্ক্সীয় তত্ত্ব অনুযায়ী বিপ্লবী পথেই রুশ জারতন্ত্রের উচ্ছেদের কথা তিনি ভাবতেন। *ক্রিস্টোফার হিল* লিখেছেন যে, 1903 থেকে 1917 খ্রিস্টাব্দের রাশিয়ার বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকেই মার্ক্সবাদ প্রয়োগ করার কথা লেনিন ভেবেছিলেন। এই বাস্তবসম্মত পন্থা গ্রহণই লেনিনের প্রধান কৃতিত্ব ("That in these years the Bolsheviks had evolved a political philosophy and analysis of events more realistic than those of any of their rivals")।[1]

বিপ্লব কালীন লেনিন : 1905 খ্রিস্টাব্দের রুশ বিপ্লব ব্যর্থ হলেও লেনিন তাকে পরবর্তী রুশ বিপ্লবের মহড়া বলে মনে করতেন। 1905-র বিপ্লব ব্যর্থ হলে 'দুই রণকৌশল' (TwoTactics) শীর্ষক রচনায় লেনিন এই তত্ত্ব প্রচার করলেন যে, রাশিয়ার বুর্জোয়া শ্রেণী দুর্বল, বিপ্লবের দুই স্তরে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব কাম্য। মার্ক্সীয় তত্ত্ব অনুযায়ী বিপ্লবের দুটি স্তর কাম্য— *প্রথম পর্বে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব হবে বুর্জোয়া নেতৃত্বে এবং দ্বিতীয় পর্বে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হবে।* লেনিনের তত্ত্ব মেনশেভিকরা মেনে নেয় নি। লেনিন অবশ্য স্পষ্ট ভাষায় জানান যে রাশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশ না হওয়াতে আগে

---

1. *ক্রিস্টোফার হিল, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. 63*

বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব হওয়া শ্রমজীবীদের কারণেই দরকার, কারণ বুর্জোয়াদের দ্বারা স্বৈরতন্ত্রের উচ্ছেদ হলে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ সুগম হবে।

1917 খ্রিস্টাব্দে লেনিন : 1917 খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হয়, জারতন্ত্রের অবসান হয় এবং কেরেনস্কির অধীনে অস্থায়ী সরকার (Provisional Government) গঠিত হলে বলশেভিক দল যখন দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছিল এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে অনিশ্চিত ছিল, সেই সঙ্কট সময়ে 1917-র এপ্রিল মাসে লেনিন স্বদেশে ফিরে তাঁর 'এপ্রিল তত্ত্ব' (April Thesis) ঘোষণা করেন। এই তত্ত্বের মূলকথা হলো, (ক) অস্থায়ী সরকারের সঙ্গে কোনও সহযোগিতা না করা, (খ) ক্রমাগত সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধ বিরোধী প্রচার চালানো, (গ) সকল জমির রাষ্ট্রীয় করণ এবং 'সোভিয়েট'গুলিকে সর্বক্ষমতা সম্পন্ন করে তোলা। সোভিয়েত বলতে বোঝায় পরিষদ যা শ্রমিক প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল। 1905 খ্রিস্টাব্দে পেট্রোগ্রাড শহরে প্রথম এরকম সোভিয়েত গঠিত হয়। লেনিন বলেছিলেন, 'All powers to the Soviets' অর্থাৎ সোভিয়েত সমূহে বলশেভিকদের ক্ষমতা বাড়াতে হবে। কী করতে হবে (What is to be done) রচনায় তিনি বিপ্লবের পন্থা সম্পর্কে বিস্তারিত জানান।[1] কেরেনস্কির অস্থায়ী সরকার জনসাধারণের দুঃখ মোচনে ব্যর্থ হয়। অন্যদিকে বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার কোনও লাভ নেই একথাও লেনিন জানান। যেহেতু জারতন্ত্রের পতনে শ্রমিক শ্রেণীর ভূমিকাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, সেজন্য মেনশেভিকদের বক্তব্য উড়িয়ে দিয়ে লেনিন অস্থায়ী সরকারের হাত থেকে বলপূর্বক ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। বলশেভিক দলের প্রভাব ক্রমশই বৃদ্ধি পেতে থাকে। ক্রমেই বিভিন্ন সোভিয়েটে তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হতে থাকে।

'রুটি, জমি ও শান্তি'-এই তিন ধ্বনি দিয়ে লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি নভেম্বর বিপ্লব সফল করে। লেনিনের নেতৃত্ব ছাড়া তা সম্ভব ছিল না। 10 অক্টোবর গোপনে তিনি পেট্রোগ্রাড শহরে এসে উপস্থিত হন, বলশেভিকদের রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের আহ্বান জানান। শেষ পর্যন্ত দুনিয়া কাঁপানো দশ দিনের শেষে 7-8 নভেম্বর বলশেভিক দল ক্ষমতা লাভ করে। এর আগেই লেনিনের নির্দেশে তার অন্যতম সহকারী ট্রটস্কির নেতৃত্বে লালফৌজ রাজধানী পেট্রোগ্রাডের সরকারি অফিস, ব্যাঙ্ক, রেল স্টেশন, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ প্রভৃতি দখল করে। লেনিনের কৃতিত্ব এই যে, তিনি শ্রমিক, কৃষক, সৈনিক ও বুদ্ধিজীবী সকল শ্রেণীর মধ্যেই বলশেভিক প্রভাব ফেলতে সফল হয়েছিলেন।

লেনিনের রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিভা, সাংগঠনিক শক্তি, তাত্ত্বিক ধারণা, বাস্তব পরিস্থিতিবোধ এবং লক্ষ্য স্থির করে তা কাজে পরিণত করার ক্ষেত্রে সাফল্য রুশ বিপ্লবে তাঁর নাম

1. Russia suffers from an underdevelopment of capitalism. A bourgeois revolution was more beneficial to the working class than to the bourgiosie"–Lenin in *Two Tactics*, দ্র. D. Shub, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, p 113.

অবিস্মরণীয় করে রেখেছে। তবে তাঁর একক প্রচেষ্টা সফল হত না যদি তিনি দলের ও সহকারীদের সাহায্য না পেতেন। আবার 1917 খ্রিস্টাব্দের বলশেভিক বিপ্লবের পরে বিপ্লবী সরকারকে টিকিয়ে রাখার জন্য গৃহযুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের সময় যুদ্ধ কালীন সাম্যবাদ (War Communism) এবং তার পরে নয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (New Economic Policy) গ্রহণ করে লেনিন বিপ্লবের স্থায়িত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রেও সমধিক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

৭। বলশেভিক বিপ্লবের পর রাশিয়া

নতুন সরকার এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ : লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক দল 1917 খ্রিস্টাব্দের 7th নভেম্বর কেরেনস্কির পতন ঘটিয়ে রাশিয়ার প্রলেটারিয়েট শাসনের সূত্রপাত ঘটালেন। কিন্তু বলশেভিক সরকারের সামনে ছিল অনেক সমস্যা। প্রথমতঃ, বাইরে ছিল বৈদেশিক শক্তিগুলির আক্রমণ। দ্বিতীয়তঃ, ছিল দেশের অভ্যন্তরে অসংখ্য শত্রুর মোকাবিলা এবং শ্রমিক-কৃষকের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সমস্যা সমাধানের উপায় নির্ধারণ। অল্পদিনের মধ্যে বলশেভিক সরকার ঘরে বাইরের সকল সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য তৎপর হয়ে উঠল। এই সমস্যার মোকাবিলার উদ্দেশ্যে বলশেভিক সরকার প্রথমে রাশিয়াকে প্রথম মহাযুদ্ধ থেকে মুক্ত করার জন্য বদ্ধপরিকর হলেন। সরকার পক্ষ থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রী ট্রটস্কি ঘোষণা করলেন যে, রাশিয়া আর প্রতিবেশী রাষ্ট্র আক্রমণ করবে না। দ্বিতীয় পদক্ষেপ হিসাবে লেনিন মিত্রশক্তিগুলির সঙ্গে ইতোপূর্বে সরকার যে-সব গোপন চুক্তি করেছিলেন, সেগুলিকে বাতিল করলেন। তৃতীয়তঃ, তিনি জার্মানির সঙ্গে ব্রেস্ট লিটভস্কের সন্ধিতে (Treaty of Brest Litovsk) আবদ্ধ হলেন (3 মার্চ 1918)। এই সন্ধির শর্ত অনুসারে (১) রাশিয়া পোল্যাণ্ড এবং বাল্টিক সাগরের তীরবর্তী প্রদেশগুলিকে জার্মানির হাতে সমর্পণ করল। (২) ফিনল্যাণ্ডও জর্জিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করল। (৩) রাশিয়া এরপর জার্মানি ও তার বন্ধু রাষ্ট্রগুলিতে কোনও প্রকার প্রচার কার্য পরিচালনা করবে না বলে প্রতিশ্রুতি দিল। তবে মিত্রশক্তির নিকট পরাজয়ের পর জার্মানি এই সন্ধির সুযোগ গ্রহণ করতে পারে নি। কিন্তু রাশিয়ার পক্ষে এই সন্ধি অপমানজনক হলেও বলশেভিক সরকারের পক্ষে এটি ছিল লাভজনক। কারণ বলশেভিক দল যুদ্ধের চিন্তা থেকে মুক্তি পেয়ে আভ্যন্তরীণ বিপ্লবকে সফল করার জন্য মনোনিবেশ করল। রাশিয়ার সাম্যবাদী দল রাজ্যের সমগ্র ভূখণ্ড রক্ষা করার চেষ্টা অপেক্ষা সমগ্র রাজ্যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বেশি আগ্রহী ছিল।

1917 খ্রিস্টাব্দের রুশ-বিপ্লবের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব : 1917 খ্রিস্টাব্দের রুশবিপ্লবের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। বিপ্লবের পূর্বেই মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট আদর্শ বিপ্লবী নেতাদের চিন্তা-ভাবনা ও কর্মে প্রেরণা সৃষ্টি করেছিল। সেই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ

বিপ্লবীরা বিপ্লব শেষে লক্ষ্যভ্রষ্ট হননি। মার্ক্সবাদী সমাজতান্ত্রিক আদর্শ অনুসারে সাম্যবাদী সংবিধান রচনা করে বিশ্বে নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে নতুন সমাজ ও নতুন অর্থনীতি রূপায়ণ করলেন। সমসাময়িক পশ্চিম ইয়োরোপ সহ আমেরিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তখন ছিল কোথাও রাজতন্ত্র, কোথাও নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র, কোথাও বা গণতন্ত্র ইত্যাদি নানা প্রকারের শাসনব্যবস্থা। পশ্চিমী সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির মুল ভিত্তি ছিল খ্রিস্টধর্মের বিধিবিধান ও উদারনীতি। ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলির অধিকাংশই গণতান্ত্রিক হয়েও ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদী নীতির দ্বারা বিশ্বের সর্বত্র বিক্ষিপ্তভাবে উপনিবেশ স্থাপনের মাধ্যমে প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তারে এবং তা সংরক্ষণে ব্যতিব্যস্ত। জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও ইতালির সঙ্গে মিত্রশক্তির লড়াই চলছে—এ লড়াই-এর মৌলিক কারণ হলো ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এমন একটা পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে ঘটে গেল 1917 খ্রিস্টাব্দের রুশ-বিপ্লব। গতি-প্রকৃতি, বিস্তৃতি, গম্ভীরতা, আদর্শ ও ফলশ্রুতির-বিচারে এ বিপ্লব হলো প্রকৃতই মহাবিপ্লব। এই বিপ্লব সমকালীন বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ জানালো।

বলশেভিকরা চার্চের ধন-সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত করে সরকারি সাহায্যের হাত গুটিয়ে নিল। পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির ভিত্তি যে ধর্ম, বলশেভিক বিপ্লব সেই ধর্মের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানালো। দেশের অভ্যন্তরে ধনসম্পত্তিভোগী, সুযোগ-সুবিধা ভোগীরা জমিদারী, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ল। ফলে বিশ্বের গণতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সম্পত্তি সুবিধাভোগীর দল ও আতঙ্কিত হলো। এভাবে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলো দিকে দিকে। দৃপ্তকণ্ঠে লেনিন ঘোষণা করলেন, "আমরা শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদের সোভিয়েত ছাড়া অন্য কোনও সরকার চাই না।" এ ঘোষণাগুলি শুধু কথায় সীমিত রইল না, বাস্তবে রাশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হলো কৃষক-শ্রমিকের সোভিয়েত। চমকে উঠল সমগ্র পশ্চিম ইয়োরোপ। তাই কিছুদিনের মধ্যে কমিউনিস্ট নিধন ও সাম্যবাদের উচ্ছেদ করার কর্মযজ্ঞে নেমে পড়ল নাৎসী ও ফ্যাসীবাদী দল। বিশ্বের যেসব দেশে (যেমন চীন) এই সময় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন চলছিল সেখানে রাশিয়ার বিপ্লব উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করল। রাশিয়ার বিপ্লব বিশ্বের ঔপনিবেশিক শাসনে জর্জরিত পরাধীন জাতিবর্গের মনে আশার সঞ্চার করল। রুশ বিপ্লবের প্রভাব পড়ল তৃতীয় আন্তর্জাতিকের উপরে। সারা বিশ্বে শ্রমিক আন্দোলন নবযুগে পদার্পণ করল। এক কথায় বলা যায়, রুশ-বিপ্লব বিশ্বের গতানুগতিক প্রচলিত রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক আদর্শের উপর চরম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। ইতোপূর্বে সংঘটিত অন্য কোনও বিপ্লব রুশ-বিপ্লবের মত তাৎক্ষণিক ও স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

গৃহযুদ্ধ এবং পরবর্তী অবস্থা : নভেম্বর বিপ্লবের সমাপ্তির (7th নভেম্বর, 1917) পরই বলশেভিক দলের সরকার গঠনের কথা ঘোষিত হয়। রাশিয়ায় বলশেভিক দলের

সরকারও গঠিত হলো। সরকারের সামনে ছিল বহুবিধ সমস্যা। বলশেভিক নেতৃত্ব তাদের মধ্যে যে-সব সমস্যাকে প্রাধান্য দিলেন সেগুলি হলো— (i) বিপ্লব থেকে উদ্ভূত পরিবর্তনগুলিকে স্থায়ী করা এবং বলশেভিক দলের পশ্চাতে জনসমর্থন অর্জন করা। (ii) এ জন্যে বৈদেশিক যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে রাশিয়াকে মুক্ত করা। (iii) মার্ক্সবাদের আদর্শে স্বদেশকে পুনর্গঠন করা। এইসব উদ্দেশ্য সামনে রেখে লেনিন 1918 খ্রিস্টাব্দে ব্রেস্ট লিটভস্ক (Brest Litovsk)-এর সন্ধির শর্তে জার্মানির সঙ্গে শান্তি স্থাপন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে তিনি নতুন সরকারেব কর্মসূচির বিষয় প্রচার করলেন। প্রচারের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল জমিদারী বাজেয়াপ্ত করা ও কৃষকের হাতে জমির দায়িত্ব তুলে দেওয়া। এই প্রচারের দ্বারা রাশিয়ার নির্যাতিত কৃষক ও ভূমিদাসগণ বলশেভিকদের সঙ্গে যোগদান করল। সমস্ত কল-কারখানা রাষ্ট্রায়ত্ত করা হবে, এটিও ছিল একটি উল্লেখযোগ্য ঘোষণা। এক্ষেত্রেও রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণী বলশেভিকদের সঙ্গে যোগদান করল। এইভাবে প্রতি-বিপ্লবের সম্ভাবনাকে দূরীভূত করে বলশেভিক দল সংবিধান রচনায় মনোযোগ দিলেন।

লেনিনের ক্ষমতালাভের পূর্বেই রাশিয়ায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে একটি সংবিধান সভা (Constituent Assembly) সংগঠিত হয়। এই সভায় বলশেভিকদের সংখ্যা ছিল কম। 1918 খ্রিস্টাব্দে এই সভা ভেঙে দিয়ে মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে সোভিয়েত সংবিধান রচিত ও গৃহীত হলো। এই সংবিধানের মূলকথা হলো— শ্রমিক, কৃষক, মেহনতী মানুষের একনায়কত্ব। এছাড়া সকল প্রকার ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার লোপ করে উৎপাদনের সকল উপাদানকে রাষ্ট্রীয়করণ করাই হলো বলশেভিক দলের অন্যতম আদর্শ। এই সব রীতি-নীতি ও আদর্শকে বাস্তবে রূপায়ণ করতে গিয়েই বলশেভিক দলকে এক গৃহযুদ্ধের সম্মুখীন হতে হলো। শুরু হলো বৈদেশিক হস্তক্ষেপ। এই গৃহযুদ্ধ ও হস্তক্ষেপের (Civil War and Intervention) বিরুদ্ধে লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকগণ যুদ্ধকালীন সাম্যবাদ (War Communism) গ্রহণ করে নবীন বিপ্লবী সরকারকে টিকিয়ে রাখতে সমর্থ হন। তেমনি বাস্তব পরিস্থিতি বিচার করে 1921 খ্রিস্টাব্দে নয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেও লেনিন নতুন সরকারের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করলেন। কীভাবে রাশিয়াতে সোভিয়েত সরকার ক্রমে ক্রমে শক্তিশালী হলো তা পরবর্তী বিংশতি অধ্যায়ে আলোচিত হবে।

অধ্যায় ১৯

শান্তি চুক্তি ও তার সুদূর প্রসারী ফলাফল

(**Syllabus** : *Peace Settlement of 1919-Its long term consequences-Birth of German Republic*).

১। প্যারিসের শান্তি সম্মেলন

পটভূমিকা : 1918 খ্রিস্টাব্দের 11 নভেম্বর জার্মানির আত্মসমর্পণের পর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটলো বলা যায়। তারপর বিজয়ী মিত্রশক্তির দেশগুলি এবং পরাজিত জার্মানি ও তার সহযোগী দেশগুলি স্থায়ী শান্তিচুক্তির শর্তাদি রচনার উদ্দেশ্যে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস শহরে এক সম্মেলনে মিলিত হন। প্যারিসের শান্তি সম্মেলন 1815 খ্রিস্টাব্দের ভিয়েনা সম্মেলনের চাইতেও অনেক বেশি প্রতিনিধিত্বমূলক ছিল। রাজা বা রাষ্ট্রপ্রধান নয়, বেলজিয়ামের রাজা অ্যালবার্ট কিংবা আমেরিকার রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন ছাড়া সব দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রমুখ। পৃথিবীর মোট বত্রিশটি দেশের প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিল। সম্মেলন শুরু হয় 1919 খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে। নিরপেক্ষ দেশ সুইটজারল্যাণ্ডে এই সভার অধিবেশন হওয়ার কথা ছিল কিন্তু 1870 খ্রিস্টাব্দে সেডানের যুদ্ধে প্রাশিয়ার হাতে পরাজিত হওয়ার পর প্যারিসের চুক্তি সম্পাদন করতে বাধ্য হয়ে ফ্রান্স যে অপমান সহ্য করেছিল, তার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যই ফ্রান্স প্যারিস নগরীতে শান্তি সম্মেলন চেয়েছিল। বিজয়ী মিত্র.শক্তিবর্গ তা মেনে নেয়।

ডেভিড টমসন লিখেছেন যে, সম্মেলন কী করতে চেয়েছিল, তা তার স্থান-কাল পাত্র থেকেই বোঝা যায়; সংগঠন ও কার্যাবলী থেকে তো অবশ্যই বোধগম্য। ("The time, place, composition, organization and procedure of the conference all had bearing upon what it was able to achieve)"[1] অধ্যাপক *জেমস জোল* লিখেছেন যে, যেমন চলতি কথা 'বিশ্বযুদ্ধ' বলা হলেও বস্তুত এটি ছিল ইয়োরোপীয় যুদ্ধ, তেমনি 1919 -এর শান্তি সম্মেলন ছিল ইয়োরোপীয় শান্তি।[2]

তবে যুদ্ধ শেষ হওয়ার অনেক আগেই আন্তর্জাতিক শান্তির ভিত্তি হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন 'চৌদ্দ দফা শর্তের' (Fourteen Points) কথা ঘোষণা করেন (8th জানুয়ারী 1918 খ্রিঃ)। উইলসনের চৌদ্দদফা শর্তে (1) জার্মানিকে

---

1. ডেভিড টমসন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ 613.
2. জেমস জোল, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ 272.

তার আইনগত সীমান্তে ফিরে যেতে হবে এবং জার্মানিকে বাইরের জোরপূর্বক অধিকৃত স্থান ত্যাগ করতে হবে। (2) ফ্রান্সকে আলসাস-লোরেন প্রদেশ ফিরিয়ে দিতে হবে। (3) বলকান, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী প্রভৃতি অঞ্চলগুলিকে জাতীয়তার ভিত্তিতে পুনর্গঠন করতে হবে। (4) পোল্যাণ্ডকে স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা প্রদান করতে হবে। (5) ঔপনিবেশক নীতি পরিচালনার ক্ষেত্রে উদার দৃষ্টিভঙ্গির উপর গুরুত্ব দিতে হবে। (6) গোপন কূটনীতি বর্জন করে অবাধ বাণিজ্যনীতি প্রবর্তন করা একান্ত প্রয়োজন। (7) সমুদ্র পথে গমনাগমনের স্বাধীনতা থাকবে। (8) প্রত্যেকটি দেশের যুদ্ধাস্ত্র হ্রাস করতে হবে। (9) একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠন করা প্রয়োজন। (10) বেলজিয়াম থেকে সৈন্য অপসারণ করতে হবে। (11) রাশিয়া থেকে সৈন্য অপসারণ করা প্রয়োজন। (12) অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরীর জনসাধারণকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিতে হবে। (13) দার্দানেলিস প্রণালীকে সকলের জন্য উন্মুক্ত করা হবে। (14) প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে আন্তর্জাতিক সংস্থাকে। এই চৌদ্দ দফা শর্তকে কেন্দ্রীয়পক্ষ ও মিত্রপক্ষ উভয়েই গ্রহণ করেছিল। বিশ্বের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সকল মানুষ এই শর্তগুলির দ্বারা আশান্বিত হয়েছিল।

যাই হোক, প্যারিস সম্মেলনে যাঁরা মিলিত হলেন তাঁদের মধ্যে; বক্তব্য-পরিবেশন ও যুক্তি বিন্যাসের ক্ষেত্রে ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেশোঁ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন, ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ এবং ইতালির প্রধানমন্ত্রী অর্লাণ্ডো ছিলেন প্রধান। তাই ইতিহাসে এই নেতৃবৃন্দ "**প্রধান চারজন**" (Big four) নামে খ্যাত। সম্মেলনে ফরাসি প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেশোঁ সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হলেন।

সম্মেলনে আলোচ্য সমস্যার প্রস্তাব উত্থাপনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইলসন তাঁর চৌদ্দ দফার শর্ত পুনরায় ঘোষণা করলেন। তাঁর প্রস্তাব আদর্শবাদ ও ন্যায় নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। অন্যদের ক্ষেত্রে বিজয়ী রাষ্ট্রের অংশবিশেষ দখলের প্রয়াস ইত্যাদি স্বার্থপরতামূলক বক্তব্যগুলিও প্রাধান্য লাভ করল। ইয়োরোপীয় রাজনীতি বিষয়ে উড্রো উইলসন বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন না। তাই কার্যক্ষেত্রে ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রধুরন্ধরদের ইচ্ছাই জয়লাভ করল। আরও লক্ষ্য করা যায়, ইতালির প্রধানমন্ত্রী অর্লাণ্ডো অন্যতম শক্তিশালী নেতা হয়েও ইতালির জন্য তিনি বিশেষ কিছু করতে পারেননি, বরং ইতালি উপেক্ষিত হলো। বস্তুতপক্ষে ব্রিটেন এবং ফ্রান্সই ছিল এই সম্মেলনের চালিকা শক্তি।

সম্মেলনের কাল, স্থান, পাত্র, সংগঠন এবং কার্যাবলী : প্রথমেই কাল লক্ষ্য করা যেতে পারে। জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধবিরতি ঠিক হওয়ার নয় সপ্তাহ পরে এই সম্মেলন হয়। এর বিলম্বের পেছনে ছিল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেনের বহুবিধ আভ্যন্তরীণ সমস্যা। 1918 খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রেসিডেন্ট উইলসন মার্কিন কংগ্রেসের ভাষণে তিনি স্বয়ং শান্তি প্রচেষ্টায় উপস্থিত থাকতে চান জানিয়েছিলেন। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ-ও তাঁর প্যারিসে যাওয়ার আগে পার্লামেন্টের অনুমোদন নিতে চেয়েছিলেন।

প্যারিসে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিবর্গ সমবেত হওয়ার পর প্রথম প্লেনারি সেশন হয় 1919-এর 18 জানুয়ারি। ভার্সাই সন্ধি স্বাক্ষরিত হয় 1919-এর 28 জুন। প্রসঙ্গ ক্রমেবলা যায় যে, প্যারিস সম্মেলনে সিদ্ধান্ত অনুসারে পাঁচটি সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়েছিল তার মধ্যে ভার্সাই সন্ধি ও চুক্তি ছিল প্রধান। প্যারিস সম্মেলনের শেষ অধিবেশন বসে 1920 খ্রিস্টাব্দের 21 জানুয়ারি। যদিও তখনও হাঙ্গেরি এবং তুরস্কের সঙ্গে চুক্তি হওয়া বাকি ছিল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রও জার্মানির সঙ্গে স্বতন্ত্র চুক্তি 1921 -এর 25 আগস্টের আগে করতে পারেনি। তুরস্কের সঙ্গেও সাধারণ শান্তিচুক্তি সম্পন্ন হয়নি 1923 -এর জুলাই মাসে লুসান চুক্তির আগে, যা বলবৎ হয় 1929 -এর জানুয়ারি থেকে। সুতরাং প্যারিস সম্মেলনের কালের চাইতে তার কর্মপরিধি ব্যাপকতর। এজন্য *ডেভিড টমসন* মন্তব্য করেছেন যে, "Thus the process of settlement-even the formal conclusion of peace treaties-lasted very much longer than the Paris Conference. Just as some parts of the settlement were predetermined before the Conference met, so much more of it was made after it dispersed".

প্যারিস সম্মেলনের স্থান নির্বাচনও ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমে সুইটজারল্যাণ্ডের জেনেভায় হওয়ার কথা হলেও পরে প্রেসিডেন্ট উইলসন প্যারিসকেই পছন্দ করেন। সেখানে অনেক আমেরিকান সৈন্য অবস্থান করছিল। তাছাড়া প্যারিস ছিল পশ্চিম ইয়োরোপের উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির জোটের অন্যতম প্রধানকেন্দ্র। প্যারিসে সম্মেলন হওয়ার ফলেই জার্মানির সঙ্গে ভার্সাই চুক্তি হতে পারল ভার্সাই শহরের 'হল অফ মিরারস্' গৃহে, যেখানে 1817 খ্রিস্টাব্দে জার্মান সাম্রাজ্য ঘোষিত হয়েছিল। প্যারিসে হওয়ার ফলে সৌজন্যবশত ফরাসি প্রধানমন্ত্রী জর্জ ক্লিমেশোঁ সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হন। শুধু তাই নয়, সমগ্র সম্মেলনের উপর ফরাসি প্রভাব ছিল লক্ষ্যণীয়। আটাত্তর বছর বয়স্ক ক্লিমেশোঁ সেডানের পরাজয়ের গ্লানি ভোলেন নি। মনে রাখতে হবে, উড্রো উইলসন কিংবা লয়েড জর্জ ফরাসি ভাষা জানতেন না, কিন্তু ক্লিমেশোঁ ফরাসি এবং ইংরেজি দুটোই জানতেন।

প্যারিস সম্মেলনের পাত্র বলতে প্রধান চারশক্তি। নামে 'চার প্রধান' বলা হলেও বস্তুত ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র— এই তিনজনই ছিল প্রধান। তবে আগেই জানানো হয়েছে যে, সম্মেলনে যোগ দিয়েছিল মোট বত্রিশটি দেশ। এই দেশগুলিহলো; আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি, জাপান, বেলজিয়াম, ব্রাজিল, চীন, কিউবা, চেকোশ্লোভাকিয়া, গ্রিস, গুয়াতেমালা, হাইতি, হেজাজ, হণ্ডুরাস, যুগোশ্লেভিয়া, সাইবেরিয়া, নিকারাগুয়া পানামা, পোল্যাণ্ড, পর্তুগাল, রুমানিয়া, শ্যাম, অস্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, ভারত, নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, বলিভিয়া, ইকুয়েডর, পেরু এবং উরুগুয়ে। প্রতিনিধিদের দুটি অংশে ভাগ করা যায়— মিত্র দেশসমূহ (The Allies) এবং সহকারী দেশ সমূহ (Associated Powers)। উপস্থিত দেশগুলির দিকে লক্ষ্য করলে তিন ধরনের

অনুপস্থিতি চোখে পড়ে বলে *ডেভিড টমসন* মন্তব্য করেছেন। নিরপেক্ষ দেশগুলি যোগ দেয়নি; যেমন সুইটজারল্যাণ্ড আর রাশিয়ার মতন দেশ বিজয়ী পক্ষভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও প্যারিস সম্মেলনে উপস্থিত ছিল না। কেননা, রাশিয়া আগেই যুদ্ধ ত্যাগ করেছিল, বলশেভিক বিপ্লবের পর গৃহযুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত ছিল। এদিকে পরাজিত দেশগুলি যেমন জার্মানি, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, বুলগেরিয়া এবং তুরস্ক শান্তি সম্মেলনে যোগ দেয়নি। এই সব অনুপস্থিতি প্যারিস সম্মেলনকে দুর্বল করে দিয়েছিল। *টমসনের* ভাষায় 'All these consequences, however reasonable the exclusion of such powers seemed at the time, were to prove basic weaknesses in the settlement।

সংগঠন ঃ প্যারিস শান্তি সম্মেলনে অনেক বিখ্যাত বিখ্যাত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। 27টি দেশ 'অফিসিয়াল ডেলিগেশন' পাঠিয়েছিল, তবে তিনটি প্রধান দেশ মূল সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ("Most important decisions were henceforth taken avowedly, as they had previously been taken substantially, by the famous 'Big Three', upon whose personal attitudes much of the outcome of the conference ultimately depended"– *David Thomson*)

মার্কিন রাজনীতিবিদদের পরামর্শ উপেক্ষা করে এসেছিলেন উড্রো উইলসন; ইয়োরোপে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল অসাধারণ। কিন্তু নিজের দেশে তা নয়। 1916 খ্রিস্টাব্দে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী হিসেবে তিনি নির্বাচনে জেতেন কিন্তু 1918 খ্রিঃ মার্কিন কংগ্রেসে তাঁর দলের পরাজয় ঘটে। রিপাবলিকান দল মার্কিন কংগ্রেস এবং সেনেটে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়। সুতরাং প্যারিস সম্মেলনে যে সিদ্ধান্তই হোক-না-কেন তা গ্রহণ বা বর্জন মার্কিন সেনেটে এবং হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভসে রিপাবলিকান দলের উপর নির্ভরশীল ছিল। এই সীমাবদ্ধতা ছাড়াও আদর্শবাদী উইলসন ইয়োরোপীয় সমস্যা সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন না। লয়েড জর্জ ব্রিটিশ সংসদের সমর্থন নিয়েই এসেছিলেন। এদিকে অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রাষ্ট্রনায়ক, শান্তিরক্ষায় ঐকান্তিক আগ্রহী ক্লিমেশোঁও ছিলেন প্রধান রাজনীতিবিদ। তিনি ছিলেন ফ্রান্সের স্বার্থ সম্পর্কে অতিসচেতন, বিশ্বরাজনীতির ব্যাপারে গভীর জ্ঞানসম্পন্ন।

এরা তিনজন ছাড়াও অধ্যাপক, সুবক্তা ইতালির অর্লাণ্ডো আদৌ ভালো ইংরেজি না জানায় তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি। ফরাসি প্রেসিডেন্ট পঁয়েকার এবং ফরাসি সেনাপতি মার্শাল ফচ প্রতিনিধি হিসেবে না থাকলেও প্যারিসে সম্মেলন হওয়ার সুবাদে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হন। এদেরও লক্ষ্য ছিল জার্মানিকে সর্বতোভাবে দুর্বল করা। ফরাসি প্রতিনিধিরা উইলসনের আদর্শবাদকে উড়িয়ে দিল। ব্রিটিশ সমর্থন ছিল তাদেরই দিকে। *ল্যাংসাম* লিখেছেন যে, উইলসনের আদর্শবাদের সঙ্গে বস্তুবাদের তীব্র সংঘর্ষ হয় এবং শেষ পর্যন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে জড়বাদের সাফল্য ঘটে। *কেটেলবি* মন্তব্য করেছেন, "At the peace conference two ideas were struggling for

mastery, on the one side was the conception of an impartial and an altruistic distribution of justice ; on the other were nations more familier to the peace conference, of the balance of power, of security against a recurrence of danger from the defeated state, of territorial and economic compensation on the part of the victors".

আসলে প্যারিস শান্তি সম্মেলনের অনেকগুলি সমস্যা ছিল। এত প্রতিনিধি, এত কমিশন, এত রাজনীতিবিদ্, সাংবাদিক ছিল উপস্থিত যে সিদ্ধান্ত নেওয়াই কঠিন হয়ে পড়ে। তাছাড়া সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অভাব, বিভিন্ন রাষ্ট্রের পরস্পর-বিরোধী স্বার্থ, নেতৃবর্গের মধ্যে আদর্শগত অনৈক্য ইত্যাদি তো ছিলই। শেষ পর্যন্ত অবশ্য কতকগুলি কার্য সমাধা করা হয়েছিল এবং সেই সঙ্গে জাতিসংঘও স্থাপন করা সম্ভব হয়।

কার্যাবলী : যে নীতিগুলির ভিত্তিতে কাজ করা হবে বলে প্রতিনিধিরা শেষ পর্যন্ত সহমত পোষণ করেন, সেগুলি হলো : (1) জার্মানিকে সন্ধির দ্বারা এমনভাবে দুর্বল করে দেওয়া হবে যে ভবিষ্যতে ঐ দেশ আর সামরিক শক্তিধর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে না পারে; (2) জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি অনুসারে মধ্য ও পূর্ব ইয়োরোপ পুনর্গঠন করা হবে ; (3) এই কারণে তুর্কি, হ্যাপসবার্গ ও বুলগেরিয়া ভেঙে দেওয়া হবে ; (4) ফ্রান্সের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং (5) ইয়োরোপে যাতে কোন শক্তি একক প্রাধান্য না পায় সেদিকেও দৃষ্টি দেওয়া হবে।

প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে আলোচ্য সমস্যাদি এত জটিল ছিল যে প্রায় দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে মোট পাঁচটি সন্ধির মাধ্যমে শান্তি প্রস্তাব গৃহীত হয়! সেই পাঁচটি সন্ধি হলো—

(1) জার্মানির সঙ্গে ভার্সাই সন্ধি (Treaty of Versailles), (2) অস্ট্রিয়ার সঙ্গে সেন্ট-জার্মেইন সন্ধি (Treaty of St. Germain), (3) হাঙ্গেরির সঙ্গে ট্রিয়াননের সন্ধি (Treaty of Trianon), (4) বুলগেরিয়ার সঙ্গে নিউলির সন্ধি (Treaty of Neuilly) এবং (5) তুরস্কের সঙ্গে সেভর-এর সন্ধি (Treaty of Sevres)।

২। ভার্সাই-এর সন্ধি

খসড়া : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ী মিত্রশক্তিবর্গের সঙ্গে জার্মানির ভার্সাই-এর সন্ধি সম্পাদিত হয় 1919 খ্রিস্টাব্দের 28 জুন। এর আগে অনেক দিন ধরে এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে এবং তা করতে গিয়ে ইয়োরোপীয় নেতৃবর্গকে অনেক রকম সমস্যারও সম্মুখীন হতে হয়েছে। যেমন শান্তি চুক্তির সঙ্গে লীগ অফ নেশনস্ সম্পর্কিত চুক্তিপত্র জুড়ে দেবার ব্যাপারে মতভেদ হয় ফ্রান্সের সঙ্গে আমেরিকার। ফ্রান্স তার নিজের নিরাপত্তার জন্য বিশেষভাবে চিন্তিত ছিল এবং এজন্য খসড়ায় বিশেষ ব্যবস্থা রাখার পক্ষপাতী ছিল। অ্যাড্রিয়াটিক সাগরের উপকূলে ফিউম বন্দর অধিকার নিয়ে ইতালি

ও যুগোশ্লাভিয়ার মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল, আবার পোল্যাণ্ডের সীমানা নির্ধারণ বিশেষত ডানজিগ সহ জার্মানির একাংশ দিয়ে দেওয়া নিয়েও বিরোধ ছিল। এছাড়া জার্মানির ভূতপূর্ব উপনিবেশ ও তুরস্কের হৃত রাজ্যাংশের প্রশ্ন ও ক্ষতিপূরণ সম্পর্কিত প্রশ্নও ছিল জটিল।

যাইহোক, অনেকদিন ধরে কখনও প্রকাশ্যে কখনও বা গোপনে আলাপ আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার পর 1919 -এর 7মে ভার্সাই সন্ধির খসড়া প্রস্তুত হয়। মনে রাখা দরকার, প্যারিস শান্তি সম্মেলনে জার্মান প্রতিনিধি ছিল না। বিজয়ী শক্তিবর্গ মনে করত জার্মানি যুদ্ধ-অপরাধী। তাঁরা আত্মসমর্পন করে শান্তি চেয়েছে। সুতরাং তাদের সঙ্গে আলোচনা নয়, তাদের উপর একতরফাভাবে সন্ধির শর্তগুলি চাপিয়ে দেওয়া হবে। যাই হোক, সন্ধির খসড়া পেয়ে জার্মানি অধস্তন কর্মচারী পাঠিয়ে সন্ধিপত্র বার্লিনে নিয়ে আসার এবং তা পুনর্বিবেচনার কথা মিত্রপক্ষকে জানায়। মিত্র শক্তিবর্গ অবশ্য এ প্রস্তাবে সায় তো দেয়ই নি, বরং অপমানিত বোধ করে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিনিধি পাঠাতে বলে। জার্মানি একদল প্রতিনিধি পাঠালে তাদের যুদ্ধবন্দীর মতন সৈন্য দিয়ে ঘিরে রাখা হয়। ফরাসি প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেশোঁ বলেছিলেন, 'আপনারা যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছিলেন এখন তার দেনা শোধবার সময় হয়েছে। আপনারা শান্তি চেয়েছিলেন, আমরা শান্তি চুক্তি করতে প্রস্তুত।' জার্মান প্রতিনিধিদের খসড়া দেখে নেবার জন্য তিন সপ্তাহ সময় দেওয়া হয়। 29 মে জার্মান প্রতিনিধিগণ শর্তগুলির বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি জানালেও মিত্রশক্তি কর্ণপাত করেনি। 22জুন জার্মানির নতুন সরকার সন্ধিপত্রের 227 থেকে 230 ধারা ছাড়া বাকি মেনে নিতে সম্মত হয়। ভার্সাই প্রাসাদে সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। প্রায় দুশো পাতার এই দলিল ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায় লেখা ; তাতে 439টি ধারা এবং 15টি অধ্যায় ছিল। ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি এবং জাপানের সরকার এই সন্ধি অনুমোদন করে। পরে 1920 খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে যুদ্ধ বিরতির পর আমেরিকার জাহাজ বিনষ্ট করার জন্য জার্মানি ক্ষতিপূরণ দিতে স্বীকৃত হলে আমেরিকা 1921খ্রিঃ জার্মানির সঙ্গে একটি পৃথক সন্ধি করে।

ভার্সাই সন্ধির শর্ত (ভৌগোলিক) ঃ ভার্সাই সন্ধির বহুবিধ শর্ত ছিল। এই ভৌগোলিক শর্তাদির উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রীয় পুনর্গঠন। এই ধারা অনুসারে (1) জার্মানি ফ্রান্সকে আলসাস ও লোরেন প্রদেশ ফিরিয়ে দেবে। প্রদেশ দুটি ফ্রান্সের, সেডানের যুদ্ধের পর কেড়ে নেওয়া হয়েছিলো (2) বেলজিয়ামকে ইউপ্রেন, মরিসনেট ম্যালমেডি জেলা জার্মানি দিয়ে দেবে। এটা হবে জার্মানি কর্তৃক আক্রমণের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ। (3) জার্মানির উত্তর সীমান্তে স্লেজভিগ প্রদেশ জার্মানি ডেনমার্ককে ফিরিয়ে দেবে। স্লেজভিগ এক গণভোটের মাধ্যমে এই ইচ্ছা প্রকাশ করলে তা কার্যকর করা হয়। তবে দক্ষিণ স্লেজভিগ জার্মানির সঙ্গে থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। (4) জার্মানি মেমেল অঞ্চল লিথুয়ানিয়াকে হস্তান্তরিত করল। (5) জার্মানির পূর্ব সীমানায় পোজেন এবং পশ্চিম প্রাশিয়া জার্মানি পোল্যাণ্ডকে

ছেড়ে দেয়। ঐতিহাসিক ন্যায় বিচার অনুসারেই স্বাধীন এবং সার্বভৌম পোল্যাণ্ড রাষ্ট্র স্থাপিত হলো। (6) স্বাধীন পোল্যাণ্ড যাতে সুমদ্রের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে, এজন্য জার্মানির মধ্য দিয়ে একটা 'করিডোর' বা যোগাযোগকারী অংশ জার্মানি পোল্যাণ্ডকে ছেড়ে দেয়। (7) জার্মান অধ্যুষিত ডানজিগকে 'উন্মুক্ত শহর' হিসেবে ঘোষণা করা হলো এবং তার শাসনভার লীগ অফ নেশনস্ এর হাতে দেওয়া হলো। লীগ অবশ্য এই বন্দর পোল্যাণ্ডকে ব্যবহার করতে দিয়েছিল। (8) জার্মানির পূর্ব সীমান্তে সাইলেশিয়া গণভোটের দ্বারা তিনভাগ করা হয়। একাংশ জার্মানির সঙ্গে যুক্ত থাকে, আরেক অংশ চেকোশ্লোভাকিয়া এবং অপর এক অংশ পোল্যাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়। (9) জার্মানির পশ্চিম সীমানা দিয়ে জার্মানি যাতে ভবিষ্যতে ফ্রান্স আক্রমণ করতে না পারে সেজন্য এক নিরাপত্তা বলয় রচনা করা হলো। ঠিক হয় যে, (ক) রাইনল্যাণ্ডে সম্প্রতি পনের বছরের জন্য মিত্র শক্তির দখলদার বাহিনী অবস্থান করবে এবং নিরাপত্তা দেবে। (খ) রাইন নদীর পূর্ব দিকে জার্মান সামরিক ঘাঁটি রাখা যাবে না এবং (গ) যুদ্ধের সময় ফ্রান্সের কয়লা খনিগুলি ধ্বংস করার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ, জার্মানির কয়লা খনি সমৃদ্ধ সার অঞ্চল ফ্রান্সকে দেওয়া হলো। বস্তুত সার উপত্যকাকে পনের বছরের জন্য এক আন্তর্জাতিক পরিষদের অধীনে রাখা হলেও কর্তৃত্ব ছিল ফ্রান্সের, 15 বছর পর অবশ্য গণভোট দ্বারা তারা আবার জার্মানির সঙ্গেই সংযুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

ঔপনিবেশিক শর্তাবলী ঃ ভার্সাই সন্ধির ঔপনিবেশিক শর্ত অনুসারে আফ্রিকা এবং পূর্ব এশিয়ার উপনিবেশগুলির উপর জার্মানির অধিকার লোপ করা হলো। জাতি সংঘের সর্বসম্মতি ছাড়া অস্ট্রিয়া ও জার্মানির সংযুক্ত সাধন করা যাবে না বলে সাব্যস্ত হয়। মিত্রপক্ষীয় দেশগুলির রক্ষণাধীনে জার্মানির উপনিবেশগুলিকে রাখার ব্যবস্থা হয়। ফলে প্রায় 25 হাজার স্কোয়ার মাইল জার্মানিকে ছেড়ে দিতে হলো এবং প্রায় কুড়ি লক্ষ জার্মান নাগরিককে স্বদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হলো।

জার্মান উপনিবেশগুলি 'অছি রাষ্ট্র' (Mandatory States) রূপে অভিহিত হলো। এই রাষ্ট্রগুলির সংগঠন ও তাদের শাসনব্যবস্থার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব জাতি সংঘের উপর অর্পিত হলো। ব্রিটেনের শাসনাধীনে টগোল্যাণ্ড এবং ট্যাঙ্গানিকা (জার্মান ইস্ট আফ্রিকা), আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে জার্মান দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকা, জাপানের অধীনে মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ, নিউজিল্যাণ্ডের অধীনে জার্মান সামোয়ার দ্বীপপুঞ্জ, বেলজিয়ামের অধীনে ট্যাঙ্গানিকার কিছু অংশ। অস্ট্রেলিয়ার অধীনে জার্মান নিউগিনি এবং ফ্রান্সের অধীনে ক্যামেরুনের কিছু অংশ রাখা হলো। জাপান পূর্বে সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে চীনের অন্তর্গত কিয়াওচাও এবং শান্টুং প্রদেশ দাবি করলেও চীনও ঐ দুটি অঞ্চল ফেরত চাইল। কারণ এই অঞ্চল তাদের কাছ থেকেই জার্মানি নিয়েছিল। কিন্তু মিত্রপক্ষ চীনের সঙ্গত দাবি উপেক্ষা করে জাপানকে ঐ দুই অঞ্চল অর্পণ করে।

অর্থনৈতিক শর্তাবলী ঃ ভার্সাই সন্ধির অর্থনৈতিক শর্তগুলির দ্বারা জার্মানিকে যুদ্ধ-অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়। যুদ্ধের দরুণ মিত্রশক্তির ক্ষতিপূরণের জন্য জার্মানির উপর ক্ষতিপূরণ চাপিয়ে দেওয়া হয়। আসলে ভার্সাই সন্ধির মূল লক্ষ্যই ছিল অর্থনৈতিক দিক দিয়ে জার্মানিকে দুর্বল করে রাখা।

ভার্সাই সন্ধির অর্থনৈতিক শর্তগুলি মিত্রপক্ষীয় দেশগুলির মধ্যে মতানৈক্য ও সঙ্কটের সৃষ্টি করেছিল। জার্মানি কী পরিমাণ যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে তা সন্ধিপত্রের 231 ধারায় বর্ণনা করা ছিল: "জার্মানি ও তার সহযোগী রাষ্ট্রগুলির আক্রমণের ফলে মিত্রপক্ষীয় দেশগুলির ও তাদের নাগরিকদের যে ক্ষতি হয়েছিল জার্মানি তা পূরণ করতে বাধ্য থাকবে।"

(1) যুদ্ধে মিত্রশক্তির যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল তার দরুণ জার্মানিকে অর্থের দ্বারা ক্ষতিপূরণ করতে বলা হয়। জার্মানির প্রদেয় অর্থের পরিমাণ ধার্যের জন্য একটি ক্ষতিপূরণ কমিশন গঠন করা হয়। এই কমিশনকে তিনবছরের মধ্যে চূড়ান্ত প্রতিবেদন পেশ করতে বলা হলো। আপাততঃ কিছু পরিমাণ অর্থ মিত্রশক্তিকে দিতে জার্মানিকে বাধ্য থাকতে বলা হয়। (2) রাইন নদীকে আন্তর্জাতিক জলপথ বলে ঘোষণা করা হলো। (3) মিত্র শক্তিবর্গকে কয়লা, কাঠ ও অন্যান্য দ্রব্য সরবরাহ করতে জার্মানিকে বাধ্য করা হলো। (4) সন্ধির 234 ধারায় বলা হলো যে মিত্রশক্তির দ্বারা উৎপন্ন শিল্পদ্রব্যের বিক্রয়ের জন্য জার্মানির বাজারে মিত্রশক্তির দেশগুলিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

জার্মানির বৃহদাকার বাণিজ্য পোতগুলি ফ্রান্সকে এবং যুদ্ধ জাহাজগুলি ব্রিটেনকে দেওয়া হলো। অর্থাৎ এরপর জার্মানিকে নিজ ব্যয়ে জাহাজ নির্মাণ করে ঘাটতি পূরণ করতে হবে। তাছাড়া জার্মানি শ্যামদেশ, সাইবেরিয়া, মরক্কো, মিশর, তুরস্ক ও বুলগেরিয়া প্রভৃতি দেশে সকল সম্পত্তি ও 'বিশেষ অধিকার' পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলো। জার্মানির বাইরে জার্মান নাগরিকদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার অধিকার মিত্রপক্ষের রইলো। এছাড়া মিত্রপক্ষকে পাঁচহাজার রেল ইঞ্জিন, দেড়লক্ষ মোটরগাড়ী, ফ্রান্স-ইতালি-বেলজিয়ামকে প্রচুর কয়লা সরবরাহ করতে বলা হলো। আবার জার্মানির এলবা ও ওডার নদীগুলি আর্ন্তজাতিক শাসনাধীনে রাখা হলো যাতে চেকোশ্লোভাকিয়া, সুইটজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ সমুদ্রে যোগাযোগের রাস্তা পায়। কিয়েল খালকেও আন্তর্জাতিক শাসনাধীনে রাখা হলো।

ক্ষতিপূরণের জটিল সমস্যা মেটানো সহজ ছিল না, প্রায় 15 থেকে 20 শত কোটি ডলার ক্ষতিপূরণ। যে ক্ষতিপূরণ কমিশন (Reparation Commission) হয়েছিল তার সদস্য ছিল ব্রিটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স, ইতালি এবং জাপান।

সামরিক শর্তাবলী ঃ ভার্সাই সন্ধির পঞ্চম ধারায় সামরিক শর্তাবলীর উল্লেখ করা হয়। সামরিক শর্তগুলির উদ্দেশ্য ছিল জার্মানি যাতে ভবিষ্যতে আক্রমণাত্মক ক্ষমতা লাভ না করতে পারে তার ব্যবস্থা করা। অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে, সামরিক দিক থেকে জার্মানিকে পঙ্গু করে রাখার ব্যবস্থা করা হলো। জার্মানিকে নিরস্ত্রীকরণ

(Disarmament) করার অপর উদ্দেশ্য ছিল ফ্রান্সের নিরাপত্তা। এইসব কারণেই জার্মানিকে যুদ্ধ অপরাধী সাব্যস্ত করে জার্মানির সামরিক শক্তি ধ্বংস করার ব্যবস্থা করা হয়। (1) জার্মানির স্থল, জল ও বিমান বাহিনীকে বিলুপ্ত করার ব্যবস্থা করা হলো। (2) জার্মান সেনাপতিমণ্ডলীকে বরখাস্ত করা হয়। (3) জার্মানিতেও বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা এবং বাধ্যতামূলকভাবে সেনাদলে যোগদানের যে ব্যবস্থা ছিল তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। কেবল বারো বছরের জন্য জার্মানিকে এক লক্ষ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী রাখবার অধিকার দেওয়া হয়েছিল এবং তাও কেবলমাত্র আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে ব্যবহার করতে বলা হয়। (4) হোলিগোল্যাণ্ডের নৌঘাঁটি বিলুপ্ত করা হয়। (5) জার্মানির নৌবহরের সংখ্যা হ্রাস ক'রে কেবলমাত্র 6টি যুদ্ধজাহাজ, 3টি ছোট ক্রুইজার, 4টি ডেস্ট্রয়ার এবং 12টি সাবমেরিন রাখার অধিকার পেল। জার্মানির পক্ষে সামরিক বিমান বহর রাখাও নিষিদ্ধ হলো। (6) রাইন নদীর পশ্চিম তীরের ত্রিশ মাইলের মধ্যে সকল জার্মান দুর্গ এবং সামরিক ঘাঁটি ভেঙে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। (7) সমস্ত সামরিক শর্তগুলি কার্যকর করবার জন্য জার্মানিতে রাইন নদীর বাম তীরবর্তী অঞ্চলে মিত্রপক্ষের সেনাদল মোতায়েন রাখা এবং একটি কমিশন নিয়োগ করা হয়।

অন্যান্য শর্তাদি ঃ ভার্সাই সন্ধিতেই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান জাতি সংঘের শর্তাদিও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বেলজিয়াম, পোল্যাণ্ড, যুগোশ্লোভিয়া এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়। জার্মানি ও রাশিয়ার মধ্যে স্বাক্ষরিত ব্রেস্ট-লিটভস্ক -এর সন্ধি এবং অপরাপার সন্ধি বাতিল করা হয়। বস্তুত ভার্সাই সন্ধির প্রথম পরিচ্ছেদেই বলা হয়েছিল যে শান্তিপূর্ণভাবে আন্তর্জাতিক বিরোধের নিষ্পত্তি এবং বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্যে জাতি সংঘ বা লীগ অফ নেশনস্ স্থাপন করা হবে।

এছাড়া জার্মান সম্রাট কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম এবং তার সেনাপতিদের যুদ্ধ অপরাধী সাব্যস্ত করে তাদের বিচার করবার আদেশ দেওয়া হয়। সন্ধির 213 ধারায় জার্মান যুদ্ধপরাধীদের শাস্তিদানের ব্যবস্থা ছিল। সন্ধির শর্তাদি ও আন্তর্জাতিক রীতিনীতি ভাঙ্গার অপরাধে কাইজারকে অভিযুক্ত করা হয়। কিন্তু তিনি হল্যাণ্ডে পালিয়ে যান এবং পলাতক কাইজারকে মিত্রপক্ষের হাতে সমর্পণ করতে হল্যাণ্ড সম্মত হয়নি। ফলে তাঁর বিচার করা সম্ভব হয়নি। যুদ্ধের আইনকানুন ভাঙার জন্য সামরিক বিচারালয়ে একশো জন জার্মানিকে অভিযুক্ত করা হলেও শেষ পর্যন্ত মাত্র বারোজনকে জার্মানির বিচারালয়ে বিচার করার ব্যবস্থা হয়।

ভার্সাই সন্ধির চরিত্র ঃ জার্মান জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা ভার্সাই সন্ধিকে জবরদস্তি বা জোর ক'রে চাপিয়ে দেওয়া (Dictated Peace) শান্তি চুক্তি বলে অভিহিত করেছেন। বস্তুত এই সন্ধি সমকালে ও উত্তরকালে বিশেষভাব সমালোচিত হয়েছে। আধুনিক যুগের ইতিহাসে এমন বিতর্কিত সন্ধি খুব কমই দেখা গেছে। অধ্যাপক এডওয়ার্ড

হ্যালেড কার স্পষ্ট ক'রেই লিখেছেন যে, এই চুক্তির মধ্যেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ নিহিত ছিল। অধ্যাপক *ল্যাসিং* -এর মতে এই যুক্তি ছিল অপমানজনক এবং অস্বাভাবিক কঠোর। বিপরীতপক্ষে *গ্যাথর্নিহার্ড* মনে করেন যে, এই সন্ধির মধ্যে অযৌক্তিক বা অন্যায় কিছু ছিল না। তবু অধিকাংশ ইতিহাসবিদ মনে করেন এই সন্ধির মধ্যে প্রতিহিংসা এবং জার্মানির প্রতি কঠোরতাই প্রকাশ পেয়েছে। *রাইকার* লিখেছেন যে, এই সন্ধির নৈতিক এবং বাস্তব উভয় দিকই ত্রুটিপূর্ণ ("The moral defects of the treaty are no more glaring than the practical")। *লিপসন*ও লিখেছেন, "It is possible that if the victorious powers had shown less severity in their treatment of Germany, she might have reconciled herself more readily to her altered status" অর্থাৎ মিত্রশক্তিবর্গ যদি কিছু সদয় ও নমনীয় মনোভাব দেখাত তাহলে হয়তো জার্মানি তার পরিবর্তিত অবস্থা মেনে নিত। অধ্যাপক *জে এল. কারভিন* যেমন লিখেছেন, সমস্যা সমাধানের নামে ভার্সাই সন্ধি দ্বারা নতুন সমস্যার উদ্ভাবন হয়েছিল, তা সত্যিই কিনা, তা আমরা শান্তি চুক্তিগুলির স্থায়ী ফলাফল প্রসঙ্গে যথাস্থানে আলোচনা করব।

আপাতত বলা যেতে পারে যে, ভার্সাই সন্ধিতে ঔদার্য আদৌ ছিল না, ন্যায় নীতিও লঙ্ঘিত হয়েছিল, জাতীয়তাবাদও উপেক্ষিত হয়েছে। আর অর্থনৈতিক ক্ষতিপূরণের শর্তাবলী যে অর্থহীন ও অবাস্তব ছিল তা উত্তরকালে স্বয়ং উইনস্টন চার্চিলই লিখেছেন। উড্রো উইলসনের আদর্শবাদের কিছুই এতে প্রতিফলিত হয়নি। ভার্সাই সন্ধির চরিত্র বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার শান্তি সম্মেলনে যোগদানকারী জার্মান প্রতিনিধিদের সন্ধির শর্তাবলী আলোচনা বা প্রতিবাদের কোনও সুযোগ না দিয়ে তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বিষয়টি এমন এক ধরণের ছিল যা অসম, কঠিন, অবাস্তব, ন্যায়নীতি বর্জিত এবং বিদ্বেষ পরায়ণ তবে এর ফলেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়েছে এমন বলা যায় না। পরবর্তীকালে হিটলারের নেতৃত্বে ন্যাৎসী দল এই একতরফাভাবে চাপিয়ে দেওয়া চরিত্রটাই তুলে ধ'রে তা মানতে অস্বীকার করে। অধ্যাপক *ডেভিড টমসন*ও লিখেছেন যে, এই সন্ধির রচয়িতারা "ভ্রান্ত স্থানে কঠোরতা ও ভুলস্থানে নরম মনোভাব" দেখিয়েছেন। এ সব ত্রুটির জন্যই ভার্সাই সন্ধি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

৩। সেন্ট জার্মেইনের সন্ধি

এই সন্ধি সম্পাদিত হয়েছিল মিত্রপক্ষ এবং অস্ট্রিয়ার মধ্যে 1919 খ্রিস্টাব্দের 10 সেপ্টেম্বর। প্যারিসের শান্তি বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুসারেই এই সন্ধি স্বাক্ষরিত হলো। তাছাড়া এটি করা হলো ভার্সাই সন্ধির মূল নীতির অনুসরণে। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ছিল এক যুগ্ম রাজ্য। এবার তা ভেঙে দেওয়া হলো। জার্মান ভাষাভাষী অস্ট্রিয়াকে বিচ্ছিন্ন করে একটি ক্ষুদ্র প্রজাতান্ত্রিক রাজ্যে পরিণত করা হলো। এই সন্ধির ৪0 নং ধারায় বলা হয়েছিল যে অস্ট্রিয়াকে জার্মানির সঙ্গে যুক্ত করা যাবে না। আসলে

জার্মান-অধ্যুষিত অস্ট্রিয়া জার্মানির সঙ্গে মিলে যাওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী ছিল কিন্তু ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গ এমন ব্যবস্থা করল যাতে জার্মানি ও অস্ট্রিয়া জাতীয়তার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ না হতে পারে। তাই নেতৃবৃন্দ একটি শর্ত দ্বারা ঠিক করে দিলেন যে, অস্ট্রিয়া জার্মানির সঙ্গে এমন কোনও চুক্তি বা সম্বন্ধ স্থাপন করবে না যাতে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে অস্ট্রিয়ার স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হয়। অস্ট্রিয়া এই শর্ত মেনে নেয়। অন্যদিকে মিত্র শক্তিবর্গ এদিকেও দৃষ্টি দিয়েছিলেন যে যাতে অস্ট্রিয়াকে নিজেদের সঙ্গে সংযুক্ত ক'রে জার্মানি নিজেকে আবার শক্তিশালী করে ফেলে এবং সেই কারণেই অস্ট্রিয়াকে জার্মান অধিবাসীদের আত্ম নিয়ন্ত্রণের অধিকার দেওয়া হলো না।

এছাড়া হ্যাপস্‌বার্গ সাম্রাজ্যই ভেঙে দেওয়া হয়। হাঙ্গেরি, যুগোশ্লেভিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড এবং তুরস্কের স্বাধীনতা অস্ট্রিয়া স্বীকার করে নেয়। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরই অস্ট্রিয়ার সুদেতান অঞ্চল, সাইলেশিয়া, বোহেমিয়া এবং মোরাভিয়া প্রদেশ দুটি একসঙ্গে ক'রে চেকোশ্লোভাকিয়া (Czechoslovakia) নামে এক নতুন রাষ্ট্রগঠন করা হয়। রাজধানী হয় প্রাগ (Prague)। বর্তমানে অবশ্য আবার তা ভেঙেগেছে। যেমন ভেঙেগেছে আর একটি রাষ্ট্র যুগোশ্লেভিয়া। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সেন্ট জার্মেইন সন্ধি অনুসারে অস্ট্রিয়ার থেকে বসনিয়া এবং হারজেগোভিনা বিচ্ছিন্ন করে সার্বিয়াকে দেওয়া হয় এবং সব মিলে নতুন রাষ্ট্র যুগোশ্লেভিয়া গঠন করা হয়। রাজধানী হয় বেলগ্রেড। তাছাড়া এই সন্ধি অনুসারে দক্ষিণ টাইরল, টেনট্রিনো, ট্রিয়েস্ট, ইস্ট্রিয়া এবং ডালমেশিয়ার নিকটবর্তী কয়েকটি দ্বীপ অস্ট্রিয়ার কাছ থেকে নিয়ে ইতালিকে দেওয়া হয়। একইভাবে অস্ট্রিয়ার গ্যালিসিয়া আবার পোল্যান্ডকে ফিরিয়ে দিতে হয়েছিল। আর বুকোভিনা ছেড়ে দিতে হয়েছিল রুমানিয়াকে। যুদ্ধের দরুণ মিত্রপক্ষকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হলো অস্ট্রিয়া। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি যুগ্ম সাম্রাজ্যের অবসান হলো। শুধু তাই নয়, জার্মানির মতো অস্ট্রিয়াও ইয়োরোপে যে-সব ঔপনিবেশিক এবং বাণিজ্যিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করছিল তা মিত্রপক্ষকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো। অস্ট্রিয়ার সৈন্য সংখ্যা কমিয়ে তিরিশ হাজারে নামিয়ে দেওয়া হলো। দানিউব নদীর নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কতকগুলি বিশেষ শর্ত অস্ট্রিয়াকে মেনে নিতে হলো। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো অস্ট্রিয়ার অর্থনীতি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলো। এরফলেই দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন যুগে অস্ট্রিয়ার জার্মানির সঙ্গে সংযুক্ত হবার জন্য এক আন্দোলন শুরু হয়, যাকে বলে Anschluss। অধ্যাপক *ল্যাংসাম* লিখেছেন যে, "One of the strongest drives in Austria for Anschluss or union with Germany came from the peculiarly difficult economic situation in which Austrian Republic was placed by the treaty of St. Germain"।[1] বস্তুত পক্ষে ভার্সাই সন্ধি যেমন জার্মানির উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল তেমনি এই সন্ধিও অস্ট্রিয়ার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়।

1. ল্যাংসাম, *The World Since 1919*, p. 36.

৪। নিউলির সন্ধি

মিত্রপক্ষ বুলগেরিয়ার সঙ্গে নিউলি-র (Neuilly) সন্ধির সম্পাদন করে 1919 খ্রিস্টাব্দের 27 নভেম্বর। এই সন্ধির শর্তানুসারে ম্যাসিডোনিয়া প্রদেশ বুলগেরিয়া থেকে নিয়ে যুগোশ্লেভিয়াকে দেওয়া হয়। বুলগেরিয়া পশ্চিম থ্রাস এবং ঈজিয়ান উপকূল গ্রিসকে দিয়ে দেয় যদিও ঈজিয়ান উপকূলে যাবার সুবিধা বুলগেরিয়াকে দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া বুলগেরিয়া রুমানিয়াকে দোব্রুজা ছেড়ে দেয়। বুলগেরিয়ার অস্ত্র হ্রাস করা হয় এবং সৈন্য সংখ্যা কমিয়ে কুড়ি হাজারে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। বুলগেরিয়ার নৌবাহিনী তুলে দেওয়া হয় এবং তাকে ক্ষতিপূরণেও বাধ্য করা হয়। এই চুক্তির ফলে রাষ্ট্রীয় আয়তন, রাষ্ট্রীয় সম্পদ এবং সামরিক দিক দিয়ে বুলগেরিয়াকে বলকানের এক দুর্বল রাষ্ট্রে পরিণত করা হয়।

৫। ট্রিয়াননের সন্ধি

মিত্রপক্ষ হাঙ্গেরির সঙ্গে ট্রিয়াননের সন্ধি সম্পাদন করে 1920 খ্রিস্টাব্দের 4 জুন। এই সন্ধির শর্তানুসারে হাঙ্গেরি নিজের রাজ্যের ম্যাগেয়ার জাতি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি আশে-পাশের রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়। যেমন (i) শ্লোভাকিয়া অঞ্চল চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। (ii) রুমানিয়াকে দেওয়া হয় ট্রানসালভ্যানিয়া এবং তার পশ্চিমে অবস্থিত এলাকার একাংশ ও টেমসভারের অধিকাংশ। (iii) টেমস্‌ভারের বাকি অংশ অর্থাৎ ক্রোয়েশিয়া এবং শ্লাভোনিয়া সংযুক্ত করা হয় যুগোশ্লেভিয়ার সঙ্গে। এছাড়া হাঙ্গেরির অস্ত্র ও সৈন্যদল হ্রাস করা হয়। ঠিক হয় যে হাঙ্গেরির সেনাবাহিনীতে 35 হাজারের বেশি সৈন্য রাখা যাবে না। হাঙ্গেরির নৌবাহিনীর কোনও অস্তিত্ব রইলো না, সামান্য কয়েকটি জাহাজ কেবল তাদের হাতে রইলো সমুদ্র অঞ্চলে। মিত্রশক্তিকে ক্ষতিপূরণ দেবার ব্যাপারেও হাঙ্গেরিকে বাধ্য করা হয়।

৬। সেভর-এর সন্ধি

মিত্রপক্ষ তুরস্কের সঙ্গে প্রথম 1920 খ্রিস্টাব্দের 20 আগস্ট সেভর-এর সন্ধি সম্পাদন করেন। পরাজিত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে মিত্রপক্ষ তুরস্ককে সম্পূর্ণ জয় করেছিল এবং তার সব প্রদেশ, এমনকি রাজধানী মিত্রপক্ষের দখলে আসে। তুরস্কের সুলতান ষষ্ঠ মহম্মদের প্রতিনিধি সেভর-এর সন্ধি স্বাক্ষর করেন। এর শর্ত অনুসারে মিশর, সুদান, সাইপ্রাস, ট্রিপোলিটানিয়া, মরক্কো এবং টিউনিস প্রভৃতি স্থানের উপর তুরস্ক নিজেদের অধিকার ছেড়ে দিল। তাছাড়া আরব, প্যালেস্টাইন, মেসোপটেমিয়া ও সিরিয়ার উপর থেকেও তুরস্কের অধিকার বিলোপ করা হলো। দার্দানেলিস এবং বসফোরাস প্রণালীদুটি আন্তর্জাতিকভাবে নিরপেক্ষ জলপথ বলে ঘোষিত হলো এবং তার তীরবর্তী সামরিক ঘাঁটি উঠিয়ে দেওয়া হলো। কনস্ট্যানটিনোপল, আলেকজান্দ্রিয়া প্রভৃতি তুর্কি বন্দরগুলি

আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা হলো। হাজ্জাজের রাজাকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করা হলো। থার্ণা ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া মাইনর সামরিকভাবে গ্রিসের অধীনে রাখার ব্যবস্থা করা হলো। এছাড়া গ্রিস ঈজিয়ান সাগরের কয়েকটা দ্বীপ, থ্রেস -এর একাংশ, অ্যাড্রিয়ানোপল, *গ্যালিপলি* ইত্যাদি লাভ করল। রোডস্ ও ডোডেকানীজ দ্বীপপুঞ্জ ইতালির অধিকারে গেল, অবশ্য অদূর ভবিষ্যতে ইতালি ডোডেকানীজ দ্বীপপুঞ্জ গ্রিসকে দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিল। সিরিয়া ফ্রান্সকে এবং প্যালেস্টাইন ও মেসোপটেমিয়া ব্রিটেনকে দেওয়া হয়। তুরস্ক ও আর্মেনিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয়।

বস্তুত এই সন্ধির দ্বারা তুরস্ক সাম্রাজ্যের আয়তন এশিয়া মাইনরের মধ্যবর্তী অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়। অর্থাৎ একদা বিশাল অটোমান সাম্রাজ্য কনস্ট্যানটিনোপল ও অ্যানটোলিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে সীমাবদ্ধ রইলো। তুরস্কের সৈন্যসংখ্যা পঞ্চাশ হাজারে সীমাবদ্ধ করা হয় এবং তার বিমান বন্দরগুলি মিত্রপক্ষের হাতে অর্পণ করা হয়। সেভর-এর সন্ধির শর্ত যখন আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদনের জন্য তুরস্কে পাঠানো হলো তখন মুস্তাফা কামাল পাশার নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী দল তা অনুমোদনে বাধা দেয় এবং প্রত্যাখ্যান করে। শেষ পর্যন্ত মিত্রপক্ষ তুরস্কের সঙ্গে *লুসান* (Lausanne)-এর সন্ধি করে 1923 খ্রিস্টাব্দে, অবশ্য তা কার্যকর হয় 1924 -এর 6 আগস্ট থেকে। এই সন্ধির শর্তানুসারে থার্ণা, কনস্ট্যানটি নোপল এবং পূর্ব-থ্রেস তুরস্ককে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। পশ্চিম এশিয়ার আরব, জোর্ডন, প্যালেস্টাইন, মেসোপটেমিয়া (ইরাক), সিরিয়া, হাজ্জাজ ইত্যাদি রাজ্যগুলি তুরস্কের অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে জাতি সংঘের অধীনে ইঙ্গ-ফরাসি ম্যান্ডেটরি রাজ্যে পরিণত হয়।

৭। শান্তিচুক্তির সুদূরপ্রসারী ফলাফল

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে ইয়োরোপের মানচিত্রে যে পরিবর্তন ঘটেছিল, রাষ্ট্রগুলির সীমানার যে বদল ঘটেছিল এবং সর্বোপরি আন্তর্জাতিক শক্তি সাম্যের যে আমূল পরিবর্তন দেখা দিয়ে ঘটেছিল, তার জন্যই যুদ্ধাবসানে শান্তিচুক্তি সম্পাদন জরুরি হয়ে দেখা দিয়েছিল। মূল লক্ষ্য ছিল শান্তি এবং নিরাপত্তা, ভবিষ্যতে যাতে যুদ্ধের কালো ছায়া আর মানুষের উপর সর্বনাশ ডেকে আনতে না পারে। আন্তর্জাতিক শক্তি সাম্যের পুনর্গঠনই ছিল প্যারিস শান্তি সম্মেলনে নেতৃবর্গের কাছে প্রধান বিবেচ্য বিষয়। *ডেভিড টমসন* ঠিকই লিখেছেন যে, "The international situation that confronted the peacemakers in Paris was, in the brutal realities of history, the result of a temporary redistribution of the balance of power in the world"।

দুটি বিষয় স্পষ্ট করে বোঝা দরকার। প্রথমটি হলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিণতি হলো মিত্রপক্ষের হাতে জার্মানি ও তার সহযোগীদের পরাজয়। বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল হিসেবেই শান্তি সম্মেলন এবং নানা সন্ধি হয়েছিল। প্রাক্-যুদ্ধকালীন সাম্রাজ্যগুলির মধ্যে

রাশিয়ার জার-এর শাসন ব্যবস্থা, তুরস্কের অটোমান সাম্রাজ্য, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্য এবং জার্মান সাম্রাজ্য সবই ভেঙে যায় 1914-1918 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। সামরিক ও রাজনৈতিক উভয় দিক থেকেই এই পতন (Collapse) মিত্রপক্ষের সমবেত প্রচেষ্টায় জয় ইয়োরোপের অবস্থা বদলে দিয়েছিল। মধ্য ইয়োরোপে জার্মানি এবং অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির আধিপত্য সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়। এই ফলাফলের জন্য শান্তি সম্মেলনের নেতাদের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মন দিতে হয়— একদিকে জার্মানির ভবিষ্যৎ নির্ধারণ এবং অন্যদিকে পূর্ব ইয়োরোপের ভবিষ্যৎ স্থির করল।

দ্বিতীয় কথা হলো, এই দুটি সমস্যা আলাদা, আবার পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত।[1] এই সমস্যা-দুটি মেটাতেই নানা সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু সত্যি সত্যি কি সমস্যা মেটানো সম্ভব হয়েছিল? এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে পাওয়া যাবে শান্তি সম্মেলনের কার্যাবলীর সুদূরপ্রসারী ফলাফল। বিভিন্ন চুক্তির-রাজনৈতিক, সামরিক এবং অর্থনৈতিক শর্তাবলীর মধ্যেই পরবর্তী সংঘর্ষের বীজ নিহিত ছিল কি না, তা নিয়েও ঐতিহাসিকগণ নানা বিতর্ক তুলেছেন।

ভার্সাই সন্ধির সমালোচনা ঃ আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি যে, ভার্সাই সন্ধিকে জার্মানি জবরদস্তিমূলক সন্ধি (Dictated peace) বলে সমালোচনা করেছে। এই একতরফা সন্ধি তারা মেনে নিতে বাধ্য হলেও মনে মনে একে ঘৃণা করত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে জার্মানিতে যে ভাইমার প্রজাতন্ত্র গঠিত হয় তার চ্যান্সেলার সীডমান এই সন্ধিকে একটি 'মৃত্যু পরিকল্পনা' এবং 'দাসত্বের শৃঙ্খলের' সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই সন্ধির সবচেয়ে বড়ো ত্রুটি ছিল -এটি একতরফা, অর্থাৎ জার্মানির মতামত আদৌ বিবেচনা করা হয়নি। ই. *এইচ কার* তাই লিখেছেন যে, এই ধরনের চাপিয়ে দেওয়া সন্ধি পালনের ব্যাপারে জার্মানির কোনও নৈতিক বাধ্যবাধ্যকতা ছিল না। আবার ভার্সাই সন্ধির পিছনে ন্যায় নীতি এবং পারস্পরিক সুবিধা-অসুবিধা আদৌ বিবেচিত হয় নি। ফলে জার্মানির প্রতি অবিচার হয়েছিল। উইলসনের চৌদ্দ দফা নীতির সাপেক্ষে ভার্সাই সন্ধি অনুসারে প্রতিটি দেশেরই যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম ও উদ্বৃত্ত সামরিক অস্ত্র এবং সৈন্য কমানোর কথা কিন্তু মিত্রপক্ষ এগুলি আদৌ না করে শুধু জার্মানিকে বাধ্য করতে চেয়েছিল। তাছাড়া জার্মানির উপনিবেশগুলি লীগ অফ নেশনস্-এর পরিদর্শনাধীনে অপরাপর ইয়োরোপীয় শক্তির 'উদার এবং দায়িত্বমূলক' শাসনাধীনে রাখা হয়েছিল। কিন্তু জাতি সংঘের শর্তানুসারে উপনিবেশ সম্পর্কে ন্যায্য নীতি অবলম্বনের প্রতিশ্রুতি দিয়েও ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গ তাদের নিজ নিজ উপনিবেশের উপর আগের মতোই সাম্রাজ্যবাদী শাসন চালাতে দ্বিধাবোধ করেনি। এদিকে ভার্সাই সন্ধিতে জার্মান জাতীয়তাবাদের

1. "These two tasks were in many ways distinct, but in certain important respects they were interconnected"– David Thomson, *op.cit*, p. 622

প্রতি অবিচার করা হয়েছিল। ইয়োরোপের ছোট বড়ো সকল শক্তির ক্ষেত্রে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করা হলেও জার্মানিকে বঞ্চিত করা হয়। সার অঞ্চল থেকে জার্মান অধিবাসীদের বঞ্চিত করা হয়। তেমনি স্লেজভিগের জার্মানদের, সুদেতান অঞ্চলের জার্মানদের, ইউক্রেন-ম্যালমেডি-মরিসনেটের জার্মানদের এবং আরো অনেককে বঞ্চিত করার উদাহরণ দেওয়া যায়। অন্যদিকে জার্মানির উপর অবাস্তব অর্থনৈতিক শর্ত আরোপ করা হয়েছিল। ল্যাংসাম, *রাইকার, কারভিন* প্রমুখ বহু ঐতিহাসিক এ ব্যাপারে সহমত পোষণ করেন। রাইকার একটি সুন্দর মন্তব্য করেছিলেন যে, রাজহংসকে উপবাসী রেখে তার কাছ থেকে সোনার ডিম প্রত্যাশা করা অবাস্তব। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ কেইনস্ কিংবা ব্রিটেনের উত্তরকালীন প্রধানমন্ত্রী চার্চিলও এবিষয়ে একমত। সর্বোপরি ভার্সাই সন্ধিতে জার্মানির প্রতি প্রতিশোধমূলক মনোভাব যে নেওয়া হয়েছিল তা সহজেই বোঝা যায়। বস্তুত এই সন্ধির মধ্যে উইলসনের আদর্শবাদ, ক্লিমেশোঁর জাতীয়তাবাদ এবং লয়েড জর্জের সুবিধাবাদের সংমিশ্রণ ঘটলেও, এর প্রধান ত্রুটি হল,এই সন্ধি অবাস্তব। এই ব্যবস্থাতে নীতিগত ত্রুটি তো ছিলই।

ভার্সাই সন্ধির সমর্থনে কিছু কিছু যুক্তি যে দেখানো হয়নি, এমন নয়। *লিপসন* লিখেছেন যে, সামগ্রিকভাবে বিচার করলে একথা অস্বীকার করা যায় না যে, পূর্বতন ইয়োরোপের তুলনায় নতুন ইয়োরোপের মানচিত্র অধিকতর সুবিচারের ভিত্তির উপর রচনা করা হয়েছিল। *গ্যাথর্নহার্ডি*ও লিখেছেন যে, কোনও যুদ্ধের পর বিজয়ী পক্ষ বিজিত দেশগুলির উপর সন্ধি চাপিয়ে দিয়েই থাকে। সুতরাং সেদিক থেকে অন্যায় কিছু হয়নি। কিন্তু এই যুক্তি খণ্ডন করেছেন *এডওয়ার্ড হ্যালেট কার*। তাঁর মতে, "Nearly every treaty which brings a war to an end is in one sense a dictated peace; for a defeated power seldom accepts willingly the consequences of its defeat. But in the treaty of Versailles the element of dictation was more apparent than in any previous peace treaty of modern times".

শান্তিচুক্তির সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া : অর্থনীতিবিদ্ *জন মেনার্ড কেইনস্* (John Maynard Keynes) 1919 খ্রিস্টাব্দে তাঁর বিখ্যাত *The Economic Consequences of the Peace* শীর্ষক পুস্তিকায় মিত্রশক্তির ক্ষতিপূরণ নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। এই পুস্তিকা জাতিবর্গের মধ্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। জার্মানির উপর যে অন্যায় এবং অসঙ্গত ক্ষতিপূরণের বোঝা চাপানো হয়েছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। এর সুদূরপ্রসারী ফল হলো উত্তরকালে হিটলারের উত্থানের পর সম্পূর্ণ পশ্চিমী ইয়োরোপকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখানো। *ডেভিড টমসন কেইনসের* মত পুরোপুরি না মানলেও একথা মেনেছেন যে, ক্ষতিপূরণ দীর্ঘকাল চালানোর বিপক্ষে কেইনস মত প্রকাশ করে ঠিক কাজ করেছেন।

শান্তিচুক্তির সুদূরপ্রসারী ফলাফল বিচার করতে গেলে দেখা যায় যে, জার্মানির উপর ন্যায়সঙ্গত আচরণ করা হয়েছিল বলে মনে হয় না। যদিও ভার্সাই সন্ধির মধ্যেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ নিহিত ছিল কিনা, তা নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অনেক কারণ আছে। তার মধ্যে অন্যতম অবশ্যই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর চাপিয়ে দেওয়া এই ভার্সাই সন্ধি জার্মানির অস্বীকার এবং প্রতিশোধ গ্রহণ।

অন্যভাবে বলা যায় জার্মানির প্রতি মিত্রশক্তির আচরণ রাজনৈতিক দিক দিয়েও সুফলদায়ক হয়নি। জার্মানির জনমানসে শান্তি চুক্তির বিরুদ্ধে যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তার ফলেই ভাইমার প্রজাতন্ত্রের বদলে হিটলারের জাতীয় সমাজতন্ত্রী নামক নাৎসীবাদী দলের উত্থান সহজ হয়েছিল। মিত্রশক্তির অবিমৃষ্যকারিতাই জার্মানদের গণতন্ত্রের বদলে একনায়কতন্ত্রে দিকে ঠেলে দেয়।

শান্তিব্যবস্থার অন্যতম দুই বড়ো ব্যাপার ছিল ক্ষতিপূরণ সমস্যা (Reparation problem) এবং যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা। বিশেষত ফ্রান্স নিরাপত্তার জন্য ব্যবস্থা চেয়েছিল। এই নিরাপত্তা অনুসন্ধানের (French search for security) পথ সঠিক ছিল কিনা, বলা কঠিন। এইজন্য তারা যে নিরস্ত্রীকরণ (Disarmament) নীতি গ্রহণ করেছিল, তাতেও বৈষম্য লক্ষ্যণীয়। জার্মানি বা অস্ট্রিয়া-বুলগেরিয়া-হাঙ্গেরি বা তুরস্ককে এ ব্যাপারে যে অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছিল, তা ব্রিটেন বা ফ্রান্সকে পড়তে হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালে অবস্থার বদল ঘটতে থাকে।

পূর্ব ইয়োরোপের ক্ষেত্রেও শান্তি সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে যে সব সন্ধি হয়েছিল তা সমস্যা সমাধান করতে পারেনি। আর একটা কথা বিশেষভাবে বলা দরকার। 1919 এরপর থেকে পশ্চিমী শাসকদের দৃষ্টি জার্মান সামরিকবাদের চেয়ে রাশিয়ার বলশেভিকবাদের ভীতির দিকে চলে যায়।[1] এটি নিতান্তই ভ্রান্ত ধারণা। ফলে ফ্যাসিবাদের উত্থানের পর স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় সোভিয়েট রাশিয়া গণতন্ত্রের সমর্থনে এগিয়ে এলেও ফ্রান্স ও ব্রিটেন ব্যর্থ হয়। ফ্রান্স-ব্রিটেন বরং ফ্যাসিবাদের তোষণে ব্যস্ত ছিল যতদিন না দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তাদের ঘাড়ের উপর নিঃশ্বাস না ফেলে।

৮। জাতি সংঘ বা 'লীগ অফ নেশনস্'

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর নানা শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর দিয়ে বিজয়ী শক্তিবর্গ নিশ্চিন্ত হতে পারেনি। কারণ এই যুদ্ধের মতো অতীতের কোনও যুদ্ধই অফুরন্ত সম্পত্তির ক্ষয়-ক্ষতি, অগণিত মানুষের প্রাণনাশ ও নৈতিক অবক্ষয় ঘটাতে পারেনি। তাই সকলেই বুঝেছিলেন যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর করলেই শান্তি ফিরে আসে না। তাছাড়া

1. "Events in Russia were ever-present in the minds of the 'Big Three' when they shaped the peace, for during 1919 western opinion was already shifting away from fear of German militarism towards fear of Russian Communism"– Thomson, পূর্বোক্ত গ্রন্থ p. 635

প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে যে-সব চুক্তিস্বাক্ষরিত হলো সেগুলির মধ্যে ছিল হিংসা-দ্বেষ, স্বার্থপরতার প্রাধান্য। ন্যায় ও সততার ভিত্তির উপর এসব চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়নি—এ সত্য অনেকেই অনুধাবন করেছিলেন। তাই নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে কেউ কেউ ভবিষ্যৎ যুদ্ধের সম্ভাবনা দূর করার বাসনা পোষণ করতেন। এরূপ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন ছিলেন অগ্রণী। তাঁর চৌদ্দ দফা শান্তি শর্তের মধ্যে লীগ অফ নেশনস্ বা জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করা ছিল। বিভিন্ন শান্তিচুক্তি রচনার সময়ও তিনি বার বার তাঁর এই ইচ্ছা ও আদর্শের কথা উল্লেখ করেন। অবশেষে এই প্যারিসের বৈঠকেই ইংরেজ ও মার্কিন মতের সমন্বয় সাধিত হয় এবং ভার্সাই সন্ধির অন্যতম শর্ত হিসেবে লীগ অফ নেশনস্ বা জাতি সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়।

উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে লীগ অফ নেশনস্-এর চুক্তিপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিশ্বের শান্তি যাতে বিঘ্নিত না হয় তার জন্যে লীগ অফ নেশনস্ প্রতিষ্ঠিত হলো। লীগের সদস্য রাষ্ট্র পুঞ্জের মধ্যে যাতে আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য ও সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়; পরস্পরের মধ্যে যাতে শান্তি ও নিরাপত্তা স্থাপন করা যায়; আন্তর্জাতিক আইন ও বিধি-বিধানগুলি যাতে সকলে মেনে চলে তার ব্যবস্থা করাই ছিল লীগের উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়তঃ, নিরস্ত্রীকরণ, অবাধ-বাণিজ্য, গোপন কূটনীতির পরিবর্তে খোলাখুলি আলোচনার মাধ্যমে যে-কোনও আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান, সমুদ্রের উপর সকল দেশের সমান অধিকার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করাই হবে লীগ অফ নেশনস্-এর অন্যতম লক্ষ্য। তৃতীয়তঃ, সমাজের দুর্বলতর শ্রেণী যেমন—শিশু, নারী, বালক-বালিকা, শ্রমিক, কৃষক প্রমুখের প্রতি ন্যায় ও মানবিক নীতি গ্রহণের দিকেও গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

জাতিসংঘের সংগঠন ঃ লীগ অফ নেশনস্-এর সংগঠন ছিল মূলত একটি সাধারণ সভা, একটি সাধারণ পরিষদ এবং একটি সচিবালয় নিয়ে গঠিত। জেনিভা শহর ছিল লীগ অফ নেশনস্ এর প্রধান কার্যালয়। পরে এই সংস্থার সঙ্গে একটি আন্তর্জাতিক বিচারালয় এবং একটি আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থাও যুক্ত হয়।

(i) লীগ সভা (League Assembly) ঃ লীগ অফ নেশনস্-এর চুক্তিপত্র স্বাক্ষরকারীর সদস্য রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয় একটি সাধারণ সভা। প্রত্যেক সদস্যের একটি করে ভোটের অধিকার ছিল। বছরে অন্তত একবার এই সভার অধিবেশন বসত। বিশ্বশান্তি, নিরাপত্তা, সংখ্যালঘু সমস্যা, রাজনৈতিক সমস্যা ইত্যাদি এই সভায় আলোচনা করা হত। প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের একটি ভোটের অধিকার থাকলেও ঐ রাষ্ট্র থেকে তিন জন উপস্থিত থাকতে পারতেন। প্রথম অবস্থায় সভার সদস্য রাষ্ট্রের সংখ্যা ছিল বিয়াল্লিশ; পরবর্তী স্তরে সদস্য রাষ্ট্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

(ii) লীগ কাউন্সিল (League Council) ঃ এটি ছিল লীগ অফ নেশনস্ বা জাতি সংঘের কার্যনির্বাহী পরিষদ। এই কাউন্সিলে ছিলেন পাঁচজন স্থায়ী সদস্য এবং চারজন

অস্থায়ী সদস্য। শেষোক্ত অস্থায়ী সদস্যরা জাতিসংঘের সাধারণ সভায় নির্বাচিত হতেন। স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে ছিল ইংল্যাণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইতালি ও জাপান। তবে মনে রাখা প্রয়োজন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতি সংঘের উদ্যোক্তা হলেও যুক্ত রাষ্ট্রীয় সিনেটের সম্মতি না থাকায় আমেরিকা স্থায়ী সদস্য হিসেবে অংশ গ্রহণ করতে পারেনি। ফলে, চারজন স্থায়ী এবং চারজন অস্থায়ী সদস্যকে নিয়ে জাতি সংঘের কর্মসূচি আরম্ভ হয়। এর পরেই জাপান (1931 খ্রিঃ) এবং ইতালি (1935 খ্রিঃ) স্থায়ী সদস্য পদ ত্যাগ করে। কিন্তু জার্মানি ও রাশিয়া সঙ্গে সঙ্গে স্থায়ী সদস্য হিসেবে জাতি সংঘে যোগদান করে। আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান, সাধারণ সভার নিকট প্রতিবেদন বা রিপোর্ট প্রেরণ অথবা সাধারণ সভার নির্দেশ কার্যকরী করার জন্য এই লীগ কাউন্সিল ছিল সদা তৎপর।

(iii) **সচিবালয়** (Secretariat) ঃ জেনিভা শহরের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ছিল এই সচিবালয়। এখানে ছিলেন একজন সেক্রেটারি জেনারেল। লীগ সভা ও লীগ কাউন্সিলের নির্দেশ পালন, চিঠিপত্র বিতরণ, সিদ্ধান্ত কার্যকর করা, তথ্য সংগ্রহ করা ইত্যাদি ছিল এই সচিবালয়ের কার্যসূচির অন্তর্ভুক্ত বিষয়।

(iv) **আন্তর্জাতিক বিচারালয়** (International Court) ঃ আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসার দায়-দায়িত্ব ছিল এই সংস্থার উপর। আইনগত দ্বন্দ্বের মীমাংসা, আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্রের ব্যাখ্যা প্রদান ইত্যাদি ছিল এই বিচারালয়ের অন্তর্ভুক্ত বিষয়। তবে এর জন্যে লীগ সভার অনুমোদন নিতে হত।

(v) **আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন** (International Labour Organisation) ঃ শ্রমিক সমস্যা ছিল এযুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিভিন্ন দেশের শ্রমিকদের অবস্থার উন্নয়ন এবং তাদের উন্নয়নের প্রতি প্রত্যেকটি সদস্য রাষ্ট্রের দৃষ্টি আকর্ষণের ব্যবস্থা করতে এই সংস্থার উদ্ভব ঘটে।

আবার ভার্সাই সন্ধির শর্তানুযায়ী যুদ্ধাপরাধী রাষ্ট্রগুলির নিকট যেসব অঞ্চল কেড়ে নেওয়া হলো সেগুলির শাসন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অছি প্রথার (Mandatory System) ব্যবস্থা গৃহীত হয়। এই প্রথা অনুযায়ী ঐসব অঞ্চলের শাসনভার দেওয়া হত জাতি সংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলি উপর। সুতরাং এই ব্যবস্থা পরিচালনার মূল দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল জাতি সংঘের উপর। যাই হোক, বিশ্বশান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে লীগ অফ নেশনস্ সমগ্র বিশ্বে প্রথম বিশেষ ভূমিকা পালনের চেষ্টা করে।

জাতি সংঘের কার্যাবলী ও তার বিফলতার কারণ ঃ উদ্দেশ্য অনুসারে 1919 থেকে 1939 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে জাতি সংঘ বা লীগ অফ নেশনস্ বহু কর্ম-সম্পাদনে যেমন সমর্থ হয়, তেমনি কোনও কোনও ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দিতেও বাধ্য হয়। অবশ্য সাফল্যসূচক কর্মের মধ্যে রাষ্ট্র সীমানা সংক্রান্ত বিষয়গুলি উল্লেখযোগ্য। এই সময় কয়েকটি রাষ্ট্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। যেমন— (ক) তুরস্ক ও ইরাক,

(খ) গ্রিস ও বুলগেরিয়া, (গ) পোল্যান্ড ও লিথুয়ানিয়ার দ্বন্দে লীগ অফ নেশনস্ নিরপেক্ষ মধ্যস্থতা অবলম্বনে সক্ষম হয়। 1924 খ্রিস্টাব্দে জেনিভা প্রোটোকল (Geneva Protocol) নামে এক চুক্তির মাধ্যমে ঠিক হলো যে, দুটি দেশের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হলে জাতি সংঘই চারদিনের মধ্যে মীমাংসার ব্যবস্থা করবে। তবে ইংল্যাণ্ডের বিরোধিতায় এই চুক্তি শেষ পর্যন্ত সফল হতে পারেনি। পরের বছর (1925 খ্রিঃ) জাতিসংঘের প্রচেষ্টায় লোকার্নো প্যাক্ট (Locarno Pact) নামে অন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রথমতঃ, জার্মানি, ফ্রান্স ও বেলজিয়াম এই তিন দেশের সীমানা বিষয়ক ভার্সাই চুক্তিকে সঠিকভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্ত এই চুক্তি বিধিবদ্ধ হয়। দ্বিতীয়তঃ, এই চুক্তিতে জার্মানিকে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্ররূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তৃতীয়তঃ, এই চুক্তিতে ফ্রান্স, পোল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া ইত্যাদি জার্মানি-সংলগ্ন কতকগুলি রাষ্ট্রের নিরাপত্তা সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়।

তিন বছর পর (1928 খ্রিঃ) জাতি সংঘের প্রচেষ্টায় কেলগ ব্রায়াঁ চুক্তি (Kellogg-Briand Pact) স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিতে 62টি দেশ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে যুদ্ধের পরিবর্তে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিবাদ মীমাংসার স্বীকৃতি জানায়। অবশেষে বলা যায়, জাতি সংঘের আন্তর্জাতিক বিচারালয় 1927 খ্রিস্টাব্দের পূর্ববিধি কতকগুলি আন্তর্জাতিক অভিযোগের বিচার-কার্য সম্পাদনে সমর্থ হয়। এই সময়ের মধ্যে এই বিচারালয় 26টি বিবাদ মীমাংসা করে, 11টি বিবাদে রায় প্রদান করে এবং 13টি ক্ষেত্রে পরামর্শ প্রদান করে।

1931 খ্রিস্টাব্দের পর থেকে জাতিসংঘের কাজের ব্যর্থতা সূচিত হতে দেখা যায়। ঐ বছর জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে। 1933 খ্রিস্টাব্দে জাপান জাতি সংঘের সদস্যপদও ত্যাগ করে। আবার 1932-33 খ্রিস্টাব্দে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন (Disarmament Conference) বসল জেনিভা শহরে। মতভেদের দরুণ এই সম্মেলন ব্যর্থ হলো। জার্মানি এই সময় সদস্যপদ পরিত্যাগ করে সামরিক প্রস্তুতি শুরু করল। ইতালি এই সময় আফ্রিকার আবিসিনিয়া আক্রমণ ও অধিকার করে। সঙ্গে সঙ্গে ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রপুঞ্জ স্বার্থগত দ্বন্দ্বে মেতে ওঠে। সুতরাং শেষ পর্যন্ত জাতি সংঘ ব্যর্থতার পর্যবসিত হলো এবং এই ব্যর্থতার কারণগুলি : হল—

প্রথমতঃ, লীগ অফ নেশনস্ বা জাতি সংঘ ছিল একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। অথচ বিশ্বের সবকটি শক্তিশালী দেশ এই সংঘের সদস্য ছিল না। যেমন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও জার্মানি জাতি সংঘের সদস্য ছিল না। জাপান সদস্যভুক্ত হলেও পরবর্তী স্তরে তারা পদ ত্যাগ করে চলে গেল। জার্মানীকে সদস্য করা হলেও তারাও ঐ পদ শেষ পর্যন্ত ত্যাগ করল। রাশিয়াকে সদস্যপদ দিয়েও তাকে বহিষ্কার করে দেওয়া হলো। আরও বিশ্লেষণ করলে লক্ষ্য করা যায়, ইয়োরোপের বাইরের কোনও সদস্য রাষ্ট্রই জাতিসংঘে প্রাধান্য বিস্তার করতে পারেনি। তাই মূলত এটি ছিল ইয়োরোপীয় সংগঠন। সুতরাং সাংগঠনিক বিচারেই জাতি সংঘ ছিল দুর্বল।

দ্বিতীয়তঃ, আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রাখার অন্যতম শর্ত হিসেবে সামরিক সাজসরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন ছিল। 1932-33 খ্রিস্টাব্দে প্রায় 60টি দেশের প্রতিনিধি জেনিভা শহরে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে উপস্থিত হয়েও এই প্রসঙ্গে একমত হতে পারেনি। ভার্সাই সন্ধির শর্ত অনুসারে জাতি সংঘ জার্মানির সামরিক শক্তি হ্রাস করে দিয়েছিল। কিন্তু জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলি নিজ নিজ সামরিক শক্তি হ্রাস করার দিকে তৎপর হয়নি। তাই জেনিভা সম্মেলনে জার্মানি ফ্রান্সের সামরিক শক্তি হ্রাসের দাবি করল। জার্মানির ভয়ে ফ্রান্স সেই দাবি মানতে পারল না। জার্মানি তখন সদস্যপদ ত্যাগ করে চলে গেল। জার্মানি পুনরায় সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করার জন্যে বিশেষভাবে তৎপর হয়ে উঠল। ইতালিও অনুরূপভাবে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করার জন্যে বিশেষভাবে তৎপর হয়ে উঠল এবং সামরিক প্রস্তুতি চালিয়ে যেতে লাগল। ক্রমে ক্রমে সমগ্র ইয়োরোপে দেখা দিল সামরিক তৎপরতা। ফলে জাতি সংঘের পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল।

তৃতীয়তঃ, বিশ্ব শান্তি বজায় রাখতে হলে বিশ্ব সংস্থা অর্থাৎ জাতি সংঘের একটি নিজস্ব সামরিক বাহিনী সংগঠন করা প্রয়োজন ছিল। এক্ষেত্রে সদস্য রাষ্ট্রের সামরিক সাহায্য দানের উপর জাতি সংঘের সামরিক বাহিনীর অস্তিত্ব নির্ভর করে। এই প্রসঙ্গে সমস্ত রাষ্ট্রের একমত হবারও প্রয়োজন হয়; কিন্তু পরীক্ষামূলকভাবে পরিচালিত জাতি সংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলি এরূপ কোনও সর্বজনগ্রাহ্য নীতি অনুসরণ করতে পারেনি। তাই জাতিসংঘের নিজস্ব সামরিক বাহিনী গড়ে ওঠেনি। ফলে জাতি সংঘের নির্দেশগুলি সর্বদা কার্যকরী অথবা রূপায়ণ করা সম্ভব হয়নি।

চতুর্থতঃ, ভার্সাই সন্ধির শর্তের ভিতর দিয়ে জাতিসংঘের উদ্ভব ঘটে। অথচ ভার্সাই সন্ধির মধ্যে ছিল ন্যায়-নীতির একান্ত অভাব—অবিলম্বে তার ব্যর্থতা সর্বত্র প্রকট হয়ে উঠল। স্বাভাবিকভাবেই জাতিসংঘের ব্যর্থতাও প্রকট হলো। লীগের কোনও চুক্তিপত্রে "যুদ্ধকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ" বলে ঘোষণা করা হয় নি। তাছাড়া সমসাময়িক সদস্য রাষ্ট্রগুলির স্বার্থ ছিল পরস্পর বিরোধী। কোনও রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থে আঘাত লাগলে সেই রাষ্ট্র সদস্যপদ ত্যাগ করতে ও যুদ্ধ করতে দ্বিধা করত না। মন থেকে যুদ্ধের প্রবণতা ত্যাগ করা কোনও সদস্য রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব হয় নি। সুতরাং জাতিসংঘের কথা ও কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য ছিল না।

পঞ্চমতঃ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছিল। মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্য দিনে দিনে বৃদ্ধি পেল। মানুষের দুঃখ-দুর্দশার অন্ত রইল না। এ অবস্থায় জার্মানি, ইতালি, স্পেন প্রভৃতি রাষ্ট্রে একনায়কতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটল। এই একনায়কতন্ত্র জাতিসংঘকে দুর্বল থেকে দুর্বলতর করল।

তবে জাতিসংঘের কার্যাবলী ব্যর্থ হলেও আন্তর্জাতিক সংস্থার অবদান নিতান্ত কম ছিল না। (i) এই সংস্থা ছিল একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন। বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা

অক্ষুন্ন রাখা, জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণতা থেকে মানুষের মনকে মুক্ত করা, মানুষের মনে যুদ্ধবিরোধী প্রবণতা সৃষ্টি করা—ইত্যাদি যেসব উদ্দেশ্য নিয়ে এই সংস্থা গড়ে উঠেছিল সেই উদ্দেশ্যগুলির প্রভাব ছিল অপরিসীম। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মন এই প্রভাবের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিল। (ii) জাতিসংঘ বিশ্বের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানবিক কার্যাদির দ্বারা যে অভিজ্ঞতা রেখে গেল পরবর্তীকালে সেই অভিজ্ঞতা যে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে সেই সম্পর্কে আর কোনও সন্দেহের অবকাশ রইল না। (iii) জাতিসংঘ যতদিন কর্মে তৎপর ছিল (1919-1939 খ্রিঃ) ততদিন নানা রকম সন্ধি ও চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌রা বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর (1939-1945 খ্রিঃ) সেই অভিজ্ঞতাই তাদের ইউনাইটেড নেশনস অর্গানাইজেশন (U. N. O.) প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় যথেষ্ট সাহায্য করে। সুতরাং জাতিসংঘের ব্যর্থতার মধ্যেই নিহিত ছিল ভাবীকালের কর্মপন্থার বিশেষ অবদান।

৯। জার্মান প্রজাতন্ত্রের উদ্ভব

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকে জার্মানিতে কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের জনপ্রিয়তা কমতে থাকে। যুদ্ধে-জার্মানির পরাজয় গর্বিত জার্মান জাতির মনে অসন্তোষের সৃষ্টি করে। তাছাড়া ছিল অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও খাদ্যাভাব। ক্রমে সৈন্যবাহিনীর ও নৌবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ দেখা যায়। আবার সাধারণ জনগণ রাষ্ট্রপরিচালনায় অংশ গ্রহণের কথা চিন্তা করতে শুরু করেন। সোভিয়েট রাশিয়ার অনুকরণে শ্রমিক ও সেনাদের নিয়ে কিয়েল বন্দরে একটি সোভিয়েট স্থাপিত হয়। ক্রমে আরও কয়েকটি শহরে এরপ্রতিফলন ঘটে। এরপর মিউনিখ, ব্যাভেরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে দাঙ্গা বাঁধে। এই অবস্থায় তদানীন্তন জার্মানির চ্যান্সেলার ম্যাক্সিমিলিয়ান কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামকে তাঁর নাবালক পৌত্রের পক্ষে সিংহাসন ত্যাগ করার পরামর্শ দিলেও জার্মান সম্রাট তা উপেক্ষা করেন। তবে একদিকে যুদ্ধে পরাজয় এবং অন্যদিকে অন্তর্বিদ্রোহের ফলে 9 নভেম্বরের পর জার্মানির অবস্থা সম্পূর্ণ আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। তখন কাইজার হল্যাণ্ডে পালিয়ে যান এবং জার্মানিতে হোহেনজোলার্ণ রাজবংশের শাসনের অবসান ঘটে। ম্যাক্সিমিলিয়ানও চ্যান্সেলার পদ ত্যাগ করেন।

এই পরিস্থিতিতে ফ্রেডারিখ এবার্ট নামক সমাজবাদী নেতার হাতে চ্যান্সেলারের দায়িত্ব এলে তিনি জার্মানিকে একটি 'প্রজাতান্ত্রিক দেশ' (Republic) ঘোষণা করেন এবং সামরিক সরকার গঠন করেন। তবে এই সরকারের পিছনে কোনও দৃঢ় দলীয় সমর্থন ছিল না। জার্মান সমাজতান্ত্রিকরা অনেক ভাগে বিভক্ত ছিলেন। এবার্ট ও তার সহযোগীরা রাশিয়ার অনুকরণে বলশেভিক ধাঁচের সরকারের বদলে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পছন্দ করতেন। তারা প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে 'জাতীয় পরিষদ' গঠন করে

প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান রচনায় উদ্যোগী হন। জার্মানির যে সামরিক বা অস্থায়ী সরকার ছিল তা রাশিয়ার অনুকরণে 'কাউন্সিল অফ পিপলস্ কমিশারস্' নামে পরিচিত। তার সদস্যদের মধ্যে 'সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির' সদস্যরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ তাছাড়া ছিল 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট জার্মান সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সদস্যরা।

ঐ সোস্যাল ডেমোক্র্যাট দুটি দল ছাড়া ছিল জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি, যাদের 'স্পার্টাসিস্ট' বলা হত। তারা সোভিয়েট ইউনিয়নের মতন বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজবাদী সরকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় 1918র ডিসেম্বর এবং 1919 -এর জানুয়ারিতে বার্লিন নগরী দখলের চেষ্টা করে। সরকার অবশ্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী বা ফ্রিকোরদের সাহায্যে এই বিপ্লব দমন করে। এই স্বেচ্ছা সৈন্যরা বহু স্পার্টাসিস্টদের হত্যা এবং বন্দী করে। জার্মান কমিউনিস্ট নেতা কার্ল লাইবনেখট্ এবং রাজা লুক্সেমবুর্গও নিহত হন।

এরপর 1919-এর জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত প্রজাতন্ত্রে সাধারণ নির্বাচনে জাতীয় সভার 423 জন সদস্যের মধ্যে 165 জন এবার্টের সমর্থক নির্বাচিত হন। তাছাড়া ছিলেন তার সমর্থক অন্য দলের নির্বাচিত সদস্যরা। এই সব সদস্য 1919 -এর 6 ফেব্রুয়ারি বার্লিনের নিকটবর্তী ভাইমার এ মিলিত হন। এই সভায় ভার্সাই সন্ধির অনুমোদনের প্রশ্ন ছিল। তাছাড়া ছিল জাতীয় সভার প্রধান কাজ অর্থাৎ এক প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান রচনা। পরবর্তী দশ মাসে সেই সংবিধান রচনা সম্পূর্ণ হলে জাতীয় সভা 1919এর 31 জুলাই তা গ্রহণ করে। এই সংবিধান 'ভাইমার শাসনতন্ত্র' নামে পরিচিত। ঐ বছর আগস্ট মাসে জার্মানিতে আনুষ্ঠানিকভাবে ভাইমার প্রজাতন্ত্র (Weimar Republic) গঠিত হয়, যার প্রথম সভাপতি হন ফ্রেডারিখ এবার্ট। অধ্যাপক *রাইডার* এই অবস্থাকে 'আগ্নেয়গিরির উপর নৃত্য' বলে অভিহিত করেছেন।

ভাইমার প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হবার পর জার্মানির অন্যান্য বিরোধী শক্তি ঐ প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে ওঠে। দক্ষিণপন্থী বিদ্রোহ, সরকারি কর্মচারীদের আনুগত্যের অভাব, সেনা বিদ্রোহ, বামপন্থী বিদ্রোহ ইত্যাদি ছিল ঐ সরকার চলার পথে বাধা। এছাড়া ভার্সাই সন্ধির কঠোর শর্তাদি তো ছিলই। সবচেয়ে গুরুত্ব অবস্থা ছিল অর্থনৈতিক দুরবস্থা এবং মুদ্রাস্ফীতি। দেশের এই সংকটে গুস্তাফ স্টেসমান সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনিও অবস্থার উন্নতি ঘটাতে ব্যর্থ হন। বস্তুত 1919 থেকে 1933 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে উনিশটি মন্ত্রিসভা এসেছে, আবার ভেঙ্গেছে। এই ছিল ভাইমার প্রজাতন্ত্রের অবস্থা। শেষপর্যন্ত 1933 খ্রিস্টাব্দে এডলফ্ হিটলারের নেতৃত্বে নাৎসী দলের উত্থান জার্মানির আভ্যন্তরীণ নীতি এবং পররাষ্ট্র নীতি, উভয়ক্ষেত্রেই চেহারা বদলে দেয়।

ষষ্ঠ পর্ব

দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীযুগে ইয়োরোপ (১৯১৯-১৯৩৯ খ্রিঃ)

(Europe in the Inter-War Period (1919-1939)

অধ্যায় ২০

সোভিয়েট রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তির সুদৃঢ়করণ

(Syllabus: ***Consolidation of Economic and Political power of the Soviet State*****)**

১। পটভূমিকা

1917 খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে রাশিয়ায় জারতন্ত্রের পতনের পর কেরেনস্কির অধীনে যে অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়, তার থেকে বলশেভিক দল ঐ বছর নভেম্বর মাসে ক্ষমতা কেড়ে নেয়। এই নভেম্বর বিপ্লবই ইতিহাসে রুশ বিপ্লব বা বলশেভিক বিপ্লব নামে পরিচিত। আমরা পূর্ববর্তী অষ্টাদশ অধ্যায়ে এই বিপ্লবের পটভূমিকা, কারণ এবং বিপ্লবের ফলাফল ইত্যাদি আলোচনার সময় লক্ষ্য করেছি যে মার্ক্সবাদের রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তিতে এবং লেনিনের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে এই বিপ্লবের সাফল্য শুধু রাশিয়ায় নয়, সমগ্র মানবসভ্যতার ইতিহাসে সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। 8th নভেম্বর রাতে 'অল রাশিয়ান কংগ্রেস অফ সোভিয়েটস' মিলিত হয় এবং নতুন বলশেভিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এর নাম হয় 'কাউন্সিল অফ পিপলস্ কমিসারস্'।[1] এর প্রধান হন লেনিন। তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে নতুন সরকারের প্রধান হিসেবে লেনিন ভাষণ দিতে যখন ওঠেন তখন; এক প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা অনুযায়ী; লেনিন যখন দাঁড়ালেন[2] a short, stocky figure, with a big head set down in his shoulders, bald and bulging. Little eyes, a snubbish nose, wide generous mouth and heavy chin.... Dressed in shaby clothes, his trousers much too long for him. Unimpressive, to be the idol of a mob, loved and revered as perhaps few leaders in history has been.

লেনিন তার ভাষণে জোর দিয়েছিলেন শান্তি এবং জমির ওপর। যুদ্ধ বন্ধ করে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং রাশিয়ার সমস্ত জমি সরকারি অধিগ্রহণের মাধ্যমে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ ঘটিয়ে কৃষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠাই ছিল নতুন সরকারের লক্ষ্য। এই সোভিয়েট সরকার এক ধাপ অতিক্রম করেছিল নভেম্বর বিপ্লবের পর। তারপর বাকি ছিল দেশের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন সরকারকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা। অধ্যাপক *ক্রিস্টোফার হিল* লিখেছেন যে,[3] "First and foremost Lenin symbolizes the Rus-

---

1. Lionel Kochan, *The Making of Modern Russia*, Penguin, 1968, p. 252.
2. John Reed, *Ten Days that shook the World*, New York, 1960. p. 170
3. C. Hill, *Lenin and the Russian Revolution*, Penguin, 1978, p. 155.

sian Revolution as a movement of the poor and oppressed of the earth who have successfully risen against the great and the powerful" অর্থাৎ লেনিন রুশ বিপ্লবকে শক্তিশালী এবং বৃহৎ মানুষদের বিরুদ্ধে দরিদ্র ও নিপীড়িত মানুষদের আন্দোলনের সাফল্য হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন।

1917 খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবের পর ক্ষমতা অধিকার করে বলশেভিক নেতা লেনিন এবং তাঁর সহযোগিবৃন্দ রাশিয়াকে একটি সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত করার কাজে হাত দেন। মনে রাখা দরকার, বিপ্লবের প্রাক্কালে লেনিন শ্রমিকদের রুটি, কৃষকদের জমি ও সেনাদলকে শান্তিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এগুলি পূরণের জন্য নতুন বিপ্লবী সরকার আত্মনিয়োগ করে। আর একটি কথা মনে রাখতে হবে, নভেম্বর বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গেই রাশিয়ার সর্বত্র বলশেভিকদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল এমন নয়। রাশিয়ার কয়েকটি বড়ো বড়ো শহরাঞ্চলেই তাদের দলের প্রভাব ছিল বেশি। শ্রমিক, কৃষক ও সেনারা ছিল তাদের সহায়। সুতরাং নতুন সরকারের প্রথম এবং প্রধান সমস্যা ছিল রাশিয়ার সর্বত্র নিজেদের ক্ষমতাকে ছড়িয়ে দেওয়া। এই রাজনৈতিক সমস্যা ছাড়া সমসাময়িক রাশিয়ার অর্থনৈতিক দুরবস্থাও দূর করাও নতুন সরকারের লক্ষ্য হ'ল। শিল্পোৎপাদন, কৃষি উৎপাদন বাড়ানো, দ্রব্যমূল্য কমানো—এগুলির দিকে দৃষ্টি দেওয়া রাজনৈতিক সুদৃঢ়করণের মতোই জরুরি ছিল।

এই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচি পালন করার সঙ্গে সঙ্গেই রাশিয়ার সোভিয়েট সরকারকে জড়িয়ে পড়তে হলো গৃহযুদ্ধে, ঘটলো বিদেশী হস্তক্ষেপ। লেনিন এবং তার বিপ্লবী সরকার সাফল্যের সঙ্গে তার মোকাবিলা করলেন যুদ্ধকালীন সাম্যবাদ প্রয়োগ করে। অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য লেনিন গ্রহণ করলেন নয়া অর্থনৈতিক নীতি।

২। গৃহযুদ্ধ (1918-1921)

নতুন বলশেভিক সরকারের সামনে ছিল বহুবিধ সমস্যা। বলশেভিক নেতৃত্ব তার মধ্যে যে-সব সমস্যাকে প্রাধান্য দিলেন সেগুলি হলো—

(i) বিপ্লব থেকে উদ্ভূত পরিবর্তনগুলি স্থায়ী করা এবং বলশেভিক দলের পশ্চাতে জনসমর্থন অর্জন করা।

(ii) এজন্য বৈদেশিক যুদ্ধ বিগ্রহ থেকে রাশিয়াকে মুক্ত করা।

(iii) মার্ক্সবাদের আদর্শে দেশকে পুনর্গঠন করা।

এইসব উদ্দেশ্য সামনে রেখে লেনিন 1918 খ্রিস্টাব্দে ব্রেস্ট লিটভস্ক (Brest Litovsk)এর সন্ধির শর্তে জার্মানির সঙ্গে শান্তি স্থাপন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে তিনি নতুন সরকারের কর্মসূচির বিষয়বস্তু প্রচার করলেন। প্রচারের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল জমিদারী বাজেয়াপ্ত করা ও কৃষকদের হাতে জমির দায়িত্ব তুলে দেওয়া। এই প্রচারের দ্বারা রাশিয়ার নির্যাতিত কৃষক ও ভূমিদাসগণ বলশেভিকদের পক্ষে

যোগদান করল। সমস্ত কলকারখানা রাষ্ট্রায়ত্ত করা হবে। এটিও ছিল এক উল্লেখযোগ্য ঘোষণা। এক্ষেত্রেও রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণী বলশেভিকদের সঙ্গে যোগদান করল। এইভাবে প্রতিবিপ্লবের সম্ভাবনাকে দূরীভূত করে বলশেভিক দল সংবিধান রচনায় মন দিলেন। লেনিনের ক্ষমতালাভের পূর্বেই রাশিয়ায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে একটি সংবিধান সভা সংগঠিত হয়। এই সভায় বলশেভিকদের সংখ্যা ছিল কম। 1918 খ্রিস্টাব্দে এই সভা ভেঙে দিয়ে মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে সোভিয়েট সংবিধান রচিত ও গৃহীত হয়। এই সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা কৃষক-শ্রমিক বা প্রোলেটারিয়েটদের হাতে সীমিত রাখা হয়। সুতরাং রাশিয়ার রাজনৈতিক আদর্শ হলো শ্রমিক-কৃষকের একনায়কতন্ত্র। একমাত্র শ্রমিক ছাড়া অন্যান্য সকল শ্রেণীর অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হলো। বলশেভিক দলের অর্থনৈতিক আদর্শ মার্ক্সবাদের মূলতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। ধনতন্ত্রের উৎখাত ঘটানোই ছিল এই অর্থনীতির মূল লক্ষ্য। সকল প্রকার ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার লোপ করে উৎপাদনের সকল উপাদানকে রাষ্ট্রীয়করণ করাই বলশেভিক দলের আদর্শ। এই সব রীতি-নীতি ও আদর্শকে বাস্তবে রূপায়ণ করতে গিয়েই বলশেভিক দলকে এক গৃহযুদ্ধের (Civil War) সম্মুখীন হতে হলো।

অবিলম্বে চিরাচরিত জার আমলের প্রশাসনকে সম্পূর্ণ ভেঙে দিয়ে প্রোলেটারিয়েটদের শাসন প্রতিষ্ঠার সূচনা হলো। এর ফলে এমন এক আমলাতন্ত্রের সৃষ্টি হলো যার কোনও ঐতিহ্য পূর্বে কখনই ছিল না। অভিজাত, জমিদার, জার-আমলের সামরিক কর্মচারী, যাজক— এক কথায় অতীতের সম্পত্তি ও সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর সামনে এলো এক বিরাট সঙ্কট। ফলে তারা বলশেভিক সরকারকে অস্বীকার করে প্রতিবিপ্লবের অবস্থা সৃষ্টি করল। শুরু হলো রাজনৈতিক গৃহযুদ্ধ। সুতরাং বলশেভিক-বিরোধী গোষ্ঠী, রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তি-সকলেরই উপর কঠোর নির্যাতনমূলক নীতি প্রয়োগ করা হলো। হত্যা অথবা সাইবেরিয়ায় নির্বাসনের হাত থেকে কেউ রেহাই পেল না। ভূতপূর্ব জার দ্বিতীয় নিকোলাস ও তার পরিবারবর্গ সাইবেরিয়ায় সাম্যবাদীদের হাতে নিহত হলেন। ফরাসি বিপ্লবের মত রাশিয়াতে অবশ্য 'সন্ত্রাসের রাজত্ব' সৃষ্টি হয়নি। সেখানে গৃহীত হলো যুদ্ধকালীন সাম্যবাদী নীতি (War Communism)।

নীতির রূপায়ণ ও বিপত্তি ঃ তবে এই নির্যাতনমূলক নীতি প্রয়োগের পাশাপাশি বলশেভিক দল মার্ক্সীয় নীতি বা নতুন সাংবিধানিক ধারা রূপায়ণ করতে ভুল করেননি। জমিদারী উৎখাত করে কৃষক সংগঠনের উপর জমি ও তার উৎপাদনের দায়িত্ব দেওয়া হলো। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও কল-কারখানা বাজেয়াপ্ত-করে উৎপাদনের যাবতীয় উপাদান-যেমন— মূলধন, সংগঠন, জমি, শ্রম ইত্যাদি রাষ্ট্রায়ত্ত করা হলো। এর জন্যে ক্ষতিপূরণের কোনও ব্যবস্থা রইল না। রাশিয়ার অতীতের সরকারি ঋণকে অস্বীকার করা হলো।

রাশিয়ার চার্চগুলি সকল প্রকার সাহায্য থেকে বঞ্চিত হলো। চার্চের সম্পত্তিও রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হিসেবে পরিগণিত হলো। বেকার বলে কোনও সমস্যা রইল না। সকলকেই শ্রমদানে বাধ্য করা হলো। এক কথায়, বলশেভিক নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনও রকমের গণতান্ত্রিকতা ও উদারতার লেশমাত্র ছিল না। ফলে বলশেভিক দল ছাড়া সকলের মধ্যে একটা আতঙ্ক সৃষ্টি হলো। তাদের সামনে এলো সন্ত্রাস, বিভীষিকা।

এই অভূতপূর্ব অবস্থা অচিরে বঞ্চিত জমিদার, যাজক ও বিত্তশালীদের একতাবদ্ধ ক'রে প্রতি-বিপ্লবে উদ্বুদ্ধ করল। এদের সঙ্গে যোগদান করল ক্ষমতাচ্যুত মেনশেভিক দল। এরা বিদেশী শক্তির সমর্থনও লাভ করল। কারণ ইতোপূর্বেই জারের আমলের বিদেশী ঋণ এবং সকল প্রকার সন্ধি চুক্তিকে বলশেভিক সরকার অস্বীকার করেছেন। তাছাড়া ধনতন্ত্রের সমাধি রচনা ক'রে বিশ্বব্যাপী সাম্যবাদ ছড়ানোর নীতিও ঘোষিত হয়েছে। তাই সেই যুগের ধনতান্ত্রিক দেশগুলি সাম্যবাদী বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় আতঙ্কিত হলো। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ইতালি, জাপান ইত্যাদি ধনতান্ত্রিক দেশগুলি একযোগে রাশিয়ার সাম্যবাদী সরকারকে অস্বীকার করল এবং সম্মিলিতভাবে এই সরকার ধ্বংসের উদ্দেশ্যে চারদিক থেকে আক্রমণ শুরু করল। শুরু হলো হস্তক্ষেপ (Intervention)। রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলি বিদেশী শত্রুর হাতে হাত মেলালো। একদল চেক (Czech) সৈন্যবাহিনী সাইবেরিয়ায় প্রবেশ করল। ব্রিটিশ বাহিনী আর্কেঞ্জেল (Archangel) অধিকার করল। রাশিয়ার দক্ষিণ অঞ্চলের কসাক সম্প্রদায় বলশেভিক সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল। জাপান সাইবেরিয়ার পূর্বপ্রান্তে আক্রমণ পরিচালনা করল।

এই সুযোগে রুশ-প্রভাবাধীন পূর্ব ইয়োরোপের অনেক রাষ্ট্র স্বাধীনতা ঘোষণা করল। বিদেশী সৈন্যগণ বলশেভিক-বিরোধী রুশদের সাহায্য করে লাল (Red) সরকারের জায়গায় সাদা (White) সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হলো।[1] এভাবে বলশেভিক সরকারের বিরুদ্ধে রাশিয়ার সর্বত্র সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। এই গৃহযুদ্ধের একদিকে ছিল বিপ্লবীদের অর্থাৎ বলশেভিক দলের লাল প্রতিরোধ এবং অন্যদিকে ছিল বলশেভিক বিরোধী অর্থাৎ প্রতি বিপ্লবীদের শ্বেত সন্ত্রাস (White Terror)। এই দুই সন্ত্রাস নতুন সরকারকে এক অভূতপূর্ব বিপদের সম্মুখীন হতে বাধ্য করল। এই নিদারুণ সংকটের মধ্যে লেনিন ধৈর্য সহকারে চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার ব্যবস্থা করলেন। ট্রট্স্কি, যিনি বিপ্লবের সময় 'লাল ফৌজ'-এর (Red Army) সংগঠক ছিলেন, তিনিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এমতাবস্থায় বলশেভিক সরকার 'চেকা' (Cheka) নামক এক কমিশন নিয়োগ করলেন। বলশেভিক-বিরোধীদের কার্যকলাপ স্তব্ধ করাই ছিল এই কমিশনের দায়িত্ব। এই কমিশন

---

1. "The foreign troops co-operated with the anti-Bolshevik motives to set up 'white' government" মন্তব্য করেছেন ল্যাংসাম। দ্রষ্টব্য, *দ্য ওয়ার্ল্ড সিন 1919,* পৃ. 317

ছিল ফরাসি বিপ্লবের ট্রাইবুনালের (Revolutionary Tribunal) মতন একটি শক্তিশালী সংস্থা। 'চেকা' অবিলম্বে অসংখ্য বলশেভিক বিরোধীদের প্রাণনাশ করল। অবিলম্বে শ্বেত সন্ত্রাস ম্রিয়মান হয়ে পড়ল। লাল প্রতিরোধ 1921 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটাতে সক্ষম হলো।

বলশেভিক সাফল্যের কারণ ঃ বলশেভিক সরকারের সাফল্যের পশ্চাতে নানা কারণ বিদ্যমান ছিল। (১) বৈদেশিক সেনাবাহিনীর রাশিয়ায় প্রবেশ দেশপ্রেমিক রুশ-যুবকদের সমর্থন পায়নি। বলশেভিকবিরোধী হয়েও অনেকেই বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। (২) কৃষক সমাজের অনেকেই বলশেভিক আদর্শ সঠিক অনুধাবন করতে পারেনি। তাদের আরোপিত ব্যবস্থা কৃষকের মনঃপূত হয়নি। তবুও তারা জারের শাসন পুনরায় প্রবর্তিত হবে-সেটা মোটেই পছন্দ করত না। ফলে তারা বলশেভিক সরকারকে সাহায্য দানে কার্পণ্য করল না। (৩) বিপ্লব-বিরোধী দলগুলির মধ্যে কোনও সংহতি ছিল না। তাদের মতভেদ ও অনৈক্য বলশেভিক সরকারকে বিদ্রোহ দমনে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। (৪) শ্বেত বাহিনীর রণকৌশল ও সামরিক ক্ষিপ্রতা ছিল খুবই নিম্ন স্তরের। পক্ষান্তরে ঠিক এই সময় ট্রটস্কির নেতৃত্বে সংগঠিত আধুনিক সমরশিক্ষায় শিক্ষিত এক লক্ষ লাল ফৌজ (Red Army) গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটাতে যেমন সাহায্য করল তেমনি বিদেশী সৈনিকদের মনে ভীতির সঞ্চার করল। অন্যদিকে সহকর্মী স্ট্যালিন গুপ্তপুলিশ সংস্থার সাহায্যে নিষ্ঠুরভাবে আভ্যন্তরীণ শত্রুদের ধ্বংশ করলেন। (৫) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে প্রত্যেকটি দেশে আভ্যন্তরীণ অব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক দুর্দশা চরম সমস্যা সৃষ্টি করায় সকলেই নিজ নিজ দেশ ও জাতীয় পুনর্গঠনে বিব্রত হয়ে পড়ে। ফলে বেশিদিন আর তাদের বলশেভিক সরকার দমনের মানসিকতা ছিল না। পক্ষান্তরে বিদেশী জাতিবর্গ রাশিয়ার সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে লাভবান হওয়ার আশা পোষণ করত। তাই লক্ষ্য করা যায়, 1921 খ্রিস্টাব্দের পূর্বে ব্রিটেন, ইতালি, আমেরিকা প্রভৃতি রাষ্ট্র রাশিয়া থেকে সৈন্য অপসারণ করল। বলশেভিক বিরোধী আন্দোলন ভেঙে গেল। গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটল।

৩। লেনিন ও তাঁর নয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

মহান বিপ্লবী লেনিনের প্রকৃত নাম ছিল ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ (Vladimir Ilyich Ulyanov)। 1870 খ্রিস্টাব্দের 22 এপ্রিল তিনি কাজান প্রদেশে সিমবিরস্কের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। স্কুলের পাঠ শেষ করে তিনি কাজান ও সেন্ট পিটার্সবার্গের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়ন করেন। ছাত্র হিসাবে তিনি ছিলেন মেধাবী। উচ্চতর শিক্ষায় আইন ছিল তার বিশেষ অনুরাগের বিষয়। ছাত্র জীবনেই তিনি কার্ল মার্ক্সের সমাজতন্ত্রে বুৎপত্তি লাভ করেন ও কার্ল মার্ক্সের প্রতি আকৃষ্ট হন। 1887 খ্রিস্টাব্দে তার

বড় ভাই আলেকজান্ডার জার-বিরোধী ষড়যন্ত্রে যুক্ত থাকার অপরাধে মাত্র উনিশ বছর বয়সে প্রাণ হারান। এই ঘটনা লেনিনের মনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল।[1] তিনি ক্রমে মার্ক্সীয় সাহিত্য পাঠ, রাশিয়াতে বিপ্লববাদের প্রসার, বিপ্লবী সংগঠন ও প্রচার ইত্যাদির কাজে যুক্ত হন। তাঁর সঙ্গে প্লেখানভ -এর সাক্ষাৎ হয় (1895)। নিজেকে তিনি একাধারে তাত্ত্বিক ও সংগঠকরূপে গড়ে তোলেন। জার সরকার তাকে বিপ্লবী কাজের জন্য গ্রেপ্তার করে সাইবেরিয়াতে পাঠায়। মুক্তি পেয়ে (1900) লেনিন 1917 খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল পর্যন্ত দেশের বাইরেই ছিলেন।[1] তার ইসক্রা (স্ফুলিঙ্গ) পত্রিকা সম্পাদনা, গ্রন্থ রচনা, মার্ক্সীয় সাহিত্য প্রচার, সাংগঠনিক কাজ ইত্যাদির মধ্যে উল্লেখ্য 1902 খ্রিস্টাব্দে 'What is to be done' রচনা এবং 1903 খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ার সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক লেবার পার্টি থেকে সংখ্যা গরিষ্ঠদের নিয়ে বলশেভিক পার্টি গড়ে তোলা।[3] ডেভিড টমসন ঠিকই লিখেছেন যে, উনিশ শতক থেকে রাশিয়াতে যে জারতন্ত্র উচ্ছেদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছিল একজন ব্যক্তি তার গতিপথ আমূল বদলে দিয়েছিলেন। তিনি ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড ও পরে সুইটজারল্যাণ্ডে ছিলেন। 1905 খ্রিস্টাব্দের বিপ্লব চলাকালীন তিনি কিছুদিনের জন্য দেশে আসেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভে তিনি ছিলেন সুইটজারল্যাণ্ডে। সুইটজারল্যাণ্ড থেকেই জার্মানির সাহায্যে যুদ্ধ-বিরোধী নানা প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি তিনি রাশিয়ায় প্রেরণ করতেন। তাঁরই অনুপ্রেরণায় রাশিয়ার বলশেভিক দল নিজেদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করতে সমর্থ হয়।

রাশিয়ার বিপ্লব আরম্ভ হওয়ার পর লেনিন জার্মানির সাহায্যে সুইটজারল্যাণ্ড থেকে রাশিয়ায় ফিরে আসেন (এপ্রিল 1917)। ক্রমে জারতন্ত্রের উচ্ছেদ হলে, কেরেনস্কির নেতৃত্বে সমাজতন্ত্রী মেনশেভিক দলের হাতে ক্ষমতা গেল, কিন্তু যুদ্ধ বন্ধ হলো না। রাজতন্ত্রের পরিবর্তে ঘোষিত হলো প্রজাতন্ত্র। একটা অস্থায়ী সরকারও (Provisional Government) প্রতিষ্ঠিত হলো। কিন্তু এই সরকার রাশিয়ার জার্মানির অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ করতে অক্ষম হলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার ধনভাণ্ডার উজাড় হলো। আভ্যন্তরীণ সমস্যা নিদারুণ সঙ্কট সৃষ্টি করল। তখন লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক দল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তগত করলেন (7th নভেম্বর 1917)। পরের বছর (1918) রচিত ও গৃহীত হলো সোভিয়েট সংবিধান। সাম্যবাদী শাসনের সুবিধার্থে সম্পূর্ণ নীচ তলায় রইল শ্রমিক কৃষকের সোভিয়েট, তার উপর নির্বাচিত জেলা সোভিয়েট। শেষোক্ত সংস্থা সোভিয়েট দ্বারা নির্বাচিত হলো প্রিসিডিয়ামের প্রতিনিধিবর্গ। প্রিসিডিয়ামের হাতে রইল সোভিয়েত শাসনের মূল দায়িত্ব।

রাশিয়া এই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে জড়িত ছিল। লেনিন ও তাঁর সহকর্মীরা জানতেন যে সমাজবিপ্লবকে জয়যুক্ত করতে হলে বিশ্বযুদ্ধ থেকে রাশিয়াকে মুক্ত করতে হবে। ব্রেস্ট

---

1. ক্রিস্টোফার হিল, *লেনিন অ্যান্ড দ্য রাশিয়ান রেভোলিউশন*, পেঙ্গুইন, 1971, পৃ 36-38
2. ডেভিড শাব, *লেনিন*, পেঙ্গুইন 1966, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়।
3. ঐ, পৃ 81

লিটভস্ক-এর সন্ধির মাধ্যমে রাশিয়াকে যুদ্ধ থেকে প্রথমে মুক্ত করা হলো। বহির্বিভাগীয় যুদ্ধ থেকে রাশিয়াকে মুক্ত করে লেনিন ও তার সহকর্মীরা মার্ক্স প্রদর্শিত পন্থায় রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে রূপায়িত করার অনুকূল বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করতে শুরু করলেন। মার্ক্সবাদীরা মনে করেন, ব্যক্তিগত মালিকানার সঙ্গে পুঁজিবাদ জড়িত। তাই রাশিয়ার সাম্যবাদী সরকার ব্যক্তিগত সম্পত্তি, জমি, ব্যাঙ্ক, কলকারখানা, মূলধন সব কিছু রাষ্ট্রায়ত্ত করল। জমির অধিকার যৌথভাবে কৃষকদের হাতে অর্পণ করা হলো। কলকারখানা বিনা ক্ষতিপূরণে মালিকের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত শ্রমিক সংগঠনের পরিচালনায় ছেড়ে দেওয়া হলো। জারের আমলের সমস্ত রাষ্ট্রীয় ঋণকে অস্বীকার করা হলো। রাশিয়ার গির্জা ও যাজকদের যাবতীয় ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হলো। গির্জা সরকারি সাহায্যে থেকে বঞ্চিত হলো। রাশিয়ার সমস্ত বেসরকারি শিক্ষাব্যবস্থাকে সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হলো। ব্যক্তিগত বাণিজ্য নিষিদ্ধ হলো, ফলে ব্যক্তিগত পরিচালনায় গড়ে ওঠা দোকানগুলি বন্ধ হলো। এসব সংস্কারমূলক কর্মের ফলশ্রুতি স্বরূপ বলশেভিক দলকে প্রায় তিন বছর যাবৎ গৃহযুদ্ধ বা প্রতি বিপ্লবের মোকাবিলা করতে হলো। কিন্তু এই সংকটময় মুহূর্তে লেনিন ও তার সহকর্মীরা যেমন আভ্যন্তরীণ ও বিদেশী শত্রুর মোকাবিলা করেছেন তেমনি নিষ্ঠার সঙ্গে বিপ্লবকে রূপায়িত করার চেষ্টা করেছেন।

বিপ্লবের পর কমিউনিস্ট শাসনের প্রথম তিন বছর রাশিয়ার অর্থনৈতিক পরিবর্তন ছিল চূড়ান্ত। অবশ্য কমিউনিস্ট আদর্শে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সর্বদা অর্থনৈতিক কর্মসূচি দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই কমিউনিস্ট শাসনের প্রথম তিন বছর অর্থনৈতিক পরিবর্তনের বিপ্লবাত্মক চেহারা লক্ষণীয় বিষয়।

প্রথমতঃ, জমিদারদের অত্যাচার থেকে কৃষককে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে যখন জমিদারী বাজেয়াপ্ত করে রাষ্ট্রীয়করণ করা হলো তখন কৃষক অসন্তোষ সুস্পষ্ট হলো। সচেতন কৃষকরা মার্ক্সীয় নীতি অনুসারে ফসলের লভ্যাংশ সরকারের হাতে তুলে দিতে চাইল না। কৃষকের নিকট থেকে শস্য আদায়ের জন্যে একটি বিশেষ বিভাগ খোলা হলো। তখন কৃষকদের অসন্তোষ চূড়ান্তভাবে আত্মপ্রকাশ করল। তারা অতিরিক্ত শস্য উৎপাদনের কর্মসূচি পরিত্যাগ করল। এর ফলে দেশে খাদ্যশস্যের অভাব প্রকট হলো। 1921 খ্রিস্টাব্দে এলো এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি ভেঙে পড়ল।

দ্বিতীয়তঃ, বলশেভিক দল সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থায় বেকার সমস্যা ও শ্রমিক মালিক বিরোধের অবসান ঘটাতে বদ্ধপরিকর ছিল। এই উদ্দেশ্যে ছোট থেকে বড় সকল স্তরের শিল্প প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হলো। কারখানার শ্রমিক সংস্থার উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা হলো। কিন্তু সদস্যদের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার অভাব থাকায় শিল্প-সংকট দেখা দিল। প্রত্যেকটি শ্রমিক সংস্থার মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ছিল না। ফলে কাঁচা মাল আমদানি করা, উৎপাদন, বণ্টন ইত্যাদি সর্ব ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হলো। এই সংকট দূর করার উদ্দেশ্যে 'সুপ্রিম ইকনমিক কাউন্সিল' নামে

উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন একটি সংস্থা গঠন ক'রে সংকট মোচনের দায়িত্ব দেওয়া হলো। কিন্তু এই সংস্থাও সঠিক দায়িত্ব পালন করতে পারল না। ফলে উৎপাদনের পরিমাণও যেমন কমলো তেমনি সামগ্রীর মূল্য অভাবনীয়ভাবে বৃদ্ধি পেল। কারখানাগুলিতে শ্রমিক অসন্তোষ মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি পেল।

এরূপ এক নিদারুণ আর্থিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে বলশেভিক নেতা লেনিন পুঁথিগত সাম্যবাদের (Copy Book Communism) পরিবর্তে বাস্তব অবস্থার অনুকূলে নতুন অর্থনৈতিক নীতি (New Economic Policy সংক্ষেপে N.E.P.) গ্রহণ করলেন। কৃষির ক্ষেত্রে নতুন নীতি অনুসারে ক্ষুদ্র কৃষকদের নির্দিষ্ট পরিমাণ জমির মালিক বলে স্বীকৃতি দেওয়া হলো। কৃষকদের কাছ থেকে জোর করে শস্য আদায় করার পরিবর্তে তাদের উপর নির্দিষ্ট হারে কর ধার্য করা হলো। কর প্রদানের পর উদ্বৃত্ত শস্য বিক্রয়ের অধিকারও তাদের দেওয়া হলো। শিল্পের ক্ষেত্রে বৃহৎ শিল্প-কারখানাগুলি নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার দায়িত্ব রইল রাষ্ট্রের হাতে। তবে ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কারখানাগুলির উপর থেকে সরকারি নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়া হলো। দেশের শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিদেশী মূলধন লেনদেনের ব্যবস্থাকে সহজ করা হলো। সরকার ছোট-বড় সকল প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের হার বৃদ্ধি ও নির্দিষ্ট মূল্যে সামগ্রী বিক্রয়ের দিকে লক্ষ্য রাখার ব্যবস্থা করলেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনার দায়িত্ব রইল সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীনে। এই কাজের জন্যে সরকারি সংস্থাও সংগঠিত হলো। তবে ছোট ব্যবসায়ীদের ব্যক্তিগত-ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার অনুমতি দেওয়া হলো। জমিদারকে কিছু কিছু ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাখারও অনুমতি দেওয়া হলো।

ফলাফল ঃ লেনিনের নতুন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ফলাফল হলো চমকপ্রদ। তিনি কিছুটা পুরাতন ব্যবস্থার সঙ্গে সাম্যবাদী নতুন ব্যবস্থায় সামঞ্জস্য রক্ষার ব্যবস্থা করলেন। ফলে শিল্পী, ব্যবসায়ী, কৃষক সকলেই উৎসাহিত হলেন। সর্বস্তরের উৎপাদন বৃদ্ধি পেল। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, রাশিয়ার সর্বপ্রকার কর্মসূচিতে সাম্যবাদী দলের একক অধিকার অক্ষুণ্ন রাখা হলো। এর ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অল্পদিনের মধ্যে রাশিয়ার অভূতপূর্ব উন্নয়নের সম্ভাবনা সুস্পষ্ট হয়ে উঠল।

লেনিন ছিলেন প্রকৃতই বাস্তববাদী মার্ক্সীয় কমিউনিস্ট বিপ্লবী। তিনি মার্ক্সবাদকে যেমন মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন তেমনি প্রচলিত সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে প্রতিপালিত সাধারণ মানুষের মানসিকতাকে অবহেলা করতেন না। তাই সাম্যবাদী বা কমিউনিস্ট আদর্শ ও মার্ক্সীয় পথে অগ্রসর হওয়ার সময় সংকট দেখা দেওয়ায় সাধারণ মানুষের চলতি মানবিকতাকে প্রশ্রয় দিলেন। সাম্যবাদী শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পুরাতনের সঙ্গে নতুন অর্থনীতির সামঞ্জস্য বিধান করলেন। সকলের উপর প্রোলেটারিয়েট কর্তৃত্বকে অটুট রাখলেন। এই ছত্রছায়ায় রাশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়ন অভূতপূর্ব বৃদ্ধি পেল। এইভাবে বিদেশী আক্রমণ প্রতিরোধ, আভ্যন্তরীণ প্রতি-বিপ্লবের মোকাবিলা এবং পুরাতনের সঙ্গে নতুনের সামঞ্জস্য

বিধানের মাধ্যমে লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক দল যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে তা ছিল যুগের সমসাময়িক অবস্থার বিচারে তুলনাহীন। সঙ্গে সঙ্গে লেনিন বিশ্বে সাম্যবাদের প্রসার ও পররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও সার্থকভূমিকা পালন করেন। 1919 খ্রিস্টাব্দে লেনিন তাঁর সহকর্মীদের সহযোগিতায় 'তৃতীয় ইন্টারন্যাশানাল' (Third International) বা কমিন্টার্নের অধিবেশন আহ্বান করেন। পৃথিবীর সর্বত্র সাম্যবাদী বিপ্লবকে বাস্তবায়িত করার নীতি এই অধিবেশনে গৃহীত হয় এবং প্রতিনিধিবর্গকে অনুকূল নির্দেশ দেওয়া হয়। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ব্রেস্ট-লিটভস্ক-এর সন্ধিতে লেনিন পশ্চিমাঞ্চলে জার্মানির নিকট নতি স্বীকার করলেও পূর্বাঞ্চলে তিনি সাফল্য অর্জন করেন। ইউক্রেইন (Ukraine) ও ককেশাস পর্বতের অপর দিকে রাশিয়ার কর্তৃত্ব পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ভার্সাই সন্ধির (1919) ফলে পোল্যাণ্ড ও বলকান অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত নতুন রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে রাশিয়ার মৈত্রী স্থাপিত হয়। তবে পোল্যাণ্ডের সঙ্গে স্থাপিত রিগার সন্ধিতে (Treaty of Riga) রাশিয়ার পশ্চিমাংশের অনেকখানি ভূখণ্ড পোল্যাণ্ডের হাতে চলে যায় (1921)। 1923 খ্রিস্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে শ্রমিক দল (Labour Party) নির্বাচনে জয়ী হলে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে রাশিয়ার বৈরীভাব কমে আসে। ইতালি ঐ বছর রাশিয়ার সাম্যবাদী সরকারকে স্বীকৃতি দেয়। 1924 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, নরওয়ে, গ্রিস, হাঙ্গেরি, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশ রাশিয়ার সাম্যবাদী সরকারকে স্বীকৃতি দিল। ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশ রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কও স্থাপন করল। এইভাবে লেনিন তাঁর মৃত্যুর (1924) পূর্বে সাম্যবাদী রাষ্ট্র রাশিয়াকে বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন।

৪। লেনিনের জীবনাবসান এবং স্ট্যালিন

লেনিনের মৃত্যুর পর (1924) কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দের মধ্যে মতভেদজনিত বিবাদ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা আত্মপ্রকাশ করল। সমকালীন নেতৃবর্গের মধ্যে লিয়ন ট্রটস্কি ছিলেন লালফৌজের (Red Army) সংগঠক এবং পররাষ্ট্র দপ্তরের 'কমিশার' (Commissar)। কমিউনিস্ট মতবাদে তিনি ছিলেন ঘোর বিশ্বাসী এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্যবাদী মতবাদ প্রসারের জন্য তাঁরই আগ্রহ ছিল সর্বাধিক। যোসেফ স্ট্যালিন ছিলেন কমিউনিস্ট নেতাদের মধ্যে সাংগঠনিক কাজে সুদক্ষ। তিনি ছিলেন দলের জেনারেল সেক্রেটারি এবং কমিউনিস্ট মুখপত্র 'প্রাভদা'র সম্পাদক। গুপ্ত পুলিশ সংস্থাটি ছিল স্ট্যালিনের হাতে। পত্রিকার সম্পাদক, দলের সম্পাদক, গুপ্তপুলিশ বিভাগের নেতা স্ট্যালিন ছিলেন অসামান্য ক্ষমতার অধিকারী। ট্রটস্কির ন্যায় জিনোভিয়েভ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্যবাদ প্রসারের পক্ষপাতী ছিলেন। তারই প্রচেষ্টায় 1919 খ্রিস্টাব্দে লেনিন তৃতীয় ইন্টারন্যাশানাল আহ্বানে সাফল্য অর্জন করেন। কামেনেভ ছিলেন অনেক বেশি নরম প্রকৃতির মানুষ। লেনিনের আমলে তাঁকে শ্রমিক ও প্রতিরক্ষা বিভাগের সভাপতি করে দেওয়া হয়। এছাড়াও ছিলেন লেনিনের ব্যক্তিগত সচিব এবং সুপ্রিম ইকনমিক কাউন্সিলের সভাপতি রাইকভ। এই নেতৃবৃন্দের সকলেই বিপ্লবে

সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে নির্বাসন অথবা কারাদণ্ড ভোগ করেন। বিপ্লবে তাদের অবদান ছিল অসামান্য; নেতৃবৃন্দের মধ্যে স্ট্যালিন ছিলেন বুদ্ধিমান ও ষড়যন্ত্রে দক্ষ। তিনি লেনিনের নতুন অর্থনৈতিক নীতি বিষয়ে মতভেদের সন্ধান পেয়ে জিনোভিয়েভ এবং কামেনেভকে নিয়ে ত্রি মিত্রের জোট (Triumvirate) গঠন করেন। যুক্তভাবে এই তিনজন সর্বদা ট্রটস্কিকে এড়িয়ে চলতেন।

কমরেড লেনিনের মৃত্যুর পর কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব নিয়ে স্ট্যালিন ও ট্রটস্কির মধ্যে তীব্র মতভেদ সৃষ্টি হয়। ট্রটস্কি মনে করতেন যে, বিশ্বের সর্বত্র সাম্যবাদী বিপ্লব না ঘটলে রাশিয়ার বিপ্লব সফল হবে না। মার্ক্সের মতে, যে-সব দেশে শিল্প-বিপ্লব ঘটেছে সেই সব দেশে সাম্যবাদী বিপ্লব ঘটানো সহজ। সুতরাং রাশিয়ার নেতৃত্বে এখন বিশ্বের শিল্প-সমৃদ্ধ দেশগুলিতে সাম্যবাদী বিপ্লব ঘটানোর চেষ্টা করা উচিত। স্ট্যালিনের মত ছিল ভিন্নতর। তাঁর মতে এখনই বিশ্ববিপ্লবের কথা চিন্তা না করে রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ উন্নয়নে তৎপর হওয়া একান্ত প্রয়োজন। তাঁর তত্ত্ব ছিল 'এক দেশে সমাজতন্ত্র'। বিশ্বের অন্য কোথাও বিপ্লব না ঘটলেও রাশিয়ার বিপ্লব সফল হতে পারে, কৃষি-প্রধান রাশিয়াকে শিল্প প্রধান দেশে পরিণত করা সম্ভব। রাশিয়ার দৃষ্টান্ত নিয়ে অন্য দেশে স্বাভাবিক উপায়ে বিপ্লব সংঘটিত হবে। রাশিয়ার বিপ্লবই হবে বিশ্ব-বিপ্লবের ভিত্তি। মতভেদজনিত এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ট্রটস্কি ও তার অনুগামীগণ পরাজিত ও দেশ থেকে বহিষ্কৃত হন। নির্বাসিত অবস্থায় ট্রটস্কি মেক্সিকোতে এক আততায়ীর হস্তে মৃত্যুবরণ করেন (1943)। ট্রটস্কির মৃত্যুর পরে আমৃত্যু স্ট্যালিন (1953) রাশিয়ার সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হলেন।[1]

যাই হোক, উক্ত মতভেদ লেনিনের মৃত্যুর পর চূড়ান্ত আকার ধারণ করল। স্ট্যালিন পন্থীরা ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাছাড়া ত্রি-মিত্রের জোট স্ট্যালিনকে ট্রটস্কির পরাজয় ঘটাতে সাহায্য করল। ট্রটস্কিকে পরাজিত করেও স্ট্যালিন বাধামুক্ত হতে পারেননি। এর পর জিনোভিয়েভ ও কামেনেভ নিজ নিজ প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তারের জন্য তৎপর হলেন। এক্ষেত্রে স্ট্যালিনকে সাহায্য করল কৃষক শ্রেণী। স্ট্যালিন তাদের আরও সুযোগ-সুবিধা দিয়ে তাদের সমর্থন আদায় করলেন। শেষে (1925) স্ট্যালিন প্রিসিডিয়ামের অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন লাভ করতে সমর্থ হলেন। তখন তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী দুই সদস্যকে ক্ষমতাচ্যুত ক'রে নিজের ক্ষমতাকে নিষ্কণ্টক করেন। স্ট্যালিন ছিলেন ধীর, স্থির, স্বল্পভাষী ও দূরদর্শী। তিনি সোভিয়েট রাশিয়াকে কেন্দ্র করে জাতীয় আদর্শের ভিত্তিতে বিশ্বব্যাপী শ্রমিক কৃষকের মনে আশা-আকাঙ্খা সঞ্চার করতে উদ্যোগ গ্রহণ করলেন।

যোসেফ স্ট্যালিন ও সাম্যবাদী শাসনের অগ্রগতি : ক্ষমতায় আসার পর স্ট্যালিন রাশিয়ার গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। লেনিন প্রবর্তিত নতুন অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে সফল করে তুলবার উদ্দেশ্যে তিনি কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে পঞ্চবার্ষিক (Five-

1. দ্রষ্টব্য: আইজাক ডয়েটসার, *স্ট্যালিন*, পেঙ্গুইন, 1968, সপ্তম-অষ্টম অধ্যায়।

Year Plan) পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন (1928)। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় (1928-1933, 1933-38) যথাক্রমে কৃষি ও শিল্পের উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য নির্দেশ করা হলো। এইসব পরিকল্পনা বা রূপায়ণের ক্ষেত্রে বিদেশী মূলধন ও বিদেশী কারিগরের সাহায্যও গ্রহণ করা হলো। কৃষির উন্নয়নের ক্ষেত্রে যৌথ খামার, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সার ব্যবহার ও ট্র্যাক্টরের সাহায্যে চাষের ব্যবস্থা গৃহীত হলো। দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে বাস্তবমুখী ও প্রয়োজনভিত্তিক করা হলো। ব্যবহারিক কর্মের মাধ্যমে কৃষি, শিল্প ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার ঘটানো সম্ভব হলো। রুশ ভাষা ভিন্ন বিদেশী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থাও গৃহীত হলো। দেশের উৎপাদন ও বন্টনের ক্ষেত্রে সাম্যবাদী ব্যবস্থা গৃহীত হলো। দেশের সার্বিক উন্নয়নের ফলে রাশিয়া বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী সাম্যবাদী রাষ্ট্ররূপে মর্যাদা লাভ করল।

পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে স্ট্যালিনের সাফল্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 1931 খ্রিস্টাব্দে জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করলে রাশিয়া বাধা দিতে অগ্রসর হয়নি। কিন্তু ঐ সময় বহির্মঙ্গোলিয়া এবং সিংকিয়াং-এ রাশিয়ার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। 1933 খ্রিস্টাব্দে জার্মানিতে হিটলারের শক্তিবৃদ্ধি ঘটে ও হিটলার কমিউনিস্ট-বিরোধী নীতি গ্রহণ করেন। জার্মানির সঙ্গে জাপানের কয়েকটি গোপন চুক্তি সম্পাদিত হয়। তাই রাশিয়াকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে স্ট্যালিন ফ্রান্স ও চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তিতে (Non-Aggression Pact) স্বাক্ষর করেন। 1934 খ্রিস্টাব্দে রাশিয়া জাতিসংঘের সদস্য পদ গ্রহণ করে। অবশেষে জার্মানি এবং জাপানের মধ্যে সাম্যবাদী-বিরোধ চুক্তি (Anti Communist Pact) স্বাক্ষরিত হলো (1936) পরের বছর জাপান চীন আক্রমণ করল। জার্মানি ঠিক তার পরের বছর অস্ট্রিয়া আক্রমণ করল। এই অবস্থায় বাধ্য হয়ে রাশিয়া জার্মানির সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করল (1939)। পূর্ব সীমান্ত সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে হিটলার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। স্ট্যালিন জানতেন যে, সুযোগ পেলেই জার্মানি রাশিয়া আক্রমণ করবে। তাই স্ট্যালিন সামরিক বিভাগের সঙ্গে প্রয়োজনীয় সরকারি তৎপরতা বজায় রেখেছিলেন। 1941 খ্রিস্টাব্দে জার্মানি রাশিয়া আক্রমণ করল। কিন্তু রাশিয়ার লাল ফৌজের হাতে জার্মানি পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হলো। রাশিয়ার সাম্যবাদী শক্তি পৃথিবীর সামনে দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে সক্ষম হলো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমের পুঁজিবাদী শক্তিগুলি সোভিয়েট রাশিয়ার উপর ঈর্ষাপরায়ণ হলো। কিন্তু তারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলনে (U.N.O.) রাশিয়াকে স্থান দিতে বাধ্য হলো। কিন্তু রুশ দেশের বিরুদ্ধে শুরু হলো আমেরিকার 'শীতল সংগ্রাম' (Cold War)।

স্ট্যালিন 1953 খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু বরণ করেন। কিন্তু তিনি মৃত্যুর পূর্বে দেখে গেলেন যে, শুধু রাশিয়া নয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পূর্ব ইয়োরোপ সহ আরও কয়েকটি দেশ সাম্যবাদী শাসনতন্ত্রকে মর্যাদা দিয়েছে। স্ট্যালিনের পরবর্তীকালেও রাশিয়ার ইতিহাসে অনেক পরিবর্তন হয়েছে তবে তা আমাদের পাঠ্যসূচির অন্তর্গত নয়।

অধ্যায় ২১

ইতালিতে ফ্যাসিবাদের উত্থান

(Syllabus: ***Rise of Fascism in Italy)***

১। ফ্যাসিবাদের উত্থানের আগে ইতালি

ফ্যাসিবাদ (Fascism) হলো এক ধরণের অ-মানবিক, অ-গণতান্ত্রিক, কর্তৃত্ববাদী, জবরদস্তিমূলক ও স্বৈরতান্ত্রিক মতাদর্শ। ইয়োরোপে এই মতাদর্শের উত্থান হয়েছিল দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তবর্তীকালীন সময়ে। এই আদর্শের ধ্বজাধারী বেনিতো মুসোলিনি কর্তৃত্ববাদী (authoritarian) সর্বগ্রাসী (totalitarian) এবং একনায়কতান্ত্রিক (dictatorial) শাসনের যে নমুনা দেখিয়েছিলেন তার থেকেই 'ফ্যাসিস্ট সরকার' কথাটির ব্যবহার ছড়িয়ে পড়েছে। ইতালিতে গণতন্ত্রের পতন এবং স্বৈরতন্ত্রবাদী ফ্যাসিস্ট শক্তির উদ্ভব যুদ্ধোত্তর ইয়োরোপের ইতিহাসের অন্যতম প্রধান ঘটনা। এই উত্থান শুধু ইতালিতে নয়, সমগ্র ইয়োরোপে, কিংবা বলা ভালো, সমগ্র মানব সভ্যতার উপর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল।

কীভাবে ফ্যাসিবাদের উত্থান হলো, এই তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য, মুসোলিনির কর্ম এবং তার দলের ক্ষমতা লাভ, আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র নীতিতে এই দলের ভূমিকা ইত্যাদি আলোচনার আগে দুটি বিষয় সর্বাগ্রে উল্লেখ্য। প্রথম কথা হলো, প্রথম মহাযুদ্ধের পরে তার অভিঘাতে ইয়োরোপের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে এক ব্যাপক রূপান্তর লক্ষ্য করা যায়। এই সূত্রে *গার্থনহার্ডি* লিখেছেন যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইয়োরোপের অনেক দেশেই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার দ্রুত পতন ঘটে। তাঁর ভাষায় 'গণতন্ত্রে মড়ক'। কথাটি ঠিক, কারণ ইতালি, জার্মানি, স্পেন, পর্তুগাল, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, পোল্যাণ্ড, গ্রিস, বুলগেরিয়া প্রমুখ অনেক দেশেই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পতন ঐ সময় লক্ষ্যণীয়। অনেক দেশেই একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। গণতান্ত্রিক সরকার, সংসদীয় ব্যবস্থা ইত্যাদি অবশ্য ব্রিটেন, ফ্রান্স, প্রমুখ দেশে টিকে ছিল। যাইহোক, একনায়কতন্ত্রী শাসকদের মধ্যে ইতালির বেনিতো মুসোলিনি, জার্মানির অ্যাডলফ্ হিটলার এবং স্পেনের জেনারেল ফ্রাঙ্কোর উদাহরণ দেওয়া যায়। মনে রাখা দরকার এদের সকলেই নিজেদের সর্বোচ্চ ক্ষমতাবান একনায়ক বলে মনে করতেন এবং তা ঘোষণাও করেছিলেন। এই জন্য মুসোলিনিকে বলা হত 'ইলডুচে', হিটলারকে 'ফুয়েরার' এবং ফ্রাঙ্কোকে *'কডিলো'*। তাদের শাসনাধীন সরকারে জনগণের কোনও ভূমিকা ছিল না। দ্বিতীয় কথা হলো, ফ্যাসিবাদী দলের উত্থানের আগে ইতালির অবস্থা একটু বিশদভাবে ভূমিকাস্বরূপ জেনে নেওয়া দরকার। কারণ এই পটভূমিকা না জানলে ফ্যাসিবাদের উত্থানের কারণগুলি সম্যকভাবে বোঝা যাবে না। ইতালির ভৌগোলিক

অবস্থানও একটু জানা দরকার। কারণ ইতালির ভৌগোলিক পরিস্থিতির সঙ্গে তার আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রনীতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ইতালির মূল ভূখণ্ড টি হল একটি সংকীর্ণ উপদ্বীপ। তার অনেকাংশ জুড়ে ভূমধ্যসাগর। বলা হয়ে থাকে যে, ইতালি 'is a prisoner of the mediteranean' অর্থাৎ ভূমধ্যসাগরের হাতে বন্দী। কথাটির তাৎপর্য এই যে, ইয়োরোপের অন্য অনেক দেশের চেয়ে ভূমধ্যসাগরে ইতালির স্বার্থ অনেক বেশি। এই কারণেই বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে মধ্য ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলির চেয়ে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করা ইতালির পক্ষে সুবিধাজনক ও স্বার্থের অনুকূল। শুধু সামরিক কারণ নয়, বাণিজ্যিক কারণেও ভূমধ্যসাগর এবং অ্যাড্রিয়াটিক সাগরে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ইতালির পক্ষে বেশি দরকারী। অপরপক্ষে ভূমধ্যসাগরে শত্রুপক্ষের উপস্থিতি তার বিপদের কারণ। ইতালি অ্যাটলান্টিক এবং সুয়েজ খালের মধ্যে দিয়ে ভারত মহাসাগরে যোগাযোগ চাইত।

ইতালির লোক সংখ্যাও ছিল প্রচুর। এই জনসংখ্যার এক অংশ ইতালির উপনিবেশগুলিতে চলে যেত। আবার প্রাকৃতিক সম্পদের অপ্রতুলতার কারণে ইতালিকে অন্য দেশের রপ্তানির উপর নির্ভর করতে হত। প্রাকৃতিক সম্পদ কম থাকায় তার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বা সামরিক শক্তিবৃদ্ধি করা কঠিন ছিল। এ ব্যাপারে ইতালি ভূমধ্যসাগরের উপর নির্ভরশীল কেননা উত্তরে আল্পস্ ডিঙিয়ে বাণিজ্য করা ব্যয়বহুল তাই আভ্যন্তরীণ সমস্যা মেটানোর কারণে ইতালির ফ্যাসিস্ট সরকার আগ্রাসী পররাষ্ট্র নীতি গ্রহণ করেছিল।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ইতালি ছিল একটি ভৌগোলিক সংজ্ঞা মাত্র। সমগ্র দেশটি ছিল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন নানা রাষ্ট্রে বিভক্ত। ঐ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পিয়েডমণ্ট সার্দিনিয়ার রাজা ভিক্তর ইমানুয়েলের নেতৃত্বে ম্যাৎসিনি, কাউন্ট কাভুর ও গ্যারিবল্দির সহায়তায় ঐক্যবদ্ধ ইতালির আবির্ভাব সম্ভব হলো (1870)। এরপর থেকে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নানা সমস্যার ভিতর দিয়ে ইতালিকে চলতে হলো। প্রথম মহাযুদ্ধের সূচনাতে ইতালি ছিল কিছুদিনের জন্য নিরপেক্ষ। পরে অস্ট্রিয়া অধিকৃত ইতালির অঞ্চল এবং হাঙ্গেরির কিছু অংশ ও ভূমধ্যসাগরীয় অন্যান্য দ্বীপাঞ্চলগুলি পাওয়ার আশায় শেষ পর্যন্ত ইতালি মিত্রপক্ষে যোগদান করল। ইতালি 1882 খ্রিস্টাব্দে জার্মানি এবং অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যোগ দিয়ে সুপরিচিত 'ট্রিপল্ অ্যালায়েন্স' গঠন করেছিল। বিসমার্কের জোট রাজনীতির অংশিদার ছিল ইতালি। পরে জার্মানির কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের আগ্রাসী পররাষ্ট্রনীতির ফলে উদ্ভূত পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এবং বলকান সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করায় ইতালি ট্রিপল্ অ্যালায়েন্স বা ত্রিপাক্ষিক মৈত্রী ত্যাগ করেছিল। বিশ্বযুদ্ধে কিছু কাল নিরপেক্ষ থাকার পর ইতালি ফ্রান্স ব্রিটেন প্রমুখ দেশের সঙ্গে অর্থাৎ মিত্রপক্ষে যোগ দেয়। যুদ্ধের সময় একমাত্র অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ইতালি অস্ত্র ধারণ করল। যুদ্ধের পর শান্তি বৈঠকে (1918) ইতালির প্রধানমন্ত্রী ভিক্তর অর্ল্যান্ডো আড্রিয়াতিক সাগরের পূর্বতীরে অর্থাৎ বলকান অঞ্চলে যতটা সম্ভব

অঞ্চল অধিকারের দাবি জানালেন। কিন্তু তাঁকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উইলসন ও ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেশোঁর নিকট তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হলো। শেষ পর্যন্ত অর্ল্যান্ডো শান্তি বৈঠক ত্যাগ করতে বাধ্য হন। অবশ্য সেন্ট জার্মেইন ও ট্রিয়ানন-এর সন্ধি অনুসারে অস্ট্রিয়ার দক্ষিণে টাইরল, ট্রিনটিনো, ট্রিয়েস্ট, ইস্ট্রিয়া ও ডালমেশিয়া অঞ্চলগুলি ইতালিকে দিতে বাধ্য হলো অস্ট্রিয়া। কিন্তু আড্রিয়াতিক উপকূলের ফিউম (Fiume) ও আলবেনিয়া প্রাপ্তির ব্যপারে ইতালি বঞ্চিত হলো। অথচ অর্ল্যান্ডো ছিলেন শান্তি বৈঠকের অন্যতম কর্তা। এই বৈঠকে ইতালি মিত্রপক্ষে থেকেও সর্বাধিক বঞ্চিত হলো। ভার্সাই সন্ধি ইতালিয়দের জাতীয়তাবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে পারল না। ইতালির তৎকালীন সরকারের বিরুদ্ধে দেশবাসী বিক্ষুব্ধ হলো, সেই অসন্তোষ মিত্রশক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ারূপে দেখা দিল। ঠিক সেই সময় ইতালিতে মহাযুদ্ধের কুফলগুলি প্রকট হয়ে উঠল। যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক সঙ্কটে সর্বত্র এলো আর্থিক মন্দা, প্রয়োজনীয় শিল্প-সামগ্রীর স্বল্পতা, বেকার সমস্যা, খাদ্যাভাব, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ইত্যাদি। সমাজতান্ত্রিক মতবাদে বিশ্বাসী শ্রমিকরা কারখানা থেকে মালিক ও কর্মকর্তাদের বিতারিত করে কারখানা দখল করতে শুরু করল। সর্বত্র দেখা দিল চরম অরাজকতা।[1] দেশের এই চরম দুর্যোগময় মুহূর্তে ইতালিতে আবিভূর্ত হলেন বেনিতো মুসোলিনি নামক একজন নেতা।

২। ফ্যাসিবাদের উত্থানের কারণ

1870 খ্রিস্টাব্দে ইতালি, ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়-সেডানের যুদ্ধের পরে, ঐক্যবদ্ধ হলেও তার আভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলি মেটেনি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দিয়েও এবং পরে শান্তি সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেও ইতালি আশাহত হয়। এই আভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধান না হওয়া, আন্তর্জাতিক হতাশার এবং সর্বোপরি এক অর্থনৈতিক সঙ্কটই ইতালিতে ফ্যাসিবাদের উত্থানের পথ প্রশস্ত করে। এই সূত্রগুলিকে আরও সম্প্রসারিত করা দরকার।

(i) ইতালি ঐক্যবদ্ধ হলেও দেশের সর্বত্র অর্থনৈতিক সমতা ছিল না। উত্তর ইতালি ছিল শিল্পে অগ্রসর এবং মোটামুটি স্বচ্ছল, কিন্তু দক্ষিণ ইতালি ছিল কৃষি প্রধান এবং দরিদ্র। 1870 খ্রিস্টাব্দের পর কোনও সরকার দক্ষিণ ইতালিকে উন্নত করার উদ্যোগ না নেওয়াতে দক্ষিণের লোকেরা বিক্ষুব্ধ ছিল। দক্ষিণ ইতালিতে অসামাজিক কার্যকলাপ চলত যাকে ইতালিয় ভাষায় বলা হত মাফিয়া।

(ii) আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইতালির প্রাকৃতিক সম্পদ ছিল অপ্রতুল। কয়লা এবং লোহার জন্য তাকে পর-নির্ভরশীল হতে হয়েছিল। বৈদেশিক বাণিজ্যের কারণে

---

1. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্র. এ. জে. হোয়াইট, *দ্য এভোলিউশন অফ মডার্ন ইতালি* (1944) এবং ডি. ম্যাক স্মিথ. *ইতালি আ মডার্ন হিস্ট্রি* (1967)। এবং ক্রিস্টোফার সেটন-ওয়াটসন, *ইতালি ফ্রম লিবারালিজম টু ফ্যাসিজম* (1967)।

তাকে ভূমধ্যসাগরের আধিপত্য বজায় রাখা এবং জিব্রাল্টার, সুয়েজ, দার্দানেলিস ব্যবহার করা এবং উপনিবেশ বাড়ানো জরুরি ছিল।

(iii) ইতালি যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দিয়েছিল তখন ক্যাথলিক দল এবং সমাজতন্ত্রী দল তার বিরোধিতা করলেও উদারতন্ত্রী দল তা অগ্রাহ্য করে যুদ্ধে যোগ দেয়। কিন্তু যুদ্ধের পর প্যারিসের শান্তিবৈঠক থেকে শূন্য হাতে ফেরায় ইতালিবাসীদের মনে হতাশা দেখা দেয়।

(iv) প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইতালি যোগ দিয়েছিল জার্মান ভীতিতে নয়, কিছু রাজ্য পাওয়ার আশায় অথচ ঐ যুদ্ধে তার সাত লক্ষ সৈন্য নিহত এবং বারো লক্ষ্য সৈন্য আহত হয়। তাদের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ছিল 1200 কোটি ডলার। প্যারিস শান্তি সম্মেলনে অর্ল্যান্ডো নামেই ছিল Big Four এর একজন, কার্যত তিন প্রধানই সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত। তার চাইতে বড়ো কথা হলো, ইতালি কিছু রাজ্যাংশ পেলেও তার বহু আকাঙ্ক্ষিত অ্যাড্রিয়াটিক সাগরের উপকূলে অবস্থিত ফিউম বন্দর ও আলবেনিয়া পায়নি। যুদ্ধোত্তর ইতালিবাসীরা তাই সরকারের প্রতি বীতস্পৃহ হয়ে ওঠে।

(v) ভার্সাই সন্ধির প্রতিও ইতালিবাসীরা বিরাগ পোষণ করত। কারণ ঐ সন্ধি তাদের কাঙ্ক্ষিত ফিউম বন্দর তো দেয়নি, এমনকি যুদ্ধের সময় ইতালির সেনাবাহিনী আলবেনিয়াতে ঢুকে সেখানে আধিপত্য বিস্তার করলেও পরে মিত্রপক্ষের চাপে ইতালিকে আলবেনিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করে নিতে হয়েছিল। পূর্ব ভূমধ্যসাগরে গ্রিস অনেক ভূখণ্ড পেলেও ইতালি কিছু পায়নি। অফ্রিকায় জার্মান উপনিবেশগুলির অংশও ইতালি পায় নি, তা গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং বেলজিয়াম ভাগ করে নিয়েছিল। আর ফিউম না পাওয়া সত্ত্বেও ইতালির সরকার যখন 'র‍্যাপোলোর সন্ধি (1920) দ্বারা ফিউমের স্বাধীনতা স্বীকার করে নিল তখন জনগণ দুর্বল সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ জানায়।

(vi) রাজ্যলাভের নিরাশা ও বিদেশী ব্যাপারে অপমান ইতালির জনগণকে যেমন মর্মাহত করে, তেমনি দেশের বিরোধী দলগুলিও নেতিবাচক মনোভাব নিয়েছিল। জাতিকে সংকট থেকে মুক্তি করার বদলে তারা সরকারকে অপদস্থ করতে অধিক আগ্রহী ছিল।

(vii) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইতালিতে দারুণ অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দেয়। বেকারি, মন্দা, দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি, মজুরি হ্রাস এবং উৎপাদনে ঘাটতি দেশের এমন এক জায়গায় চলে যায় যে তা সমাধান করা কঠিন হয়ে পড়ে। এর ফলে দাঙ্গা ও ধর্মঘট বাড়তে থাকে।

(viii) সমস্যা সমাধানে উদারপন্থী সরকারের ব্যর্থতার ফলে দেশের মধ্যে সমাজতন্ত্রের প্রতি আকর্ষণ বাড়তে থাকে বিশেষত শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর মধ্যে কমিউনিস্ট প্রভাব বৃদ্ধি পায়। এই সাম্যবাদী প্রচারের তাৎপর্য না বুঝে কিছু মানুষকে ভুল পথে নিয়ে যাওয়া অরাজকতার সৃষ্টি করে।

(ix) ক্রমে ইতালির সরকারের প্রতি নানা শ্রেণীর মানুষের আস্থা কমে যেতে থাকে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্বেগ বাড়ে। সমাজতন্ত্রের প্রসারে, বিশেষত উগ্র সমাজতন্ত্রীদের কার্য কলাপে, দাঙ্গা ও নৈরাজ্যে তারা হতাশ হন। অপরপক্ষে বুর্জোয়া ও শিল্পপতিগণ ক্রমাগত ধর্মঘটে উদ্বিগ্ন হন। ভূস্বামী শ্রেণীও বিপন্ন বোধ করে।

(x) এই পরিস্থিতিতে দেশের উদারপন্থী সরকারি ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। অধ্যাপক লিপসনের ভাষায় দেশ 'সম্পূর্ণ নৈরাজ্যের দিকে' (to complete anarchy) চলে যায়। 1919 খ্রিস্টাব্দ থেকে 1922 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ছ'টি মন্ত্রিসভা এসেছে আবার ভেঙ্গে গেছে, অবস্থার পরিবর্তন হয় নি। উদারতন্ত্রী দলের নিত্তি বা জিউলিনির মতন নেতারা ব্যর্থ হওয়াতেই ইতালিবাসীর সামনে দুটি পথ খোলা ছিল, হয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব নতুবা একনায়কতন্ত্র।

এই জাতীয় সংকট থেকে মুক্তির পন্থা নিয়েই মুসোলিনির ফ্যাসিস্ট দল ক্ষমতাসীন হয়। ফ্যাসিবাদীরা মনে করত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিপর্যয় এবং হতাশার ফলেই জনগণ তাদের পক্ষে গিয়েছিল। ইতালি ঐতিহাসিক সালভেমিনি অবশ্য ইতালির অতখানি নৈরাশ্যব্যঞ্জক অবস্থা মানেননি, তবু মুসোলিনির উত্থানের পিছনে উপযুক্ত কারণগুলি পটভূমি হিসাবে অস্বীকার করা যায় না।

৩। বেনিতো মুসোলিনি এবং ফ্যাসিস্ট দলের উত্থান

বেনিতো মুসোলিনি বলপূর্বক ক্ষমতা দখল করেন 1922 খ্রিস্টাব্দে। তিনি ফ্যাসিস্ট দল গঠন করেন 1918 খ্রিস্টাব্দে। প্রথমে যুদ্ধফেরৎ বেকার সেনানী এবং কর্মহীন যুবকদের নিয়ে এক আধা সামরিক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করেছিলেন। সেই বাহিনীর নাম ছিল 'ফ্যাসিস্ট'। এই শব্দটি এসেছে ল্যাটিন ফ্যাসেস (Fasces) শব্দ থেকে যার মানে হলো বল বা শক্তি। ইতালির মিলানের 'ফ্যাসিত' নামে এক সংগঠন ছিল। মুসোলিনি তার আদলেই নিজের দলকে গড়ে তোলেন। ফ্যাসিস্ট শব্দের দ্বারা তিনি বোঝাতে চান যে শক্তির সাহায্যে সরকার চলাতেই তিনি মনস্থ করেছেন। অর্থাৎ গোড়া থেকেই তার মত ও আদর্শ জবরদস্তিমূলক এবং অগণতান্ত্রিক পথে চলার। এই সঙ্গে তিনি দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এবং বামপন্থী সমাজবাদী শক্তির হাত থেকে ইতালিকে রক্ষা করার কথা বলেন। তাঁর মতে ফ্যাসিস্ট দলের উদ্দেশ্য দলবিহীন জাতীয় আন্দোলন। তীব্র কমিউনিস্ট বিরোধী মুসোলিনি ঘোষণা করেন যে অরাজকতা ও জাতীয় আন্দোলন থেকে তিনি ইতালিকে রক্ষা করবেন। সেই সময় ইতালিতে নানা শ্রেণীর মানুষদের মনে হতাশা ছিল, বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী কালে শান্তি সম্মেলনে ইতালি নিরাশ হয়েছিল এবং দেশ অর্থনৈতিক সঙ্কটে পড়েছিল। এই দুর্বলতা দূর করতে হবে বলপূর্বক শক্তিশালী সরকার গঠন করে, এই মতাদর্শ নিয়ে চরম স্বৈরাচারী মুসোলিনি বিংশ শতাব্দীর কুড়ির দশকে তার দলের উত্থান ঘটিয়েছিলেন।

বেনিতো মুসোলিনি 1883 খ্রিস্টাব্দে উত্তর ইতালির রোমানা নামক স্থানে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী এক কর্মকারের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। মুসোলিনির মা ছিলেন শিক্ষয়িত্রী। শিক্ষার প্রয়োজনে তিনি সুইটজারল্যাণ্ডের লুসান ও জেনিভা যান। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি রাজনীতিতে অংশ নেন ও একটি সমাজতান্ত্রিক পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সুইটজারল্যাণ্ডে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনেও যোগ দেন। কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক কাজকর্ম সুইটজারল্যাণ্ড সরকারের মনঃপুত হয়নি। তাই তাঁকে জেনিভা থেকে ইতালিতে ফিরে আসতে হলো।

ইতালিতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পুরোদমে বিপ্লবী তৎপরতা চালাতে থাকেন। ইতোমধ্যে শুরু হলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (1914)। ইতালির সমাজতন্ত্রীদল ছিল যুদ্ধ বিরোধী। কিন্তু মুসোলিনী সমসাময়িক আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে ইতালির ভাবী লাভ-লোকসানের কথা চিন্তা করে যুদ্ধের পক্ষে মতামত প্রচার করতে শুরু করলেন। 1915 খ্রিস্টাব্দে ইতালি যুদ্ধে মিত্রপক্ষে যোগদান করল। মুসোলিনি নিজেও সৈনিক হিসেবে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করলেন। যুদ্ধে কিঞ্চিৎ আঘাত পাওয়ায় তিনি সৈনিক বৃত্তি ত্যাগ করে গভীরভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করলেন। এই সময় তিনি একটি জাতীয় পত্রিকার সম্পাদনা করতেন।

বস্তুতপক্ষে সুইটজারল্যাণ্ড থেকে ইতালিতে ফিরে এসেই মুসোলিনি বিপ্লবী কাজকর্ম শুরু করেছিলেন। ইতালি যখন 1911 খ্রিঃ ট্রিপোলি দখলের জন্য সৈন্য পাঠান তখন মুসোলিনি প্রকাশ্যভাবে তার বিরোধিতা করার জন্য কারাদণ্ড ভোগ করেন। মুক্ত হওয়া (1922খ্রিঃ) থেকে তিনি Avanti নামে একটি সমাজতান্ত্রিক পত্রিকার সম্পাদক হন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের গোড়ার দিকে ইতালির নিরপেক্ষ থাকাই উচিত বলে তিনি মনে করতেন। পরে ইতালির স্বার্থের কথা বিবেচনা করে যুদ্ধে যোগ দেওয়ার পক্ষপাতী হন। সমাজতান্ত্রিক দল যুদ্ধে যোগদানের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাই দলের সঙ্গে তাঁর মতভেদ হলো এবং তাকে পত্রিকার সম্পাদক থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো। তখন মুসোলিনি স্বয়ং যুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠনের জন্য Il Popolo d' Italia নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করতে শুরু করেন। তারপর স্বয়ং যুদ্ধে গেলেন, আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে ফিরে এলেন এবং সরকারের সহায়তায় পুনরায় নিজের কাজ শুরু করলেন।

যুদ্ধান্তে শুরু হলো ইতালির সর্বত্র অর্থনৈতিক সঙ্কট ও শাসনতান্ত্রিক অরাজকতা। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি গঠন করলেন একদল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী এবং 1919 খ্রিস্টাব্দে তিনি তাদের সামনে রাখলেন এক বৈপ্লবিক কর্মসূচি। এই বিপ্লবাত্মক কর্মের তালিকাটি তিনি দলীয় স্বেচ্ছাসেবক ছাড়াও সৈনিক ও সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরলেন। মুসোলিনীর রচনা ও বক্তৃতায় দেশের যুবকরা আশার আলো দেখতে পেল। তাদের নিয়ে তিনি গঠন করলেন একটি রাজনৈতিক দল। তাদের ঐক্যের প্রতীক ছিল 'ফ্যাসিস' অর্থাৎ দড়ি বাঁধা কাষ্ঠদণ্ড। প্রাচীন রোমেও রাজশক্তির প্রতীক ছিল এই 'ফ্যাসিস'। ঐতিহাসিকদের

মতে প্রাচীন ঐতিহ্যকে সম্মান জানানোর উদ্দেশে মুসোলিনি নিজের স্বেচ্ছাসেবকদের এই প্রতীক ব্যবহারের নির্দেশ দেন। তাই তার স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নাম হল 'ফ্যাসিস্ট' (Fascist) বা ফ্যাসিবাদী দল। মুসোলিনীর কথায় ও পরিকল্পনায় পুঁজিপতি, মধ্যবিত্ত, অধ্যাপক ও ছাত্র-সমাজ দেশের অরাজক অবস্থার মোকাবিলার জন্য একটা শক্তিশালী সরকার গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল। তাই তাঁরাও এই ফ্যাসিস্ট বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করল।

মুসোলিনীও তাঁর দলীয় যুবকদের সামরিক শৃঙ্খলা ও কসরৎ শেখালেন। অচিরে ফ্যাসিস্টদের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিকদের বিবাদ ঘনীভূত হলো। 1919 খ্রিস্টাব্দে প্রথমে প্রাক্তন সেনানীদের নিয়ে মুসোলিনি ফ্যাসিস্ট দল গড়লেও ক্রমে নানাস্তরের মানুষ তাতে যোগ দেয়। ইতালির শাসনব্যবস্থা তখন ভেঙে পড়ার মুখে। ফ্যাসিস্ট দল আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার পক্ষপাতী ছিল, অরাজকতা ও ধর্মঘট বরদাস্ত করত না। দেশে যেখানেই ধর্মঘট এমনকি সভা-সমিতি পর্যন্ত ফ্যাসিস্টরা বলপূর্বক দমনের পন্থা নেয়। সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্টদের সঙ্গে তাদের খণ্ডযুদ্ধ চলে। আক্রমণাত্মক এই নীতি 'Squadrism' নামে পরিচিত ছিল। 1920 খ্রিস্টাব্দে ইতালির শিল্পাঞ্চলগুলিতে ধর্মঘট ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। সমাজতন্ত্রীরা রাশিয়ার মতন বিপ্লবী সরকার কামনা করতেন। কমিউনিস্ট-বিরোধী ফ্যাসিস্টগণ এদের বলপূর্বক দমনের দায়িত্ব নেন। কর্মচ্যুত সৈন্য, বেকার যুবক, জমিদার, শিল্পপতি, বুর্জোয়া, মধ্যবিত্ত সকলের কাছে মুসোলিনি হয়ে ওঠেন মুক্তিদাতা। মনে রাখতে হবে যে, যুদ্ধের পর ইতালির শাসনভার প্রথমে নিত্তি এবং পরে গিওলিনির অধীনে থাকলেও তারা দেশের অরাজকতা দুর করতে ব্যর্থ হন। সুতরাং দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনার ফ্যাসিবাদী পন্থা জনগণ সমর্থন করে। ফ্যাসিস্টদের অত্যাচারে অন্যান্য দল বিলুপ্ত হলো। অবশেষে 1922 খ্রিস্টাব্দের ফ্যাসিস্টরা দলে দলে মুসোলিনীর নেতৃত্বে রোমের দিকে অভিযান শুরু করল। তখন ইতালির রাজা ছিলেন ভিক্তর তৃতীয় ইমানুয়েল। ফ্যাসিস্ট আক্রমণে প্রথমেই তিনি ভীত ও সন্ত্রস্ত হলেন। 1921 খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে ফ্যাসিস্ট দল আইন সভায় আসন পেয়েছিল মাত্র 31-টি। 1922 খ্রিস্টাব্দের 28 অক্টোবর মুসোলিনীর বাহিনী রোম দখল করল। মুসোলিনির ফ্যাসিস্ট দল কালো পোষাক পরত এবং সামরিক কুচকাওয়াজ করত। সামরিক কুচকাওয়াজের ফলেই ফ্যাসিস্ট দলের সদস্যগণ সৈনিক সুলভ ও যুদ্ধ মনোবৃত্তি বৃদ্ধি করে ফেলে। এরপর ক্রমে তারা বিরোধী নেতৃবৃন্দকে হত্যা করতে থাকে, বিরোধীদের সভা সমিতি ভেঙে দেয়। সরকার মুসোলিনিকে মন্ত্রিসভায় যোগদান করতে আহ্বান জানালেও তিনি অস্বীকৃত হন। 1921 -এর নির্বাচনে দেখা যায় তারা খুব বেশি আসন পান নি। তবু 1922 -এর 28 অক্টোবর ফ্যাসিস্ট বাহিনী রোম দখল করলেন এবং রাজা ভিক্টর তৃতীয় ইমানুয়েল তাকেই মন্ত্রিসভা গঠন করতে ডাকলে তিনি 30 অক্টোবর মন্ত্রিসভা গঠন করেন। *রাইকার লিখেছেন*, জনসমর্থন না থাকলে ফ্যাসিবাদের

উত্থান সম্ভব ছিল না। ঠিকই যে মুসোলিনি যখন শাসনভার গ্রহণ করলেন তখন জাতির এক বড়ো অংশের সমর্থন ছিল। শেষপর্যন্ত বৈধ মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করতে বাধ্য হলো। রাজা ভিক্টর তৃতীয় ইমানুয়েল মুসোলিনিকে মন্ত্রীপদে বসালেন। অচিরেই মুসোলিনি জরুরি ক্ষমতা প্রয়োগ করে সরকারের বিভিন্ন দফতর নিজ নিয়ন্ত্রণে আনেন, আইন সভায় বিরোধীদের ধ্বংস করেন এবং গুপ্ত হত্যার দ্বারা প্রধান বিরোধী নেতাদের নিশ্চিহ্ন করেন। এই ধরনের সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে মুসোলিনি ইতালিতে ক্ষমতা দখল করেন। 1924 খ্রিস্টাব্দে যে নির্বাচন হয় তাতে অন্য দল বিশেষ জনসমর্থন পায়নি; ফ্যাসিস্ট দল বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। এরপর গৃহীত হলো এক নতুন সংবিধান (1926 খ্রিঃ)। নতুন সংবিধান অনুসারে মুসোলিনির নেতৃত্বে ইতালিতে ফ্যাসিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হলো। তিনি হলেন সর্বাধিনায়ক, তার উপাধি হল 'ডুচে' (Duce)।[1]

অচিরেই ফ্যাসিবাদী দল সমস্ত বিরোধী দলগুলিকে কঠোর হাতে দমন করে, দেশের সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কেড়ে নেয়, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির বিলোপ সাধন করে, নির্বাচন সংক্রান্ত আইনগুলি ফ্যাসিস্ট দলের অনুকূলে প্রণয়ন করে। চেম্বার অফ ডেপুটিস নামক প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানটিও উঠিয়ে দেয় এবং বাইশটি পৌর প্রতিষ্ঠানের এক কাউন্সিল গঠন করে। মুসোলিনির নেতৃত্বে একদলের একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসোলিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন যে, সরকারের উদ্দেশ্য হবে আভ্যন্তরীণ আইন শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানো এবং পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে ইতালির মর্যাদা বৃদ্ধি করা। 1924 -এর নির্বাচনে তিনি অসদুপায়ে ভোটদাতাদের ভীতি প্রদর্শন করেছিলেন। 1926 -এর সংবিধান একনায়কতন্ত্রের কুখ্যাত দলিল। মুসোলিনি ঘোষণা করেন যে, "দেশের সবকিছুই হবে রাষ্ট্রের অন্তর্গত; রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোনও কিছুই থাকবে না, রাষ্ট্রের বাইরে কোনও কিছু সহ্য করা হবে না।"

ফ্যাসিবাদের মূল সূত্র : মুসোলিনি বা তাঁর দার্শনিক বন্ধু জিওভানি প্রমুখের মস্তিষ্কপ্রসূত 'ফ্যাসিবাদ' ছিল ইতালির সামাজিক অবক্ষয়ের যুগে এক রাজনৈতিক ব্যাভিচার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ইতালিয়দের চিন্তা বৈকল্য, রাজনৈতিক দলাদলি, তথাকথিত উদারপন্থী সরকারগুলির দুর্বলতা, অর্থনৈতিক দুর্বলতা, রাজার মেরুদণ্ডহীনতা, উগ্র বামপন্থী হঠকারিতা ইত্যাদির মধ্যে এই মতবাদের সৃষ্টি হয়। এটি ছিল মূলত নেতিবাচক আদর্শ। গণতন্ত্র, প্রশাসনে জনমতের প্রতিফলন কিংবা সমাজতন্ত্রের বিরোধিতা, বস্তুত সর্বপ্রকার বিরোধী মতামতের কণ্ঠরোধই ছিল এর লক্ষ্য। মুসোলিনি মনে করতেন, ফ্যাসিবাদের মূলকথা হলো রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বল বা শক্তির দ্বারা এবং তা রক্ষাও করতে হবে শক্তির দ্বারাই। ব্যক্তির কোনও ভূমিকা নেই, গণতন্ত্র বা উদারতন্ত্র সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি

---

1. ইতালিয় ঐতিহাসিক জি. সালভেমিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন তাঁর *আণ্ডার দ্য এক্স অফ ফ্যাসিজম্‌* গ্রন্থে (1936)।

করে, সুতরাং ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ এক ভ্রান্ত জিনিস। যে সরকার ভোট দ্বারা গঠিত তা সমস্যা সমাধানে অক্ষম। সুতরাং নির্বাচন নয়, নির্ভর করতে হবে শক্তির উপর।

কর্তৃত্ববাদী এই তত্ত্ব মানুষের অধিকার এবং মতামত প্রকাশে বিশ্বাস করত না। নিজেদের মত রাষ্ট্রের নামে সকলের উপর চাপিয়ে দিত। এর মূলমন্ত্র ছিল, 'শক্তি, সাহস, আত্মোৎসর্গ, শৃঙ্খলা এবং জয়'। মুসোলিনি বলতেন, 'Every thing in the state, nothing against the state, nothing outside the State'। বেনেদিতো ক্রোচের মতে, একটি ভিত্তিহীন সংস্কৃতি গঠনের বন্ধ্যা মানসিকতার প্রয়াস তৈরি হয়েছিল নানা ভাবধারার মধ্য দিয়ে। রাষ্ট্র, জাতি ও সমাজ অভিন্ন বলে ফ্যাসিবাদীরা মনে করত।

ফ্যাসিবাদের লক্ষ্য ছিল রাষ্ট্রের মর্যাদা বৃদ্ধি করা, ব্যক্তিগত ধন-সম্পত্তি রক্ষা করা এবং ইতালিকে বিশ্বরাষ্ট্রে উন্নীত করার উপযোগী বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করা। প্রথম দিকে তারা শৃঙ্খলার কথা বললেও পরে একনায়ক বা ডিক্টেটরের কথা মত চলাই কর্তব্য বলে মনে করত। তবে *এফ. স্যাবোড* তাঁর 'আ হিস্ট্রি অফ ইটালিয়ান ফ্যাসিজিম' বইতে দেখিয়েছেন যে, মুসোলিনির সবই নেতিবাচক বলা ভুল। তাঁর রাজনৈতিক কর্মদক্ষতা ছিল, বক্তৃতা দিয়ে জনগণকে মোহিত করতে পারতেন এবং দেশের দুর্বলতা দূর করার ক্ষেত্রে তাঁর পন্থাই জনগণের কাছে উপযুক্ত মনে হয়েছিল। *জে. এ. এস গ্রেনভিল* অবশ্য মনে করেন যে, রাজা যদি শক্ত থাকতেন তাহলে ভীতি প্রদর্শন সত্ত্বেও 1922 খ্রিঃ রোম দখল করতে গেলে ফ্যাসিস্ট বাহিনীর পক্ষে ইতালিয় সেনাবাহিনীকে হারান অত সহজ ছিল না। যাই হোক, ফ্যাসিবাদ একবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে তার মূলসূত্র দাড়াল—রাষ্ট্রপুঞ্জ, একনায়কের হাতে সমস্ত ক্ষমতা তুলে দেওয়া, যুদ্ধের আয়োজন এবং আগ্রাসী পররাষ্ট্রনীতি।

৪। মুসোলিনির আভ্যন্তরীণ নীতি

মাত্র চার বছরের মধ্যে মুসোলিনি ইতালিতে ক্ষমতা দখল করেছিলেন। ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েই তিনি আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন। 1919 খ্রিস্টাব্দের 23 মার্চ ইতালির মিলান শহরে এক সম্মেলন থেকেই ফ্যাসিবাদী আন্দোলনের সূচনা। ঐ সম্মেলনে এক বিপ্লবী কর্মপন্থা নেওয়া হয়েছিল যাতে সমাজের প্রত্যেক স্তর থেকে সংখ্যানুপাতে প্রতিনিধি পাঠানো, শ্রমিকদের দৈনিক আট ঘণ্টা শ্রম, উত্তরাধিকার কর, মূলধনীদের উপর কর, চার্চের সম্পত্তি অধিগ্রহণ, সেনেটের বিলোপ, জাতীয় সভা আহ্বান, অস্ত্রকারখানার জাতীয়করণ, রেলপথ সমেত কোনও কোনও শিল্পে শ্রমিকদের দ্বারা পরিচালনা ইত্যাদির কথা বলা হয়েছিল। তবু 1919-এর নির্বাচনে ফ্যাসিস্ট দল একটি আসনও পায়নি। তবে সমাজতান্ত্রিকদের বিরুদ্ধে ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাস এবং বিশৃঙ্খলাপূর্ণ অবস্থা নিয়ন্ত্রণে সরকারের ব্যর্থতার মধ্যে দিয়েই তারা ক্ষমতায় আসার সুযোগ পায় বলে

মার্ক রসন মন্তব্য করেছেন। 1921-22 খ্রিস্টাব্দে মুসোলিনি দেশভক্তি, শৃঙ্খলা এবং স্থায়ী ও শক্তিশালী সরকার গঠনের উপর জোর দিয়েছিলেন।

1921 এর নির্বাচনে ফ্যাসিস্ট দল 31টি আসনে (অন্য মতে 35টি আসনে) জয়ী হন। তারপরই প্রধানমন্ত্রী ফ্যান্টা তাকে মন্ত্রিসভায় যোগদানের আহ্বান জানালে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি আকস্মিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সম্পূর্ণ ক্ষমতা নিজের হাতে নেওয়ার কথা ভাবেন। তদনুযায়ী তিরিশ হাজার 'ব্ল্যাকশার্ট' রোম সহ গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলি দখলের পরিকল্পনা করে। প্রধানমন্ত্রী ফ্যাক্টা ইতালির রাজা তৃতীয় ভিক্তর ইমানুয়েলকে ফ্যাসিস্টদের আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্য সেনা মোতায়েন করতে বললেও রাজা ব্যর্থ হন। বরং 1922 এর 28 অক্টোবর মুসোলিনি রোম দখল করলে পরদিন 29 তারিখ তাকেই মন্ত্রিসভা গঠন করতে আহ্বান করেন এবং 30 অক্টোবর মুসোলিনি তাঁর ফ্যাসিস্ট মন্ত্রিসভা গঠন করেন।

এরপর আবার চার বছরের মধ্যে অর্থাৎ 1922 থেকে 1926 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মুসোলিনি ক্রমে প্রধানমন্ত্রী থেকে একনায়কে রূপান্তরিত হন। রাজা নন, ফ্যাসিবাদী একনায়ক তখন সর্বেসর্বা। এই চারবছরের মধ্যে সরকারি প্রশাসন যন্ত্রকে কাজে লাগিয়ে গ্রাম স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত ফ্যাসিস্ট দলের লোকদের প্রধান পদে বসিয়ে, সেনাদল, পুলিশ, প্রশাসন সর্বত্র অনুগত লোক নিয়োগ করে ফ্যাসিস্ট দল আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে নাগরিকদের ধন-সম্পত্তি রক্ষা, শৃঙ্খলা স্থাপন এবং একদলীয় শাসনের ভিত্তি স্থাপন করার দিকে অগ্রসর হন।

শুধু এই কাজ নয়, ক্রমে মুসোলিনি শিল্পনীতি গ্রহণের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটালেন। গম উৎপাদনের ক্ষেত্রে দেশকে স্বয়ম্ভর করার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়। শিক্ষানীতির ব্যাপারেও বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছিল। তবে এ সব কাজ করতে গিয়ে অন্য সব দলকে নির্মূল করে দেওয়া হয়েছিল। মুসোলিনির বক্তব্য উদ্ধৃত করে অধ্যাপক *ল্যাংসাম্* দেখিয়েছেন যে, একচ্ছত্র অধিপতি হতে গিয়ে বেনিতো মুসোলিনি অন্য সব দল ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। ক্ষমতা দখলের পর মুসোলিনি ফ্যাসিস্ট দলের সামনে তুলে ধরা সেই কর্মসূচি রূপায়ণে তৎপর হলেন।

(i) মুসোলিনি রাষ্ট্রের শান্তি-শৃঙ্খলা বিধানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাস-বাহিনীর সাহায্যে বিরুদ্ধবাদীদের হত্যা এবং কর্মরত বিরোধী সরকারি কর্মচারীদের চাকরি থেকে বিচ্যুত করলেন। এইভাবে অল্পদিনের মধ্যে (1926 খ্রিস্টাব্দের পূর্বেই) মুসোলিনি ইতালিতে প্রতিষ্ঠা করলেন একনায়কতন্ত্র। 1922 খ্রিস্টাব্দে মুসোলিনি মন্ত্রিসভা গঠন করেই পার্লামেন্টে বিরোধী দলগুলিকে দমন করার চেষ্টা করলেন। পদচ্যুতি থেকে গোপনে ব্যক্তি হত্যা কিছুই বাদ রইল না। 1924 -এর নির্বাচনে অসদুপায় অবলম্বন করা

হয়েছিল ব্যাপকভাবে। 1926 খ্রিস্টাব্দে ফ্যাসিবাদী সংবিধান গৃহীত হয়ে ইল দুচে মুসোলিনি অরাজকতার সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী কোন দল রাখলেন না।

(ii) 1926 খ্রিস্টাব্দে যে সরকারি বাজেট পাস করা হলো তাতে আয় ব্যয় সমান দেখানো হলো। এরপর থেকে প্রতি বছরই সরকারি আয় উদ্বৃত্ত থাকত। তা সরকারি তহবিলে সঞ্চিত হতে লাগল। এরপর মুসোলিনি অর্থনৈতিক সংস্থারের মনোযোগী হন।

(iii) একনায়কতন্ত্রে মাধ্যমে জোরপূর্বক শৃঙ্খলা স্থাপনের পর মুসোলিনী দেশের আর্থিক উন্নয়নের নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করে। পরিকল্পনা অনুসারে শিল্পোন্নয়নের জন্য অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে এক 'প্রযুক্তি সভা' বা টেকনিকাল বোর্ড গঠন করা হলো। এই বোর্ডের দায়িত্ব ছিল নতুন কলকারখানা স্থাপন এবং পুরাতন কারখানাগুলির সংস্কার বা সম্প্রসারণের বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দেওয়া। এব্যাপারে দীর্ঘকালীন ঋণ দান, জনকল্যাণমুখী সরকারি পরিকল্পনা গ্রহণ, শ্রমিক শ্রেণীর মোট কাজের সময় কমিয়ে দেওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থনৈতিক সংস্কার আরম্ভ হলো।

(iv) শ্রমিকদের নূন্যতম মজুরি স্থির করে দেওয়া হলো। অন্যদিকে জিনিসপত্রের দাম বেঁধে দিয়ে এবং গম, তুলো, তামাক প্রভৃতি কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটিয়ে জনসাধারণের জীবনযাত্রা সহজ করা হলো। বিদেশ থেকে আমদানির প্রয়োজনও কমে গেল। তাছাড়া বিদেশ থেকে আমদানিকৃত খাদ্যদ্রব্যের উপর উচ্চ হারে শুল্ক চাপানো হলো। এর উদ্দেশ্য ছিল যাতে দেশে জমির আবাদ বাড়ে এবং খাদ্যশস্য উৎপন্ন করে দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা যায়।

(v) ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটাবার জন্য সরকারি অনুদান দিয়ে নতুন জাহাজ কোম্পানি খোলা হলো। বলকান অঞ্চল, রাশিয়া এবং অন্য দেশের সঙ্গে সমুদ্র বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো হলো। 1931 খ্রিস্টাব্দে জাহাজ প্রস্তুতির তিনটি কারখানা একসঙ্গে করে এক বিশাল কারখানা গড়ে তোলা হলো। এই কারখানা থেকে তৈরি করা জাহাজগুলি নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে অন্য দেশের জন্যও যুদ্ধ জাহাজ তৈরি করতে লাগলো।

(vi) ইলেকট্রিক ও রেডিও শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি ঘটানো হলো। বিদেশী মোটর গাড়ি আমদানি যাতে কমে যায় সেজন্য উচ্চহারে শুল্ক বসিয়ে দেশী গাড়ি তৈরিকে উৎসাহ যোগানো হলো।

(vii) প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে দেশের জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করার দিকে মুসোলিনি নজর দেন। রাষ্ট্রের সহায়তা পেয়ে শিল্পোন্নয়ন ঘটে, বৈদেশিক বাণিজ্য বাড়ে। তবে এই বৈদেশিক বাণিজ্যের অধিকাংশই ছিল রাষ্ট্রের পরিচালনাধীন। 1929 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ইতালি ইয়োরোপীয় দেশগুলির মধ্যে প্রথম স্থানে এগিয়ে গেল জলাবিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে। ইতালির রেশম, রেয়ন প্রভৃতি শিল্পেও উন্নতি ঘটলো। অনেক পরে 1939 খ্রিস্টাব্দে 'ফ্যাসিস্ট সিণ্ডিক্যালইজম' নামক অর্থনীতি-ভিত্তিক শাসনব্যবস্থা দ্বারা মুসোলিনি

বোঝাতে চেয়েছিলেন যে অর্থনৈতিক উন্নতি হলে জনগণ রাজনৈতিক অধিকার কেড়ে নেওয়াকে খারাপ চোখে দেখবে না।

(viii) একনায়কতন্ত্রে সামরিক শক্তিবৃদ্ধি ছিল সর্বাধিক জরুরি। তাই তিনি প্রথম ফ্যাসিস্ট দলটিকে দেশের সর্বত্র সম্প্রসারিত করলেন। এছাড়া প্রাপ্তবয়স্ক যুবকদেরকে সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করা হলো বাধ্যতামূলক। 'বিশ্বাস, আনুগত্য ও সংগ্রাম'—এই তিনটি নীতি ছিল ফ্যাসিবাদীদের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। আগ্রাসী আভ্যন্তরীণ এবং পররাষ্ট্রনীতির পূর্বশর্তই ছিল শক্তিশালী সেনাবাহিনী গড়ে তোলা। ফ্যাসিবাদী সরকার সে-বিষয়েই গুরুত্ব দিয়েছিল। বস্তুত সেনাবাহিনীর রাজনীতিকরণও এক ফ্যাসিবাদী পন্থা। মুসোলিনি শুধু সামরিক সংস্কার করেন নি। সেনাবিভাগেও তাঁর আনুগত্য ছিল প্রশ্নাতীত।

(ix) মুসোলিনী তৎকালীন ইতালিকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্তির জন্য শিক্ষা খাতে প্রচুর অর্থব্যয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এর জন্য নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল; কিন্তু শিক্ষার মৌলিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল ফ্যাসিবাদী মত ও বিশ্বাসের প্রতি নিষ্ঠাবান ভাবী নাগরিক তৈরি করা। এছাড়া বিচারব্যবস্থা উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য রেখে ফৌজদারী আইনগুলিকে কঠোর করা হলো। বস্তুত স্কুল কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়ে শিক্ষার প্রসার ঘটানোর ক্ষেত্রে মুসোলিনির যে আগ্রহ ছিল তার পিছনেও মূল উদ্দেশ্য ছিল ফ্যাসিবাদের প্রসার ঘটানো এবং ফ্যাসিস্ট সরকারের প্রতি জনসাধারণের আনুগত্য বৃদ্ধি করানো।

(x) মুসোলিনির আভ্যন্তরীণ নীতির আর এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হলো পোপের সঙ্গে মীমাংসা। মনে রাখতে হবে যে, 1870 খ্রিস্টাব্দে ইতালির ঐক্যের প্রয়োজনে রোম দখল করা হলে পোপ মধ্য ইতালিতে তার রাজ্য হারিয়েছিলেন। পোপকে সন্তুষ্ট করার জন্য 1871 খ্রিস্টাব্দে এক আইন পাশ হলেও পোপ নবম পায়াস তা অস্বীকার করেন। ফলে পোপের সঙ্গে ইতালি সরকারের বিবাদ চলে আসছিল। 1926 খ্রিস্টাব্দে মুসোলিনি পোপের সঙ্গে এক মীমাংসায় উপনীত হতে সচেষ্ট হন এবং শেষ পর্যন্ত 1929-এ ল্যাটেরানের সন্ধির দ্বারা তা সম্পন্ন হলো। সাব্যস্ত হলো যে, (ক) পোপ হবেন ভ্যাটিকান রাষ্ট্রে প্রধান এবং তিনি ইতালির সার্বভৌমত্ব মেনে নেবেন (খ) ভ্যাটিকান সরকার নিজস্ব মুদ্রা, ডাকটিকিট, টেলিগ্রাফ ও রেলপথ করতে পারবে। বিদেশী রাষ্ট্রদূত গ্রহণ ও প্রেরণ করতে পারবে এবং পোপ হবেন পবিত্র ও আইনের উর্ধে। চার্চের সমর্থন পেয়ে ফ্যাসিস্ট সরকারের শক্তি আরও বেড়ে যায়।

মুসোলিনি ব্যক্তিগত গণতন্ত্র অথবা ব্যক্তির জন্য রাষ্ট্র—এই মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাই তিনি ব্যক্তি-স্বাধীনতা খর্ব করে সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বলবৎ করেন। মুসোলিনি বিশ্বাস করতেন, "রাষ্ট্রই হবে সকল ক্ষমতার আধার ও উৎস। রাষ্ট্রের বাইরে কিছুই নয়,

রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেও কিছু করা যাবে না।” ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে মুসোলিনি এক আইন দ্বারা তেরোটি সিণ্ডিকেট গঠন করেন। এর মধ্যে ৬টি মালিক শ্রেণীর, ৬টি শ্রমিক শ্রেণীর এবং একটি বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে গঠিত। এই তেরোটি সিন্ডিকেট ডুচের নির্দেশে চলত। আর এক আদেশ বলে ট্রেড ইউনিয়নগুলি ভেঙে দিয়ে শ্রমিক আদালত গঠন করা হয়, যারা শ্রমিক মালিক বিবাদ মীমাংসা করত।

মুসোলিনির আভ্যন্তরীণ সংস্কার ও কার্যাবলী প্রসঙ্গে সুন্দর মন্তব্য করেছেন *কেটেলবি* “মুসোলিনি বেসামরিক ও রাজনৈতিক শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছিলেন, শিল্পকে নিজের পায়ে দাঁড় করিয়েছিলেন, উৎপাদন বাড়িয়েছিলেন, দেশের সাধারণ সম্পদ বৃদ্ধি করেছিলেন, জমির উন্নতি ঘটিয়েছিলেন, জনকল্যাণমূলক নানা কাজ করেছিলেন, সামাজিক কল্যাণে দৃষ্টি দিয়েছিলেন—সব কিছুই করেছিলেন কিন্তু দমনমূলক স্বৈরাচার, জনমত প্রকাশের স্বাধীনতা, সংসদীয় গণতন্ত্র এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতার বিনিময়ে।” অর্থাৎ জনসাধারণ বস্তুগত উন্নতি পেল স্বাধীনতার বিনিময়ে।

৫। মুসোলিনির পররাষ্ট্র নীতি

মুসোলিনির পররাষ্ট্রনীতি ফ্যাসিবাদী মতবাদের দ্বারা পরিচালিত ছিল। ইতালির ফ্যাসিবাদী সরকার ছিল সমর-নীতির মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক। মুসোলিনি বিশ্বাস করতেন যে, সমরনীতি ও সাম্রাজ্যবাদ এবং উপনিবেশ বিস্তার রাষ্ট্রীয় শক্তির পরিচায়ক। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করতে হলে সামরিক শক্তির সহায়তায় বিশ্বে উপনিবেশ বিস্তার করা একান্ত প্রয়োজন। তাই ক্ষমতা হাতে পেয়েই মুসোলিনী দেশটিকে যেন যুদ্ধের কর্মশালায় রূপায়িত করলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রপক্ষে থেকেও ইতালি ছিল সর্বাধিক বঞ্চিত। প্যারিসের শান্তি-সম্মেলনে সিংহভাগ দখল করেছিল ব্রিটেন ও ফ্রান্স। বিশেষ করে ফ্রান্সের বিরোধিতায় শান্তি বৈঠকে ইতালির দাবি নাকচ হয়ে যায়। ফরাসি অধিকৃত টিউনিশিয়া, কর্সিকা, স্যাভয়, নীস প্রভৃতি স্থানগুলিকে ইতালি নিজস্ব বলে দাবি করত। শান্তি বৈঠকে মিত্রপক্ষ এইসব স্থানের উপর ফ্রান্সের কর্তৃত্ব স্বীকার করলে ইতালি ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। ইতালির ইচ্ছা পূরণের ক্ষেত্রে সর্বাধিক বাধা দিয়েছিল ফ্রান্স। আর যুদ্ধের সময় ফ্রান্সের লোকক্ষয় হয়েছিল খুব বেশি। ফ্রান্স সেই অভাব পূরণের জন্যে ইতালি সহ পার্শ্ববর্তী দেশগুলি থেকে নাগরিকদের ফ্রান্সে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্যে উৎসাহিত করত। ফ্যাসিবাদ বিরোধী অধিবাসীরা তাই ইতালি থেকে ফ্রান্সে চলে আসে। এই সব কারণে ইতালির সঙ্গে ফ্রান্সের বিবাদ ঘনীভূত হতে থাকে। সেই অসন্তোষকে মূলধন করে মুসোলিনী পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলেন তাঁর ফ্যাসিবাদ নীতি। শক্তির বিচারে ইতালির পশ্চিম অপেক্ষা পূর্বদিকে ছোট ছোট

রাষ্ট্রগুলি ছিল অধিক দুর্বল। তাই তিনি পূর্বাংশের রাষ্ট্রগুলির উপর প্রতিপত্তি বিস্তারের সংকল্প গ্রহণ করলেন। প্রথমে তিনি মধ্য ও পূর্ব-ইয়োরোপের কোনও কোনও রাষ্ট্রের সঙ্গে সামরিক ও বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদন করলেন। এইভাবে শক্তি সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি আক্রমণাত্মক নীতি প্রয়োগ করতে থাকেন। 1923 খ্রিস্টাব্দে তিনি অধিকার করলেন ডোডেকানিজ দ্বীপপুঞ্জ (Dodecanese Islands)। পরের বছর (1924) যুগোশ্লাভিয়ার অন্তর্গত ফিউম (Fiume) অধিকৃত হলো। ইতালি আগ্রাসী পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করলে ইয়োরোপের অনেকগুলি দেশের সঙ্গে তার সম্পর্কের অবনতি ঘটে। গ্রিসের বিরুদ্ধে ইতালি অভাবনীয় সাফল্য পেয়েছিল। 1920 খ্রিস্টাব্দে ইতালি ও গ্রিসের মধ্যে যে সন্ধি হয়েছিল সেই অনুসারে ইতালি ডোডেকানিজ দ্বীপপুঞ্জ গ্রিসকে দিলেও 1923-এর লুসানের সন্ধিতে তা আবার ফিরে পেয়েছিল। ইতালি সেখানে এক শক্তিশালী নৌঘাঁটি করে। গ্রিস ও আলবেনিয়ার মধ্যে সীমান্ত নির্ধারণের কাজে নিযুক্ত কয়েকজন ইতালির সদস্য আততায়ীর হাতে নিহত হওয়ায় ইতালি এজন্য গ্রিসকে দায়ী করে চরমপত্র দেয়। গ্রিস তা না মানলে কর্ফু (Corfu) দ্বীপ বোমায় বিধ্বস্ত করে দখল করে। লীগ এই বিবাদের মীমাংসা করতে পারেনি, শেষ পর্যন্ত গ্রিস ইতালিকে ক্ষতিপূরণ দিলে ইতালি কর্ফু ত্যাগ করে। *ল্যাংসাম* লিখেছেন যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইতালি ও ফ্রান্সের মধ্যে সম্পর্ক তিক্ত হয়। তার অনেক কারণও ছিল। ইতালির আবি-সিনিয়া দখলের পর এই সম্পর্কর আরও অবনতি হয়। যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে সম্পর্কও ছিল তিক্ত। এর অন্যতম কারণ আলবেনিয়াতে ইতালির প্রভাব বৃদ্ধি এবং শেষপর্যন্ত ইতালি কর্তৃক আলবেনিয়া দখল। স্পেনের অন্তর্বিপ্লবে এবং গৃহযুদ্ধেও ইতালি ফ্রান্সের সঙ্গে হাত মেলায়।

এরপর মুসোলিনী আফ্রিকার দিকে নজর দিলেন। আফ্রিকায় ইতালি-অধিকৃত সোমালিল্যাণ্ড ছিল আবিসিনিয়া বা ইথিওপিয়ার সীমান্তে অবস্থিত। 1934 খ্রিস্টাব্দে ঐ দু'দেশের সীমান্তে নিযুক্ত সৈনিকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। এই অজুহাতে মুসোলিনী 1935 খ্রিস্টাব্দে আবিসিনিয়া আক্রমণ করলেন। তখন আবিসিনিয়ার নরপতি হাইলে সেলাসী (Haile Selassie) বিশ্বসংস্থা লীগ অফ নেশনস্-এর দ্বারস্থ হলেন। লীগ অফ নেশনস্ ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের পরামর্শ মতো ইতালির উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে অর্থনৈতিক বয়কটের কথা ঘোষণা করল। মুসোলিনী এসব শাস্তির কথা অগ্রাহ্য করে আবিসিনিয়া দখল করলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরেই ইতালি ক্রমে আবিসিনিয়ায় নিজেদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করে গেছে। প্রথমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে কিন্তু 1934 খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ওয়ালওয়াল নামক স্থানে ইতালির সেনাদের সঙ্গে আবিসিনিয়া সেনাদের সংঘর্ষ বাধে। এর ফলেই ইতালির আবিসিনিয়া অভিযান শুরু হয়। লীগ অফ নেশনস্ কিছুই করতে পারেনি। কাউন্সিল এই সংকটে এক কমিশন নিয়োগ করেছিল। শেষপর্যন্ত আবিসিনিয়া দখল করে নিয়ে ইতালি জাতিসংঘের সদস্য পদই ছেড়ে দেয়।

1936 খ্রিস্টাব্দের মে মাসে ইতালির বাহিনী আবিসিনিয়ার রাজধানী আদ্দিস আবাবায় প্রবেশ করে। হাইলে সেলাসী একটি ব্রিটিশ জাহাজে ইয়োরোপে পলায়ন করেন। মুসোলিনী আবিসিনিয়াকে ইতালির সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। এই কাজে ফ্যাসিবাদী মুসোলিনিকে নাৎসীবাদী হিটলার সাহায্য করেন। এরপর মুসোলিনি স্পেনের গৃহযুদ্ধে জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে সাহায্য করে ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ইতালির মনোবল বৃদ্ধি করেন।

ঠিক এই সময় জার্মানি ও জাপানের মধ্যে একটি রাজনৈতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। *ই. এইচ. কার* ঠিকই লিখেছেন যে, এটি ছিল মূলত কমিউনিজমের বিরুদ্ধে একটি প্রতিরোধমূলক চুক্তি।[1] পরের বছর নভেম্বরে (1937 খ্রিঃ) ইতালি এই কমিউনিস্ট বিরোধী আন্দোলনে যোগদান করেন। রোম-বার্লিন-টোকিও-এর এই মিলন ইতিহাসে তিন অক্ষশক্তি (Axis Power) নামে পরিচিত। বস্তুত রোম-বার্লিন অক্ষশক্তি আগেই (1936) স্বাক্ষরিত হয়েছিল। ঐ বছরেই স্পেনের গৃহযুদ্ধে জার্মানি ও ইতালি স্পেনের একনায়ক ফ্রাঙ্কোর সমর্থনে সক্রিয় সাহায্য করে। 1937 এ ইতালি বার্লিন-টোকিও অক্ষশক্তিতে যোগ দেয়। 1938 থেকেই বিশ্বযুদ্ধের দামামা বাজতে থাকে। 1939 খ্রিস্টাব্দে হিটলার রাশিয়ার সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি করলেও ইতালি ক্ষুণ্ণ হয় কিন্তু জার্মানির সঙ্গে বন্ধুত্ব অটুট ছিল। ফ্যাসিবাদী ইতালির সঙ্গে নাৎসীবাদী জার্মানির মিলনই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পথ দ্রুত তৈরি করে। সঙ্গে সঙ্গে ইতালি লীগ অফ নেশনস্-এর সদস্যপদ ত্যাগ করল। জার্মানির সঙ্গে ইতালির মিলনকে সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে মিউনিখে মুসোলিনি ব্যক্তিগতভাবে হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। হিটলারও পরের বছর (1938 খ্রিঃ) রোমে মুসোলিনির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এরপরই মুসোলিনি সাম্রাজ্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে টিউনিস (Tunis) অধিকার করতে গিয়ে ফ্রান্সের বিরোধিতার সম্মুখীন হন কিন্তু তিনি ঐ বছরেই (1938-39) আলবেনিয়া অধিকার করতে সমর্থ হন। এর ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠল।

৬। উত্তরকালের কথা

1939 খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়।[2] হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করলে তার প্রতিবাদে ফ্রান্স ও ব্রিটেন জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেও মুসোলিনি সঙ্গে সঙ্গে জার্মানির সমর্থনে এগিয়ে আসেনি। এর দুটি কারণ ছিল, (ক) তাকে অগ্রাহ্য ক'রে হিটলার অ্যান্টি কমিন্টার্ন ভেঙেছিলেন। ঐ চুক্তি ফ্যাসিস্ট ইতালি ও নাৎসী জার্মানি করেছিল স্ট্যালিনের সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে। হিটলার 1939 খ্রিঃ রাশিয়ার সঙ্গে রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি করেন। (খ) যুদ্ধের গতি মুসোলিনি বুঝে নিতে চাইছিলেন। তাই

1. দ্র. *ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস বিটুইন টু ওয়ার্ল্ড ওয়ারস্*, পৃ. 262.

2. আমাদের পাঠ্যসূচি অনুযায়ী যদিও এই সময় পর্যন্ত আলোচ্য তবু আলোচনার পূর্ণাঙ্গতার কারণে উত্তরকালের কথা জানা দরকার। তাই সংক্ষেপে সে কথা দেওয়া হলো।

হিটলারের অনুরোধেও ইতালি যুদ্ধে সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়েনি। তবে 1940 খ্রিস্টাব্দে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মুসোলিনির ইতালি জার্মান পক্ষে যোগদান করে। তার আগেই জার্মানি পোল্যাণ্ড জয় করে এবং বেলজিয়াম ও ফ্রান্স দখল করে নিতে চলেছে। হিটলার ও মুসোলিনির মধ্যে মিউনিখে এক বৈঠকে (1940) ইতালি ফ্রান্সের কাছ থেকে স্যাভয়, নীস, সোমালিল্যাণ্ড, মিউনিখ এবং ব্রিটেনের মাল্টা দাবি করলে জার্মানি তা সমর্থন করে। তারপর জার্মান-সোভিয়েট সম্পর্কের অবনতি হলে হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করেন (1941), ইতালি সেই যুদ্ধে যোগ দেয়। কিন্তু হঠকারী নীতি নিয়ে উত্তর আফ্রিকায় ব্রিটিশ উপনিবেশ দখল করতে গিয়ে ইতালি পর্য্যুদস্ত হয়। ক্রমে মুসোলিনির বিরুদ্ধে ইতালির অভ্যন্তরে যেমন জনরোষ দেখা দেয়, তেমনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও ইতালির পরাজয় হয়। ইতালির জনগণের হাতেই মুসোলিনির মৃত্যু হয়েছিল; তার মৃতদেহ প্রথমে গাছের ডালে এবং পরে সেখান থেকে মিত্রপক্ষের সৈন্যদের হাতে চলে আসে। এইভাবে অমানবিক, অগণতান্ত্রিক, এক নায়কতান্ত্রিক মুসোলিনির অন্তিম অধ্যায় রচিত হয়।

অধ্যায় ২২

জার্মানি ও নাৎসীবাদ

(Syllabus: *Nazism and Germany-Nazi State-The aggresive foreign policy)*

১। নাৎসীবাদের উত্থানের আগে জার্মানি

নাৎসীবাদ (Nazism) হলো ফ্যাসিবাদের মতন এক উগ্র, অমানবিক, অ-গণতান্ত্রিক, কর্তৃত্ববাদী, জবরদস্তিমূলক ও স্বৈরতান্ত্রিক মতাদর্শ। সুতরাং তা ফ্যাসিবাদেরই নামান্তর। ইয়োরোপে এই মতাদর্শের উত্থান হয়েছিল দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে। এই আদর্শের ধ্বজাধারী অ্যাডল্‌ফ হিটলার (Adolf Hitler) কর্তৃত্ববাদী, সর্বব্যাপী এবং একনায়কতান্ত্রিক শাসনের যে নমুনা দেখিয়েছিলেন তার থেকে নাৎসী সরকারের স্বরূপ বোঝা যায়। জার্মানিতে প্রজাতন্ত্রের পতন এবং স্বৈরতান্ত্রিক নাৎসী শক্তির উদ্ভব ইয়োরোপের ইতিহাসের এক প্রধান ঘটনা। হিটলারের উত্থান না হলে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ হত কিনা সন্দেহ। নাৎসী নায়ক হিটলার ও তার জার্মানি শুধু ইয়োরোপ নয়, সমগ্র পৃথিবীর উপর তার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল।

ইতালিতে যেমন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ফ্যাসিবাদের উদ্ভব হয়, তেমনি জার্মানিতেও নাৎসীবাদের উদ্ভব ঘটে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ইতালির মতন জার্মানিও ছিল একটি ভৌগোলিক সংজ্ঞা মাত্র। এটি ছিল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন রাজ্যে বিভক্ত এবং বহু রাজ্যের সমষ্টি, যার মধ্যে প্রাশিয়া ছিল সর্ববৃহৎ। প্রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী অটো ফন বিসমার্ক তিনটি যুদ্ধের মাধ্যমে অসাধারণ কূটকৌশলে বহু রাজ্যে বিভক্ত জার্মানিকে একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করেন (1870 খ্রিঃ)। এরপর থেকে জার্মানি প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত নানা আন্তর্জাতিক জোটের মাধ্যমে নিজেকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। এই জোটের রাজনীতি বিসমার্ক যেভাবে করেছিলেন, উত্তরকালে কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম তা থেকে সরে গিয়ে এক আগ্রাসী বিদেশ নীতি গ্রহণ করেন। এর ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিবেশ রচিত হয়। তাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে মিত্রপক্ষ জার্মানিকেই দায়ী করল। তাদের মতে জার্মানি হলো যুদ্ধ-অপরাধী। যাইহোক, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের ফলে (নভেম্বর 1918) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যেমন জার্মানির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হলো তেমনি আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে জনসাধারণের মনে বিক্ষোভ জমে উঠল। স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল। রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রীরা ও প্রজাতন্ত্রীরা আন্দোলনের সূচনা করল। বাধ্য হয়ে, কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম হল্যাণ্ডে

পালিয়ে গেলেন। জার্মানি 1918 খ্রিস্টাব্দে আত্মসমর্পণ করল মিত্রপক্ষের কাছে। অন্যদিকে ঐ বছরই জার্মানিতে রাজতন্ত্রের পরিবর্তে ফ্রেডারিষ এবার্ট-এর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হলো প্রজাতন্ত্র। জার্মানির রাজধানী বার্লিনের পরিবর্তে ভাইমার শহরে স্থানান্তরিত হলো। নব-নির্বাচিত প্রতিনিধি সভা এই শহরে সম্মিলিত হয়ে একটি সংবিধান রচনা করল (জুলাই 1919), তাই এটি ভাইমার শাসনতন্ত্র (Weimar Constitution) নামে পরিচিত। এই সংবিধান অনুসারে জার্মানি একটি গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রে (Federation of Republican States) রূপান্তরিত হলো। এবার্ট হলেন এই যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভার্সাই সন্ধিতে জার্মানি যুদ্ধ-অপরাধী হিসেবে গণ্য হয়। তাই এই সন্ধির শর্তে অপরাধীকে শাস্তিদানের যে ব্যবস্থা গৃহীত হলো ভাইমার সরকার ও জার্মান জাতিকে সেই শাস্তি ভোগ করতে হলো। এসবের ফলে জার্মানির আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে নানা বিপর্যয় ঘটল। প্রথমতঃ, ভার্সাই সন্ধির শর্তগুলি সমগ্র জার্মান জাতির মনে অসন্তোষের আগুন জ্বেলে দিল। দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধের পর যুদ্ধ-ঋণ পরিশোধ করতে গিয়ে জার্মানি এক শোচনীয় আর্থিক সঙ্কটের সম্মুখীন হলো। মূলধনের অভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষি-শিল্পের উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হলো। তৃতীয়তঃ, জার্মানি যখন অসংখ্য সমস্যার সম্মুখীন এবং জনসাধারণের দুর্দশা যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেল তখন জার্মান জাতির মুক্তির প্রতিশ্রুতি দিয়ে অ্যাডলফ্ হিটলার ও তাঁর ন্যাশনাল সোস্যালিস্ট পার্টি (National Socialist Party বা Nazi Party) জার্মানির রাজনৈতিক রণাঙ্গনে প্রবেশ করল। সাধারণতন্ত্রের দুর্বলতাই হিটলারের অভ্যুদয়ের পথ উন্মুক্ত করে দিল।

ভাইমার প্রজাতন্ত্রের ব্যর্থতাই জার্মানিতে হিটলারের উত্থানের পথ সুগম করে দেয়। এজন্যই অধ্যাপক *রাইডার* ঐ সময়কার অবস্থাকে ভয়ঙ্কর বলেছেন।[1] প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিজয়ী মিত্রপক্ষ জার্মানির উপর যে অপমানজনক এবং জবরদস্তিমূলক ভার্সাই সন্ধি চাপিয়ে দেয় তা প্রজাতান্ত্রিক সরকার মানতে বাধ্য হয়েছিল। এর ফলে সর্বস্তরের মানুষ জার্মান সরকারের উপর বিক্ষুব্ধ হয়। তাছাড়া বলশেভিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ কমিউনিস্টরা বিভিন্ন স্থানে ধর্মঘট ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। 1919 খ্রিস্টাব্দে জার্মান কমিউনিস্টরা 'স্পার্টাকাস' দলের নেতা কার্ল লাইবেনেখট্ এবং রাজা লুকসেনবুর্গের হত্যা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে সাময়িকভাবে দমন করলেও সম্পূর্ণ মুছে ফেলতে পারেনি।[2] যুদ্ধ বিধ্বস্ত জার্মানির উপর যে বিপুল ক্ষতিপূরণের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল তা শোধ করার ক্ষমতা জার্মানির ছিল না। উপরন্তু জার্মানির শিল্প সমৃদ্ধ রূঢ় অঞ্চল ফ্রান্স ও বেলজিয়াম দখল করে নিয়েছিল। তদুপরি ছিল জার্মানির অর্থনৈতিক দুরবস্থা—মুদ্রাস্ফীতি, খাদ্যাভাব, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দুষ্প্রাপ্যতা, কর্মহীনতা, শিল্প ধর্মঘট, উৎপাদন হ্রাস ইত্যাদি।

---

1. দ্র. A.J. Ryder, ***The German Revolution of 1918*** (1967)
2. দ্র. David W. Morgan, ***The Socialist Left and the German Revolution*** (1975)

1919 থেকে 1933 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে গঠিত 19টি মন্ত্রিসভা জার্মানির স্থায়ী কোনও সমাধান জাতির সামনে রাখতে পারে নি। এই হতাশা ও অন্ধকারের মধ্যে হিটলারের নাৎসী দলের বক্তব্য ও কর্মসূচি জনসাধারণের সামনে আশার আলো তুলে ধরলো।

ভাইমার প্রজাতন্ত্রের উদ্ভব সম্পর্কে আলোচনা পূববর্তী উনিশতম অধ্যায়ে করা হয়েছে। 1919 খ্রিস্টাব্দের 19 জানুয়ারি প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন হয়। মোট 421টি আসনের মধ্যে সোশাল ডেমোক্র্যাট 163টি আসন পায়। তাছাড়া সেন্ট্রিস্ট বা খ্রিস্টান ডেমোক্র্যাটস ৪৪, ডেমোক্র্যাটিক দল 75, ন্যাশানালিস্ট দল 42, ইণ্ডিপেন্ডেন্ট দল 42, এবং পিপলস্ পার্টি 21 টি আসন পায়। স্পার্টাকাস দল নির্বাচনে অংশ নেয় নি। ভাইমার নামক স্থানে জাতীয় সংবিধান সভা যে যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান গ্রহণ করে তাকে *ডেভিড টমসন* পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ লিখিত গণতান্ত্রিক সংবিধান বলেছেন। এই সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রের প্রধান হবেন রাষ্ট্রপতি। একটি দুই কক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্ট রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য করবে। উচ্চকক্ষের নাম রাইখস্ট্যাড আর নিম্নকক্ষের নাম রাইখস্ট্যাগ। উচ্চকক্ষের সদস্য হবেন জার্মানির বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিবর্গ এবং নিম্নকক্ষের সদস্যগণ প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারে নির্বাচিত হবেন। এই সংবিধান অনুসারেই প্রথম রাষ্ট্রপতি হন ফ্রেডারিষ এবার্ট।

এরপর ভাইমার প্রজাতন্ত্রের সামনে ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি সমস্যাদেখা দেয়। প্রথমটি হলো, মিত্রপক্ষের সঙ্গে সন্ধি সম্পাদন। তাদের উপর মিত্রপক্ষ ভার্সাই-এর সন্ধি চাপিয়ে দেয়। তাছাড়া চরম দক্ষিণপন্থী এবং উগ্র বামপন্থী দলগুলির বিরোধিতা, সরকারি কর্মচারিদের এক বড়ো অংশের আনুগত্যের অভাব এবং শ্রমজীবী শ্রেণীর সমস্যাজনিত ধর্মঘট ছিল। জার্মানির জাতীয়তাবাদী এবং উগ্র দেশপ্রেমিক মানুষজন জার্মান সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি ভালোভাবে মেনে নেয়নি। প্রজাতন্ত্রী সৈন্যবাহিনীর অধিকাংশ সেনা এবং অফিসার কাইজারের রাজতন্ত্রী আদর্শের অনুগামী ছিল। প্রধান সেনাপতি হানস্ ফন শেক্ট কেন্দ্রীয় সরকারের অজ্ঞাতে জার্মান সেনাদের প্রশিক্ষণের জন্যে সোভিয়েট সরকারের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ করেন। অবস্থা চরমে পৌঁছায় যখন 1920 খ্রিস্টাব্দে উলফ্‌গ্যাং কাপ (Wolfgang Kapp) নামে এক সেনা অফিসার বলপ্রয়োগে বার্লিন দখল করে ফেলেছিলেন, দেশব্যাপী ধর্মঘটের ফলে অল্পদিনের মধ্যেই কাপ সরকারের পতন হয় এবং কাপ সুইডেনে পালিয়ে যান। অনুরূপভাবে 1923 খ্রিঃ প্রাক্তন জেনারেল লুডেনড্রফ (Ludendroff) বলপূর্বক ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। এই অভ্যুত্থানে যুক্তছিলেন হিটলার এবং তার কারাদণ্ড হয়েছিল।

এইসব সমস্যা ছাড়া প্রজাতান্ত্রিক সরকারের সামনে সবচেয়ে বড়ো সমস্যা ছিল ক্ষতিপূরণ দেওয়া। গুস্তাফ্ স্ট্রেস্‌মান 1923-এ মন্ত্রিসভা গঠন করে এই সমস্যা মেটাবার

আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। যুদ্ধোত্তর জার্মানির এই বিচক্ষণ রাজনীতিক পশ্চিমী শক্তির সঙ্গে সহযোগিতা করে কিস্তিতে ক্ষতিপূরণ শোধের চেষ্টা করেন। ক্ষতিপূরণের পরিমান নির্ধারণের জন্য মার্কিন অর্থনীতিবিদ চার্লস্ ডাওয়েজ -এর নেতৃত্বে যে 'ক্ষতিপূরণ কমিশন' গঠিত হয় তার পরিকল্পনা অনুসারে কাজ চলছিল। এরপর 1925 খ্রিস্টাব্দে প্রেসিডেন্ট এবার্ট -এর মৃত্যু হলে নতুন রাষ্ট্রপতি হন হিন্ডেনবুর্গ। স্ট্রেসমান ঐ বছরেই 'লোকার্নো চুক্তি' অন্যান্য দেশের সঙ্গে সম্পাদন করে জার্মানির সীমান্ত সমস্যাও মিটিয়ে ফেলেন। 1928 খ্রিঃ জার্মানি কেলগ্-ব্রাঁয়া চুক্তির দ্বারা ফ্রান্সের সঙ্গেও বিবাদ কমিয়ে ফেলে। দুর্ভাগ্যবশত 1929 খ্রিঃ স্ট্রেস্‌মানের মৃত্যু হয়। ইতোমধ্যে জার্মানি ক্ষতিপূরণের পরিমাণ হ্রাসের দাবি জানালে মিত্রপক্ষ আওয়েন ইয়াং-এর সভাপতিত্বে এককমিশন গঠন করে। 1929-এ ক্ষতিপূরণের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া হলেও 1930 থেকে বিশ্বব্যাপী মন্দার পরিপ্রেক্ষিতে জার্মানির ক্ষতিপূরণ হ্রাসের প্রশ্ন অস্বীকৃত রইল। স্ট্রেস্‌মানের পর চ্যান্সেলার ব্রুনিং অর্থনৈতিক সমস্যা দূর করতে ব্যর্থ হন। এই অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং জনগণের সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি অনাস্থাই নাৎসী দলের বলপূর্বক ক্ষমতা দখলের পথ সুগম করে।[1]

২। অ্যাডল্‌ফ হিটলার এবং নাৎসী দলের উত্থান

অস্ট্রিয়ার অন্তর্গত ব্রাউনাউ গ্রামে এক সাধারণ চর্মকারের ঘরে অ্যাডলফ্ হিটলার 1889 খ্রিস্টাব্দে 20 এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই তিনি পিতাকে হারান। এই সময় তিনি ভিয়েনার আর্ট একাডেমিতে ভর্তি হতে চেয়েছিলেন; কিন্তু অকৃতকার্য হয়ে তাঁকে চাকরি গ্রহণ করতে হলো। সম্বলহীন অবস্থায় তাঁকে ছবি অঙ্কন ক'রে, হোটেলে পরিচারকের কাজ ক'রে, জীবিকা নির্বাহ করতে হত। কিন্তু এই অবস্থাতেই তিনি সাধারণ পাঠাগারে পড়াশুনা করতে ভুলে যাননি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি ব্যাভেরিয়ার সেনা-বাহিনীতে যোগাদান করেন ও সৈনিক হিসেবে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ভার্সাই সন্ধির সময় তিনি আহত অবস্থায় হাসপাতালে ছিলেন। সেখান থেকে বেরিয়ে তিনি গৃহসজ্জার ব্যবসা করতে আরম্ভ করলেন। বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পরাজয় তাঁকে গভীর শোকে নিমগ্ন করে এবং তার মনে হতাশার ভাব সৃষ্টি হয়। 1919 খ্রিস্টাব্দে হিটলার 'জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টি'তে যোগাদান করেন। এই দলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ডেক্সলার। বাগ্মিতার গুণে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি এর নেতা হয়ে উঠলেন। দলের নতুন নাম হলো 'ন্যাশানাল সোস্যালিস্ট জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টি'। ইহুদী বিরোধিতা, ক্যাথলিক বিরোধিতা,

1. বিস্তারিত আলোচনার জন্য অ্যালন বুলক, হিটলার : এ স্টাডি ইন টির‍্যানি (1962) কে, এস. পিনসন, মডার্ন জার্মানি অ্যাণ্ড ইটস্ সিভিলাইজেশন (1954), গর্ডন ক্রেগ, জার্মানি, 1860-1945 (1978), এ. জে. নিকলস্, ভাইমার অ্যাণ্ড দ্য রাইজ অব হিটলার (1968)

কমিউনিস্ট বিরোধিতা ছিল এই দলের লক্ষ্য। এরপর তিনি ঐ দলকে নিয়েই গঠন করলেন 'ন্যাশন্যাল সোস্যালিস্ট' দল বা নাৎসী (Nazi) দল। হিটলারের তেজস্বী বাগ্মিতায় জার্মান জাতির মনে আশার সঞ্চার হলো। দলে দলে যুবসম্প্রদায় তার দলের সভ্য হলো।

বস্তুত হিটলার ছিলেন এক অসাধারণ বক্তা। *অ্যালান বুলক* তাকে ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক বক্তা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাছাড়া ইতিহাসবিদ *এরস্যাং* জানিয়েছেন যে, নাৎসী দলের বিশেষ জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ ছিল প্রচার এবং মিথ্যা প্রচার। ক্ষমতাসীন হওয়ার পর গোয়েবলস্ সেই ব্যাপারে অসীম ক্ষমতা দেখিয়েছিলেন। নাৎসী দলের সফলতার প্রধান কারণ বলা যেতে পারে জাতির সামনে ভার্সাই সন্ধি বাতিল করে আবার শক্তিশালী জার্মান রাষ্ট্রগঠনের স্বপ্ন।

1923 খ্রিস্টাব্দে হিটলার তাঁর দলের সাহায্যে জার্মানির 'ভাইমার' সরকারের পতন ঘটাতে গিয়ে কারারুদ্ধ হলেন। এই কারাবাস ছিল তার নতুন জীবনে উন্নীত হবার সুবর্ণ সুযোগ। কারাকক্ষে বসে হিটলার রচনা করলেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'মেই ক্যাম্প' (Mein Kampf) অর্থাৎ 'আমার সংগ্রাম'। এই গ্রন্থে তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠের সংসদীয় রীতি-নীতির নিন্দা করে ব্যক্তিকেন্দ্রিক একনায়কতন্ত্রের কথা ব্যক্ত করেছেন। তিনি আরও লিখেছেন ইয়োরোপীয় জাতিবর্গের অবিচার, প্রতিহিংসা, আর জার্মান জাতির দুর্দশার কাহিনী। বাস্তবিকই গ্রন্থখানি ছিল 'নাৎসী বাইবেল'। গ্রন্থটির মধ্যে ছিল হিটলারের রাজনৈতিক চিন্তাধারা আর নাৎসীবাদের কর্মসূচি। অচিরে হিটলারের নাৎসীবাদ জনপ্রিয় হয়ে উঠল। বছর পাঁচেকের মধ্যে ন'লক্ষ 'নাৎসী বাইবেল' বিক্রি হলো। জার্মান যুব সম্প্রদায় দলে দলে হিটলারের ভক্ত হয়ে উঠল। তিনি তাদের নিয়ে গঠন করলেন ঝটিকা বাহিনী (Storm troops)। তিনি ঘোষণা করলেন: জার্মান জাতি প্রকৃত আর্যজাতির বংশধর। ইহুদি আর কমিউনিস্টরা দেশের শত্রু, কমিউনিজম মানবতার শত্রু। আর্যজাতির স্বস্তিকা চিহ্ন জার্মান জাতির প্রতীকরূপে গৃহীত হলো। এইসব ঘোষণা জার্মান জাতির মনে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও আশার সঞ্চার করল। জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদের মাধ্যমে জার্মান ভাষাভাষী অধিবাসীগণকে নিয়ে এক ও অখণ্ড জার্মান রাষ্ট্র গঠনের প্রতিশ্রুতি ছিল নাৎসি কর্মসূচির মূলকথা। কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে হিটলার দেখলেন, জার্মান জাতি নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ।

Mein Kampf বইতে হিটলার সরাসরি ফ্রান্সকে জার্মান জাতির চিরন্তর শত্রু হিসেবে তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে "France is the eternal and mortal enemy of the nation"। জার্মান জনগণের স্থান সঙ্কুলানের জন্য জার্মান রাজ্যের সীমানা প্রসারের কথাও তিনি বলেন। আর্যজাতি স্বস্তিকা চিহ্ন একটু বাঁকা ভাবে (জার্মান ভাষায় বলা হত 'হ্যাকেনক্রুজ') ব্যবহার করে তিনি বিশুদ্ধ আর্যতত্ত্ব তুলে ধরেন। এই চিহ্ন শুধু নাৎসী দলের প্রতীক নয়, নাৎসীদের জামা-কাপড়ে এবং সেনাবাহিনীর পোষাকেও তা লাগাতে হত। বেকার সমস্যার সমাধান, আমূল ভূমিসংস্কার, শিশু ও নারীকল্যাণ ইত্যাদি কর্মসূচি ঘোষণা এবং অন্যদিকে ঝটিকা বাহিনী দিয়ে বিরোধী মতামত দমন করা ছিল নাৎসী দলের কাজ।

1929 খ্রিস্টাব্দের বিশ্বব্যাপী মন্দার (The Great Depression) ঢেউ জার্মানিতেও পরে। দলের ঘোষিত লক্ষ্যে ও কর্মসূচিতে আকৃষ্ট হয় বেকার যুবক, করভাবে নিপীড়িত জার্মান কৃষক, ইহুদি বণিক ও ব্যবসায়ীদের একাধিপত্যে বীতস্পৃহ জার্মান ব্যবসায়ীগণ, জার্মান শিল্পপতিরা সকলেই নাৎসী দলের ভক্ত হন। 1930 -এর নির্বাচনে নাৎসী দল রাইখস্ট্যাগে আসন সংখ্যা 12 থেকে 107 এ বৃদ্ধি করেন। 1932 খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে রাইখস্ট্যাগের নির্বাচনে নাৎসী দল 608 এর মধ্যে 230 টি আসনে জয়ী হয়। সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও 1933 খ্রিঃ হিটলার জাতীয়তাবাদী দলের ফন্ পেপেন-এর সঙ্গে যুক্তভাবে ভাইমার প্রজাতন্ত্রের চ্যান্সেলার বা প্রধানমন্ত্রী হন। বস্তুতপক্ষে 1932 -এর নির্বাচনে নাৎসীরা ছিল একক বৃহত্তম দল। প্রেসিডেন্ট হিণ্ডেনবুর্গ হিটলারকে সরকার গঠনের আহ্বান জানালে তিনি বহুদলীয় সরকার গঠন করেন। বহুদলীয় সরকার শাসন পরিচালনায় নানা অসুবিধার সম্মুখীন হয়। তাই তার পরামর্শে রাষ্ট্রপতি বৃদ্ধ হিণ্ডেনবুর্গ আবার নির্বাচনের ডাক দেন। রাইখস্ট্যাগে তখন নাৎসী দলের প্রধান প্রতিপক্ষ ছিল কমিউনিস্টরা। 1933-এর 28 ফেব্রুয়ারি পার্লামেন্ট ভবনে বিধ্বংসী আগুন লাগে রহস্যময় কারণে। হিটলার এই ঘটনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব কমিউনিস্টদের উপর চাপিয়ে দিয়ে নির্বাচনে বিপুল গরিষ্ঠতা লাভ করেন। এবার হিটলার হলেন জার্মানির চ্যান্সেলার (Chancellor) বা প্রধানমন্ত্রী। হিটলার প্রচারের মাধ্যমে রাইখস্ট্যাগ অগ্নিকাণ্ডের দায় কমিউনিস্টদের উপর চাপালেও বর্তমান গবেষণায় জানা গেছে একাজ তারা নিজেরাই গোপনে করেছিলেন। 1933 -এর 5 মার্চ নির্বাচনেও তাঁর দল 288 টি আসন পায় এবং একক সংখ্যা গরিষ্ঠতালাভে ব্যর্থ হয়। পুনরায় অন্য দলের সঙ্গে তাঁর মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এর অল্পকাল পরেই 1934 খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে জার্মানির প্রেসিডেন্ট হিণ্ডেনবুর্গ (Hindenburg) মারা গেলে হিটলার স্বয়ং জার্মানির চ্যান্সেলার ও প্রেসিডেন্ট দুটি পদ একত্রে গ্রহণ করলেন। তখন হিটলারের উপাধি হলো ফ্যুয়েরার (Fuhrer) অর্থাৎ সর্বোচ্চ নেতা বা সর্বেসর্বা, সকল ক্ষমতার আঁধার। এইভাবে হিটলার জার্মানিতে এক -অধিনায়কত্বের পথ উন্মুক্ত করলেন। আসলে হিন্ডেনবুর্গের মৃত্যু এবং ফ্যুয়েরার হওয়ার আগেই দেশের দুর্দিনে জার্মান পার্লামেন্ট এক বিশেষ আইন বলে সংসদের অনুমোদন ছাড়াই শাসন পরিচালনা ও আইন প্রণয়নের অধিকার হিটলারের হাতে তুলে দেয়। ফলে তাঁর একনায়কত্ব তখনই শুরু হয়। ক্ষমতা দখলের পর নাৎসী নায়ক হিটলার সমস্ত বিরোধিতাকে স্তব্ধ করে দিয়ে ইতিহাসের ক্রুর একনায়কে পরিণত হন।

হিটলার এবং নাৎসী দলের সাফল্যের কারণ ঃ হিটলার তথা নাৎসী দলের জার্মানিতে উত্থান হওয়ার পিছনে নানাবিধ কারণ আছে। এ. জে. পি. টেলার, মারিস বুমঁ, জিওফ্রি ব্যারাক্ল, এডওয়ার্ড হ্যালেট কার, অ্যালান বুলক, ব্রেকার, ফ্রাংকেল প্রমুখ অনেক

ঐতিহাসিক নানা মত প্রকাশ করেছেন। জার্মানি জাতির উপর অপমানজনক ভার্সাই সন্ধির আরোপ এবং হিটলারের তার তীব্র বিরোধিতা তার উত্থানের প্রথম কারণ। তাছাড়া কমিউনিস্টদের সম্পর্কে জার্মানদের প্রবল ভীতির ফলেও তারা নাৎসীদের সাহায্যে করে। আবার অর্থনৈতিক সংকট নাৎসী উত্থানের অন্যতম প্রধান কারণ। এদিকে হিটলারের জনমোহিনী ব্যক্তিত্ব এবং বাগ্মিতা জনপ্রিয়তার অন্যতম উৎস। আবার নাৎসীদের ইহুদি-বিদ্বেষী প্রচার জনগণের উপর প্রভাব ফেলে। সর্বোপরি,মানসিকতার দিক থেকে জার্মানিগণ গণতন্ত্র প্রেমী ছিল না। তারা এ ব্যাপারে ফরাসিদের বিপরীত। তাঁরা শক্তিশালী জার্মানি সাম্রাজ্য কামনা করত। সব মিলে অ্যাডল্ফ হিটলারের মধ্যে জার্মানিরা নবযুগের নায়ক খুঁজে পায়।

৩। নাৎসী রাষ্ট্র

ক্ষমতা হাতে পেয়েই হিটলার জার্মানির আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনায় হস্তক্ষেপ করলেন। তাঁর আভ্যন্তরীণ নীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল -(i) জার্মানিতে নাৎসীদের নিরঙ্কুশ প্রতিপত্তি স্থাপন করা এবং (ii) দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক পুনর্গঠন করা। হিটলার ছিলেন জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদে (National Socialism) বিশ্বাসী, কারণ প্রথম দিকে শ্রেণী-সমন্বয় ছিল তাঁর নীতি। এই জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদ ছিল সাম্যবাদ বা কমিউনিজমের সম্পূর্ণ বিরোধী, কারণ কমিউনিস্টরা শ্রেণী সংগ্রামে বিশ্বাসী। সুতরাং হিটলারের আমলে জার্মানি থেকে কমিউনিস্ট বিলুপ্ত হলো; এছাড়া উনিশ শতকের উদারনৈতিক ভাবধারায় হিটলারের কোন আস্থা ছিল না। তিনি মনে করতেন উদারনৈতিকতা হলো দুর্বলতার নামান্তর মাত্র । তাই জার্মানির জাতীয় সমাজতন্ত্র মূলত অতি সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের দ্বারা প্রভাবিত হলো। এই মনোভাবের ফলশ্রুতি হলো প্রচণ্ড ইহুদী বিদ্বেষ। নাৎসীবাদীরা মনে করত যে, জার্মানি জাতি প্রকৃত আর্যজাতির বংশধর, সুতরাং অন্যান্য যে-কোনও জাতি ও সম্প্রদায় থেকে তারা শ্রেষ্ঠ। অন্যদিকে তারা অনার্য বংশোদ্ভূত ইহুদিগকে জার্মানির শত্রুরূপে গণ্য করল এবং অবিলম্বে দেশে শুরু হলো ইহুদি-নির্যাতনের পালা। জার্মানির অত্যাচারে জর্জরিত আইনস্টাইনের মতন বিশ্ববিজ্ঞানীকেও জার্মানি ত্যাগ করে আমেরিকায় চলে যেতে হলো। অবশেষে কমিউনিস্ট, সোস্যাল ডেমোক্র্যাট ইত্যাদি নাৎসী-বিরোধী দলগুলিকে বেআইনী বলে ঘোষণা করা হলো।

হিটলারের ইচ্ছা ছিল সমগ্র জার্মান জাতিকে সুসংহত ক'রে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাকে পুনরায় সঞ্জীবিত করা। এই উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত করার উদ্দেশ্যে হিটলার শাসনতান্ত্রিক সংস্কারে মনোনিবেশ করলেন। প্রথমতঃ, তিনি প্রদেশগুলির স্বায়ত্তশাসনের অধিকার কেড়ে নিয়ে শাসনতান্ত্রিক সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে স্থানান্তরিত করলেন। এই ব্যবস্থার দ্বারা জার্মানি প্রকৃতই হিটলারের এক অধিনায়কত্বে চলে এলো।

শাসনব্যবস্থাকে নিজের হাতে নিয়েই হিটলার আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করলেন। এ ব্যাপারে বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডঃ *শাখট* (Dr. Schacht) ছিলেন তাঁর প্রধান পরামর্শদাতা। দ্বিতীয়তঃ, কলকারখানার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে শ্রমিক-সংঘ ও মালিক-সংঘকে ভেঙে দিয়ে উভয়েরই যৌথ সংস্থার মাধ্যমে উৎপাদনের ব্যবস্থা গৃহীত হলো। মালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বজায় রইল কিন্তু কারখানাগুলিকে সরকারি পরিদর্শকের নিয়ন্ত্রণে পরিচালনার ব্যবস্থা গৃহীত হলো। শ্রমিকদের কাজের সময় কমিয়ে দিয়ে বাড়তি সময়ে কাজের জন্য অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগের ব্যবস্থার দ্বারা বেকার সমস্যার সমাধান করা হলো। এছাড়া 1931 খ্রিস্টাব্দে নতুন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গৃহীত হলো। কৃত্রিম উপায়ে খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতের প্রণালী আবিষ্কৃত হওয়ায় জার্মানির অর্থনীতির অবস্থা অল্পদিনের মধ্যেই স্বচ্ছল হয়ে উঠল।

নাৎসী রাষ্ট্র (Nazi State) সম্পর্কে আরও বিশদভাবে জানতে গেলে নাৎসী দলের আদর্শ ও নীতি, নাৎসী সংগঠন এবং নাৎসীকরণ নীতি এবং নাৎসী অর্থনীতি আরও একটু বিশদভাবে জানা দরকার।

নাৎসী দলের আদর্শ ও নীতির মধ্যে যে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়ে। যেমন, (1) বিশুদ্ধ জাতিতত্ত্ব (Racist Theory)। টিউটনিক জাতিগোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত জার্মান জাতিকে তাঁরা শ্রেষ্ঠ মনে করত। তাঁরা নিজেদের শুদ্ধআর্য মনে করত। সুতরাং অপরাপর জাতি থেকে তাঁরা শ্রেষ্ঠ এবং অপরের উপর তাদের প্রভুত্ব করার অধিকার আছে। (2) *লেনার্ড শাপিরো* লিখেছেন যে, শুধু জাতিগত অসহিষ্ণুতা নয়, নাৎসী কর্মসূচির একটা বড়ো অংশ জুড়ে ছিল সমাজবাদী আদর্শ এবং কমিউনিস্ট বিরোধিতা। (3) নাৎসী নীতির অপর দিক ছিল ইহুদি বিদ্বেষ। তাঁরা জার্মান ইহুদিদের প্রকৃত জার্মান মনে করত না। (4) ইতালির ফ্যাসিস্ট দলের মতন জার্মানির নাৎসী দলও একদলীয় শাসনে বিশ্বাস করত এবং একনায়কতন্ত্রের মাধ্যমে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিল। (5) নাৎসী দল মার্ক্সবাদের ঘোর শত্রু ছিল ঠিকই কিন্তু তাঁরা ধনতন্ত্রেরও বিরোধী ছিল। নাৎসী দলের নাম ছিল জাতীয় সমাজতন্ত্রী দল। ধনী ও দরিদ্রদের মধ্যে সমন্বয় সাধন ক'রে তারা শ্রমিকদের সামাজিক মুক্তি আনতে রেখেছিল। (6) নাৎসী বৈদেশিক নীতির মূলকথা ছিল বলপ্রয়োগ এবং আগ্রাসন।

নাৎসী দলের নানা শাখার মধ্যে কয়েকটির নাম করা যেতে পারে। (1) বেকার যুবকদের নিয়ে আধাসামরিক বাহিনী ছিল **স্টর্মট্রুপার্স** বা ঝটিকা বাহিনী। হিটলার বিশ্বস্ত অনুচর এরনিস্ট রোমে ছিলেন এর প্রধান। এর কাজ ছিল সভা সমিতি পাহারা দেওয়া এবং বিরোধি দলের সংগঠন বা সভা হামলা করে ভেঙে দেওয়া। (2) আরেকটি বাহিনী ছিল শ্যুটস্ স্টাফেলন। এদের কাজ ছিল মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে নাৎসী নেতাদের জীবন রক্ষা করা। এই দল অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করত। (3) **গেস্টাপো** বা গুপ্ত পুলিশ বাহিনী

ইন্টালিজেন্স ব্রাঞ্চের কাজ করত এবং গোপনে সমালোচকদের মেরে ফেলা হত। এই বাহিনীর প্রধান ছিলেন হিমলার। (4) এছাড়া ছিল যুব বাহিনী, নারীবাহিনী, গণ আদালত, অসামরিক বন্দীশালা। দলের পত্রিকার নাম ছিল 'পিপলস্ অবজারভার', এদের পতাকা ছিল লালের সঙ্গে সাদা এবং তার মধ্যে বাঁকা স্বস্তিকা বা হ্যাকেনক্রুজ। লাল ছিল ধনতন্ত্র বিরোধিতা প্রতীক, সাদা ছিল জাতীয়তাবাদের প্রতীক, হ্যাকেনক্রুজ বিশুদ্ধ আর্যজাতির প্রতীক। নাৎসী দলের নিজস্ব সংগীত রচনা করেন হোর্স্ট ওয়েসেল এবং জার্মানির জাতীয় সংগীত হিসেবে গণ্য হয় বিখ্যাত ভাগনার রচিত 'জাগ্রত জার্মানি' গানটি।

উগ্রজাতীয়তাবাদ, বিশুদ্ধ জাতি তত্ত্ব এবং আগ্রাসী পররাষ্ট্র নীতি —এই তিনটি হলো নাৎসীবাদের তিন প্রধান বৈশিষ্ট্য। বিশুদ্ধ জার্মান আর্যজাতি অন্যান্য জাতির উপর প্রভুত্ব করার তত্ত্ব, যাকে হেরেনভক তত্ত্ব বলে তা ছিল বলেই ইহুদিদের উপর নির্যাতন ও বিতাড়ন চালানো হয়। ইহুদি নির্যাতন বিভাগের প্রধান ছিলেন আইখমান। এই নির্যাতন বর্বরতম রূপ পায় কনসেনট্রেশন ক্যাম্প এবং গ্যাসচেম্বারে হত্যা করে। উগ্র জাতীয়তাবাদ থেকেই ফ্যাসিবাদের জন্ম যা চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক। আগ্রাসী পররাষ্ট্রনীতির মূল কথা ছিল 'Lebensraum' অর্থাৎ বসবাসের জায়গায় সম্প্রসারণ।

ফুয়েরার বা একনায়ক হিসেবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর হিটলার ও তার দলের কার্যকলাপের মধ্যেও নাৎসী রাষ্ট্রের চরিত্র পরিস্ফুট হয়েছিল। এর মূলে দেখা যায় ব্যাপক নাৎসীকরণ নীতি। যেমন 1933 খ্রিস্টাব্দের 14 জুলাই এক আইন দ্বারা ঘোষণা করা হয় যে, নাৎসী দল ছাড়া জার্মানির সব দল অবৈধ। 1934 থেকে নাৎসী ছাড়া অন্য দলের অস্তিত্ব দেশদ্রোহিতা বলে গণ্য করা হয়। ঐ বছর রাইখস্ট্যাগের এক আইন প্রণয়ন করে জার্মানির অন্তর্ভুক্ত প্রদেশগুলির স্বায়ত্তশাসনের অধিকার কেড়ে নেয়। অর্থাৎ প্রদেশগুলির আইন রচনার অধিকার কেড়ে নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে আনা হয় এবং তারপর সংসদই ভেঙে দেওয়া হয়। সমস্ত সরকারি কর্মচারি ও সৈনিককেও নাৎসীবাদের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিতে হত। এই একনায়কতন্ত্রে কঠোরতাই হিটলারের আভ্যন্তরীণ নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য।

আভ্যন্তরীণ নীতির অপর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল ইহুদি নির্যাতনের মধ্যে। এর পিছনে শুধুমাত্র জাতিতত্ত্ব ছিল এমন নয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কারণও ছিল। ইহুদিদের অনেকেই ছিল কমিউনিস্ট। সুতরাং তাদের উপর নির্যাতন শুরু হয়। অপরপক্ষে, জার্মানির ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইহুদিদের আধিপত্য ছিল। শুরু হয় ইহুদির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা, সরকারি চাকরি থেকে তাদের বিতাড়ন; স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইহুদি শিক্ষকদের ছাঁটাই, হাসপাতালে থেকে ইহুদি নার্স-ডাক্তার ছাঁটাই, ইহুদিদের আইন ব্যবসা বন্ধ ইত্যাদি। এই নির্যাতনের কারণেই বিশ্ববরেণ্য বৈজ্ঞানিক অ্যালবার্টআইনস্টাইন পর্যন্ত আমেরিকায় চলে যেতে বাধ্য হন। এছাড়া সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হয়। হিটলার,

নাৎসী কর্মসূচি ও জার্মান গৌরবগাথার অনুকূলে দিনরাত প্রচার চালানো হয়। এই প্রচার কাজের প্রধান দায়িত্বে ছিলেন প্রচার সচিব, একদা দর্শনের অধ্যাপক ডঃ গোয়েবলস্। তার বিখ্যাত উক্তি, 'একটি মিথ্যাকে দশবার প্রচার করলে জনগণ তা সত্য বলে গ্রহণ করবে।'

জার্মানির অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে হিটলার সমস্ত শ্রমিক সংগঠন ভেঙে দিয়ে নাৎসী দলের পরিচালনায় 'জাতীয় শ্রমিক ফ্রন্ট' গঠন করেন। এতে শিল্প ও বৈজ্ঞানিকদের উৎসাহ দেওয়া হয়েছিল। শ্রমিক-মালিকদের যৌথ প্রতিনিধি নেওয়া হয়েছিল। কলকারখানায় শিফট্ প্রথা চালু হয়। ধর্মঘট, লক আউট নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বজায় থাকলেও হিটলার ছিলেন ধনতন্ত্রের বিরোধী। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জার্মানিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য হিটলার নানাবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন।

৪। হিটলারের আগ্রাসী পররাষ্ট্রনীতি

প্রচণ্ড ক্ষমতা ও দক্ষতার অধিকারী একনায়কতন্ত্রী হিটলার যেমন আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতার দিকে মনোযোগ দিলেন তেমনি ছলে-বলে-কৌশলে বিশ্বের দরবারে জার্মানির শক্তি ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দিকে সচেষ্ট হলেন। তিনি জানতেন ভার্সাই সন্ধিতে জার্মানির প্রতি যে অবিচার করা হয়েছিল তার প্রতিশোধ গ্রহণ না করা পর্যন্ত জার্মানিকে ইয়োরোপের শ্রেষ্ঠ শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়। ভার্সাই সন্ধির শর্ত নাকচ করার সংকল্প নিয়ে তিনি জার্মান জাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি অধিকার ক'রে একটি ঐক্যবদ্ধ জার্মান সাম্রাজ্য গঠন করার দিকে মনোনিবেশ করলেন। এই সংকল্প সাধনের উদ্দেশ্যে তিনি জার্মানিকে আর্থিক ও সামরিক ক্ষেত্রে অসামান্য শক্তিশালী করে তোলার দিকে নজর দিলেন। সুতরাং লক্ষ্য করা যায়, হিটলার ক্ষমতালাভের পূর্বে 1925 খ্রিস্টাব্দে 'লোকার্নো' চুক্তি সম্পাদিত হয়। ঐ বছর জার্মানিকে 'লীগ অফ নেশনস্'-এর সদস্যভুক্ত করা হলো। উল্লেখ করা যায় যে, 1933 খ্রিস্টাব্দেই হিটলার পূর্ণ ক্ষমতা লাভ করেন। ক্ষমতা লাভের কয়েক মাসের মধ্যে হিটলার লীগ অফ নেশনস্-এর সদস্যপদ বর্জন করলেন। কারণ তিনি দেখলেন যে, লীগের শর্ত (Covenant) এবং আন্তর্জাতিক বিধি মেনে চলতে গেলে বলপ্রয়োগ বা আগ্রসী নীতি অবলম্বন করা সম্ভব নয়। তাই আন্তর্জাতিক বিধি-বন্ধন থেকে জার্মানিকে মুক্ত ক'রে হিটলার ভার্সাই সন্ধির শর্ত লঙ্ঘন করার উদ্দেশ্যে দেশে বাধ্যতামূলক সামরিক প্রথা (Conscription) প্রবর্তন করলেন (1935)। সঙ্গে সঙ্গে ভার্সাই সন্ধির 15 বছর পূর্ণ হওয়ায় জার্মানি সার অঞ্চল পুনরায় অধিকার করল। ভার্সাই-এর চুক্তিশর্তে এতদিন এটি ছিল ফ্রান্স ও বেলজিয়মের তত্ত্বাবধানে।

ইতোমধ্যে জার্মানির শক্তিবৃদ্ধি ও আগ্রাসী নীতির প্রয়োগ লক্ষ্য করে ফ্রান্স ও রাশিয়া এবং রাশিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হলো (1935)। এই চুক্তি ছিল মূলত আত্মরক্ষার চুক্তি। চুক্তি সম্পাদনের পরই ফ্রান্স, রাশিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া জার্মানির সমর

সজ্জা ও সম্প্রসারণ নীতির প্রতিবাদ করল। ফলে হিটলার দেখলেন যে ইয়োরোপ ভূখণ্ডে তিনি ক্রমশ বন্ধুহীন হয়ে পড়েছেন। তাই তিনি ইংল্যাণ্ডকে দলে নেওয়ার চেষ্টা করলেন। ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেন দেখলেন যে রাশিয়ানদের কমিউনিজমের অগ্রগতি রোধ করার জন্য জার্মানির শক্তিবৃদ্ধির প্রয়োজন আছে। তাই তিনি জার্মানিকে খুশি রাখার উদ্দেশ্যে একটি নৌচুক্তি সম্পাদন করলেন (1935)। ভার্সাই-এর শর্ত নাকচ করার লক্ষ্যে হিটলার এরপর (1936) লোকার্নো চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করে রাইনল্যাণ্ড দখল করলেন এবং ভার্সাই-এর শর্ত লঙ্ঘন করে তিনি সেখানে সৈন্য সমাবেশ করলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানি-অস্ট্রিয়ার মধ্যে সেন্ট জার্মেইন সন্ধি স্থাপিত হয়। ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বাবধি (1919-1933) নাৎসী দল অস্ট্রিয়াকে জার্মানির সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করে। 1934 খ্রিস্টাব্দে অস্ট্রিয়া সরকার তার রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে নাৎসী দলকে অবৈধ বলে ঘোষণা করে ইতালির সঙ্গে মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হয়। ক্ষমতায় আসার পর (1933) হিটলার অস্ট্রিয়ার সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে থাকেন। এরপর (1936) রোম-বার্লিন-টোকিও অক্ষশক্তি প্রতিষ্ঠার পর হিটলার ভার্সাই চুক্তি শর্তের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আক্রমণাত্মক সাম্রাজ্যবাদী নীতি প্রয়োগে তৎপর হলেন। 1938 খ্রিস্টাব্দে তিনি সেন্ট জার্মেইন সন্ধি ভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে অস্ট্রিয়ার অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত নাৎসী দলকে উত্তেজিত করলেন। নাৎসী দলের চাপে অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী সুচনিগ (Suchnigg) পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। এবার অস্ট্রিয়ার নাৎসী নেতা সিয়েশ ইঙ্কার্ট (Siyes Inquart) হলেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর আহ্বানে ও হিটলারের নির্দেশে জার্মান সেনাবাহিনী অস্ট্রিয়া অধিকার করল।

অস্ট্রিয়া অধিকারের পর এলো চেকোশ্লোভাকিয়ার পালা। এখানকার সুদেতান অঞ্চলটিতে ছিল জার্মান জাতির বসবাস। এই সময় ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার দুর্বলতা লক্ষ্য করে হিটলার কৌশলে সুদেতানসহ সমগ্র চেকোশ্লোভাকিয়া অধিকার করলেন। এইভাবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনা পর্যন্ত ভার্সাই সন্ধির প্রতিশোধ গ্রহণ পরিপ্রেক্ষিতে হিটলারের আগ্রাসী নীতি অব্যাহত ছিল।

1933 থেকে জার্মান সমরসজ্জা : ভার্সাই সন্ধিতে জার্মানিকে সামরিক শক্তি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। হিটলার জানতেন জার্মানিকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠা করতে হলে তাকে আধুনিক সমরসজ্জায় সজ্জিত করতে হবে। সুতরাং তিনি ভার্সাই সন্ধির শর্ত নাকচ করে সামরিক শক্তি বৃদ্ধির ব্যাপারে তৎপর হলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, 1933 খ্রিস্টাব্দে হিটলার ক্ষমতা লাভ করেন। ঐবছরই জার্মানি আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকে যোগদান করে ও ফ্রান্সের অনুরূপ সামরিক অস্ত্রশস্ত্র রাখার অধিকার দাবি করে। কিন্তু জার্মানির এই দাবি অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্র কর্তৃক সমর্থিত না হওয়ায় হিটলার জার্মান প্রতিনিধিকে সম্মেলন বর্জন করার নির্দেশ দেন। কয়েক মাসের মধ্যে হিটলার লীগ অফ

নেশনস্-এর সদস্যপদ বর্জন করলেন। 1935 খ্রিস্টাব্দে জার্মানির সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের একটি নৌ-চুক্তি সম্পাদিত হয়। এরপরই হিটলার জার্মানির জন্য যুদ্ধ-জাহাজ ও নৌযুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম নির্মাণে তৎপর হলেন। স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী নতুন নতুন আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হলো। দূর পাল্লার কামান, বিমান, রণতরী, ট্যাঙ্ক, স্বয়ংক্রিয় রাইফেল, সাঁজোয়া গাড়ী, ডুবোজাহাজ, বোমারু বিমান, বিষাক্ত গ্যাস ইত্যাদির সাহায্যে জার্মানি বিশ্বের অদ্বিতীয় শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হলো।

জার্মান জাতিতত্ত্ব: রোম-বার্লিন-টোকিও অক্ষশক্তি : নাৎসীগণ জার্মান জাতি সম্পর্কে খুবই উচ্চ ধারণা পোষণ করত। তাদের মতে টিউটন জাতিগোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত এই জার্মান জাতি প্রকৃত আর্যজাতির বংশধর। নাৎসীদের মতে ইংরেজ, ফরাসি, ইতালিয়রা হলো মিশ্র জাতি; তারা নিজেদের বিশুদ্ধ জাতি হিসেবে মনে করত। অন্যদিকে নাৎসীদের বিশ্বাস ছিল সমগ্র বিশ্বে শ্বেতকায় জাতিবর্গই শ্রেষ্ঠ; তবে তাদের মধ্যে জার্মান জাতি হল সর্বশ্রেষ্ঠ।

উপরিউক্ত জাতিতত্ত্বের নিরিখে নাৎসীদল সর্বদা জার্মান জাতির বিশুদ্ধতা রক্ষায় তৎপর ছিল। জার্মানজাতিকে অ-জার্মান প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার জন্য ইহুদি বিতাড়ন অথবা নিধনের নীতি তারা গ্রহণ করল। নাৎসীগণ মার্ক্সবাদের ঘোর বিরোধী ছিল। কারণ নাৎসীগণ বিশ্বাস করত যে, ধনী ও শ্রমিকের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করে বা সমন্বয় সাধন করে শ্রমিক সমাজকে মুক্ত করা যায় এবং এটা জাতীয় সমাজতন্ত্রের মাধ্যমে সম্ভব। মার্ক্সবাদীরা শ্রেণী সংগ্রামে বিশ্বাসী। সুতরাং শ্রেণী সংঘাতে উদ্বুদ্ধ সাম্যবাদীদের ধ্বংস করা প্রয়োজন। তেমনি নিছক ধনতন্ত্রবাদীদের উপরও নাৎসীগণের কোনও বিশ্বাস ছিল না।

উপরোক্ত বিশ্বাসের ফলে একনায়কতন্ত্রী হিটলার 1931 খ্রিস্টাব্দ থেকে ক্রমশ বন্ধুহীন হয়ে পড়েছিলেন। তাছাড়া এই সময় জাপান ও ইতালি নিজ নিজ আগ্রাসী-নীতির জন্য মিত্রহীন হয়ে পড়েছিল। মাঞ্চুরিয়া অধিকার করার ফলে জাপান ; ইথিওপিয়া দখল করার জন্য ইতালি এবং রাইন উপত্যকা অধিকার করার জন্য জার্মানি ইয়োরোপীয় শক্তিপুঞ্জে সহানুভূতি হারিয়েছিল। অন্যদিকে ভার্সাই সন্ধির সূত্রে উক্ত তিনটি রাষ্ট্রই ছিল অতৃপ্ত। ফলে পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে 1936-এর পূর্বেই তিনটি রাষ্ট্রের মধ্যে মিত্রতা স্থাপনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

হিটলার জানতেন যে, রাশিয়ার বিরোধিতা করলে পশ্চিমী জাতিপুঞ্জ খুশি হবে। তাই তিনি দূর প্রাচ্যের সামরিক শক্তিতে শক্তিমান জাপানের সঙ্গে সাম্যবাদ বিরোধী চুক্তি (Anti Commintern Pact) অর্থাৎ রাশিয়া-বিরোধী চুক্তি সম্পাদন করলেন (1936) । সেই বছরেই (1936) ইতালির ফ্যাসিবাদী মুসোলিনি পূর্ব-আফ্রিকার আবিসিনিয়া দখল করেন।

এর জন্যে লীগ অফ নেশনস্ ইতালির বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ ঘোষণা করে। জার্মানি এই সময় লীগের নির্দেশ অমান্য করে মুসোলিনিকে সামরিক সাহায্য প্রদান করেন। ফলে হিটলারের সঙ্গে এই সময় মুসোলিনির ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ ঘটল। ইতালি অবিলম্বে লীগ অফ নেশনস্-এর সদস্যপদ ত্যাগ ক'রে (1937) জার্মানির সঙ্গে সামরিক চুক্তি সম্পাদন করল। প্রতিষ্ঠিত হলো 'রোম-বার্লিন চক্র'। ইতোপূর্বে জাপানের সঙ্গে জার্মানির 'বার্লিন-টোকিও' চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। এবার ত্রিশক্তির মিলনে গঠিত হলো 'রোম-বার্লিন-টোকিও অক্ষশক্তি' (Rome-Berlin-Tokyo Axis)। তিনটি রাষ্ট্রেই ছিল একনায়কতন্ত্র। বিশ্বের যৌথ নিরাপত্তা ভেঙে গেল। লীগ অফ নেশনস্ অকেজো হয়ে পড়ল। বিশ্বের শক্তিপুঞ্জের মধ্যে গড়ে উঠল ফ্যাসিস্ট এবং অ- ফ্যাসিস্ট দুটি জোট।

1937 খ্রিস্টাব্দের পর নাৎসীদল জার্মান জাতিতত্ত্বের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, ডানজিগ ইত্যাদি অঞ্চলে ছিল নাৎসী জার্মানির সংখ্যাধিক্য। তখন অস্ট্রিয়ার অর্থ ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ছিলেন নাৎসী নেতা সিয়েস ইনকার্ট। তাঁরই আহ্বানে 1938 খ্রিস্টাব্দে জার্মানির নাৎসী সেনাদল পূর্বের সেন্ট জার্মেইন সন্ধি ভঙ্গ করে অস্ট্রিয়া অধিকার করে। হিটলার কৃত্রিম গণভোটের মাধ্যমে অস্ট্রো-জার্মান সংযুক্তির কথা ঘোষণা করেন। দ্বিতীয় স্তরে ঐ বছরেই চেক নাৎসীদল চেকোশ্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। চেকোশ্লোভাকিয়ার সুদেতান অঞ্চলের নাৎসী নেতা হেনলিয়েন দাবি করেন যে, সুদেতান অঞ্চলটি জার্মান অধ্যুষিত, তাই এটি জার্মানিকে দিতে হবে। চেক সরকার সুদেতান অঞ্চলটিকে জার্মানির হস্তে অর্পণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু হিটলার এটুকুতে খুশি হতে পারেননি। ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন সুদেতান অঞ্চল নিয়ে জার্মানি ও চেকোশ্লোভাকিয়ার মধ্যে একটা আপোষ-মীমাংসার চেষ্টা করেন। অবশেষে 1938 খ্রিস্টাব্দে মিউনিখ বৈঠকে ইতালির মুসোলিনির মধ্যস্থতায় ব্রিটেন ও ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী যথাক্রমে চেম্বারলেন ও দালাদিয়ের জার্মানির হিটলারের সঙ্গে এক চুক্তি সম্পাদন করেন। এটি মিউনিখ চুক্তি (Munich Pact) নামে ইতিহাসে খ্যাত। চুক্তিতে সুদেতান অঞ্চল পাকাপাকিভাবে জার্মানির হাতে চলে এল। হিটলারের প্রতিশ্রুতি ছিল "সুদেতান অঞ্চল হলো ইয়োরোপের কাছে তাঁর শেষ দাবী।" মিউনিখ চুক্তিতে সোভিয়েট রাশিয়াকে আমন্ত্রণ করা হয়নি। এর ফলে কয়েক বছর পূর্বেকার ফ্রাঙ্কো-রুশ গ্যারান্টি চুক্তি ব্যর্থ হলো। কারণ মিউনিখ চুক্তিতে ফ্রান্স ছিল অন্যতম সদস্য। এসবের ফলে রাশিয়া কর্তৃক জার্মান-বিরোধী মহাজোট গঠনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো। এদিকে ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গের দুর্বলতার সন্ধান পেয়ে হিটলার কিছুদিন পরেই অরাজকতার অজুহাতে সমগ্র চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করেন (1939)।

অস্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়ার পরই এলো পোল্যাণ্ডের পালা। ভার্সাই সন্ধিতে জার্মানি বাল্টিক সাগরের তীরে অবস্থিত অন্যতম প্রসিদ্ধ বন্দর ডানজিগকে (Danzig) আন্তর্জাতিক

উন্মুক্ত শহর হিসেবে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু তখন থেকেই এই শহরের বসবাসকারী জার্মানরা পোল সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। এবার তাদেরই সহযোগিতা পেয়ে হিটলার ডানজিগ শহরকে জার্মানির অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানান। শেষ পর্যন্ত হিটলার পোল্যান্ড আক্রমণ করলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়।

রাশিয়ার সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি : রোম-বার্লিন-টোকিও চুক্তি ছিল মূলত সাম্যবাদ-বিরোধী চুক্তি (Anti-Commintern Pact) অর্থাৎ রাশিয়া-বিরোধী চুক্তি। তাই স্ট্যালিন সামরিক সাজ-সরঞ্জাম বৃদ্ধির দিকে মনযোগ দিলেন। স্ট্যালিন লক্ষ্য করলেন উপরিউক্ত চুক্তির পর জার্মানি পূর্বাঞ্চলে একের পর এক ভূখণ্ড অধিকার করেই চলেছে। অথচ পশ্চিমী শক্তিপুঞ্জ যেমন -ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি কেউ রাশিয়ার নিরাপত্তার দিকে মনোযোগ দিচ্ছে না। তারা শুধু হিটলারকে তোষামোদ করতে ব্যস্ত। এই অবস্থায় স্ট্যালিন নিরাপত্তার অভাব বোধ করলেন। অন্যদিকে পূর্বাঞ্চলে জার্মানির অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিরোধ করার মত রাশিয়া ভিন্ন অন্য কোনও শক্তি অবশিষ্ট ছিল না। সুতরাং বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বেই (24শে আগস্ট, 1939) রাশিয়া ও জার্মানির মধ্যে অনাক্রমণ চুক্তি (Non-aggression Pact) সম্পাদিত হলো। এই চুক্তি একদিকে যেমন রাশিয়াকে আত্মরক্ষা বা নিরাপত্তা দেওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত করল তেমনি হিটলারকে প্রতিরোধকারী পূর্বাঞ্চলীয় শক্তি সম্পর্কে নিশ্চিত করল। কিন্তু এ-সম্পর্কে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এই অনাক্রমণ চুক্তিটি জার্মানিকে পোল্যাণ্ড আক্রমণে উদ্বুদ্ধ করে।

নাৎসী জার্মানি সম্পর্কে ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের মনোভাব : 1917 খ্রিস্টাব্দে বলশেভিক বিপ্লবের সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম ইয়োরোপের শক্তিপুঞ্জের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছিল। ধনতন্ত্রের অবসান ঘটানোই ছিল সাম্যবাদী রাশিয়ার মূল কর্মসূচি। তবুও সাম্যবাদী রাশিয়ার মত একটা বিশাল রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করে পশ্চিম-ইয়োরোপের ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি লাভবান হওয়ার আশা ত্যাগ করতে পারেনি। তাই লক্ষ্য করা যায়, 1924 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ইংল্যাণ্ডে, ফ্রান্স, নরওয়ে, গ্রিস, হাঙ্গেরী, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশ রাশিয়ার সাম্যবাদী সরকারকে স্বীকৃতি দিল। ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশ রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কও স্থাপন করে। কিন্তু ইয়োরোপীয় দেশগুলি রাশিয়ার সংশ্রবে এলেও তারা সাম্যবাদী ভীতিকে মন থেকে দূর করতে পারেনি। অবশেষে জার্মানির হিটলার যখন নাৎসী নীতির মূলসূত্র অনুসারে কমিউনিস্ট নিধনযজ্ঞ শুরু করলেন তখন পশ্চিম ইয়োরোপের শক্তিপুঞ্জসহ নেতৃস্থানীয় শক্তি ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স আশ্বস্ত হলো। পশ্চিমী শক্তিগুলি হিটলারকেই রাশিয়ার কমিউনিস্ট ভাবধারার অগ্রগতি রোধ করার একমাত্র নির্ভরশীল ব্যক্তি বলে গ্রহণ করল। এর জন্য ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স জার্মান তোষণ নীতি শুরু করল (Policy of Appeasement)। এরপর 1938 খ্রিস্টাব্দে হিটলার অতীতের সেন্ট জার্মেইন সন্ধি ভঙ্গ করে অস্ট্রিয়া

অধিকার করল। ইংল্যাণ্ড এই আক্রমণে নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করল। অন্যদিকে ফ্রান্স এককভাবে জার্মান বাহিনীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হতে সাহস পেল না। অস্ট্রিয়ার পর জার্মান বাহিনী চেকোশ্লোভাকিয়ার সীমান্তে হাজির হলো (1938)। ইংল্যাণ্ড এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতি অবলম্বন করল। ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী হিটলারের আক্রমণ প্রতিরোধে দ্বিধাবোধ করলেন। মুসোলিনির মধ্যস্থতায় তারা হিটলারের সঙ্গে '*মিউনিখ চুক্তি*' সম্পাদন করেন (1938)। এরপর *ডানজিগ* বন্দর এবং পোল্যাণ্ডের প্রতি হিটলারের দৃষ্টি পড়ল। ডানজিগে ছিল জার্মান জাতির বসবাস। তাই হিটলার এই বন্দর অধিকারে দাবি জানালেন। তাছাড়া পোল্যাণ্ডের ভিতর দিয়ে যেতে পূর্বপ্রাশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়-এমন একখণ্ড ভূমিও (Corridor) দাবি করলেন। এই অবস্থায় ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স পোল্যাণ্ডকে সাহায্য করার জন্য জোটবদ্ধ হলো এবং একত্রে হিটলারকে সতর্ক করে দিল। সেই সতর্কবাণী অগ্রাহ্য করে হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করলেন। (পয়লা সেপ্টেম্বর, 1939)। শুরু হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের জার্মান তোষণ নীতির পরিণাম ভয়াবহ হয়ে উঠল।

জার্মানির পোল্যাণ্ড আক্রমণ ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত ঃ মিউনিখ চুক্তির (1938) সময় হিটলার ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সসহ ইয়োরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রের দুর্বলতা লক্ষ্য করে উক্ত চুক্তি ভঙ্গ করে চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করলেন (1939)। সঙ্গে সঙ্গে লিথুয়ানিয়ার নিকট থেকে মেমেল বন্দর এবং বোহেমিয়া ও মোরাভিয়া অঞ্চল দুটিকে জার্মান নিয়ন্ত্রণাধীন করলেন। এই সময় মুসোলিনির হস্তক্ষেপের ফলে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স যুদ্ধ ঘোষণা করতে দুদিন বিলম্ব করে। তবে তারা পোল্যাণ্ডের সীমান্ত থেকে জার্মান বাহিনী অপসারণের দাবি করে। হিটলার সেই দাবি অগ্রাহ্য করায় ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স 1939 খ্রিস্টাব্দের 3rd সেপ্টেম্বর জার্মানির বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এর পরই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গতি ত্বরান্বিত হলো।

হিটলারের আগ্রাসী পররাষ্ট্রনীতি প্রসঙ্গে আরও কিছু কথা বলা দরকার। হিটলারই 1939 খ্রিস্টাব্দে বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করেন। অবশ্য 1941 খ্রিস্টাব্দের 7 ডিসেম্বর জাপান আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই দ্বীপের পার্ল হারবারে বোমা নিক্ষেপ করা পর্যন্ত, যুদ্ধ মূলত ছিল ইয়োরোপীয় যুদ্ধে। 1941 থেকে সোভিয়েট ইউনিয়ন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং জাপান যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এই যুদ্ধের সূচনার সঙ্গে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনার মিল ছিল। দুটি ক্ষেত্রেই জার্মানির উত্থানের প্রশ্ন ছিল প্রধান। *ডেভিড টমসন* লিখেছেন, "The six years' war which Hitler began in September 1939 had so many resemblences to the great war of 1914 that from the first it was regarded, accurately enough, as the Second World War"। মূলত দেখা যাচ্ছে 1933 খ্রিস্টাব্দে হিটলার জার্মানির চ্যান্সেলার হওয়ার আগেই তাঁর আগ্রাসী পররাষ্ট্রনীতি বিশ্বযুদ্ধ ডেকে এনেছিল।

হিটলারের আগ্রাসী পররাষ্ট্রনীতিকে কেন্দ্র করে ঐতিহাসিকদের মধ্যে নানা মত আছে। তবে এই বিদেশ নীতি নির্ধারণ করতেন স্বয়ং ফ্যুয়েরার হিটলার। তিনি অবশ্য বিদেশমন্ত্রী রিবেনট্রপ (Joachini von Ribbentrop) -এর মতামতে গুরুত্ব দিতেন। গোয়েরিং (Goering) -এর মতও শুনতেন। হিটলার ভার্সাই সন্ধি সংশোধন করার দাবি করেছিলেন, না আগ্রাসী পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করে সব বদলে দিয়েছিলেন? অধ্যাপক *এ জে পি টেলার* তাঁর *Origins of the Second World War* গ্রন্থে (1961) একথা বলার চেষ্টা করেছেন— হিটলারের পররাষ্ট্রনীতি তাঁর পূর্বসূরীদের অনুসৃত নীতিরই অনুসরণ, যার উদ্দেশ্য হলো জার্মানির বিপুল ক্ষমতার জোরেই তাকে ইয়োরোপের শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করা। জার্মান ঐতিহাসিকদের এক বিশেষ গোষ্ঠী যাদের '*পোগ্রাম ফুল*' বলা হয় এই মত আদৌ মানেন নি। ঐ গোষ্ঠীর *হিলগ্রুবার, হিলডেব্রানড্‌* প্রমুখের মতে হিটলারের পররাষ্ট্রনীতি তাঁর নিজস্ব, তা 1920 থেকে উদ্ভাবিত। তাদের মতে হিটলারের বিদেশ নীতির প্রথম পর্ব মহাদেশীয় (Continental) এবং দ্বিতীয় পর্ব বিশ্বব্যাপী (Global)। প্রথম পর্বে উদ্দেশ্য ছিল ফ্রান্সকে পরাজিত করা এবং রাশিয়ার অংশ দখল করা; দ্বিতীয় পর্বে জার্মানিকে বিশ্বশক্তিতে পরিণত করাই হলো মূল লক্ষ্য। *অ্যালান বুলক* তার '*হিটলার আ স্টাডি ইন টির‍্যানি*' গ্রন্থে (1967) লিখেছেন যে, হিটলারের বিদেশ নীতিকে বুঝতে হবে উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের সামঞ্জস্যের সঙ্গে পদ্ধতি ও কৌশলের চরম সুবিধাবাদের সংযোগের মধ্য দিয়ে।

1933 থেকে 1936 -এর মধ্যে হিটলার ব্রিটেন ও ইতালির সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে ফরাসি প্রতিপত্তি বিনষ্ট করার লক্ষ্য নিয়েছিলেন। জার্মানি নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়। জাতিসংঘের সদস্য পদ ত্যাগ করে। বিমান বাহিনী ও সৈন্য সংখ্যা বাড়ায়। 1936 খ্রিস্টাব্দে জার্মানি স্পেনের গৃহযুদ্ধে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর সমর্থনে পপুলার ফ্রন্টের বিরুদ্ধে বিমানবহর (Luft waffe) এবং ট্যাঙ্ক পাঠায়। তাই এই গৃহযুদ্ধকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মহড়া বলা হয়। 1937 খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত হাসব্যাক সম্মেলনে হিটলার তাঁর ভাষণে আগ্রাসী পরারাষ্ট্রনীতির কথা খোলাখুলি বলেন। অস্ট্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্তি (একে জার্মান ভাষায় বলে Anschluss) বা চেকোশ্লোভাকিয়া তো বটেই পরে পোল্যাণ্ড পর্যন্ত তাঁর আগ্রাসী নজরে পড়ে। এরপর রাজ্য বিস্তার নীতি ও আগ্রাসনই হয়ে দাড়ায় হিটলারের পররাষ্ট্রনীতির মূলকথা।

৫। উত্তরকালের কথা

হিটলার যখন আগ্রাসী পররাষ্ট্রনীতির মাধ্যমে ইয়োরোপে তাঁর রক্তচক্ষু দেখাচ্ছিল তখন ব্রিটেন ও ফ্রান্স তাকে প্রতিরোধ করেনি, বরং তোষণমূলক (appeasement) নীতি নিয়ে চলেছিল। কিন্তু 'নাগিনীরা চারদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস' যখন এরূপ ইয়োরোপের অবস্থা হল তখন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেন এবং ফরাসি প্রধানমন্ত্রী

দালদিয়ের আপোষ করতে চেয়েছিলেন। অথচ মিউনিখ চুক্তি (1938) স্বাক্ষর করার ছ'মাসের মধ্যে বলদর্পী হিটলার তা ভেঙে চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করে নেন। শেষপর্যন্ত 1939 -এর পয়লা সেপ্টেম্বর হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করলে কার্যতঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। *এ জে পি টেলর* ইঙ্গ-ফরাসি তোষণ নীতিকেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য দায়ী করেছেন। যাই হোক, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি-ইতালি-জাপান -এর অক্ষ শক্তির (Axis Power) বিরুদ্ধে ব্রিটেন, ফ্রান্স, সোভিয়েট রাশিয়া এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রশক্তি (Allied Power) শেষপর্যন্ত জয়লাভ করে।

মিত্রবাহিনীর হাতে ফ্রান্স যখন পুনরুদ্ধার হলো তখনই জার্মানির দিন শেষ হয়ে আসে। 1945 -এর জানুয়ারি থেকেই হিটলার তাঁর প্রধান কার্যালয় চ্যানসেলারীর বাগানের ভূগর্ভে পঞ্চাশফিট নিচে বিশেষভাবে তৈরি এক বাঙ্কারে আশ্রয় নেন। সেখানেই তিনি শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করেছিলেন। ঐ বছর 7মে জার্মানি শেষপর্যন্ত মিত্র বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে।

অধ্যায় ২৩
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা

(Syllabus: *Outbreak of the Second World War-Different Interpretations)*

১। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঃ 1939 খ্রিস্টাব্দের 1st সেপ্টেম্বর থেকে 1945 -এর 14th আগস্ট জাপান আত্মসমর্পণ করা পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলেছিল। এই যুদ্ধের পিছনে নানাবিধ কারণ ছিল, যেমন ভার্সাই সন্ধির ত্রুটি, জার্মানি ও ইতালিতে একনায়কতন্ত্রের উত্থান, ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত, জাতিসংঘের ব্যর্থতা ইত্যাদি। আমরা যুদ্ধের কারণগুলি বিস্তারিত আলোচনার পর কীভাবে বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত হলো তা লক্ষ্য করব। তেমনি বিশ্বযুদ্ধের কারণ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকদের মধ্যে যে নানা মত ও ব্যাখ্যা আছে সে-বিষয়েও দৃষ্টি দেব। তার আগে ভূমিকাস্বরূপ সমগ্র বিশ্বযুদ্ধের কাহিনী অতি সংক্ষেপে জেনে রাখা দরকার।*

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে একদিকে ছিল অক্ষশক্তি (Axis); যার অন্তর্গত ছিল জার্মানি, ইতালি, জাপান; বিপরীতে মিত্রশক্তি (Allied) যার মধ্যে ছিল ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়া। 1939 খ্রিস্টাব্দের 1st সেপ্টেম্বর জার্মান বাহিনী পোল্যাণ্ড আক্রমণ করে; 3rd সেপ্টেম্বর ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। সূচনায় ইতালি, রাশিয়া, আমেরিকা জাপান কেউই ছিল না কিন্তু একে একে সকলেই নিজ স্বার্থে ভিন্ন ভিন্ন পক্ষে যোগ দেয়। রাশিয়া জার্মানির সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি (আগস্ট, 1939) করার এক মাসের পরই জার্মানি পোল্যাণ্ড আক্রমণ করে। তারপর ইঙ্গ-ফরাসি মিত্রশক্তি জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেও জার্মানির বিরুদ্ধে আক্রমণ চালায় নি। তাই *উইনস্টন চার্চিল* একে ছায়াযুদ্ধ (Phony War) বলেছেন। রাশিয়া বরং পোল্যাণ্ডের কিছু অংশ এবং বাল্টিক রাজ্যগুলি (এস্তোনিয়া, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া) দখল করে, তবে ফিনল্যাণ্ড আক্রমণ করলেও তা দখল করতে পারেনি। জার্মানি পোল্যাণ্ডের পর একে একে ডেনমার্ক, নরওয়ে, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড এবং লুক্সেমবার্গ অধিকার করে ফ্রান্সে ঢুকে পরে (1940)। ঐ সময় মিত্রপক্ষ প্রবল বিক্রমে ঝাঁপালেও তারা ছিল রক্ষণাত্মক। 1940

---

* কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচি অনুযায়ী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা পর্যন্ত এই গ্রন্থের আলোচ্য কিন্তু ইতিহাসের ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসও সংক্ষেপে জানা দরকার। তাই অতি সংক্ষেপে যুদ্ধের কাহিনী ও ফলাফল এখানে উল্লেখ করা হলো। তবে যুদ্ধোত্তর ইয়োরোপে বা বিশ্ব ইতিহাসে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটলেও আলোচনার সুযোগ নেই।

এর 13 জুন জার্মান সৈন্যরা প্যারিস দখল করে। এর আগে ফ্রান্সের ডানকার্ক বন্দরে জার্মানির সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে প্রায় তিন লক্ষাধিক ইঙ্গ-ফরাসি-বেলজিয়ান সৈন্য অবরুদ্ধ হয়ে পড়লেও আশ্চর্যজনকভাবে জার্মান বোমারু বিমান ও কামানের গোলা উপেক্ষা করে মিত্রপক্ষীয় সেনাপতিরা ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করে ছ'দিনের মধ্যে যুদ্ধ জাহাজ ব্রিটেনে সরিয়ে নেন। ঐ বিশাল সেনাবাহিনী জার্মানির হাতে বন্দী হলে মিত্রপক্ষকে তখনই আত্মসমর্পণ করতে হত। 1940 খ্রিস্টাব্দেই মুসোলিনির ইতালি জার্মানির সঙ্গে পূর্বেকার সন্ধি (Pact of Steel) অনুসারে অক্ষ বাহিনীতে যোগ দেয় এবং ফ্রান্সের উপর আক্রমণ করে।

যুদ্ধের আগেই ইঙ্গ-ফরাসি নিষ্ক্রীয়তা দুই দেশে সমালোচিত হয়। ব্রিটেনে নেভিল চেম্বারলেন সরকারের পতনের পর চার্চিলের নেতৃত্বে সর্বদলীয় যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। ফ্রান্সে দালদিয়ের মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। প্রধানমন্ত্রী হন পল রেনো। জার্মানির আক্রমণে বিধ্বস্ত ফ্রান্সে রেনো পদত্যাগ করলে জেনারেল পেঁতা দায়িত্ব নেন। তিনি জার্মানির কাছে আত্মসমর্পন করেন। 1918 খ্রিস্টাব্দের 11 নভেম্বর কাম্পেই-এর বনাঞ্চলে এক পরিত্যক্ত রেলগাড়ির কামরায় যেভাবে অপমানজনক ভার্সাই সন্ধি স্বাক্ষর করতে হয়েছিল, ঠিক সেই স্থানে সেই কামরায় 1940 -এর 21 নভেম্বর ফরাসিদের আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করানো হয়। ফ্রান্সের পাঁচভাগের তিনভাগ জার্মানি নিয়ে নিলে বাকি অংশ ফিলিপ পেতাঁর নেতৃত্বে ক্রীড়নক সরকার টিকে থাকে। পরে লণ্ডনে অবশ্য ফরাসি বাহিনী **জেনারেল দ্যগল** -এর নেতৃত্বে স্বাধীন সরকার গঠন করে।

এরপর 1940 -এর আগস্ট মাসে জার্মানি ব্রিটেনে প্রবল বিমান আক্রমণ করেও সাফল্য পায়নি। 1941 -এর 22 জুন জার্মানি রাশিয়া আক্রমণ করায় রাশিয়া মিত্রপক্ষে যোগদেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও সরাসরি যুদ্ধে যোগ দেয় 1941 -এর 7 ডিসেম্বর— জাপান হাওয়াই দ্বীপের পার্ল হারবারে বোমা নিক্ষেপের পর। এর আগেই জাপান যোগ দিয়েছিল অক্ষশক্তির দিকে; আমেরিকা সক্রিয় সাহায্য করতে শুরু করেছিল মিত্রশক্তিকে। জাপান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশ দখল করে নেয়। জার্মানির রাশিয়া আক্রমণের বিরুদ্ধে রুশবাহিনী প্রচণ্ড সাহসিকতার সঙ্গে প্রতিরোধ গড়ে। শেষ পর্যন্ত রুশ মার্শাল *ঝুকভ* -এর কাছে জার্মান সেনাপতি ফন পাউলাস আত্মসমর্পন করে। বিখ্যাত স্ট্যালিনগ্রাডের যুদ্ধে রুশ বাহিনীর বীরত্ব আজও স্মরণীয়। 1940 জুন মাসে ফ্রান্সের পতন, আগস্ট থেকে ব্রিটেনের উপর ব্যাপক বিমান আক্রমণ এবং পৃথিবীর নানা প্রান্তে যুদ্ধের বিস্তার আমেরিকাকে উদ্বিগ্ন করল, প্রেসিডেন্ট *রুজভেল্ট* মার্কিন *সেনেটে লেণ্ডলীজ* আইন পাস করিয়ে মিত্রপক্ষকে সাহায্য করতে শুরু করেন। রুজভেল্ট-চার্চিল **'অ্যাটলান্টিক চার্টার'** (আগস্ট 1941) স্বাক্ষর করে বিশ্বশান্তির আবেদন করলেও ডিসেম্বর 1941খ্রিঃ জাপানের আগ্রাসী নীতি আমেরিকাকে যুদ্ধে নামায়। ইতালি উত্তর আফ্রিকায় আক্রমণ চালালে ব্রিটিশ সেনাপতি *আর্চিবল্ড ওয়াভেল* (ইনি পরে ভারতে ভাইসরয় হয়ে এসেছিলেন) তা প্রতিহত করেন।

জার্মানি বিখ্যাত সেনাপতি *রোমেলকে* পাঠালে, ব্রিটিশ ও আমেরিকানরাও যথাক্রমে *মন্টগোমারি* ও *প্যাটনকে* পাঠায়। শেষপর্যন্ত আফ্রিকায় মিত্রপক্ষেরই জয় হয়। 1943 খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে মুসোলিনির পতন হয়। সেখানে অ-ফ্যাসিস্ট সরকার হয় এবং তারা মিত্রপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করে (সেপ্টেম্বর, 1943)। হিটলারের জার্মান সৈন্য ইতালির সাহায্যার্থে পাঠালেও ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়। 1945 -এর 28 এপ্রিল মুসোলিনি ফ্যাসিবিরোধী উন্মত্ত জনতার হাতে ধরা পড়ে নির্মমভাবে প্রাণ হারান। অন্যদিকে মার্কিন *জেনারেল আইসেন হাওয়ারের* নেতৃত্বে মিত্রপক্ষীয় বাহিনী দ্বিতীয় রণাঙ্গনে (1943 ডিসেম্বর থেকে) জার্মানিকে কোণঠাসা করে ফেলে, 1944 -এর 6 জুন মিত্রপক্ষের নৌবহর অভিযানে জার্মানি দুর্বল হয়ে পড়ে। ঐ দিনটিকে **D-Day** (Deliverance Day বা মুক্তি দিবস) বলা হয়। 1944 -এর 25 আগস্ট মিত্রবাহিনী প্যারিস দখল করে নেয়। ঐ বছর সেপ্টেম্বর থেকে জার্মানির পতন দ্রুত শুরু হয়। 1945 -এর 2 মে রাশিয়ার লালফৌজ বার্লিন দখল করে নেয়। 1945 -এর 7 মে জার্মানি আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পন করে।

1945 -এর ফেব্রুয়ারি মাসে রুজভেল্ট-চার্চিল-স্ট্যালিন ক্রিমিয়ার ইয়াল্টা সম্মেলনে মিলিত হয়ে যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন। এর পর 1945 -এর জুলাই মাসে জার্মানির পটস্‌ড্যাম শহরে এক সম্মেলনে মিত্রপক্ষ মিলিত হয়ে জাপানকে আত্মসমর্পণ করতে বললে জাপান অস্বীকার করে। আমেরিকা ঐ বছর 6 আগস্ট হিরোশিমা এবং 9 আগস্ট নাগাসাকিতে আনবিক বোমা নিক্ষেপ করলে জাপান বাধ্য হয়ে 14 আগস্ট আত্মসমর্পণ করলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটে। এরপর যুদ্ধের শেষের দিকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (U.N.O) বিশ্বশান্তি রক্ষার্থে গঠিত হয়।

পটভূমিকা : (1918 খ্রিস্টাব্দেব 11th নভেম্বর জার্মানি এবং তার সহযোগী দেশগুলি আত্মসমর্পণের পর প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের অবসান হয়েছিল) তারপর বিজয়ী মিত্রশক্তি (ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রমুখ) প্রথমে প্যারিস শান্তি সম্মেলনে বসে এবং পরে জার্মানি, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, বুলগেরিয়া এবং তুরস্কের সঙ্গে আলাদা আলাদা ভাবে সন্ধি করে। এই সন্ধিগুলির উদ্দেশ্য ছিল ইয়োরোপের মানচিত্রের পুনর্বিন্যাস, নিরস্ত্রীকরণ, ক্ষতিপূরণ এবং শান্তি ফিরিয়ে আনা। কিন্তু এই সব চুক্তি মূলত জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ফলে শান্তি প্রচেষ্টা ছিল জবরদস্তিমূলক (Dictated peace)। জার্মানির সঙ্গে হয়েছিল ভার্সাই সন্ধি (1919)। শেষ পর্যন্ত 1939 খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে হিটলারের জার্মানি পোল্যাণ্ড আক্রমণ করলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়। ফলে শান্তি ও সকলের নিরাপত্তার প্রশ্নটি বিভিন্ন দেশের নেতৃবর্গ স্মরণে রাখলেও শেষপর্যন্ত যে নিরর্থক হল তার অনেক কারণ ছিল। উইলসনের চৌদ্দ দফা নীতি বিভিন্ন সন্ধিতেপ্রতিফলিত হয়নি। জাতিসংঘ গঠন করে যৌথ নিরাপত্তার

(Collective Security) বোধকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় অথচ বাস্তবে তা সঠিক প্রয়োগ হয়নি। প্রতিশোধমূলক মনোবৃত্তি থেকে ক্ষতিপূরণের (Reparation) উপর যতখানি জোর দেওয়া হয়েছিল, নিরস্ত্রীকরণের (Disarmament) ব্যাপারে ততখানি সততা দেখানো হয়নি। এর উপর দেখা দিল জার্মানিতে হিটলার ও নাৎসী দলের এবং ইতালিতে মুসোলিনি ও ফ্যাসিস্ট দলের উত্থান। ফ্যাসিবাদ সমাজের শত্রু বলে প্রতিভাত হওয়া সত্ত্বেও তার বিরুদ্ধে ব্রিটেন-ফ্রান্স গ্রহণ করল তোষণনীতি (Appeasement)। বরং রাশিয়ার সরকার এবং সাম্যবাদ গণতন্ত্র-বিরোধী ধরে নিয়েই পশ্চিম ইয়োরোপ ফ্যাসিবাদকে তোষণ করেছিল, যার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, স্পেনের গৃহযুদ্ধ। শেষপর্যন্ত কুড়ি বছর ঠেকিয়ে রাখার পর আবার ইয়োরোপে যুদ্ধ শুরু হলো এবং অচিরে তা সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল। তবে এই যুদ্ধের জন্য শুধু জার্মানি একা দায়ী ছিল ভাবলে ভুল হবে, এর পিছনে নানাবিধ কারণ ছিল।

ভার্সাই সন্ধি ঃ ভার্সাই সন্ধির শর্তে অখুশি জার্মানি কর্তৃক প্রতিশোধ গ্রহণের তীব্র ইচ্ছা থেকেই এই যুদ্ধ সংঘঠিত হয়। তাই বলা হয় ভার্সাই সন্ধির ভিতরেই ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ। প্রতিক্রিয়াশীল স্বার্থপর শক্তিপুঞ্জের বেয়নেটের সামনে জার্মানিকে এই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করতে হয়েছিল। সন্ধির শর্তে জার্মানিকে সবদিক থেকে পঙ্গু করা হলো। উপনিবেশসহ রাজ্য-সীমার কিছু কিছু অংশ থেকে জার্মানি বঞ্চিত হলো। জার্মানির নৌবাহিনীকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হলো। সৈন্য সংখ্যা ও অস্ত্রশস্ত্র কমিয়ে সামান্যতম করে রাখা হলো। কয়লা এবং লৌহ খনি অঞ্চল কেড়ে নেওয়া হলো। তাছাড়া জার্মানির উপর চাপিয়ে দেওয়া হলো যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের অপর্যাপ্ত অর্থ; যে অর্থ পরিশোধ করা তার পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। জার্মানিতে বৈদেশিক সৈন্য আমদানী করে সন্ধির শর্ত পূরণের ব্যবস্থা হলো। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে পড়ল যখন ফরাসিরা ভিয়েনার শর্ত অনুসারে রূঢ় উপত্যকা দখল করল। এক কথায় প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মানিকে যেমন পঙ্গু ও দুর্বল করে রাখার ব্যবস্থা হলো তেমনি পদে পদে তাকে অপদস্থ ও হেনস্থা করার ব্যবস্থাও গৃহীত হলো। পরাজয়ের গ্লানির সঙ্গে ইয়োরোপীয় শক্তিপুঞ্জের আচার-আচরণ জার্মান জাতির মনে এক অদ্ভুত ধরনের আত্মসচেতনতা ও জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটিয়েছিল। অন্যদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানিতে গঠিত ভাইমার সাধারণতন্ত্র (Weimar Republic) জার্মানির সর্বগ্রাসী সমস্যাগুলির সমাধানে অকৃতকার্য হলো। 1924-25 খ্রিস্টাব্দ থেকে জার্মানির অর্থনৈতিক সঙ্কট চূড়ান্তভাবে ঘনীভূত হলো। সরকারের প্রতি জার্মানজাতি আস্থা হারাল। এমনই এক সঙ্কটময় অবস্থার মধ্যে নাৎসী দলের প্রভাব বৃদ্ধি পেল। অবশেষে এই দলের নেতা হিটলার 1933 খ্রিঃ জানুয়ারিতে জার্মানির চ্যান্সেলর পদে অভিষিক্ত হলেন। হিটলার ঘোষণা করলেন যে, ইয়োরোপে শান্তি ফিরিয়ে আনাই তার কাম্য। হিটলার তাঁর প্রতিশ্রুতি পালনের পরিপ্রেক্ষিতে 1934 খ্রিস্টাব্দে পোল্যাণ্ডের সঙ্গে এবং 1935 খ্রিস্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের

সঙ্গে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করলেন। 1934 খ্রিস্টাব্দে অস্ট্রিয়াতে যখন বিদ্রোহ হলো তখন তিনি নিরপেক্ষ রইলেন; কিন্তু ভিতরে ভিতরে হিটলার সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করে জাতীয়তাবাদ ও আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবির কথা ঘোষণা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভার্সাই সন্ধির অপমানজনক শর্তের বিরুদ্ধে জার্মান জাতির সমরবাদী মনোভাব প্রবল হয়ে উঠল। 1936 খ্রিস্টাব্দের পর হিটলার যে আগ্রাসী নীতি গ্রহণ করলেন তা অবিলম্বে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পথ প্রশস্ত করল। সুতরাং ভার্সাই সন্ধির অন্যায় শর্ত-ই ছিল বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ।

জাপানী সাম্রাজ্যবাদের উত্থান : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্য একটি কারণ হলো জাপানী সাম্রাজ্যবাদের উত্থান। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়েই জাপানের সাম্রাজ্যবাদী লিপ্সা বৃদ্ধি পায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পাশাপাশি দুটি রাষ্ট্র চীন ও জাপান মিত্রপক্ষে থেকেও পরস্পর যুদ্ধ থেকে বিরত হয়নি। যুদ্ধের পর ভার্সাই সন্ধিতে চীনের কিছু কিছু অংশ জাপানের হস্তগত হলো। তখন থেকেই জাপান তার নৌশক্তি বৃদ্ধি শুরু করল। জাপানি যুবদল নতুন জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হলো। 1930 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে জাপান অপরিমিত সামরিক শক্তিতে শক্তিমান হলো। 1931 খ্রিস্টাব্দে জাপান মাঞ্চুরিয়ায় প্রবেশ করে। জাতিপুঞ্জ ও সদস্য রাষ্ট্রগুলির অনুরোধমূলক নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও জাপান মাঞ্চুরিয়া দখল করে। 1937 খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে জাপান পুনরায় চীনে প্রবেশ করে ও চীনের শহর বন্দরগুলি দখল করে। 1939 খ্রিস্টাব্দে যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় তখনও চীন-জাপান যুদ্ধের অগ্রগতি অব্যাহত ছিল। এরপর পার্ল-হারবার আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে (1941) জাপান দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ল।

জার্মানিতে একনায়কতন্ত্রের উদ্ভব : ইয়োরোপে একনায়কতন্ত্রের উদ্ভবই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ। এ ক্ষেত্রে জার্মানির নাৎসীদলের নেতা অ্যাডলফ হিটলারের একনায়কতন্ত্রের উদ্ভব সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। জীবনের নানা ব্যর্থতার ভিতর দিয়ে তিনি সাত জন সদস্যকে নিয়ে গড়ে তুললেন জার্মান শ্রমিকদল। দলের নতুন নাম দিলেন নাৎসী দল। নাৎসীদলের মূলনীতি প্রসঙ্গে বলা হলো : (ক) ভার্সাই সন্ধির শর্ত অগ্রাহ্য করা, (খ) প্রকৃত (আর্য) জার্মানদের নিয়ে জাতিগঠন ও সার্বভৌম প্রতিষ্ঠা করা এবং (গ) জার্মানি-গঠন, রাশিয়ার সাম্যবাদ প্রতিরোধ ও ইহুদী বিতাড়ন। তাছাড়া, তাঁর বিশ্বাস ছিল ইহুদীদের বিশ্বাসঘাতকতায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পরাজয় ঘটে।

এই মূল নীতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে হিটলার জার্মান জাতির দুঃখ দুর্দশার কাহিনী জ্বালাময়ী ভাষায় অবাধ প্রচার করতে লাগলেন। 1920 খ্রিস্টাব্দে তাঁকে কারাকক্ষে নিক্ষেপ করা হলো। কারাকক্ষের অন্তরালে তিনি রচনা করলেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'মেইন ক্যাম্ফ' (Mein Kampf) অর্থাৎ আমার সংগ্রাম। এই গ্রন্থে ছিল জার্মান জাতির অপমান, দুর্দশা ও নাৎসীদের ব্যাখ্যা। গ্রন্থখানি বাইবেলের মতন জার্মানজাতি নিষ্ঠার সঙ্গে পড়ল। ফলে জার্মানিতে জেগে উঠল উগ্র জাতীয় চেতনা। জার্মান যুব সম্প্রদায় বলিষ্ঠ জাতি গঠনের

স্বপ্ন দেখলেন। তৈরি হলো জার্মান-ঝটিকা বাহিনী (Storm Troops)। জার্মানিতে নাৎসী ভিন্ন-অন্য কোনও দল বা সম্প্রদায় (যেমন, ইহুদী) যাতে না থাকে উক্ত বাহিনী সেদিকে লক্ষ্য নির্বিষ্ট করল। চ্যান্সেলার হয়েই হিটলার শুরু করলেন ইহুদী আর কমিউনিস্ট নিধন যজ্ঞ। নাৎসী ভিন্ন অন্য রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ হলো। 1934 খ্রিস্টাব্দে প্রেসিডেন্ট হিন্ডেনবুর্গ পরলোক গমন করলে হিটলার একাধারে হলেন চ্যান্সেলর ও প্রেসিডেন্ট। তাঁর উপাধি হলো ফ্যুয়েরার (Fuhrer) অর্থাৎ একচ্ছত্র অধিনায়ক। জার্মানিতে প্রতিষ্ঠিত হলো একনায়কতন্ত্র। এখান থেকে শুরু হলো জার্মানির আগ্রাসী নীতির রূপায়ণ। এর ফলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পথ আরও পরিষ্কার হলো।

ইতালিতে একনায়কতন্ত্রের উদ্ভব ঃ জার্মানির হিটলারের মতো ইতালিতে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করলেন বেনিতো মুসোলিনি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তিনি ছিলেন সৈনিক, আর যুদ্ধের পর হলেন বিক্ষুব্ধ জননেতা। কারণ, যুদ্ধে বিজয়ী হলেও ভার্সাই সন্ধির শর্ত ইতালির অভাব পূরণ করতে পারেনি। যুদ্ধের পর ইতালিতে এলো খাদ্যাভাব, অর্থনৈতিক সঙ্কট, শ্রমিক ধর্মঘট ও বহুমুখী অরাজকতা। তাই মুসোলিনি, 'ফ্যাসিস্ট' (Fascist) নামে একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করলেন। অল্পদিনের মধ্যে মুসোলিনির নেতৃত্বে ইতালির শহর-গঞ্জে ফ্যাসিস্ট ক্লাব স্থাপিত হলো। বিদ্রোহী নেতা মুসোলিনির হাতে সমস্ত ক্ষমতা তুলে দিলেন ইতালির রাজা। ইতালিতে প্রতিষ্ঠিত হলো একনায়কতন্ত্র। মাত্র চার বছরের মধ্যে তিনি ইতালির অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক উন্নয়ন ঘটিয়ে সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করলেন ; কিন্তু অন্যদিকে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হলো, ধর্মঘট নিষিদ্ধ হলো, পার্লামেন্টের ক্ষমতা হ্রাস করা হলো। প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠার দিকে লক্ষ্য নির্দেশ করে তিনি ইতালির নিকটবর্তী দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জগুলি দখল করলেন। 1935 খ্রিস্টাব্দে আবিসিনিয়া বিজিত হলো, 1937 খ্রিস্টাব্দে আলবেনিয়াকে আশ্রিত রাজ্যে পরিণত করা হলো। এরপর মুসোলিনি জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ ত্যাগ করেন। ঠিক এই সময় স্পেনের বিপ্লবী নেতা ফ্রাঙ্কো কমিউনিস্টদের সঙ্গে গৃহযুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন (1936-39)। মুসোলিনি ও হিটলার ফ্রাঙ্কোকে সাহায্য করেন। অবিলম্বে ইয়োরোপের এই তিন একনায়ক বিশ্ববাসীর মনে ত্রাসের সঞ্চার করলেন। ইয়োরোপে একনায়কতন্ত্রের উদ্ভবের ফলেই আগ্রাসী পররাষ্ট্রনীতির সৃষ্টি, যার ভিত্তি ছিল উগ্র জাতীয়তাবাদ। এটিও বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ।

তোষণ নীতি ঃ মিত্রশক্তির অনৈক্য, পারস্পরিক অবিশ্বাস, হিংসা-দ্বেষ, ঔপনিবেশিক স্বার্থ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাসহ ব্রিটেনের তোষণ নীতি ছিল দ্বিতীয় বিশ্বসমরের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কারণ। মিত্র শক্তিবর্গের মধ্যে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স ছিল মুখ্য ভূমিকায়। কিন্তু এই দুটি দেশের ঔপনিবেশিক দ্বন্দ্ব ছিল প্রকট। উভয় দেশই সাম্যবাদের ভয়ে সর্বদা ভীত ছিল। এই সাম্যবাদ রুখবার জন্যে তারা জার্মানিকে ব্যবহার করতে চেয়েছিল; কিন্তু ফ্রান্স তার প্রতিবেশী জার্মানির শক্তি বৃদ্ধিকে মোটেই পছন্দ করত না। তাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর

থেকে ফ্রান্স বারে বারে নিরাপত্তার দাবি জানতে থাকে। ইংল্যাণ্ড এ ব্যাপারে মৌখিক আশ্বাস দিলেও কখনও কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করেনি। 1935 খ্রিঃ ইংল্যাণ্ড ও জার্মানি এক নৌচুক্তি সম্পাদন ক'রে জার্মানিকে অস্ত্রসজ্জার অনুমতি দিল। ঐ বছর (1935) আত্মরক্ষার জন্যে ফ্রাঙ্কো-সোভিয়েট চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু ইতোমধ্যে হিটলার এক বক্তৃতায় ব্রিটেনের প্রতি সমর্থন জানান। এই বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে ইংল্যাণ্ডের টোরী প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেন তোষণ নীতি দ্বারা হিটলারকে খুশি করার নীতি গ্রহণ করেন। তিনি চেয়েছিলেন জার্মানিকে খুশি রেখে সোভিয়েট কমিউনিজমকে রুখবেন এবং বিশ্বব্যাপী ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও প্রতিপত্তি বজায় রাখবেন। তাই সোভিয়েট রাশিয়া যখন জার্মান-বিরোধী জোট সাধনের প্রস্তাব দিল তখন ব্রিটেন সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। চেকোশ্লোভাকিয়ার সুদেতান অঞ্চল অধিকারের জন্যে জার্মান সৈন্য মোতায়েন করলেও ইংল্যাণ্ড তোষণ নীতি অবলম্বন করে। বরং ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেন ঐ সব অঞ্চলের উপর জার্মানির অধিকারকে স্বীকৃতি জানালেন। ঠিক এরপরেই ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স পার্শ্ববর্তী ইতালির মুসোলিনির মধ্যস্থতায় হিটলারের সঙ্গে 'মিউনিখ চুক্তি' সম্পাদন করে (1938) এবং জার্মানিকে সুদেতান অঞ্চল ছেড়ে দেয়। অন্যদিকে ইতালি আবিসিনিয়া আক্রমণ করলে (1935) ইঙ্গ-ফরাসি শক্তি ইতালির আগ্রাসনকে পুরোভাবে সমর্থন জানায়। পূর্ব এশিয়ায় যাতে সাম্যবাদী হাওয়া সম্প্রসারিত না হয় তার জন্য ইতোপূর্বে (1931) জাপান মাঞ্চুরিয়া দখল করলে ইংল্যাণ্ড নিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বন করে। সুতরাং লক্ষ্য করা যায়, তোষণ নীতি অক্ষশক্তির সাম্রাজ্যবাদী ক্ষুধা-বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছিল।

ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রজোট ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে রাষ্ট্রজোটের উদ্ভব এই যুদ্ধের অন্যতম কারণ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালেও ঠিক এই ধরণের রাষ্ট্রজোটের উদ্ভব ঘটেছিল। রাষ্ট্রজোটের উদ্ভবের মূলে ছিল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ আর আগ্রাসী নীতি। ভার্সাই সন্ধির ফলে জার্মানির উপনিবেশগুলি ব্রিটেন, ফান্স, বেলজিয়াম, পর্তুগাল ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বণ্টিত হয়। জার্মান জাতি সে কথা ভুলতে পারেনি। হিটলারের নেতৃত্বে জার্মানজাতি উপনিবেশগুলি দখল করে বৃহত্তর জার্মান সাম্রাজ্য গঠনে তৎপর হলো। অন্যদিকে ইতালি পূর্ব-আদ্রিয়াটিক উপকূল, টিউনিশিয়া এবং ফরাসি বন্দর জিব্যুতি (Jibuti) অধিকার করার পরিকল্পনা গ্রহণ করল। সুদূর প্রাচ্যে জাপান সমগ্র এশিয়ার প্রভুত্ব স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়ে মাঞ্চুরিয়া দখল করল। ভার্সাই সন্ধির ফলে অতৃপ্ত জার্মানি, ইতালি ও জাপান 1937-এর পূর্বেই রোম-বার্লিন-টোকিও অ্যাক্সিস (Axis) গঠন করে আগ্রাসী নীতি অবলম্বন করল। জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া ও চীন আক্রমণ, ইতালি কর্তৃক ইথিওপিয়া দখল আর জার্মানি কর্তৃক পোল্যাণ্ড আক্রমণকে কেন্দ্র করেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হলো।

নিরস্ত্রীকরণের ব্যর্থতা ঃ ভার্সাই সন্ধি এবং লীগ অফ নেশনস্-এর নিরস্ত্রীকরণ নীতির ব্যর্থতা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একটা বিশেষ কারণ হিসেবে পরিগণিত। প্রেসিডেন্ট

উইলসনের চৌদ্দ দফাতে নিরস্ত্রীকরণের কথা বলা ছিল। ভার্সাই সন্ধির সকল মিত্রশক্তি নিরস্ত্রীকরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। লীগ অফ নেশনস্-এর চুক্তিপত্রের অষ্টম ধারায় (Article-8) বলা হলো যে, "শান্তি রক্ষার্থে চুক্তিবদ্ধ সকল সদস্য রাষ্ট্রের আত্মরক্ষার প্রয়োজনের সঙ্গে সংগতি রেখে যতদূর সম্ভব অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।" মনে রাখা প্রয়োজন, এই ঘটনার পূর্বেই ভার্সাই সন্ধি দ্বারা জার্মানিকে সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকৃত করা হয়েছে। যাই হোক, লীগের চুক্তিপত্র অনুসারে প্রথম একটি অস্থায়ী কমিশন গঠন করা হয় ; কিন্তু কমিশনের প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি ; 1925 খ্রিঃ যখন জার্মানি লীগের সদস্যপদ গ্রহণ করে তখন থেকে জোর কদমে নিরস্ত্রীকরণের তোড়জোড় চলতে থাকে। 1932 খ্রিঃ লীগের নেতৃবর্গ নিরস্ত্রীকরণের জন্য একটা বিশ্ব-সম্মেলন আহ্বান করেন। সেক্ষেত্রেও মতভেদের জন্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে জার্মানি দাবি করল যে তাকেও ফ্রান্সের মত অস্ত্র রাখার অধিকার দিতে হবে। এইভাবে মতভেদ প্রকট হওয়ায় হিটলার নিরস্ত্রীকরণ নীতির বিপক্ষে গেলেন এবং লীগের সদস্যপদ ত্যাগ করলেন। এরফলে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন ফলপ্রসূ হল না। জার্মানি পুরোদস্তুর সামরিক অস্ত্রশস্ত্র বৃদ্ধিতে মনোযোগ দিল।

লীগ অফ-নেশনস্ বা জাতিসংঘের ব্যর্থতা ঃ লীগ-অফ নেশনসের ব্যর্থতা দ্বিতীয় বিশ্বসমরের অন্যতম কারণ। বিশ্ব শান্তি ও বিশ্ব নিরাপত্তা বিধানের জন্য তৈরি হয়েছিল এই লীগ অফ-নেশনস্। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী জাপান 1931 খ্রিস্টাব্দে মাঞ্চুরিয়া অধিকার করে ও চীন থেকে যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা আদায় করতে তৎপর হয়। 1937 খ্রিস্টাব্দে জাপান চীন আক্রমণ করে। চীনের পুনঃপুনঃ আবেদন সত্ত্বেও 'লীগ অফ নেশনস্' জাপানকে শাস্তিদানে ব্যর্থ হলো। জার্মানি ভার্সাই সন্ধি (1919), লোকার্নো চুক্তি (1925), কেলোগ ব্রায়াঁ চুক্তি (1928) ইত্যাদি লঙ্ঘন করে 1934 খ্রিস্টাব্দ থেকে যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু করে। কিন্তু যুদ্ধ-প্রস্তুতি ও আগ্রাসী নীতির অন্তরায় ছিল লীগ-অফ-নেশনস্। তাই হিটলার এই সময় লীগের সদস্যপদ পরিত্যাগ করার কথা ঘোষণা করেন। ইতালিও আগ্রাসী নীতি প্রয়োগ করে ইথিওপিয়া (1935) এবং আলবেনিয়া (1936) অধিকার করে। কিন্তু লীগ-অফ নেশনস্ ইতালিকে এই আগ্রাসী নীতি থেকে বিরত করতে পারেনি। কাজেই লীগের ব্যর্থতাই পুনরায় বিশ্বযুদ্ধের পথ সহজ করে তুললো।

সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব ঃ দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে পুঁজিবাদের লড়াই, বাজার ও উপনিবেশ দখলের আর্থ-সামাজিক দ্বন্দ্ব বিশ্বযুদ্ধকে আরও তরান্বিত করেছিল। সোভিয়েট ঐতিহাসিক ভ্লাদিমির আলেকজান্দ্রভ তাই লিখেছেন যে, "The Second World War broke out owing to the aggravation of the economic and political contradictions of imperialism" দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে উৎপাদক ও পুঁজির কেন্দ্রীভূত হওয়া, একচেটিয়া রাষ্ট্রিয় পুঁজির (State Monopoly Capital) ক্রমবর্ধমান ভূমিকা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি অর্থপুঁজির (Finance Capital)

ফলেও দেশে সামরিকতাবাদ (militarism) বৃদ্ধি পায়। বিশ্বব্যাপী মন্দা, অর্থাভাব, বেকারি, মুদ্রাস্ফীতি ইত্যাদির ফলে সম্প্রসারণবাদ প্রসারিত হয়, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।[1]

২। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দায় ঃ নানা ব্যাখ্যা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য জার্মানি যে প্রধানত দায়ী ছিল সে-বিষয়ে আজ কোনও সন্দেহ নেই। ঐতিহাসিকগণ অধিকাংশই এ ব্যাপারে সহমত পোষণ করেন। তবে আগে একথা ধরে নেওয়া হত যে যুদ্ধের জন্য হিটলারই একমাত্র দায়ী—সেই মত এখন পরিত্যক্ত হয়েছে। যুদ্ধের কারণ প্রসঙ্গে অধ্যাপক বেল লিখেছেন যে, "হিটলার যুদ্ধের পরিকল্পনা করেছেন এবং যুদ্ধ ঘটিয়েছেন।[2] এই মত তাঁর 'দ্য অরিজিনস্ অফ দ্য সেকেণ্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার' বইতে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত ইতিহাসের অধ্যাপক এ জে পি টেলার।[3] বস্তুত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দায় প্রসঙ্গে এখন অনেক নতুন নতুন ব্যাখ্যা যেমন শোনা যাচ্ছে, তেমনি জার্মানির দায়িত্বও সম্পূর্ণভাবে অস্বীকৃত হয়নি।[4]

অনেক ঐতিহাসিকের মতে ভার্সাই সন্ধির মধ্যেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ নিহিত ছিল। এই মতের প্রবক্তাদের মধ্যে *ই.এচ.কার, জে.এল. কারভিন, অধ্যাপক ল্যামিং* প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এই মত অবশ্য স্বীকার করেনি *এ.এম. গার্থন হার্ডি*। অধ্যাপক কেইনস এর মতন অর্থনীতিবিদ এবং চার্চিলের মতন রাজনীতিবিদও ভার্সাই সন্ধির শর্তাবলী এবং ক্ষতিপূরণকে কঠোর বলেছেন। *রাইকারও* একইমত পোষণ করেন। অধ্যাপক *ডেভিড টমসন* এর মতে অবশ্য এই চুক্তির রচয়িতারা "ভ্রান্তস্থানে কঠোরতা ও অবিজ্ঞোচিত উদারতা" দেখিয়েছেন বলে মন্তব্য করেছেন। তবে মোটের উপর একথা স্বীকার করতেই হবে যে, ভার্সাই সন্ধি ছিল একতরফা, জার্মানির উপর চাপিয়ে দেওয়া কঠোর এবং জার্মানির পক্ষে অপমানজনক। তাছাড়া এগুলি শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার সহায়ক ছিল না। তাই কুড়ি বছরের মধ্যেই, জার্মানি পুনরায় আক্রমণাত্মক ভূমিকা নিয়েছিল। *এডওয়ার্ড হ্যালেট* কার তাঁর *International Relations between The Two World Wars* গ্রন্থেও এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। জার্মানিই বিশ্বযুদ্ধের জন্য একমাত্র দায়ী কিনা তা নিয়েও ভিন্নমত। একথা অনস্বীকার্য যে জার্মানির বিদেশ নীতির দুটি পর্যায়—প্রথম পর্যায়ে তারা ভার্সাই সন্ধি সংশোধনের দাবি জানায়। কারণ ভার্সাই চুক্তি তাদের মতে

---

1. ভি. আলেকজান্দ্রভ, এ কনটেমপোরারি ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি, প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, মস্কো, 1986, পৃ. 582

2. P.M.H. Bell, *The Origins of the Second World War in Europe*. London, 1971, p. 39.

3. A. J.P. . Taylor, *The Origins of the Second World War,* London, 1961 গ্রন্থটির মূল সংস্করণ হ্যামিশ হ্যামিল্টন কর্তৃক প্রকাশিত, পরে পেঙ্গুইন সংস্করণ বেরিয়েছে।

4. বিস্তারিত আলোচনার, জন্য দ্র. E.M. Robertson (ed.), *The Origins of the Second World War (1971);* D. C. Watt, *Too Serious a Business ; Armed Forces and the Approach to the Second World War* (1975) ; একই লেখকের *How War Came (1989);* Elizabeth Wiskemann, *The Rome Berlin Axis* (1989) ; Anthony Adamthwaite, *France and the Coming of the Second World War* (1977) এবং বেল ও টেলারের পূর্বোক্ত গ্রন্থদ্বয়।

অন্যায়। এই সংশোধন ঘটবার নীতি ত্যাগ করে দ্বিতীয় পর্যায়ে সে পুরোপুরি আগ্রাসী বিস্তারনীতি গ্রহণ করে। সুতরাং হিটলারের দায়িত্ব কোন মতেই লঘু করা যায় না। হিটলারের আমলের জার্মানির পররাষ্ট্র নীতি এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন অধ্যাপক Weinberg।[1] ইংরেজ ঐতিহাসিক *এ জে পি টেলার* মনে করেন, হিটলারের বিদেশ নীতি বাস্তবতার নিরিখেই রচিত। তা পূর্বেকার বিদেশীনীতিরই অনুসরণ। জার্মানিকে শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রে পরিণত করাই ছিল এর লক্ষ্য। বস্তুত এই মত গ্রহণ করা কঠিন। বিসমার্ক বা কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের বিদেশ নীতির সঙ্গে হিটলারের বিদেশনীতির প্রভূত পার্থক্য ছিল। হিলগ্রুবার, হিলডেব্র্যাণ্ড প্রমুখ জার্মান 'প্রোগ্রাম স্কুল' বা গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকগণের মতে হিটলারের পররাষ্ট্র নীতি তাঁর নিজস্ব এবং তা আক্রমণাত্মক।

অনেক ঐতিহাসিক ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের তোষণ নীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। উইনস্টন চার্চিলও অনেকটা এই মতের সমর্থক। অনেকে আবার ব্রিটেন-ফ্রান্সের সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে সমঝোতার অভাবের উপর জোর দেন। যদি তারা তিরিশের দশকে রাশিয়াকে অবিশ্বাস না করে জোটবদ্ধ হতেন তাহলে 1934 খ্রিস্টাব্দে যৌথ নিরাপত্তার জন্য রুশ আহ্বানে সাড়া দিতেন। এই মত কতদূর সত্য বলা মুশকিল, তবে ইঙ্গ-ফ্রান্সের তোষণ নীতি জার্মানির ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্যে করেছিল। তাছাড়া 1936 খ্রিস্টাব্দে স্পেনের গৃহযুদ্ধকে *ল্যাংসাম, কার* প্রমুখ অনেকেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মহড়া বলেছেন, কারণ যেখানে ফ্রাঙ্কোর সমর্থনে ইতালি ও জার্মানি এগিয়ে আসে ও গণতান্ত্রিক পপুলার ফ্রন্টের সমর্থনে রাশিয়া; অথচ সেখানে গণতন্ত্রের পূজারী ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের অবশ্যই ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে সংগ্রামে মদত দেওয়া উচিত ছিল। তা না ক'রে ফ্রান্স-ব্রিটেন অন্যায় করেছিল।

বস্তুত প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যেমন ট্রিপল অ্যালায়েন্স এবং ট্রিপল্ আতাঁত, উভয় গোষ্ঠীই -এর দায়িত্ব এড়াতে পারে না, তেমনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য অনেকেই দায়ী। তবে হিটলার এবং মুসোলিনির বর্বর, অনৈতিক আগ্রাসী ফ্যাসিবাদ-নাৎসীবাদ শুধু যুদ্ধের জন্য মূলত দায়ী বললে অন্যায় হবে না। তারা মানবতারও শত্রু। ই *এল এডওয়ার্ড* তাই যখন লেখেন যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হিটলারের যুদ্ধ তখন তা একেবারে অস্বীকার যায় না। Etienne Mantoux তার The Carthaginian Peace বইতে অস্বীকার করলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সন্ধির মধ্যে অর্থনৈতিক শর্তাবলীর অবাস্তব চরিত্র সম্পর্কে J.M. Keynes -এর The Economic Consequences of the Peace -এর মূল বক্তব্য সঠিক। ভার্সাই সন্ধির মধ্যে অ-ন্যায্য শর্ত ছিল একথাও অনস্বীকার্য। তাই জার্মানির ক্ষুব্ধ হওয়ার কারণ ছিল। তারা শর্ত অস্বীকার করতে পারত কিন্তু সম্প্রসারণশীল নীতি নেওয়ার দরকার ছিল না। এজন্য জার্মানিই দায়ী।

---

1. Gerhard Weinberg, *The Foreign Policy of Hitler's Germany* Vol I. Diplomatic Revolution in Europe 1933-1936 (1970) Vol II, Starting World War II, 1937-1939 (1980)

গ্রন্থপঞ্জী

[কলকাতা এবং কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনির্ধারিত পাঠ্যসূচির বৈশিষ্ট্য হলো, এগুলি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি-প্রসূত। শুধু তাই নয়, বর্ণনামূলক কাল-পরম্পরাগত ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে এখানে 'থীম' বা বিষয় ধরে ইতিহাসের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সঙ্গত কারণেই রাজনৈতিক ইতিহাসের পাশাপাশি অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ফলে পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে গিয়ে আমাদের প্রভূত পরিশ্রম হলেও আনন্দ পেয়েছি। গ্রন্থ-রচনার কাজে যে-সব বইপত্রের সাহায্য পেয়েছি সেগুলির প্রতি ঋণ স্বীকারের জন্য এবং কৌতূহলী জিজ্ঞাসুদের অতিরিক্ত পাঠ্য হিসেবে গবেষণার নিশানা দেবার জন্য এই গ্রন্থপঞ্জী যুক্ত করা হলো। এখানে 'এ' 'বি' 'সি' ইত্যাদি শিরোনামগুলি সিলেবাসের ভাগ অর্থাৎ পর্ব অনুসারে।]

'এ'

M.S. Anderson, *Europe in the Eighteenth Century* (1713-1783); David Ogg, *Europe of the Ancient Regime (1715-1783); N. Hampson, The Enlightenment;* P. Hazard, *The European Mind* (1680-1715); L.G. Crocker (Ed.), *The Age of Enlightenment;* W. Doyle, *The Old European Order* (1660-1800); O. Hufton, *Europe: Privilege and Protest* (1730-1789); P. Gay, *The Enlightenment, an Interpretation,* 2 vols; Kingsley Martin, *French Liberal Thought in the Eighteenth Century; New Cambridge Modern History, Vol VIII;* Max Beloff, *The Age of Absolutism* (1660-1815); L. Greshoy, *From Despotism to Revolution* (1763-1789); A Goodwin (Ed.), *The European Nobility in the Eighteenth Century;* A. Cobban (Ed.), *The Eighteenth Century;* J. Godechot, *France and the Atlantic Revolution of the Eighteenth Century; R. R. Palmer, The Age of Democratic Revolution,* 2vols; G. Williams, *The Expansion of Europe in the Eighteenth Century;* সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী, ইয়োরোপের ইতিহাস; প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী, ফরাসী বিপ্লব; George Bull, *The Renaissance;* Peter Burke, *The Renaissance;* J. R. Hale, *The Renaissance;* Leonard Cowie, *The Reformation of the Sixteenth Century;* G. R. Elton, *The Reformation Europe;* B. Brett, *Explorers and Exploring;* M. Dobb, *Studies in the Development of Capitalism;*

C. M. Cipolla (Ed), *Fontana Economic History of Europe;* G. Brunn, *The Enlightened Despots;* J. G. Gagliardo, *Enlightened Despotism.* A. Goodwin, *The French Revolution;* G. Lefebvre, *The Coming of the French Revolution;* G. Lefebvre, *The French Revolution,* 2 vols; A. Cobban, A *History of Modern France,* Vol I-II; G. Lefebvre, *Napoleon,* 2 vols; P Geyl, *Napoleon: For and Against;* E. J. Hobsbawn, *The Age of Revolution: Europe* 1789-1848; A. Cobban, *Social Interpretation of the French Revolution;* G. Rude, *Revolutionary Europe* (1783-1815); *The New Cambridge Modern History,* Vol IX; L. Gershoy, *The Era of the French Revolution;* M. J. Sydenham, *The French Revolution; F M. H. Markham, Napoleon and the Awakening of Europe;* J. M. Thompson, *Napoleon: His Rise and Fall;* R. Cobb, *The Police and the People;* R. Cobb, *Reactions to the French Revolution; G. Rude, The Crowd in the French Revolution.*

'বি'

David Thomson, *Europe Since Napoleon;* J. Droz, *Europe Between Revolutions;* C. K. Webster, *The Congress of Vienna; H. Nicholson, Congress of Vienna: A Study in Allied Unity The New Cambridge Modern History,* Vol IX; F. B. Artz, *Reaction and Revolution, 1814-1832;* W. Alison Phillips, *The Confederation of Europe: A study of European Alliances;* H. G. Schenk, *The Aftermath of Napoleonic Wars: The Concert of Europe, An Experiment;* A. J. P. Taylor, *The Courses of German History;* A. Ramm, *Germany, 1789-1919: A Political History;* P. Viereck, *Conservatism Revisited;* A Cecil, *Metternich 1773-1859: A Study of His period;* D. Mack Smith, *Italy: A Modern History;* A. J. Whyte, *The Evolution of Modern Italy; A. J. P. Taylor, The Italian Problem in European Diplomacy, 1847-1849;* R. Albert Carrie, *Italy from Napoleon to Mussolini;* D. Johnson, Guizot: *Aspects of French History* (1787-1879); J. P. T. Bury, France (1814-1940); A. Cobban, *A History of Modern*

France, vol II-III; J. B. Wolf, *A History of France since 1814;* J. Plamenatz, *The Revolutionary Movement in France;* G. Elton, *The Revolutionary Idea in France* (1789-1871); M. Agulhon, *The Republican Experiment* (1848-1852); R. Price (ed), *Revolution and Reaction;* সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী, ইয়োরোপের ইতিহাস; Karl Marx, *The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte*

A. J. P. Taylor, *The Habsburg Monarchy,* 1815-1918; C. A. Macartney, *The Habsberg Empire* (1790-1918); A Sked and C. Cook (ed), *Crisis and Controversy:* Esays in *Honour of A. J. P. Taylor;* B. Pares, *A History of Russia;* L. Cochan, *The Making of Modern Russia;* B. H. Sumner, *Survey of Russian History;* M. T. Florinsky, *Russia : A History and an interpretation*; R. Postgate, *Story of a year: 1848;* M. Kranzberg (Ed.), *1848: A Turning Point?;* A. Whitridge, *Men in Crises*: *The Revolution of 1848*.

'সি'

সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী, ইয়োরোপের ইতিহাস; David Thomson, *Europe Since Napaleon; E. J. Hobsbawm, Industry and Empire;* D. S. Landes, *The Unbound Prometheus; Technological Change in Europe since 1750;* P. Deane, *The First Industrial Revolution;* C. M. Cipolla (ed), *Fontana Economic History of Europe,* Vol III & IV, *The Cambridge Economic History of Europe,* Vol VI; H. J. Habakuk & N. M. Postan (Eds.), *The Industrial Revolution and After;* T. S. Ashton, *The Industrial Revolution, 1760-1830;* E. P. Thompson, *The Making of the English Working Class;* Maurice Dobb, *Studies in the Development of Capitalism, International Working Class Movements,* Progress *Publishers, Moscow, Vol I-IV; Carlton Hayes, Contemporary Europe since 1870;* H. Laski, *Karl Marx;* G. D. H. Cole, *History of Socialist Thought;* E. Burns, *Handbook of Marxism;* Marx & Engels, *Collected Works;* Sabine, *A History of Political Theory;* George L.Mosse, *The Culture of Western Europe: The Nineteenth and Twentieth Centuries* (1961); William L. Langer, *European Alliances*

and Alignments 1871-1890 (1931); A. J. P. Taylor, *Bismarck, The Man and the Statesman* (1955).

'ডি'

James, Joll, *Europe Since 1870;* The New Cambridge Modern History, Vol XI: *Material Progress and Worldwide problems*. 1870-1898 (1967), Vol XII: *The Shifting Balance of World Forces, 1898-1945 (1968); A. J. P. Taylor, The Struggle For Mastery in Europe,* 1848-1908 (1954); John Chapham, *Economic Development of France and Germany 1815-1914* (4th edn, 1936); William L. Langer, *European Alliances and Alignments,* 1871-1890 (1931); George F. Kennan, *The Fateful Alliance: France, Russia and the* Coming of the *First World War* (1984); Kenneth Bourne, *The Foreign Policy of Victorian England, 1830-1902* (1970); W. L. Langer, *The Diplomacy of Imperialism* (1954); Wolfgang J. Mommsen, *Theories of Imperialism* (1980); D. K. Fieldhouse, *Economic and Empire 1830-1914* (1973).

"ই"

B. H. Liddell Hart, *History of the First World War* (2nd Edn, 1970); Marc Ferro, *The Great War 1914-1918* (Eng. Tr. 1973); E. H. Carr, *The Bolshevik Revolution,* Vol I-III (1950-53); Isaac Deutscher, *The Prophet Armed: Trotsky 1879-1921* (1963); D. C. B. Lieven, *Russia and the Origins of the First World War* (1983); Norman Stone, *The Eastern Front* (1975); David Stevenson, *The First World War and International Politics* (1988); Sir Liewellyn Woodward, *Great Britain and the War of 1914-1918* (1967); Arthur Marwick, *The Deluge: British Society and the First World War* (1965); Arthur Rosenberg, *The Birth of the German Republic* (1931); Marc Ferro, *The Russian Revolution of February 1917* (Eng. Tr. 1972); M. Ferro, *October 1917: A Social History of the Russian Revolution*

(Eng. tr. 1980); Adam B. Ulem, *Lenin and the Bolsheviks* (1965); A. J. Ryder, *The German Revolution of 1918* (1967); Arno J. Mayer, *The Politics and Diplomacy of Peacemaking: Containment and Counter Revolution at Versailles 1918-1919* (1968); Arno J. Mayer, *The Political Origins of the New Diplomacy,* 1917-1918 (1959); G. Schultz, *Revolution and Peacetreaties 1917-1920* (1966); L. Lafore, *The Long Fuse* (1965); L. C. F. Turner, *Origins of the First World War* (1970); James Joll, *The Origins of the First World War* (1984); Lingi Albertini, *The Origins of the War of 1914* (Eng. tr. 1952-57); Fritz Fischer, *Germany's Aims in the First World War* (Eng. tr. 1967); Fritz Fischer, *The War of Illusion* (Eng. tr. 1975); Vladimir Dedijer, *The Road to Sarajevo* (1967); V. R. Berghahn, *Germany and The Approach of War in 1914* (1973); Zara S. Steiner, *Britain and the Origins of the First World War* (1983); John V. F. Keiger, *France and the Origins of the First World War (1983);* D. C. B. Lieven, *Russia and the Origins of the First World War* (1983); F. R. Bridge, *From Sadowa to Sarajevo* (1972); R. J. B. Bosworth, *Italy and the Approach of the First World War* (1983).

"গ্রন্থ"

James, Joll, *Europe Since 1870,* Alan Bullock, *Hitler- A Study in Tyranny,* rev. edn, 1962; A. J. P. Taylor, *The Origins of the Second World War,* Rept. 1977; E. H. Carr, *The Bolshevik Revolution 1917-1923,* Vol III (1953); Henri Michael, *The Shadow War: Resistance in Europe* (Eng. tr. 1972); Herbert, Feis, *Churchill, Roosevelt, Stalin* (1957); Gerhard. L. Weinberg, *The Foreign Policy of Hitler's Germany* (Vol. I Diplomatic Revolution in Europe 1933-1936 (1976), Vol. II Starting World War II 1937-1939 (1980); Norman Rich, *Hitler's War Aims* (2 Vols, 1973-74); Anthony Adam waite, *France and the Coming of the Second World War* (1977); E. M. Robertson (Ed.) *The Origins of the Second World War* (1971); P. M. H. Bell, *The Origins of the Second World War in Europe,*

(1986); D. C. Watt, Too Serious a Business: Armed Forces and the Approach to the Second World War (1975); D. C. Watt, *How War Came* (1989); Elizabeth Wiskemann, *The Rome-Berlin Axis* (1949); MacGregor Knox, *Mussolini Unleashed 1939-1941* (1982); Peter Calvocoressi and Guy Wint, *Total War: Causes and Course of the Second World War* (1989); Isaac Deutscher, *The Prophet Outcast: Trotsky, 1929-1940* (1963); E. H. Carr, *The interregnum 1923-24,* (1954); E. H. Carr, *Socialism in One Country* (1956); Eugen Weber, *Varieties of Fascism* (1964); Ernst Nolte, *Three Faces of Fascism* (Eng. tr. 1965), F. L. Carden, *The Rise of Fascism* (1968); G. L. Mosse (Ed.) *International Fascism* (1979); David Schoenbaum, *Hitler's Social Revolution* (1966); Edward R. Tannenbaum, *Fascism in Italy* (1972); Denis Mack Smith, *Mussolini* (1981); A. M. Gathorne-Hardy, *Short History of International Affairs* 1920-1939 (1950); E. H. Carr, *International Relations between Two World Wars;* Langsam, *World since 1919;* Max Beloff, *Foreign Policy of Soviet Russia* 1929-1941 (2 Vols. 1947-49); J. H. Wheeler Bennett, *The Nemesis of Power* (1953); David Thomson, *Europe Since Napoleon.*

নির্দেশনা

কলকাতা ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রিবার্ষিক স্নাতক (সাধারণ) শ্রেণীর যে নতুন পাঠ্যসূচি নির্ধারিত হয়েছে, তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, কোন্ কোন্ অধ্যায় থেকে ক'টি প্রশ্ন পরীক্ষায় থাকবে তা নির্দিষ্ট ক'রে বলা হয়েছে। এই কথাটি সহকর্মী অধ্যাপক-অধ্যাপিকা বন্ধুদের এবং প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের বিশেষভাবে মনে রাখতে অনুরোধ করছি। নির্দিষ্ট এই প্রশ্ন বিভাগ নিচে দেওয়া হলো। *এ-বি-সি ইত্যাদি প্রতিটি পর্ব এক বা একাধিক অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে এবং ১,২ ইত্যাদি উপ-বিভাগগুলি যেখানে যেখানে আছে, সেগুলিও নানা অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে।*

সিলেবাসের 'এ' 'বি' পর্ব থেকে **চারটি** প্রশ্ন
(প্রত্যেক বিভাগ থেকে দু'টি ক'রে)

সিলেবাসের 'সি' 'ডি' পর্ব থেকে **চারটি** প্রশ্ন
(প্রত্যেক বিভাগ থেকে দু'টি করে)

সিলেবাসের 'ই' পর্ব থেকে **একটি** প্রশ্ন

সিলেবাসের 'এফ' পর্ব থেকে **একটি** প্রশ্ন

মোট দশটি প্রশ্ন থাকবে। এই প্রশ্নগুলির ধরণ কী রকম হতে পারে তা বোঝার সুবিধার জন্য পরের পৃষ্ঠায় পর্ব-ভিত্তিক প্রশ্নাবলী যুক্ত করা হলো।

পর্বভিত্তিক প্রশ্নাবলী

প্রথম পর্ব—'এ' (অধ্যায় ১,২,৩)

১। নবজাগরণ এবং ধর্ম সংস্কার আন্দোলন বলতে কী বোঝায়? এই আন্দোলনগুলির বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

২। ভৌগোলিক আবিষ্কার এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কীভাবে আধুনিক যুগের পটভূমি রচনা করেছিল?

৩। ফরাসি বিপ্লবের পশ্চাতে বুরবোঁ রাজতন্ত্রের দায়িত্ব আলোচনা কর।

৪। ফরাসি বিপ্লবের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কারণগুলি আলোচনা কর।

৫। ফরাসি বিপ্লবের জন্য অষ্টাদশ শতাব্দীর দার্শনিকগণের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

৬। ফ্রান্সে সন্ত্রাসের রাজতন্ত্র মূল্যায়ণ কর।

৭। নেপোলিয়ান বোনাপার্টের আভ্যন্তরীণ সংস্কারগুলি আলোচনা কর।

৮। নেপোলিয়ানকে কী বিপ্লবের সন্তান বলা যায়?

৯। মহাদেশীয় অবরোধ কাকে বলে? এই পদ্ধতি নেপোলিয়ানের পতনের জন্য কতখানি দায়ী?

১০। নেপোলিয়ান বোনাপার্টের পতনের কারণগুলি আলোচনা কর।

১১। রেনেশাঁস বা নবজাগরণ আন্দোলন কাকে বলে? ইয়োরোপের ইতিহাসে এই আন্দোলনের গুরুত্ব কী?

১২। ধর্মসংস্কার আন্দোলন কাকে বলে? ইয়োরোপের ইতিহাসে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের গুরুত্ব নিরূপণ কর।

১৩। ফরাসি সংবিধান সভার কার্যাবলী আলোচনা কর।

১৪। টিলসিটের সন্ধি পর্যন্ত নেপোলিয়ানের সঙ্গে ইয়োরোপীয় শক্তিগুলির সম্পর্ক আলোচনা কর।

দ্বিতীয় পর্ব—'বি' (অধ্যায় ৪,৫,৬,৭,৮)

১। ভিয়েনা সম্মেলনের কার্যাবলী সহ একটি সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লেখ।

২। মেটারনিখ ব্যবস্থা কাকে বলে? এই ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়েছিল কেন?

৩। 'ইয়োরোপীয় শক্তি সমবায়' বলতে কী বোঝ? এই সমবায় ইয়োরোপে কী ভূমিকা পালন করেছিল?

৪। ভিয়েনা সম্মেলন থেকে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের অন্তর্বর্তীকালে কিভাবে ইয়োরোপে রক্ষণশীলতা বজায় রাখার চেষ্টা হয়েছিল?

৫। ফ্রান্সে জুলাই বিপ্লবের কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর।

৬। ফ্রান্সে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর।

৭। 1848 কে বিপ্লবের বৎসর বলা হয় কেন? 1848-এর ফরাসি বিপ্লব ইয়োরোপে নানা স্থানে কী প্রভাব বিস্তার করেছিল?

৮। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের কারণগুলি আলোচনা কর। ঐ বিপ্লবের তাৎপর্য কী ছিল?
৯। ইতালির ঐক্যসাধনে মাৎসিনি ও কাভুরের ভূমিকা সংক্ষেপ আলোচনা কর।
১০। জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের সংস্কারের বিবরণ দাও। সংস্কারগুলির তাৎপর্য কি ছিল?
১১। জার্মানির ঐক্যসাধনে বিসমার্কের অবদানের মূল্যায়ণ কর।
১২। জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারকে মুক্তিদাতা জার বলা কি সঙ্গত?
১৩। ইতালির ঐক্যসাধনে মাৎসিনি, কাভুর ও গ্যারিবল্ডির ভূমিকা বিচার কর।
১৪। 1815 থেকে 1848 এর মধ্যে জাতীয়তাবাদ ও উদারনৈতিকতা কিভাবে ইয়োরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল?

তৃতীয় পর্ব—'সি' (অধ্যায় ৯,১০,১১,১২)

১। ইংল্যাণ্ডে শিল্প বিপ্লবের অগ্রগতির বর্ণনা দাও।
২। ইংল্যাণ্ডের শিল্পায়নের সঙ্গে ইয়োরোপীয় মহাদেশের শিল্পায়নের পার্থক্য কি ছিল?
৩। শিল্প বিপ্লবের ফলাফল আলোচনা কর।
৪। উনিশ শতকের ইয়োরোপে শ্রমজীবী আন্দোলনের পরিচয় দাও।
৫। 'কল্পনাশ্রয়ী সমাজতন্ত্র' বলতে কী বোঝায়? দুইজন কল্পনাশ্রয়ী সমাজতান্ত্রিকের পরিচয় দাও।
৬। মার্ক্সবাদের মূল বৈশিষ্ট্যগুলির উপর একটি প্রবন্ধ রচনা কর।
৭। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র বলতে কী বোঝায়? তার বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য নিরূপণ কর।
৮। উনিশ শতকে ইয়োরোপে সাহিত্য সংস্কৃতির অগ্রগতির পরিচয় দাও।
৯। উনিশ শতকের ইয়োরোপে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার বিবরণ দাও।
১০। রোমান্টিকতাবাদ কাকে বলে? উনিশ শতকে এই তত্ত্ব কীভাবে শিল্প ও সাহিত্যে প্রভাব ফেলেছিল?
১১। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও জার্মানিতে শ্রমজীবী আন্দোলনের সূচনা ও প্রসার কিভাবে হয়েছিল?

চতুর্থ পর্ব—'ডি' (অধ্যায় ১৩,১৪,১৫,১৬)

১। 1871 খ্রিস্টাব্দে ইয়োরোপে কীভাবে শক্তিসাম্যের পরিবর্তন ঘটেছিল?
২। বার্লিন কংগ্রেস কেন আহূত হয়েছিল? ঐ কংগ্রেস বলকান সমস্যা কতদূর সমাধান করেছিল?
৩। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফল আলোচনা কর।
৪। ত্রিশক্তি আঁতাত গঠনের পটভূমি আলোচনা কর।
৫। 1871 খ্রিস্টাব্দ থেকে 1890 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত জার্মানির পররাষ্ট্রনীতি আলোচনা কর।

৬। পূর্বাঞ্চল সমস্যা বলতে কী বোঝ? উনিশ শতকের এই সমস্যার কারণ এবং প্রকৃতি বিচার কর।

৭। বার্লিন কংগ্রেসের পরবর্তীকালে পূর্বাঞ্চল সমস্যার স্বরূপ কি ছিল?

৮। 'ট্রিপল্ অ্যালায়েন্স' গঠনের পটভূমি আলোচনা কর।

৯। ইয়োরোপীয় দেশসমূহ কিভাবে এশিয়া ও আফ্রিকায় তাদের সাম্রাজ্যবাদী বিস্তারনীতি অনুসরণ করেছিল?

১০। আফ্রিকা মহাদেশ কীভাবে ইয়োরোপীয় দেশসমূহ নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছিল?

১১। সেডানের যুদ্ধের পরবর্তীকালে মৈত্রীব্যবস্থার ফলে কীভাবে ইয়োরোপ দুই সশস্ত্র সামরিক শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল?

১২। বলকান যুদ্ধগুলির কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর।

পঞ্চম পর্ব 'ই' (অধ্যায় ১৭,১৮,১৯)

১। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণগুলি আলোচনা কর।

২। ভার্সাই সন্ধির শর্তগুলি কি প্রকৃতই কঠোর ছিল?

৩। বলশেভিক বিপ্লবের পটভূমি বর্ণনা কর।

৪। রুশ বিপ্লবে লেনিনের ভূমিকার মূল্যায়ণ কর।

৫। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য জার্মানি কতটা দায়ী ছিল?

৬। 1871 খ্রিস্টাব্দের পর কী কী মৌলিক কারণে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল?

ষষ্ঠ পর্ব—'এফ' (অধ্যায় ২০,২১,২২,২৩)

১। মুসোলিনি কিভাবে ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র স্থাপন করেন? ইতালির আভ্যন্তরীণ নীতিতে তাঁর প্রতিক্রিয়া কী?

২। হিটলার কিভাবে জার্মানিতে ক্ষমতা দখল করেন? তিনি জার্মানির পররাষ্ট্রনীতিতে কি পরিবর্তন আনে?

৩। জাতি সংঘের ব্যর্থতার কারণগুলি আলোচনা কর।

৪। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য হিটলারের জার্মানি কতখানি দায়ী?

৫। 1917-এর পর লেনিন কিভাবে রাশিয়ার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বনিয়াদ শক্ত করেন?

৬। হিটলারের আগ্রাসী পররাষ্ট্রনীতি কিভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পথ সুগম করেছিল?

৭। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণগুলি আলোচনা কর।

৮। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দায়িত্ব সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের নানা ব্যাখ্যা ও তত্ত্বগুলির পরিচয় দাও।

ইয়োরোপের ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনাপঞ্জি

1453 কনস্ট্যানটিনোপল্-এর (পূর্ব রোমান বা বাইজানটাইন) পতন
1492 কোলম্বাস কর্তৃক আমেরিকা আবিষ্কার
1487 বার্থলোমিউ দিয়াজ কর্তৃক উত্তমাশা অন্তরীপ অবিষ্কার
1498 ভাসকো-ডা-গামার ভারতে পদার্পণ
1517 মার্টিনলুথার কর্তৃক চার্চের দুর্নীতির প্রতিবাদ
1748 আই লা স্যাপেলের সন্ধি
1763 প্যারিসের সন্ধি
1740-86 প্রাশিয়ার দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের রাজত্বকাল
1780-90 অস্ট্রিয়ার দ্বিতীয় যোসেফের রাজত্বকাল
1762-76 রাশিয়ার দ্বিতীয় ক্যাথারিনের রাজত্বকাল
1760-80 ইংল্যাণ্ডে শিল্প বিপ্লবের সূচনা
1765 স্পিনিং জেনি আবিষ্কার
1769 (15 আগস্ট) নেপোলিয়ানের জন্ম ;
1774 ফ্রান্সে ষোড়শ লুইয়ের সিংহাসনে আরোহণ
1776 (4 জুলাই) আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা
1783 ভার্সাইয়ের সন্ধি/ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীন
1789 ফরাসি বিপ্লব/ টেনিস কোর্টের শপথ (20 জুন)/বাস্তিল দুর্গের পতন (14 জুলাই)
1789-91 সংবিধান সভার কার্যকাল
1792 ফ্রান্সে জাতীয় কনভেনশন
1797 কাম্পো-ফার্মিওর সন্ধি
1795-99 ফ্রান্সে ডাইরেক্টরির শাসন
1799 কনসালেট শাসন ; নেপোলিয়ান প্রথম কনসাল
1804 নেপোলিয়ান ফরাসি সম্রাট
1805 ট্রাফালগারের যুদ্ধ
1806 বার্লিন ডিক্রি
1807 টিলজিটের সন্ধি
1812 পেনিনসুলার যুদ্ধের সূচনা ; নেপোলিয়ানের রাশিয়া অভিযান
1813 লাইপজিগের যুদ্ধ
1814 নেপোলিয়ানের পরাজয় ও এলবা দ্বীপে নির্বাসন
1815 ওয়াটার্লুর যুদ্ধ ; নেপোলিয়ানের সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসন ; ভিয়েনা সম্মেলন
1818 কার্ল মার্ক্সের জন্ম (5 মে)
1820 ট্রপোর ঘোষণা পত্র ; স্পেনে ও ইতালিতে বিদ্রোহ
1823 মনরো নীতি ঘোষণা
1824 দশম চার্লসের সিংহাসন লাভ
1829 গ্রিসের স্বাধীনতা লাভ
1830 ফ্রান্সে জুলাই বিপ্লব

1831 ম্যাটসিনি কর্তৃক 'ইয়ং ইতালি' প্রতিষ্ঠা
1848 ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ও ইয়োরোপের নানা স্থানে বিদ্রোহ; কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো প্রকাশ
1853 ক্রিমিয়ার যুদ্ধ
1856 প্যারিসের সন্ধি
1864 প্রাশিয়ার সঙ্গে ডেনমার্কের যুদ্ধ
1866 স্যাডোয়ার যুদ্ধ
1870 সেডানের যুদ্ধ
1877 রুশ-তুর্কি যুদ্ধ; স্যান স্টিফানোর সন্ধি
1878 বার্লিন কংগ্রেস
1889 রাশিয়াতে সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি
1890 কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের ক্ষমতালাভ ও বিসমার্কের পতন
1903 বলশেভিক পার্টির প্রতিষ্ঠা
1904 রুশ-জাপান যুদ্ধ; ইঙ্গ-ফ্রান্স চুক্তি
1905 রাশিয়াতে প্রথম বিপ্লব; পোর্টস্‌মাউথের সন্ধি
1907 ত্রিশক্তি আঁতাত সম্পূর্ণ
1912-13 প্রথম ও দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ
1914-1918 প্রথম বিশ্বযুদ্ধ; সেরাজেভো হত্যাকাণ্ড (28 জুন)
1917 রুশবিপ্লব ও জারতন্ত্রের পতন
1918 উইলসনের চৌদ্দ দফা ঘোষণা
1919 ভার্সাইয়ের সন্ধি; মুসোলিনী কর্তৃক ফ্যাসিস্ট দল গঠন
1920 সেভরের সন্ধি দ্বারা তুরস্ক ব্যবচ্ছেদ; জাতিসংঘ স্থাপন
1921 লেনিনের নয়া অর্থনীতি গ্রহণ
1924 লেনিনের মৃত্যু
1925 লোকার্ণো চুক্তি
1931 জাপানের মাঞ্চুরিয়া দখল
1932 তুরস্ক জাতি সংঘের সদস্য
1933 জার্মানীতে হিটলারের ক্ষমতা দখল
1934 চীনে কমিউনিস্ট দলের লংমার্চ
1935 ইতালির আবিসিনিয়া দখল
1936-39 স্পেনের গৃহযুদ্ধ
1939 রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি; হিটলারের পোল্যাণ্ড আক্রমণ (1 সেপ্টেম্বর);
1939-45 দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ